দশম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ • ১৩৫৪

এশিয়া

জওহরলাল নেহ্‌রু

এশিয়ার সমস্ত দেশকে একই কর্ত্তব্য ও প্রয়াসের সমান ভিত্তিতে মিলিত হতে হবে। এশিয়ার এই নূতন অভিযানে ভারতবর্ষেরও দায়িত্ব আছে—সে দায়িত্ব তার পালন করা চাই। এ-কথা সত্য যে, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু এ ঘটনাটি ছাড়াও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: এশিয়ার বিভিন্ন সক্রিয় শক্তিরই কেন্দ্রস্থল আজ এই ভারতবর্ষ। ভূগোলকে স্বীকার না করে উপায় নেই, এবং ভৌগোলিক দিক থেকে তার অবস্থান এমন জায়গায়, যেখানে এসে মিলিত হয়েছে পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সুদীর্ঘ সম্পর্ক তাকে আশ্রয় করে তাই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের ইতিহাস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে সংস্কৃতির স্রোত এসে মিশে গেছে ভারতের মাটিতে, আর তারই ফলে একটি উন্নত ও বিচিত্র সংস্কৃতি নিয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ তৈরী হয়েছে। আবার ভারতবর্ষেরও সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেছে এশিয়ার সুদূর প্রান্তে। ভারতবর্ষকে যদি জানতে হয়, তা হলে আমাদের যেতে হবে আফগানিস্থানে, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায়, যেতে হবে চীনে ও জাপানে, পরিচিত হতে হবে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তের সঙ্গেও। ভারতীয় সংস্কৃতির যে সজীব, সতেজ সত্তা দিগ্বিদিকে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলো, সে-সব দেশে তার বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে।

অতি প্রাচীনকালেই ইরাণের একটি প্রবল সংস্কৃতির স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসেছিলো ভারতবর্ষে; তারপর ভারতবর্ষের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের, বিশেষ করে চীনের এক অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; আর পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর উৎসারে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার অবগাহন। একদিন যে প্রবল স্রোত আরবে জন্মলাভ করে ইরাণ-আরবের মিশ্র সংস্কৃতিতে প্রসারিত হয়ে উঠলো—তাও গড়িয়ে পড়লো এসে ভারতবর্ষে। প্রবল এ ধারাগুলো আমাদের কাছে এসেছে, আমাদের প্রভাবিত করেছে, কিন্তু এমনি শক্তিবান ভারতের প্রাণ আর ভারতের সংস্কৃতি যে, সে ধারাগুলোকে অকুণ্ঠে গ্রহণ করেও নিজে সে কখনও ভেসে যায়নি, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। অবশ্য, মিশ্রণের ফলে আমরা পরিবর্ত্তিত হয়েছি, আর আজকের ভারতবর্ষের অধিবাসী আমরা সেই বিচিত্র প্রভাবেরই মিশ্র ফল। ভারতবর্ষের কেউ যদি আজ এশিয়ার যে কোনো দেশে যায়, তা হলে সেই দেশকে আর সেই দেশবাসীকে সে নিজেরই আত্মীয় বলে মনে মনে অনুভব করবে।

মানব-প্রগতির কল্যাণে য়ুরোপ ও আমেরিকার দান প্রচুর এবং তার জন্যে আমরা তাদের প্রশংসা করবো, সম্মান জানাবো, আর তাদের কাছ থেকে শিখবার যা আছে শিখে নেবো। কিন্তু পাশ্চাত্য আমাদের এগিয়ে দিয়েছে অগণিত যুদ্ধ আর দ্বন্দ্বের মধ্যে; আর এখনও, একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পরমূহূর্ত্তেই, আমাদের আণবিক যুগের আকাশে আরো যুদ্ধের আভাস ফুটে উঠছে। কিন্তু এই আণবিক যুগে এশিয়ার সক্রিয় কর্ত্তব্য হবে শান্তি রক্ষা করা। আর বাস্তবিক, যতক্ষণ না এশিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি আসতে পারে না। দেশে দেশে আজ দ্বন্দ্ব, আর আমরা এশিয়াবাসীরাও আপন আপন বিঘ্ন-বিপদে বিব্রত। তা' সত্ত্বেও এশিয়ার মন ও দৃষ্টিভঙ্গি শান্তিময়, এবং বিশ্বব্যাপারে এশিয়া প্রবেশ করলে বিশ্বশান্তির পক্ষে তার প্রভাব হবে অপরিসীম।

শান্তি শুধু তখনই আসতে পারে, যখন সমস্ত জাতি পাবে স্বাধীনতা এবং সর্ব্বত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তি পাবে স্বাধীনতা, নির্বিবঘ্নতা আর আপন সুযোগ-সুবিধার অধিকার। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় দিক থেকেই শান্তি ও স্বাধীনতার কথা ভাবতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এশিয়ার দেশগুলো অনগ্রসর এবং তাদের জীবনধারণের মানও অত্যন্ত শোচনীয়। অর্থনীতির এই সমস্যাগুলোর আশু-মীমাংসা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা না হলে সঙ্কট ও বিপদের আঘাত অনিবার্য্য। সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে সাধারণ মানুষকে নিয়েই; আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে তার বোঝার নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবন-স্ফূর্ত্তির সম্পূর্ণ সুযোগ পায়।

এখন আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, যখন একটি অখণ্ড পৃথিবীর আদর্শ,

একটি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের একান্ত প্রয়োজন না মেনে উপায় নেই; যদিও এ পথে বাধা আছে অনেক, বিপদও আছে প্রচুর। বিশ্বরাষ্ট্রের বৃহত্তর আদর্শের জন্যেই আমরা কাজ করে যাব—তার পথ যেন কোনো দলীয় স্বার্থ এসে রোধ করে না দেয়। সুতরাং আমরা সেই যুক্তরাষ্ট্রসঙ্ঘকেই সমর্থন করি, যে অনেক ব্যথাবেদনা সহ্য করেও তার শৈশব উৎরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'অখণ্ড বিশ্ব'কে লাভ করতে হলে সেই বৃহত্তর আদর্শের জন্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথাও আমাদের অতি অবশ্য ভাব্‌তে হবে।

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ আমরা চাই না। প্রত্যেক দেশেই জাতীয়তাবাদের স্থান আছে, এবং সেখানে তা লালিত হওয়াও প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে তাকে কিছুতেই আক্রমণাত্মক হতে দেওয়া সঙ্গত নয়, আর আন্তর্জাতিক অগ্রসরতার পথেও তাকে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া যায় না। বন্ধুর মতো এশিয়া তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে য়ুরোপ আমেরিকার দিকে আর আমাদের আফ্রিকাবাসী নির্য্যাতিত ভাইদের দিকে। আফ্রিকাবাসীদের প্রতি আমাদের, এই এশিয়াবাসীদের, বিশেষ একটি দায়িত্ব আছে। মানব পরিবারে তাদের ন্যায়সঙ্গত ঠাঁই আছে—সেই অধিকার অর্জ্জনে তাদের আমরা সাহায্য করব। যে স্বাধীনতার কথা আমরা ভাবছি তা কেবল জাতি ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাক্‌বে না, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বজনীন মানবস্বাধীনতা কখনও বিশেষ কোনো শ্রেণীর আধিপত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। সর্ব্বত্র সাধারণ মানুষের জন্যেই চাই এই স্বাধীনতা, আপন উন্নতির জন্যে সে যেন পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে।

সমগ্র এশিয়াতেই আমরা আজ বিঘ্নবিপদ আর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ভারতবর্ষেও দেখা যাবে সেই দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট। কিন্তু তাতে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কিছু নেই। প্রচণ্ড যুগসন্ধিক্ষণে এ তো অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি এশিয়াবাসীর মধ্যে আজ স্পন্দিত হচ্ছে নতুন শক্তি, সৃষ্টিক্ষম এক প্রবল প্রেরণা।

জনগণ জাগ্রত, স্বাধিকার তাদের দাবী। সমগ্র এশিয়ার আকাশে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা। তাকে ভয় করলে চল্‌বে না, আমরা নির্ভয়ে তাকে আহ্বান জানাই, তার সাহায্যেই আমরা গড়ে তুল্‌তে পারবো আমাদের কল্পনার নব-এশিয়া। নবজাগ্রত এই কল্পমূর্ত্তির উপর যেন আমরা বিশ্বাস না হারাই। সর্ব্বোপরি, সুদীর্ঘ অতীত থেকে এশিয়া যে মানবীয় প্রাণের প্রতীক হয়ে এসেছে, তার উপর যেন আমাদের বিশ্বাস অটল থাকে।

মার্কস্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম্ম

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মার্কস্‌বাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দুটি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য : (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব-স্ফূরণের অবকাশই মিলবে না; এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক ও 'ব্যাবিট্'-শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ-ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা ত দূরের কথা। শিক্ষক-সম্প্রদায়, আর্টিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবিরই আজ এই দশা। তবু এই ধরণের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানুষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্ক্‌স-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায় না। এইখানেই রাশিয়ার ঝগড়া ওঠে। কেউ বলছেন সেখানে মানুষ যাঁতা কলে পিষে মরছে, আবার কেউ বলছেন সেখানে মানুষ সব অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে যখন যাইনি তখন মাত্র এইটুকু মানব যে সেখানকার মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরাও আত্মবিশ্বাসী। দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় আছে, তবে মনে হয় যে তার ইঙ্গিত পূর্ব্বোক্ত মার্ক্‌সিজম্‌-এর স্বপক্ষে জবাবদিহির মধ্যে নেই।

অন্য উত্তর চাই। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখলে মন্দ হয় না। মানুষের সভ্যতায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে বহুবার তার সঙ্গে প্রকৃতির ও সমষ্টির বিবাদ বেধেছে। আদিম তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বদা দেখি cosmology-র পাশে একটা anthropology রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির সঙ্গে আদিম মানুষ প্রশ্ন করছে তার নিজের উৎপত্তি কি ও কোথায়? প্রথমে দেখি ভুতুড়ে ব্যাখ্যা আসছে, পরে mythology সৃষ্টি হচ্ছে। তাই থেকে ধর্ম্ম উঠল; এবং ধর্ম্ম পুরাণকে নষ্ট না করে তাকে পুষতে লাগল। ফলে যেটা ছিল মাত্র জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এখন সেটা হল মানুষ কি সেই জ্ঞানেরই কর্ত্তব্যবোধ। এই মন-ঘুরে যাবার পর থেকেই মানুষ সমগ্র প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন

ঐক্য, অর্থাৎ সমষ্টি থেকে বিচ্যুত হল। এতদিন প্রকৃতি ছিল নৈর্ব্যক্তিক সমগ্র ও সুনিশ্চিত, মানুষের পৃথক সত্তাই ছিল না; কিন্তু আত্মজ্ঞানের তাগিদে বহির্জগতের সূত্র গেল ছিঁড়ে, আর বেড়ে চলল প্রশ্ন আর সন্দেহ। বর্ত্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ সুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। এই থেকেই "মনুষ্যধর্ম্মের" আরম্ভ। দর্শনের ইতিহাসে দেখি 'scepticism has very often been simply the counterpart of a *resolute humanism.* By the denial and destruction of the objective certainty of the external world the sceptic hopes to throw all the thoughts of man upon his own being." (Cassirer—What is Man ?) এই scepticism-এর সঙ্গে মার্ক্‌সীয় critique-এর সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্ক্‌সবাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে। সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব্ব অনেকদিন চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জুডা, ইসলাম ধর্ম্ম সে-পর্ব্বের এক একটি অধ্যায়। লাভ হয়েছিল এই যে মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র এ-কথা সে ভুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর; নিজের ওপর অতটা আস্থা থাকার দরুণ বাইরের অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছিল। অর্থাৎ প্রকৃতি-সমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। প্রতিক্রিয়া এল কোপার্ণিক্যান ও কার্টেসীয়ান চিন্তা-পদ্ধতিতে। অনন্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষ আবার পেল ভয়। মানুষ গেল কুঁকড়ে, ছোট হয়ে। রিনেস্থান্‌স্‌ যুগের এই দিকটা ঐতিহাসিকরা বড় বেশী দেখাননি, তাঁরা হ্যামলেটের মানব-অর্চ্চনা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত। মনটেন লিখছেন: Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subjet to the injuries of all things, should call himself master and emperor of the world, of which he has not power to know the least part, much less to command the whole ?" (এটা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে; তখন ভারতবর্ষে সাধুসন্তের কৃপায় মানবধর্ম্মের জোয়ার বইছে। আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মে কোপার্ণিক্যান কিংবা কার্টেসীয়ান সীস্‌টেমের মতন অবিশেষ প্রকৃতি-ধর্ম্মের প্রচার হয় নি। তার ফল বিচারের স্থান অন্যত্র।)

এইবার প্রশ্ন উঠল প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কি করে মুক্ত হবে; যদি মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মাবলী থেকে মানুষের নিয়মাবলী, অর্থাৎ সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্রের, পরিশীলন, আচার-ব্যবহারের নিয়মকানুন কিভাবে ও কতটা বিভিন্ন? কোপার্ণিকাস, ডেকার্ট-এর চিন্তাধারায় মানুষ গণিতশাস্ত্রে শাসিত, কারণ প্রকৃতির মর্ম্ম সংখ্যার হাতে? কিন্তু এই গণিতশাস্ত্রই মানুষকে তার পূর্ব্বতন স্থানে ফিরিয়ে আনলে। Infinite-এর বিচারে দেখা গেল যে মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

করতে পারে, এবং সে প্রকৃতির প্রতিবেশ এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রহনক্ষত্র আকাশ প্রসারী। অতএব অঙ্কশাস্ত্র ও তার অধীনস্থ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেলে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা চলেছিল মানব-সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করতে—বাক্‌ল, ফেকনার থেকে সলভে, এজওয়ার্থ-এর দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে।

কিন্তু গণিতবিদ্যার সাধারণত্ব ও অবরোহী পদ্ধতির বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াল জীববিদ্যা; Biology। ডারুইনের কৃপায় আরোহী যুক্তি পদ্ধতি ও পর্য্যবেক্ষণ প্রসারিত হল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে থেকেই রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। জীবতত্ত্বের প্রচারে মানুষ প্রথমেই অবশ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি; বরঞ্চ মানুষ আরো পরাধীন হয়ে পড়েছিল, যেমন কোঁৎ, হার্ব্বার্ট স্পেনসার, শাফ্‌ল প্রভৃতির সমাজতত্ত্বে। টেন এক জায়গায় লিখছেন, ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের ইতিহাস তিনি লিখবেন metamorphosis of an insect হিসেবে। তবুও ফল বিপরীত হল দুই দিক থেকে: (১) জীবতত্ত্বের বিচারে একটা জীবনস্রোতের সন্ধান মিলল, যার জোরে মানুষ ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় প্রতিবেশ বদলে অন্য জীবের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হয়েছে মনে হল কিংবা দেখা গেল। এবং (২) এই উন্নতির ইতিহাস একটি অদৃশ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে ধারণা জন্মাল। ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্য্যন্ত যতটা উন্নতিবাদের চলন হয়েছে তার মূলে ছিল ঐ উদ্দেশ্যবাদ, ঐ মানুষের প্রতি আস্থা, তার বর্ত্তমানে গৌরব ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস। উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদই হল আমাদের পরিচিত মানব-ধর্ম্মের প্রাণবস্তু। গণিতের কবলে থাকলে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারত না। (Cassirer এই উন্নতিবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। এর খবর Christopher Dawson দিয়েছেন চমৎকার)। একবার পথ যেই খুলল, অমনই মানুষ-সংক্রান্ত যত প্রকার বিদ্যা আছে সব এগিয়ে চলল। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কেউ পড়ে রইল না।

কিন্তু নতুন বিপদ এল। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু নৌকোয় পা; কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না এগুলে কেবল বর্ণনার জঞ্জাল জড় করা। সেই পুরাতন তর্ক, সাধারণ বড় না বিশেষ বড়? সাধারণকে মানলে মানুষের ইতিহাস হয় অঙ্কের অধীন, না হয় Natural History; আবার বিশেষকে স্বীকার করলে কোনো নিয়মই খাড়া করা যায় না, কোনো কাজই সম্ভব হয় না, কোনো কিছু বোঝাই যায় না। জনকয়েক ঐতিহাসিক বল্লেন, ইতিহাস বিজ্ঞানের মতন করেই লিখতে হবে; যেমন র‍্যাঙ্কে; আবার কেউ বল্লেন, ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ, যেমন কার্লাইল। অবশ্য লেখবার বেলা কেউই নিজের মতানুসারে চললেন না। আরেকটি বিপদ ঘটল এই যে প্রত্যেক মানুষ-

সংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিজের নিয়ম তৈরী করে দাবী জানালে যে সেইটাই একমাত্র নিয়ম, অন্য কোনো নিয়ম মানুষের বেলা খাটে না। এই বিভিন্ন দাবীর উৎপাতে সেই পুরাতন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গড়া মূল-পত্তন গেল ভেঙ্গে। আজও সেজন্য হা হুতাশ শুনতে পাই, যেমন Cassirer—An Essay on Man, পৃঃ ২১, ২২।

কিন্তু আমার মতে দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্কসবাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ; অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্ম্মের দ্বারা সে কেবল মানবপ্রকৃতি নয় জড়প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে, এবং নিজের মত ভেঙ্গে-গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিক্যান-কার্টেসীয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে। অনেকে একে environ mentalism-এর পর্য্যায়ে ফেলতে চান; কিন্তু যদি এই ধরণের মন্তব্য করতেই হয় তবে Human Geographyর সঙ্গে একে যুক্ত করাই যুক্তিসাপেক্ষ। মার্ক্‌সিজম-এ অন্ধনিয়তির স্থান নেই, আবার আকস্মিকতারও স্থান নেই। Infinity-বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই dialectical materialism-এর প্রত্যয়ে মার্ক্‌সিষ্ট আপনার প্রতি বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারে। মার্ক্‌সিজমের যুক্তিপন্থা প্রধানত আরোহী। বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহী। এর মূলকথা জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষ-চর্চ্চা; এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যয় থেকে কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্ত্তন। মার্ক্‌সিজম-এ বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খানিকটা মিটেছে। কেবল তাই নয়, সেই জন্যে মার্ক্‌সবাদী ইতিহাস Natural history থেকে পৃথক হতেও পেরেছে। তার উন্নতিবাদ গড্‌উইন, কন্‌ডর্স-এর অজানিত উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদ নয়। মানুষের চেষ্টার ওপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মোদ্দা কথা এই: মার্ক্‌সবাদ সেই বহু পুরাতন মনুষ্যধর্ম্মের আধুনিক সংস্করণ। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে Stoic humanism-এর আত্মকেন্দ্রিকতার মিল নেই; ভারতীয় humanism-এর আত্মচর্চ্চার সঙ্গেও তার মিল কম; য়ুরোপীয় রিনেস্যান্স-যুগের শেষভাগের humanism-এর খাপছাড়া, মুনাফালোভী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরও বিপরীত ধর্ম্মী; এবং আজকালকার Scientific humanism-এর সঙ্গেও পার্থক্য তার অনেকখানি।

তা হলে দাঁড়াল এই। মার্ক্‌সবাদের কেন্দ্র মানুষ। কিন্তু মানুষ আর ব্যক্তি কি এক বস্তু? যদি বলা যায় যে মাত্র ব্যক্তিই সত্য, কারণ তারই মন ও দেহ আছে, তবে সকলেই মানতে বাধ্য যে মার্কসিজ্‌মের সঙ্গে এই ব্যক্তি-সত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাতের নয়, একটা কোনো মানব-গোষ্ঠির মারফৎ; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠি প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। আর যদি কেউ বলেন যে ব্যক্তি বলে কোনো বস্তু নেই, একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং

সমষ্টিটাই সত্য, কারণ ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারাই প্রভাবিত, প্রচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তবে মার্কসিজ্‌ম-এর সঙ্গে মানব-সমষ্টির সম্বন্ধ নিতান্ত প্রত্যক্ষ। আমার নিজের বিশ্বাস, অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে, যে ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড abstraction, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধণিক-তন্ত্রের যুগে এবং যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সমাজের ও ঘটনার কোন যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ ; ও আমাদের সমাজে এখন পর্য্যন্ত এমন খুব বেশী 'ব্যক্তি' জন্মান নি যাঁদের চরিতকথার প্রেরণায় ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যায়। (তবে তাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন।) ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা আর্থিক উন্নতির সাধনা। পুরুষবাদের তত্ত্ব কথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকসিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোন। মার্কসিজম আর হিন্দুত্ব একবস্তু বলছি না ; আমার বক্তব্য এই যে ব্যক্তিত্বের নামে মার্কসিজম-এর বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধণিকদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তাঁরা কি ভারতবাসী ? মার্কসিজমের অন্য গলদ থাকতে পারে ; তবে ব্যক্তিত্ব নামক কল্পিত বস্তুর বিশেষ রকমের উন্নতিবিধানের স্থান, কিংবা জল্পনা কল্পনা মার্কসিজম-এ নেই বলে তার সমালোচনা চলে না ; কারণ তা হলে সমগ্র মানবপ্রচেষ্টার গতির বিপক্ষে যেতে হয় ; জ্ঞানের ইতিহাসকে অপমান করা হয়। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে মানবধর্ম্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয়।

ভ্রান্তি-বিলাস

অজিত দত্ত

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিষ্ঠুর হাওয়ায়
নিষ্ফল মেঘের মতো হৃদয়ের আকাশে মিলায় ।

আয়ুর পরিধি হ'তে অবাধ্য বাহুতে
মৃত্যু-তীর্ণ কল্পনারে ছুঁতে
বারংবার অক্লান্ত প্রয়াসে
কামনা স্তিমিত হয়ে আসে ।

স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল মন, তবু কঠিন শাসনে
রাত্রিদিন রেখে সন্তর্পণে
'সংশয়ের বিভীষিকা আনি'
উন্মুক্ত দৃষ্টির পরে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা টানি'
গড়ে চলি এতোটুকু নীড় ।
যেখানে অসংখ্য ছোটো নির্জীব আশার শুধু ভিড়.
সেখানে মলিন শয্যা পেতে
আত্ম-প্রসাদের তীব্র সুরার ভ্রান্তিতে থাকি মেতে ।

আমার এ-উপদ্বীপে যাযাবর তাতারের মতো
নিষ্ঠুর দুর্দমনীয় প্রেম এলো কতো !
এলো কতো দুর্নিবার উদ্ধত বাসনা,
সম্ভ্রমের রুদ্ধদ্বারে অবজ্ঞায় হোলো অভ্যর্থনা ।

তারপর সুখ খুঁজে খুঁজে
রাত্রিদিন স্রোতে ভেসে চলি চোখ বুজে ;
সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

মাঝে মাঝে শুনি যেন আর্তনাদ কার !
অকস্মাৎ মনে হয়, ভেঙে দিয়ে দ্বার
বিদ্রোহী কল্পনাগুলি যদি কোনোমতে
সহসা ছড়ায়ে পড়ে সত্তাব্যাপী বিস্তীর্ণ জগতে,
তবে কি সে স্ফুলিঙ্গের উদ্দাম আহবে
প্রাণের এ-আয়োজন ভস্ম হয়ে গিয়ে ধন্য হবে ?

কবিতা সম্বন্ধে অজিত দত্ত

আলংকারিক ও সমালোচকেরা কাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন। যারা আলংকারিক বা সমালোচক নয়, এবং সেহেতু তাঁদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী নয়, তাদের পক্ষে কবিতার প্রকৃতি বর্ণনা করা শক্ত। তবু যাঁরা কবিতার চর্চা করেন, তাঁদের মনে কাব্য সম্বন্ধে একটা আদর্শ নিশ্চয়ই আছে। সেটা লেখকের যোগ্যতা, অভ্যাস ও পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হ'তে পারে, মতামতের পার্থক্য থাকাও বিচিত্র নয়। কবিতা রচনার আদর্শ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা কিছু বলা যায়, কিন্তু লেখককে ব্যাখ্যাতা হতে হবে তার কোনো মানে নেই, সেটা সমালোচকের কাজ।

কবিতার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটাকে ফোটাতে আমরা চেষ্টা করে থাকি, সেটা অবশ্য ছন্দ বা মিল নয়, এমন কি বক্তব্যও নয়। ভালো ভালো কথা মোটামুটি ভালো করে ছন্দোবদ্ধে বললেই কবিতা হয়ে ওঠে বলেও মনে হয় না। তবু ছন্দ, মিল, ভাষা ইত্যাদি যাবতীয় আঙ্গিকের সম্বন্ধে যত্ন নিতে হয়। অনেকে গদ্যছন্দে লেখেন, অনেকে মিল পছন্দ করেন না, তাতে কিছু যায় আসে না। যেটাই যার আঙ্গিক, সেটাই তার অভ্যাস ও যত্নের ফল, আসল জিনিস ভিতরকার কাব্য। সেই কাব্যকে খাপ খাইয়ে আঙ্গিক তৈরী হয়, যেমন আলো অনুযায়ী শেড। বাইজীর নাচের সময় ঝাড়লণ্ঠন দরকার। বই পড়বার সময় নীলাভ শেডের তলায় একটি উজ্জ্বল আলোই যথেষ্ট। তবু যথাযথ আঙ্গিক সম্বন্ধে অসাবধান হলে ভিতরের ঔজ্জ্বল্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

আমরা কবিতা লিখি বা লিখতে চেষ্টা করি কেন? কী প্রক্রিয়ায় কবিতা আমাদের মনের মধ্যে তৈরী হয়? যে জিনিসটাকে মনের মধ্যে কোনো এক দুর্লভ মুহূর্তে খুঁজে পাই সেটা কি কল্পনা অথবা তাকে ভাব বলবো? এই নামগুলো পুরোনো, কিন্তু আমার মনে হয় এই পুরোনো নামগুলোতেই তাকে চেনা চলে। কেননা সেটা অবর্ণনীয়। হঠাৎ কারণে বা অকারণে একটা কথা মনে হয়। মনে হয় কথাটা যেন নতুন, যেন ভারি সুন্দর, যেন এই কথাটা আমার বলা দরকার, কেননা আর কেউ কোনোদিন এরকম ভাবে এ কথাটা বলে নি। বলা বাহুল্য এটা বাজে কথা। পুরোনো কথাই সব, তবু যেন নতুন রূপ ধরে আসে, নতুন করে বলতে ইচ্ছে করে।

এ জিনিসটাকে হয়তো প্রেরণা বলা চলে। এটা যদি প্রেরণা হয়, তাহলে আমি প্রেরণায় বিশ্বাস করি। তবে যে ধরণের প্রেরণার কথা শুনি, যাতে প্রেরণাকে আশ্রয় করে না ভেবে চিন্তে পুরো একটি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করা চলে, সে ধরণের প্রেরণায় আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় নয়। অনেকটা ভূতে বিশ্বাসের মতো, কখনো দেখিনি, তবে তার গল্প শুনে রোমাঞ্চ হয়। আমার মনে হয় উৎকৃষ্ট রচনামাত্রই পরিশ্রম-সাপেক্ষ। মানুষের মনে বা বহির্জগতে এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি যার কল টিপে দিলেই বিশুদ্ধ একটি আস্ত কবিতা বেরিয়ে আসবে। অবশ্য প্রত্যেক কবির জীবনেই এমন কোনো কোনো শুভ মুহূর্ত আসতে পারে, যখন কবিতা একেবারে দানা বেঁধেই মনের মধ্যে আসে, তখন পরিশ্রম কম হয়, সহজে লেখা চলে, কিন্তু তাও সম্পূর্ণ অনায়াসে হয় বলে মনে হয় না।

আগেই বলেছি একটি কবিতার বীজকে যখন মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা বীজই মাত্র, তার সম্ভাবনা যাই থাক বা না-ই থাক। তবু যেন মনে হয় এই একটা কবিতা পেলাম। সেটা একটা সুর মাত্র হ'তে পারে, কিংবা একটা mood অথবা একটা চিন্তার ক্ষীণসূত্র। সেটা অনেক সময় হারিয়েও যায়। ধরে রাখতে হলে সেটাকে নিয়ে মনের মধ্যে খেলা করতে হয়, সেই সামান্য জিনিসকে বিস্তার করে একটা আকার দিতে হয়, যেটা ছিলো নীহারিকাপুঞ্জের মতো অস্পষ্ট ও আকারহীন, তাকে একটা নির্দিষ্টরূপে গঠিত করতে হয়। এটাকে আমরা সৃষ্টি বলি এই জন্যে যে মনের ভিতরকার যে জিনিসগুলি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যাদের আমরা আবেগ বা ভাবনা বলি সেই জড়জগতের বহির্ভূত বস্তুগুলো ছাড়া এই গঠনের অন্য কোনো উপাদান নেই। যেখানে কিছুই ছিলো না সেখানে একটা কিছু তৈরি হোলো, তাই এটা সৃষ্টি। তবু পদ্যমাত্রই সৃষ্টির পর্যায়ে ওঠেনা, ছবি মাত্রও নয়। একটা গাছ কিংবা পাহাড়ের ছবি দেখেই আমরা বলিনা যে এটা আর্ট। কেননা গাছ ও পাথর জড়জগতের অন্তর্গত, ছবি দেখে যদি শুধু সেইগুলোই দেখা যায়, তাহলে আর সৃষ্টি হোলো কোথায়? কিন্তু গাছ আর পাহাড়ের ছবিই যদি এমন করে আঁকা যায় যা মনের মধ্যে একটা আলোড়ন আনবে, তাহলে বুঝ্‌বো এটা সৃষ্টি, কেননা তাহলে বুঝ্‌বো যে এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি চিত্রকরের মনের একটা রূপ। কবিতাতেও তাই। মনটা অলস ও স্তিমিত হলে প্রবন্ধরচনা করা চলে, কাব্যসৃষ্টি চলে না। এমন কি মোটামুটি ভালো পদ্যও হয়তো লেখা যায়, কেননা Craftsmanship চর্চা দ্বারা আয়ত্ত হয়।

ভাবই বলুন আর যাই বলুন, কবিতার বীজকে আশ্রয় করে একটা গোটা কবিতা রচনার যে

প্রক্রিয়া, সেটা অবশ্য খানিকটা বর্ণনার যোগ্য। ভাবটা মনের মধ্যে একটু দানা বাঁধবার পরই একটা উপযোগী আঙ্গিকের সঙ্গে তাকে ওতপ্রোত করে নিই। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তখন হয়তো মনের মধ্যে থাকে কবিতার একটা পংক্তি, কিংবা গোটাকয়েক কথা। যখন কথা পেলাম, তখনই একটা রূপ পেলাম। রচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপকে মার্জিত, সংস্কৃত, সুগঠিত করে' চলি। যে ভাব অস্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন, নিরাকার ছিলো, সেটা ক্রমশ মনের মধ্যে স্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ হয়ে আসে। যতোই রচনা করে চলি, ততোই বক্তব্যের নক্সাটা পরিস্ফুট হয়; যতোই সেটা স্পষ্ট হয়, ততোই সেই নক্সার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনাটাকে মার্জিত নিখুঁত করবার চেষ্টা করি। প্রচুর কাটাকুটি করি। অবশ্য অনেক সময়ে সহজেই লেখা হয়ে যায়, প্রথমেই যেন ঠিক কথাটা খুঁজে পেয়ে যাই, অনেক সময় অনেকক্ষণ হাতড়াতে হয়।

অবশ্য এ-গেল বিশ্লিষ্টভাবে এক-একটি কবিতা রচনার প্রক্রিয়া। কিন্তু মনটা যখন অনেকটা প্রৌঢ় বা mature হয়ে আসে, যখন নিজের মনটাকে খানিকটা চিনে ফেলা যায়, তখন আবেগের সঙ্গে বুদ্ধির সচেতন সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিক। নিজের মনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসে তখন স্বভাবতই কবিতা বাস্তব পরিবেশ ও সময়-পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়ে উঠবার বেশি সুযোগ পায়। এজন্য এটা স্বাভাবিক যে অপরিণত বয়সে কবিতা আবেগকে অবলম্বন করে যতোটা উচ্ছ্বাস-মুখর হয়ে উঠতে চায়, পরিণত মন থেকে উৎসারিত কবিতার পক্ষে ততোটা হওয়া শক্ত। সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে একটা অন্তর্দৃষ্টি অগ্রসরমান কবিমনে আয়ত্ত না হয়ে পারে না। যদি কেউ ওটাকে ইতিহাস-চেতনা বলেন, আপত্তি করবো না; যদি সমাজ-চেতনা বলেন, তাতেও আপত্তির কিছু নেই। তবে এই কথাগুলো দ্বারা অপরে যা বোঝেন, আমি তা নাও বুঝতে পারি। আবেগ ও মননের সমন্বয়ের চেষ্টাতেই কবি-মন এগিয়ে চলে। এখানে বিতর্কের অবকাশ আছে, সংশয়ের খুব বেশি অবসর নেই। তবু আত্মসচেতন লেখকের পক্ষে অন্তত আংশিক সমন্বয় সর্ব্বদাই সম্ভব।

আমার মনে হয় কবির পক্ষে নিজের মনের সাংস্কৃতিক রূপ এবং চিন্তা ও আবেগের সহজ ও স্বাভাবিক গতির সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। এইরূপ আত্মসচেতন হলেই মাত্র কবি দৃঢ়পাদক্ষেপে নিজের আদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। অবশ্য অতৃপ্তি একটা থেকেই যায়। যে কথা যেমন করে বলতে চাই, কিছুতেই তেমন করে বলা যাচ্ছে না, যে কাব্যলোকে পৌছুতে চাই সেটা দুর্গম ও দুর্লভ, এরকম একটা অশান্তি থাকাই বোধ হয় কবি-মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। চট্ করে স্বর্গলোকে পৌছে গেলাম বলে মনে হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। স্বর্গপ্রাপ্তিরই অপর নাম মৃত্যু।

বাংলার সংস্কৃতি

আধুনিক নাটকের প্রথম যুগ

করালীকান্ত বিশ্বাস

বাংলা দেশে এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে যাহাকে ইয়োরোপীয় আদর্শে প্রকৃত নাটক বলিতে না পারিলেও নাটকীয় বলিতে কোনও বাধা নাই। কথকতা, পাঁচালী ও প্রচীন যাত্রার প্রকৃতিতে নাটকের অনেকগুলি উপাদান বর্ত্তমান। এই সব অনুষ্ঠান জনসাধারণের অত্যন্ত আদরনীয়, এবং আদরনীয় বলিয়াই মনে হয় যে জাতি হিসাবে নাট্যশিল্প বাঙ্গালীর মজ্জাগত। তথাপি উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি পরিণত হইয়া খাঁটি নাটক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইয়োরোপীয় আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙ্গালী নাট্যকার সংস্কৃতে নাটক রচনা করিয়াছেন। 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব' নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর নহে। কাজেই বাঙ্গালীর সম্মুখে কোনও আদর্শ ছিল না বলিবার উপায় নাই। প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রার, আজও অস্তিত্ব আছে, তথাপি প্রাচীন যাত্রার কাঠামোতে নূতন নাটকের স্থান হয় নাই।

প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা অব্যাহত থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় বাংলা দেশের সমাজবিন্যাসের কথা। বাংলা দেশের সমাজবিন্যাস কৃষিনির্ভর। আজও সমাজের এই রূপ সম্পূর্ণ বদলায় নাই। প্রাচীন যাত্রার উৎপত্তি এই কৃষিনির্ভর গ্রামে। কয়েকটি চারুকলা বিশেষভাবে পোষকতা দাবী করে। যথোপযুক্ত পোষকতার অভাবে তাহা বিকাশ লাভ করিতে পারে না, পরিণত হইবার সুযোগ পায় না। পোষকতার অভাব সত্ত্বেও নাটক প্রসার লাভ করিয়াছে ইতিহাসে এমন কোন নজীর নাই, রচিত নাটক অভিনীত হয় কি না, দর্শকের তাহা ভাল লাগে কি না তাহা উপেক্ষা করিয়া শিল্পী সম্পূর্ণভাবে নিজ প্রেরণা হইতে নাটক রচনা করিয়া গেল, এমন একটি অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। The Dynasts-এর মত নাটক অভিনয় হয় নাই, রঙ্গমঞ্চের কলাকৌশল এখনও যে স্তরে তাহাতে ঐ ধরণের নাটকের অভিনয় সম্ভব নহে। এখানে নাট্যকার নিছক শিল্পপ্রেরণার উপর নির্ভর করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী-সাহিত্যে প্রাচীন ও আধুনিক এমন অনেক

দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সেই সব নাটকের অভিনয়োপযোগিতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। সাহিত্য হিসাবেও ঐ নাটকগুলি স্বীকৃত। কিন্তু ছাপাখানার সাহায্যে সাহিত্য যখন ব্যাপকতা লাভ করে নাই, সাক্ষাৎ আবৃতি এবং অভিনয়ই তখন সাহিত্য প্রচারের একমাত্র উপায়। সাহিত্য বিকাশের এই কৈশোরে অভিনীত হইলেই নাটক সাধারণের কাছে পৌঁছিতে পারিত। সাধারণ দর্শকেরা ছিল তখন নাটকের প্রধানতম পোষক। আমাদের প্রাচীন যাত্রা সাধারণের পোষকতা লাভ করিয়াছিল, আজও এই যাত্রা ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে গ্রামের জনসাধারণকে আনন্দ দিয়া থাকে। শহরে নূতন নাটকের সূত্রপাত হইলে গ্রামের লেখক অথবা অধিকারীরা শহরের নাটক হইতে দুই একটি ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া গ্রামে তাহা প্রয়োগ করিয়া গ্রামীন যাত্রার নূতনত্বের সৃষ্টি হয়ত করিতেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা নূতনত্বের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করে নাই। বৎসরের বিশেষ সময়ে একই পালাগান বৎসরের পর বৎসর অভিনীত হইলে সরল গ্রামবাসীদের কাছে তাহা অপ্রীতিকর বোধ হইত না। সেতু আবর্ত্তনের মত এই সব যাত্রাভিনয়কেও তাহারা স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিত। পরোক্ষভাবে ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রামবাসীদের তাহা আরও আদরনীয় ছিল। প্রাচীন যাত্রা এইভাবে গ্রামবাসীদের জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে পরিবর্ত্তন আনা নিতান্ত সহজ নহে, বৈপ্লবিক প্রতিভা না থাকিলে তাহা সম্ভব নয়। উপরন্তু পরিবর্তন গ্রামবাসীরা সহ্য করিত কি না, তাহা লইয়াও কল্পনার অবকাশ আছে। সুযোগ পাইলে গ্রামের লোকে এখন যাত্রা ফেলিয়া সিনেমা দেখে একথা সত্য। কিন্তু অতীতে শহর ও গ্রামের ব্যবধান এখানকার তুলনায় অনেকগুণ বেশী ছিল। শহরের ফ্যাশন গ্রামে পৌছিতে এখন ছয়মাসের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও উল্লেখযোগ্য সময়ের ব্যবধানে শহরের আচরণ গ্রামে আবির্ভূত হইত।

বাংলা দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিও নাটক বিকাশ লাভের অন্যতম বাধা ছিল। ভাষা হিসাবে বাংলা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে আনুমানিক সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে। নাটকের বাহন হইবার মত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে আরও কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায়। কিন্তু এখন নাটকের মত একটি শিল্প প্রসার লাভ করিবার মত রাজনৈতিক অবস্থা দেশে ছিল না। পাঠান শাসনের অবসানে কিছুদিনের জন্য মোগল শাসন কায়েম হওয়ায় দেশে আবার রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। নাটক বিকাশের পক্ষে দেশের এই অবস্থা মোটেই অনুকূল নহে। কাজেই যাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল গ্রামের অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল পরিবেশে তাহাই কোনও ক্রমে বাঁচিয়া ছিল। বাঙ্গালীর অভিনয়প্রিয়তাও বিরূপ পরিবেশে প্রাচীন যাত্রা বাঁচাইয়া রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

এই সব 'নাটকের 'সাহিত্যমূল্য যাহাই হউক, এই অভিনয় বহুবার দেখিয়া নাট্যকের

কয়েকটি অপরিহার্য্য উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের একটি ধারণা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল। সাধারণ দর্শক অভিনয় দেখে আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং অভিনয়ে তাহারা দাবী করে গান এবং হাসিতামাসা। যতই গুরু বিষয়বস্তু হউক শিক্ষাদান করিবার ইচ্ছা যতই প্রত্যক্ষ হউক গান এবং হাসিতামাসা ছাড়া নাটক তাহারা কল্পনাই করিতে পারে না। প্রাচীন যাত্রা এইভাবে একটা ট্রাডিশন সৃষ্টি করিয়াছিল। নাটকের কাহিনী যোগাইত রামায়ণ মহাভারত অথবা পুরাণ। নূতন নাটকের যখন আবির্ভাব হইল তখনও নাট্যকার অথবা অধিকারীরা ইহা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

ইংরেজ শাসন এদেশে কায়েম হয় পলাশী যুদ্ধের পরে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় ইংরেজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লালবাজারের কাছে একটি ইংরেজী রঙ্গালয়ে অভিনয় হইত। পরবর্ত্তী বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে Calcutta Theatre, Chowringhee Theatre প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। নিয়মিত নাটক অভিনয় তাহাতে হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে আরও কয়েকটি ইংরেজী রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব জানা যায়। বাঙ্গালীরা ইংরেজী অভিনয়ের সংস্পর্শে আসে এই সব রঙ্গালয়ের মারফতে। কাজেই এই সব রঙ্গালয়ে কি ধরণের অভিনয় হইত তাহা জানা প্রয়োজন। বাঙ্গালী অভিজাত এবং শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক দেশজ নাটক তখন পরিত্যক্ত। আজিকার মত তখন ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর এত ব্যাপক পরিচয় হয় নাই। কাজেই নূতন নাটকের মান (standard) সম্বন্ধে ধারণা জন্মিল এই সব রঙ্গালয়ের অভিনয় হইতে। এই সব ইংরেজী রঙ্গালয়ে সেক্সপীয়রের অভিনয় না হইত এমন নহে, কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী অভিনয় হইত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডি, যে সব গ্রন্থের নাম এখন ইংরেজী সাহিত্য হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সাহিত্য হিসাবে এই সব নাটকের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীরও নহে। তবু গঠনে এবং প্রকৃতিতে তাহা দেশজ যাত্রা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া একটি নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিল, একটি নূতন জীবনের সম্মান পাইল। বাঙ্গালী অর্থে অবশ্য কলিকাতা এবং তাহার আশেপাশের ধনী নব্য অভিজাত শ্রেণীর কথাই বলা হইতেছে। ইংরেজ জাতির জীবনযাত্রার সহিত পরিচয় তখনও তেমন হয় নাই, অথচ নূতনকে ভাল করিয়া জানিবার আগ্রহ অপরিসীম। ইংরেজী রঙ্গালয় হইতে এই আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে তৃপ্ত হইল। উপরোক্ত কমেডিগুলির আর যাহাই দোষগুণ থাকুক, ইংরেজের জীবনযাত্রার খানিকটা প্রতিচ্ছবি তাহাতে ছিল। এই বিশেষ কারণে নূতন ধরণের নাটক তখনকার দিনে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

রুশ বাদ্যকর হেরাসিম লেবেডেফ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একখানি হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এই রুশ লেবেডেফই

প্রথম নূতন ধরণের বাঙ্গলা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরিয়া লেবেডেফ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং ডুমতলাতে একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তিনি দুইখানি ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন। নাটকের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল যে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে বহু গান নাটকে জুড়িয়া দেওয়া হইবে। লেবেডেফের ব্যাকরণের ভূমিকায় বাংলা নাটক সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে। তিনি উক্ত ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে এদেশীয় দর্শকেরা গম্ভীর বিষয় অপেক্ষা হাসিতামাসা ব্যঙ্গই বেশী পছন্দ করে। তিনি নাটকের বই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন দেশের লোকের এই রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালায় (New Theatre) এই দুইটি অভিনয় ছাড়া অপর কোনও নাটক অভিনয় হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। লেবেডেফের রঙ্গশালা পরবর্ত্তী কালের বাংলা নাটকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার যদিও শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়, তথাপি পরবর্ত্তী যুগের বাংলা নাটকের সহিত হিন্দু থিয়েটারের যোগ সামান্য। হিন্দু থিয়েটারে শেক্সপীয়র অথবা অন্য ইংরেজী নাটক এবং দুই একটি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রকৃত বাংলা নাটকের অভিনয় হয় শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে। লেবেডেফের রঙ্গালয়ের তারিখ ১৭৯৫ এবং নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয়ের তারিখ ১৮৩৫—মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী জীবনের অনেকক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা অনুভব করিতে পারিয়াছে, বাঙ্গালী জাতি খানিকটা আত্মসচেতনও হইয়া পড়িয়াছে। তাই মাঝে মাঝে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইলে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে অভিনয়ের প্রাপ্য প্রশংসার সহিত বাংলা নাটকের দাবী করিয়া প্রায়ই মন্তব্য করা হইত। ইংরেজী নাটক নহে, বাংলা নাটকই পত্রিকার সম্পাদকেরা দাবী করিতেন—অনুকরণে আর তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা দেখিতে চাহেন শিল্পসৃষ্টি।

কতকটা এই কারণেই শ্যামবাজার নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হিন্দু পায়োনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিরূপ সমালোচনাও হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার কারণ মূলত পিউরিটানিক।

উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন বাংলা নাটকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ইংলণ্ডের রেনেসাঁস নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ অনেক দিক দিয়া তুলনীয়। বাংলা দেশে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত নাটক ছিল না, ছিল প্রাচীন যাত্রা। প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে অন্তত বিষয়বস্তুর দিক

হইতে তাহার সহিত ধর্ম্মের যোগ ছিল। ইংলণ্ডেও রেনেসাঁস নাট্যসাহিত্য বিকাশ লাভ করিবার পূর্ব্বে ছিল Miracle এবং Mystery Plays আর ছিল Comic Interlude. Dr Nard এর মতে মিরাক্‌ল্ এবং মিস্‌ট্রিই কালে পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া এলিজাবেথীয় ট্রাজেডিতে পরিণত হয় এবং ইন্টারলিউডের পরিবর্ত্তিত রূপ কমেডি। তখনকার দিনের শিক্ষিত ইংরেজরা দেশজ নাটকের নানা রকম ত্রুটির প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। Sidney, Ben Jonson প্রভৃতির উক্তি প্রায় সকলেরই জানা আছে। রাজ দরবারে পণ্ডিতদের রুচি অনুযায়ী ল্যাটিন আদর্শে রচিত নাটকের অভিনয় হইত। ভাষার কারুকার্য্য, সূক্ষ্মতা, ব্যাকরণসম্মত ঐক্য প্রভৃতি রক্ষা করিবার দিকে দরবারী নাট্যকারদের সচেতন দৃষ্টি ছিল। কিন্তু দরবারের বাহিরেও নাটক অব্যাহত, সেখানে ভীড় করিয়া জমা হইত সব শ্রেণীর দর্শক—রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দিনমজুর কেহই বাদ থাকিত না। কাজেই সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকারীদের সকল শ্রেণীর দর্শকের সর্ব্ববিধ রুচি পরিতৃপ্ত করিবার দিকে দৃষ্টি থাকিত। বিদূষকের বিচিত্রবর্ণের পোষাক দেখিয়াই উল্লসিত হইত, তাহাদের কথা আচরণে হাসিয়া প্রেক্ষাগৃহ মুখর করিয়া তুলিত এমন দর্শকের ভীড় হইত; তেমনি নাটকের অতিসূক্ষ্ম ভাষায় অনুভূতি প্রকাশের তারতম্যে আনন্দ লাভ করিবার মত দর্শকেরও অভাব ছিল না। সাধারণ দর্শককে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা মাত্র থাকিলেও সে নাটক প্রাণবন্ত হইতে পারে, তবে সাহিত্য হিসাবে তাহার আয়ু বেশী না হইবারই সম্ভাবনা। ইংরেজী সাহিত্যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাবান্ নাট্যকারের আবির্ভাবের ফলে এলিজাবেথের সময়ে ইংরেজী নাটক শুধু প্রাণবন্ত নহে, সাহিত্য হিসাবেও তাহা রসোত্তীর্ণ। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারেরা যে শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তিগত প্রতিভার দান সন্দেহ নাই। কিন্তু দর্শকশ্রেণীর প্রভাবও এলিজাবেথীয় নাটকে অসামান্য। এলিজাবেথীয় নাটক ইংলণ্ডের প্রকৃত 'জাতীয় নাটক', জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ তাহার অন্যতম কারণ। নূতন নাটকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা দেশে জনসাধারণের অতিপ্রিয় নাটকীয় অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশজ নাটককে প্রীতির চোখে দেখিতেন না। কারণ ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী নাটকের সহিত পরিচিত হইয়াছে, বাঙ্গালীরা ইংরেজী নাটকের সফল অভিনয় পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইল অনুকরণ, তাহাতে সৃষ্টি প্রেরণা তৃপ্ত হইতে পারে না। কাজেই বাংলা নাটকের প্রয়োজন। দেশের প্রচলিত নাটক অথবা নাটকীয় অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি দিয়া প্রথম যুগের নাট্যামোদীরা আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সৌসাদৃশ্যই যাহাতে বেশী, তাহা গ্রহণ করিবার প্রশ্নই ওঠে না। গঠনের দিক দিয়া দেশের নাটকের বহু ত্রুটি তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল। সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের

প্রাচীন যাত্রায় কোন ধরাবাধা কর্ম্মই ছিলনা। যাঁহারা নূতন নাটক অভিনয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন নাটকের প্রয়োজন অনুভব করিলেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক কোনখানি তাহা লইয়া কিছু বাদানুবাদ হইয়াছে। বাংলা ভাষায় বই ছাপিবার সুযোগ হয় ১৭৭৮ সাল হইতে, ছেনিকাটা বাংলা হরফে হুগলি সহরে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হইবার পর। এই তারিখের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত বাংলা নাটক ইহার পরেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের ছাপিবার সন দেখিয়া অথবা অন্য উপায়ে তারিখ নির্ণয় করিয়া তাহার কোনটিকে প্রথম নাটক বলিয়া আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নহে। শরৎচন্দ্র ঘোষাল খানকয়েক মুদ্রিত নাট্যকারের পুস্তক আবিষ্কার করেন। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত "প্রেম নাটক" এবং "রমণী নাটক" তাহার অন্যতম। এই পুস্তক দুইটির মুদ্রণ কাল ১৮২০ ও ১৮৪৮। ডকটর দীনেশ সেন 'প্রেম নাটক'কে প্রথম বাংলা নাটক আখ্যা দিয়াছেন। ইদানীং বহু সমালোচক এবং গবেষকদের মত উক্ত বই দুইখানি নাটক আখ্যা পাইবার উপযোগী নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই ধরণের অবৈধ প্রণয়ঘটিত বহু নাটক রচিত হইত। উক্ত দুইখানি নাটক ছাড়াও রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক' এবং দ্বারিকনাথ রায়ের 'বিল্বমঙ্গল'এর প্রকাশকাল ১৮৫০ এর পূর্ব্বে। কিন্তু আধুনিক নাটকের ইতিহাসে এই গ্রন্থগুলি নানা কারণে অপাংক্তেয়। এখন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'কেই প্রথম বাংলা নাটক বলিয়া ধরা হয়। নাটকখানির অভিনয় হইয়াছিল কি না জানা নাই। রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলিনকুল সর্ব্বস্ব" বাংলা নূতন নাটকের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অভিনয় কাল ১৮৫৭; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলেও নাটকের অভিনয় হইত এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। রাজেন্দ্রলাল মিশ্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' কোন এক সংখ্যায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্বে আরও চৌত্রিশ খানি বাংলা নাটক পড়িয়াছিলেন। 'ভদ্রার্জ্জুন' ও 'কীর্ত্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকা হইতেও জানা যায় যে বাংলা নাটক এই দুইখানি নাটকের পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই তিনখানি নাটকই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমতম নাটক বলিয়া জানা যায়।

নাটক রচনা করিতে গিয়া নাট্যকারেরা সংস্কৃত আদর্শ এবং তৎকালীন কলিকাতায় প্রদর্শিত ইংরেজী নাটকের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুশীয় অধিকারী লেবেডেফ এবং নবীবচন্দ্র বসু দেশীয় নাটকের রীতি বজায় রাখিয়া বহু গান এবং হাসি তামাসার অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দর্শক সমাজের রুচি যদি নাটক প্রযোজনায় সময় বিস্মৃত হওয়া যায়, তাহা হইলে নাটকের অন্যবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও সাফল্য নিশ্চিত নহে।

বেলগাছিয়া, পাইকপাড়া, জোড়াসাঁকোয় এবং শোভাবাজারে যে সব অভিনয় হইত কলিকাতার জনসাধারণের সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ট যোগ ছিল বলা যায় না। সেই জন্যেই এই সব ধনী ব্যক্তিদের গৃহে যে সব নাটকের অভিনয় হইয়াছে তাহাকে আধুনিক বাংলা নাটকের পরীক্ষার যুগ বলা যাইতে পারে মাত্র। সমসাময়িক পত্রিকাদিতে সমালোচনার প্রশ্রয়ে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ এবং পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যের বর্ণনায় আধুনিক নাটক বাঙ্গালীর কল্পনা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ধনীর প্রমোদ কানন অথবা বহির্ব্বাটি ত্যাগ করিয়া বাংলা নাটক জনসাধারণের আরও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

সাহিত্য হিসাবে নাটক গড়িয়া উঠিতে হইলে অন্তত প্রথম দিকে শিক্ষিত দর্শক শ্রেণীর মার্জ্জিত বিশ্লেষণ শক্তির সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে মধ্যযুগে নাটকের প্রকৃতি এবং বিষয় ছিল প্রায় একই। কিন্তু ফ্রান্সে আইন করিয়া সাধারণের সম্মুখে অভিনয় প্রদর্শন বন্ধ হওয়াতে নাটক শিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণীর গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ফরাসী রেনেসাঁস নাটকের পরিণতি Racine—যাঁহার নাটকে সর্ব্বপ্রকার স্থূলতা একেবারেই বর্জ্জিত। বাংলা নাটকের পরীক্ষার যুগেও বিদগ্ধরুচি দর্শকের পরিবেশে অভিনীত হইত, অতএব আধুনিক নাটকের যে সব ত্রুটি আমরা আজও দেখিতে পাই তাহা গোড়াতে বর্জ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নূতন নাটকের উদ্যোক্তাগণ বাংলা দেশের দর্শকের চাহিদার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। নাট্যকারেরা কেহ কেহ দর্শকদের দাবী মিটাইবার পক্ষে যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন, কেহ বা কোনও রকম যুক্তিতর্কের অবকাশ না রাখিয়াই দর্শকদের তৃপ্ত করিবার উপযোগী নাটক রচনা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এ মনোভাব লইয়া সাহিত্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করা কঠিন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আধুনিক বাংলা নাটকের সূত্রপাত। প্রথমযুগে সমস্যা ছিল অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের অভাব। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে 'ভদ্রার্জ্জুন' প্রথম মৌলিক রচনা এবং 'কীর্ত্তিবিলাস' প্রথম মৌলিক ট্রাজেডি। কিন্তু যে নাটক অভিনয় হইতে বাংলা আধুনিক নাটকের জন্ম ধরা হয় তাহা হইতেছে নাটুকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'। দুইতিন বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হইল, কিন্তু মৌলিক নাটক সেই অনুপাতে তত বেশী রচিত হইল না। নাটকের এই অবস্থা দেখিয়া মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ

কোথায় বাল্মিকী, ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদনের এই উক্তি শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশকালে বাংলা নাটকের অবস্থা সম্বন্ধে যেমন আভাস পাই, তেমনি বিদগ্ধ লেখকদের নাট্যাদর্শ সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে। যাঁহারা মধুসূদনের মত গ্রীক অথবা ল্যাটিন জানিতেন না, অথচ সংস্কৃত জানিতেন তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ আবার নান্দী এবং সূত্রধার কর্ত্তৃক ভূমিকা সম্বলিত নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল না হওয়াই সম্ভব, কারণ সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার বাংলায় ঠিক মানায় না। এই কথাটি বুঝিতে আমাদের বহুদিন সময় লাগিয়াছিল বলিয়া বাংলা গদ্যও বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খোঁড়াইয়া চলিয়াছে। যে সমস্ত সংস্কৃত অনুবাদ অভিনয় হইয়াছে তাহার মধ্যে 'শকুন্তলা', 'রত্নাবলী', 'মালতিমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি নাটকের একাধিক অভিনয় হইয়াছিল। সংস্কৃত অনুবাদের অভিনয় নিতান্তই পরীক্ষামূলক বলিয়া ধরা উচিত। এই অর্থে পরীক্ষা যে নূতনভাবে বাংলা নাটকের পত্তন করিতে সংস্কৃত নাটক সক্ষম কি না। এই পরীক্ষা সর্ব্বতোভাবে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ সামান্য কিছুদিনের মধ্যে অনুদিত নাটকের অভিনয় পরিত্যক্ত হয়।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এক দিক দিয়া আমাদের প্রাচীন যাত্রার ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছে। প্রাচীন যাত্রার বিষয় পুরাণ রামায়ণ মহাভারত হইতে গৃহীত হইত। সংস্কৃত নাটকের বিষয়ও একই। কাজেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে বিষয়ের দিক হইতে অবিছিন্ন ধারা রক্ষিত হইয়াছে। এই অভিনয় একাধারে যেমন উন্নতরুচি দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারিয়াছে, তেমনি সাধারণ দর্শক উহাতে পরিচিত স্বাদ পাইয়া আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। সংস্কৃত অনুবাদ পরীক্ষামূলক বলিয়া ধরা হইলে, বলিতে হইবে বাংলা দেশের নূতন নাটকের ভিত্তি স্থাপনে তাহা আংশিক মাত্র সফল। সংস্কৃত অনুবাদে "অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ" আসিয়া রঙ্গমঞ্চে ভণ্ডামি করিবার সুযোগ পাইত না, অন্যান্য excrescenceও বর্জ্জিত হইত। এই হিসাবে নাটকের গঠনে একটি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষে সহায় হইয়াছিল নিশ্চয়ই।

কিন্তু নূতন নাটক প্রবর্তনে শুধুই কি গঠনের আদর্শের সমস্যাই প্রবল ছিল? আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইয়া আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে তখনকার নাট্যকারেরা অপর কোনও সমস্যার কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। নাটক বিশেষভাবে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল। প্রযোজনা, অভিনয় এবং উপভোগ—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চাই সমষ্টির সহযোগিতা। বহুর একত্রিত প্রয়াস যেখানে অনিবার্য্য প্রয়োজন, সেখানে বহুর জীবনযাত্রার সহিত নাট্যাভিনয়ের যোগ স্থাপিত হইলেই নাটক সহজ এবং জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। অভিনয় কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাস্তবের অনুকরণ। অর্থাৎ জাতি যেভাবে জীবন যাপন করে, যাহা জীবনে আকাঙ্ক্ষনীয় অথবা আচরণীয় মনে করে, অভিনয়ে তাহাই অনুসৃত হওয়া উচিত।

সংস্কৃত নাটকে যে জীবনাদর্শ তাহা কি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত? পরিগণিত হইত না বলিয়াই সংস্কৃত অনুবাদ নাটক বেশীদিন চলে নাই।

মুসলমান আমল হইতেই বাংলা দেশে একটী শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রধান যদিও মুসলমানেরাই ছিল, ব্যবসাবাণিজ্য এবং শাসনকার্য্যে হিন্দু মধ্যবিত্ত নগণ্য ছিল না, মুসলমান শাসনপদ্ধতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততন্ত্রে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব অনিবার্য্য। ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিবার পর শাসক ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে সমাজের নেতৃত্ব চলিয়া যায়। তখনকার দিনে হিন্দু মধ্যবিত্তেরা আগ্রহে ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল, মুসলমানেরা প্রথম পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারে নাই বলিয়া কতকটা সন্দেহে এবং কতকটা অভিমানে পিছাইয়া ছিল। তাই ইংরেজ শাসনের মারফতে যে নূতন সভ্যতার আভাস দেখা দিয়াছিল তাহা হিন্দু মধ্যবিত্তদেরই বেশী আলোড়িত করিয়াছিল। মুসলমান আমলে হিন্দু সংস্কৃতির ধারা ম্লান হইয়া আসিয়াছিল, বহু আচার অনুষ্ঠান অন্তর্নিহিত অর্থ হারাইয়া কেবলমাত্র প্রাণহীন বহুব্যবহার কোন মতে টিঁকিয়া ছিল। মুসলমান আমলেই এইসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়াছিল, ইংরেজ শাসনের পরিবর্ত্তিত আবহাওয়ায় তাহা অচল হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের সংস্কার মজ্জাগত, সহজে তাহা দূর হইতে চায় না। যাহা কিছু পুরাতন সব তুচ্ছ করিয়া হিন্দু মধ্যবিত্তের একাংশ পশ্চিমের সভ্যতা গ্রহণ করিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছিল, তেমন অপর এক অংশ পাশ্চাত্যের সব কিছুতে ম্লেচ্ছের বিধর্ম্মী আচরণ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই তখনকার দিনে দেশে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল। এই দ্বন্দ্ব অত্যন্ত গভীর, জাতির মর্ম্মে তাহা স্পর্শ করিয়াছিল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে ইংরেজ অধিকারের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ সহসা প্রাচ্য হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ইয়োরোপে নীত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কোন সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করে নাই, যদিও রামমোহন রায়ের নূতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তখন যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। বাংলাদেশের মানসে তখন একটি নৈরাজ্যের যুগ। রোনাল্‌ড্‌সে তাঁহার The heart of Aryabarta পুস্তকে নূতন ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশের নবীন যুবকদের মানসিক বিপর্য্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দেশের নবশিক্ষিত যুবকেরা প্রাচীন সামাজিক ভিত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহার স্থানে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে তখন পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। মনের দিক হইতে এই দ্বন্দ্ব সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু সাহিত্যেও নূতন আদর্শ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে, আকৃষ্ট করিয়াছে, তাই নূতন আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাই তখন প্রবল—জাতির এই মানসিক দ্বন্দ্ব ফটাইয়া তুলিবার কথা কেহ চিন্তা করেন নাই।

একমাত্র বাংলা নাটকে এই দ্বন্দ্বের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সমাজের নানারূপ বিকার কয়েকখানি গদ্য রচনাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', 'কলিবাজার মাহাত্ম্য', 'কলিকুতুহল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা। বাংলা গদ্যের এই দুইচারিখানি পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিলে, মোটের উপর গদ্য সাহিত্যে তখনকার দিনের মানসিক ও নৈতিক নৈরাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু মৌলিক বাংলা নাটক আত্মপ্রকাশ করে দুইটি বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগত আদর্শের দ্বন্দ্ব লইয়া। ১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' রামজয় বসাকের গৃহে অভিনয় হয়। কৌলিন্যপ্রথার কুফল অবলম্বনে ইহা রচিত। কোন একদিন কৌলীন্যপ্রথা সমাজের হয়ত উপকার করিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবধানে কৌলীন্যপ্রথার সামাজিক গুণ অন্তর্হিত হইয়া অর্থহীন কতগুলি কুসংস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল। পূর্ব্বেও হয়ত লোকে কৌলীন্যের অর্থহীন কঠোরতা অনুভব করিয়াছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে তাহার বিরোধিতা করে নাই। নূতন চিন্তাধারা লোকের মনে বিদ্রোহ করিবার শক্তি দিয়াছিল বলিয়াই ঐ ধরণের একটি নাটক রচনা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইতে পারিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'নাটুকে' রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' অনেক দিক দিয়াই বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে। প্রথমত ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর জীবনের কোনও সমস্যা লইয়া কোনও মৌলিক নাটক বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। তাই নূতন বাংলা নাটকের জন্মকাল ধরা হয় ১৮৫৭ সাল হইতে। তখনকার নাট্যামোদীদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটক পাওয়া। তখনকার দিনের এই চাহিদা মিটাইতে নাট্যকারদিগকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নাটকের গঠন, বিষয় এবং ভাষা কোনটিই তখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই। রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' অন্তত একটি সমস্যা মিটাইতে সাহায্য করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে, এমন কি বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও, এইরূপ সমসাময়িক সামাজিক কুপ্রথা অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। অমৃতলাল বসুর ব্যঙ্গ নাটকগুলির কুলজী অনুসন্ধান করিলে রামনারায়ণে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। রামনারায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হইবার পর সকলেরই দৃষ্টি পড়িল বাস্তব জীবনের প্রতি। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অথবা ভাবালম্বনে রচিত নাটকের অভিনয় অবশ্য বন্ধ হইল না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা অর্জ্জন করিল এই ধরণের নাটক যাহার বিষয়বস্তুর সহিত দর্শকদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এই আদর্শে কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি নাটক রচিত এবং অভিনীত হইয়া গেল। তাহার মধ্যে রামনারায়ণের দুই তিনখানি প্রহসন ছাড়া 'সম্বন্ধ সমাধি', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' 'সপত্নী' 'বুঝলে কিনা' এবং 'কিছু কিছু বুঝি' যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি পরে আলোচিত হইবে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল না। উপরোক্ত নাটকগুলি ছাড়া আরও বহু অক্ষম নাটক রচিত হইয়াছিল যাহাতে সমাজসংস্কারের চেষ্টা অত্যন্ত স্পস্ট। সাহিত্য হিসাবে ঐসব নাটকের মূল্য নিতান্ত নগণ্য, অধিকাংশই বিস্মৃত। কিন্তু একটি দিক হইতে নগণ্য হইয়াও ঐ নাটকগুলিকে তুচ্ছ বলা যায় না এই কারণে যে নাট্যকারেরা প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে আন্তরিক প্রেরণা অপেক্ষা তখনকার দিনের ফ্যাশনই অনেক লেখককে সমাজসংস্কারঘটিত বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। ফলে অধিকাংশ নাটকই গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'রহস্য সন্দর্ভে'-র ব্যঙ্গোক্তি স্মরণীয়। 'দুর্ভিক্ষ দমন' নামক নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে আছে: "...এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলাবৃষ্টিতে প্রায় সেইরূপ আপদ্ উপস্থিত; প্রায় অলিতে গলিতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম্ম লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গবঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা প্রচার করিতেছেন; এমত লোকও বর্ত্তমান যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পরে জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতিরও নাটক অসম্ভব হইবে না।" দুর্ভিক্ষ নাটকের বিষয় হইতে কোনও বাধা নাই, তাহা আজ অনেকেই স্বীকার করিবেন। বিষয় গৌণ না হইলেও, একমাত্র বিষয়ই নাট্যসাহিত্যের দোষগুণ বিচার্য্যের মান নহে। যাহাই হউক, তখনকার দিনে অনুরূপ বিষয় অবলম্বনে নাটক যে রচিত হইত তাহার পিছনে সত্যকার জীবনদর্শনজনিত সৃষ্টি-প্রেরণার তাগিদ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অন্যথায় অন্তত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। অতীতে যেমন একই বিষয় লইয়া বিভিন্ন কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, তেমনি একজাতীয় উপাদান অনুকরণে নাটক রচিত হইতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে তখনকার দিনের নাটকের আরও একটি গুণ বর্ণনা না করিলে তাহার সুবিচার করা হয় না। যে দেশের সাহিত্যে ব্যঙ্গ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানকার সাহিত্যিকদের বাস্তব এবং সামাজিক চেতনা জাগরূক। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে এইরূপ মানস সম্পদ একান্ত প্রয়োজন। বাংলা নাটকের প্রথম যুগে নাট্যকারেরা উপযুক্ত মন লইয়াই নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাই তখনকার দিনের নাটকে প্রহসন এবং ব্যঙ্গের এত প্রাধান্য। কিন্তু গোড়াতে একটি বিপদ থাকিয়া যাওয়ায় বাহ্য এবং মানস পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা

মহাকাব্যাদি সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া দিয়া প্রত্যেকটি বিভাগের একটি কাঠামো স্থির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সাহিত্য বিকাশের প্রথম যুগে এই রূপ ধরাবাঁধা ফর্ম নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথায় বহুধা আচরণের বিশৃঙ্খলায় সাহিত্য বিকাশ লাভ করিতে পারেনা। অবশ্য যে দেশের সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে সেখানে ফর্মের বাঁধন আলগা হইলে ক্ষতি নাই। সেক্সপীয়রের সনেট পেট্রার্কের নিয়ম মানিয়া চলে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কোন অংশে হীন নহে। কিন্তু প্রাথমিক যুগে নিয়মের কাঠিন্য নিতান্ত প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা কাব্য হইতেও ইহার সমর্থন মিলিবে। কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াই যে কবি গদ্য কাব্য (verse libre) লিখিতে সুরু করেন তাঁহার পক্ষে গদ্য অথবা কাব্য কোনটিই রচনা করা সম্ভব নহে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত সমসাময়িক মাসিক পত্রিকা হইতে দেওয়া যাইবে। যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নূতন বাংলা নাটক রচনার প্রথম যুগে নাটকের কোন নির্দ্দিষ্ট ফর্ম না থাকাতে তখনকার দিনের নাটক রচয়িতাদের সম্মুখে কোনও ফর্মের আদর্শ না থাকাতে গঠনে বহু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সে ত্রুটি আজও সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে বলা যায় না। সংস্কৃত অলঙ্কারের নির্দ্দেশ অবশ্য ছিল, ইংরেজী নাটকের ঐক্য ইত্যাদির নিয়ম অবশ্য কেহ কেহ জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষায় নাটক রচনা করিবার সময় অনেকেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা এবং সমাপ্তির নিয়মই শুধু কিছু কিছু পালিত হইয়াছে অন্য কোনও নিয়ম পালিত হয় নাই। ইংরেজীর মারফতে গ্রীক নাটকের নিয়মের সহিত কোন কোন নাট্যকার পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু তাহা পালন করিবার কথা কেহ চিন্তা করেন নাই। ফলে সংহত প্লট গঠন করিতে অনেকেই পারেন নাই। এই কারণেই মধুসূদন তাঁহার প্রহসন সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন: "As a scribbler, I am of course proud to think that you like my farces ; but to tell you the truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre ; I mean, we have not as yet got a body of sound classical dramas to regulate the national taste, and therefore, we ought not to have farces."

উপরোক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সত্য। একের পর একটি প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য তেমন সফল হইল না। সমাজের যে ব্যাধির প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হইল তাহা দূর করিবার সত্যকার কোন প্রেরণা দেশে দেখা দিল না। তখন লোকে নাটক দেখিতে যাইত 'মজা' পাইতে, নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ লাভ করিতে এখনও নাট্যালয়ে দর্শকের ভীড় হয় একই কারণে। নাটকের বিষয় লইয়া কোন শীরঃপীড়া ঘটিবার

অবকাশ পাইত না। ফলে 'কিছু কিছু বুঝি'র মত নাটকে ব্যক্তিগত আক্রমণও চলিত। সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াসে রচিত নাটকের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই, সাহিত্য হিসাবেও সবগুলিকে সার্থক বলা যায় না। প্রহসনে সংহত প্লট গঠন করিবার প্রয়াস না থাকাতে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকের চরিত্রও বহুক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। প্লট এবং চরিত্রসৃষ্টিই নাটকের সাহিত্য বিচারের মান।

নাট্যসাহিত্য বিকাশের পথে ভাষা একটি সমস্যা। নাটকে কোন ভাষা ব্যবহার করা হইবে, কবিতা অথবা গদ্য নাটকের উপযুক্ত বাহন প্রথমে তাহাও স্থির করা কর্ত্তব্য। প্রথম যুগে নাট্যকারেরা গদ্যকেই নাটকের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ধরা হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে। আজ একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে প্রথম যুগের গদ্য রচয়িতারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বাংলা গদ্য বিকাশের পক্ষে খুব অনুকূল ছিলনা। সাহিত্যের ভাষা কথ্য ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইলেও, বাংলা গদ্য এবং চলিত ভাষার মধ্যে যতটা ব্যবধান তাহা থাকা উচিত নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কথ্য এবং সাহিত্যের ভাষার ব্যবধান আরও অধিক ছিল। কাব্যে তখনও পয়ার ত্রিপদীর যুগ চলিতেছে। পয়ারের তালে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব, ত্রিপদীর ত কথাই নাই। এই কারণে তখনকার দিনে নাট্যকারেরা গদ্যই নাটকের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। নাটকের ভাষা গদ্য হইলে তাহাতে যতদূর সম্ভব কথ্যরীতি অনুসরণ করা বিধেয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি মিশ্র ভাষার অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও যেন দ্বিধা এবং সঙ্কোচ। তবে যেখানে কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার শক্তি সত্যই প্রশংসনীয়।

নূতন বাংলা নাটকের প্রথম যুগে গতি যে দিকে ছিল তাহার সামান্য কিছু ইঙ্গিত উপরে দেওয়া গেল। সামান্য হইলেও পরবর্ত্তী কালের নাটকের উপরে কোন কোন প্রভাব কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা বুঝিতে সাহায্য হইবে। প্রথম যুগে যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম বাংলা নাটকের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাহাদের কথাও এখানে স্মরণীয়। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা বাংলা নাটক গড়িয়া তুলিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। একথা বলিলে অন্যায় হয় না যে তাঁহাদের নিরলস চেষ্টাতেই নূতন বাংলা নাটক সম্ভব হইয়াছিল।

অভিনয়ের সঙ্গীত

মণিলাল সেনশর্ম্মা

আঠার শতকের শেষদিকে বাঙ্গালী যে হাসিতামাশা ও অনুকরণ করার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়—হেরাসিম্ লেবেডেফ্ নামে এক রুশদেশবাসীর লেখা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের ভূমিকায়। তিনি প্রথম বাংলা নাট্যশালা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাহায্যেই ২৫নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীট) অভিনয় হয়েছিল। লেবেডেফ্ লিখেছেন তিনি Disquise আর Love is the best Doctor নামে তাঁর দুটি ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করেন এইজন্য যে তিনি তখন লক্ষ্য করেছিলেন এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা যত বিশুদ্ধভাবেই ব্যক্ত হোক না কেন তার চেয়ে অনুকরণ ও হাসিতামাশা বেশী পছন্দ করে। আর সেইজন্যই তিনি চৌকিদার চোর উকিল গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুটি নাটকই অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচন করেছিলেন।

এই থিয়েটার অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু স্থাপয়িতার সেই উক্তি হতে আমরা তখনকার বাংলা সম্বন্ধে একটি কথা জান্‌তে পারি যে, সে সময়ে বাংলায় অনুকরণ ও হাসিতামাশা খুব বেশী চলছিল। তার ফলে গত শতকে যখন প্রথমে বাংলা নাটক লেখা আরম্ভ হয় সে বইগুলির মধ্যে অনেকগুলি 'প্রহসন' লেখা 'হয়েছিল। আর প্রায় সবগুলি নাটকে হাস্যরস আনবার জন্য সেরূপ দৃশ্যের সমাবেশ ও চরিত্র যোজনা করা হয়েছিল। বর্ত্তমান শতকে প্রহসন লেখা হয়নি বললেও চলে।

বহুরূপী বর্ত্তমানে দেখা যায় না। কিন্তু গত শতকে 'বহুরূপীর' খুবই প্রচলন ছিল। পোষাক কথাবার্ত্তা তাছাড়া চলতি বিষয়, নিয়ম, আচার, প্রভৃতি নিয়ে বহুরূপী তার নানাবিধ রূপ হাসিতামাশার মধ্য দিয়ে দেখাতো। যাতে হাসি পায় সেরূপ সুরেই বহুরূপী গান করতো, অনেক সময় অবশ্য নিচুস্তরের গান হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগুলি আর এখন নেই বললেও হয়।

এই অনুকরণ হাসিতামাশার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল আঠার শতকের মাঝামাঝি হতে। সে সময়ে কবিগানের খুব চলন। কবিগানে পাল্‌টা উত্তরগুলি খুব হাস্যকর হতো, অনেক সময় অত্যন্ত অশ্লীল ইঙ্গিতও থাকতো; আর জনসাধারণ সেগুলি খুব উপভোগ

করতো। কবি গানের উত্তর ও প্রত্যুত্তরে আদি রসের আধিক্য যাকে 'খেউড়' বলে—সেই খেউড় আঠার শতকের মধ্যভাগে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে খুব প্রচলিত হয়েছিল। কবিগানের এক একটি বিষয়বস্তু নিয়ে পালা আকারে সাজিয়ে গীত করার রীতি। সাধারণতঃ রামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয় নিয়েই পালা তৈরী হয়। কবিগানের প্রাণ উত্তর ও প্রত্যুত্তর। আর এই উত্তর ও প্রত্যুত্তর উপস্থিত মত রচনা করে চলে সাধারণ কবি। কিন্তু উত্তর ও প্রত্যুত্তরের মাঝখানে থাকে সুর ও গানবাজনা—অনেকটা ধূয়ার মত। কিন্তু বর্ত্তমানে কবিগানও অপ্রচলিত।

পাঁচালী কথাটি সংস্কৃত পঞ্চালিকা শব্দ হতে উদ্ভূত। অর্থ—পুত্তলিকা, খেলার বা নাচের পুতুল। বাংলার প্রাচীন কাব্য মাত্রই পাঁচালী। পাঁচালীর মূল গায়ক এক হাতে মন্দিরা আর পায়ে নূপুর পরে গান করতো। সাধারণতঃ দুজন থাকতো ধূয়ার (দোহা) কাজ করার জন্য; সঙ্গে তালযন্ত্র বাজানো হতো। খুব পুরাণো কালে এই কাব্যগীতির সঙ্গে পুতুল সাজিয়ে নাচানোও হতো মনে হওয়া স্বাভাবিক। আঠার শতকে পাঁচালী গান বলে এক নতুন পদ্ধতির প্রচলন হয়। এই পাঁচালী গানে দুটি ভূমিকা ছিল;— নারদ মুনি, আর—বাসুদেব। অনেক পূর্ব্বে রামায়ণের কথা সুর করে পড়বার যে রীতি ছিল পাঁচালী পড়ার রীতি বর্ত্তমানেও প্রায় অনেকটা সেরূপই বলা চলে। তবে এখনকার পাঁচালী গানে কীর্ত্তনের বাউলের ও অন্যান্য পদ্ধতির সুরও প্রবেশ করেছে।

গত শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় নাটক আরম্ভ হয়, তার আগে নাটক ছিলনা। কিন্তু যাত্রার অভিনয় ছিল। যাত্রার প্রথম উল্লেখ এবং বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। পয়ার ও ষোল শতকে রামায়ণ নাটের বর্ণনা আছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে এক নাটুয়া দশরথের ভূমিকা অভিনয় করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ নিয়ে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন। আগের দিনে রামলীলা কৃষ্ণলীলা যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল। সে যাত্রার রূপ কেমন ছিল সে কেবল অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। যাত্রাকে বর্ত্তমানকালে অভিনয় বলা হলেও আগে যাত্রা-গান বলা হতো। আর সে যাত্রা গানের মাধ্যমেই পরিবেশন করা হতো। কথা ও অভিব্যক্তি খুব কমই ছিল। সেসব গানের সুর কিরূপ ছিল তারও নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া সম্ভব হয়নি। যাত্রা অবশ্য গত শতকের মাঝামাঝি হতে নাটকীয় ধারায় পরিবর্ত্তিত রূপে পরিবেশিত হয়েছে। সেই হতে সে সময়ে যেরূপ সঙ্গীত প্রচলিত ছিল সেসব সুরের কাঠামো ক্রমে যাত্রায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যাত্রাগানের পালা যখন বেশ বড় ছিল তখন ছোট আকারে সাজিয়ে সখের যাত্রার পালা কয়েক ঘণ্টায় শেষ করে দেওয়ার প্রথা তখনও আরম্ভ হয়নি। সে সময়ে যাত্রাগান ছিল মার্গসঙ্গীতের ধারা অনুযায়ী সঙ্গীত প্রধান। ক্রমে

পালা যেমন ছোট হতে থাকে, গানের আকার ছোট হতে থাকে, যন্ত্র সঙ্গীতের আবেদন এবং নাচগান ও তেমনি কমতে থাকে।

সমাচার চন্দ্রিকায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য আছে, "পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়।" এই মন্তব্য হতে অনুমান করা সম্ভব যে সে সময়ে অভিনয় ছিল না বললেও চলে। এমনকি সখের যাত্রাও খুব কমই হতো। কাজেই অভিনয় সঙ্গীতের কোন পরিপুষ্ট রূপ ছিল না মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ সময়ে অভিনয়ও যা ছিল বা অভিনয় অনুযায়ী চিত্তবিনোদনের যে সব ব্যবস্থা ছিল—সেগুলি ছিল বহুরূপীর নানাবিধ হাসিতামাশা ও ভাঁড়ামী; কবিগানের খেউরের নিচুস্তরের ইঙ্গিত, আর যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে সং ও ভাঁড়ামী সাধারণের নিকট পরিবেশিত হচ্ছিল। কীর্ত্তনের প্রসারও কমতে আরম্ভ হয় আঠার শতকের মাঝামাঝি হতে। আর ঐ সময়ে কীর্ত্তনের দিকে সাধারণের দৃষ্টি কমই ছিল মানে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এই সময়ে বাংলাদেশ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করে, ইংরেজ নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতি বিশেষ করে ঝুঁকে পড়ে। সে সময়ে স্কুল কলেজে ইংরেজী নাটকের এক একটি দৃশ্য অভিনয় করার চলন হতে থাকে। বাঙ্গালী অভিনেতা ইংরেজী রঙ্গশালায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছে তার প্রমাণ অনেক আছে। সে সময়ে ইউরোপীয় বাদ্যের যে নিকৃষ্টতম ব্যবস্থা এখানে ছিল তারই হুবহু অনুকরণ বাংলায় চলতে থাকে। অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সময় অথবা অভিনয়ের অঙ্ক শেষে যে সঙ্গীত সে যুগে বাংলায় পরিবেশিত হয়েছিল সেগুলি তখনকার ইউরোপীয় সঙ্গীতের নিকৃষ্টতম সঙ্গীত। অথবা সেগুলির নিকৃষ্ট পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনকার সমৃদ্ধশালী বাঙ্গালীগণ ইংরেজের অনুকরণ করাই আভিজাত্যের মান মনে করতো আর তার ফলে গত শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কলিকাতার ইউরোপীয় রঙ্গালয়গুলির অনুকরণে সঙ্গীত পরিবেশন করাও গৌরবের বিষয় বলে সসম্মানে সেগুলি হুবহু গ্রহণ করা হয়েছিল। তার ফলে নাচবহুল নাটক তৈরী করার এবং এক একটি দৃশ্যের পর নৃত্যগীত লাগিয়ে দেওয়ার প্রচলন বাংলা নাটকে আসে। সেই সময়ে বাংলার সঙ্গীতে ইউরোপীয় যন্ত্রগুলির প্রচলন আরম্ভ হয়। ব্যাগপাইপ, কর্ণেট, ক্লেরিওনেট ইত্যাদি যন্ত্র নিয়ে কনসার্ট বাজাবার রীতি প্রচলিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হতে বাংলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে নাট্যাভিনয় চলছে। কিন্তু তার আগে কলিকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তির উৎসাহে পর পর কয়েকটি নাট্যশালা প্রস্তুত হয়েছিল। সেগুলি স্থায়ী হয়নি। আর সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। তখনকার প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যক্তিগত খেয়াল বলা চলে।

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বাংলা নাটকের অভাব ছিল; সেজন্য তখনকার নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হতো। আর সেগুলির পক্ষে রস জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ছিলনা। কলিকাতায় তখন উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় অর্কেষ্ট্রা থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে সময়ে বাংলার নাট্যশালায় তখনকার প্রচলিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের নিকৃষ্টতম অর্কেষ্ট্রাই ভাড়া করে আনা হতো। আর ঐ সময় পর্য্যন্ত সেজন্য অভিনয় সঙ্গীতের কোন নিজস্ব রূপ জমাট বেধে ওঠেনি।

বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজার উৎসাহে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে নাট্যশালা তৈরী হয় সেখানেই প্রথম দেশীয় ঐক্যতানবাদনের প্রবর্ত্তন করা হয়। এই ঐক্যতানবাদনের দল গঠন করে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল। সেই ঐক্যতানবাদন ইউরোপীয় জাতির নমুনায়ই তৈরী হয়েছিল তবে তাতে দেশীয় সুর গ্রহণ করা হয়েছিল মনে করা স্বাভাবিক কেন না ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ পণ্ডিত। তিনিই প্রথম বাংলার ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের বই—'সঙ্গীতসার' লেখেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সে বই ছাপা হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ঐক্যতানবাদনের কাঠামো কিরূপ ছিল জানা যায় না। কেবল প্রশংসাই করা আছে তখনকার পত্রিকায়। 'নব-নাটকে'র অভিনয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে হয়েছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "আমি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় সাজিলেন নট·········ছয় মাস কাল যাবৎ রিহার্শাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্র সহকারে কন্‌সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্‌সার্ট হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতাম।"—বাংলার সঙ্গীতে হার্ম্মোনিয়ম সে সময়ে প্রবেশ করেছে দেখতে পাই। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐক্যতানের নমুনা কিরূপ ছিল তারও কোন সঠিক রূপ নেই।

'আঠারশত সাতান্ন'র পর নাটকের নবজীবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের দিকে তখনকার অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল দেখতে পাই। সেই সময় হতে পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দুসঙ্গীতের দিকে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন "শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় মৎপ্রণীত সেই পুস্তক দৃষ্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে সাধারণের নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়া অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম প্রাচুর্য্য স্বীকার করত নানা সংস্কৃত ইংরাজী ও পারস্য প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তত্তৎ গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহ পূর্ব্বক আমার ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রভূত রূপে পল্লবিত করিয়াছেন।" সৌরীন্দ্র মোহন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে তিনি

অনেকগুলি বই লেখেন। আর ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি দেয়।

কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরালোচনা আরম্ভ করে কলিকাতার তখনকার সঙ্গীতজ্ঞ সমৃদ্ধশালীগণ উত্তর ভারতে মধ্য যুগে আকবরের সময়ে ও তারপরে যেসব গীতপদ্ধতির প্রসার হয়েছিল আর মুগল রাজত্বের শেষ দিকে বাংলায় গীত হয়েছিল সেগুলির দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। আঠার শতকের প্রথমে বাংলার মাটিতে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের যে চর্চ্চা ক্ষীণভাবে আরম্ভ হয়েছিল তারই প্রচলন তখন কলিকাতায় বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। সে সময়ে খেয়াল ও টপ্পা এমন কি ঠুংরীও কলিকাতার রাজা, জমিদার ও সমৃদ্ধদের বাড়ীতে জলসায় গান করা আরম্ভ হয়েছে। আরও বিশেষ করে আলোচনা ও শিক্ষা করা সুরু হয়। কিন্তু সেসব সুর হিন্দী ও ব্রজবুলিতে বাঁধা থাকায় অসুবিধা হওয়াতে পরে সে-সব গানের হুবহু সুরে বাংলা কথা বলিয়ে সেগুলিকে বাংলা গানে রূপান্তরিত করা হতে লাগলো। কিন্তু ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইবার রীতি এমন যে সেগুলিকে তখনকার নাটকে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি বলেই মনে হয়।

অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে ঐক্যতান, অঙ্ক শেষে ও অঙ্ক আরম্ভের মাঝখানে ঐক্যতান, সন্ন্যাসীর বা ভিখারীর গান, দু'একখানি নায়িকার বা সখীর গান, তা ছাড়া নটনটীর যে নটীদের নাচ ও সঙ্গে গান তাই ছিল নাটকের সঙ্গীত ব্যবহারের পরিচয়। ঐক্যতান কি নমুনার ছিল অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুএকটির ধ্রুপদ পদ্ধতির সুরে বাংলা গান ব্যবহৃত হতো। খেয়াল যে রীতিতে গাওয়া হয় নাটকে তা ব্যবহার সম্ভব নয়। সহজিয়াদের গান মালসী গান—যে গুলি বাংলায় সে সময় প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে টপ্পা সহজে মিশে বলে সে সময়ে দেওয়ানজীর গানগুলি, কমলাকান্তের মালসীগুলি টপ্পার নমুনায় তৈরী হয়। তা ছাড়া নিধুবাবুর টপ্পা বাংলায় সহজে স্থান করে নিয়েছিল। সে গুলির সুরই তখনকার বাংলা নাটকে বেশী করে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও নাটকের গানে কীর্ত্তন ও প্রাচীন খেমটা প্রবেশ করেনি দেখতে পাই। অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন, "খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে কীর্ত্তন প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।" আর একস্থানে লিখেছেন, "ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া এইরূপ একটা গান করিয়া সেদিনের আসররক্ষা, রসরক্ষা, মানরক্ষা করিলাম"।--কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দেখতে পাই খেমটার নিকৃষ্টতম আবেদন থিয়েটারী সুরে মালসী ও নানাবিধ রাগরাগিণীর রেশ মিলিয়ে খেমটা ছন্দে নটনটীর নাচের সঙ্গে

চলছে। আর সে পদ্ধতিকে একটু উপরের স্তরে উন্নত করবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতী waltz ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। এতগুলোর সঙ্গে কতকটা মিল আছে বলে সেটি আমাদের ছন্দের সঙ্গে মিশে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ইংলণ্ডে ছিলেন সে সময়ে সেখানে ভিয়েনার waltz বিশেষ করে ষ্ট্রাউসের (strauss) সুরের খুব প্রসার চলছিল। কাজেই waltzএর প্রতি সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরাগ খুবই স্বাভাবিক।

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ টপ্পা, মালসী শ্যামাবিষয়ক গানের সুরে এবং ঢপ খেয়াল সুরের অবলম্বনে নাটকের গান বেঁধেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু খেয়ালকে এক বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এই সম্বন্ধে 'বাংলা গানের ক্রম' প্রবন্ধে একবার বিস্তারিত লেখা হয়েছে। তিনি বাংলার নাটকে এক বিশেষ কাঠামোর জাতীয় সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীগণ নাটকের গানের দিকে ততটা দৃষ্টি দিতে পারেন নি। সমসাময়িক গীতবহুল নাটকের গানবাজনাগুলি উত্তর ভারতীয় সুর বিশেষ করে বাঈজি নাচের সুরে বাধা হয়েছে দেখতে পাই। দ্বিজেন্দ্রলাল তার পরিবর্ত্তে এক বলিষ্ঠ সুরপদ্ধতির গান রচনা করে সেটিও অভিনয়ে ব্যবহার করছিলেন।

নাট্যকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই সে সময়ে বিদেশী নাট্যালয়ে কিভাবে সঙ্গীতকে নাটকে কাজে লাগানো হয় প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন। তাতে তিনি তাঁর নাটকে সঙ্গীতের একটা নতুন ছাপ দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। গানগুলির মধ্যে অভিনবত্ব আনলেও তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতি করতে পারেন নি। তাঁর সময়ে সঙ্গীতের পরিবেশ যেরূপ ছিল তাতে যান্ত্রিক ঐক্যতান দেওয়ার 'কর্ণসার্ট' রচনা অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। সে সময়ে নাচ-গান-বাজনাকে কেউ ভাল চোখে দেখত না। গান গাইলে অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতেন এই ভেবে যে তাদের ছেলেরা বুঝি জাহান্নামে যেতে বসেছে। সেজন্য বুদ্ধিমান যন্ত্রীর অভাব ছিল। একদিকে যন্ত্রীর অভাব আর অন্যদিকে যন্ত্রধ্বনিকে কি ভাবে একত্রীভূত করলে যন্ত্রধ্বনি যান্ত্রিক কোলাহল না হয়ে সুমধুর ঐক্যতান হবে সেরূপ ধারণা সে যুগে বাংলায় কারো ছিল না বললেও চলে। সেজন্যেই শুধু গানকে পরিবর্ত্তিত-রূপে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হলেও তখন যন্ত্রকে নিয়ে চেষ্টাই করা হয়নি। বর্ত্তমানে সে চেষ্টা নৃত্যসঙ্গীত প্রযোজনায় এবং সিনেমাশিল্পের তাগিদে আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমান যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থা অন্য প্রবন্ধে যথা সম্ভব দেখাবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা উপন্যাস

বছর দশ বারো আগে আমি বাংলা উপন্যাস পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলুম। বুর্জোয়ারা লিখছে বুর্জোয়াদের জন্যে বুর্জোয়াদের কথা। ও আর কী পড়ব! তাও যদি সত্য ঘটনা সুন্দর করে লিখতে জানত। লেখা যে একটা আর্ট এটাও তারা শিখবে না। লেখা হয়েছে একটা ইন্‌ডাস্ট্রি। যুগটা ইন্‌ডাস্ট্রির যুগ। আর্টের যুগ তো নয়।

তার পরে ভেবে দেখলুম ও ছাড়া আর কী হতে পারত! আমার এক নম্বর অভিযোগ তো এই যে লিখছে বুর্জোয়ারা। কিন্তু বুর্জোয়ারা না লিখলে কি মজুরচাষীরা লিখত? মজুরচাষীরা লিখতে চাইলে কি কেউ কোনো দিন তাদের বাধা দিয়েছে? ওরাও লিখবে না, এরাও লিখবে না। তা হলে লিখবে কে? জানি এক দিন সূর্য উঠবে, কিন্তু তত দিন চন্দ্র অতন্দ্র থাকলে ক্ষতি কী? চন্দ্র অস্ত গেলেই কি সূর্য তৎক্ষণাৎ উঠবে? একাদশীর চন্দ্রাস্তের পর কি অবিলম্বে সূর্যোদয় ঘটে? না, তা ঘটে না। যত দিন সাহিত্যের ভার চাষীমজুরদের হাতে পড়েনি ততদিন সে ভার বুর্জোয়াদের হাতেই থাকবে। উপায় নেই।

তা না হয় হলো। কিন্তু বুর্জোয়ারা কেন সর্বসাধারণের জন্যে লেখে না? কেন লেখে শুধু বুর্জোয়াদের জন্যে? এই আত্মকেন্দ্রিকতার হেতু কী? হেতু অস্পষ্ট নয়। বই লিখে ছাপাতে যে খরচটা হয় সেটা সর্বসাধারণ দেয় না। দেয় বুর্জোয়ারাই। লেখকদের যদি জমিদারি থাকত তা হলে বই লিখে জমিদারির টাকায় ছাপানো যেত। বুর্জোয়াদের কাছে হাত পাততে হতো না। কিন্তু সে দিন কি আর আছে? এখন বুর্জোয়ারা কিনবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোনো প্রকাশক বই ছাপেন না। ক্রেতার মুখ চেয়ে লিখতে হয়। উপায় নেই।

বেশ। কিন্তু বিষয়টা কেন সেই থোড় বড়ি খাড়া? যে দেশে তরিতরকারির অভাব নেই, বিচিত্র শাক সবজি, সে দেশে কেন খাড়া বড়ি থোড়? এত বড় কৃষক সমাজ আর কোনো দেশে আছে কি? শ্রমিক বলতে যদি গ্রাম্য কারিগরকেও বোঝায় তো এত বড় শ্রমিক সমাজ আর কোন দেশে আছে? কামার কুমোর তাঁতী ছুতোর গয়লা নাপিত মুচি কসাই দর্জি মেথর ডোম এমনি হাজারো নাম। ইউরোপ হলে এদের এক একটা

ট্রেড ইউনিয়ন বা সিণ্ডিকেট থাকত। ভারতবর্ষ বলে এদের এক একটা জাত। এদের কথা কি লেখা যায় না ?

লেখা যায়। কিন্তু যারা লিখবে তারা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হবে অভিন্ন হবে, তবে তো ওরা মন খুলবে। ওদের মুখের ভাষা শিখে নেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু মনের ভাষার বর্ণপরিচয় বড় কঠিন। আমরা ইংরেজী জানি, কিন্তু ইংরেজকে জানিনে। তেমনি ফিরিওয়ালার বুলি জানি, কিন্তু ফিরিওয়ালাকে জানিনে। বহু ভাগ্যে একজন কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের কাছে মন খুলেছিল। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বুর্জোয়া লেখকদের মজুরচাষীরা বুলিওয়ালা। ওরা সত্যিকার মজুরচাষী নয়, বুর্জোয়াদের চোখে মজুরকে চাষীকে যেমন দেখায় ওরা তেমনি। অর্থাৎ অর্দ্ধেক বুর্জোয়া।

বুর্জোয়ারা লিখবে বুর্জোয়াদের জন্যে, অথচ প্রোলিটারিয়ানদের সম্বন্ধে, এটা আমার প্রত্যাশা করাই অন্যায় হয়েছিল। যারা লেখে তারা যদি বা ও বিষয়ে লেখে যারা পড়ে তারা ক'দিন আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। পরের ব্যাপারে আগ্রহ বেশী দিন থাকে না। কিছু দিন পরে ক্লান্তি আসে। সেইজন্যে "কল্লোল" কাগজে যাঁরা সমাজের নীচের তলার কথা লিখতেন তাঁরাই তাঁদের পাঠকদের উৎসাহ না পেয়ে উপরের তলার কথা লিখতে লাগলেন। এ রকম আরো ঘটেছে। ঘটবেও। পরের বিষয়ে কৌতূহল সহজেই বাসি হয়ে যায়, যদি না পরকে আপন করার কৌশল জানা থাকে। তার মানে প্রোলিটারিয়ানের অন্তরে যে শাশ্বত ও সার্ব্বভৌম মানুষটি আছে তার সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। এ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই কাবুলিওয়ালা বাঙালীর আপনার লোক হয়েছে। এ ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা হয়তো কাবুলিকে বাঙালী করে তুলবেন, কিন্তু কাবুলিকে কাবুলি রেখে বাঙালীর ঘরের লোক করতে পারবেন না। তেমনি চাষীকে ভদ্রলোক করে বসবেন, কিন্তু আত্মীয় করতে অক্ষম হবেন।

এই দশ বারো বছরে আমি অনেক ধারণা বিসর্জন দিয়েছি। তাই বাংলা উপন্যাসের কাছে আমার প্রত্যাশা অল্প। এখন আমার প্রত্যাশা অল্প বলে যখন যা হাতে পাই পড়ি বা পড়বার অবসর খুঁজি। যে যা জানে সে তাই নিয়ে লিখুক। ফাঁকি না দিলেই হলো। যদি মানবহৃদয়ের ঠিক সুরটি বাজে তা হলে বুর্জোয়ার জন্যে বুর্জোয়ার বিষয়ে বুর্জোয়ার লেখা বলে নামঞ্জুর হবে না। শাশ্বত ও সার্ব্বভৌম মানুষের কাহিনী যদি হয় তো ভাবী কালের প্রোলিটারিয়ান পাঠক আপনার করে নেবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভিজিট

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ভেবে দেখুন, এক-এক করে একশো জন রোগী মারতে পারলে যাদের পসার জমে উঠবার কথা—এই অনিশ্চিত সময়ে তাদের অবস্থা-টা কি! হিসেব করে দেখুন, বছরে গড়ে দশটি রোগী মারবার অবকাশ পেলেও আমাদের পসার জমাতে দশটি বছর চলে যায়। এ অবস্থায় মাত্র তিন বছর হ'ল প্র্যাকটিস করতে বসেছি—১৯৪৫-এ। ১৯৪৫-থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত ক'টা দিন ভালো গেলো বলুন—আর ক'টা রোগী মিলতে পারে এ ক'দিনে, যারা মরতে প্রস্তুত? ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি, দাঁতব্যাথার উপরে আর দাঁত বসাতে পারিনি। ঠাট্টা করে অবশ্যি বলতে পারেন—সমস্ত দেশইতো রোগী হয়ে উঠেছে ১৯৪৩-এর পর থেকে। কিন্তু নিরীহ ডাক্তারদের উপর আপনাদের ওসব স্বদেশী ঠাট্টার ঝাল ঝেড়ে লাভ নেই। আপনাদের দুর্ভিক্ষ, চোরাবাজার, গুলিগোলা, ষ্ট্রাইক আর রায়টের আমরা কি করতে পারি? বরং রায়টে-রায়টে আমাদেরই রোগী বানিয়ে তুল্‌লেন আপনারা। একদম পথ্যবন্ধ রোগী।

নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এম্নি উঠে-পড়ে লেগেছেন আপনারা যে গণৎকারের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এ-অভ্যাসের ফলে কদিন পরে আর ডাক্তারেরই হয়ত দরকার হবেনা আপনাদের। কিন্তু ডাক্তাররাও মানুষ, প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছা তাদেরও হয়—কাজেই তিন দিন বন্ধ রেখে চতুর্থ দিনে চেম্বারটা খুলে বসি। তার আগে ভয়ার্ত্ত মনকে খানিকটা যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করতে হয়। রোগবীজাণুগুলোত আর রায়টে মারা যাচ্ছেনা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তাদের অবাধ বিচরণ চলেইছে—চৈত্রের এই শুক্‌নো গরমে আর রাত্রিশেষের হঠাৎ ঠাণ্ডায় মানুষের শরীর তাদের সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ না করে থাক্‌তে পারে? অধীত বিদ্যা স্মরণ করে মন চেম্বার-প্রবেশে সায় দেয়।

"অপঘাতে মরবে তুমি একদিন—" ভয়ের সিরিঞ্জ অষ্টপ্রহর হাতে নিয়েই আছে বন্ধুরা—দেখা হলেই শরীরে ঢুকিয়ে দিতে চায়।

ওদের এবং নিজেকেও আশ্বস্ত করবার জন্যে অভিনয় করতে হয়: "মৃত্যুভয় দেখাও ডাক্তারে?"

"ওসব ফাজলেমি রাখো—হাটে গিয়ে ক'টা দিন চেম্বার খুলে না বস্‌লেও তোমার উনুন জ্বল্‌বে!" বন্ধুরা অতিশয় গম্ভীর হয়ে যায়।

"চেম্বারে গিয়ে বুনসন বার্ণার না জ্বালিয়ে ঘরে বসে উনুন না হয় জ্বাল্‌লাম—কিন্তু তোমরা কি চাও তোমাদের ঘরদোর জ্বলবার আতঙ্কে আমিও ভক্তি হয়ে যাই।"

"রোম পুড়ছে আর তুমি বেহালা বাজাচ্ছ ত! বউদি মানুষটাও বা কেমন, তোমাকে টই-টই করে ঘুরতে দিচ্ছেন রাস্তায়-রাস্তায়।"

"মানুষটা যুক্তিবাদী। ডাক্তারের উপর ছুরীছোরার উপদ্রবকে হয়ত সাংঘাতিক ভাব্‌তে পারেন না।"

বন্ধুরা ভদ্রলোক—আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে পারে না—কাজেই চুপ করে যায়। ট্রাম বন্ধ, বাস লোকারণ্য,—বুনোমানুষ হতে চাইলেও ঝুলবার ঠাঁই নেই, রিক্সা ডেকে চেম্বারের পথটা যথাসাধ্য হ্রস্ব করে নিই।

বন্ধুবান্ধবের কথায় কর্ণপাত করিনে বলে যদি আমায় আলাদা ধরণের জীব বলে মনে করে থাকেন তাহলে ভুল করবেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যারা খবর সংগ্রহের জন্যে ভীড় করে থাকে কিম্বা সকাল সন্ধ্যায় খবরের কাগজের হরফগুলো গোগ্রাসে গিল্‌তে থাকে আমি তাদেরই সগোত্র। মানে কম্যুনিস্টদের ভাষায় জনগণের একজন। সাবেক দিনের গড্ডলিকা কথাটার ইতর সংস্পর্শ থেকে যে কম্যুনিষ্টরা আমাদের উদ্ধার করেছেন তার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ!

একাধিক পত্রিকা থেকে খবর সংগ্রহ করতে না পারলে আমারও মন ভালো থাকেনা—কিন্তু সেদিন খবর সংগ্রহ করেও মনটা ভালো ছিল না। এভাবে আর কতোদিন চল্‌বে? কতো লোক মরবে, কতো বস্তি জ্বল্‌বে! অনর্থক এতোগুলো জীবন শেষ হয়ে গেল—কোনো কথা ছিলনা এদের মরবার। নিমোকক্কাস্ বা বসন্তের ভিরাস্ এদের শরীরে ঢোকেনি—টি-বি নয়, ক্যান্সার নয়—সুস্থ, সবল মানুষ সব; আমারই মতো রুটির ব্যবস্থায় বাইরে বেরোল কিন্তু ঘরে আর ফিরে এলোনা—হাসপাতালে গেল, গেল মর্গে। ডাক্তারের মন নেই বলে আপনারা বদনাম করেন, মশাই, কিন্তু এসব কি হচ্ছে আপনাদের কলকাতায়? মনের মস্ত পরিচয় দিয়ে চলেছেন আপনারা! মেজাজটাকে সরিফ রাখতে পারছিলাম না, ভ্রূ কুঁচকে উঠ্‌ছিল—জানালা দিয়ে মধ্য ও উত্তর কল্‌কাতার আকাশের দিকেই হয়ত তাকিয়েছিলাম। অসুস্থ হয়েছি ভেবে স্ত্রী মহা ফূর্তিতে আছেন লক্ষ্য করছিলাম। চাকরকে চা করতে দিতেও তাই রাজি ছিলেন না আজ। নিজের হাতে চা করে নিয়ে এসে বল্‌লেন: "শরীর খারাপ থাক্‌লে আজ আর চেম্বারে না-ই বেরোলে।"

"আমার শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন, শত্তুরের হোক!"

"ভালো থাকলে ত ভালোই। বিকেলে ছুটকি'দের ওখানে চলো!"

শরীর ভালো থাকলেই স্ত্রীর বোনের বাড়ি বেড়াতে যেতে হবে বিয়ের মন্ত্রে এমন কোন শপথ উচ্চারণ করেছিলাম বলে মনে পড়লনা। ত্রস্ত হয়ে বল্লাম: "সর্ব্বনাশ—তিনটে জরুরী কাজ পড়ে আছে—চেম্বারে না গেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।"

স্ত্রীকে নিরস্ত করতে আমার এই ত্রস্তব্যস্ত ভাবটাই যথেষ্ট। মাপ করবেন, এই মিথ্যা অভিনয়টা সেদিন স্ত্রীর কাছে করতেই হ'ল। আর এ-ধরণের এক-আধটু মিথ্যা না চালালে সত্যিকারের সংসার চল্‌তে পারে না। যে যা-ই বলুন—স্ত্রীর কাছে সত্যগোপন করবনা বলে বিয়ের মন্ত্রে যে পাঠটা ছিল ওটা আমি পড়িনি।

মিথ্যা কথা বল্লাম, কিন্তু তাহা মিথ্যা নয়। মিত্তির সাহেবের ইউরিনটা আসবার কথা আছে। ভালগার রসিকতা করে বল্‌তে পারেন—চিনির দায় থেকে কল্‌কাতার মতো ওটাকে মুক্ত করবার ভার বুঝি আপনার? দায় আমার নয়, উনিই নেহাৎ দায়ে পড়ে আমার মতো জুনিয়ারের পরীক্ষার উপর নির্ভর করছেন। যাক্ আস্‌বার কথা মাত্র আছে—আস্‌বে যে তার মানে নেই। তবে দুঃসময় বলে যদি এ-কৌলীন্য অর্জ্জন করা যায়।

আজ আর রিক্সাও জুটলনা—তাছাড়া অনিশ্চিত রোজগারের আশায় আর কতোদিন বা রিক্সার খরচ যোগান যায়? সর্দ্দার শঙ্কর রোড্ থেকে এল্‌গিন রোড্—দূরত্বের ছবিটা মনে উঁকি দেবার আগেই পা চালিয়ে দিলাম।

চেম্বারের বয়টিও আজ উধাও। এমন পুরোপুরি নিঃসঙ্গতা ভুঞ্জনের সুযোগ আলেকজাণ্ডার শেলকার্কের মতো দুচারটি প্রাণী ছাড়া ইতিহাসে আর ক'জন আদমীর মিলেছে? গত যুদ্ধে কয়েকজন সীমান্ত প্রহরীর হয়ত। আর আমিও এখন সীমান্ত প্রহরীই ত!

বেলা বারোটা অবধি মিত্তির সাহেব বসিয়ে রাখ্‌লেন। অপরাধ হয়ত ওঁর নয়—আমারই অপরাধ। রোম পুড়ছে আর আমি টেষ্ট-টিউব আর ফ্লাস্ক বাজাতে বসেছি! আমার এই সোশ্যাল সেন্সের গুরুতর অভাবে কম্যুনিষ্টরা নিশ্চয়ই ডিকাডেণ্ট মধ্যবিত্তের গন্ধ পাবেন। কিন্তু কি করা যায় বলুন, জীবিকার্জ্জনের জন্যে কতো কুকাজইত মানুষ করে!

গৃহস্বামী গৃহেই ফিরে যাব ভাবছিলাম—কিন্তু এই সাধু সঙ্কল্পে ব্যাঘাত এলো।

"ডাগ্‌দর বাবু—"

লোকটার দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌লাম।

কি করে এলো ও, কেন এলো—লোকটা আমায় চেনে, ডাক্তার বলেই চেনে কিন্তু

এ সম্বোধনের শেষে কি বলতে পারে ও—কি করতে পারে? ঝাঁক বেঁধে এ প্রশ্নগুলো মনের উপর উড়ে এসে চমকে দিল আমাকে। বুঝতে পারছিলাম, মুখের চেহারাটা আমার ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছিল।

"কি চাই?"

লোকটা দু-পা সরে গেল। হয়ত আমারি ভীতিপ্রদ কণ্ঠে। অপলক ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ওর চেহারাটা যে আমার চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল তা নয়।

"জেরা মেহেরবানি করকে—"

আশ্বস্ত হওয়া গেল—লোকটাও ভয় পেয়েছে। আশ্বস্ত হয়ে এবার ওকে দেখতে পেলাম সম্পূর্ণভাবে। অনেক দেখেছি এ-চেহারা—আজ নূতন নয়। রাস্তায়, ফুটপাথে, দোকানে, বাজারে, ট্রামে, বাসে এ চেহারার সঙ্গে কতোবার, কতোসময় পরিচয় হয়েছে—তবু আজ যেন তা আরেক রকম মানে নিয়ে উপস্থিত হ'ল! নোংরা, খাটো ধুতি ময়লা নীল হাফ-সার্ট—বোতাম নেই—কালো তাগায় গলার সঙ্গে একটা রূপোর তাবিজ বাঁধা, তাতে গম্বুজমিনারের নক্সা খোদাই করা। হয়তো দিন কয়েক আগে দাড়ি কামিয়েছিল, এখন গোঁফদাড়িতে একাকার মুখ। ধীরে ধীরে চোখ আবিষ্কার করতে সুরু করলে, এতে চমকে উঠবার কিছু নেই। সকালবেলাকার খবরের কাগজের হরফগুলো মনের উপর যে-তাণ্ডব সুরু করেছিল তা-ও ধীরে ধীরে মীইয়ে এলো।

"ক্যা হুয়া?" নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করে তুললাম।

যা হয়েছে এককথায় ও বল্‌তে পারেনি—অনেক জেরা করে তবে ওর মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হওয়া গেল। মাপ করবেন, আমার জেরাগুলো হুবহু আপনাদের শোনাতে পারব না। নেহাৎ ওর দায় বলেই আমার হিন্দিজবান ওকে বুঝতে হয়েছে—কিন্তু রাষ্ট্রভাষা-শিক্ষার্থীদের কানে তা প্রবেশ করা মাত্র মাথায় খুন চেপে যাবে। কাজেই ব্যাপারটা শুনেই আপাতত কৌতূহল নিবৃত্তি করুন: চৌরঙ্গীর বগলেই কোথায় ও থাকে, স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা, ব্যথায় ভিরমি খাচ্ছে, ডাগদরবাবুকে নিয়ে যেতে হবে ছাড়া আর কিছুই সে জানে না, আপনার লোক কেউ নেই বঙ্গালমুলুকে, কি করবে ও? ডাগদরবাবু চলুন, ও টাকা দিতে কসুর করবে না।

ম্যাটার্নিটি হোম কেন ও চেনেনা এ-তিরস্কার ওকে করা যেতো কিন্তু যে ডুবে যাচ্ছে তাকে সাঁতার না শেখার দরুণ তিরস্কার করতে নেই বলে কথামালাতে উপদেশ পেয়েছি। কিন্তু সে উপদেশ অনুসরণ করে কতোদূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়? চৌরঙ্গীর বগলে কোনো অজ্ঞাত গলি পর্য্যন্ত যাওয়া যায় কি?

এবার লোকটা কাঁদতেই সুরু করল—কাঁধের গামছায় চোখ চেপে দরজার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু বিব্রতই হলাম না—খানিকটা ভয়ও হল। ওকে একা এখানে ফেলে বাড়ি পালানো সম্ভব কি না ভাবছিলাম। সম্ভব নয়। সম্ভব যখন নয়, হয়তো ওর সঙ্গে যেতেই হবে। প্রাণের ভয় ছেড়ে ওর আসা-টার মর্য্যাদা না দেওয়া মানে নিজেকেই অমর্য্যাদা করা। ভাববেন না, ভিজিটের লোভেই এ সব মহাকাব্য আওড়ে চল্‌ছিল মন। ছেলেমানুষের মত লোকটা কাঁদছে—কি মুস্কিল, ভেবে দেখুন!

"চলো—" অবশেষে বল্‌তেই হ'ল। বিরক্তি ঢাকতে গিয়ে আমার চেহারাটা নিরুপায়ের মতোই হয়তো করুণ হয়ে উঠেছিল।

৩১শে মার্চ্চ দুপুর দুটোয় আপনাদের বাড়ি ফিরবার ব্যস্ততার মধ্যে যদি কোনো লোককে চৌরঙ্গীর কোনো গলি থেকে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এসে একটা ট্যাক্সি ধরতে দেখে থাকেন এবং লোকটার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যে যদি যৎসামান্যও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকেন—তাহলে স্মরণ করে দেখুন, সে-লোকটাই আমি। পুরোপুরি দেড়টি ঘণ্টা ইয়াসিনের 'কোঠি'তে কাটিয়ে আস্‌তে হ'ল। খামকাই ভয় পেয়েছিল ইয়াসিন—একদম সহরের জীব বনে গেছে ও—নিজেকে সব কিছুতেই অসহায় মনে করবার রোগে ধরেছে। ডাক্তারের কোনো দরকারই ছিলনা, একজন অভিজ্ঞা স্ত্রীলোক হলেই চল্‌ত। তবু যখন গিয়ে পড়তে হল, টুকি-টাকি ডাক্তারি বিদ্যা না দেখিয়ে আমার উপায় ছিলনা। সুস্থ, স্বাভাবিক কেস্—প্রসূতির আর শিশুর একটু পরিচর্য্যা করা মাত্র। প্রায় সব কিছু ইয়াসিনই করল—আমার নির্দ্দেশে। তবু ইয়াসিনের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিলনা—যা হচ্ছে ওটুকু না হলে যেন প্রসূতি আর শিশু কিছুতেই বাঁচতনা। ইয়াসিনকে আপনারা মডার্ন বল্‌তে পারেন—আপনাদের আর কি, একটা কথা বলে সংজ্ঞা নির্ণয় করে দেওয়া, আর আমাকে কি করতে হয়েছিল ভাবুন—চৈত্রের দুপুরে না খেয়ে দেয়ে দেড়টি ঘণ্টা ইয়াসিনের মডার্নত্ব চিকিৎসা করতে হ'ল!

যখন চলে আস্‌ছিলাম ইয়াসিন সেলাম জানিয়ে প্রচুর উৎসাহভরে একটি পাঁচটাকার নোট হাতে তুলে দিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আর ফিরিয়ে দেওয়া গেলনা টাকাটা। ট্যাক্সিওয়ালার কেয়ারা মিটিয়ে আপদ বিদায় করা গেল।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল স্ত্রীকে নিয়ে। আমাকে দেখেই ওঁর আতঙ্ক অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় রাগের মূর্ত্তি ধারণ করে বসল: "তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই—?"

ও ত' বলাই বাহুল্য, হাস্‌তে লাগ্‌লাম। হাসবার মতো একটা হাল্কা মেজাজ তৈরী হয়ে উঠ্‌ছিল যেন।

"রাস্তায় ঘাটে কি সব হয়ে চল্‌ছে আর এসময়ে উনি ফিরে এলেন দুটো বাজিয়ে!"

"শতমারীকে সময়ের ভয় দেখাও!" স্ত্রীর রুদ্রমূর্ত্তির সামনে একটু পরিহাসের নৈবেদ্য তুলে ধরলাম।

"ঈস্‌—ভারি বীরপুরুষ এসেছেন।" রাগের জোয়ারে ভাটার টান দেখা গেল।

ভালো লাগছিল দেখ্‌তে। এধরণের মানসিক পটপরিবর্ত্তনে মেয়েদের ভালো দেখায় বলেই যে ভালো লাগছিল তা যেন নয়। আপনারা কি বল্‌বেন জানি—স্বামীত্বের ভূষণ স্ত্রৈণতাকে মেনে নিতে আমার সঙ্কোচ নেই—তবে এ ঠিক তা-ও নয়। এ সবের উপরে আরো কিছু মনে পড়ছিল বলেই যেন ভালো লাগছিল ওঁকে।

মনে পড়ছিল আপনাদেরও - খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আস্ফালন করছেন আপনারা—মৃতের উপর, মৃত্যুর উপর আস্ফালন করে চলেছেন—মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন চারদিকে। শুধু মৃত্যু, শুধু মৃত্যু—মৃত্যুর পালাগান আপনাদের সমবেত কণ্ঠে! আপনাদের গান আমি শুন্‌ছি, মনোযোগ দিয়েই শুনছি। ভুলে গিয়েছিলাম, এ ছাড়াও যে গান থাকতে পারে। আজ সে গান শুনে এলাম, একটি ক্ষীণ, মৃদু কণ্ঠের অদম্য অফুরন্ত গান—আকাশের নীচে আলোর নীচে জীবনের অঙ্কুরের গান। আর সে গানের সুর বুনে চলছে যারা, আপনাদের ভীড় থেকে তাদেরই একটি মুখ আজ উঁকি দিয়ে যাচ্ছে—ইয়াসিনের স্ত্রী।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঁচিশ

গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। তামসী গলা উঁচিয়ে বললে, 'সেকেণ্ড অফিসারের বাড়ি চেন? সে বাড়ি।'

চিনে-চিনে নিয়ে এসেছে গাড়োয়ান। খসা-ধসা ভাড়াটে বাড়ি। সামনের দরজাটা খোলা, পর্দার ওজুহাতে একটা চট ঝোলানো। কিন্তু একরতি আলো নেই, শব্দ নেই এক ফোঁটা। এক রুগ্ন অন্ধকার যেন এক বিবর্ণ স্তব্ধতাকে আলিঙ্গন করে আছে।

তামসী রোয়াকের উপর উঠে এল। কি করে ঘোষণা করবে নিজেকে ভেবে পেলনা। দরজা বন্ধ থাকলে কড়া নাড়তে পারত। না, ভয় কি। এগিয়ে গেল তামসী।

'কে?' ভিতরে লোক আছে। অত্যন্ত ক্লান্ত কণ্ঠের প্রশ্ন। কৌতূহলহীন।

'আমি।' যেন কত দিনের পরিচয় স্বরে এমনি একটা আমেজ আনল তামসী। 'ভিতরে আসতে পারি?'

'আসুন।' প্রতিধ্বনিতে উত্তাপ নেই।

মনসিজ সেদিনের মতই চটের ইজিচেয়ারের হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। সেই ইজিচেয়ারটাই কিনা ঠিক কি। গায়ে তেমনি গেঞ্জির উপরে কোট, পরনের কাপড়টা কোমরে গোল করে জড়ানো। সেই হাড্ডিসার তক্তপোষ, নিস্খোলস টেবিল, পুঁয়ে-পাওয়া চেয়ার। কচি পাঁঠার কৃষ্ণকায় কমনীয়তাটুকুই অদৃশ্য হয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে মনসিজের আর প্রমোশান হয়নি। সাইকেল ছেড়ে এজলাস পেলেও সে ডেপুটি হতে পারেনি। বরং টি-এ খুইয়েছে, খুইয়েছে ভেট-বেগার। মনসিজের মনে সুখ নেই। হাকিমকে খাওয়াতে হবে বলে মোক্তারবাবুরা দু পক্ষ থেকেই টাকা খাচ্ছে, এক আধলাও ট্যাঁক থেকে ছিটকে আসছে না। বিপরীত ফল ঘটলে মক্কেলকে তিরস্কার করছে, 'তখন বললুম বাজে খরচ বাবদ পুরো একশো টাকাই দে—তা না, সাশ্রয় করতে গেলি। পঞ্চাশ

টাকায় কখনো কাজের বাজে খরচ হয় ? ও পক্ষ বেশি টাকার বাজে খরচ করে কেমন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বল দেখি—'

অন্ধকারে চোখ বুজে মনসিজ তার ভবিষ্যৎ ভাবছিল। যদি এখুনি সে চাকরিটা ছেড়ে দেয় সেই ভবিষ্যৎ।

'আমাকে চিনতে পারেন ?' নির্দেশ পাবার আগেই চেয়ারে বসেছে তামসী। তার আজ অনেক সাহস। অনেক স্বাচ্ছন্দ্য।

কিন্তু গলার স্বরে পুলকিত হবার লগ্ন চলে গিয়েছে মনসিজের। হাতের কাছে টেবিলের উপর লণ্ঠনের পলতেটা অনেক গভীরে ডোবানো ছিল। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিল আস্তে-আস্তে। সঙ্গে-সঙ্গে একটি পিচ্ছল চিক্কণ হাসি তামসীর চোখের কালোতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

সেই হাসিটা যেন কেমন নগ্ন, নির্দিষ্ট। মনসিজকে এমন এক জায়গায় স্পর্শ করছে যেটা অনাবৃত অথচ দাহবোধহীন। এমন এক দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যেদিন এই হাসিটা সমাপ্তির রেখা হতে পারত অনায়াসে। কিন্তু আজ এই হাসি ভস্মের নিচে অগ্নিচিহ্নের মত দেখল মনসিজ। নম্র চোখে বললে, 'ও! আপনি!'

'চিনতে পেরেছেন তা হলে ?' চাউনিটা আরো একটু তরল করল তামসী।

'হ্যাঁ। জামিন দেবার পর উঠেছিল আপনার কথা। দুয়ে-দুয়ে চার করতে তাই দেরি হল না।'

কিন্তু এ যে দুয়ে-দুয়ে পাঁচ হবার উপক্রম। চিনতে পেরেছে অথচ এমন নিঃসাড়। এমন নিরস্ত। এই উপেক্ষার অর্থ কি। নতুন শীত পড়ে এসেছে অথচ তামসীর আচ্ছাদনের অল্পতার জন্যে তার আজ মায়া নেই। রাঁধা মুরগির মাংস দেয়া দূরের কথা, এক পেয়ালা চা দিয়ে পর্যন্ত সাধছে না। কেন এই নিঃস্নেহতা ? কিছু এখন খেতে দিলে নির্লজ্জের মত খেতে পারত তামসী, কিন্তু নির্লজ্জের মত তা চাইতে দেবার প্রশ্রয় নেই। কেন চারপাশে ? যে লোক নিজের থেকে এসেছে তাকে নিজের লোক বলে ভাবতে কেন এত আলস্য ?

'আপনি কেন এসেছেন ?' সামনের দিকে ঝুঁকে এসে অন্তরঙ্গ ষড়যন্ত্রীর মত চাপা গলায় জিগগেস করলে মনসিজ।

সত্যি, কেন এসেছে ? নিজের উপকারের জন্যে, না, সমাজের উপকারের জন্যে ? সমাজের উপরকার হোক কি না-হোক তাতে তার কী যায় আসে ? বা, সমাজের প্রতি তারও একটা কর্তব্য আছে বৈকি। নিজের প্রতি যখন অপরাধ করেছে সে অম্লানমুখে ক্ষমা করেছে। সে হীনতাটা মনে হয়েছে শরীরের প্রচ্ছন্ন গ্লানির মত। সংশোধন করে

নিয়েছে নিজের স্বাস্থ্যের জোরে। কিন্তু সমাজের সম্বন্ধে যে অপরাধ তার মার্জ্জনা নেই। সে হীনতাটা অশুচি পূতিক্ষতের মত, ভালোবাসার সিল্কের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা যায় না। নির্দয় হাতে তার চিকিৎসা চাই। যাতে অন্য অঙ্গে না সংক্রমণ হয়। চিকিৎসককে তাই সচেতন করে দেয়া দরকার। মন্ত্রবলে ব্যাধি সারে এমন অসার কথা যেন না সে বিশ্বাস করে। যেন কোনো শৈথিল্য না আসে, কোনো অমনোযোগ।

'আপনি মিছিমিছি এসেছেন। আপনি চলে যান।'

'চলে যাব!' তামসীর হাসিমুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, কেউ দেখে ফেললে কিছু ভেবে বসবে নিশ্চয়।'

কে কী ভাববে! তামসী যেন তা গ্রাহ্য করে! নড়ে-চড়ে ঢিলেঢালা হয়ে বসল সে আরো মজবুত হয়ে। ভাবুক না যার যা খুসি। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ভাবতে দাও। যার যা খুসি বলুক না চোখ টিপে, ঠোঁট বাঁকিয়ে। তামসী কারুর ধার ধারে না।

অন্তঃপুরে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। অনেকগুলি ছেলেপিলের কান্নাকাটি, অনেক তাড়ন-তর্জন। যেন অনেক বিশৃংখলা, অনেক অসন্তোষ। অনেক বা জোড়াতাড়া, টানাহেঁছা। তাই হয়তো এই ভয়, এই অচেষ্টা।

কিন্তু তামসী তো নিজের উমেদারিতে আসেনি। সে এসেছে সমাজের মুখপাত্র হয়ে। উর্দ্ধতম শাস্তির সুপারিসে।

তিক্ত গলায় বললে, 'ভাবতে দিন। পরের ভাবনায় গায়ে ফোস্কা পড়েনা আমার। আপনারও পড়েনা বলেই জানতাম।'

'সে ভাবনার কথা বলছি না। বলছি—প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তিই গুপ্তচর—কেউ দেখে ফেললে কানাঘুসো করে বেড়াবে, আসামীর পক্ষে মামলার তদবির করতে রাত্রে চুপিচুপি আপনি হাকিমের বাড়িতে এসেছেন। তাতে ফল হবে এই—'

'মামলার তদবির করতে এসেছি? আমি? আসামীর পক্ষে? ককখনো না।' তামসী ঝাঁকরে উঠল।

'অন্তত লোকে তাই বলবে। কলেক্টরের কানে উঠলে মোকদ্দমা ট্র্যান্সফার হয়ে যাবে অন্য কোর্টে, হয়তো কোনো অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ফাইলে। ফল হবে উলটা, একটুখানি অসাবধানতার জন্যে সব ভেস্তে যাবে। তাই যা বলি শুনুন।' মনসিজ চেয়ারটা আরো কাছে টেনে এনে স্বর আরো খাটো করল: 'গুটিগুটি চলে যান। আপনার কিছু ভাবনা নেই। আসামী আমি খালাস করে দেব।'

'খালাস করে দেবেন!' তামসী যেন দমে গেল, থেমে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, বলে দেবেন গিলটি প্লিড যেন না করে। আর দেখুন, ওসব ঘেসো মোক্তারে

চলবে না, একটি দু-কানকাটা উকিল দেবেন, মুখে যার কিছু আটকায়না, মুরগি আর ষাঁড়ের গল্প যে এন্তার বানিয়ে যেতে পারে—'

তামসী কতক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে রইল। এও সম্ভব? এই তার মামলার তদবির?

স্বরে সে সাহস আনল। বললে, 'কলেক্টরের বাড়ি ঢুকে যে চুরি করে সে কখনো ছাড়া পায়?'

'আমার কাছে পায়।' মনসিজ নিজের অজানতে তপ্ত হয়ে উঠল: 'শুধু কলেক্টরের বাড়ি আর কলেক্টরের বউ! যেন তাইতেই একেবারে গোটা ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। বলি, প্রমাণ কি? কলেক্টরের বউ দাঁড়াবে এসে কাঠগড়ায়? দাঁড়াক না একবার এসে।' মনসিজ উৎফুল্ল হয়ে উঠল: 'বিটকেল উকিল বিতিকিচ্ছি প্রশ্ন করে একেবার কাদা-চিংড়ি করে ছাড়বে। ওটা চুরি না আসলে প্রেমোপহার, মাথা থেকে বার করবে অনেক চটুকে গল্প। বিবিজান তখন নিজেই লবেজান হয়ে যাবেন।'

'ছি ছি ছি, চুরি করে ফের মিথ্যে কথা বলবে?'

'ডাহা মিথ্যে কথা বলবে, খাজা মিথ্যে কথা। আইনে সেটাকে মিথ্যে বল্লে না, বলে স্বপক্ষ সমর্থন। ওসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি শুধু একটি ফেরেববাজ উকিল লাগিয়ে দিন। বিবিসাহেবার তেজটা আমি একবার দেখি। আমি তো ডেড এণ্ডএ এসে পৌঁচেচি, আমার ওঠাও নেই নামাও নেই, ভয়ও নেই ভরসাও নেই। উকিল শুধু হালটা ঠিকমত ধরে থাকবে, আমি, এক পাড়ি দিয়ে সোয়ারিকে ঠিক পৌঁছে দেব ওপারে। খোলা মাঠ, খোলা হাওয়ার দেশে। আবার নতুন করে সুরু হবে আপনাদের পথ চলা।'

বুকের ভিতরটা অস্থির করে উঠল তামসীর। বললে, 'এমন যে চোর তার মুক্তি পাওয়াটা সুবিচার?'

'এমন যে দাঁড়কাক সমাজের থেকে তার ময়ূরের সম্মান পাওয়াটা সুবিচার? চুরি কেন, ডাকাতি করতে পারত না? সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে বিবস্ত্র করে দিতে পারত না ওদের?'

'দেখুন, আপনি ব্যক্তিগত রাগের কথা বলছেন—'

'বলছিই তো। সমস্ত কিছুই তো ব্যক্তিগত। আমার প্রমোশান যে হল না সেটাও তো ওদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল। আমাকে কম জ্বালানটা জ্বালাচ্ছে! আমি যদি সুযোগ পাই তবে কেন আঁচড় কাটবনা—অন্তত কালির আঁচড়?'

'তাই বলে মাঝখান থেকে চোর ছাড়া পাবে?' তামসীর অসহ্য লাগল: 'না, কখনো না। এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। তার উর্ধ্বতম শাস্তি হওয়া উচিত। আইনে ক বছর লেখে?'

'যান, আপনি আর ছলনা করবেন না। যাকে দরজা খুলে তক্তপোষের তলায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাকে নিয়ে আসুন সেই অন্ধকার ঘুপসি থেকে, আমি আবার তার জন্যে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

ও, হ্যাঁ, বুকের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারেনি বলে একদিন তাকে তক্তপোষের নিচে আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিন সেটা ছিল একটা পাপের কথা, অখ্যাতির কথা। আজ তার উপরে মহত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক পড়ছে। যেন বীরকীর্তি।

'আপনাদের ভাবনা কি!' মনসিজ ক্লান্তের মত চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিল: 'আপনারা দেশের কাজ করছেন। আপনাদের কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না, কোন পরাজয় বশ করতে পারে না,—'

লজ্জায় মাথা হেঁট করল তামসী। এই তার উদাহরণ?

'মাঝে-মাঝে পাঠ ভুল হয়ে যায়। ভাল যে অভিনেতা সামলে নিতে তার দেরি হয় না। কিন্তু তার ভয় কি—আপনার মত যখন ভাল প্রম্পটার রয়েছে পাশে। ঠিক সে কেটে বেরিয়ে যাবে। কত বড় ভবিষ্যৎ আপনাদের—যারা দেশের কাজ করছেন। আজ যদি আপনাদের ধুলো, কাল তবে সোনা, আজ যদি পাঁক কাল তবে পদ্ম। মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের—আমাদের ভবিষ্যৎ কী? আমরা কার কাজ করছি?'

নিঃস্বের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তামসী। নিরস্ত্রের মত।

'আপনি চলে যান।' আবার সামনের দিকে ঝুঁকে এসে নিম্নস্বরে বললে মনসিজ: 'এখানে বসে থেকে কেস মাটি করে দেবেন না। কেউ হয়ত এখনি এসে পড়বে। দেশের কাজ করতে না পারি—কিন্তু আপনারা যারা করছেন—'

কানে যেন কে গলানো গরম শিসে ঢেলে দিচ্ছে। তামসী বিতাড়িতের মত বেরিয়ে এল রাস্তায়।

দেশের কাজ! একটা তীক্ষ্ণ তপ্ত গুলি এখন যদি তার বুকের স্থির মধ্যস্থলে এসে বিদ্ধ হত তো নিজের রক্ত দেখে গভীর শান্তি পেত তামসী।

গাড়িকে বললে ইষ্টিশানের দিকে নিয়ে যেতে। টিকিট কেটে মেয়েদের থার্ডক্লাশ কামড়াতে উঠে পড়ল। না খাওয়া না ঘুম—ভিড়ের মধ্যে জানলার দিকে মাথা রেখে বসে রইল নিঝঝুমের মত। দুই চোখ জোর করে বন্ধ করা। যেন চোখের দৃষ্টি কোনোকালে আর ফিরে না আসে। তাকাতে না হয় নিজের দিকে, চারপাশের পৃথিবীর দিকে।

কিন্তু কান কি করে বন্ধ করবে? চলন্ত গাড়ির চাকা কী বলছে বিদ্রূপ করে? বলছে দেশের কাজ, দেশের কাজ।

'দেশের যে একটা কাজ করব লোকে তার সুযোগ দেবে না।' দেবিকা গর্জে উঠল। স্বামীকে বললে, 'তুমি ভেঙে দাও এই একজিবিশন।'

শহরে একটা কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হয়েছে। কথা ছিল কলেক্টর-পত্নী তার দ্বার উন্মোচন করবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কমিটি মত বদলেছে। সাব্যস্ত হয়েছে, প্রদর্শনী যখন দেশের কৃষি-শিল্প নিয়ে, তখন গ্রাম থেকে কোন চাষা এসে তার উদ্বোধন করবে। সেই চাষা, যার স্বাস্থ্য মজবুত আর বলদ জোড়া তেজীয়ান। এক হালে যে দশ বিঘে চাষ করতে পারে এক দিন।

'তোমাকে ভাবতে হবে না। ও একজিবিশনকে আমি জুয়োখেলার আড্ডা বানিয়ে ছাড়ব। নইলে চলবে নাকি ভেবেছ? গ্যাম্‌ব্লিং বুথে বসিয়ে দেব ফিরিঙ্গি ছুঁড়ি।' দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে রাগটাকে পিষে ফেলল নীলাচল: 'এই দেশকে এখন উচ্ছন্নে দেয়া হচ্ছেই দেশের কাজ।'

স্বপ্ন দেখছে নাকি তামসী?

একটা ছোট জংশন-স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। নিশুতিরাতে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা।

'শুনুন, কিছু খাবেন?'

হাতের উপাধানে মাথা নোয়ানো। নিশ্চল হয়ে বসে আছে তামসী।

বললে, 'না, খিদে পায়নি।'

কেন যেন আবার বললে স্নিগ্ধ স্বরে, 'কতদূর যাবেন?'

'জানি না।'

'কিন্তু কিছু খেয়ে নিলে ভাল হত না?'

'আপনি খান গে।'

আচ্ছন্ন তন্দ্রার মধ্যে কার সঙ্গে কথা কইছে তামসী? চোখ কি সে মেলবেনা একটিবার?

কিন্তু শেষরাতের দিকে চোখ মেলতে হল তামসীকে। ট্রেন আর যাবেনা। এখানেই তার শেষ। হ্যাঁ, স্টেশনের পরেই বাস আছে দাঁড়িয়ে। ভোর হলে ছাড়বে। বাইশ মাইল রাস্তা। আড়াই ঘণ্টা। যেতে পারবে যেখানে সে যেতে চায়। তাকে নামিয়ে দিয়ে বাস আরো চলে যাবে দক্ষিণে। আরো আট মাইল।

বাসে এসে বসল তামসী। লোক বোঝাই হচ্ছে ক্রমশ। অন্ধকারে কে কার পা মাড়িয়ে দিচ্ছে, ভাই-বাছা বলে আবার আপোষ করে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। কত রকমের গালগল্প চলেছে। কিছু কানে নিচ্ছে, কিছু নিচ্ছেনা তামসী। সমস্ত অন্তর-বাহির অন্ধকারে পূর্ণ করে নিঃসঙ্গের মত এক পাশে বসে আছে। পৃথিবীর মত প্রত্যূষের প্রতীক্ষা করছে।

কে একজন তার পাশে এসে বসল। মেয়ে নয়। মেয়ে আর কেউ ওঠেনি। কণ্ডাক্টরই পাশে বসতে বললে। জিগগেস করলে, আপনার লোক কিনা। সম্মতি পেল হয়ত। নইলে বসল কেন? প্রশ্ন ও উত্তর—দুটোর আন্দাজই চমৎকার। দেখবে নাকি লোকটা কে? কোনো উৎসাহ নেই তামসীর। দেখব-দেখব চেষ্টা করেও দেখবার ইচ্ছে হল না।

গাছে-গাছে পাখার ঝটাপটি সুরু হল। সুরু হল উৎফুল্ল কাকলী। আকাশের প্রান্তরেখা নীলাভ হয়ে এল।

চোখ মেলল তামসী।

বসবার নির্দিষ্ট সংখ্যা বাসের গায়ে লেখা আছে, কিন্তু দাঁড়াবার সংখ্যার ইতি-অন্ত নেই। বনেট-বাম্পার তো আছেই, ছাদের উপর লোক উঠেছে। এর পর যারা উঠবে তারা নাকি কোলের উপর বসবে। যারা কোল দিতে রাজি হবে তারা এক চৌথ রিবেট পাবে ভাড়া থেকে।

'তাই নাকি?' নারায়ণ নিজের মনে হেসে উঠল।

আবার চোখ বুজল তামসী। ভাবল, মনসিজের বাড়ি থেকে সে অমন তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল কেন? সাহস হল না কেন আরো কতক্ষণ বসে থাকবার? বেশ তো, দেখে ফেলত কোনো গুপ্তচর। মামলা বদলি হয়ে যেত তাঁবেদার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। তা হলে জেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত তামসী। ক্ষুধা বোধ করে দুটো মুখে দিতে পারত। গভীর ঘুমে মুছে দিতে পারত অস্তিত্বকে।

গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। কোমরে র‍্যাপার জড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছে কণ্ডাক্টর, কিন্তু বোবা মোটরে আওয়াজ ফুটছে না। একেকবার ঝেঁকে উঠছে শরীরটা আবার তখুনি নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছে।

'আপনি কদ্দূর যাবেন?' নারায়ণ জিগগেস করলে।

'আগে যাই কিনা ঠিক কি।' তামসী পাস কাটিয়ে গেল।

না, স্টার্ট নিয়েছে। কতক্ষণ টিকে থাকবে কে জানে। গর্তভরা রাস্তা, শূন্যে তুলে আছাড় মারছে মাটির উপর। যাচ্ছে শামুকের মত। রাস্তা যেখানে বিপজ্জনক, সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে নেমে পড়ে গাড়ি হালকা করে দিতে হচ্ছে। এমনি করতে করতে কতক্ষণে পৌঁছুবে তার ঠিক নেই।

শুধু তামসীই নামছে না। আর নারায়ণ যখন তার আপনার লোক তখন ড্রাইভার তাকে পাশে বসে থাকতে দিচ্ছে।

গাড়ি আবার চলল বোঝাই হয়ে।

'কদ্দূর যাচ্ছেন ?'

জায়গাটার নাম করলে তামসী। বললে, 'আমার বোনের বাড়ি। আপনি ?'

'আমি যাব আরো দূরে। গাঁয়ের মধ্যে। চাষাদের নিয়ে কী একটা ব্যাপার ঘটেছে—'

কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু গাড়ি আবার থামল কেন ?

একটা ঘাঁটি মতন মনে হচ্ছে। উলটো দিকের আরো একটা বাস আছে দাঁড়িয়ে। খালি হয়ে। এ বাসটাও এখন খালি করে দিতে হবে। আর সে যাবেনা। এক পা না।

কেন, কী ব্যাপার ?

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল আজ দশটা থেকে বাসের ষ্ট্রাইক। দশটা বাজতে মোটে আর এখন দশ মিনিট বাকি।

সে কি কথা ? রাস্তা যে বাকি এখনো আরো বারো-তেরো মাইল।

উপায় নেই। পয়সা ফেরত চান পড়তা কসে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ঘড়ি বেঁধে ষ্ট্রাইক্ যখন একবার ঘোষণা করা হয়েছে তখন আর নড়চড় নেই।

আমরা তবে, কী করে যাব ? প্যাসেঞ্জারের দল খেপে উঠল। নারায়ণ দাঁড়াল মাথাল হয়ে।

নিজের—নিজের পথ দেখুন।

গাড়ি ছাড়বার আগে বলনি কেন ? কেন মাঝপথে নামিয়ে দেবে ? মরিয়া হয়ে উঠল সোয়ারিরা। পয়সা ফেরৎ কে চাইছে ? আমরা পুরো ট্রিপ চাই।

এঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছে আমাদের। পথে দুর্ঘটনা ঘটলে কী করতেন ? মানে যখন রাস্তা ডুবে যায় বর্ষার সময় তখন করেন কী ? এই কাছেই প্রোপ্রাইটরের বাড়ি, যেখানে গাড়ি জিম্মা করে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কি, গায়ের জোর দেখাবেন নাকি ? মারামারি হলে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে গাড়ি কি আর চলবে ? গাড়ি চললেও কি সিধে যাবে, না পড়বে খানায় কাৎ হয়ে ?

উলটো দিকের খালি বাসের লোক দুটো দাঁত বার করে হাসছে। তারা কত সহজে নামিয়ে দিতে পেরেছে সোয়ারী, কোনো অসুবিধে হয়নি। বলিস কেন, মেয়েমানুষ সোয়ারী নিয়ে হয়েছে মুস্কিল, তার জন্যেই যত টেণ্ডাই-মেণ্ডাই। যা না বাপু, গরুর গাড়িতে চেপে, নিরিবিলিতে, ছায়ায়-ছায়ায়। সৎ পরামর্শ তো নিবিনে—যত সব—দু বাসের কণ্ডাক্টর অর্ধ-দগ্ধ বিড়ির মুখে অর্ধ-ব্যক্ত রসিকতা করলে।

'চলে আসুন।' নারায়ণের ক্রুদ্ধ মুষ্টিতে শান্ত হাতের মৃদু স্পর্শ রাখলে তামসী। 'কাদের হয়ে আপনি লড়বেন ? ঐ দেখুন কেমন স্বচ্ছন্দে পয়সা ফিরিয়ে নিচ্ছে। যেন

এইটুকু মস্ত লাভ। অনেক রকম দুর্য্যোগ-দৌরাত্ম্যের মত এটাও ঘাড় কাৎ করে মেনে নিচ্ছে অক্লেশে। 'তারপর,' কণ্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে: 'তারপর এরা যদি একত্র হবার কোনো সংকল্প করে থাকে তবে তাতে বাধা হবার আমাদের অধিকার নেই। এরা এত দিন কষ্ট করে আমাদের কষ্ট দূর করেছে, আজ আমরা কষ্ট করে এদের কষ্ট লাঘব করি। চলে আসুন, বাকি পথ হেঁটে যাব আমরা।'

আগুনে জল ঢেলে দিল তামসী। কণ্ডাক্টরকে সে চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, তার খুড়তুতো ভাই, জগৎ। সংসারের ধাক্কায় নেমে পড়লেও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়নি। নিঃস্ব হলেও নিঃস্বত্ব নয়। জাত গেলেও ইজ্জৎ ফিরে পেয়েছে। শাখা থেকে নেমে এসেছে শিকড়ে, শক্তির মূল কেন্দ্রে।

মনে-মনে পাশে এসে দাঁড়াল তামসী। কিন্তু জগৎ কি তাকে চিনতে পারছে না? তবে সংকোচে সরে থাকছে কেন? তামসীও তো সমাজের বৈদূর্যমণি নয়, সেও তো পথে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো। স্তূপীভূতেরই এক অংশ। বৃহত্তর আত্মীয়তায় গাঁথা।

অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তারা, খালি বাস নিয়ে চলে এল জগৎ। বললে, 'আসুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নারায়ণ জয়ের একটা গর্ব বোধ করতে যাচ্ছিল, তামসী বললে, 'নিজেরা পৌঁছুতে পারেন কিনা তাই দেখুন। আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না।'

কোন্ এক অচেনা গ্রাম্য গৃহস্থের বাড়ি তারা মাথা ধুয়ে ধোঁয়া-ওড়ানো ফ্যানসা ভাত খেয়ে নিলে। পরে পাৎনার উপরে পুরু করে খড় বিছিয়ে টপ্পরওয়ালা একটা গরুর গাড়িতে তারা চেপে বসলো।

এবার তামসীর দু চোখ ভরে ঘুম আসছে উচ্ছল হয়ে। কিন্তু হায়, তার আসেনি এখনো ঘুমের মধ্যে শিথিল হবার স্বাধীনতা।

এমনিই একটা উদাস-করা উধাও পথেরই সে স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু এ তো পথ হারাবার পথ দেখায় না, কেবলই পথপ্রান্তের ইঙ্গিত করে।

এইখানে আপনাকে নেমে যেতে হবে। এই আপনার সেই শহরে যাবার ফাঁড়ি।

হ্যাঁ, আমি জানি। আমি আরো এসেছি আগে।

'একা যেতে পারবেন?' এটা নারায়ণের উদার বন্ধুতার অতিরিক্ত কিছু নয় তো?

তামসী হাসল।

কিন্তু সে-হাসি উড়ে গেল তার প্রাণধনের বাড়ীর দুয়ারে এসে। শুনলে, উষসী নেই

নেই মানে?

বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে ?

শুধু একটা বুড়ো ঝি অবশিষ্ট আছে। বললে, 'বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।' শেষে নির্দন্ত মাড়ি ঘসে বললে, 'বেরিয়ে গেছে।' (ক্রমশঃ)

জয়জয়ন্তী

বুদ্ধদেব বসু

'...যতক্ষণ লিখছিলে, ততক্ষণ তুমি আমাকে ভাবছিলে, ততক্ষণ তুমি আমার ছিলে। চিঠি! চিঠির মতো কি আর-কিছু! এমন একান্ত, নিবিড়, অবিরল। যাকে লিখছি সে ছাড়া আর-কেউ নেই, আর-কিছু নেই, হোক সে আধঘণ্টা, দশ মিনিট, দু মিনিট। চিঠি অভিসারিকা; চিঠি অবগুণ্ঠিতা প্রেমিকা; রহস্যময়ী, কিন্তু ছলনাহীনা—ঘোমটা যেই সরিয়ে দিলাম, সর্বস্ব সমর্পণ করলো। চুপে-চুপে বলা, কানে-কানে শোনা, জীবনে হয় আর ক'বার—কিন্তু চিঠি যখনই আসে, আসে চুপে-চুপে; যখনই বলে, গুনগুন করে কানে-কানে। চিঠি চুম্বনের মতো অন্তরঙ্গ; কিন্তু চুম্বন, দীর্ঘতম চুম্বন, তাও শেষ হয়, একই চুম্বন দুবার ধরা দেয় না—চিঠি থাকে, তাকে ফিরে পড়া যায়, ফিরে পাওয়া যায়, সে হারায় না, সে ফুরোয় না...

সুমিত্র থামলো। ধোঁয়া-রঙের কাগজের উপর কুচকুচে কালো কালিতে তার ঢেউ-ঢেউ অক্ষরগুলি দেখাচ্ছে যেন মেঘের গায়ে-গায়ে উড়ে-চলা কয়েকটা কাক। পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারে সে, এত কথা তার মনে, খামটা ফুলে উঠবে ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বার মতো। অন্তঃসত্ত্বা! তার সত্তা, তার সত্তা-সার সে নিংড়ে-নিংড়ে বের ক'রে দিচ্ছে ঐ কাগজে, খামে ভ'রে পাঠাচ্ছে--কাকে ? তন্দ্রাকে ? কিন্তু তন্দ্রা তো তাকে কোনো চিঠি লেখেনি, লিখলেও এমন-কিছু লিখতো না, যার উত্তরে ও-রকম লেখা যায়। চিঠি লেখার সময় কোথায় তন্দ্রার! তার চারদিকে কত লোক, তার দিন-রাত্রে কত উৎসব, তার ঘণ্টা-মিনিটে বেঁচে থাকার কত অফুরন্ত ফেনিলতা। যদি কখনো কাউকে চিঠি লিখতেই হয়, সে তা লিখবে—বাংলায় না, ইংরেজিতে, তাও টমাস ব্রাউন কি পেটর কি ইএটস-এর ইংরেজিতে নয়—ছুঁচলো ঝাঁঝালো, কাটাছাঁটা কটকটে বুকনিতে—তার উত্তরে কী লিখতে পারতো সুমিত্র ? কিছুই না। ও-ভাষা সে জানে না; ও-ভাষায় যারা বলে, চলে, ঢলে, তাদেরও চেনে না।...কিন্তু যদি লিখতো, তন্দ্রার যে-চিঠি তাকে লেখা উচিত, যদি সে তা লিখতো, তার উত্তর হ'তো এই।

নিজের লেখাটি আর-একবার পড়লো সুমিত্র, খামে ভ'রে রেখে দিলো টেবিলের বড়ো দেরাজটার অন্ধকার গহ্বরে। শেষ হ'লো না এখন; এ-চিঠির কি শেষ আছে? আবার আর একদিন—না, ও-চিঠি আর নয়, অন্য-কোনো…

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালো। এপ্রিলের লম্বা বিকেলটি এলুমিনিঅমের পাতের মতো প'ড়ে আছে। আজ সন্ধ্যায় তার যাবার কথা…যাবে? আবার দেখবে তাকে! দেখা হয়েছে বার কয়েক মাত্র। ইচ্ছে করে দেখতে, ভালো লাগে দেখা হ'লে। দেহ আছে, দৃষ্টি আছে, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ—এরা আছে ব'লেই এত ভালো লাগে বাঁচতে, কিন্তু এরাই তো শত্রু।

জানলা থেকে সরতেই উল্টো দিকের মস্ত আয়নায় তার ছায়া পড়লো। ঢিলে পাঞ্জাবি পরা ছিপছিপে একটি যুবক, ম্লান গায়ের রং, এলোমেলো চুল। একেবারে কবি! কিন্তু কবিই তো। রীতিমতোই ভালো কবি। হুজুগের কবি নয়, যুগের কবিও নয়, নিছক কবি। আঠারো শতকে যেমন ব্লেক, ভিক্টরিয়ার আমলে হপকিন্স। দুটো বই অবশ্য সে ছাপিয়েছে—না-ছাপলেও চলতো—কেউ পড়ে না, কেউ নাম করে না।…কিন্তু তাতে কী?

আয়নার মূর্তিটি আস্তে-আস্তে মেঝে পার হ'য়ে দাঁড়ালো এসে তার মুখোমুখি। ও-পারের ঘরটি মায়াবী; সেখানে ধুলো সুন্দর, ভাঙাচোরা সুন্দর, তার টেবিলের অসম্ভব বিশৃঙ্খলাও সুন্দর। চিরন্তন এই মায়া—শুধু একটি মাত্র কাচ বুক দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে ক্রীতদাস জীবনকে, সময়ের ক্রীতদাস, পরিবর্তনের, মৃত্যুর।

একটু হেসে সুমিত্র নমস্কার করলো হাত তুলে। এমনি দেখা হবে তার সঙ্গে, ড্রয়িংরুমের মেঝে পার হয়ে দরজার কাছে দাঁড়াবে তার অভ্যর্থনা।…'Oh, you have come!' কত যেন খুশি! কিন্তু এ-রকম ওরা সকলকেই বলে। 'কেমন আছেন?' 'আপনি? আপনি কেমন?' আয়নায় চোখ দুটি একটু বিষণ্ণ, হাসিতে পাণ্ডুরতা। কেন যে ও-রকম বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে বাংলা বলে!

মায়াবী ঘরের পরদা সরিয়ে চায়ের ট্রে হাতে মহেশ ঢুকলো। সুমিত্র স'রে এলো তাড়াতাড়ি। কী ভাবলো মহেশ? বাবু নিজের রূপ দেখছিলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে? তা যতই দেখি, কিছুতেই জানবো না অন্যের চোখে কেমন দেখায় আমাকে। কিছুতেই না।

চায়ের কাছে ব'সে সে ইংরেজি কবিতার নতুন একটি অ্যান্থলজি খুললো। ইংল্যাণ্ড, তোমার হ'লো কী? আর কি কবি জন্মাবে না? 'We are the last romantics'—ইএটস-এর দীর্ঘশ্বাস। দীর্ঘশ্বাস? না, গর্বিত, উদ্দীপ্ত ঘোষণা? সত্যি কি শেষ? না, আবার আসবে, আবার কবি হবে, কবিতা হবে। তার কোনো আভাস দেখা যাচ্ছে কিনা সেইটে তন্দ্রার কাছে তার জানবার ছিলো। মাত্র কয়েক মাস আগে তন্দ্রা ফিরেছে

ইংলণ্ড থেকে বি. বি. সি.র নবিশি শেষ ক'রে। কিন্তু যুদ্ধের গল্প ছাড়া আর-কিছু শোনেনি এখনো তার মুখে। কী-রকম বোমা-ঠেকানো ব্যবস্থা, কী-রকম খাওয়ার কষ্ট, রাত্রে কী অন্ধকার! সে কি জানে না সে কোথায় গিয়েছিলো, কাদের দেশে, শেক্সপিআর, শেলি, সুইনবর্নের দেশে, বিশ্ব জয় করেছে যে-দেশের বাণী! অত কালের শত্রু আয়র্ল্যাণ্ড, অথচ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর হাওয়ায়-হাওয়ায় তারই নাম ছড়িয়ে দিচ্ছে ইএটস-এর তন্ময়তা, বর্নার্ড শ-র মুখরতা। আর ভারতবর্ষ—কী তিক্ত আমাদের ভাগ্য, কী তীব্র আমাদের দুঃখ তার হাতে—তবু, তবু ইংল্যাণ্ড, সুমিত্র চায়ের পেয়ালা মুখে তুললো, তোমাকে না-পেলে আমি কেমন ক'রে থাকতাম!

আজ তুলবে কথাটা। রঙের মুখোশ ঠেলেও অমন মুখশ্রী যার, অত ভঙ্গিমা শিখেও যার তাকানো অত সহজ, সে কি বুঝবে না তার কথা। যদি না-ই বুঝবে, তাহ'লে এই মেয়েকে ভালো লাগলো কেন তার, এত ভালো লাগলো যে আলাপ হবার পর থেকে সব সময় তার কথাই ভাবছে, তার সঙ্গেই আছে।

কী রঙের শাড়ি সে পরবে আজ? রাত্রির রং, তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে যাবার পর চৈত্রের আকাশের রং। আর মেঘ-রঙের জামা, একটু আগে যেখানে চাঁদ ছিলো, সেখানকার ফোলা-ফোলা শাদা-শাদা নরম মেঘ। মুক্তোর মালা পরবে কি গলায়? মৃদু, ম্লান, বিষণ্ণ মুক্তো—গলা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়বে স্তনচূড়ায়। কখনো পরতে দ্যাখেনি—কিন্তু ক'বারই বা দেখেছে। নিয়ে যাবে মুক্তোর মালা কিনে, মানাবে ভালো কালো চুলের তলায়, আলো-করা গলায়, রাত-রঙের শাড়ির মেঘ-রঙের পাড়টিতে। আজ এটা নেবে ব'লেই তো চিরাচরিত কবি-প্রথা সে লঙ্ঘন করেছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংশ্রব রাখেনি; আজ সন্ধ্যায় কোনো-একটি বন্দিনী মুক্তা-মালাকে সে উদ্ধার করবে ব'লেই তার বাবা নদীতে সাঁকো বেঁধেছেন, নদীকে নিয়ে গেছেন খাল কেটে দূরে-দূরে, পাহাড় ভেঙে পেতেছেন রেল-লাইন।

...গিয়ে দেখলো তন্দ্রার শাড়িটি টিয়ে-রঙের সবুজ, আর টিয়ে-রঙের হলদে তার জামা, আর তার গলা আঁকড়ে আছে রক্ত-লাল প্রবাল। চমক লাগলো তার। এ-মেয়ে তো সে নয়, যাকে সে ভেবেছিলো, যার কাছে সে এসেছে। টুকটুকে দুটি ঠোঁট, ঝকঝকে দাঁত, এক ঝলক হাসির উপহার। কিন্তু এ-রকম তো কথা ছিলো না: ম্লান হাসবে সে, কালো চোখে তার আবেশ, কালো চুলে রাত্রির নিবিড়তা। অস্বস্তি হলো সুমিত্রর: যেন তার এখানে আসবার কথা ছিলো না, যেন সে ভুল করেছে।

আরো অনেকে ছিলেন সেখানে। রেডিওর কয়েকটি যুবক; তন্দ্রার মা-বাবার দু চারজন বন্ধু; মার্কিন সৈনিক; সাহিত্যিক গোছের ভ্রাম্যমাণ ইংরেজ। দিল-খোলা পার্টি, খিল-খোলা ব্যবহার; যে যেখানে খুশি বসছে, যা খুশি খাচ্ছে কিংবা খাচ্ছে না,

দু তিনজনে ভাগ হ'য়ে-হ'য়ে গল্প। বসবার আসনের কতবার যে অদল-বদল হ'লো !...কিন্তু সুমিত্র ঘরে ঢুকে যেখানে বসেছিলো, সেখানেই ব'সে রইলো স্থির হ'য়ে, অনেকেই কাছে এসে আলাপ জুড়লো, জমলো না কারো সঙ্গেই। হঠাৎ তন্দ্রা এসে ব'সে পড়লো তার পায়ের কাছে, কার্পেটের উপর। সুমিত্র উঠে দাঁড়ালো।

—'উঠলেন যে ?'

'আপনি বসুন।'

'না, না, আমি এখানেই বসছি,' তন্দ্রা সোফার গায়ে হেলান দিলো। 'আপনি বসুন। ...বসুন না।'

'দাঁড়িয়ে বেশ আছি আমি।'

তন্দ্রা একটু হেসে বললো, 'আপনার কি অসুবিধে হবে আমি এখানে বসলে ?'

সুমিত্র বললো, 'হ্যাঁ, হবে।'

তন্দ্রা চোখ তুললো—'কেন ?'

'পায়ের কাছে ভদ্রমহিলা নিয়ে ব'সে অভ্যেস নেই আমার।'

কথাটা শুনে তন্দ্রা ইংরেজিতে হেসে উঠলো। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, 'তাহ'লে আমি উঠে বসি, আপনি বসুন এখানে। ভদ্রমহিলার পায়ের কাছে ব'সে অভ্যেস আছে আশা করি ?'

'না, তাও নেই।'

'তাহ'লে ?' তন্দ্রা যেন চিন্তিতই হ'য়ে পড়লো বসবার ব্যবস্থা নিয়ে।

'তাহ'লে তন্দ্রা দেবী, অনুমতি করুন, বিদায় হই।'

'এখনই ?'

'আমার তো মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ছিলাম—অনেক, অনেকক্ষণ।'

লাল প্রবালে আলোর ঢেউ তুলে তন্দ্রা উঠে দাঁড়ালো। লম্বা মেয়েটি, সুমিত্রর কান পর্যন্ত তার মাথা। কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'চুপ ক'রেই তো ব'সে ছিলেন এতক্ষণ।'

'সময় হোক, কথা বলবো।'

মুহূর্তের জন্য তন্দ্রার চোখ নিচু হ'লো। মৃদু স্বরে বললো, 'আবার কবে আসবেন ?'

'আসবো।'

'কবে, বলুন।'

'আপনি বলুন।'

'কাল আসবেন—' ঠিক বোঝা গেলো না কথাটা জিজ্ঞাসা, না অনুরোধ, না আদেশ।

কাল আসবেন। কাল আসবেন! কানে-কানে ভরে গান ক'রে গেলো রাতের

হাওয়া, পথের হাওয়া, পাতায়-পাতায় ঢেউ তুলে। সুমিত্র বসেছে খোলা ট্যাক্সিতে মাথা এলিয়ে, মাথার উপরে গাছগুলি হাত নেড়ে-নেড়ে চ'লে যাচ্ছে, তারার ঝাঁক ছুটছে আকাশে। এক্ষুনি আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে—কিন্তু সে যে কাছে নেই সেটা যেন ভালোও লাগছে আবার। কী যন্ত্রণা, কোনো মানুষকে কাছে চাইবার কী যন্ত্রণা! সব সময় তাকে চাই, সর্বস্ব তার চাই, কিন্তু দেহ-বন্দী মানুষ কী দিতে পারে, কতটুকু দিতে পারে!···

ট্যাক্সি-ভাড়া বের করতে গিয়ে হাত ঠেকলো একটা নরম জিনিশে। এতক্ষণে মনে পড়লো! পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো পাতায় ঘেরা চাঁপার কলি একটি—এ-বছরের প্রথম চাঁপা—দেয়া হ'লো না। মুক্তোর মালা কেমন ক'রে দেবে, অল্প আলাপ, কোনো উপলক্ষ্যও নেই। একটি ফুল নিয়ে হাতে দিলে দোষ হ'তো না; পৃথিবীর লোকের চোখে উপহারের মূল্য তো টাকার টিকিটেরই অনুপাতে। ঘরে এসে পকেট থেকে বের ক'রে দেখলো; গ্রীষ্মের ফুল চাঁপা, কঠিন, সহিষ্ণু, অতক্ষণ অন্ধকূপে বাস ক'রেও মলিন হয়নি, বেরিয়ে এসেই তীব্র-মধুর নিশ্বাস ফেললো সুমিত্রর মুখের উপর। 'নাঃ, তার কাছেই পাঠিয়ে দিই তোমাকে!' সুমিত্র দেরাজ খুলে ফুলটি রেখে দিলো ছাইরঙের মোটা খামের মধ্যে, তার অসমাপ্ত চিঠির বুকের কাছে।

'হ্যালো।'

'আপনি সুমিত্র?'

'আমি সুমিত্রবাবু।'

'বাবু আবার কেন?' একটু হাসি।

'আপনি তন্দ্রা?'

'আমি তন্দ্রা। কাল যে এলেন না?'

চুপ।

'কেন এলেন না? ভুলে গিয়েছিলেন?'

'না।'

'তবে?'

সুমিত্র ভেবে পেলো না কী-জবাব দেবে। কবিতা লিখছিলো, ভালো লাগছিলো না কথা বলতে। ইচ্ছে ক'রেই যায়নি—কেননা দেখা হওয়াটা বড়ো সংকীর্ণ, বড়ো পরাধীন। কিন্তু এ-কথা কি বলা যায়?

'হ্যালো? কিছু বলছেন না?'

'যাবো আর-একদিন।'

'একটুও উৎসাহ নেই আপনার কথায় !'

'কী করছেন ?' গলা খুব নিচু।

'কী বললেন ?'

'কী করছেন এখন ?'

'কী করছি ? বেরুচ্ছি এক্ষুনি। আপিশ আছে তো।'

'আপিশ কেন ?'

'বাঃ ! আমি রেডিওতে কাজ করি জানেন না ?'

'সে-কথাই তো জিগেস করছি—কেন করেন।'

'কেন মানে ?'

'আপনার কি জীবিকার অভাব ?'

'কাজ করবার ঐ বুঝি একমাত্র কারণ ?'

'কাজ মানে যদি চাকরি হয়, তাহ'লে তা-ই।'

'আমার এমনিতেই বেশ লাগে। সময় তো কেটে যায়।'

'সময় কাটাবার ওর চেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা নেই আপনার ?'

'বলুন না তু একটা।'

'চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে সুন্দর হ'তে দোষ কী !'

'কী বললেন ?…ব'সে ব'সে শুধু সুন্দর হবো ! Oh. my… !'

তন্দ্রার হাসি শেষ হবার আগেই সুমিত্র টেলিফোন রেখে দিলো। দেখতে পেলো, তন্দ্রা তরতর ক'রে নামছে সিঁড়ি দিয়ে, পরনে স্ল্যাক্‌স্‌, গায়ে একটা অর্ধেক বুক-খোলা শার্ট। আর সে ভাবছিলো তন্দ্রা ব'সে আছে স্নানের পরে পাৎলা শাদা একটি মিলের শাড়ি প'রে, দক্ষিণের বারান্দায়, ক্যামাক স্ট্রিটের সারি-সারি গাছের দিকে তাকিয়ে। তন্দ্রা বাসা নিয়েছে তার দিনে, তার রাত্রে, তার হৃৎস্পন্দনে, তার ছন্দোবন্ধনে: সেই তন্দ্রাকে কেমন ক'রে বাইরে দেখবে সে ? যে-কবিতা এখন সে লিখছে, তাতে ভালোবাসার কথা কিছু নেই, কিন্তু এও তো তন্দ্রার; এই কালো-কালো অক্ষরগুলি তো সেই পথই এঁকে দিচ্ছে, যে-পথে পাওয়া যাবে তার সঙ্গ, অন্তরঙ্গতা, অন্তহীন। এর মধ্যে হঠাৎ টেলিফোন ক'রে তন্দ্রা জানিয়ে দিয়ে গেলো তার রক্তমাংসের সীমা। বাধা পড়লে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে। তন্দ্রাই তন্দ্রার শত্রু।

'চুপ যে ?'

'এমনি।'

'আশ্চর্য আপনার নিঃশব্দ থাকার ক্ষমতা।'

'নাকি?'

'এতক্ষণ না-হয় ভিড় ছিলো, কিন্তু এখন—'

'এখনও আছে ভিড়,' সুমিত্র চোখ তুললো দরজার দিকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তন্দ্রা ব'লে উঠলো, 'কী, নীলোৎপল?'

'রুমালটা বোধহয় ফেলে গেছি,' ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো, নীলোৎপল, পা থেকে গলা পর্যন্ত বিলকুল বিলেতি তার সাজ। লণ্ডনে থাকতে আলাপ, ফিরেছে তন্দ্রার সঙ্গে এক জাহাজে; আফ্রিকা ঘুরে আসতে এত সময় লাগলো যে বন্ধুতা হ'তেই হ'লো।

কুশন উল্টে-পাল্টে রুমাল বেরলো না। 'রুমালে কিছু বাঁধা ছিলো কি?' মৃদুস্বরে বললো সুমিত্র।

'বাঁধা? রুমালে?' যদি কেউ তাকে বলতো যে তার নেকটাইয়ের গেড়ো নিখুঁত হয়নি, তাহ'লেও এত অবাক নীলোৎপল হ'তো না।

'হ্যাঁ, ছিলো।'

'ছিলো? আপনি জানেন?' এই পাংশু নির্জীব কবির মুখে এ-কথা শুনে নীলোৎপল অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করলো। 'বলুন তো কী?'

'হৃদয়।'

তন্দ্রা হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠলো। 'সত্যি? সত্যি, নীলোৎপল?'

নীলোৎপল হাসির সুরেই জবাব দিলো, 'বেশ তো, তাহ'লে তো ভালোই। এখানে যা-ই হারায়, তা-ই ফিরে আসে দ্বিগুণ হ'য়ে।'

তন্দ্রা তক্ষুনি বললো, 'তোমাকে বাবার রুমাল দুখানা এনে দেবো কি?'

নীলোৎপলের চঞ্চল চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো তন্দ্রার মুখের উপর। তারপরেই মনোহর একটু হেসে, 'Don't trouble. চলি,' ব'লেই বেরিয়ে গেলো মাথা উঁচু ক'রে লম্বা পা ফেলে।

সুমিত্র বললো, 'খুব জীবন্ত ছেলেটি।'

'ছেলেটি? ও কি আপনার ছোটো?'

'তা-ই তো লাগে আমার। অনেককেই লাগে।'

'সত্যি কথাটা এই যে কাউকেই আপনার ভালো লাগে না।'

'হ্যাঁ,' সুমিত্র আস্তে-আস্তে বললো, 'আমাকে একটু সাবধানেই থাকতে হয় ও-বিষয়ে; আমার ভালো লাগাটা বড়ো তীব্র।'

* * *

'তীব্র, তীব্র এই ভালো লাগা। মানুষকে ভালোবেসে অভ্যেস নেই আমার : আমি ভালোবাসি ঘাস, আকাশ, রোদ্দুর ; ছবি, গান, কবিতা। যেমন ক'রে একটি কবিতাকে ভালোবাসি, তেমনি ক'রে, তন্দ্রা, তেমনি ক'রে ভালোবাসতে যাই তোমাকে। তুমি জানো না, কিন্তু বার-বার তা ব্যর্থ ক'রে দাও, ব্যর্থ না-ক'রে উপায় নেই তোমার। তুমি কি তোমার দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারো, তুমি কি একটি কবিতা হ'তে পারো, তন্দ্রা ?...'

থেমে-থেমে, ভেবে-ভেবে, একটু-একটু ক'রে সুমিত্র লিখতে লাগলো। কাগজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কলমের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে অবিশ্রাম কর্ষণ, এই তো তার কাজ, তার জীবন, এই তো তার বাঁচা। বাঁচা বলতে আর যা-কিছু বোঝায়, সবই তো এক অলক্ষ্য, অলঙ্ঘ্য শক্তির দাসত্ব : বাধ্য আমরা খেতে, বাধ্য আমরা খাদ্যের ত্যাজ্য অংশকে দেহের অভ্যন্তর থেকে নিষ্কাশিত ক'রে দিতে ; বাধ্য জন্মাতে, জন্ম দিতে, মরতে। বর্বর, বিশৃঙ্খল ঘটনা আমাদের প্রভু ; কাল আমাদের শৃঙ্খল। বেঁচে থাকতে খুব যখন ভালো লাগছে, তখনও সেই বেঁচে-থাকাকেই আমরা ক্ষয় ক'রে যাচ্ছি তিলে-তিলে, পলে-পলে। আর বাঁচতে ভালো যখন লাগে না, তবু মুক্তি নেই, মুহূর্তের বিরতি নেই—কী ভীষণ, কী অসহ্য-ভীষণ সেই ভার ! প্রাণপণে বুকে আঁকড়ে আছি যে-জীবনকে সে-ই ধ্বংস করছে আমাদের। বাঁচি ব'লেই চিরকাল বাঁচতে পারি না আমরা।

তখনই শুধু মুক্তি, যখন আমি লিখি। এখানে আমি স্বাধীন ; কাগজ-কলমের এই ক্লান্তিহীন সংগমে আমারই প্রভুত্ব। সব এখানে আমার কথা মেনে চলে ; আমি ইচ্ছা করি ব'লে সব এখানে ছন্দের অনুগত, সৌন্দর্যের অনুগামী।

...'তোমাকেও,' কলম তুলে নিয়ে সুমিত্র লিখতে লাগলো, 'তোমাকেও এখানেই আমি চাই, তন্দ্রা। যে-তুমি তোমার দেহরূপে আবদ্ধ, সে তো সাময়িক ; যে-তুমি আমার মনের মধ্যে বিকীর্ণ, সেই তুমি চিরন্তন। সেইজন্য, তন্দ্রা, সেইজন্য তোমার সঙ্গে আমার আর দেখাশোনা হওয়া অনর্থক। শুধু অনর্থক নয়, আমার পক্ষে কষ্টকর। আমার হাতে তুমি কবিতা হ'য়ে উঠছো, তুমি কি ভেবেছো আমি তা নষ্ট হ'তে দেবো ? না, তন্দ্রা। আর কখনোই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো না।'

চিঠিখানা শেষ ক'রে, খামে ভ'রে, সুমিত্র রেখে দিলো দেরাজের অন্ধকারে অন্যগুলির পার্শে। এই নিয়ে বারোখানা লেখা হ'লো।

* *

'কেন তুমি বার-বার আমাকে ডেকে পাঠাও ?'

'তুমি কি রাগ করো সে-জন্য ?'

'ভালো লাগে না আমার। কী চাও, কী চাও তুমি আমার কাছে ?'

'কী চাই তা বলা কি সহজ !'

'শোনো তন্দ্রা, তুমি ভুল করছো—'

'না, না, ও-কথা বোলো না। ভুল আমি করিনি। আমি ছেলেমানুষ নই; অনেক দেখেছি, অনেকের সঙ্গে মিশেছি।—সুমিত্র !'

'অমন ক'রে ডেকো না তুমি আমাকে !'

'কেন ?'

'আমি বারণ করছি।'

'তুমি আমাকে বারণ করবার কে ?'

'মনে হচ্ছে এতদিনে সময় হয়েছে তোমার সঙ্গে কথা বলবার।'

'বলো।'

'সইতে পারবে ?'

'আমি কি ভয় করি, ভেবেছো।'

'আমি যা চাই, তুমি কি তা দিতে পারো ?'

'পারি না ?'

'কী দিতে পারো, শুনি ?'

'কী না পারি ? সব, সব...'

'তাতে কি মিটবে এই তৃষ্ণা ? দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে, হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে আমি তোমাকে চাই—এ-চাওয়া কেমন, তা কি তুমি জানো ?'

'যদি না জানতাম, তবে তো বাঁচতাম।'

'না, তুমি জানো না—তুমি জানো না—'

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তন্দ্রা তার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'খুব চিন্তিত ?'

চমকে কেঁপে উঠলো সুমিত্র, একটু বেশিই চমকালো। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তন্দ্রার দিকে, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

তন্দ্রা ব'সে বললো, 'কী ভাবছিলেন ?'

'কিছু না।'

'সে কে ?'

ক্ষীণ হাসলো সুমিত্র।

'অমন আত্মহারা হ'য়ে যার কথা ভাবছিলেন সেই মানুষটি কে শুনি না ?'

'না, কেউ না।' সুমিত্র গম্ভীর।

'ঠিক বললেন না। ...কিন্তু আমার কাছে ঠিক কথা বলবেনই বা কেন।'

কিছু না-ব'লে সুমিত্র চোখ তুলে তাকালো। তন্দ্রা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে হঠাৎ হেসে ফেলে বললো, 'কী?'

'এক-এক সময় আমার মনে হয় আপনি আপনি নন, অন্য-কেউ।'

'আমি তো সেই অন্য-কেউ নই,' তন্দ্রা হাসতে-হাসতেই জবাব দিলো, 'তাহ'লে কি আর আমার বাড়িতে আমার কাছে এসে আমাকে দেখে অমন চমকাতেন!'

'আজ আপনার ড্রয়িংরুম ফাঁকা যে?'

একটু দেরি ক'রে উত্তর এলো—'ফাঁকা আর কোথায়।' প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বললো, 'সেদিন আমাদের ষ্টিমার-পার্টিতে এলেন না তো কিছুতেই!'

সুমিত্র চুপ।

'এর আগেও যেদিন চাঁদের আলোয় ব্যারাকপুর গেলাম আমরা, আপনি পালিয়ে গেলেন। কেন আপনি এ-রকম করেন?'

'সত্যি? কেন আমি এ-রকম?'

'গেলে ভালোই লাগতো আপনার। ব্ল্যাক-আউটে জ্যোছনা খুব খোলে।'

'যতটা ভালো ভাবি, ততটা ভালো কিছুই কি হ'য়ে ওঠে?'

'ও-রকম ভাবলে আর বেঁচে থাকা কেন।'

'তা-ই তো!' একটু পরে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুমিত্র বললো, 'মেঘ করেছে। কালবৈশাখী উঠলো।'

রাস্তার ডালপালার আকুলতা মৃদু মর্মরে পৌঁছলো তেতলার ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে। তন্দ্রা গুনগুন ক'রে বললো, 'যদিও আপনি দু বার দুঃখ দিয়েছেন, তবু আবার বলি। সামনের শনিবার চেকদের উৎসবে যাবেন?'

'ও-সব আমার ভালো লাগে না, তন্দ্রা দেবী।'

'কিন্তু আপনি না-গেলে আমার যে ভালো লাগে না, সে-কথা একবার ভাবেন?'

সুমিত্রর মুখ পাথরের মতো হ'য়ে গেলো।

তন্দ্রা আবার বললো, 'কিছুই কি ভালো লাগে না আপনার? কিছুই না? কাউকেই না।...কত আর চুপ ক'রে থাকবেন—কিছু বলুন, কিছু বলুন!'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সুমিত্র, এত হঠাৎ যে তার চুল কপালে প'ড়ে নেচে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে তন্দ্রাও উঠে এলো, দাঁড়ালো কাছে, খুব কাছে, মুখোমুখি। চোখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'সুমিত্র!'

কেঁপে উঠলো সুমিত্রর ঠোঁটের প্রান্ত।

'বলো এবার, ভালো লাগে না?'

স্তব্ধ হ'য়ে রইলো সুমিত্র দুটি কালো চোখের মধ্যে তাকিয়ে। তারপর স'রে এসে আস্তে বললো, 'আমি যাই।'

'না—না—'

কিন্তু তন্দ্রা বাধা দিতে পারলো না; নেমে গেলো সুমিত্র সিঁড়ি দিয়ে। রাস্তায় ঝড়, উড়ে-আসা কাঁকর, ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি। কাছের তন্দ্রা তো একটুখানি; দূরে এলেই তার আর অন্ত নেই। ছড়িয়ে পড়ে মেঘে, জড়িয়ে ধরে হাওয়ায়, বৃষ্টি হ'য়ে ঝরে। আনন্দে সুমিত্রর চোখে জল এলো।

* * *

...'আমি বাসা নিয়েছি একটি দেহের মধ্যে; বিশ্বের কতটুকু আমার প্রাপ্য, তার বরাদ্দ বেঁধে দিয়েছে কয়েকটি ক্ষীণ ইন্দ্রিয়। মাথা খুঁড়ে মরলেও র‍্যাশনের বাইরে একটি ফোঁটা পাওয়া যাবে না। সেইজন্য, যত প্রবল আমাদের চাওয়া, তত তীব্র আমাদের ব্যর্থতা। ঔদরিক সারা দিন ধ'রে খেতে পারে না, কামুকের কার্মুক থেকে-থেকে শিথিল হ'য়ে আসে।...কিন্তু অন্য-এক জগৎ আছে, অন্য-এক জীবন। তারই দূত আমাদের ইন্দ্রিয়, তারই স্মৃতি বস্তু। স্মৃতিকেই আমরা সত্য ব'লে ভুল করি, দূতকেই সিংহাসনে বসাই; এমন-কিছু তাই পেতেই পারি না, পাওয়ামাত্র যাকে হারাতে না হয়। পেয়েছি ব'লেই হারাবার চাইতে পাবার জন্যেই হারানো তো ভালো?...তন্দ্রা, তোমাকে আমি বাস্তব দিয়ে বাঁধবো না।...'

'হ্যালো।'

'তুমি?'

'তুমি। এত রাত্রে!'

'ঘুম আসছে না। কী ভাগ্য তুমিও জেগে আছো!'

'ঘুম আসছে না কেন?'

'কেন! তুমি জিগেস করছো, কেন!'

'সন্ধেবেলা কী করলেন?

'করলেন কেন আবার!'

'অভ্যাস—কিংবা অনভ্যাস।'

'আমার তো মনে হচ্ছে চিরকাল তোমাকে—তখন ভিজেছিলে?'

'ভিজেছিলাম একটু। ভালো লাগছিলো। কী করলে সন্ধেবেলায়?'

'বাড়িতেই ছিলাম। মনে হচ্ছিলো—মনে হচ্ছিলো—'

'থাক, বোলো না।'

'তোমার মনে হচ্ছিলো না ফিরে যাই ?'

'কিন্তু ফেরবার পরেও আবার তো ফিরতে হ'তো।'

তন্দ্রা পাঁচ-ছ সেকণ্ড চুপ ক'রে রইলো।

'তন্দ্রা—'

'কী পরিষ্কার আসছে তোমার গলা! কী সুন্দর!'

* *

'কী? হয়েছে কী তোমার?'

'কিছু তো হয়নি।'

'কিছু তো হয়নি! তুমি কী!'

'তুমি-যে রোজ রাত্রে টেলিফোন করো সেটা খুব ভালো লাগে।'

'তুমি এলে কি করতাম না!'

একটু চুপ ক'রে থেকে সুমিত্র বললো, 'তোমাকে দেখতে গিয়ে তোমাকে তো দেখতে পাই না—'

'তুমি যা চাও তা-ই হবে, সুমিত্র—আর-কেউ থাকবে না—'

'না, আমি তা বলিনি।'

'তবে কী বলেছো তুমি! কী বলছো তুমি! আজ তিন দিন তুমি আসো না—আমি কি ম'রে যাবো!'

'তন্দ্রা, লক্ষ্মী মেয়ে—'

'চুপ করো তুমি!...সত্যিই চুপ করলে যে! শুনছো?'

'বলো।'

'এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে।'

'কাণ্ড?'

'কাল বলবো। —কখন আসবে?'

'দেখি। ...কী? কথা বলবে না আর? রাগ?'

'সুমিত্র, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তোমাকে আমার আজ দরকার, আর...'

'ভেবো না, ভেবো না। ঘুমোও।'

* * *

'...তোমাকে আমি যত দেখতে চাই, আমার দুই চোখ তত দেখতে পারে না। যত শুনতে চাই তোমার কণ্ঠ, আমার কানের কি এতই শক্তি যে তা শুনবো! যত স্পর্শ চাই

তোমার, তা পাবো না কিছুতেই, শরীরের সমস্ত সীমা চুরমার ক'রে ফেললেও না। তবে কেন, তবে কেন—'

তবে কেন—কী ? ভাষা এত অল্প, এত দুর্বল ! কাগজ থেকে চোখ তুলে সুমিত্র ভাবতে লাগলো, চোখ আবার নামাতেই মনে হ'লো কাগজে যেন সবুজ একটা আভা পড়েছে, তার কলমের চিক্কণ-কালো শরীরে লাল একটি রেখার ঝিলিমিলি। তাকিয়ে দেখলো—তন্দ্রা। লম্বা, লাল পাড়ের কচিপাতা রঙের শাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধ ঘরটিতে রঙের ঘণ্টা বাজিয়ে।

'চিনতে পারছো না আমাকে ?'

'এই দুপুরবেলা। রোদ্দুরে !' লেখাটায় বই চাপা দিয়ে সুমিত্র উঠে দাঁড়ালো।

'আর থাকতে পারলাম না আমি—তুমি তো আর যাবে না—' তন্দ্রা ঘরের চারদিকে তাকালো। 'একটু জল খাওয়াও।'

'বোসো,' দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ডিভানটির দিকে এক পলক তাকিয়ে সুমিত্র জল নিয়ে এলো কুঁজো থেকে।

তন্দ্রা একবার তাকালো কাচের গ্লাশের উজ্জ্বল জলের দিকে, একবার সুমিত্রর মুখে; জল খেতে-খেতে আস্তে-আস্তে বললো, 'কী ঠাণ্ডা জল ! ...কী ঠাণ্ডা ঘরটি ! ...কী ঠাণ্ডা তুমি !'

একটু হেসে সুমিত্র বললো, 'তুমিও খুব ঠাণ্ডা। শাদা শাপলার সবুজ পাপড়ি, লাল শাপলার শাদা...,' একটু থেমে, একই রকম সুরে আবার বললো, 'কত কষ্ট হ'লো আসতে! দুপুরবেলা গাড়িতে যা গরম !'

নিশ্বাস পড়লো তন্দ্রার—'তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে ?'

'থাকি না। একটু দেখি।'

জলের গেলাশে চোখ নামিয়ে তন্দ্রা বললো, 'একেবারে নিঃশব্দ বাড়ি ! কেউ নেই ?'

'আমি আছি।'

'আর ?'

'শুধুই আমি।'

'একেবারে একা ?'

'সত্যি। কী ক'রে ছিলাম এ-ক'দিন তোমাকে না-দেখে।' ব'লে সুমিত্র পাশে এসে বসলো।

তন্দ্রা একটু স'রে গেলো, একটু তাকিয়ে রইলো। তারপর :

'শোনো, যে-কথা বলতে এসেছি।'

সুমিত্র একটু হেসে বললো, 'নীলোৎপল তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে ?'

'কী ক'রে জানলে ?'

'এটা জানবার জন্য দৈবজ্ঞ হ'তে হয় না।'

'তুমি এটা জেনেও—বুঝতে পেরেও—' কথা শেষ করতে পারলো না তন্দ্রা ; তার সজ্জার রং ছাপিয়ে উঠলো লজ্জার লাল।

'এতে আর কী আছে, এতো স্বাভাবিক। একসঙ্গে দশজন যে চাচ্ছে না তাতেই আবাক হচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত তুমি! এত সহজে বলতে পারলে কথাটা!'

'তন্দ্রা, তোমাকে দেখে যদি প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের বুকে দীর্ঘশ্বাস না উঠলো—আহা, আগে কেন দেখা হলো না—তাহ'লে আর তুমি কী!'

'ভালো লাগে না এ-সব ঠাট্টা', তন্দ্রা গম্ভীর হ'য়ে গেলো। 'মনে-মনে আমি তো নিজেকে একজনের স্ত্রী ব'লেই ভাবি আজকাল।'

সুমিত্রর চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হ'লো। আবার তাকালো যখন, সে-চোখে যেন কতকালের বিষাদ। তন্দ্রা তা লক্ষ্য করলো না, আপন ঝোঁকে ব'লে চললো, 'নীলোৎপল তবু নাছোড়। আমার বাবাকে দাঁড় করিয়েছে তার ব্যারিস্টর। অবস্থাটা উপভোগ্য নয়। তোমার আর দেরি করা চলবে না।'

জলের উপরে আলোর মতো হাসি দেখা দিলো সুমিত্রর চোখের বিষণ্ণতায়। 'না, দেরি আমি করবো না', বলে সে মাথা নিচু ক'রে হাত চালিয়ে দিলো চুলের মধ্যে। তার বড়ো-বড়ো বিপর্যস্ত চুলের দিকে তৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তন্দ্রা। একটু পরে বললো, 'কী লিখছিলে আমি যখন এলাম ?'

'কী যেন, এখন আর মনে নেই।'

'বাধা দিলাম তোমার কাজে। বেশ করেছি—আরো বাধা দেবো।'

'তাতে কারো কোনো ক্ষতি নেই—আমার লেখা তো কেউ পড়ে না। এমনকি চিঠি লিখেও আমি নিজের কাছেই রেখে দিই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, খুব না-হয় ভালোই লেখো মানলুম, কিন্তু তোমার লেখা কি তোমার মতো ভালো ?'

সুমিত্র চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো চুপ করে।—'কী ?' আর কিছু না ব'লে তন্দ্রা একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে একখানা হাত আলগোছে ছুঁইয়ে গেলো সুমিত্রর চুলের উপর। যেন স্বপ্নের মধ্যে সুমিত্র দেখলো একটি মুখ, দুটি ঠোঁট ইচ্ছায় আরক্তিম, দুটি চোখে বিস্মৃতির অন্ধকার, স্বপ্নের মতো মুখ, স্বর্গের মতো বুক,

স্বর্গের ছায়াপথের মতো বাহু। ছড়িয়ে পড়লো গ্রহতারার গান তার রক্তে, তার যৌবনে, সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না; তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো কালো চোখ দুটি বুজে এলো, ঠোঁট গেলো খুলে, গলা যেখানে বুকের সঙ্গে মিশেছে সেখানটা কাঁপতে লাগলো বার-বার, আর বুকের কাছে ঢেউ উঠলো কচিপাতা রঙের শাড়িতে।...জীবন, তুমি এত পারো, তোমার এত আছে!...কিন্তু কতটুকু? কতক্ষণ? কয়েক মুহূর্ত, কয়েক দিন, কয়েক বছর! একটি মাত্র জীবন! দেহ ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই? স্পর্শ ছাড়া আর-কোনো ভাষা নেই? প্রতিমা ছাড়া পূজা হবে না কোনোদিন? যে-দেহ পথ, সেই দেহই বাধা; যেটা আমন্ত্রণ, সেটাই আচ্ছাদন; তার সঙ্গ তার অন্তরায়, তার অঙ্গ তার অন্তরাল। এত বড়ো চাওয়া যদি জাগলো, তার উত্তরে নাকি এত বড়ো বঞ্চনা!... না, কিছুতেই না। কিছুতেই হার মানবো না আমি।

হঠাৎ মেঝেতে হাত বাড়িয়ে সুমিত্র বললো, 'এই যে, তোমার হাত-ব্যাগটা প'ড়ে গেছে।'

তন্দ্রা স্তব্ধ হ'য়ে রইলো দীর্ঘ একটি মুহূর্ত, তারপর ব্যাগ খুলে একটু প্রসাধন সেরে নিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভাঙা-ভাঙা গলায় বললো 'চলি এখন। সন্ধেবেলা এসো।'

তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে উপরে এসে সুমিত্র ডাকলো, 'মহেশ! মহেশ!',

দিবানিদ্রা থেকে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে মহেশ চোখ মুছতে-মুছতে ঘরে এলো।

'জিনিশপত্র গুছিয়ে নাও।'

'আজ্ঞে?'

'বাক্স-বিছানা বেঁধে নাও। আজ আমরা যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে?'

'আজ আমরা যাচ্ছি। বাইরে যাচ্ছি—পাহাড়ে।'

'আজই?'

'আজই। সন্ধেবেলা গাড়ি।'

* * * *

টেলিফোনের চেষ্টা ক'রে-ক'রে তন্দ্রা যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, তখন সুমিত্রকে নিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেস পাড়ি দিচ্ছে রাত্তির। কামরায় রাত-আলো জ্বলছে, সুমিত্র ব'সে আছে জানলার ধারে। লক্ষ তারা চলেছে তার সঙ্গে, তবু আরো আছে, আড় হ'য়ে আকাশে উঠলো কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, তার আলোয় ফেনিল হ'লো অন্ধকারের সমুদ্র। একটা কষ্ট, একটা চাপা, বোবা, বুক-ভাঙা কষ্ট, ভুলতে পারছিলো না কিছুতেই। হাওড়ার পুল পার হ'তে-হ'তে, প্ল্যাটফরমে ঢুকতে-ঢুকতে, গাড়িতে উঠতে-উঠতেও মনে হয়েছে— না, পারবো না, ফিরে যাই। সত্যি যখন চলতে লাগলো গাড়ি, স্টেশন ছাড়িয়ে গেলো, লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে

করেছে দু তিন বার। কোথায় যাচ্ছে—কোন অন্ধকারে, কোন শূন্যতায় ? তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না, তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমি বাঁচবো না। বর্ধমানে নেমে থাকবে—নিশ্চয়ই !—কিন্তু বর্ধমান তো আর আসে না।

বর্ধমান এলো···আসানসোল···রানিগঞ্জ···বাংলাদেশ প'ড়ে রইলো পিছনে। রাত বাড়লো ; গতি বাড়লো গাড়ির ; বাইরের অন্ধকারে কে ছুটছে গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে তারায়-তারায় চুল উড়িয়ে দিয়ে ? তন্দ্রা, তন্দ্রা !···কী ভাবছে সে ? কী ? গাড়ির চাকার এই ভীষণ রুদ্ধশ্বাস আবেগ কার জন্য ; কোন হাওয়াকে ছাড়িয়ে যাবে ব'লে তার এই উদ্দামতা, যত যায় ততই জেগে ওঠে হাওয়া—শেষ নেই, শেষ নেই তার। তুমি এই হাওয়া, এই রাত্রি, এই তারা-ভরা আকাশ : তোমাকে তো আমি নিয়েই চলেছি সঙ্গে ক'রে, বুকের মধ্যে ভ'রে—তন্দ্রা, আর কি তোমাকে আমি হারাতে পারি !···গাড়ির জানলায় মাথা রেখে অফুরন্ত রাত্রির স্পর্শহীন রোমাঞ্চে সে আচ্ছন্ন হ'লো, ঘুমের মতো শান্তি নামলো মনে, ঠোঁটে ফুটলো হাসি। বোজা চোখের অন্ধকার আলো ক'রে তন্দ্রা এসে দাঁড়ালো—দুপুরবেলায় যেমন দেখেছিলো ঠিক তেমনি, সেই কচিপাতা রঙের শাড়ি, ভিজে-ভিজে চোখ, কাঁপা-কাঁপা বুক, কিন্তু স্তব্ধ, অধৈর্যহীন, বাঁচা থেকে মুক্ত, বাধ্যতা থেকে বিচ্যুত, চিরন্তন। সুমিত্র দেখতে লাগলো, দেখতে-দেখতে যেন আনন্দে গ'লে গেলো, মিশে গেলো তন্দ্রার সঙ্গে, ঘুমে ঢ'লে পড়লো বিছানায়। এতক্ষণে, এতক্ষণে সে আমার !···বাস্তব, প্রবঞ্চক, আমাকে ফাঁকি দিতে তুমি পারলে না।

চিত্রকলা

কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত না করেও বলা যায়, চিত্রশিল্পটা বাংলাদেশে জড়োয়া গয়নার মতো বড়লোকের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালেভদ্রে কলকাতা-সহরের প্রদর্শনী-উৎসবে চিত্রশিল্পীদের সাধনা প্রকাশ্য আলোকে এসে দাঁড়ায়। তাছাড়া সেসব প্রদর্শনীও রাজারাজড়া, আমীর-ওমরাহের খেয়ালের উপরই নির্ভরশীল, ক্বচিৎ দু-একজন দুর্দ্দমনীয় শিল্পী তাঁদের একক প্রচেষ্টার ফল দর্শকের কাছে উপস্থিত করতে চান। কিন্তু দর্শক কোথায়? রাজারাজড়ারাই তাঁদের প্রভূত অবকাশের খানিকটা মূল্যবান অংশ খরচ করে প্রদর্শনী-গৃহকে মূল্যবান করে তোলেন এবং তাঁদের এ সৌখীনতায় ঘাটতি পড়লে প্রদর্শনী ব্যর্থ হয়ে যায়। ধন এবং মান এই উভয় দিক থেকেই ব্যর্থ। প্রদর্শনী-গৃহের প্রাচীর-লগ্ন ছবিগুলো তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে—দর্শকের বা ক্রেতার দৃষ্টি বা প্রসাদ লাভে ধন্য হতে পারেনা। এ অবস্থাটাকে সোজা ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, আমরা বলতে বাধ্য যে চিত্রশিল্পের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এবং আগ্রহ তৈরী করবার কোনোরকম সুযোগও নেই। 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস' গত এগারো বছর ধরে চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছেন—কিন্তু তাঁদের এ-চেষ্টা জনসাধারণের মনে চিত্রশিল্পসম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহল বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। যাঁরা প্রদর্শনীগৃহে পদার্পণ করেন বা ছবি কিনে নিয়ে যান তাঁরা অতি পরিচিত একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীরই অন্তর্ভুক্ত। দৈবাৎ মিসেস কেজীর মতো কোনো বিদেশীর আবির্ভাবে কোনো কোনো শিল্পীর বরাত খুলে যায়।

চিত্র-শিল্পের প্রতি জনসাধারণের এই আগ্রহের অভাব দূর করবার কোনো সহজ পথ নেই। পথের কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই মনে হবে, আজকের দিনে বাংলার চিত্রশিল্প সমঝদারদের যে অপরিসর বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছে তা থেকে প্রথমে তার উদ্ধার পাওয়া চাই। চিত্রপ্রদর্শনী বলতে যে রেকারিং ডেসিমেলের আইনে পাওয়া একটি অঙ্কের মতো বারবার একই রকম ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়ে চলবে—এই ক্লান্তিকর অবস্থাটা দূর করবার অভিপ্রায়েই হয়ত কতিপয় শিল্পী গত ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ কলকাতায় একটি নূতন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। 'নেশন্যাল একাডেমি অব ফাইন আর্টস এণ্ড কালচার' নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী করবার সঙ্কল্প তাঁদের আছে। যদি তা স্থায়ী হয়, তাহলে আর কিছু না হোক, বাংলা চিত্রশিল্প কক্ষান্তরে বিচরণ করবার সুযোগ লাভ করবে, একই কক্ষের রুদ্ধবাতাসে বছরের পর বছর নিশ্বাস নিয়ে তাকে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌তে হবেনা। 'নেশন্যাল একাডেমি'র ব্যবস্থাপকরা প্রথম 'বরফ ভাঙা'র কাজটি করে দিলেন—বৈদিক ইন্দ্রের মতো বৃত্রহননের কাজ—তারপর জলস্রোত অবাধে বয়ে যেতে পারে। জনসাধারণ অসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে এখন ব্যবহার করতে পারে সে জলপ্রবাহ। এখন সবটুকুই জনসাধারণের রুচি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করবে।

চিত্রশিল্পশিক্ষায় জনসাধারণের আগ্রহ কোনোদিনই ইংরেজী শিক্ষার মতো উগ্র হয়ে উঠবেনা

—জানি, কারণ তাতে জীবিকার ইসারা নেই। কিন্তু-খাওয়া-পরা নিদ্রার বাইরে জনসাধারণের জীবন প্রসারিত নয় বলেই ত আজ চারদিকে জনজাগরণের ধ্বনি! খাওয়া-পরা-নিদ্রার বাইরে সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি এখন থেকেই তাদের খানিকটা উৎসুক হতে ক্ষতি কি? চিত্রশিল্পকে বুঝবার এবং বুঝে আনন্দ পাবার শিক্ষাটা জীবনের পক্ষে নেহাৎ অবান্তর নয়। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলা চিত্রশিল্পে যে একটি নূতন ধারা ও প্রেরণা জেগে উঠল তা আজ কতো বিচিত্র, কতো বিস্তৃত! বাংলার এই সাংস্কৃতিক সাধনা উপলব্ধি করে বাঙালী জনসাধারণ কি একটু আনন্দ, একটু তৃপ্তি পেতে পারে না?

এ-যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা জল-রং তৈল-রং-এর মাধ্যমে যে পাশ্চাত্য পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেই নিরস্ত হয়েছেন তা নয়, বিশিষ্ট মানসিকতার রঙে তাঁদের ও-পদ্ধতির ছবিগুলো একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁরা যে শুধু অনুকরণই করতে পারেন, রূপকরণ করতে পারেন না; প্রদর্শনী দেখে তথাকথিত বহু চিত্র-সমালোচকেরই এ-ভুল ভেঙে যাবে। মাধ্যমগত বর্ণচ্ছটার স্বাভাবিক ও ঐতিহ্যগত প্রকাশকে ভিন্ন ধারায় ব্যক্ত করার মধ্যে আমরা শিল্পীদের নূতন পথন্বেষী মনেরই সন্ধান পাই। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও ঐশ্বর্য্য যথাযথ ব্যক্ত করার সুযোগ তৈল-রং-এ প্রবল—প্রাচীন তৈলচিত্রগুলো তার প্রামাণ বহন করে, কুর্টল্যারিশের তিনটি ছবিতে (একাডেমি অব্ ফাইন্ আর্টস্) এ-কথা চোখে আঙুল দিয়ে নূতন করে আবার আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আনওয়ারুল হকের 'ভেজা দিন' (নেশন্যাল একাডেমি) এবং কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যের 'বাদলের শেষে'র (একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্) তৈল-রং এম্নি একটি জলসিক্ত নিষ্প্রভতা সৃষ্টি করেছে যা শুধু অভিনব নয়, অপূর্ব্ব। আবার ঠিক তেম্নি রণেন আয়ান দত্তের 'লামা' (নেশন্যাল একাডেমি) জল-রং-এর অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলেছে। তাছাড়া জল-রং-এ প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape) অঙ্কণে ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্য পদ্ধতি ব্যবহারমাত্র করে নিজেদের বিশিষ্ট অনুভূতি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। জয়নুল আবেদীনের 'নীরব ত্রয়ী' (নেশন্যাল একাডেমি) এবং রাজ জি, ডি, পালের 'কোডাইকেনেলের রাস্তা' (একাডেমি অব্ ফাইন্ আর্টস্) শুধু তিনটি গাছ আর একটি গ্রাম্য রাস্তার অবিকল প্রতিকৃতিই নয়—নিঃসঙ্গ তিনটি গাছ বা একটি গ্রাম্য রাস্তা হঠাৎ আমাদের চোখে পড়লে অনুভূতি যেমন নিবিড় হয়ে ওঠে, অনুভূতির ঠিক তেম্নি নিবিড়তা বুলিয়ে বুলিয়ে যেন ছবিগুলো আঁকা হয়েছে—তাতে প্রয়াস নেই, আয়াস নেই, গভীরতার যদি কিছু বর্ণ থাকে-শুধু তা-ই আছে। দুঃখের বিষয় 'একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্' রাজ জি, ডি, পালের ছবিগুলো ছবির ভীড়ে কোণঠাসা করে প্রদর্শিত করেছেন, হয়ত ছবিগুলো তাঁদের চিত্রবিচারের মাপকাঠি বেশি দূর স্পর্শ করতে পারে নি কিন্তু বিচারকদের মনে রাখা উচিৎ, বিচারের ধরাবাঁধা পদ্ধতিরও পটপরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। অঙ্কণ পদ্ধতির বাঁধাধরা গৎ দিয়েই যে চিত্রশিল্পের অন্তর্গত সবটুকু সুর ফুটে উঠবে তার কি মানে আছে—একটি ছবির মধ্যে যদি শিল্পীর অনুভবকেই খুঁজে না পাওয়া গেল তা হলে তার শুষ্ক কাঠামোর কারিকুরি নিয়ে আমাদের দরকার নেই। চিত্রশিল্পের পেশাদার সমালোচকরা ছবির ব্যাকরণে আকণ্ঠ ডুবে থাকুন, শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা ব্যাকরণের বহু উর্দ্ধে।

সাম্প্রতিক কালের চিত্রশিল্পীরা জলরং এবং তৈলরং-এর চিত্রেই অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন, কাজেই ওধরণের চিত্র সম্বন্ধেই একটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আলোচিত হ'ল।

সাময়িক সাহিত্য

উপন্যাস

অভিযান—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ। দাম—৪৷৷০

ঝড় ও ঝরাপাতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : বসুমতী সাহিত্য মন্দির। দাম—২৷৷০

আধুনিক বাংলাসাহিত্য বল্‌তে সাধারণত আমরা যে পর্য্যায়টিকে বুঝি, সেখানটায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, মাত্র কয়েক বছরে এতগুলো উপন্যাস রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে যে বাঙালী পাঠকমাত্রই বাঙলা সাহিত্যের প্রাচুর্য্যে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌তে পারেন। উপন্যাসের সংখ্যাই যে শুধু দিন দিন বেড়ে চলেছে তাই নয়, আমরা নতুন নতুন উপন্যাসকারের সঙ্গেও প্রত্যহ পরিচিত হচ্ছি, এবং আশার কথা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মোটামুটি ভালো উপন্যাস রচনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা জিনিস সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দু' একটা রচনায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েই আশ্চর্য্যরকম ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ছেন, আর যাঁরা একেবারে স্তিমিত না হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে 'যেতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা শুধু পূর্ব্বতন প্রতিভার হতাশাব্যঞ্জক পরিণতির ইঙ্গিতই দিচ্ছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস দুইটি পড়তে বসে বিশেষ করে এই কথাটি মনে পড়্‌লো এইজন্যে যে আজকাল যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র তারাশঙ্করবাবুর নামই উল্লেখ করা চলে যিনি ক্রমাগত লিখেও কখনও খারাপ কিছু লিখে মুগ্ধ পাঠক-সাধারণকে ঠকানোর চেষ্টা করেন নি। তাছাড়া, আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কয়েক দশক পূর্ব্বে যে কয়েকজন উপন্যাস রচয়িতা একযোগে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে এসে তাঁদের প্রচুর সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়ে সাহিত্যরসরসিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই তারাশঙ্কর অন্যতম। তারপর খুব বেশীদিন অতিক্রম করে নি, অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেখতে হচ্ছে, তারাশঙ্কর এবং অচিন্ত্যকুমার ছাড়া প্রায় সকলেই সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, আর যদি কেউ নিতান্তই কালেভদ্রে দু' একটি উপন্যাস আমাদের উপহার দেন, তাঁদের প্রাক্তন প্রতিভার বিন্দুমাত্র আভাসও তাতে পাওয়া যায় না। এই দুই দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে, বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান কোথায়, এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি কোন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে যাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি 'সন্দীপন পাঠশালা' আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার' মত সুবৃহৎ উপন্যাস, তিনিই যখন আবার খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে 'অভিযানে'র মত বিরাট ও সার্থক উপন্যাস এবং একান্ত সাম্প্রতিক কালের বিপ্লবাত্মক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস 'ঝড় ও ঝরাপাতা' আমাদের এনে উপহার দেন, তখন, বুঝতে বাকী থাকে না যে, সাহিত্যিক সত্তা তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে যেতে পেরেছে বলেই, সাহিত্যরচনায় এমন নিষ্ঠা থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

'অভিযান'-এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, তারাশঙ্কর তাঁর 'কালিন্দী' 'ধাত্রীদেবতা' বা 'গণদেবতা'য় যে দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই সঙ্গে ভাষার প্রাখর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, 'সন্দীপন পাঠশালা' থেকে যেমন তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, তেমনি বদলেছে তাঁর রচনাশৈলী। তাঁর অর্থ এই নয় যে 'সন্দীপন পাঠশালা' থেকে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ধীরে ধীরে ঢালুপথে নেমে চলেছে। তা নয়, বরং বলা চলে, ভিন্নপথে তিনি নতুন করে তাঁর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিতে সুরু করেছেন। কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। পূর্ব্বোক্ত বইগুলো যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, তারাশঙ্করই প্রথম পতনশীল জমিদারশ্রেণীর মর্ম্মান্তিক পরিণতির সত্যিকারের ছবি বাংলার সাহিত্যপটে এঁকেছিলেন, যে জমিদারকুলের ঐতিহ্য আজ অবলুপ্তপ্রায় আর যাদের ইতিহাস আজ কাহিনীর পর্য্যায়ভুক্ত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভারসাম্য রেখে সে রচনার ভাষা ও রীতিও ছিলো কঠিন ও ধ্রুপদী। অথচ তিনিই যখন আবার লিখলেন 'সন্দীপন পাঠশালা' তখন আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় সেই দুর্দ্ধর্ষ জমিদারকুল, কোথায় সেই ভাষার উদ্দামতা। এখানে কাহিনীর নায়ক গ্রাম্য পাঠশালার এক দরিদ্র মাষ্টার, যার আশা ছিলো অনেক, আদর্শ ছিল বিরাট, অথচ যে নির্ম্মমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে; আর ভাষা ও রচনারীতিও তেমনি কোমল করুণ, যেন উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ নয়, গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে শুধু হেটে চলা।

বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুইটি ধারা সম্বন্ধে যদি সম্যক পরিচয় থাকে, তা হলে 'অভিযানে' লেখকের বিশেষত্ব ও সার্থকতাটুকু ধরতে পারা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। কারণ, যে দুইটি ধারার কথা এখানে উল্লেখ করেছি, এ উপন্যাসে লেখক সেই দুই ধারার সমন্বয় সাধন করেছেন অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে। এ উপন্যাসের নায়ক ট্যাক্সী ড্রাইভার নরসিং—সে আজ দশটি সাধারণ লোকের মতই একজন, কিন্তু এইটুকুতেই তার সবটুকু পরিচয় নয়। তার আসল পরিচয় হচ্ছে সে গিরিব্রজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিধারী সিং-এর উত্তরপুরুষ, যার বীরত্বকাহিনীর স্মৃতি মাঝে মাঝে নরসিং-এর রক্তকে চঞ্চল করে তোলে। গিরিধারীর বংশ তাদের সমস্ত প্রতাপ প্রতিপত্তি হারিয়ে যে অবস্থায় নেমে এসেছে তার অন্যতম সাক্ষী এই ড্রাইভার নরসিং। নরসিংকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের সব, তথাপি, তার স্মৃতিকে মন্থন করে, তার পূর্ব্বপুরুষের যে ক্রমপরিবর্ত্তনের ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে বারে বারে সেই 'কালিন্দী' আর 'ধাত্রীদেবতার' তারাশঙ্করের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু যখন নরসিং-এর সুখেদুঃখে-ভরা একক জীবনের বিবর্ত্তনধারা প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তখন আমাদের মনে পড়ে 'সন্দীপন পাঠশালা'র কথা। ছোটো ছোটো ব্যথা-বেদনা, ছোটো ছোটো আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নরসিং-এর জীবন—সেখানে প্রিয়জন নিতাই-এর বিশ্বাসঘাতকতা আছে, আর আছে মুগ্ধ শিশু চিরসহচর রাম। মৃত স্ত্রী জানকীকে ভুলতে পারে না, অথচ নীলিমা আর ফটুকীর সাহচর্য্যে এসে নরসিং-এর কামাতুর হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে।

পরবর্ত্তীকালের রচনায় তারাশঙ্কর যে নতুন পথে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, আশা করি যে কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তা তাঁর বাস্তববোধেরই ফল। আমার এ কথা থেকে যদি কেউ মনে করে থাকেন আমি এই বলতে চাইছি যে, তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির,
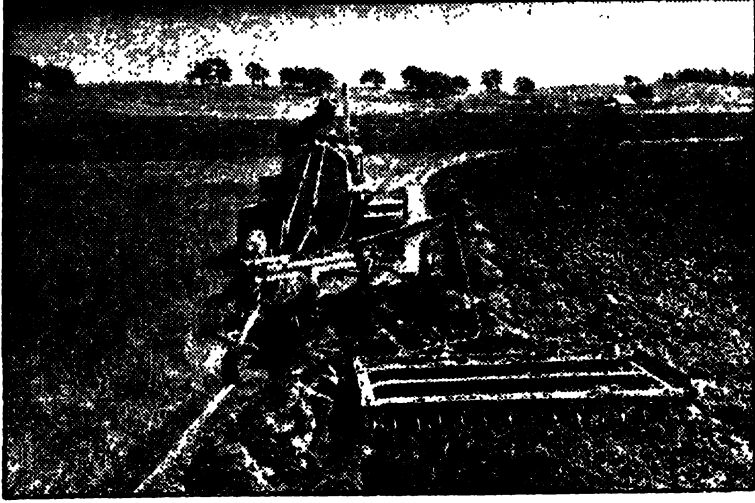
প্রথম পর্য্যায়ে যে উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে বাস্তব চেতনার লক্ষণ ছিলো না, তাহলে তিনি আমাকে ভুল বুঝবেন। আমি আগেই বলেছি, তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলি সাধারণত ধ্বসে-পরা জমিদারশ্রেণীকে কেন্দ্র করেই লেখা, সুতরাং সময়ের দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, সেখানে লেখকের দৃষ্টি ছিলো খানিকটা অতীতের দিকে। কিন্তু শেষের দিককার উপন্যাসগুলো শুধু যে বর্ত্তমানকালের পরিমণ্ডলকে আশ্রয় করে লেখা তাই নয়, তার চরিত্র ও বিষয়বস্তুও একেবারে আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। তাই, শেষের উপন্যাস কয়টির মধ্যে পারিপার্শ্বিকের চেতনা বা বাস্তববোধ যে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষরূপে দেখা দেবে তাতে আর বিচিত্র কি। এখানে যারা নায়কনায়িকা, তারা জমিদারগোষ্ঠীর কেউ নয়, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের প্রতিদিন। 'অভিযানে' যেমন, 'ঝড় ও ঝরাপাতা'তেও তেমনি লেখকের এই সচেতন বাস্তবানুভূতির গভীর স্পর্শ পড়েছে।

'ঝড় ও ঝরাপাতা'কে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস বললে ভুল হবে। মাত্র কয়েকমাস আগে রসিদ-আলী দিবসকে উপলক্ষ্য করে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিলো কলকাতা শহরে—কেমন করে তা ছড়িয়ে পড়েছিলো বাগবাজার থেকে কালীঘাট আর কলকাতার অলিতেগলিতে, কেমন করে সে বিপ্লবের বহ্নিকণা গিয়ে ছিটকে পড়েছিলো সামান্য কেরাণীগৃহস্থের কুটির পর্য্যন্ত, তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। আশ্চর্য্য এই, জনতার মনস্তত্ত্বকে চমৎকারভাবে ধরতে পেরেছেন তারাশঙ্কর, শুধু তাই নয়, বিপ্লব যে সাধারণ মানুষের প্রাণেও কি ভয়ঙ্কর আর আত্মঘাতি নেশা ধরিয়ে দিতে পারে, অবচেতন মনের সেই দ্রুত পরিবর্ত্তনটুকুও তিনি যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে ধরতে চেষ্টা করেছেন এখানে। এবং শুধু ঘটনাকে আশ্রয় করে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এই চেষ্টাতেই তারাশঙ্কর তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সংসার করে ক্ষুদ্র কেরাণী গোপেন, এ আগুনকে তো সে ঘৃণাই করতে চেয়েছিলো, কিন্তু তা সে পারলো কৈ! বরং দেখা গেলো, কি এক অলক্ষিত টানে সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই অগ্নিকুণ্ডে; এমন যে ঘরের মেয়ে নেবু, সেও তো বেরিয়ে এলো পথে, গুলির ঘায়ে প্রাণ দিয়ে উজ্জ্বলতর করে দিয়ে গেলো বিপ্লবের আগুনকে!

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্বতঃই মনে পড়ে। অধুনা দেখতে পাচ্ছি, অনেকেই সাহিত্যের মধ্যে শ্রমিক-আন্দোলন, গণবিপ্লব, শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান নিয়ে মেতে উঠেছেন, কিন্তু এই যে এতবড় একটা সংগ্রাম সমস্ত শহরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শুদ্ধ হয়ে গেলো, তাতে কি তাঁরা গণবিপ্লবের সন্ধান বিন্দুমাত্রও খুঁজে পেলেন না? কিন্তু তারাশঙ্কর তো পেলেন। শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজচেতনাকে সম্বল করে তারাশঙ্কর যার সন্ধান পান, দেশ-বিদেশের বিপ্লব পর্য্যালোচনা করেও তাঁরা নিকটতম পরিমণ্ডলে তাকে খুঁজে পান না, তাঁদের পক্ষে এটা সত্যি বড় লজ্জার কথা।

অনিল চক্রবর্ত্তী

এক বৎসরের জন্য	...	শতকরা ৪৷৷০ টাকা
দুই বৎসরের জন্য	...	শতকরা ৫৷৷০ টাকা
তিন বৎসরের জন্য	...	শতকরা ৬৷৷০ টাকা

নেট লাভের উপর ৫০% বোনাস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এ্যাণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

৫-১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা

টেলিগ্রাম: হনিকুম্ব্ | ফোন কলি: ৩৩৮১

সূচীপত্র

পূর্ব্বাশা : জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৪

বিষয়		পৃষ্ঠা

মাঠে

শিল্পী : শ্রীরামকিঙ্কর—

দশম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ • ১৩৫৪

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ

হুমায়ুন কবির

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়তাকে অনেক সময় জ্ঞান-প্রগতির বিরোধিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। তার চেয়েও অদ্ভুত, শাস্ত্রগত সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতার সংমিশ্রণ। সামাজির সুবিচারের দাবীই সমাজতান্ত্রিক সূত্রগুলোর ভিত্তিমূল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দাবীকে তার নিজ ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে নিয়ে কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজন অনুসারে বিকৃত করা হচ্ছে—সেই কায়েমী স্বার্থের ধারক এবং বাহক তারাই যারা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সাম্যবাদ দিয়ে এখন আর শোষিত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে একসূত্রে গেঁথে দেবার উপায় নেই—ধর্ম্মগত বিবেচনার অনধিকার প্রবেশের ফলে এখন তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাগত অসাম্যের অছি হিসেবেই দাঁড়িয়ে গেছে।

নূতন জীবন এবং অতীতের পুনঃপ্রবর্ত্তন তাই বর্ত্তমান ভারতবর্ষে পরস্পর বিরোধিতায় সক্রিয়। ঐতিহ্যের আশ্রয় নষ্ট হয়ে গেছে। নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করবার মনোভঙ্গী সমাজ-জীবন থেকে লুপ্ত—নিরাপদ জীবনের পুরোণো আশ্বাস ছত্রখান—আর তার সঙ্গে জীবনের পুরোণো পরিচিত আদর্শও ভেঙে পড়েছে। বিশ্বব্যাপারে ক্রমেই এতো জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে আমাদের, যে আলাদা হয়ে বসবাস করবার আর উপায় নেই। যাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে

আমাদের জানাশোনা নেই বা জানাশোনা হতে পারেনা তাঁরাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছেন। যেসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের দাবীদাওয়ার সম্বন্ধ নেই তারই উপর আমাদের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে। কাজেই আজকার দিনে বিক্ষোভ আর বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেলে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই।

অস্থিরতা আর বিক্ষোভই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য বিষয়। পুরোণো দেশের লোকদের যাত্রা সুরু হয়েছে। আদর্শের মূর্ত্তি এখনো সম্পূর্ণ ফুটে ওঠেনি কিন্তু সর্ব্বত্রই একটি নূতন জীবনের সাড়া। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় দৃশ্যের বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু তাতে প্রাচীনের সঙ্গে বন্ধনমুক্তির আভাস ফুটে ওঠেনি। গত দুই শতকে এবং বিশেষ করে গত চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন দেখা গেছে তার রূপ স্বতন্ত্র। অতীতের সঙ্গে এ-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ নেই, তার শরীরে একটি নূতন আরম্ভের চিহ্ন আঁকা।

পুরোপুরি নূতনের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক। যে-একটি কর্ম্মস্রোত সুদূর অতীতে জন্মলাভ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসেছে, বর্ত্তমান কাল তারই পূর্ণ পরিণতি। অতীতের সঙ্গে যে তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়নি তা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যা হয়ে এসেছে ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত দু'তিন শতকের পরিবর্ত্তনে মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে যে-পার্থক্য সূচিত হয়েছে তার তুলনা তার আগেকার সমগ্র লিখিত ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর। পরিবর্ত্তনের ক্ষিপ্র গতি সত্যি বিস্ময়কর।

অন্যায়ের উপলব্ধি থেকেই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। দ্বন্দ্বের মূল উৎপাটিত না করলে বিশ্বসভ্যতার বিরাট সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। গত পঁচিশ বছরে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এ-আশঙ্কারই স্মারক। দেখা যাচ্ছে যে মীমাংসার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে অক্ষম। অর্থনৈতিক শোষণ এবং তার অনুগামী অন্যায়বোধ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিগত বস্তু। সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হলে তাদের নির্ম্মূল করা যাবেনা। সুবিচারের আদর্শের ও বাঁচবার স্পৃহার মিলিত দাবীতেই সমাজের পরিবর্ত্তনের দরকার।

এই পরিবর্ত্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। অধীন ভারতবর্ষের মানে শুধু ভারতবর্ষের দাসত্ব নয়, অধীন ভারতবর্ষ মানে রুদ্ধ ভারতবর্ষ। তার মানে ভারতবর্ষের বিরাট সম্পদ ও জনবল অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকছে। রুদ্ধশ্বাস অর্থনীতির অর্থ বিক্ষুব্ধ সমাজ। ভারতীয় অর্থনীতির শ্বাসরোধ হয়ে গেছে বলেই আজ ভারতীয় সমাজ আসন্ন অগ্ন্যুৎ-সারী। সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক ঈর্ষা ও বিরোধ বলে' যা আজ প্রতিভাত হচ্ছে তার আন্তরিক রূপ বাঁচাবারই প্রয়াস। ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষি ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে পালন করতে পারে না। একমাত্র চাকরিই নিরাপত্তা ও সান্ত্বনা দিতে পারে।

কাজেই বাঁচবার একমাত্র উপায় চাকরির সংস্থানে যতোকিছু অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যক্তি বা দল জীবনযুদ্ধে নেমে এলে হাতের কাছে তৈরী যে হাতিয়ার পায় তা-ই আঁকড়ে ধরে। কায়েমী স্বার্থ প্রচলিত আমল থেকেও বিলাসের উপকরণ আহরণ করে নেয়। পুঁজিবাদী, যে জাতি বা বর্ণেরই হোক, ভোগের আয়োজন তার সর্ব্বদাই করায়ত্ত। সাম্প্রদায়িক চীৎকারে দুঃসহ বৈষম্য থেকে শোষিত জনসাধারণের মন ভ্রষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা কায়েমী স্বার্থের শেষ রক্ষাকবচ।

মূল অন্যায় থেকে সাময়িকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা মনকে বিক্ষিপ্ত করে, সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, শতাব্দীব্যাপী প্রয়াস ও সংযমের ফলে শৃঙ্খলা ও শালীনতা তৈরী হয়ে উঠেছিল তা হয়ত বিপন্ন হয়ে ওঠে। সভ্য সমাজ জোয়ারের জল ধরে রাখবার একটি বাঁধের মতো। বাঁধ যতদিন শক্ত থাকে—জোয়ারের জল ফুলে উঠলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু একবার যদি তাতে ফাটল দেখা দেয় তাহলে শুধু বাঁধ ভাঙবারই আশঙ্কা নয়, তার দ্বারা সুরক্ষিত সমস্ত অঞ্চলেরই আশঙ্কা জেগে ওঠে। সভ্যতার তৈরী সংযম সম্বন্ধেও এ-কথাই বলা যায়। একবার তা শিথিল হয়ে গেলে জীবনযাত্রার সুরক্ষিত পথ বিপন্ন হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অন্তর্যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। অন্তর্যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পথ খুলে দেয়। আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হবে তাতে মানুষের সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা ভারতবর্ষের একার সমস্যা নয়। আন্তর্জাতিক ঘটনার স্রোত ভারতের উপকূলে এসে আছড়ে পড়ছে। ঐক্যের ও সুসংবদ্ধতার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষ—এই অদৃষ্টলিপি সে মুছে ফেলতে পারেনা। রাষ্ট্রিক অধীনতার দরুণ বিশ্বশক্তির হাতে সে একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু—বিশ্বদৃশ্যে সক্রিয় অভিনেতা নয়। এতে তার নিজেরও বিপদ, পৃথিবীরও বিপদ। বিশ্বশান্তির পথেও এ এক বিঘ্ন, কারণ ভারতবর্ষের অধীনতা ও শোষণ, তার শোষকদল ছাড়াও, তার প্রতি অন্য শক্তিকে প্রলুব্ধ করবে। নিজের পক্ষেও তার বিপদ এই যে স্বাভাবিক ও অবাধ উন্নতির পথ তার রুদ্ধ। অবদমনে ও তিক্ততায় ভারতবর্ষের সমাজমানস দ্বন্দ্বপূর্ণ, এ দ্বন্দ্ব সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে সমস্ত পৃথিবীতে। আর স্বাধীন ও শান্তিময় ভারত বিশ্বশান্তির আশ্রয়স্থল হতে পারে। তখন অদূর প্রাচ্যের বিক্ষোভকেই শুধু সে শান্ত করে আনবে না, বিশ্বশান্তির জন্যে সচেষ্ট শক্তিসমূহের পক্ষেও ভারতবর্ষের বিপুল শক্তি স্বার্থকভাবে নিয়োজিত হবে।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স

শশধর সিংহ

তিন

বৃটেনের সহিত ফ্রান্সের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, ফরাসী দেশের লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং সেখানকার আভ্যন্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এযাবৎ একটা সাম্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ফলে এতদিন আর্থিক ব্যাপারে বৃটেনবাসীদের মত ফরাসীদের এতটা পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। ইহারা এখনও নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী স্বদেশেই উৎপন্ন করিতে পারে, আর ফ্রান্সের শিল্পের কাঠামোও ব্রিটিশ অর্থ-তন্ত্রের মত এক তরফা নহে। পিয়ের জর্জ্জ (Pierre George) লিখিয়াছেন: "ইহার অর্থনৈতিক কাঠামো কিন্তু তাহার প্রতিবেশীদের অর্থতন্ত্র হইতে অনেকটা আলাদা। ফ্রান্স নিজের উৎপাদিত শস্যাদি দিয়া দেশের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহার শিল্পানুষ্ঠানের উপর পুরাতন শিল্পাদর্শ ও ঐতিহ্যের ছাপ এখনও বর্ত্তমান। ইংলণ্ড বা জার্ম্মেণীর মত দেশে এইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, কারণ ঐসব দেশে শিল্প ও কৃষির সম্বন্ধ সাম্যমূলক নহে। ফরাসী শিল্পের কাঠামো জার্ম্মেণীর মত বৈষম্যহীন ও সংহত নহে। ইহার জটিল রূপ নানা সূক্ষ্ম প্রভেদের ভিত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছে।" ["But her economic structure is very different from those of her neighbours. Not only is she able to feed her population on home-grown products, in a way not open to countries such as England and Germany, where there is a less even balance between industry and agriculture, but even her industry shows the influence of ancient craft traditions. The industrial economy of France is not an unvarying and homogeneous system like that of Germany. It is a complex system of subtle variations."]

ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ৪২ কোটির মত হইবে এবং এই সংখ্যা বহুকাল ধরিয়া একই অবস্থায় রহিয়াছে। ১৯৪৫ সাল হইতে কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মত ফরাসীদের জন্মের হার পুনরায় বাড়তির দিকে চলিয়াছে, যদিও ইহা চিরস্থায়ী হইবে কিনা বলা দুষ্কর। এই মোট লোকসংখ্যার পঞ্চমাংশ গ্রামে বাস করে, এই কৃষিকার্য্য হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে। ফ্রান্সে বৃহদাকার (large-scale) কৃষি-ব্যবস্থা এখনও বিরল। অধিকাংশ কৃষকই নিজের পরিবারের সাহায্যে ক্ষেতের কাজ সম্পন্ন করে। সাম্প্রতিক "মনে" (Monnet)

রিপোর্ট* অনুসারে "যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে দুইশত কৃষক পিছু একটিমাত্র ট্রেকটর যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সেই তুলনায় বৃটেনে বাইশ জন কৃষক পিছু একটি আর আমেরিকায় তেতাল্লিশ জন কৃষক পিছু একটি ট্রেকটর ব্যবহৃত হইত।" শিল্পের প্রসারের দিক দিয়াও ফ্রান্স ইংলণ্ডের অনেক পিছনে ছিল। 'মনে" রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী শিল্পের মোট উৎপাদন শক্তির এক তৃতীয়াংশ একেবারেই কাজে লাগান হইত না। অন্য দিকে মার্কিনদেশের তুলনায় ফরাসী শ্রমিকদের কর্ম্মের ক্ষমতা ছিল মাত্র তৃতীয়াংশ ও ব্রিটিশ শ্রমিকদের তুলনায় ইহারা দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদনক্ষম ছিল।, এই সাংখ্যিক তুলনা হইতে ফ্রান্সের জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে।

অদ্যকার পরিস্থিতিতে ফরাসী সমাজের প্রধান সমস্যা হইল আর্থিক। কি ভাবে সত্বর যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে তাহা হইল ইহার আপাত দিক। গত মহাযুদ্ধে ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় ফ্রান্সের ক্ষতি বহুল পরিমাণে বেশী হইয়াছে। "মনে" রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, এইবারে ফ্রান্সের বিপর্য্যস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কেবল বেশী হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষতির মাত্রাও বিশেষভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাটের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ফলতঃ পুনর্গঠন কার্য্যের জটিলতাও নানাদিক দিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ফরাসী নেতারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ফ্রান্সকে আবার শক্তিশালী করিতে হইলে প্রথমে দেশের আর্থিক ভিত্তিকে সুগঠিত করা প্রয়োজন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা দেশের শিল্পব্যবস্থা সংগঠনের উপর নির্ভর করিবে। যুদ্ধপূর্ব্বের শিল্পের অবনতি যে গত যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের একটা কারণ তাহা আজ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। চিন্তাশীল লোকমাত্রই এই সম্বন্ধে একমত যে, বর্ত্তমানের ক্ষতি পূরণ করিয়া দেশকে আধুনিক ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইলে পুনর্গঠনের ভার ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। ফরাসী অর্থ নৈতিক সমস্যার পরিসর এত ব্যাপক যে, সংঘবদ্ধভাবে ইহার সমাধান না করিতে পারিলে ইহার কোন প্রকৃত মীমাংসা হইবেনা। "মনে" প্ল্যান বা পরিকল্পনা এই সত্যের উপলব্ধির ফল। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, "মনে" কমিটি বা "Commissariat Général du Plan de Modernisation et d' Equipement"কে জেনারেল দ্য গল নিজেই নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরেজীতে এই কমিটির সভাপতি মঁসিও জাঁ মনের নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

* Rapport Général sur le Premier Plan de Modernisation et d'Equipment.

"মনে" পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল :

(১) ১৯৩৮ সালের উৎপাদনের স্তর ১৯৪৬ সালের মধ্যে আবার ফিরাইয়া আনা ;

(২) ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি উৎপাদনের মাত্রা ১৯২৯ স্তরে লইয়া আসা অর্থাৎ উৎপাদনের মাত্রা ১৯৩৮ সাল হইতে শতকরা ২৫ অংশে বর্দ্ধিত করা ;

(৩) ১৯৫০ সালের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২৯ সালের স্তর হইতে শতকরা ২৫ মাত্রা বর্দ্ধন করা।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই পরিকল্পনায় ফরাসী আর্থিক জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে দেশের অর্থতন্ত্রকে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের অধীনে না আনিয়া কতকগুলি বিষয়কে মাত্র ব্যক্তিগত চালনার হাত হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাকী বিষয়গুলির উপরও রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান মানিয়া লইতে হইবে। "মনে" কমিটির মতে ঃ "এইরূপ অর্থতন্ত্রে কতকগুলি বিভাগ রাষ্ট্রের অধিকারে থাকিলেও উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র ব্যক্তিগত চালনাধীন থাকিবে। এই পরিকল্পনানুসারে একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হইবে, আর অন্যদিকে উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্র রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে।" ["In an economy which, together with some nationalised sectors, still has a wide free sector, the plan must serve as a signpost for some efforts as well as do the actual steering of others."] বলাবাহুল্য আগামী চার বৎসর (১৯৪৭-৫০)এর উৎপাদনসংকল্পে প্রধান জোর দেওয়া হইবে তথাকথিত "key resources" অর্থাৎ কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, ইস্পাৎ, সিমেণ্ট, কৃষিযন্ত্র ও যানবাহনাদির উপর। এইগুলি হইল ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির চাবী। "মনে" কমিটির ভাষায় বলিতে গেলে "আধুনিককরণের সংকল্প অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা সাধন না করিতে পারিলে কেবল যে যুদ্ধপূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহা নহে, ইহার অন্য ফল হইবে এই যে, ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিবে।" ["A programme of modernisation is essential. The alternative to it is not simply a return to pre-war conditions but a progressively aggravated material decline."]

"মনে" পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে ফ্রান্সে আজ কোন মতদ্বৈধ নাই। দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলিই জানে যে, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ সর্ব্বাংশে নির্ভর করিবে। এই হেতু দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সবাই আজ ফরাসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। আর আর্থিক সংকটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই হয়ত ইঁহাদের মধ্যে দলাদলির উগ্রতা এখনও গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ

করে নাই। 'তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কাগজে কলমে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যতই সহজ মনে হউক না কেন, কার্য্যতঃ ইহার পথে নানা বাধা বিঘ্নের উদ্রেক হইতে বাধ্য। প্রথমতঃ মূলধনের কথা উঠিবে। হিসাব করা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে চার বৎসরে অন্ততঃ ৭৮০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হইবে। ফ্রান্সের পক্ষে এই মূলধনের পরিমাণ মোটেই মারাত্মক হইবে না সত্য, কিন্তু ইহা যথেষ্ট হইবে কিনা বিচার্য্য। ফরাসী পরিকল্পকদের মতে দেশ ও বিদেশ হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে। ইঁহারা আরও মনে করেন যে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিদেশ হইতে অর্থ ধার করিতে হইবে, আর বিদেশস্থ ফরাসী মূলধনও ইহাদের কাজে লাগাইতে হইবে। উক্ত মূলধনের অপ্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বিলাতের সাপ্তাহিক "ইকনমিষ্ট" লিখিয়াছে : "ফ্রান্সের পক্ষে কিন্তু অতীতকে মুছিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রাখিতে হইবে; কেবল বর্ত্তমানের কথা ভাবিলে চলিবেনা।" ["But France has to catch up, not to keep up." December 14, 1946.]

নিরাপত্তা ফ্রান্সের চিরন্তন সমস্যা। জার্ম্মেণী শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ফরাসী জাতির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিবে কিনা তাহা সকলের পক্ষেই ভাবিবার বিষয়।' সুতরাং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেও নিরাপত্তার জন্য ফরাসীদের অন্যপথ খুঁজিতে হইবে। ফ্রান্সের নিজস্ব ক্ষমতা ইহার জন্য যথেষ্ট নয়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই হেতু এক নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন। চিন্তাশীল ফরাসীমাত্র আজ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঔপনিবেশিক জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পুরাতন ছাঁদের সাম্রাজ্যিকনীতি অনুসরণ করা সমীচীন হইবে না, অথচ ফ্রান্সকে বৃহৎশক্তি বলিয়া পরিচিত করিতে হইলে ফরাসী সমাজ-ব্যবস্থা হইতে সাম্রাজ্যের চিন্তা একেবারে বাদ দিলেও চলিবেনা। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে করাইয়া দেওয়া দরকার যে, এযাবৎ ফরাসীদের চক্ষে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে নিরাপত্তার দিক হইতে। ফ্রান্সের লোকসংখ্যার অপ্রাচুর্য্য ইহার একটা কারণ। ফরাসী সামরিক নেতারা অনেককাল হইতে সাম্রাজ্যের লোকবলের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজন বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ হইলে লোকবলের প্রাচুর্য্য যে ইহার পরিণতির একটা নির্দ্ধারক হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। মনে হয় সেই কারণেই ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দলই ফরাসী সাম্রাজ্যের বাহ্যিক কাঠামো বদলাইতে নারাজ। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে-প্রভেদ আছে তাহা মূলতঃ পন্থা নিয়া, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নহে। ইহাদের মধ্যে যাহারা দূরদর্শী তাহারা সাম্রাজ্যকে এমন একটা রূপ দান করিতে চায়, যাহার ভিতর দিয়া সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় "ফরাসী ইউনিয়ন"-এ থাকিতে রাজী হইবে। বস্তুতঃ

ইন্দোচীনে বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা ইহাই প্রমাণ দেয় যে, পুরাতন ও নূতন পন্থীদের মধ্যে এই বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ বোঝাপড়া হয় নাই। পুরাতন পন্থীরা এখনও ফরাসী উপনিবেশগুলিতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া স্বদেশের সামাজিক বিপ্লব বিপর্য্যস্ত করিতে প্রয়াস করিতেছেন। অন্যদিকে বামপন্থীদের অর্থাৎ সোসেলিষ্ট ও কম্যুনিষ্টের মধ্যে এই বিষয় লইয়া মতের অনৈক্য থাকাতে উগ্রপন্থীরা ইহার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব্বেকার ভিত্তি কায়েম করিতে চাহিতেছেন। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা ছাড়া ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এত শীঘ্র আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত না।

ইহা সকলেরই চোখে পড়িবে যে, ফরাসী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দিকটা এ-পর্য্যন্ত যথাসম্ভব ফ্রান্সের কাজে লাগে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় ফরাসী সাম্রাজ্যের কাঁচামালের সম্ভার সামান্য হইলেও ইহা একেবারে নগণ্য নহে। এতকাল ইহার সমুচিত ব্যবহার না হওয়ার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ফরাসী অর্থতন্ত্র বহির্মুখী নয় বলিয়া ইংরেজদের মত ফরাসীরা কখনই উপনিবেশগুলির উপর এতটা নির্ভরশীল হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী কলোনিগুলিকে ফ্রান্সের আর্থিক জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তখনকার এই পরিকল্পনাকে "mise en valeur" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই প্রয়াস বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ফরাসী সাম্রাজ্য এখনও সর্ব্ববিষয়ে অনুন্নত। কৃষি ও শিল্পে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে অনেক পশ্চাতে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে, এইবারও পুনরায় ফরাসী কলোনিগুলির "মূল্যবর্দ্ধন" (mise en valeur) করিবার চেষ্টা হইবে। ফরাসী সাম্রাজ্যকে বাঁচাইতে হইলে ইহা না করিয়াও উপায় নাই। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে Colbertism-এর* কোন স্থান নাই। এই মতবাদ অনুসারে ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রধান সার্থকতা হইল ইহার ভিতর দিয়া কতদূর ফ্রান্সের স্বকীয় আর্থিক স্বার্থ পরিপূরিত হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, এই নিছক শোষণনীতি [1] অনুসরণ করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফরাসীদের নিজেদের স্বার্থও বজায় থাকে নাই। খানিকটা দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ না থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদও টিকেনা। ইংরেজরা অনেককাল হইতে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে; ফরাসীরা দায়ে পড়িয়া আজ নূতন করিয়া এ সম্বন্ধে ভাবিতে শিখিতেছে। ফ্রান্সের সহিত

---

* Jean-Baptiste Colbert (১৬১৯-১৬৮৩) চতুর্দ্দশ লুইর প্রসিদ্ধ অর্থসচিব ছিলেন।

1 ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি অনুসারে উপনিবেশগুলিকে "Colonie d' exploitation" ও "Colonie de peuplement" এ ভাগ করা হয়। শোষণ (exploitation) করাই হইল প্রথমটির আসল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় রকমের কলোনির সঙ্গে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির সাদৃশ্য আছে। এইগুলি হইল ফরাসীদের বসবাসের যোগ্য।

ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যপ্রকার লাভের পরিসর বাড়ান ছাড়া উপনিবেশগুলিরও যে কতকগুলি স্বকীয় স্বার্থ আছে তাহা আজ অন্ততঃ কোন কোন মহলে স্বীকৃত হইতেছে। অধুনা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের এই হইল প্রধান সমস্যা। কলোনিগুলিতে স্বায়ত্তশাসন দিয়া বা দিবার ভান করিয়া কিভাবে ইহাদিগকে "mother country" অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সহিত আরও নিকট সম্বন্ধে বাধিয়া দেওয়া যায় কিনা তাহার প্রয়াস আজ এশিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে। ইন্দোচীনে এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বলিয়াই সেখানে সংগ্রামের এখনও বিরাম হয় নাই। "Divide and rule" (ভেদনীতি)কে ফরাসী পরিভাষায় "politique des races" বলা হয়। ইহার মূল কথা হইল জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধাইয়া ফরাসীদের প্রাধান্য রক্ষা করা। এই ভেদনীতি ইন্দোচীনে এখনও অনুসৃত হইতেছে এবং আপাতভাবে ইহা খানিকটা সাফল্যও লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা যে চিরস্থায়ী হইবে তাহা মনে করিবার এখনও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছেনা। ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদকে সমূলে বিনষ্ট করিবার মত ক্ষমতা ফরাসীদের নাই। এই ক্ষমতা থাকিলে ফরাসীরা সিরিয়া ও লেবানন ছাড়িয়া আসিত না, আর উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদীর সহিত বোঝাপড়া করার ভান করিত না। পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের যুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক নীতি বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে, যদিও ইহার একটা স্থায়ীরূপ এখনও দেখা দেয় নাই। এই নীতিতে বর্ত্তমানে যে-অনিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে তাহা ফ্রান্সের নিজের সামাজিক অনিশ্চয়তার একটা প্রতিচ্ছায়া বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দেশে প্রতিক্রিয়াশীলতার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ফরাসী সাম্রাজ্যিক নীতির মধ্যে চিরকাল একটা দ্বন্দ্ব রহিয়া যাইবে। গত জানুয়ারী মাসের "Amerasia" নামক সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন মাসিক পত্রে "Conflict in Indo-China"* (ইন্দোচীনের সংগ্রাম) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :

"অধিকন্তু, ইন্দোচীনের প্রতি ফরাসীদের যুদ্ধোত্তর নীতির সত্যকার গঠনমূলক দিকটা কুখ্যাত ফরাসী ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়ের চিরন্তন ঔদ্ধত্য, চক্রান্ত ও অমানুষিক আচরণের ফলে সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়াছে। চিন্তা ও কর্ম্মের দিক দিয়া ফরাসী নীতির দ্বৈতের এই কারণ। এই দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ ফ্রান্সের আভ্যন্তর, রক্ষণশীল ও উদার পন্থীদের বিরোধের শক্তিসাম্য। ইহাদের ক্ষমতা সমান সমান হওয়াতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্ত্তন অনেক সময়েই তথাকার গভর্ণমেণ্টের ভিতরকার শক্তিসাম্যের অদল বদলের উপর নির্ভর করিয়াছে। রক্ষণশীলদের প্রভাব বর্ত্তমানে বিশেষভাবে "এম, আর, পি" দলের মধ্যে নিবদ্ধ। ইহাদের অনুপ্রেরণা হইল চার্লস দ্য গল। ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে ইন্দোচীন

* এই সুলিখিত প্রবন্ধে ইন্দোচীনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্বন্ধে একটা বিশদ চিত্র পাওয়া যাইবে।

ফেডারেশনের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে ইহারা মৌখিক স্বীকৃতি দিয়াছে, কিন্তু নিয়ত ইহাদের চেষ্টা হইয়াছে কিভাবে ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদীদের হাতে কত কম ক্ষমতা দিয়া সেখানকার অর্থনৈতিক সম্ভারের উপর নিজেদের দখল সুদৃঢ় করা যায়।"
"Furthermore, some of its genuinely constructive provisions have been nullified by innumerable instances of the arrogance, intrigue and brutality that have been notorious characteristics of the French colonial caste. As a result, French policy has been contradictory, both in conception and execution. The contradictory nature of French policy has resulted from the conflict of the almost equally balanced forces of conservatism and liberalism within France itself. Shifts in colonial policy have frequently coincided with shifts in the balance of power in the French government. The conservative forces, concentrated in the MRP and inspired by Charles de Gaulle, though supporting the idea of an Indo-Chinese Federation within the French Union, have steadily held to a program of regaining firm control over the economic resources of Indo-China with a minimum of concessions to nationalist sentiment."

ফরাসী কম্যুনিষ্টদল অবশ্য ভিয়েৎনামের সহিত বোঝাপড়া করা সম্বন্ধে সব সময়েই দৃঢ়তার সহিত মতামত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে এবং সম্প্রতি অন্যান্য দলের সহিত ইহার মতানৈক্য নিয়া রামাদিয়ে (Ramadier) গভর্ণমেন্ট প্রায় ভাঙ্গিতেও বসিয়াছিল। আর শোনা যায় যে, মঁসিও ব্লুম "ল্য পপুল্যার" (Le Populaire) সংবাদ পত্রে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা প্রয়াস অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া "এম আর পি" দল তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে নারাজ হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমেরিকা, বৃটেন ও হল্যাণ্ড যতকাল সুদূর প্রাচ্যে তাহাদের সাম্রাজ্যিক নীতি না বদলাইবে ততদিন ফরাসীদের ঔপনিবেশিকনীতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আশা করাও বৃথা। এই প্রসঙ্গে "Amerasia" লিখিয়াছে : "বৃটেন, ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও মালয়ে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে ; হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া পুনরায় নিজের দখলে আনিতে গিয়া ব্রিটিশদের কাছ হইতে ব্যাপক সাহয্য পাইতেছে ; অন্যদিকে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের এলেকায় নিজে একা জবরদস্তি করিয়া বেড়াইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ফরাসী নাগরিককে বুঝান শক্ত হইত যে, ইন্দোচীন ছাড়িয়া আসা তাহার পক্ষে ভাল। এই হেতু, ফ্রান্সের

বামপন্থী কোয়ালিশনদল দেশের জরুরী সমস্যাগুলি সমাধান করিতে গিয়া ইন্দোচীনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আনিতে অসমর্থ হইয়াছে।" "With Britain taking steps to maintain a dominant position in India, Burma and Malaya ; with the Netherlands receiving extensive British aid in its efforts to regain Indonesia ; with America playing a high-handed, unilateral role in the Pacific, it would have been difficult to convince the average Frenchmen that it was in his interests to deprive France of Indo-China. Thus the left coalition, already beset with serious domestic problems, felt itself in no position to effect the complete independence of Indo-China."

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীর মধ্যে যে-মনকষাকষি সুরু হয় তাহার একটা ফল হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে entente cordiale বা বন্ধুত্বের স্থাপন। ১৮৭০ সালের যুদ্ধে জার্ম্মেণীর হাতে পরাজয়ের শোধ নেওয়া যেমন ফরাসী চিন্তাধারার একটা মূল কথা হইয়া দাঁড়াইল, জার্ম্মেণীর ক্ষমতাকে য়ুরোপের বাহিরে বিস্তৃর্ণ না হইতে দেওয়াও ইংরেজ কূটনীতির পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে কেবল এই দুই দেশের মধ্যে নহে, রাশিয়ার সঙ্গেও ইহাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। রাশিয়ার সহিত প্রথম মহাযুদ্ধের আগের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়া যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের একটা কারণ তাহা দ্য গল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের মৈত্রীস্থাপনে দ্য গলের অগ্রণী হওয়ার নিঃসন্দেহ ইহাও একটা কারণ। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ও ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্বন্ধের কাঠামো অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, যেহেতু পূর্ব্বের মত এখনও ফরাসীদের প্রধান চিন্তা জার্ম্মেণীকে দমন করা এবং বৃহৎ শক্তি হিসাবে জার্ম্মেণীর পুনরুত্থানকে সর্ব্বতোভাবে রোধ করা। ফরাসী নেতৃবৃন্দ সবিশেষ জানেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধিত করিতে হইলে ফ্রান্সকে একদিকে ইঙ্গ-মার্কিনদের ও অন্যদিকে রুষীয়দের সহিত সমভাবে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে। ইংরেজদের নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও যে, ফরাসীরা একটা পাশ্চাত্যদল বা Western Bloc-এ যোগদান করিতে রাজী হয় নাই তাহারও ইহা একটা কারণ বলিতে হইবে। মঁসিও বিদো এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে অর্থাৎ একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ ও অন্যদিকে রুষীয়দের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনে সহায়তা করা ফ্রান্সের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়াছেন এবং কোন বিশেষ পক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে রাজী হ'ন নাই। এইরূপ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারিলে ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে সন্দেহ নাই, তবে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে বেশীদিন পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে বামপন্থীদের ক্ষমতা

বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও দক্ষিণ পন্থীরাই মোটামুটি ফ্রান্সের আসল কর্ত্তা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দ্য গল-পন্থী "এম আর পি" দল রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব চাহিয়াছে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, যদিও ইহার মনের যোগ আসলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্সের সোসেলিষ্টদল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি বৃটেনের সহিত ফ্রান্সের যে-মৈত্রীসম্বন্ধ স্থাপিত হইল তাহা প্রধানতঃ ব্লুম প্রভৃতি সোসেলিষ্ট নেতাদের উৎসাহে সাধিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার সহিত দক্ষিণপন্থীদের মনের সায় আছে বলাই বাহুল্য। ফ্রান্সের সাধারণ লোকের চক্ষে কিন্তু বর্ত্তমান ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে। বৃটেনের পক্ষে ইহাতে উল্লসিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ফ্রান্সকে রাশিয়ার আকর্ষণ হইতে ছুটাইয়া নিজের দিকে টানিয়া লওয়া এবং কালে পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলি লইয়া একটা দল গঠন করা হইল যুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির একটা গোড়ার কথা। এই বিষয়ে বৃটেন কতটা সফল হইবে তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে জার্ম্মেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতির উপর।

এই ব্যাপারে এখনও ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে মতের ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। ফরাসীদের প্রথম ঐকত্রিক দাবী হইল এই যে, সার (Saar) প্রদেশকে পুনরায় ফ্রান্সের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হউক। দ্বিতীয়তঃ জর্ম্মণ শিল্পের হৃদয়স্থল রুর (Ruhr) কে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত করিয়া ইহার চালনার ভার একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের উপর দেওয়া হউক। তৃতীয়তঃ ফরাসী শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য জার্ম্মেণী হইতে আগত কয়লার আমদানীর পরিমান বাড়াইয়া দেওয়া হউক। এই দাবী ফ্রান্সের সবাই দল নির্ব্বিশেষে করিতেছে। এই তিন দফা দাবী পরিপূরিত হইলে ভবিষ্যতে জর্ম্মণ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বরূপ কি হইবে তাহা নিয়া ফরাসীরা খুব মাথা ঘামাইবে না। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস যে-দল হইতে বেশী পরিমাণে পাইবে সেই দলের দিকেই ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত ঝুঁকিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আর্থিক ও সাম্রাজ্যিক পুনর্গঠনের জন্য ফরাসীরা ইঙ্গ-মার্কিনদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী। বৃটেন ও আমেরিকা ফ্রান্সের এই অসামর্থ্যের পুরা সুযোগ নিতে ছাড়িতেছে না। এই প্রসঙ্গে বিলাতের "New Statesman and Nation" (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) সাপ্তাহিক পত্র লিখিয়াছে: "ইন্দোচীনে ফরাসীদের মারাত্মক ও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অভিযান এবং ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি একসঙ্গে আসিয়াছে। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎও ব্রিটিশদের মনোভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়া আমরা বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় যতটুকু ভাল করিতে পারিয়াছি তাহাও বিনষ্ট করিব।" ["The calamitous and unnecessary campaign

in Indo-China coincides with the promise of a British French Alliance. The attitude of the British may therefore be decisive as it was in Indonesia. By aiding French imperialism, which is in need of arms and equipment in Indo-China, we could undo all the good we have done in Burma and Indonesia."]

ফরাসী পররাষ্ট্রনীতির আসল রূপ এখনও দ্বিমুখী। আর এই মৌলিক দ্বন্দ্বের জন্য ফরাসী সমাজের শ্রেণীবিভাগকেই মুখ্যতঃ দায়ী করিতে হইবে। সব দেশেই পররাষ্ট্র-নীতিতে দেশের আভ্যন্তর অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এই হেতু, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার বৈদেশিক সম্বন্ধের মধ্যে যে-ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা ফ্রান্সে এখন অবর্ত্তমান। রাশিয়ায় শ্রেণীসংঘর্ষের সমাধান ঘটিয়াছে বিপ্লবের ভিতর দিয়া। বৃটেনে ইহার তীব্রতা খানিকটা প্রশমিত হইয়াছে সাম্রাজ্যিক শোষণ দ্বারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগাধ দৌলত ও কর্ম্মের অবাধ সুযোগ সেখানকার শ্রেণীসংঘর্ষকে এখনও ব্যপক রূপ গ্রহণ করিতে দেয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতেই ফ্রান্সের ভিতরে ও বাহিরে যে-অস্থায়িত্ব লক্ষিত হইয়াছে তাহা গত মহাযুদ্ধের ফলে অন্তর্হিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কার্য্যতঃ সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। ফরাসী সমাজে বামপন্থী চিন্তাধারার ব্যাপকতা হইতে বুঝা যায় যে, সেখানকার সামাজিক ভিত্তি শিথিল হইয়াছে। তথাপি দেশের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির ক্ষমতা মোটামুটি অটুট রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় নাৎসীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া এবং পরে ইঙ্গ-মার্কিনদের সাহায্যে ফ্রান্সের "deux cents familles" অর্থাৎ দুইশত পরিবার পুনরায় নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। সম্প্রতি জেনারেল দ্য গল যে আবার রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছেন এবং শতমুখে মার্কিনদের প্রশংসা করিতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ফ্রান্সে "counter-revolutionary" বা বিপ্লব-বিরোধী শক্তিগুলি আবার মাথা উঁচাইতেছে। সংখ্যা ও গণপ্রভাবের তুলনায় ফরাসী কম্যুনিষ্টরা যে দেশশাসনে অনুরূপ ক্ষমতা পায় নাই তাহা ইহার সাক্ষ্য দেয়। সোসেলিষ্ট ও "এম আর পি" দল মিলিয়া মন্ত্রীসভার প্রধান প্রধান পদগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। পররাষ্ট্র দপ্তর এযাবৎ "এম আর পি" নেতা মঁসিও বিদোর হাত হইতে অন্যের হাতে যায় নাই। ঔপনিবেশিক দপ্তর হইতেও কম্যুনিষ্ট নেতাদের দূরে রাখা হইয়াছে। এইভাবে ফরাসী সমাজের পুরাতন কাঠামো এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃটেনে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার পর একবার ভাবা গিয়াছিল যে, য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আশা পূর্ণ না হইবার

একটা প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, য়ুরোপীয় বামপন্থীরা আজ পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত। সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিরোধ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ইহার প্রধান সুযোগ লইবে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এবং ইহাদের পরিপোষক ইঙ্গ-মার্কিন শাসকশ্রেণী। এই কারণে ফরাসী রাজনৈতিক দিকচক্রবালে দ্য গলের পুনরাবির্ভাব এতটা শঙ্কাজনক। ১৯৪৩ সালে অধ্যাপক ল্যাস্কি সত্যই লিখিয়াছিলেন: "ফ্রান্সের গণতন্ত্রবাদ সহযোগ না সংগ্রামের ভিতর দিয়া সঞ্জীবিত হইবে তাহা স্থির করা অবশ্য ফরাসীদের নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু এই কথাটা লুকাইলে বোকামি হইবে যে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই সম্বন্ধে কি নীতি অনুসরণ করে তাহার উপর ইহার ভবিষ্যৎ রূপ অনেকাংশে নির্ভর করিবে।" ["Whether the democracy in France is to be renovated by consent or by conflict is, obviously, a matter that Frenchmen first of all must decide. But it would be foolish to conceal from ourselves the fact that not a small part of the decision with them upon the policies adopted by Great Britain, the United States and the Soviet Union".] ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই মন্তব্যের প্রমাণ দেয়। এই শেষ প্রবন্ধটি লেখার পরে ফ্রান্সের রাজনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। "রামাদিয়ে" (Ramadiea) গভর্ণমেণ্ট হইতে কম্যুনিষ্টমন্ত্রীরা বহিষ্কৃত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য আরও বাড়িল। ইহার সুযোগ নিয়া দ্য গল ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইতে সচেষ্ট হইবেন নিঃসন্দেহ। কম্যুনিষ্টদের দাবাইতে গিয়া ইহারা আমেরিকার কাছ হইতে যে নানা সাহায্য পাইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি হেনরী ওয়ালেস (Henry Wallace) য়ুরোপীয় দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের যে-তোড়-জোড় চলিতেছে তাহাতে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির কতটা দায়িত্ব সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মনে হইতেছে যে, ফ্রান্সের শ্রেণী-সংঘর্ষের এই হইল শেষ পর্য্যায়।

কবিতা

দিনরাত্রির গান

প্রভাকর সেন

সময়ের সমুদ্রের নীল দ্বীপ নিমেষের তীরে
তোমার আঙুলে আঁকা ঝিনুকের আল্পনাটিরে
রূপকথা মনে হয় ; পউষ-প্রখর ঝাউপাতা
কী যে স্বপ্নে ভরে ওঠে হিমে হিমে, সেই জানে না তা !
অচেনা আকাশে কোন তারা গণবার রাতভোরে
ঘুমের কাজলচোখে মৃদু নদী, সেও ভুল করে।

যেখানে দুরন্ত ঝর্ণা হয়েছে হরিণী মনে মনে,
যেখানে তোমার চুলে শত সূর্য্য সোনা ঝড় বোনে,
সেই দ্বীপে আছো তুমি, সেই নীল নিমেষের দেশে —
এখানের ছায়াহীন ব্যর্থ নদী গোধূলিতে মেশে,
দিন যায়, রাত্রি যায়, দিন আসে, রাত্রি আসে ঘিরে,
দিন হয়ে রাত্রি হয়ে কখনো কি আসবেনা ফিরে ?

সীমা

সুধীরকুমার গুপ্ত

কয়েদখানার যত দেয়ালের কঠিন পাহারা,
শাসনের বেড়ি আর শোষণের বিবিধ কৌশল
সমবেত আকাঙ্ক্ষার উপস্থিত প্রাপ্য আজো শুধু।
খণ্ডিত প্রান্তর জুড়ে, চিমনীর আগুনের তাপে
প্রাণের সকল সাধে বঞ্চিত মুহূর্ত্তগুলি কাঁপে।

তবুও নিশান ওঠে, আবার মিছিল হয় জড়ো,
বুকের শোণিত ঢেলে বারে বারে তারা যায় লিখে
আমাদের সকলের হয়ে—
যারা পড়ে মার খায়, শুধু যায় মুখ বুজে সয়ে
আমরা তাদের দলে নয়,
উদ্ধত ঘোষণা জাগে কুমারিকা থেকে হিমালয়।

আমাদের দেহে
কত যে রক্তের স্রোত মিলে গেছে একটি ধারায়
আজ তার চিহ্ন পাওয়া দায়।
যাদের প্রাণের স্তরে অসমান এ মাটির মায়া
কোমলে ও রুক্ষতায় একই টানে নেওয়া যায় চিনে,
এ মাটির তারাই সন্তান,
এ দেশ তাদের হিন্দুস্থান।

তবু সে প্রাণের বার্ত্তা ভিন্ন নামে আজো শুধু রটে ;
ছত্রভঙ্গ জনতারা এ পথেরই দুধারে যখন
পরস্পর বুকে হানে ছুরি,
তখনো বোঝেনি তারা কী আশার এমন মজদুরি।
পার হতে পারিনি সে সীমা,
তাইতো চোখের জলে মৃত্যুকেই দিয়েছি মহিমা।

ক্রৌঞ্চ-মিথুন

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রাত নেমে আসে।
কোথায় উঠেছে ঝড় ? সাগরের কালো জলে কত নৌকা সে
ডুবে গেল, বিশুষ্ক পাতার মত খড়ো ঘর বাতাসে বাতাসে।
ভেঙে যায় কত বুক হাহাকার শ্বাসে।

একটু এগিয়ে গেলে বাঁশ-ঝাড় পার
কচুরিপানায় ঢাকা নদীর ওপার
পাখীর নীড়ের মত ভাঙা কুঁড়ে ঘরে
কা'রা কাঁদে ? ভেসে যায় ঝড়ে ?
ঝড় নয়, মরে গেছে শুধু দু'টি পুরুষ-রমণী
বয়েসে প্রৌঢ়ের মত ; কেঁপে কেঁপে যায় প্রতিধ্বনি।
তাহাদের হয়নি উদ্বাহ।
হোথায় তাদের দেহ কান্নার ঝড়ের মুখে
বিনিঃশেষে হয়ে যায় দাহ ঃ
এইটুকু ইতিহাস
অনেক ঝড়ের 'পরে স্বচ্ছ প্রতিভাস।

মাঠ ভেঙে বনের ভিতরে
শিয়ালের পিছু পিছু আঁকাবাঁকা পথ সে কঙ্করে—
হিজল গাছের পার ফণি-মনসার ঝাড় পরিক্রমা করে
কে সে ?—অনেক সূর্যাস্ত আগে এক সে তরুণ,
মুখে কাঁপে প্রসন্ন হাসিতে বালারুণ।
—পথ চলে, পাশে পাশে ছায়া এক তরুণী সে নাকি ?
মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে ঝিলমিল দুইটি জোনাকী ঃ
দুইদিক থেকে আলো, কথার প্রদীপে কাঁপে আঁখি।
কত প্রেম কত না আবেগ ঃ
অশ্রু যেন বাষ্প হয়ে মেঘ,
হয়ত মেঘেরো কান্না বুঝিতে পারে না কেউ ঃ বৃষ্টি হয়ে যায়,
স্পর্শে তার নীল নীল ঘাস জন্মায়।

অনেক সূর্যাস্ত বুঝি পার
নিষ্ক্রমণ করে গেলে কত অন্ধকার
হয়ত বা দেখা যায় একটি নায়িকা সনে এক সে নায়ক,

ঘাসের নিবিড় নীড়-আবডালে ক্রৌঞ্চ-মিথুন যেন করে ঝকমক—
শাদা শাদা ডানার পালক।
তারা আজ কেউ নেই, বুকে-মনে বল ত বেঁধালো কে শায়ক ?

আবার আবার ঝড়, কান্না কাহাদের ?
যারা মরে গেছে আজ তাহাদের পরিজন কেঁদে ওঠে ফের।
শুধু এই পরিহাস : ইতিহাস মনে করে রাখে না তাদের।

রাত্রি

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর ঘাসে বসে দেখি দূর আকাশে কোথাও
তীরের সীমানা নাই, শুধু জল শুধু নীল জল ;
বিপুল ইথার রাশি দিকে দিকে করে টলমল।
কোটী তারা ডোবে ভাসে শতসূর্য্য নিমেষে উধাও,
আলোর কণিকাগুলি ভাঙ্গা ঢেউ আঁধারে ছড়ায়।
আমার হৃদয় ওড়ে ওরি বুকে একক মরাল—
উড়ে উড়ে ঘুরে যায় শুধু চায় এতটুকু দ্বীপ
নরম বুকের তলে কিছু মাটি অনড় কঠিন,
কিছুটা সবুজ জমি নীল জলে প্লাবন বিহীন ;
সমস্ত মুখের 'পরে অন্ধকারে একবিন্দু টিপ।
তবু জল, শুধু জল, টলমল অতল আকাশ।
পৃথিবীর ঘাসে বসে অন্ধকারে করি অনুভব
পাখীর ডানার 'পরে নেবে আসে শীতল তুষার,
ক্রমে চোখ নীল জলে ছবি দেখে অনড় দ্বীপের
প্রভাতের কৈশোরের যৌবনের স্বপ্ন ভেসে যায়।
হয়তো অতল তলে আমার পৃথিবী আজ
একটি সাহসী পাখী আবার হারায়।

ঘুষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দেখিনি দেখিনি করে শীতাংশু পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল কিন্তু সদানন্দবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আরে শীতাংশু যে, শোন শোন।'

অগত্যা ব্রেক কসে সাইকেলের ওপর থেকেই শীতাংশু বলল, 'আর একদিন শুনব তাঐমশাই, বেলা একেবারে গেছে। একটু জোরে চালিয়ে না গেলে রাত আটটার আগে পৌঁছতে পারব না।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'আমিও তো তাই বলছি, যতই জোরে চালাও না কেন, পৌঁছতে পৌঁছতে তোমার অনেক রাত হয়ে যাবে। চন্দনীর চর কি এখানে নাকি, আর উত্তরে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছ! মাঝকান্দীর চক ছাড়াতে না ছাড়াতে নির্ঘাত বৃষ্টি নামবে, এস আমাদের বাড়িতে, রাতটা থেকে কাল ভোরে রওনা হয়ো।'

শীতাংশুর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সেও ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল। অবেলায় মেঘ বাদলের দিনে যাকে আরও দশ বার মাইল জল কাদার খারাপ রাস্তা সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে কেউ বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ করলে তার খুসি হওয়ারই কথা, কিন্তু শীতাংশু তবু খুসী হ'তে পারছিল না। কারণ সে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে সদানন্দবাবু তিনচার বিঘা জমিতে বেশি পাট বুনিয়েছেন। আর শীতাংশু এই সার্কেলেরই ফুটরেজিস্ট্রেশন অফিসে কাজ করে। তদন্তের ভার তার ওপরই পড়েছে। অবশ্য 'খরচ পাতি' নিয়ে বরাদ্দের চেয়েও দু'চার বিঘা এদিক ওদিক শীতাংশু অহরহই ক'রে দিচ্ছে। সবাই তাই করে। তাতে গৃহস্থদেরও লাভ, শীতাংশুদেরও লোকসান নেই। কিন্তু দূরসম্পর্কের হ'লেও সামান্য একটু কুটুম্বিতা সদানন্দবাবুর সঙ্গে তার রয়ে গেছে। শীতাংশুর জেঠতুতো ভাই-এর পিসতুতো শ্বশুর হচ্ছেন মদনপুরের এই সদানন্দ গাঙ্গুলী। তাই শীতাংশু ভেবেছিল এ কেসটা ধরিয়ে দেবে সহকর্ম্মী বিনোদ বোসকে। সে যদি অন্য কেস দিতে পারে ভালোই না হ'লে তার কাছ থেকে বখরা নিলেই হবে। এ ক্ষেত্রে বিনোদ যত চাপ দিতে পারবে, শীতাংশু ততখানি দিতে পারবে না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য রকম ঘুরে গেল। সদানন্দবাবু একেবারে পথ আগলে এসে দাঁড়ালেন। শীতাংশু মনে মনে ভাবল আচ্ছা দেখা যাক, সেও ঘুঘু কম নয়। কোন

রকম বিবেচনার কথা তুললেই শীতাংশুও খরচপত্রের কথা তুলতে সঙ্কোচ করবে না। ‘পাঁচজনকে নিয়ে কাজ তাঐমশাই, নিচের ওপরের সকলের দিকেই তাকাতে হয়। একার ব্যাপার তো নয়, তবে কুটুম্ব মানুষ, যেখানে পঞ্চাশ লাগবে, সেখানে আপনি চল্লিশ দিন।’

অত চক্ষুলজ্জা নেই শীতাংশু চক্রবর্ত্তীর। এ কথা সে সদানন্দবাবুকে খুবই বলতে পারবে, হলেনই বা জেঠতুতো ভাইয়ের পিসতুতো শ্বশুর।

তবু একবার এড়াবার শেষ চেষ্টা করল শীতাংশু, ‘মিছামিছি আপনাদের কেন কষ্ট দেব তাঐমশাই, এরকম চলাফেরা আমাদের খুব অভ্যাস হয়ে গেছে, বেস যেতে পারব।’

সদানন্দবাবু বললেন, ‘শোন কথা, কুটুম্বের বাড়ি কুটুম্ব আসবে তার আবার কষ্ট কি। অবশ্য আমি তো আর বড়লোক কুটুম্ব নই শীতাংশু, পোলাও মাংস করেও খাওয়াতে পারবনা, উপস্থিত মত নিতান্তই দুটি ডাল-ভাত হয়তো সামনে দিতে পারব। তবু এই সন্ধ্যাবেলা বুড়ো মানুষের কথা অমান্য কোরোনা শীতাংশু, এসো, চল আমার সঙ্গে।’

অগত্যা সাইকেল থেকে নেমে পড়তেই হোল। এরপর আর না করা চলেনা। তাছাড়া আজ সত্যিই দেহ যেন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরের মেঘভাঙা রোদে বার তের মাইল একটানা সাইক্লিং করতে হয়েছে শীতাংশুকে। আর সে কি রাস্তা। কোথাও জল, কোথাও কাদা। এই যদি বা সাইকেলে চাপে, পরক্ষণেই সাইকেল চাপে এসে ঘাড়ে। তারপর ছোট বড় সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। সহজে গাঁট থেকে পয়সা বের করতে চায়না। অজস্র বক্তৃতা, ধমক আর চোখ-রাঙানির ফলে যখন তারা নরম হয়ে আসে তখন ক্লান্তিতে নিজেরও চোখ প্রায় বুজে আসতে চায়। বেছে বেছে শীতাংশু আচ্ছা ঝকমারীর কাজ নিয়েছে যা হোক। সীজনের সময়টা রোদ নেই বৃষ্টি নেই সারাদিন প্রায় মাঠে মাঠেই কাটে। বিনিময়ে মাস অন্তে পচাত্তর টাকা। ঘুষ! ঘুষ না নিলে কি বাঁচবার জো আছে নাকি। আর তো সম্বল দাদার পঁচিশ টাকার মাইনের এম, ই, স্কুলের মাষ্টারী। ভাইপো ভাইঝিদের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। অফিসের একটি ঘর কর্ত্তৃপক্ষ থাকবার জন্য ছেড়ে দিলেও চন্দনীর চরের মত অমন একটা গেঁয়ো বাজারেও খোরাক পোষাক চা সিগারেটে পঞ্চাশ টাকায় কুলোয় না। বাঁচতে হলে এদিক ওদিক সবাইকে আজকাল করতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষের এক আধটু ভয় ছাড়া অন্য কোনরকম শুচিবায়ুতা শীতাংশুর নেই। আর চারদিকে আট-ঘাঁট বেঁধে কি করে চলতে হয় এই আড়াই বছরে তা সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে।

দু’পাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধ হাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দুর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। সাইকেলটি হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে শীতাংশু সদানন্দবাবুর

পিছনে পিছনে চলতে লাগল। সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনো হাঁটু অবধি ওঠেনি গাছ। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নুইয়ে নুইয়ে পড়ছে। অবশ্য এখানে ওখানে বহু জমিই খালি পড়ে আছে। বরাদ্দ না থাকায় গৃহস্থেরা ওসব জমিতে পাট দিতে পারেনি। দেখতে দেখতে শীতাংশু এগিয়ে চলতে লাগল। বে-আইনী চাষের জন্য সোনাকান্দী গাঁয়ের দু'তিনখানা বড় বড় জমি শীতাংশু আজ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিয়ে এসেছে। সে জমিগুলোর পাট এর চেয়েও বড় আর ঘন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা ঠিক শীতাংশুর চাহিদা মেটাতে পারেনি। কেউ কেউ আবার ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছিল। না এসব কাজে দয়া-মায়া চলেনা। দোষ ঘাট হলে শীতাংশুকেই বা দয়া দেখায় কে। তাছাড়া মানুষের কাছ থেকে ভয় শ্রদ্ধা আর উপুরি পাওনা পেতে হলে কিছু বেশি পরিমাণে নিষ্ঠুর নৃশংস হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পথে বহু চাষী গৃহস্থদের সঙ্গেই দেখা হতে লাগল। সসম্ভ্রমে সবাই শীতাংশুকে নমস্কার জানাল। জনকয়েক বর্গাদার মুসলমান চাষী জমি থেকে তখনো ঘাস নিড়াচ্ছে। তারা হাত তুলে সেলাম জানাল। শীতাংশু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিতে দিতে এগুতে লাগল সদানন্দের পিছনে পিছনে।

বাড়ির সামনে একটি পানাভরা মজা পুকুর। চার পাশ থেকে নানা আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে। ভালোর মধ্যে দু'একটা আম আর খেজুর গাছ আছে মাঝে মাঝে। পুকুর পারের সেই আগাছার ভিতর দিয়েই সরু সাদা একটু পথ কুমারীর সিঁথির মত সোজা একেবারে বাড়ির উঠানে গিয়ে পেঁৗচেছে।

বছর পাঁচ ছয় আগে সদানন্দবাবুর মেজো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে শীতাংশু যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল তখন বাড়ির আশপাশ এমন জংলা ছিলনা। পুকুরটিও বেশ পরিষ্কার ছিল বলে মনে পড়ছে।

কিন্তু উঠানের ভিতর গিয়ে শীতাংশুর চোখে পড়ল আগের চেয়ে বাড়িই কেবল জঙ্গলা হয়নি, ঘরদোরও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। দুদিকে বারাণ্ডা ঘেরা উত্তরে ভিটির বড় ঘরখানা নড়বড়ে অবস্থায় কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। পূবের ভিটির অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরখানার অবস্থাও তথৈবচ। দুই মেয়ের বিয়েতে কিছু খামার জমি ছুটেচে, আর সালিশী বোর্ডের বিচারে কয়েক বিঘা মর্গেজী জমিও যে হারাতে হয়েছে সদানন্দবাবুকে তা শীতাংশু আগেই শুনেছিল। তবু ওঁর অবস্থা যে সত্যিই এতখানি খারাপ হয়েছে তা তার ধারণা ছিল না।

সদানন্দবাবু উঠান থেকেই ডাকতে ডাকতে চললেন, 'ওরে ও কুন্তলা, ও চুণী টুনি, দেখ্‌ এসে কে এসেছে। এসো বাবা ঘরে এসো।'

পিছনে পিছনে শীতাংশু ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বছর সতের বয়সের একটি

তন্বী শ্যামবর্ণা মেয়ে এদিকে একবার মুখ বাড়িয়েই আড়ালে চলে গেল। পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছোট আর দুটি মেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামনে।

শীতাংশু একটু ইতস্তত করে বলল, 'মায়ে মা কোথায়।'

সদানন্দবাবু একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'কোথায় আবার, আঁতুড়ে। কাল গেলে মাংটামি সার বাবা। এক জন্ম ধরে দেখলুম তো কেবল মেয়ে আর মেয়ে। গুটি তিনেক তবু মরে গিয়ে রেহাই দিয়েছে। এখন নিজের মরবার আগে ভাগ্য হোল পুত্র দেখবার। তাতো হোল, কিন্তু বলোতো বাবা লাভটা হোল কি, শিখিয়ে পরিয়ে এ ছেলেকে কি মানুষ করবার সময় মিলবে, না এর রোজগার খেয়ে যাওয়ার বেড় পাব আয়ুতে। ভগবানের উপহাস ছাড়া আর একে কি বলব বলো তো শীতাংশু।'

কি বলবে শীতাংশুও হঠাৎ ভেবে পেলনা। তবে এটুকু লক্ষ্য করল সবটুকুই হয়তো 'ভগবানের উপহাস' নয়। কিন্তু অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত পুত্রসন্তান যে লাভ হয়েছে তার প্রসন্ন পরিতৃপ্তি প্রৌঢ় পিতার বাচনিক নৈরাশ্যে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি।

সদানন্দবাবু আবার হাঁক দিলেন, 'কোথায় গেলি কুন্তলা, চেয়ারটা এগিয়ে দে শীতাংশুকে। ওর কাছে আবার লজ্জা কিসের তোর। আচ্ছা থাক, থাক, আমিই না হয় আনছি।'

কিন্তু আনত মুখে কুন্তলা ততক্ষণে একটা হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে এসেছে। শীতাংশু একবার তার দিকে তাকাল। বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে এই কুন্তলাকেই সে কি পাঁচ ছয় বছর আগে এঘরে ওঘরে ছুটাছুটি করতে দেখেছিল? দূর থেকে হাসতে হাসতে তার গায়ে হলুদ জল ছিটিয়ে দিয়েছিল কি এই শান্ত নিরীহ মেয়েটিই। বিশ্বাস করা শক্ত।

পাশের ছোট তক্তপোষখানায় নিজে বসে সদানন্দবাবু চেয়ারটা শীতাংশুকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো।'

এই ঘরেরই, পশ্চিম কানাচে ছোট একটু ঢাকা বারাণ্ডায় আঁতুড়। সুরলক্ষ্মী সেখান থেকে বলে উঠলেন, 'চটের আসনখানা চেয়ারের ওপর পেতে দে কুন্তী। নইলে ছারপোকার জ্বালায় একদণ্ডও বসতে পারবেনা।'

সবুজ সুতোয় লতা আর ফুল তোলা একখানা আসন চেয়ারের ওপর পেতে দিল কুন্তলা। শীতাংশু সেই আসন ঢাকা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আবার চেয়ারের হাঙ্গামা কেন এত। কুন্তলা তো আজকাল ভারি শান্ত হয়ে গেছে। কথাই বলেনা।'

সুরলক্ষ্মী আঁতুড় থেকেই বললেন, 'শান্ত না ছাই। দু দণ্ড বস, তাহ'লেই দেখতে পারবে।'

শীতাংশু বলল, 'তাই নাকি কুন্তলা।'

কুন্তলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'কি জানি। কথা বলিনি, তাতেই তো একদফা নালিশ হয়ে গেল শুনলেন তো। আর গোড়াতেই কথা বলতে সুরু করলে মা যে আরো কত কি বলতেন তার ঠিক নেই।'

সুরলক্ষ্মী আঁতুড় ঘরের দোরের একটি পাট ততক্ষণে খুলে দিয়েছেন। শীতাংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হতচ্ছাড়া মেয়ের ভঙ্গি দেখ কথার। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেই হবে, না হাতমুখ ধোবার জল টল এনে দিবি শীতাংশুকে।'

কুন্তলা অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'দিচ্ছি মা দিচ্ছি, তুমি শুধু চুপ করে দেখে যাও। তুমি আটকা আছ বলে সাধ্যমত আমরা কুটুম্বের অযত্ন করব না।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'আহাহা, সাধ্যের তো আর সীমা নেই। যত্ন করবার কত যেন সামগ্রী আছে ঘরে।'

এরপর আঁতুড় ঘরের সামনে এগিয়ে গিয়ে কুন্তলা ফিস ফিস করে মার কাছে কি বলল, তারপর আরও কি কি বলবার জন্য বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

বেড়ার আড়াল থেকে সদানন্দবাবুর অনুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'বাঁড়ুয্যেরা চাইলেও দেবেনা। তবে দত্তদের বাড়িতেই বোধ হয় পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে সেদিনও তাদের চা আসতে দেখেছি।'

কুন্তলার ফিস ফিস গলাও একটু একটু যেন কানে গেল শীতাংশুর, 'আস্তে বাবা আস্তে।'

ঘরে এসে ছাতাটা নিয়ে সদানন্দবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

শীতাংশু বাধা দিয়ে বলল, 'এই জলবৃষ্টির মধ্যে মিছামিছি আবার কোথায় চললেন তাঐমশাই।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'এক্ষুনি আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

শীতাংশু আর কোন কথা বলল না। সদানন্দবাবুর ছাতাটির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ছোটবড় গোটা তিনেক তালি পড়েছে ছাতায়।, নতুন নতুন আরো গোটা কয়েক যে ছিদ্র বেড়েছে তাতে বোধ হয় এখনো তালি দেওয়ার অবকাশ পাননি। কিংবা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টি যে রকম বড় হয়ে এসেছে তাতে মালিকের মাথা ও ছাতা কতক্ষণ শুকনো রাখতে পারবে শীতাংশু মনে মনে একবার না ভেবে পারল না।

এতক্ষণ ঘরে লক্ষ্মীর আসনের কাছে মাটির দীপে সরষের তেলের আলো জ্বলছিল

কুন্তলা এবার একটি হ্যারিকেন জ্বেলে আনল। চিমনির একটি জায়গায় সামান্য একটু কাটা কিন্তু বাকিটা কুন্তলা চুণ দিয়ে পরিষ্কার করে মেজে এনেছে। ছোট আকারের হ্যারিকেন। কিন্তু তারই আলোয় সমস্ত ঘরখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কুন্তলা বলল, 'আসুন, ওদিকে জল দিয়েছি বালতিতে। হাতমুখটা ভালো ক'রে ধুয়ে ফেলবেন। চিনু গামছাখানা নিয়ে আয় তো এখানে।'

চিনু এতক্ষণে একটা কাজের ভার পেয়ে খুসি হয়ে বলল, 'এক্ষুনি আনছি দিদি।'

তার ছোট টুনু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কি আনব দিদি।'

কুন্তলা জবাব দিল, 'তুমি শীতাংশুদার কড়ে আঙুল ধরে নিয়ে এসো।'

বারাণ্ডা থেকে কুন্তলার খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। সুরলক্ষ্মীও হাসি চাপতে চাপতে বললেন, 'হতচ্ছাড়ী কোথাকার।'

শীতাংশু বারাণ্ডায় উঠে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'কেউ এসে কড়ে আঙুল ধরুক, খুব বুঝি সখ।

কুন্তলা ইঙ্গিতে মার আঁতুড়ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে একটু হতাশ ভঙ্গি করল। অর্থাৎ এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব সে এখনি দিত যদি না মা থাকতেন ওখানে।

কুন্তলা বলল, 'এবার ভালো ছেলের মত হাতমুখটা ধুয়ে নিন। আর সাহেবী বেশটা কি পরাণ ধ'রে ছাড়তে পারবেন ? তাহলে কাপড় এনেদি।'

শীতাংশু বলল, 'আনো। যে বেশ তোমার এতখানি চক্ষুশূল তা বেশিক্ষণ পরে থাকতে ভরসা হয় না।'

হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট ছেড়ে ফেলে চুলপেড়ে একখানা ধুতী পরল শীতাংশু। কুন্তলা সেখানেই আয়না চিরুণী নিয়ে এল। আয়নাখানা শীতাংশুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখুন এবার মানিয়েছে কিনা।'

শীতাংশু মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মানিয়েছে যে তা তোমার মুখচোখেই দেখতে পাচ্ছি, কষ্ট করে এর জন্য আর আয়না আনবার দরকার ছিলনা।'

মুখ মুচকে শীতাংশু একটু হাসল।

কথায় কথায় কখন একেবারে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা, শীতাংশুর কথার ইঙ্গিত বুঝে তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়াল। শীতাংশু তার সেই লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন! এবার ? আচ্ছা জব্দ হয়েছ তো ? খুব তো বক্ বক্ করছিলে।'

কুন্তলা কোন জবাব দিল না। শীতাংশু প্রসঙ্গটা পালটে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তাঐমশাইকে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় পাঠালে বলোতো। চায়ের কি দরকার ছিল। চা যে আমি খাই সে কথা কে বলল তোমাকে।'

কুন্তলা যেন আর একবার আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'কে আবার বলবে। কে কি খায় না খায় আমরা মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।'

একটু বাদেই সদানন্দবাবু ফিরে এলেন। থালায় ক'রে মুড়ি গুড়, আর নারকেলকোরা দিয়ে জলখাবার নিয়ে এল কুন্তলা, বলল, 'একেবারে গ্রামদেশী খাবার। সেইজন্যই আপনার বিদেশী সাহেবী বেশটা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিলাম, বুঝেছেন?'

সুরলক্ষ্মী আবার বললেন, 'হতচ্ছাড়ীর কথার ভঙ্গি দেখ।'

চিনু আর টুনুর হাতে কিছু কিছু মুড়িগুড় তুলে দিল শীতাংশু। তারপর কুন্তলা নিয়ে এল চা। বলল, 'চা খাওয়ার তো আপনার অভ্যাস নেই, ধীরে ধীরে দেখেশুনে খাবেন, দেখবেন মুখ যেন পুড়িয়ে ফেলবেন না।'

সুরলক্ষ্মী ধমকের সুরে বললেন, 'পোড়ারমুখী এবার একটু থাম দেখি। মানুষ দেখলে ওর এত আনন্দ হয় শীতাংশু যে ও কি করবে, কি বলবে ভেবে পায় না। স্ফূর্তিতেই অস্থির।'

শীতাংশুও চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিল। এই বয়সে এমন সপ্রতিভ বাকপটু মেয়ে সে যেন এর আগে আর দেখেনি। খানিকক্ষণ আগে দেহমনে যে ক্লান্তি ছিল শীতাংশুর তা যেন সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে গেছে। এমন আনন্দ, এমন প্রসন্নতার স্বাদ দীর্ঘকাল ধ'রে পায়নি শীতাংশু। অফিসের কাজের চাপে অনেকদিন বাড়ি যেতে পারেনি। আর বাড়ি গেলেই বা কি। গেলেই মা আর বউদির একের বিরুদ্ধে আর একজনের নতুন নতুন নালিশ। অভাব অনটনের সংসারে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একপাল ছেলেমেয়ের হাতাহাতি মারামারি চলছে সবসময়। বাড়ি গেলেও দুঘণ্টার মধ্যে শীতাংশুকে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। এখানকার মত এমন শান্ত নিরবচ্ছিন্ন পরিতৃপ্তির মুহূর্ত বহুকাল ভাগ্যে জোটেনি শীতাংশুর। বাড়ির বাইরের জঙ্গল আর ভিতরের ঘরদোরের জীর্ণতা দেখে শীতাংশু আশাই করতে পারেনি যে এর মধ্যেও এমন একটি আনন্দের নীড় আত্মগোপন ক'রে রয়েছে।

সুরলক্ষ্মী খুঁটে খুটে বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শীতাংশুর দাদা বউদি মা, ভাইপো ভাইঝিদের কে কেমন আছে শুনতে চাইলেন। খুকুর সঙ্গে (শীতাংশুর সেই জেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী) অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না উল্লেখ করলেন সে কথা।

তারপর উঠল শীতাংশুর অফিসের প্রসঙ্গ। শীতাংশু বলল অল্প মাইনে আর অতিকষ্টের চাকরি। তাওতো ডিপার্টমেন্ট এখনো স্থায়ী হোলনা। চাকরি কবে আছে কবে নেই তারই বা ঠিক কি। পাটের সময় তো প্রায় সর্ব্বদা মাঠেমাঠেই বেড়াতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদিন যে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেবে তারও জো নেই। অড়িয়ালখাঁ নদীর পারের চর। তারই গাঁঘেষে অফিস। টুল টেবিল সরিয়ে রাত্রে তার মধ্যেই শোয়ার জায়গা ক'রে নিতে হয়।

শুয়ে শুয়ে কানে আসে নদীর অন্য পার ঝুপ ঝুপ ক'রে অনুক্ষণ ভেঙে পড়ছে তো পড়ছেই। এদিকে জাগছে চরের পর চর। আর কিচ কিচ করছে বালি। হাওয়া একটু জোরে বইলেই সে বালি উড়ে আসে চোখে মুখে বিছানাপত্রের মধ্যে। ঝাড়াপোছার পর বিছানা বালিস থেকে যদি বা সে বালি যায়, মনের ভিতর থেকে কিছুতেই তা দূর হতে চায়না। সেখানে দিনভর রাতভর বালি কেবল কিচ কিচ করতেই থাকে।

সদানন্দ আর সুরলক্ষ্মী দুজনেই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সবই ভাগ্য। নইলে বিদ্যাবুদ্ধি তো নেহাৎ কম নয় শীতাংশুর। দেখতে শুনতে বলতে কইতেও এমন ছেলে গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে না। কিন্তু কপাল। সুরলক্ষ্মী আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখিয়ে বললেন, 'সব এই চার আঙুল জায়গাটুকুর মধ্যে লেখা আছে বাবা। তার বাইরে কারোরই যাওয়ার জো নেই।'

অন্য কোন কুটুম্ব স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে দৈন্য কখনো প্রকাশ করেনা শীতাংশু। খুঁৎ খুঁৎ করে না ভাগ্য নিয়ে। বরং যতটুকু শক্তি তার চেয়ে বড়াই করে বেশি, বড় বড় চাল দেয়। কিন্তু সুরলক্ষ্মীর কথার ভঙ্গিতে এত গভীর স্নেহ আর মমতা প্রকাশ পেল যে তার মাধুর্যে দুঃখ আর দারিদ্র্যও যেন নতুন রকমের উপভোগ্য বস্তু হয়ে উঠল শীতাংশুর কাছে। এমন স্নেহার্দ্র সান্ত্বনা যখন আছে তখন দুঃখে আর ভয় কি।

সদানন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু দৈব যেমন আছে তেমনি আছে পুরুষকার। মহাভারতের কর্ণের কথা মনে আছে তো। আর তোমাদের তো এই উঠতি বয়স। বাধা বিঘ্ন ঠেলে পথ করবার এইতো সময়। তোমাদের তো হতাশ হলে চলবে না বাবা শীতাংশু। কতজনকে আশা দেবে তোমরা, বলভরসা দেবে, কতজন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, নির্ভর করবে তোমাদের ওপর।'

অতি প্রচলিত গতানুগতিক কথা। কিন্তু শীতাংশুর মনে হ'তে লাগল এ সব যেন সে আজ নতুন শুনছে। কেবল হিত কথাই নয়, সঙ্গীতের মত সদানন্দবাবুর এসব কথারও যেন সুর আছে, ক্ষমতা আছে মনোহরণের।

কুন্তলা রান্নার আয়োজনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস ক'রে কি জিজ্ঞাসা করছে এসে মায়ের কাছে, পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সদানন্দবাবু বললেন, 'জোর ক'রে তোমাকে পথ থেকে ধ'রে তো নিয়ে এলাম শীতাংশু, আদর আপ্যায়ন যা হবে তা ভগবানই জানেন।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'থাক্ থাক্, ভগবানের আর দোষ দিয়ো না, বাদলা বৃষ্টির জন্য গত হাটে গেলে না, আচ্ছা বেশ। কিন্তু সকালে তো বৃষ্টি ছিলনা—এত ক'রে বললাম

বাজারটা ক'রে এস যাও, তা দাবা নিয়ে বসা হোল চাটুয্যে বাড়ি, পুরুষমানুষের এত গাফলেতি থাকলে কপালে কি কোন দিন সুখ হয়। এখন শুধু শুধু ডাল ভাত আমি কুটুম্বের ছেলের সামনে কি ক'রে দিই।'

শীতাংশু বলল, 'আদর আপ্যায়ন কি কেবল খাওয়া পরার মধ্যেই আছে মাঐমা? কুটুম্বের ছেলে বলে কি তাকে অতই পর ভাবতে হয়?'

রান্নাঘর থেকে কুন্তলা এসে উপস্থিত হোল, 'আচ্ছা আপনি যে কেবল মা আর বাবার সঙ্গেই বসে বসে কথা বলছেন, ওঁরা ছাড়াও যে এখানে আরো দুটি প্রাণী আছে তাদের কথা কি আপনি একেবারেই ভুলে গেলেন?' শীতাংশু একটু বিস্মিত হয়ে কুন্তলার দিকে তাকাল। কুন্তলা মুখ টিপে হেসে বলল, 'চুনু আর টুনুর কথা বলছি। ওরা যে কতক্ষণ ধ'রে সেজেগুজে বসে আছে আপনাকে নাচ দেখাবে বলে?'

শীতাংশু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও তাই নাকি? তা এতক্ষণ বলনি কেন?'

কুন্তলার নির্দেশে চুনু আর টুনুর নাচগান আরম্ভ হয়ে গেল:

'অ মার কৃষ্ণ কানাই এল, রুণু রুণু, রুণু ঝুণু রে।'

একেবারে অপূর্ব মৌলিক পরিকল্পনা। শীতাংশু হেসে বলল, 'বেশ, বেশ। তা' এসব তোমরা শিখলে কোথায়?'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'কোথায় আবার শিখবে! সব কুন্তলার কাণ্ড। চাটুয্যে বাড়ির সেজমেয়ে থাকে কলকাতায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন পনেরের জন্য এসেছিল বাপের বাড়িতে। ওদের নাচতে গাইতে বুঝি দিন দুয়েক দেখে এসেছিল কুন্তলা বোনদের নিয়ে। তারপর বাড়িতে এসে বললে তোদেরও নাচতে হবে। আমার সব মনে আছে, ভুল হ'লে আমি ঠিক করে দেব। আচ্ছা একখানা মেয়ে হয়েছে বাবা। তারপর থেকে দিন নেই রাত নেই চুনু টুনুদের টেনে হেঁচড়ে মারধোর ক'রে—'

তারপর হাসতে লাগল শীতাংশু। তারপর উঠে বারাণ্ডায় গেল সিগারেট ধরাতে।

কুন্তলা গেল পিছনে পিছনে; 'নাচ কি রকম দেখলেন বললেন না তো।'

শীতাংশু সহাস্যে বলল, 'বারে বললাম যে। বেশ চমৎকার হয়েছে। কিন্তু চুনু টুনুর নাচ তো দেখলুম এবার তোমার নাচটা কখন দেখব।'

কুন্তলা বলল, 'অসভ্য কোথাকার। আমি নাচতে জানি নাকি যে নাচ দেখবেন আমার।'

শীতাংশু সকৌতুকে হাসল, 'ও নাচতে জানো না বুঝি। তা কি জানো তুমি?'

কুন্তলা আরও একটু কাছে এগিয়ে এল শীতাংশুর, ভ্রূদুটিতে অপূর্ব ভঙ্গি এনে বলল, 'নাচাতে গো নাচাতে।'

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে ফের চলে গেল রান্নাঘরে।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে ডাক পড়ল খাওয়ার। বড় ঘরের মেঝেয় সেই লতাফুলওয়ালা আসনখানা কুন্তলা পেতে দিল সযত্নে। কাঁসার বড় একখানা ছড়ানো থালায় এলো মোটা মোটা রাঙা চালের ভাত। দুটো ডাল, ভাজা, মাংসের মত করে রাঁধা সিঙ্গি মাছের ঝোল, একটু টক্, আর তারপর বড় একটি বাটির তলায় সামান্য একটু দুধ। উপকরণে বাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আর আন্তরিকতা যেন চোখে দেখা যায়। এমন তৃপ্তি আর পরিতুষ্টির সঙ্গে শীঘ্র কোথাও যেন আর খায়নি শীতাংশু।

সুরলক্ষ্মী বলে চললেন, 'ভাগ্যে জিয়ানো মাছ দুটি দত্তদের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল। কি রকম কি রেঁধেছে কে জানে। নিজে তো কিছু দেখতেও পারলামনা, করতেও পারলাম না।'

শীতাংশু বলল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে মাঐমা। দেখবার করবার এরপর আপনার কিছু আর ছিলনা।'

ঘটিতে করে আঁচাবার জল দিল কুন্তলা বারাণ্ডায়। টিপটিপ ক'রে তখনো বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কুন্তলা বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়েই আঁচান। ধুয়ে যাবে।'

শীতাংশু খানিকটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বলল, 'ধূয়ে যে যাবে সেই তো হয়েছে চিন্তা। আঁচাব কিনা ভাবছি। জলের ঘটি তুমি বরং ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

কুন্তলা বলল, 'কেন।'

শীতাংশু বলল, 'রান্নার স্বাদটুকু ঠোঁটে মুখে মেখে রাখতে ইচ্ছা করছে। জল দিলে তো ধুয়েই যাবে।'

কুন্তলা হেসে বলল, 'তা'হলে ধুয়ে কাজ নেই। শুকনো গামছা দিচ্ছি। মুখটা একটু মুছে ফেলুন, তবু খানিকটা স্বাদ থাকবে।'

শীতাংশু বলল, 'উঁহু, মুছিই যদি শুকনো গামছায় মুখ মুছে আর লাভ কি।'

কুন্তলা বলল, 'তবে কিসে মুছবেন।'

শীতাংশু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আঁচলে গো আঁচলে।'

পূবের সেই ছোট্ট টিনের ঘরখানির একদিকে ধানের গোলা, আর একদিকে একখানি তক্তপোষ পাতা। পাটের সময় পাট রাখা হয়, অন্য সময় খালিই পড়ে থাকে। কুটুম্ব-স্বজন অতিথি অভ্যাগত কদাচিৎ কেউ কখনো এলে শুতে দেওয়া হয় সেখানে। বাপ আর মেয়েতে মিলে বিছানাপত্র টানাটানি করে নিল সেই ঘরে। সুরলক্ষ্মী আঁতুড় ঘরে থেকেই ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'কাঠের বড় বাক্সটীর মধ্যে দেখ ধোয়া চাদর আর মশারিটা

রয়েছে। পাতলা কাঁথাখানাও বের করে দিস যদি শীত শীত করে শেষ রাত্রে গায়ে দেবে, আলমারীর মাথার ওপর দড়ি আর পেরেক পাবি, বোধ হয় বোঁচকাটার তলায় পড়ে গেছে। একটু খুঁজে দেখ কুন্তী, সবই আছে ওখানে।'

কুন্তলা বলল, 'ব্যস্ত হয়োনা মা, কোথায় কি আছে আমি জানি। সব আমি ঠিক করে নিতে পারব।'

কিছুক্ষণ ধরে ও ঘর থেকে ঝাড়া পোঁছা আর পেরেক ঠুকবার শব্দ এল। তারপর সদানন্দ চলে এলেন। কুন্তলা লাগল বিছানাপাততে। খানিক পরে এ ঘরে এসে বলল, 'যান শোন গিয়ে, হয়ে গেছে আপনার বিছানা।'

শীতাংশু বলল, 'এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল কি। তোমাদের তো এখনো খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত হয়নি।'

কুন্তলা বলল, 'হ্যাঁ, তা বাকি রেখেছি। সেই ভাবনায় যদি কিছুক্ষণ ঘুম আপনার বন্ধ থাকে। না হলে তো শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে সুরু করবেন।'

শীতাংশু বলল, 'আমার নাক ডাকে কিনা তুমি কি করে জানলে।'

কুন্তলা বলল, 'নাক দেখলেই আমরা বুঝতে পারি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'যাও বাবা, তুমি শোও গিয়ে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'হ্যাঁ, আর রাত কোরোনা। সারাদিন খাটুনি আর ঘোরাঘুরি গেছে রোদবৃষ্টির মধ্যে। এবার শুয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে।'

কুন্তলা বলল, 'দোর দেবেন না যেন। আমি একটু পরেই গিয়ে জলটল দিয়ে আসব, কি শীত কি গ্রীষ্মে রোজ রাত্রে আমার জল পিপাসা পায়। ঢক ঢক করে জল এক গ্লাস খাই তারপরে ফের ঘুম আসে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বিশ্বশুদ্ধ সবাই বুঝি তোর মত ভেবেছিস?'

এরপর শীতাংশু পূবের ঘরে উঠে গেল শোয়ার জন্য। হ্যারিকেনটি জ্বলছে এক পাশে। বিশেষ যত্ন করে পাতা হয়েছে বিছানা। দক্ষিণ শিয়রে দুটি বালিশ। সাদা ঢাকনির এককোণায় নীল দুটি পাতার আড়ালে লেখা কুন্তলা। বিছানার চাদরটি শুভ্র পরিচ্ছন্ন। শীতাংশুর মনে হোল এই অম্লান শুভ্রতা কেবল যেন এই শয্যাটিরই নয়। আর একটি কুমারী হৃদয়ের সানুরাগ শুচিশুভ্র পবিত্রতা এর সঙ্গে মিশে রয়েছে।

খানিকবাদে সত্যিই জলের ঘটি হাতে কুন্তলা এল ঘরে। তার সেই কালোপেড়ে আধময়লা শাড়িটা ছেড়ে পরেছে পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া ধানী রঙের আর একখানা শাড়ী। বোধ হয় রাঁধতে গিয়ে আগের শাড়িখানা এঁটো হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু শীতাংশুর মনে হোল শুধু সেইজন্যেই নয়, সেইজন্যেই নয়।

তক্তপোষের তলায় কিনার ঘেঁষে জলের ঘটিটা রাখল কুন্তলা, একটি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে ঢেকে দিল তার মুখ। তারপর মুহূর্ত্তকাল চুপ করে একটু দাঁড়াল। শীতাংশু তার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখল। মনে পড়ল সাইকেল নিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একদিন ক্লান্ত হয়ে একটা আমগাছে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছিল হঠাৎ তার চোখ পড়ল শস্য ভরা সামনের ছোট একখানি ক্ষেতের দিকে। এমন সবুজ শস্যের ক্ষেত তো শীতাংশু যেতে আসতে অহরহই দেখছে কিন্তু সেদিন যেন নতুন ক'রে দেখল, নতুন চোখে। কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় গেল বিরক্তি আর অপ্রসন্নতা। সমস্ত হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল। শীতাংশু অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল সেই শস্যের ক্ষেতের দিকে।

কুন্তলার চোখে আর একবার চোখাচোখি হোল শীতাংশুর। সেই মুখরা মেয়ের চঞ্চল চোখ দুটি যেন এ নয়। শস্যের ক্ষেতের ওপর এ যেন একটুকরো মেঘ করা আকাশ—স্নিগ্ধ, শ্যাম, সুগম্ভীর। শীতাংশু ভাবল কুন্তলা হয়তো কিছু বলবে, কুন্তলা ভাবল হয়তো কোন কথা বলবে শীতাংশু। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ কিছু বলল না। ক্ষণিকের জন্য দুজনের এঁই যুগ্ম উপস্থিতিই যেন শুধু বাঙ্ময় হয়ে রইল। তারপর দোর ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল কুন্তলা। শীতাংশু কান পেতে রইল। লঘু পায়ের শব্দ বাইরের টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধ'রে জেগে জেগে সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল শীতাংশু। তারপর কখন দু'চোখ ভেঙে এল ঘুমে।

খুব ভোরেই যাত্রার আয়োজন সুরু করতে হোল। মুখ হাত ধুয়ে শীতাংশু আবার পরল সেই খাকির হাফপ্যাণ্ট। কিন্তু প্যাণ্টটির রুক্ষতা যেন আর টের পাওয়া যাচ্ছেনা। শীতাংশুর সর্বাঙ্গে মনে কালকের সন্ধ্যার আর রাত্রের সেই আদর যত্নটুকু যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপের মত লেগে রয়েছে। দুটি নারকেল নাড়ুর সঙ্গে এক কাপ চা এনে দিল কুন্তলা। তাড়াতাড়িতে কোনো খাবার খেয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে না বলে সুরলক্ষ্মীর নির্দেশে একটি পুঁটলিতে করে কিছু চিড়া আর গুড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে কুন্তলা বেঁধে দিয়ে এল। চুনু আর টুনু পায়ের ওপর কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল শীতাংশুকে। কুন্তলা নিচু হয়ে পায়ের ধূলো নিল। শীতাংশু সস্নেহে চুনু টুনুর গাল টিপে দিয়ে স্মিতমুখে কুন্তলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটি ছল ছল করছে। শীতাংশুর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু এ যেন কেবল বেদনা নয়, তার সঙ্গে এক অনাস্বাদিত আনন্দও যেন মিশে রয়েছে। শীতাংশু কি যেন বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ আঁতুড়ের ভিতর থেকে

সুরলক্ষ্মী অনুচ্চ, মিষ্টি কণ্ঠে ডাকলেন, 'শীতাংশু, চলে গেলে নাকি বাবা।' শীতাংশু লজ্জিতকণ্ঠে বলল, 'না মাঐমা, আসছি।'

মনে পড়ল সুরলক্ষ্মীকে প্রণাম না জানিয়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তাড়াতাড়ি ভুল ক'রে সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল। ছি ছি ছি, নিজেকে শীতাংশু একটু তিরস্কার না ক'রে পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি আঁতুড় ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল।

ছেলেকে বোধ হয় স্তন্য দিচ্ছিলেন সুরলক্ষ্মী, তাড়াতাড়ি একটু সংযত হয়ে বসলেন। কোলের ওপর শিশু আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শীতাংশু চেয়ে চেয়ে দেখল ভারি সুন্দর চেহারা হয়েছে সুরলক্ষ্মীর এই ছেলের। চমৎকার চোখমুখের গড়ন, আর মোমের মত ফুটফুটে রঙ। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সোনালী রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে, খানিকটা রোদ লেগেছে সুরলক্ষ্মীর মুখে। শীতাংশু চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করল।

সুরলক্ষ্মী সস্নেহে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক।'

সদানন্দও সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুরলক্ষ্মী বললেন, 'শীতাংশুকে বলেছিলে কথাটা ?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'না, তুমিই তো বলবে বললে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বেশ বলছি, শীতাংশুর কাছে আবার লজ্জা।'

শীতাংশু বলল, 'ব্যাপার কি মাঐমা।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'ওই সেই তিন বিঘা জমির কথা শীতাংশু। বরাদ্দের চেয়ে ওই ক'টুকরো জমিতে নাকি উনি বেশি বুনিয়েছেন। শুনেই আমি কিন্তু বলেছিলাম তা বুনিয়েছ বুনিয়েছ, আমাদের শীতাংশু থাকতে আর ভাবনা কি। ওকে একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, দেখি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ক'রে না বলতে পারে।'

সুরলক্ষ্মী একটু থামলেন কিন্তু শীতাংশু কোন জবাব দিলনা দেখে তেমনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'উনি অবশ্য বলেছিলেন অনেক টাকাপয়সার ব্যাপার। এরজন্য বহু খরচপত্র করতে হয়। কিন্তু শীতাংশু কি দিয়ে খাই না খাই, কোথায় শুই, কি ক'রে থাকি সবই তো নিজের চোখে দেখলে বাবা, তুমিই বল খরচপাতির জন্য টাকা দেওয়ার কি সাধ্য আছে আমাদের ?'

শীতাংশুর বুকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। এবার আর আনন্দের কোন অনুভূতি নেই। হিংস্র বিষাক্ত একটা বল্লম কেউ যেন তার বুকে ছুঁড়ে মেরেছে।

মুহূর্ত্তকাল চুপ করে থেকে ম্লান একটু হাসল শীতাংশু তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'সেজন্য ভাববেন না মাঐমা। সব ঠিক করে নেব। টাকার চেয়ে বেশিই আপনারা দিয়েছেন।

এত আর কোথাও পাইনি। মনে মনে বলল, 'এমন করে হারাবার দুর্ভাগ্যই কি আর কখনো হয়েছে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বাঁচালে বাবা, এমন ভাবনা হয়েছিল আমার।'

সাইকেলে উঠবার আগে কুন্তলার দিকে আর একবার তাকাল শীতাংশু। মনে হোল তার চোখে আর জল নেই, ঠোঁটের কোণে কৃতার্থতার হাসি ফুটে উঠেছে।

দ্রুত প্যাডেল করে গাঁ ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল শীতাংশু। সবুজ কচিকচি পাটের পাতা হাওয়ায় দুলছে। কুন্তলার সেই পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া সবুজ রঙের শাড়িখানা যেন আর একবার শীতাংশুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তারপরই শীতাংশু মনে মনে অদ্ভুত একটু হাসল। হয়তো এরই মধ্যে আছে সদানন্দ গাঙ্গুলীর বরাদ্দের বাড়তি সেই তিন বিঘা জমি।

রাতের সেই টিপ টিপে বৃষ্টি আর নেই। নীল নির্মল আকাশে ভোরের সেই সোনালী স্নিগ্ধতা মেঘান্তরিত খররৌদ্রে দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছাব্বিশ

'কে ?'

তামসী উত্তর দিল না। এগিয়ে আসতে লাগল পা টিপে-টিপে। এগিয়ে আসতে লাগল নতুন নির্জনতায়। নতুন উন্মুক্তিতে। উষসী নেই, সে চলে গিয়েছে বাড়ি ছেড়ে, এ যেন একটা কত বড় থাকা, কত বড় পরিপূর্ণতা।

বাঁটোয়ারার মোকদ্দমা চুড়ান্ত ডিক্রি হয়ে অংশ মোতাবেক ছাহাম পেয়েছে সরিকরা।

নম্রা ভাঁউয়ে চিহ্নিত দখল নিয়েছে। ঋষিবর চলে গিয়েছে তার বেদ-বিদ্যালয়ে, বার লাইব্রেরিতে।

এলেকা ছোট হলেও একলা কর্ত্তাত্তি পেয়ে আস্থা বেড়ে গিয়েছে প্রাণধনের। জমিদারিতে জিদ এসেছে। আগে যখন এজমালে ছিল, ভাবখানা ছিল কি করে ফুঁকে দেবে, এখন ভাবনা হয়েছে আটঘাট বেঁধে কি করে বাজিয়ে যাবে বাজনা। মানে, খাজনা আদায়ের বাজনা। তাই খুব কড়া করে গেরো দিচ্ছে। ঘসামাজা করছে হিসেবে। কি করে খরচ-অখরচ কমাবে, আয়-আদায় বহাল রাখবে ষোলআনা। আত্মীয়ের আগাছার ঝাড় বিদায় করে দিয়েছে একঝাঁটে। ঝি ছাড়িয়ে দিয়ে চাকর রেখেছে। মদের বদলে ধরেছে আফিং। আগে যদি বা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, এখন হয়েছে কঠোর কৃপণ আচারভ্রষ্ট।

'কে ?'

মেয়ে-মেয়ে লাগছেনা ? মন উড়ু-উড়ু করে নাকি ? হোঁক-হোঁক করে ? না, ঘুপসি সেরেস্তায় বসে ঝাপসা দেখছে প্রাণধন। উচাটন হবার আছে কি ? র-ঠ করে একটা বিয়ে করে নিলেই চলবে। মাঠান জমির মত মেয়ে, সবসময়েই যে মাটি হয়ে আছে। ঘাসজলের মত। অমন ডাকাতে বাড়ীর মেয়ে নয়। দেখতে ছোট হলেও ধানীলঙ্কার ঝাল বেশি।

হ্যাঁ—তারপর—বাহাত্তরের দুই নামল হাতে রইল সাত—

হিসাব তজদিন করছে প্রাণধন। কোথাও না পাই-পয়সার তছরুপ হয়। একপাশে দাঁড়িয়ে সেহানবিশ, আরেক পাশে তশিলদার।

'কে ? দিদি না ? সেই দেবীমূর্তি না ?' এক লাফে বারান্দায় চলে এল প্রাণধন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তামসীর পায়ের উপর। আর, এতটুকুও প্রস্তুত হতে না দিয়ে উদ্দামশব্দে কেঁদে উঠল হাউ-হাউ করে।

এমন একটা বিষবিকৃত মুখ কল্পনা করতে পারতনা তামসী। এমন একটা পিণ্ডাকৃত মূর্খতা।

'আমার মধ্যে আর অস্তবস্তু নেই, আমি ঝাঁঝরা হয়ে গেছি। ফোঁপরা হয়ে গেছি। আমাকে বাঁচান।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'এদিকে লাটদারি পেলাম ওদিকে আমার মহাল লাটে উঠল। সিংহাসন পেলাম কিন্তু মুকুট পড়ল খসে। আনলাম সোনার খাঁচা তৈরি করে, কিন্তু পাখি আমার উড়ে গেল—'

'কেন, মরে যায়নি তো ?'

'মরে গেলে দেশশুদ্ধ লোককে ডেকে আনতাম দিদি, কি করে সোনার পিরতিমেকে

বিসর্জন দিতে হয়ে। চন্দনকাঠে দাহন করতাম তাকে। গায়ে পরিয়ে দিতাম গমগনে গয়না। আগুন না সোনা কে বেশি রাঙা—লোকের ধাঁধা লেগে যেত। কিন্তু এ আমার সে কী করল—'

আবার উদ্দাম কান্না। অসহায়, অপটু উষসী কিছু একটা করেছে তা হলে!

'কী করেছে?'

'আমার ঘরের চুড়ো ভেঙে দিয়েছে, নড়িয়ে দিয়েছে ভিত-বনেদ। মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে আমার। কাউকে না বলে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে একদিন।'

তামসীর হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। হাততালি দিয়ে উঠতে। কিন্তু মুখে একটা দয়ালু দুঃখের ভাব মাখিয়ে রেখে জিগগেস করলে, 'কোথায় গেছে?'

ভগ্নহৃদয়ের হতাশ ভঙ্গি করল প্রাণধন। বললে, 'কেউ জানেনা। কত খোঁজাখুঁজি, কত থানা-পুলিশ, কোথাও কোনো খবর নেই।'

তবু এটাই যেন কত বড় সুখবর। উষসী যে এই জীবন্মৃততা থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে এটাই একটা অপূর্ব ঘটনা। বিপ্লবের নিমন্ত্রণপত্র তারও দুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে। একটা ডাকাতি হোক এ বাড়িতে, তাকে নিয়ে যাক এ বাড়ির বাইরে, এ তার একান্তের কামনা ছিল। কিন্তু নিজেই সে নিজের অন্তরে খুঁজে পেয়েছে সেই দুর্বৃত্তকে। দরজা খুলে তাকে নিভৃতে অভ্যর্থনা করতে হয়নি। দরজা খুলে নিজেই সে তার অভিসারী হয়েছে। হোক সে মৃত্যু, হোক সে কলঙ্ক, তবু তা বিপ্লবের সারথি। সে এ জীবন থেকে দেখতে পেয়েছে আরেক জীবনাধিককে।

উপরে চলে এল তামসী, অন্তঃপুরের নিরালায়। ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় নিম্নস্বরে জিগগেস করলে, 'কেন চলে গেল?'

'এবার না জানি কি অকথ্যকথন শুনতে হয়। কিন্তু প্রাণধন স্বচ্ছন্দে সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিল। বললে, সে অধম, সে অযোগ্য, সে কদাচারী। অনেক সে তার ক্লেশের কারণ হয়েছে, অনেক অপমানের। ক্ষীরপঙ্ক ছেড়ে সে ক্লেদপঙ্কে গিয়ে ডুবেছে। পাপ স্বীকার করতে তার আর আজ কুণ্ঠা নেই। কেননা সে আজ থেমেছে, ফিরেছে, পৌঁচেছে তার নিজের জায়গায়। আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি দিদি, আমি বদলে গেছি, ছেড়ে দিয়েছি সেই অধঃপাতের রাস্তা। যতই ভোগের আগুন জ্বালি নিজেই দগ্ধ হই, ভোগ আর নিবৃত্ত হয়না। সেই ময়দানের আর ওর নেই। যত দৌড়ুই, ময়দানও ততই বেড়ে যায়। আমি হাঁপাই কিন্তু ময়দান হাসে। আমি ফুরোই কিন্তু ময়দান ফুরোয় না। তাই মাঠ ছেড়ে ঘরে চলে এসেছি। কিন্তু আমার সেই ঘরের মানুষ, মনের মানুষ ফিরল কই?

তামসী ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল ঘর-দোর। সমস্ত কেমন সাজানো-গুছোনো, চুপ-চাপ। একটা যেন শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ পড়েছে। সত্যিই একটা পরিবর্তন হয়েছে গৃহবাসের। আগের সেই ফেনিল কদর্যতা নেই, সেই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। শান্তি ও স্তব্ধতার পবিত্রতা যেন অক্ষত হয়ে আছে।

তামসীর বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। এই স্তব্ধতা মৃত্যুর স্তব্ধতা নয় তো? আত্মহত্যা করেনি তো উষসী?

বাড়িতে পা দিয়েই তখুনি তাই চলে যাওয়া গেল না। কদিন থেকে এ রহস্যের উদ্ধার করতে হবে।

একটা কোথাও স্ত্রী-আত্মীয় নেই। সব বিতাড়িত হয়েছে। সাধারণ ঝি-চাকর আমলা-ফয়লা আছে, তারাও আনাচে-কানাচে নির্বাসিত। জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্তি হয়না, তা ছাড়া শেখানো কথাই বলবেনা তার ঠিক কি। চোখ মেলে রাখলেই সত্য উদ্ঘাটিত হবে। ধৈর্য ধরো। ধৈর্য কাকে বলে তার মতো আর জানে কে?

'আপনি কদিন এখানে থাকুন।'

তামসী দ্বিরুক্তি করল না। বললে, 'থাকব। যদ্দিন না একটা কিনারা হয়।'

'থাকবেন?' প্রাণধন উছলে উঠল: 'রাণীর মতো থাকবেন, না ঘরনীর মতো? মানে,' প্রচণ্ড হোঁচট খেয়ে নিজেই সামলে নিল তক্ষুনি: 'মানে, মানী অতিথির মতো দূরে-দূরে পর হয়ে থাকবেন না আত্মীয়ের মতো সব কিছু আপনার করে আপনার হয়ে থাকবেন?'

সরল সহাস্য মুখে তামসী বললে, 'আত্মীয়ের বাড়ি এসে পর থাকতে যাব কেন?'

প্রাণধন জানে এই মহত্ত্বময় উত্তরই সে শুনতে পাবে। যদি বিশ্বাস করেন তো বলি, আপনার আসবার আগে আপনাকেই চিঠি লিখছিলুম। আর কাকে নালিশ জানাব আপনি ছাড়া?, আগ্রহই শেষ পর্যন্ত বিগ্রহে প্রকাশিত হল। আমি জানি আমার এ নিঃস্বতায় আপনি বিমুখ থাকতে পারবেন না। আপনি বিচার করবেন, বিহিত করবেন।

সরলতারও নিষ্ঠুরতা আছে। তামসী বললে, 'বলুন কী করতে হবে, করব।'

শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল প্রাণধন। 'আমি আর পারিনা। ভেঙে পড়ছি। আপনি আমার সংসারের ভার নিন।'

'স্বচ্ছন্দে।' ভ্রূক্ষেপও করলনা তামসী। প্রায় হাত পাতল। বললে, 'স্বচ্ছন্দে কেন, সানন্দে। যদ্দিন না উষসী ফিরে আসে তদ্দিন তার সংসারের হাল-চাল ঠাট-বাট সব আমি বজায় রাখব। দিন, চাবি দিন আমার হাতে।'

উষসীর কাঁচের আলমারির মধ্যে অনেক বই-খাতার ফাঁকে বাবার একটা ফোটো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বুকটা শিউরে-শিউরে উঠছে তামসীর। বাবার মুখ সে ভুলে

গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল সেই অপরূপ উজ্জ্বল চক্ষুদুটো। সে-চোখে শুধু তিরস্কার, না, আছে কোনো প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ চোখের কাছে এনে তাই দেখতে ভারি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। তিনি যে তাকে মসী বলে ডাকতেন সে কি শুধু কালিমার কাহিনী, না তাতে আছে জ্যোতির্ম্ময়তার প্রতিজ্ঞা ? একদিন কলঙ্কী চন্দ্রের সঙ্গে তমোহারী সূর্য্যের একত্র বাস হয় বলেই তো তা আমাবস্যা।

তা ছাড়া, কে জানে, হয়তো ঐ তার গোপন আলমারিতেই রয়েছে তার চলে যাওয়ার ঠিকানা।

এক তাড়া চাবি নিয়ে এল প্রাণধন। বললে, 'আপনি আজ আমাকে এক পলকে হালকা করে দিলেন। আঁকড়ে ধরার চেয়ে ছেড়ে দেয়ায় যে কী সুখ তা বুঝতে পাচ্ছি এখন।'

হ্যাঁ, একটা লোহার সিন্ধুকের চাবি, একটা মহাফেজখানার। বাক্স-প্যাঁটরা আলমারি সিন্দুক সব আপনি বুঝ-সমুঝ করে নিন। লাগামে ঢিল দিতে চান দিন, কষতে হয় কষুন। জমিদারিটা বাঁচান।

ঘাবড়ালনা তামসী। বললে, 'একদিনে সব হজম করতে পারবনা। আস্তে-আস্তে। আজকে শুধু এই কাঁচের আলমারির চাবিটা দিন। কে জানে, হয়তো একটা আলমারি আয়ত্ত করবার আগেই সে এসে পড়বে।'

সে এসে পড়লেই বা তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে কে ? যে অমন গোঁয়ারের মতো জোর দেখিয়ে চলে গেল এ সংসারে তার আবার প্রশ্রয় কোথায় ?

তা ছাড়া, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আর আসবেনা।

আসবেনা ?

না, সে গেছে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে। আমাকে জবরান্ জব্দ করতে। আমার মুখে কালিজুলি মাখাতে। তার পথে বাধা আসুক, আঘাত আসুক, অপমান আসুক, এখানে ফিরে আসবার মত পরাজয় সে কিছুতেই ভাবতে পারেনা। আর, আমিই বা কী ভাবতে পারি বলুন ? আমি কি এত সামান্য এত সম্বলহীন যে যে গেছে তারই জন্যে হাপুস-চোখে কাঁদব, যে আসছে তার জন্যে হা-পিত্যেশ করবনা ? হরে-দরে পুষিয়ে নিতে পারবনা ? বাজার এখন পড়তি বলেই কি আর আমার পড়তা পড়বেনা ভেবেছেন ?

এ একেবারে আরেক রকম মূর্তি। তবু দেখনহাসি হাসল তামসী। বললে, 'বলা কি যায়, বহুদিনের অদর্শনের পর যদি ফের দেখা হয়, হয়তো আঁকুপাঁকু করে উঠবেন।'

আর কত অদর্শনের দণ্ড নিতে হবে তাকে ? নিতান্তই বদলে গেছে বলে সে আর হালুচালু করছেনা। ভদ্র হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। দুঃখরাতের বুক চিরে চাঁদের কলি

দেখা দিলেও জোয়ার তুলছেনা। বসে আছে পূর্ণিমার প্রতীক্ষায়। পূর্ণপাত্রের প্রতীক্ষায়। প্রাণধনও শোধ তুলতে জানে।

দুপুরের শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর তামসী উষসীর আলমারিটা ঘাঁটতে বসল। বাবার ছবিটা দেখল অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে। সে দৃষ্টিতে আশীর্বাদ না ভৎ'সনা কিছুই পড়তে পারছেনা তামসী। যেন একটা অভয়দক্ষিণার আভাস পাচ্ছে—শুধু এগিয়ে যাবার আহূতি। অশ্রু-নম্র চোখে প্রণাম করে আবার তা রেখে দিল স্পষ্ট জায়গায়। উষসী যখন ফিরে আসবে তখন প্রথমেই যাতে চোখে পড়তে পারে। যাতে সহজেই এ-চোখে খুঁজে নিতে পারে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

আরো অনেক সে ঘাঁটাঘাঁটি করল। কতগুলি শাড়ি-জামা, বই-খাতা, খুচরো গয়নার খোলা একটা বাক্স, কিছু টাকা-পয়সা আর টুকিটাকি কটা প্রসাধনের জিনিস। কাগজপত্রের জঞ্জাল ঘেঁটেও পাওয়া গেল না একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো। অগ্নিদীপনের এতটুকু ধূমচিহ্ন।

রাত্রে শুয়ে একাকী অন্ধকারে তামসীর ভয় করতে লাগল। প্রাণধনের ভব্যতার ভয় নয়, উষসীর ভবিতব্যতার ভয়। সে ক্ষীণশ্বাস জলধারা কি করে হঠাৎ অত্যস্তগামিনী হল— পাষাণবিদারিনী? কী দুর্নিবার দুঃসাহসে সে এই উচ্চচুড় অভিজাত আশ্রয় ছেড়ে চলে গেল অপরিচিত অন্ধকারে? সে কিসের প্রেষণা? সে কি প্রেম, না, মৃত্যু, না অবিচ্ছিন্ন অত্যাচার? কোন শান্তি, কোন সিদ্ধির সন্ধানে সে আজ দূরযায়িনী?

আর তামসী কিনা একটি উষ্ণ নীড়ের জন্যে পাখা গুটিয়ে রয়েছে। সে কিনা চাইছে পত্রপরিবৃত শ্যামল স্নেহচ্ছায়া। মনে-মনে সেই লিপ্সা আছে বলেই হয়তো বিশ্রাম নিতে বসেছে এখানে। এমন কি, মনের গহনে এমন প্রার্থনা পর্যন্ত করছে যেন উষসী একদিন ফিরে আসে। ফিরে এসে বাবার ছবিকে প্রণাম করে মার্জ্জনা চেয়ে নেয়।

না, বাবা মরে গেছেন। উষসী যেন কোনো দিন না ফিরে আসে। তার আরম্ভের যেন না শেষ হয়। আর সে, নিজে,—বালিসে মুখ ঢাকল তামসী—ঝরে যাক, মরে যাক, কোনো দিন যেন না ফিরে যাবার নাম করে। তার শেষের আর আরম্ভ না হয় কোনোদিন। সমুদ্রের মৌনে সে ডুবে যায়, মুছে যায় নিঃশেষে।

প্রাণধনকে কি ভব্যতায় আরো শিক্ষিত করা দরকার? আরো তপঃক্লেশসহ? নইলে দিনে-দিনে তামসী শিকড় মেলছে কেন? একটার পর একটা চাবি বাঁধছে কেন আঁচলে? সমস্ত সংসারে রাখছে কেন প্রশ্রয়ের শীতলতা? প্রসারিত অধিকারের স্বীকৃতি?

যে যাই বলুক, ভীত স্তব্ধ বাড়ির দেয়াল থেকে এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। কেন, কোথায় চলে গিয়েছে উষসী?

তামসী নিচে নেমে এল, চাকর-বাকরের মহলে। রান্না-ভাঁড়ারের তদারকে। সবাই

পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। আনাচেকানাচে কান পেতেও কানাঘুষো কিছু শুনতে পেলনা। জিগগেস করলে, সেই বুড়ো ঝিটা কোথায় ? শুনলে হুজুরানীর সঙ্গে ঠিক ভাবে কথা বলতে পারেনি বলে বরখাস্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, যে সর্বশেষ বন্ধুটি ছিল তাও আর নেই।

'আপনি কেন যাবেন রান্নাঘরে কালিঝুলি মাখতে ?' প্রাণধন আপত্তি করল। 'ওখানে কি আপনাকে মানায় ?'

কোথায় মানায় জিগগেস করল না তামসী। বললে, 'কাজ একটা কিছু করতে হবে তো—'

'কাজ ? কাজের ভাবনা কি। চলুন কোথাও আমরা দূরে বেড়াতে যাই, অনেক দূরে।'

'আপনার জমিদারি ?' তামসী হাসল। 'জমিদারি দেখবে কে ?'

'দেখুক না-দেখুক, কিছু এসে যায় না। ও আমি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি এত ছেড়েছেন, আপনার জন্যে —'

'কেউ কিছুই ছাড়ে না। ছাড়িয়ে নেয়। তাই ছাড়িয়ে নেবার দিন না আসা পর্যন্ত ছেড়ে দেবেন না দয়া করে। বরং ভাল করে চৌকি দিন।'

এতে এত হাসবার কী ছিল কে জানে। প্রাণধন দম নিয়ে বললে, 'তাইতো আপনাকে রেখে দিতে চাই। এক বিষের কাটান আরেক বিষ।'

তামসী চুপ করে গেল। একটা ইঙ্গিত কি ঝলসে উঠল হঠাৎ ?

'কোথায় আর টো-টো করবেন, এখানেই থেকে যান।' প্রাণধন স্খলিতস্বরে বলতে লাগল : 'ব্যাপারটা মোটেই অশাস্ত্রীয় হবে না। আমি অনেক ভদ্র হয়েছি। বাঁটোয়ারার পর আমার আয় বেড়েছে। নতুন বাড়ি কিনছি কলকাতায়। কেন ঘরের সন্ধানে আর দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবেন ? এত বড় যার আশ্রয়, তার কিসের অভাব ?'

'বা, আমি তো এই বাড়িতেই আছি ! সবুর করুন, আগে উষসীর মৃত্যুসংবাদটা জানি ঠিকঠাক।'

একটা খাস-ঝি বহাল হয়েছে তামসীর। বলে, 'বাবু বলেন কী অমন কালিঝুলি মেখে বসে থাক—এটা ভালো দেখায় না। সাজগোজের বয়স তো আর চলে যায়নি—'

যায়ইনি তো। কই, গয়না-শাড়ি কই ? শুধু মুখের কথা।

অতদূর ঝি কী জানে ? সে বড় জোর চুল বেঁধে দিতে পারে, নখ কেটে পড়িয়ে দিতে পারে আলতা। গায়ের মাটি তুলে দিতে পারে ঘসে-ঘসে।

তাই দে বাবা, তাই দে। আর এমন সুযোগ পাব না। পা দুটো টিপে দে আচ্ছা করে। কত হেঁটেছি, আরো কত হাঁটব।

হাঁটতেই একদিন বেরুচ্ছিল তামসী। বুঝছিল বাড়িতে বসে থেকে কোথাও সে ঠিক সন্ধান পাবে না। পাবে বাইরে, প্রতিকূল প্রতিবেশীর মহলে।

'শুনুন।' পিছন থেকে ডাক দিল নগেন। বাজার-সরকার। 'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

ব্যাপার কী ?

ব্যাপার সামান্য। এই বেশবাস তার পক্ষে উপযুক্ত নয়, বিশেষত যখন সে পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেরুচ্ছে। অন্তত যে-বাড়িতে সে অধিষ্ঠাত্রী হয়েছে তার মর্যাদার অনুরূপ নয়।

সত্যিই তো। তামসী লজ্জায় হেসে ফেলল। বললে, 'তবে ছাদে গিয়ে বেড়াই।' বুঝল, পাড়া বেড়াবার পথ তার খোলা নেই।

আরেক দিন আবার ডাক পড়ল তামসীর।

ওটা সেরেস্তা। আমলা-মুহুরির আস্তানা। ওখানে আপনি যাবেন কেন ?

বা, জমিদারির কাজকর্ম একটু-আধটু শিখতে চেষ্টা করব না ? কী ভাবে খাতা লেখে, তেরিজ কষে ? কোন খাতার কী নাম ?

না। জমিদার বাড়ির সেটা রেওয়াজ নয়। তাদের বাড়ির স্ত্রীলোকের আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

এখন বুঝতে পারছি। অনুতপ্ত মুখ করল তামসী। একেবারে হেঁজিপেঁজির ঘর থেকে এসেছি কিনা, সব ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না।

বুঝল, দোতলা থেকে নামা তার নিষেধ হয়ে গেছে।

জামবাটি করে সকালে দুধ নিয়ে এসেছে ঝি। তাই খেতে-খেতে তামসী নিচে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনল। ক্রুদ্ধ ও আর্তকণ্ঠের চীৎকার।

ঝিই এসে খবর দিল। সেহানবিশবাবুকে কর্তা মেরেছেন। হ্যাঁ, গায়ে হাত তুলে মেরেছেন। হিসেব মেলাতে ভুল করছিল বারে-বারে।

শুধু মারা ? চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। হিসেব মেলাতে পারে না, সে আবার সেহানবিশ ? চুপি-চুপি দেখে আয় তো, এখনো চাকরি করছে কিনা—

করছে বৈ কি। তার পরের দিনও করছে। না করলে খাবে কি ? তবে যা, চুপিচুপি এই চিঠিটা দিয়ে আয় তাকে। তার চাকরিটাকে খেতে হবে।

দুপুরবেলা প্রাণধন ঘুমোচ্ছে। কটা ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দোতলার সিঁড়ির মুখে সেহানবিশ, বটকৃষ্ণ, তামসীর সঙ্গে দেখা করলে। ত্রস্ত স্বরে বললে, 'কী জরুরি কথা, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। নগেন সরকার দেখে ফেললে বাবুর কাছে রিপোর্ট করে দেবে। আমার চাকরি থাকবে না।'

'আপনার চাকরি যায় তাই তো আমি চাই।'

'চান ?'

'হ্যাঁ, সমর্থ পুরুষ হয়ে মার ফিরিয়ে দিতে পারেন না তার আবার চাকরি কি ?'

'সকলেই নারায়ণ রায় হতে পারে না। আমাদের যাদের ছাপোষা সংসার আছে—'

কে নারায়ণ রায় ? বাড়ি কোথায় ? সে এখানে কেন ?

সে এখানে আমারই মত খাতা লিখত। কী খেয়াল হয়েছিল ভিতর থেকে দেখতে এসেছিল জমিদারির ফের-ফেরেব। কী ভুল করেছিল, বাবু তাকে চড় মেরেছিলেন। সে জেল-খাটা স্বদেশী, আপনি আর কোপনি, চতুর্গুণ করে মার সে ফিরিয়ে দিলে। শুধু শরীরে নয়, মনে, সমস্ত সংসারে। চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সময় একা গেল না, বাবুর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

তামসীর বুক কাঁপতে লাগল শুকনো পাতার মত। কি করে সম্ভব হল এ অঘটন ?

অন্তঃপুরেও ছিল এমনি মারের কাঠিন্য। মনের বৈরিতা। দুই অত্যাচারিতের মধ্যে জন্মেছিল এক অলক্ষ্য সহানুভূতি একই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। একই পথ তারা আবিষ্কার করল, শুধু নির্গমনের নয়, প্রতি-আক্রমণের। সমধর্ম কর্মের দীপনায়। এক দুরুচ্ছেদ শোষণের শোধনে। ঋণ-পরিশোধে।

কোথায় তারা ? উদ্বেল হয়ে উঠল তামসী।

এই মাইল আষ্টেক দূরে, অধঃপতিত গ্রামের মধ্যে। চাষাদের একত্রীকৃত করছে। নিয়ে যাচ্ছে প্রতিঘাতের ঘনতায়। আপনি যাবেন ?

উড়াল দিয়ে যাব। গ্রামটার নাম বলুন।

নাম বললে। বললে, সকালবেলা বাস যায় পাশের সড়ক দিয়ে। বড় রাস্তা থেকে পোয়াটাক পথ ভিতর দিকে। আল পাবেন খটখটে।

আপনিও যাবেন একদিন সেই হালটা ধরে। যেদিন আপনার চাকরি থাকবে না।

বেঁটে নগেন সরকার আসছে এ দিকে। পালান।

আক্ষিং যেন বহুদূরের রাস্তা, মদ অনেক দ্রুতগামী, অসমসাহসিক। সেই সন্ধ্যায় প্রাণধন তাই মদ খেল। দুঃখের উপর টনকের ঘা আর সে সইতে পারছে না। সময় অত্যন্ত মন্থর, রক্ত ক্ষিপ্র। বলবন্ত ঝড় না হলে উড়বে না এই পুঞ্জিত প্রত্যাখ্যান।

ঝি বললে, বাবু এসব পাঠিয়ে দিলেন। সেজেগুজে যেতে বললেন তাঁর কাছে।

ঝলমলে রঙিন শাড়ি-ব্লাউজ আর নানা অঙ্গের গয়না কতগুলো। সদ্য-কেনা নয় বোধ হয়, আর কারু ব্যবহৃত।

একটা কোথাও লকলকে চাবুক পাওয়া যায় না হাতের কাছে ? সপ্তজিহ্ব আগুনের মত তামসী দাউ-দাউ করে উঠল।

আর কী বলতে যাচ্ছিল ঝি, তামসী ঝাঁকরে উঠল। বাঘিনীকে আর ঘাঁটাসনে বলছি। অঘটন হবে।

'তবে এ সব ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?'

'না। এ সব তোর। তুই আমাকে সাজাতে চেয়েছিলি না ? এ-সব দিয়ে তোকে আজ সাজিয়ে দেব। তুই শুধু রাত করে চুপিচুপি খিড়কির দরজাটা খুলে দিয়ে আসবি।'

'ওমা, সে কি গো ? তুমি চলে যাবে, আর আমি —'

'গজস্কন্ধ বুঝবেনা কিছুই তারতম্য। সহজেই, এক রাতেই, অনেক টাকার মালিকি পেয়ে যাবি। জমি-জায়গা হবে, মাটকোটা হবে, ঘাটবাঁধানো পুকুর হবে তোর —'

দাসী সলজ্জ কটাক্ষ করল।

রাত না পোহাতেই রিক্তহাতে বেরিয়ে এসেছে তামসী। রেলের সরু লাইনের ষ্টেশনের দিকে না গিয়ে বাসের ফাঁড়ির দিকে এগুলো।

কিন্তু বাস কই ?

ওদের ষ্ট্রাইক মেটেনি এখনো। একটা গরুর গাড়ী ডেকে দিচ্ছি। সেই বল্লভপুর যাবেন তো ?

পিছনে নগেন সরকার। সঙ্গে কুলির মাথায় তামসীর পরিত্যক্ত সুটকেস আর দড়ি দিয়ে বাঁধা সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। ও দুটো জিনিসের থেকে মুক্তি নেই তামসীর।

বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মনে হল জিনিসদুটোকে। ও দুটোকে ফেলে যাওয়ার কোনো মানে হয়না।

'কোনো মানে হয়না।' বললে নগেন সরকার। 'যাচ্ছেন অজ পাড়াগাঁয়ে, কদ্দিন থাকবেন তার ঠিক কি। বাক্স-বিছানা না হলে চলবে কেন ? আর অমন পালিয়ে যাবারই বা কী হয়েছে ? আমাকে বললে সব ভদ্রভাবে সমাধা করে দিতে পারতাম।'

আসলে লোকটা হয়ত ভাল। অন্তত এখন তো ভাল। তেজী গরুর গাড়ি জোগাড় করে অনল। খড়-পাতা টপ্পরওয়ালা গাড়ি। গই-গাঁয়ের নির্দেশ দিয়ে দিলে গাড়োয়ানকে। বললে, একজন আটপ্রহরী দেব সঙ্গে ?

দরকার নেই। গাড়োয়ানই জানে।

তবু কৌতুহল হচ্ছিল তামসীর। জিগগেস করলে, 'বাবু কী বললেন ?'

'কী আর বলবেন। বললেন, মানুষ করে আম্বা, কিন্তু ঘটান জগদম্বা।'

(ক্রমশঃ)

খরগোস

রজত সেন

খাঁচার মধ্যে হাত বাড়িয়ে নির্মল খরগোসটার একটা ঠ্যাং ধরে ফেলল। আসন্ন বিপদের আশংকায় জন্তুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দরজাটা বন্ধ হবার পরেও অবশিষ্ট খরগোসগুলো অসাড় হয়ে রইল কতক্ষন। এটুকু বোধ হয় ওরা অনুভব করতে পারে—দলের যে যায় সে আর ফিরে আসে না।

বাঁ হাতে পুষ্ট খরগোসটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে নির্মল ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। এখন তার প্রয়োজন নির্জনতা, শব্দহীন নিভৃতি।

ওষুধের আলমারিটা খোলা। কাচের আলমারিতে ছুরি, কাঁচি আর হরেক রকমের যন্ত্রপাতি ঝক ঝক করছে। ষ্টোভ জ্বলছে সশব্দে, এ্যালুমিনিয়ামের প্যানের মধ্যে গরম জল ফুটছে, নির্মল তার মধ্যে কয়েকখানি ছুরি ফেলে দিল। ঘরের মাঝখানে টেবিল, চার পাশে ছোট-বড় নানা আকারের ষ্ট্র্যাপ আঁটা। খরগোসটাকে নির্মল বাঁ হাতে চেপে ধরল টেবিলের ওপর, চারটে পায়ে ষ্ট্র্যাপ এঁটে দিতে তার এক মিনিটেরও বেশি লাগলনা। জানলার ধারে ছোট টেবিলের ওপর একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র, বাঁ চোখ রেখে যন্ত্রটাকে ঠিক করে নিল সে, ড্রয়ার থেকে কয়েকখানি নূতন স্লাইড বার করে রাখল পাশে।

সাবানে হাত ধুয়ে নিতে বেশি সময় লাগলনা তার।

ষ্টোভটা নিবিয়ে দিয়ে চিমটে দিয়ে কয়েকটা ছুরি সে তুলে নিল প্যান থেকে।

খরগোসটার দিকে একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুকের মাঝখানে ধারাল ছুরিটা বসিয়ে দিল আস্তে আস্তে। টেবিলটা ভিজে গেল উষ্ণ রক্তে, জন্তুটার শরীর কয়েক বার কেঁপে উঠল—তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল। ছুরিটা আস্তে আস্তে পা পর্যন্ত টেনে আনল নির্মল। হাত দিয়ে নরম মাংসের ভাঁজ খুলে ফেলল। ছুরি দিয়ে কেটে নিল পাতলা কয়েকটা টুকরো।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে, নির্মল শিষ দিয়ে উঠল।

'আবার একটাকে মারলি নিমু?' মা হেমাংগিনী প্রশ্ন করলেন।

'না মারলে চলবে কেন মা?' হাসিমুখে উত্তর দিল নির্মল, 'এদের জীবনের বিনিময়ে অসুস্থ মানুষের যদি কিছু সুরাহা হয়—তার জন্যে চেষ্টা করতে হবেনা? আশা ছিল মানুষকে দিয়ে এই পরীক্ষাগুলো করি, সে ত আর হবেনা, অতএব খরগোস মেরে হাত পাকান ছাড়া উপায় কি বল?'

'মানুষ ? কি বলছিস রে ? তোর মাথা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি ? সে জন্যেই ত রোগী আসেনা তোর কাছে, তোর সব উদ্ভট প্রস্তাব শুনে পালাতে পথ পায়না। এসব পাগলামি না ছাড়লে কোনদিনই তুই পসার জমাতে পারবিনা। জ্বর হলে মিক্‌চার দে, ফোঁড়া হলে ছুরি চালা, তবে না দু'চারটে রোগী আসবে। এত ভাল পাশ করে শেষকালে কিনা সারা জীবন খরগোস আর ইঁদুর কাটবি ! তোর ছোটমামা দু'দিন ডেকে পাঠালেন গেলিনা !'

'গিয়ে কি হবে মা ? ওখানে ত চিকিৎসা করা যাবেনা, বড় ডাক্তারের তাঁবেদারি করতে হবে, সে আমি করতে যাব কেন ?'

'তাতে ঝকি কম, রোগী মরলে দোষ ঘাড়ে পড়বেনা।' বললেন হেমাংগিনী।

'আর রোগী ভাল হলে জয়মাল্য গিয়ে পড়বে বড় ডাক্তারের গলায়, আমার গলায় পড়বে হাত ! ঝক্কিটাই ত আমি নিতে চাই মা, আমি গাড়ি হতে চাইনা, চাই ঘোড়া হতে ! পথ চলবার স্বাধীনতা আমার। বাঁধানো সড়কে কেন আমি গড্ডলিকা-প্রবাহের সংগে কাঁধ মেলাব ? আমি চলব আমার নিজের স্বতন্ত্র রাস্তায়, একা, স্বাধীন ; পথ আবিষ্কারের আনন্দ আমার। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাক্তারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আমার নেই, কোন দিন পারবনা তাদের সহযোগিতা করতে। আর মজা কি জান মা ? সর্বত্রই এই দ্বিতীয় শ্রেণীদের ভিড়। ওরা সহর মাৎ করে রেখেছে কুৎসিত কলহ আর কোলাহলে। তা ছাড়া মিলিত কাজে আমি বিশ্বাস করিনা, সে কাজে বৈশিষ্ট্য নেই, মর্যাদা নেই, বিশেষত্ব নেই ; একটা জগাখিচুরি, একটা থার্ড ক্লাশ যাত্রা ; দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায়ের গানের মত, বাজারের কাটা পোনার মত ; স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ড-এর মত। সে-কাজের ফল দাঁড়ায় খুঁটি লাগান গাছের মত, যে-গাছের আপন-শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ নেই ; কাঠের পা-লাগানো মানুষের মত, বাহারি শাড়ি-পরা বিয়ের কনের মত ; করসেট-আঁটা বৃদ্ধার মত ; স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের মত ; সে-কাজ —'

'তুই থাম নিমু ! বাজে বকিসনি !' হেমাংগিনী ধমকের সুরে বললেন।

'আচ্ছা তুমিই বল মা, দশজন মিলে যে কাজ তার কোন মানে হয় ? দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবিধার জন্যে প্রথম শ্রেণী কেন তার মস্তিষ্কের অপব্যবহার করবে ?'

'তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে বলে দিলাম !'

'থাক, সে আমারই দুঃখ, শুধু এই আমার কামনা--সেদিন যেন কেউ আমাকে অনুকম্পা দেখাতে না আসে।'

* * * *

সন্ধ্যার পর নির্মল তার তালতলার ছোট ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসে একখানা বিদেশী জার্নাল

পড়ছিল। দোকানে গোটা কয়েক কাচ-ভাঙ্গা আলমারিতে নানা আকারের ওষুধের শিশি বোতল। কম্পাউণ্ডার সে নিজেই। এ-সপ্তায় মোট দু'জন রোগী এসেছিল। প্রথমজন হিন্দুস্থানী মেয়ে, জীবন্ত কঙ্কাল। শরীরের কাঠামোটা একদিন মজবুত ছিল, তাই এখনও বেঁচে আছে কোন রকমে।

নির্মল বসতে বলল।

'তোমার স্বামী কোথায় ?

বলল ছেড়ে চলে গেছে।

'কার কাছে থাক তুমি ?'

একলা থাকে ও।

রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে নির্মল ওকে শুতে বলল বেঞ্চির উপর।

পরীক্ষা করে চলল সে। দু'চোখে তার ফুটে উঠেছে অসীম আগ্রহ। ছাত্রাবস্থায় হাসপাতালে মরা কাটবার সময় যে-আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তার চোখে মুখে।

'তোমার বড় রোগ,' হাত ধুয়ে নির্মল বলল, 'তুমি খেতে পাওনা; যা খেয়ে বেঁচে আছ তা খাদ্য নয়। ওষুধে তোমার কাজ হবেনা, খাবার যোগার কর।'

মেয়েটি জানাল তার পেটে দরদ।

ডাক্তার বলল, 'অসুখের নয়, ক্ষুধার।'

মেয়েটি বলল এখানে আসাই তার ভুল হয়েছে, সে যাবে বড় ডাক্তারের কাছে। শরীরটাকে গুছিয়ে নিয়ে কোন রকমে রাস্তাটা অতিক্রম করে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নির্মল হাসল, একটা সিগারেট ধরাল।

মোটারের ধাক্কায় আহত একটি বাঙ্গালী যুবক দু'জন লোকের কাঁধে হাত দিয়ে উপস্থিত হল তার সিস্‌পেন্‌সারীতে, নির্মল তখন উঠবে উঠবে করছিল।

'দেখুন ত হাঁটুটা।'

নির্মল পরীক্ষা করে বলল, 'ঠিক আছে, কিছু হয়নি, আর কোথাও লেগেছে ?'

'হাতে, এখানে। ব্যাণ্ডেজ করে দিন।'

'আস্তিনটা গুটিয়ে দিন।' উপদেশ দিল নির্মল।

দেখেই নির্মল বলল, 'ধাক্কা লেগেছে, কাটেনি।'

'ব্যাণ্ডেজ ?'

'দরকার নেই।'

'একটা এ্যান্টি-টিটেনাস দেবেন নাকি ?'

'না।'

'তবে আর আপনার কাছে এলাম কেন ?'

'আমি অসুস্থ লোকের চিকিৎসা করি,' দরজার পাল্লা টেনে দিল নির্মল।

পল্লীটা নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। সার্কুলার রোড থেকে মাঝে মাঝে ট্রামের শব্দ শোনা যায়।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে নির্মল দরজায় তালা লাগাচ্ছিল।

'একটু অপেক্ষা করুন !' স্ত্রী-কণ্ঠের মিনতি শোনা গেল।

'বলুন !' নির্মল মুখ ফেরাল।

'বড় দেরি করে ফেলেছি।' মেয়েটি বলল, 'আমায় একটু দেখতে পারেন ?'

দীর্ঘ দেহ শীর্ণকায়া, একটি মেয়ে, অস্পষ্ট অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে।

'এখানে ? না যেতে হবে কোথাও ?'

পল্লীটা নির্জন। রাস্তার প্রান্তে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'আজ তা হলে থাক—কাল দয়া করে আপনার সুবিধে মত একবার আসবেন এই ঠিকানায় ?' মেয়েটি এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল। নির্মল পকেটে রাখল কাগজটা।

পরদিন বিকেলে ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বার করতে হয়রাণ হয়ে গেল সে।

ছোট দোতলা বাড়িটা বহুদিন সংস্কারের অভাবে একটা অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। তবু গাঁথুনি আর কাঠামোতে সুরুচির চিহ্ন এখনও ধরা পড়ে। সামনে বিস্তৃত বাগানের কংকাল। কয়েকটা ইউক্যালিপটাশ গাছের শাখা বিগত-গৌরবের স্মৃতির ভারে এখনও দুলছে বাতাসে। সীমানা-দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে টুকরো টুকরো হয়ে, বাড়িটা হয়ে উঠেছে বেআব্রু।

মেয়েটি নিজেই তাকে পথ দেখাল।

চেয়ারে বসল সে, ব্যাগটা রাখল নামিয়ে। ঘরের সামন্য কয়েকটি আসবাবে যত্নের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে আছে। একপাশে একটি পিয়ানো, মূল্যবান বস্ত্রের আচ্ছাদনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

'বেশি সময় আপনার নেবনা !' মেয়েটি বলল। বয়েশ পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।

দিবালোকে নির্মল ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল। কপাল থেকে পা পর্য্যন্ত কয়েকটি সরল রেখার সমষ্টির মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে। জাহির করার মত ওর মাথায় ঘন কুন্তল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শরীরে ফাঁকি আছে, কিন্তু চুলে নেই এতটুকু ফাঁক। নির্মল বিস্মিত হল, কেশের এই সমারোহের সংগে দেহের কোনই সামঞ্জস্য নেই। দীর্ঘায়ত দুটি চোখের চারপাশে কালো দাগ। অতিশয় ক্লান্ত দৃষ্টি। মুখে মাংসের অভাবে নাকটাকে

বেমানান মনে হয়, সারস পাখির মত গলা, হাড় দুটি সেতুর মত বক্রাকার। নিচুগলার জামার নিচে কোথাও স্তনের আভাস পর্যন্ত নেই।

তবু হাতের আঙুলগুলো এখনও সুন্দর, এখনও প্রাণের স্পন্দনে চঞ্চল। স্তব্ধ সঙ্গীতের শেষ ঝঙ্কারের মত।

'বসুন!' নির্মল বলল।

মেয়েটি বসল পাশের চেয়ারে।

'বলুন আপনার অসুখের বিবরণ!'

'একদিন ভাল ছিলাম,' মেয়েটি বলল, 'খুব ভাল, আজ আয়নায় নিজেকে চিনতে পারিনা! হঠাৎ বাবা মারা গেলেন, কলেজে পড়ি, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল আস্তে আস্তে। ছোট ভাই কলেজ ছাড়ল, বই বন্ধ করল। কুসঙ্গিদের আড্ডায় জুয়া আর মদ খেতে শিখল, যেতে আরম্ভ করল অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। বাবার টাকা আর মায়ের গয়না কিছুই অবশিষ্ট রইলনা। সংসারকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম, বাধা দিলাম ভাইকে, শাসন করলাম, অনুরোধ করলাম, মিনতি করলাম, শুনলনা সে, ভেসে চলল। চাকরি নিলাম। একদিন—'

'আপনার রোগের কথা বলুন!' বাধা দিল নির্মল।

'বলছি। রোগের সূত্রটা জানলে চিকিৎসার আপনার সুবিধে হবে। একদিন হিমাংশু আমার হাতে একশ'টা টাকা দিয়ে বলল, লেখাকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, কথাবার্তা সব ঠিক, একশ টাকা আগাম নিয়ে এলাম। দেখতে ভাল, গান গাইতে পারে। বাংলা দেশকে ও মাত করে দেবে, দেখে নিও। সেদিন আমাদের হরেন স্কুল থেকে ফেরবার সময় রেখাকে দেখেই ওদের নূতন বইএর পার্ট ঠিক করে ফেলেছে মনে মনে, কাল আসবে ও ট্যাক্সি নিয়ে, লেখাকে ষ্টুডিওতে নিয়ে যাবে, তোমাদের ভয় নেই কিছু, আমি সংগে থাকব। ম্যাট্রিক পাশ করে কি ছাই হবে বলনা, সেই ত তোমার মত স্কুল-মাষ্টারি। হিমাংশুকে বললাম, লেখা কোথাও যাবেনা তোমার সংগে। নিয়ে যাও তোমার টাকা। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, মান থাকবেনা, বলল হিমাংশু। তোমার আবার মান অপমান কি? বললাম আমি। ও রেগে গেল। যে-সব কথা বলবার ওর অধিকার নেই, উচিৎ নয় তাই বলল সে, আরও বলল, লেখার ওপর তোমার যা অধিকার আমারও তাই, জোর করে ওকে নিয়ে যাব দেখি কেমন করে তুমি আটকাও। লেখার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। হিমাংশু জানত চেষ্টা করে কোন ফল হবেনা।'

মেয়েটি থামল, তাকাল নির্মলের দিকে। ওর শান্ত, মৃদু, বিস্তারহীন কথার স্রোত যেন এখনও বয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে ঝংকারহীন, তরঙ্গহীন।

'স্কুলে পড়াই, ছু'বেলা ছাত্রী আছে। মার অসুখ, চিকিৎসা চলছে, লেখার বিয়ের পণ বাঁচাচ্ছি না খেয়ে, মাতালটার জুয়ার টাকা যোগাতে হয় মাঝে মাঝে, না হলে ও শান্তিতে থাকতে দেবেনা। অসুখে পড়লাম। কিন্তু—' প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে তার বাক-রোধ হল।

নির্মল তাকাল, সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে বাতাসে শিশিরের মত।

'কিন্তু আমি মরতে চাইনা, আমার একদিন রূপ ছিল, আমি আবার ফিরে পেতে চাই আমার যৌবন। আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচান। অনর্থক কেন আমি ক্ষয় হয়ে যাবো?'

'স্থির হন, এতটা অধৈর্য্য হলে চলবেনা।' নির্মল ওর হাতটা তুলে নিল। বাত্যাহত কোন পাখি আশ্রয় পেল যেন। স্তিমিত প্রদীপের শিখা নিবতে নিবতে বেঁচে উঠল যেন।

কয়েক মুহূর্ত তার কব্জিটা চেপে ধরে নির্মল বলল, 'আপনার জ্বর আসে। ঠিক কখন জ্বরটা ছাড়ে লক্ষ্য করেছেন কি?'

'জ্বর আসে না কি?' বিস্মিত গলার প্রশ্ন হল।

'আমার দিকে তাকান, দেখি!' নির্মল তার চোখের নিচের পাতাটা টেনে ধরল।

'জিভটা বার করুন!'

আদেশ পালন করল সে।

'দাঁত দেখি!'

পরিস্কার দাঁত, ঝক ঝক করছে, মাড়িতে এক ফোঁটা রক্তের আভাস নেই।

'হাঁ করুন!'

হাত দিয়ে নির্মল চিবুকটা তুলে ধরল।

'এমন গলা নিয়ে আছেন কি করে!' নির্মলের প্রশ্নে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল।

'ঐ চৌকিটায় শুয়ে পড়ুন দেখি!'

বুকের ওপর নির্মলের ষ্টেথেসকোপ ওর ফুসফুসের অবস্থা পরীক্ষা করে চলল।

'জামাটা খুলে ফেলুন!' আদেশ দিল নির্মল।

জামা খুলতে ছু'মিনিটের বেশি সময় সে নিলনা।

চামড়া আর হাড়ের নিচে ফুসফুসের ছবিটা নির্মলের চোখে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

ষ্টেথেসকোপ গুটিয়ে নির্মল আঙ্গুল দিয়ে তার পেটে চাপ দিলে—প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে।

'লাগছে!' মেয়েটি বলল।

'জামা পরে নিন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।'

কয়েক মিনিট।

'নিয়মিত ভাবে আপনার—'

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল, 'না, একেবারেই নয়।'

চুপচাপ।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা।

নির্মল যতই ভাবছে ততই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে—এ-মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে কি করে? ঠিক এমনি একটা স্পেসিমেনের অভাব সে বহুদিন অনুভব করছে।

'আসুন হাত ধোবেন।' মেয়েটি দাঁড়াল।

'দরকার নেই, বসুন আপনি। অনেক দিন আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে, হয়ত এক বছরও লাগতে পারে। একটা প্রশ্ন আপনাকে করব, ভেবে চিন্তে জবাব দেবেন। আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই, রাজি?'

মেয়েটি তাকাল অসহায়, করুণ দৃষ্টিতে, ঠোঁট তার কাঁপছে আর কাঁপছে হাত।

'আমার বোন লেখা?' ভীরু পাখি যেন ডানা ঝাপটে উঠল।

'তার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই হবে। আচ্ছা বেশ। তাকে পাত্রস্থ করবার দায়িত্ব নিলাম।'

'মা?'

'তাঁকে ভাল করে তুলব।'

'রাজি!' মেয়েটি যেন চেয়ারের ওপর ভেঙ্গে পড়ল।

'সর্ত আছে, আমার এক্স্পেরিমেন্ট-এ সহায়তা করবেন।'

'করব।'

বধূবরণ করবার সময় হেমাংগিনী হাত গুটিয়ে নিলেন।

'এই তোমার বৌ!' বলল নির্মল।

হেমাংগিনী তাকালেন না, নববধূর হাতে পরিয়ে দিলেন এক জোড়া কংকন।

'প্রণাম কর রেখা।'

পা সরিয়ে নিলেন হেমাংগিনী।

উৎসব-রজনীর কোলাহল এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে এল।

নির্জন ঘরের মধ্যে রেখা ঘুরে বেড়াল কতক্ষণ। টেবিল ল্যাম্পের নীল, নরম আলোয় নূতন, পালিশ করা ডেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল সে, সিল্কের সাড়ি তার ঝলমল করছে, নীল আলো ঠিকরে পড়েছে তার অলঙ্কারে, চুলে, চোখে। পাউডারের একটা হাল্কা প্রলেপ বুলিয়ে নিল সে কপালে, গালে আর গলায়। এসেন্স ছড়াল ব্লাউজে আর চুলে। চুলটা

ফাঁকিয়ে দিল কানের দু'পাশে। প্লেট থেকে একটা পান মুখে দিল, ধূপ জ্বালল। আশ্চর্য সুখের আবেশে সমস্ত সত্তা তার মধুর হয়ে উঠেছে।

নরম বালিশে গা এলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কেউ একজন ফুলদানীতে রজনীগন্ধা রেখে গিয়েছে।

হঠাৎ সুতীব্র যন্ত্রনার একটা বিদ্যুত তরংগ তার সমস্ত শরীরকে মথিত করে ফেলল। মরণাহত সাপের মত দেহ তার কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল বারবার, বালিশটা প্রাণপনে আঁকড়ে ধরল সে। এ-যন্ত্রণা তার পরিচিত, তবু—আজকের দিনে এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে, জামাটা ভিজে গিয়েছে ঘামে, নিঃশ্বাস আর টানতে পারে না। হৃদপিণ্ডের প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন ধারালো ছুরির মত তার মাংস কেটে ফেলছে।

নির্মল এল, দরজাটা বন্ধ করল। এগিয়ে এল বিছানার দিকে! রেখার গায়ে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে ডাকল কয়েকবার; সাড়া দেবার সামর্থ তার নেই।

আলমারি থেকে ওষুধের ব্যাগটা বার করল নির্মল, এ্যালকোহল দিয়ে সিরিঞ্জটা বিশুদ্ধ করে নিল অভ্যস্ত হাতে। একটা ছোট শিশি থেকে নিজের তৈরী ওষুধের খানিকটা সে ভরে নিল সিরিঞ্জে। আজ পর্যন্ত তার এ-ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করবার সুযোগ সে পায়নি। রোগীর মৃত্যুর দায়িত্ব সে নিতে পারেনি কোনদিন। নির্মল জানে ব্যথার কারণ। যদি কেউ পারে ওষুধের তীব্র প্রভাব সহ্য করতে তা হলে রোগের বীজাণু থাকবে না তার শরীরে এটা তার বিশ্বাস। জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যদি কেউ চরম যুদ্ধে জয়ী হতে পারে—তা হলে সে-রোগ আর তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না। আধাআধি সম্ভাবনা বাঁচা আর মরার, বাঁচাতেও ত পারে। দেখাই যাক না।

এ্যালকোহল-সিক্ত তুলোটা সে রেখার নিস্পন্দ বাহুতে বার কয়েক ঘসল। তারপর সূঁচটা ঢুকিয়ে দিল।

কয়েক মুহূর্ত।

নির্মল ওকে শুইয়ে দিল। আঁচলটা সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম কটা খুলে দিল, সাড়ির বাঁধন দিল আলগা করে। পাখার রেগুলেটারটা শেষ প্রান্তে টেনে দিয়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। সিগারেট টানতে টানতে সে ভাবতে লাগল যে-খরগোসটার শরীরে ক্যানসারের বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেটা বেশি খাচ্ছে কেন? বেশি ছুটছেই বা কেন? রোগ জন্মাবার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কাল সকালেই ওটাকে অস্ত্রোপচার করা দরকার! নির্মল ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ একটি বৎসর রেখাকে নিয়ে তার পরীক্ষা চলল, জীবন আর মৃত্যুর পরীক্ষা, বিজ্ঞান আর জীবনের পরীক্ষা। নির্মল রেখার জীবনীশক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, রেখা যেন তার সংগে একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে দিনের পর দিন, তার যৌবনে আবার ফুল ফুটছে, তার সুরভি কি নির্মলের বিজ্ঞানকে স্পর্শ করে ?

জানলার বাইরে একটা জামরুল গাছের সিক্ত শাখায় সূর্যের সোনালী আলো চিক চিক করছে। সবে ভোর হয়েছে। শ্রাবণের শেষ। রাত্রে কখন এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, জানলার পাশে তোরঙ্গটায় জলের দাগ। ঘাড় ফেরাল সে, আজ তার শরীরে এতটুকু অবসাদ নেই।

নির্মল চোখ মেলে দেখল আয়নার সামনে বস্ত্র পরিবর্তন করছে রেখা। ভাল করে তাকাল সে কয়েক মিনিট।

'এখানে একবার আসবে ?'

মাথায় আঁচল তুলে রেখা এগিয়ে এল।

'দেখি হাত ?'

কয়েক মুহূর্ত।

'ষ্টেথেসকোপটা নাও ত ?'

যন্ত্রটা নির্মলের হাতে এগিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'শোব ?'

'নাঃ, বোসো এখানে !'

'জামাটা খুলব ?'

'না, শুধু একবার স্টেথেসকোপ বসালেই বুঝতে পারব।'

নির্মল নেমে গেল, ন'টার সময় একবার এল পোষাক পড়তে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'আমার ফেরবার কিছু ঠিক নেই, তুমি খেয়ে নিও !'

হেমাংগিনীর পাত্তা নেই। পাচক নোটিশ দিয়ে গেল আহার প্রস্তুত, খাবারটা কি ওপরেই আসবে ?

'না, আমি যাচ্ছি নিচে।' বলল রেখা, 'মা কোথায় ?'

'গংগা নাইতে গেছেন।'

রেখা যখন ওপরে এসেছে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে তখন। কাচের শার্সি বন্ধ করে ও দেখতে লাগল বৃষ্টির ধারা আর কালো মেঘ। হঠাৎ তার মনে হল ভদ্রলোক ফিরবেন কেমন করে, না নিয়েছেন ছাতা, না আছে বর্ষাতি। উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠল সে।

নির্মল ফিরল এক সময়ে, ঝড়বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা এক নিশ্বাসে অতিক্রম করে ছুটে এল রেখা। কোট খুলতে বলল।

'দেখত খরগোসগুলো ভিজছে কিনা।'

ফিরে এসে রেখা দেখল নির্মল স্নানের ঘরে, ধূতি আর জামাটা পর্যন্ত সে এগিয়ে দিতে পারলনা!

ভাত খাবার আর সময় নেই।

'কি খাবে?' রেখা জিজ্ঞেসা করল।

'কৈ? ক্ষিধে পাচ্ছেনা ত?'

ঘোলের সরবৎ তৈরী করে নিয়ে এল রেখা। নীরবে পান করল নির্মল। তাক থেকে কয়েকটা মোটা বই সংগ্রহ করে একতলায় নির্জন ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। এই তার পরীক্ষাগার। এখানে বন্ধ ঘরে যতক্ষন সে থাকবে—কারুর ডাকবার অনুমতি নেই।

রেখা বসে রইল চুপ করে।

সেদিন রাত্রেই—আকাশে মেঘের মিছিল, জামরুল গাছের শাখা দুলছে বাতাসে,—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে রেখা চুল খুলে দিল, কিন্তু কাশি চাপতে পারলনা, আঁচলটা চেপে ধরল মুখের ওপর, আঁচলে টাটকা রক্তের দাগ। খুচরো রোগের প্রাধান্যে এটা এতদিন চাপা পড়ে ছিল।

নির্মল ততক্ষণ ঘরে এসে পড়েছে, বলল, 'লুকোবার দরকার নেই, জানতাম।' হাসল সে। 'ওঠ, সাড়িটা বদলে নাও।'

সাড়ি বদলে এল রেখা, শরীরটা নুয়ে পড়েছে তার। 'আমি নিচে শুই।'

'দরকার নেই ত।' বলল নির্মল, 'শুয়ে পর তুমি। আমি একটু কাজ করব, ভেবোনা, তোমার রোগ সারিয়ে দেব, খাবার একটা নিয়ম করে রাখছি কাগজে, কাল থেকে সুরু করবে। ভাত না খেয়ে পারবে ত?'

রেখা ঘাড় নেড়ে জানাল পারবে।

খাবার একটা ফিরিস্তি লিখে রেখে নির্মল তার পরীক্ষাগারে এল।

হেমাংগিনী শুয়ে পড়েছেন, প্রত্যূষে তাঁর গংগা-স্নান আছে। বাড়ি নিস্তব্ধ, রাত গড়িয়ে চলেছে।

আলমারী থেকে স্ফীতকায় কয়েকখানি বই বার করে নির্মল বসে পড়ল টেবিলের ধারে। বই দেখে দেখে খাতায় আঁক কষতে লাগল। বাইরে আবার বর্ষণ সুরু হয়েছে। তার এক ডাক্তার বন্ধুর সংগে কথোপকথন মনে পড়ল তার:

'পাগল হয়েছ? কে এমন বেপরোয়া রুগি আছে তোমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

'কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই রোগী যখন বাঁচবেনা—তখন এ-পরীক্ষাটা করে দেখতে আপত্তি কি?'

'আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে সাধারণ কোন মানুষ সাধারণ অবস্থায় তোমার ওষুধের প্রভাব কিছুতেই সহ্য করতে পারবেনা।'

'কিন্তু ওর ঐ ব্যাথাটার কথাও তোমাকে বলেছিলাম, দেখলে ত বেঁচে গেল; তোমার বিজ্ঞানটা ত একটা থিয়োরী মাত্র। বৈজ্ঞানিক সত্যকে বিশেষ কয়েকটি অবস্থার ওপর নির্ভর করতে হবেই। অবস্থাভেদে এই সত্যেরও আকৃতি বদলায়, তা ছাড়া তোমার ত একটা মত আছে—বিজ্ঞান থেকে জীবন বড়।'

'হ্যাঁ, এটা আমার মত স্বীকার করি, কিন্তু এটা অংক নয়।'

অংক! নির্ম্মল তার অর্ধসমাপ্ত অংকতে মনোযোগ দিল।

খাতা ছেড়ে যখন সে উঠল তখন দুটো বেজে গিয়েছে। জানলার কাছে এসে নির্মল সিগারেট ধরাল। ওপরের ঘর থেকে অস্পষ্ট কাশির শব্দ শোনা গেল কয়েকবার। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা দিয়েছে। সিগারেটের টুকরোটা নির্মল বুঝি চাঁদের উদ্দেশেই ছুঁড়ে মারল।

খাতা দেখে ওষুধ তৈরী করতে তার রাত ভোর হয়ে গেল। যখন সে ওপরে এল তখন রেখা উঠে বসেছে বিছানায়। কাতর, শ্রান্ত চোখে তাকাল সে নির্মলের দিকে।

'কাজ ছিল আর শুতে আসতে পারিনি,' বলল নির্মল, 'তোমার ভয় করেনি ত?'

উত্তর দিতে গিয়ে রেখার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে মাটিতে পা নামিয়ে সে দাঁড়াতে গেল, সমস্ত শরীরটা দুলে উঠল, ভোরবেলার আলোটা চোখে বিবর্ণ হয়ে দেখা দিল।

নির্মল ধরে না ফেললে হয়ত সে ঢলে পড়ত মাটিতে। নির্মলের হাতের স্পর্শ লাগল তার বুকে, রক্তে লাগল একটা ঢেই। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ছেড়ে দাও, যেতে পারব।'

'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল নির্মল।

'নিচে।'

'তুমি শুয়ে পড়, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

'আমি পারব, সুস্থ বোধ করছি।'

নির্মলের মাথায় খরগোস ঘুরছে, সেবা করবার মত সময় তার পর্যাপ্ত নয়। রেখাকে বাধা দিলনা সে। ভাবল একবার মা-কে অনুরোধ করে, কিন্তু পরে বোধ হয় সেকথা ভুলে গেল।

স্খলিত পায়ে রেখা স্থানান্তরে গেল।

নির্মল স্নান করবে কিনা বুঝতে পারলনা। আকাশে ঘনঘোর বর্ষা, কিন্তু বাতাসে এতটুকু উত্তাপ নেই।

চায়ের সংগে কি যে আহার্য চলে গেল পেটে নির্মল লক্ষ্য করলনা। নিচে এসে খাঁচা থেকে খরগোস বার করল। বাঁ হাতে ওটাকে বুকের কাছে ধরে ডান হাতে সিরিঞ্জের সূঁচটা ঢুকিয়ে দিল পিঠে। পালাবার চেষ্টা করল খরগোসটা, সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে ছোট করে ফেলল, চোখে যন্ত্রনার কুয়াসা।

হাতের মধ্যে খরগোসটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। নির্মল নামিয়ে দিল টেবিলের ওপর। তাকিয়ে রইল অবসন্ন প্রাণীটার দিকে, নিস্পলক চোখে, দৃষ্টিতে তার একাস্ত হয়ে উঠেছে। নিশ্চেতন খরগোসটার শরীর বার কয়েক কেঁপে উঠল; তারপর নিস্পন্দ, নিথর।

নির্মল হাসল, বিজ্ঞান কখনও মিথ্যে হতে পারেনা।

বিকেলের দিকে।

রেখা শুয়ে ছিল জানলার কাছে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা বন্ধ করার শব্দে চোখ মেলে তাকাল সে। দরজায় খিল লাগাবার ভংগিটা খুব স্বাভাবিক মনে হলনা তার। নির্মল এগিয়ে এল কাছে, হাতে ব্যাগ। বিছানার ওপর ব্যাগ রেখে সে রেখার গা ঘেঁসে বসল।

'ওষুধটা খেয়েছিলে?' নির্মল জিজ্ঞেস করল।

রেখা ঘাড় নাড়ল।

'কখন?'

'যখন তুমি বলেছিলে।'

রেখা চুপ করে রইল, নির্মল লক্ষ্য করল সিঁথিতে সিঁদুরের দাগটা জ্বল জ্বল করছে। বিস্ময় বোধ করল সে, ঐ সিঁদুর সে-ই পরিয়ে দিয়েছিল।

ব্যাগ থেকে তুলো, শিশি আর ইনজেক্‌সনের সিরিঞ্জ বার করল নির্মল।

'দেখি হাতটা।'

রেখা হাত বাড়াল।

রবারের টিউব দিয়ে বাহুর ওপরে শক্ত করে বেঁধে দিল নির্মল। রক্ত চলাচলহীন শীর্ণ হাতের শিরাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সূঁচটা ঢোকাবার আগে খরগোসটার কথা একবার মনে পড়ল তার।

রেখার কপালে দেখা দিল যন্ত্রণার অস্পষ্ট চিহ্ন।

সূঁচটা তুলে নিয়ে নির্মল ওর হাতে তুলো ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞাসা করল 'লেগেছে?'

রেখা জানাল—লাগেনি। নির্মলের মুখের ওপর একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি যেন বলতে চাইল সে, তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল; নির্মল বালিশটা টেনে দিল তার মাথার নিচে। তাকাল। রেখার নীমিলিত চোখের পাতা কাঁপছে, নিশ্বাস নির্গমনের সংগে নাক স্ফীত হয়ে উঠছে বার বার। নির্মল জানত, ওষুধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তার কোনই সন্দেহ ছিলনা, তার মুখে তৃপ্তির আভাষ দেখা দিল। ঘড়ির দিকে তাকাল সে, পাঁচটা বাইশ, সময়টা বোধ হয় মনে রাখা উচিত, কে জানে জীবনে কোন দুর্বল মুহূর্তে এই ক্ষণটিকে অনুসন্ধান করতে হবে।

তবু অভ্যাসবশতঃ সে রেখার হাত তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। নাড়ীর স্পন্দন নির্জীব হয়ে এসেছে, মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। হাত নামিয়ে রাখল সে, আর কয়েক মিনিট।

নির্মল অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ তার খেয়াল হল রেখার নিশ্বাস কখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, স্তম্ভিত হয়ে গেল সে, ক্ষিপ্র হাতে রেখার নাড়ী টিপে ধরল, স্টেথেসকোপ বসাল বুকে। হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিকত্বে কোন ব্যতিক্রম নেই। ওষুধের ফরমুলাটা মনে মনে উচ্চারণ করল সে।

রেখা চোখ মেলে তাকাল। অদ্ভুত, আশ্চর্য্য সে-চোখের দৃষ্টি। পৃথিবীকে সে যেন নূতন করে দেখছে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল নির্মল।

রেখা নিঃসংকোচে নির্মলের একখানি হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখল, বলল, 'সত্যি! খুব ভাল।'

•

আবার এল সেই শরৎ—রেখা যেদিন ছিল ষোড়শী মেয়ে। দু'মাসের মধ্যে তার কি আশ্চর্য্য রূপান্তরই না ঘটেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিশোরী রেখা আজ তাকে ঈর্ষা করত সন্দেহ নেই। রাত্রির মত তার চুল, নয়নে বিদ্যুত, রক্তিম কপোল, সুঠাম স্তন আর মৃণাল বাহু। শরীরের অন্যান্য বিশেষণের কথা মনে হতে রেখা হেসে ফেলল। আজ ডাক্তারকে দিয়ে সে তার হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করবে। বাড়িতে তার পিয়ানোয় ধুলো জমছে, সুরের মিছিল আসা-যাওয়া করছে তার মনে।

স্নান সেরে ঘরে এল সে। তার ভাগ্য ঘরে বড় আয়না ছিল, না হলে সে কি কোন দিন দেখতে পেত নিজেকে? আবিষ্কৃত হত কোন বিরল মুহূর্তে?

নির্মলের পায়ের শব্দ শুনে আঁচলটা নামিয়ে দিল সে কাঁধ থেকে, ব্লাউজে একখানি হাত ঢুকিয়ে তেরচা ভংগিতে দাঁড়াল।

আয়নায় রেখার শরীর দেখে ক্ষণিকের বিভ্রান্তি এল নির্মলের মনে, টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে আবার তাকাল সে, রেখা জামার বোতাম আঁটছে।

'কয়েকটা ইনজেক্সন দেব।' নির্মল বলল।

'আবার ইন্জেকস্ন্ কেন?' আপত্তির সুরে জিজ্ঞেস করল রেখা, 'আমি ত সেরে গিয়েছি।'

'সেই জন্যেই ত আবার তোমার শরীরে রোগ ঢোকান দরকার।' বলল নির্মল।

'আমার নীরোগ, নিখুঁত দেহে তোমার কোন প্রয়োজন নেই?' রেখা তাকাল, আঁর দাঁড়াল অদ্ভুত আশ্চর্য্য এক ভংগিতে।

নির্মল প্রায় হেরে যাচ্ছিল। রেখার সংগে কোন সর্ত বড় না হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানকে বিসর্জন সে কেমন করে দেবে।

উত্তরের অপেক্ষা করল রেখা।

নিজেকে সে ধরে রাখতে পারলনা, হঠাৎ তার শক্তি গেল ফুরিয়ে, তবু বুদ্ধিভ্রংশ হলনা তার, অবশ গলায় বলল, 'বুকের মধ্যে কেমন করছে, দেখত একবার!' খাটের ওপর গা এলিয়ে দিল সে; জামার একটা বোতাম খুলতে এক মুহূর্ত বুঝি লাগল, আঁচল সরিয়ে চোখ বুজল সে।

ষ্টেথেসকোপ বসাতে গিয়ে নির্মল থামল। কি আশ্চর্য রূপসী মেয়ে! একি ছেলেমানুষী করছে সে। তবু সে হার মানলনা, ষ্টেথেসকোপের বদলে ইন্জেক্সনের সিরিঞ্জ তুলে নিল।

সূঁচের আঘাতটা অনুভব করল রেখা তার শরীরে, আপত্তি করলনা।

প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে স্থির হয়ে বসে রইল নির্মল।

মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল রেখার। বড় বড় চাকার মত দাগ দেখা দিল শরীরে, নিশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। হাত দিয়ে যেন সে বাতাসের প্রতিবন্ধক সরাবার চেষ্টা করল; বন্ধ চোখের পাতা কাঁপতে লাগল ঘন ঘন; শরীরটা তার কুঁকড়ে ছোট হয়ে এল, বালিশে মুখ গুঁজল সে উপুড় হয়ে, খোলা পিঠ।

নির্মল ক্ষিপ্র হাতে ওকে সোজা করতে গিয়ে ওর বুকের নিচে হাত বাড়াল, ষ্টেথেসকোপ নেই, সূঁচ নেই তার হাতে, নিরস্ত্র সে। উষ্ণ, নরম স্পর্শে বিদ্যুৎ চমকাল তার শরীরে। জীবনের তাপে গলে গেল সে। বাঁ হাতে অবশিষ্ট ওষুধের শিশিটা সে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে মারল বাইরে।

রেখার শরীরটা সে সোজা করে রাখল বিছানার ওপর। কি জানি কেন জামার বোতাম পরিয়ে দেবার সাহস হলনা তার।

শরৎচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমাদের মনের জড়তায় পরিবর্ত্তন খুব দ্রুতগতিতে ফুটে ওঠেনা। তার কারণ আপাতত লিপিবদ্ধ করে লাভ নেই, কার্য্যটি লক্ষ্য করেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক্। বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের কথা বল্‌তে গিয়েই ঔপন্যাসিকের মনের জড়তার কথা মনে পড়ল। উপন্যাস-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি পূর্ণ অধ্যায় নির্ম্মাণ করে গেছেন। বাংলা উপন্যাস কথাটি উচ্চারণ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কারো কথা এতো বেশি করে মনে পড়ে না, এমন কি অনেকসময় রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে যেতে হয়। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস কবির রচিত উপন্যাস, ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্র পূর্ব্বাপর ঔপন্যাসিকই থেকে গেছেন কাজেই উপন্যাসের সার্থকতা-অসার্থকতার জিজ্ঞাসা এ-যুগে শরৎচন্দ্রকে নিয়েই তৈরী হওয়া উচিত। বাংলা উপন্যাসকে শরৎচন্দ্র কোথায় পেয়েছিলেন এবং কোথায় এনে তাকে রেখে গেলেন পাঠকের মন দিয়ে তার বিচার করা উচিত হবেনা, ইতিহাসের মানদণ্ডই এ-ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। ইতিহাস মানে সমাজের দেহ ও মনের ইতিহাস, দেহের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব - যা থেকে দেহের ও মনের রূপান্তর হয়। এই দ্বন্দ্ববাদই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গতি-সঞ্চার করেছে, 'দেবদাস' থেকে তিনি পৌঁছুতে পেরেছেন 'শেষপ্রশ্নে', তৈরী করে যেতে পেরেছেন উপন্যাস-সাহিত্যের খানিকটা উজ্জ্বল রাজপথ। সমাজের প্রাচীনতা মানুষের জীবনকে রুদ্ধশ্বাস করে তোলেই, সেখানে কান্না থাকে, থাকে নূতন কোনো জীবনে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আর ব্যর্থতা, আর সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের মানসিক দৈন্যের ছবি ত এদিক-উদিকে ছড়িয়ে থাকেই—এ অবস্থায় সমাজকে খুঁজে নেওয়াই ঔপন্যাসিকের বিশেষত্ব, আর তা করতে হলে ঔপন্যাসিককে কবির মতোই অনুভবশক্তির অধিকারী হ'তে হয়। অনুভব, আবেগ নয়—চেতনা, ধ্বনিকাতরতা নয়—শক্তমাটি, বায়বীয় আকাশ নয়, কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের পার্থক্য এইটুকু। সমাজের জীর্ণ দেয়ালের আড়ালে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করবার অনুভূতি আর চেতনা দিয়েই শরৎ-সাহিত্যের সার্থকতা রচিত। ভবিষ্যৎ সমাজের জন্যে তিনি কয়েকটি কাল্পনিক অতিমানব তৈরী করে যান নি বলে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই, কিম্বা অচেতন শ্রেণী থেকে ভবিষ্যতের একজন জননেতা আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে তাঁকে অচেতন আখ্যা দেবার মূর্খতাও আমাদের থাকা উচিত নয়, এটুকুতেই আমাদের তৃপ্তি যে তিনি ঔপন্যাসিকের ধর্ম্ম যথাযথ পালন করে

গেছেন। যে-ব্যথা সামাজিক মানুষ তাঁর কানে-কানে নিবেদন করেছে, যে-আশার ছবি তুলে ধরেছে তাঁর চোখের উপর—তাদের তিনি যথাযথ ভাষা দিয়ে গেছেন, কিছুই গোপন করেন নি, গোপন করে মানুষের প্রতি অবিচার করেন নি। তাঁর উপন্যাসে তাই বাঙালীর এক বিরাট শোভাযাত্রা দেখ্‌তে পাই আমরা, সময়ের বুকের উপর অসংখ্য পদধ্বনি শুনতে পাই—সময়কে নির্ম্মাণ করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা, এগিয়ে চলেছে নিজেদের নির্ম্মাণ করে। ভেঙেচুরে পার্ব্বতী কমল হ'য়ে গেছে, ইন্দ্রনাথ সব্যসাচী হয়ে গেছে কখন, সে-বার্ত্তা হয়তো সবসময় তাঁর মনের সচেতনতায় এসে উঁকিও দেয়নি, সময়ের সঙ্গে নিজেকে এম্নি অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্র।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরেকার অধ্যায়ই অন্যরকম। আমরা তখন দেখ্‌তে পাই বাংলা-উপন্যাস সাহিত্যে ক্লান্তি জমে উঠ্‌ছে, উপন্যাসের গতিপ্রবাহে ক্লান্তি, পাঠকের মনে ক্লান্তি। তার মানে বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মনে জড়তার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। যেন উপন্যাসের গোপনমন্ত্র লেখা হয়ে গেছে, মানুষকে জানবার, সময়কে অনুভব করবার, সমাজকে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন যেন আর নেই, শরৎচন্দ্রের মানসিক আর্দ্র্তা অনুকরণ করেই যেন পারের কড়ি হাতে পাওয়া যাবে, এম্নি একটা মনোভাব ষড়যন্ত্রের মতো ছড়িয়ে পড়ল ঔপন্যাসিকদের মনে। অবিরত শরৎচন্দ্রের স্বাদাবশেষ ভুঞ্জন করে পাঠকের মনে ক্লান্তি আস্‌তে বাধ্য কিন্তু এ-ক্লান্তি সোচ্চার নয় বলে খুব সত্বর ঔপন্যাসিকরা উদ্যমহীন হলেন না। কিন্তু পাঠকের ক্ষমাগুণ দেখা গেলেও স্রোতস্বান সময় জড়তাকে বেশিদিন সহ্য করতে পারেনা, কাজেই অচিরেই দেখা গেল বাংলা উপন্যাস সাহিত্য শরৎচন্দ্রের অন্ধ অনুকারকদের জন্যে খুব প্রশস্ত স্থান নির্দ্দেশ করেনি। অন্ধ অনুকারকদের নিয়ে অবশ্য কোনোসময়ই সাহিত্য ও শিল্পের খুব বেশি বিপদ নেই—শক্তির অভাবে তাঁরা একসময় ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েনই। কিন্তু অনুকরণের সঙ্গে যাঁরা নিজেরও খানিকটা উপকরণ মিশিয়ে চলেন, তাঁরাই পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যের প্রতি শত্রুতাসাধন করতে সমর্থ। তাঁদের উপস্থিতিতে সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয় না কিন্তু মন্থর হয়, সাহিত্যের বর্ণ কালো হয়ে যায়না কিন্তু নিষ্প্রভ হয়। সময়ের রাশ টেনে ধরতে চান তাঁরা তার স্বাভাবিক দ্রুতগতিকে খর্ব্ব করবার জন্যে। বাংলা উপন্যাসের এ-অবস্থাটাই মারাত্মক, জড়তার চেয়েও ক্লান্তিকর এবং এ-অবস্থা থেকে বাংলা উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আস্‌তে পারেনি।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা শরৎচন্দ্রকে অনুকরণ না করে যদি অনুধাবন করবারও চেষ্টা করতেন তাহলে বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক এই উভয়েরই উপকৃত হবার সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা দেখ্‌তে পেতেন শরৎচন্দ্রের মন জননীর দেহযন্ত্রের মতোই সক্রিয়, সে মনে তিল-তিল

করে এক একটি জীবন তৈরী হয়ে চলেছে। তার চরিত্রগুলো তাঁর মনের শরীক, চিন্তার শরীক। তাঁর মন আর চিন্তা খাঁটি বাঙালী বলে তাঁর চরিত্রগুলোও বাঙালীর সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছে। মন আর চিন্তাকে যাঁরা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারবেন, তাঁরা কেন অনুকরণের কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে কালক্ষেপ করবেন? ইতিহাসের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, সমাজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, জীবনের ক্ষীণতম বর্ণান্তর তাঁদের চেতনাকে স্পর্শ করে সৃষ্টির প্রেরণা দেবে। উপন্যাস-শিল্প উপন্যাসিকের কছে এ-দাবী ছাড়া আর কোনো ইচ্ছা জানায় না। শরৎচন্দ্রের সমাজ, শরৎচন্দ্রের বাংলাদেশ ও বাঙালীর মন আজ অতি-প্রত্যক্ষভাবে বদলে গেছে—ষোড়শী জীবানন্দ-সাবিত্রী-রাজলক্ষ্মীকে উপাখ্যানের সামগ্রী করে বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক পরিচ্ছন্ন দিনের আলোতে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনের ধারা এখন অনেক স্পষ্ট, অনেক ঋজু, অনেক নির্ভীক কিন্তু তার স্পন্দন, তার উচ্চারণ কোথায় বাংলা উপন্যাসে? যে-সময়ে যে-মন নিয়ে বসবাস করে যাচ্ছি আমরা আমাদের সাম্প্রতিক উপন্যাসে তার ছবি খুবই কম। বাঙালী সমাজে যে-শ্রেণী দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, যাদের অর্থনীতির, রাজনীতির, সমাজনীতির ও মনোনীতির পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে বছরে-বছরে সেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর নির্ভুল জীবন নেই কোনো উপন্যাসের পাতায়। আজও শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বহন না করে বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব হয়না।

সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, শরৎসাহিত্যকে বাংলা উপন্যাসের ধ্রুপদী সাহিত্য বলে ধরে নিয়ে সেখান থেকে বস্তু গ্রহণ করে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে কি উপভোগ্য উপন্যাস তৈরী হ'তে পারে না? শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু কি প্রাচীন ধ্রুপদী চিত্রের বিষয় ও ছন্দ নিয়ে তার আঙ্গিকের ক্রুটী সংশোধন করে উত্তম শিল্পসৃষ্টির করেন নি? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে চিত্রকলার সঙ্গে উপন্যাসের লক্ষণ মিলিয়ে দেখতে হয়। বর্ণে ও রেখায় একটি রূপসৃষ্টির নামই চিত্রকলা, চিত্রশিল্পীর মানসপটে তড়িৎপ্রভাবৎ সেই রূপের আবির্ভাব হয় এবং তারই ইঙ্গিতে বর্ণের ও রেখার জন্ম হ'তে থাকে। ধ্রুপদী চিত্রের আঙ্গিক সংশোধনের অর্থ ধ্রুপদী চিত্র থেকে রূপসৃষ্টির যে-প্রেরণা সঞ্জাত হয় বর্ণে ও রেখায় তার সম্পূর্ণতা দান। উপন্যাসের উপাদান রূপ নয়, মানুষ, যে-মানুষ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক, যে-মানুষ আবেগময়, মননময় এবং মানবতার অপচয় ও পূর্ণতাময়। রূপের একটি সার্ব্বকালীন অক্ষয় সত্তা আছে কিন্তু মানুষ দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল, ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তার চেহারা আলাদা। রূপসাধনার মতো স্থাণুত্বের অবকাশ নেই উপন্যাসে, চলচ্চিত্রের মতো তার ধারা অপ্রতিহতভাবে চল্‌বে। উপন্যাস জীবনের সবচেয়ে কাছের শিল্প, যে-প্রক্রিয়ায় জীবনের গঠন চলে, ধীরে-ধীরে ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে একটি সম্পূর্ণতার স্তূপ গড়ে ওঠে যেমন—উপন্যাসের গঠন-প্রণালীও তা-ই—ঔপন্যাসিকের অনুভূতিতে উপন্যাসের রূপ তড়িৎপ্রভাবৎ

উদিত হয়না। কাজেই উপন্যাসের অন্তর্গত নিয়মেই ধ্রুপদী উপন্যাস নামের কোনো সার্থকতা নেই, কারণ অতিবড় কাল্পনিকের কল্পনায়ও ধ্রুপদী মানুষ বলে কিছু নেই।

সাম্প্রতিক যুগে আরেকদল ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা শরৎচন্দ্রের অনুকারক নন কিম্বা শরৎচন্দ্রকে ধ্রুপদী ঔপন্যাসিক বলেও মনে করেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা শরৎচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াতে পারেন নি। যে-রূপ নিয়ে মানুষগুলো শরৎচন্দ্রের মনে প্রতিভাত হয়েছিল, আজও তারা সে-রূপ নিয়েই তাঁদের মনে ধরা দিচ্ছে। তাঁদের দেখা-টা আন্তরিক, অনুকরণের কথা হয়ত সেখানে সত্যি অনুপস্থিত। একটি অনুন্নত দেশে সামাজিক মনের পূর্ণ রূপান্তর হয় না, হয়ত সংযুক্ত বিকাশ মাত্র কল্পনা করা যায়। সভ্যতার সর্ব্ব নিম্ন স্তর থেকে সুরু করে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের মানুষ এবং প্রত্যেকটি মানসিক পর্য্যায় হয়ত বাংলাদেশে উপস্থিত আছে। শরৎচন্দ্র যে ধরণের মানুষদের তাঁর চারপাশে অনুভব করেছেন তারা আজ সংখ্যাল্প হলেও সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সাম্প্রতিক যুগের কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের হয়ত সেই ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলোর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা, হয়ত তারা পশ্চাৎপটে চলে যাচ্ছে বলেই তাদের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ তাঁদের, কিম্বা হয়ত নিজেরাই তাঁরা সে শ্রেণীর মন ও মননের উত্তরাধিকারী। এ সম্প্রদায়ের ঔপন্যাসিকদের সদিচ্ছা ও সদন্তঃকরণ মেনে নিয়েও আমরা বল্‌তে বাধ্য বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ তাঁরা ম্লান করে দিচ্ছেন। সভ্যতার পুরোভাগে যারা এগিয়ে গেছে তারাই সমাজের ভবিষ্যৎ শক্তি, ঔপন্যাসিক যদি তাদের প্রতি অমনোযোগী থাকেন, তাদের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে না পান তাহলে তিনি মানুষের সভ্যতা ও সমাজের গতিপ্রবাহকে উপেক্ষা করছেন বলতে হবে। এ উপেক্ষায় উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষতির চেয়ে তাঁদের নিজের ক্ষতি বড় কম নয়—এই পেছনের টান একদিন তাঁদের শিল্প-শক্তি নষ্ট করে দেয়। মানুষের জীবনের উপর কোনো উপপ্লবের বা সমাজের উপর কোনো বিপ্লবের সূত্র তাঁরা আর খুঁজে পাননা, শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্যই দেখে যান, কখনো আনন্দিত হন, কখনো বিস্মিত, কখনো বা বিষণ্ণই হতে পারেন আর পারেন সেই দৃশ্যের নিষ্প্রাণ, ক্লান্তিকর বর্ণনায় উপন্যাসের কলেবর ভারাক্রান্ত করে তুলতে। জীবনের আবেগ ও অনুভূতির ক্ষুদকুঁড়া ধীর মন্থর হাতে কুড়িয়ে আনায় যে ভার জমে ওঠে উপন্যাসে, উপন্যাস তাকে সহ্য করলেও এ ভার তার সহ্য হয়না। কাজেই অনুকারকদের পর্য্যায়ভুক্ত না হয়েও এ দলের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস-সাহিত্যকে এবং নিজেদের সেই একই অবস্থায় এনে উপস্থিত করেন। শেষ বিচারে এঁদেরও সেই অনুকারকদের পংক্তিভুক্ত হয়েই দাঁড়াতে হয়।

কেবল ঔপন্যাসিকদের মোটামুটি একটা পরিচয়ে উপন্যাস-সাহিত্যের সত্যিকারের বিচার হয়ত অসম্পূর্ণ থাকে। শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী বাংলা উপন্যাসের অচল অবস্থার জন্যে যে শুধু

ঔপন্যাসিকরাই দায়ী—পাঠকশ্রেণী সর্ব্বদোষমুক্ত, এমন কথা বলা যায় না। উপন্যাস একটি সামাজিক ক্রিয়া। ক্রিয়াকারের অনিবার্য্য ত্রুটীর জন্যে ক্রিয়া-উপভোগকারীও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী হতে বাধ্য। পাঠকশ্রেণী অনেকসময় শরৎচন্দ্রের রসাস্বাদন থেকে মুক্ত হ'তে ত সহজে রাজী হনই না বরং আবেগের আস্বাদে অভ্যস্ত হয়ে মনে-মনে বল্‌তে সুরু করেন, আরো চাই। আবেগের রঙ আরো গভীর, আরো ঘন হলেই যেন তাঁদের তৃপ্তি সুসম্পন্ন হয়। শরৎচন্দ্রের মানসিক পরিস্ফ্রুতিতে আবেগ যতটুকু অনুভূতির রূপ নিয়েছিল, ততটুকু পেলেও যেন এখন আর চলেনা। পরিস্ফ্রুতির প্রয়োজনই যেন আর নেই, সেই কাঁচা আবেগ গলাধঃকরণ করতে পারলেই যেন নিষ্প্রাণ জীবনে খানিকটা প্রাণসঞ্চার হয়। পাঠকশ্রেণীর এই তির্য্যক মনোভাব উপন্যাসের সুফল ফলাতে অক্ষম। শরৎচন্দ্রের যুগের মানুষের চেয়ে এখনকার মানুষ অনেকাংশে আবেগমুক্ত—তার নির্ভুল চেহারা দেখতে না চেয়ে যদি আজ পাঠকশ্রেণী আবেগসম্বল একপ্রকার জীবের জীবনে তৃপ্তি খুঁজতে যান তাহলে নিজেদের প্রতি তাঁদের ঘোরতর অনাস্থা জন্মেছে বল্‌তে হয়। এই অনাস্থা যে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে না দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাতেই আমাদের আক্ষেপ। জীবনের অগ্রগতিকে অস্বীকার করে লাভ নেই। আমাদের জীবনে ভাবাবেগ যদি আজ সংযত হয়ে থাকে, মনন ও বুদ্ধিকে যদি আমরা প্রশ্রয় দিতে সুরু করে থাকি সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে তাকে অ-মানুষিক বলা যায় না। পাঠকশ্রেণী যদি নিজের দিকে, নিজের সময়ের দিকে তাকিয়ে উপন্যাস-পাঠ শিক্ষা করেন, তাহলে, মনে হয়, বাংলা উপন্যাসের বন্ধন-মুক্তি খুব দূরের ঘটনা হয়ে থাক্‌বে না। তা না করে যদি এখনও তাঁরা উল্লোল উল্লাসের আর রক্তবজ্রের গাঢ় নির্য্যাস পান করে পুলকরোমাঞ্চস্বেদশিহরণ পেতে চান তাহলে উপন্যাসের গতিশীলতা একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়েই নিরস্ত হতে পারে। কে বল্‌বে, পাঠকমনের প্রতিকূল হাওয়ার টানের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের অগ্রগমনের ইচ্ছার সংমিশ্রণেই আজ বাংলা উপন্যাসের জড়অবস্থা প্রাপ্তি ঘটেছে কি না।

তবে আশার কথা এই যে মানুষের জীবন-বিকাশের নিয়মেই উপন্যাস-সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুন্নত দেশ বলে নূতন জীবনের আলো-বাতাস যেমন এখানে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ নয় ঠিক তেম্নি দুস্তর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নূতন জীবনের উঁকিঝুঁকি বাংলা উপন্যাসে কেউ রোধ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে তার আভাস আমরা পেয়েছি। কিন্তু তা শুধু আভাসই। বর্ত্তমানকে কেউ নির্ভুল সম্পূর্ণতায় আজ পর্য্যন্ত ধরে দিতে পারেন নি। একদিন কেউ তা নিশ্চয়ই ধরে দেবেন। কেউ একা, না-হয় কোনো ঔপন্যাসিক গোষ্ঠী। আমরা তাঁদের অপেক্ষায়ই থাকব।

চিত্রকলা

বাংলার গত মন্বন্তরের পটভূমিকায় অঙ্কিত শিল্পী ইন্দু গুপ্তের সাতটি ত্রিবর্ণ চিত্র সম্প্রতি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার গ্রাম থেকে যারা বেরিয়ে এসে সহরের কঠিন ফুটপাথে মাথা ঠুকে মরেছে তাদের কাহিনী নিয়েই এ-ক'টি চিত্র। শিল্পী আশা করেছেন এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর ব্যথা, এই নরকঙ্কালের স্তূপ ব্যর্থ হবেনা, বাংলার মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াবে বলিষ্ঠ জীবনের নবাঙ্কুর—দু'শো বছরের দীর্ঘ রাত্রির অবসানে ফুটে উঠ্‌বে নূতন প্রভাতের অরুণিমা। শিল্পীমন প্রাণের উৎসার আর জীবনের ছন্দকে ভুলে যেতে পারেন না, চিরকালই তাঁদের আশা মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে নীড় রচনা করে। শিল্পের ও শিল্পীমনের সার্থকতা এইখানেই। মনের দিক থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দু গুপ্ত যথার্থ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রোত্তর যুগে একসময় বর্ণধৌত চিত্র যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। শুধু শিল্পীরাই নন, শিল্পভোক্তারাও বর্ণের সুকোমল মিশ্রণকে অঙ্কনপদ্ধতির একটি সম্পদ বলে মনে করতেন। আর সত্যি, এ-পদ্ধতিতে যে কতো শিল্পীর কতো বিখ্যাত ছবি অঙ্কিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জাপানী চিত্রের চিক্কণতা এবং পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্যতার সমন্বয়েই হয়ত এই পদ্ধতির উদ্ভব কিন্তু বাংলার চিত্রকলা বল্‌তে কিছুকাল আমরা এই পদ্ধতির চিত্রকেই বুঝেছি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ছন্দোময় রেখাও এ-ধরণের চিত্রে স্থান-লাভ করেছে, উদাহরণত উকীল-ভ্রাতৃদ্বয়ের ও চাঁঘ্‌তাইসাহেবের চিত্রগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীযুত ইন্দু গুপ্তও বর্ণপ্রলেপে এই পদ্ধতিভুক্ত শিল্পী। মূর্ত্তি-অঙ্কনে পাশ্চাত্য প্রভাবকে অস্বীকার না করেও তিনি ভারতীয় রেখার ছন্দটি ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন। সব মিলে তাই তাঁর ছবিগুলোতে বিংশ শতকীয় ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে।

কিন্তু ছবিগুলো দেখে একটি প্রশ্ন আজ আমাদের করতে হয়: চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি কোনো বিশেষ একটি যুগ-রীতিতে আবদ্ধ থাকলে কি তা চিত্রভোক্তার চোখের পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনা? শিল্প, তা সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত যা-ই হোক না কেন, এমনই একটি বিষয় যার পটপরিবর্ত্তন দ্রুতলয়ে না হলে সমঝদাররা তৃপ্তি পেতে পারেন না। পাশ্চাত্যে যে কি দ্রুতলয়ে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হচ্ছে তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বহুশিল্পী তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিও পরিবর্ত্তন করে নিচ্ছেন। চিত্রাঙ্কন

পদ্ধতিতে স্থলভেডর ডালির পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর। আমাদের কাছাকাছি শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ও আছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের ছবিগুলো যদি বর্ত্তমানের যুগরীতির স্পর্শ লাভ করত তাহলে আমাদের মনে হয়, এ-যুগের শিল্পজ্ঞদের কাছে গ্রন্থখানি একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতে পারত।

Bengal in Agony : Indu Gupta (Book Company– Rs 10/-)

সাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী—নলিনীকুমার ভদ্র। মডার্ণ পাব্লিশার্স। দাম—২৲

প্রতিবেশী হলেও সত্যিই এরা আমাদের অপরিচিত। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, চেনেন কি সিন্টেংদের বা মিকিরদের কিংবা বল্তে পারেন কিছু দল্মা পাহাড়ের 'হো' দের কথা? জানি, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বিনীতভাবে স্বীকার করবেন, এরা তো আমাদের পরিচিত নয় কেউ। অথচ, আশ্চর্য্য এই, আমরা অনর্গল মুখস্ত বলে যেতে পারি, উজ্বেকিস্তানবাসী নরনারীর ইতিহাস, পারি কশাকদের দুর্নিবার প্রকৃতির সন্ধান দিতে; আর সুদূর দেশবাসী এস্কিমোদের সম্বন্ধে বহুমূল্য তথ্য আছে আমাদের মাথায় জড়ো হয়ে। কিন্তু, আমাদের নিজেদেরই দেশবাসীর সম্পূর্ণ পরিচয় যতক্ষণ না আমরা জান্তে পারি ততক্ষণ এ পাণ্ডিত্য যে আমাদের পক্ষে বিন্দুমাত্র গৌরবের বস্তু নয় বরং অপমানকর, সে কথাটা এতদিন আমরা একান্তভাবে ভেবে দেখ্তে চেষ্টা করিনি। তাদের সম্বন্ধে যদি কখনও কিছু আমাদের জান্বার প্রয়োজন হয়, আমরা শরণ নিই যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থের, সত্যের খাতিরেই বল্তে হবে, সে সব গ্রন্থের রচয়িতা প্রায় সকলেই বিদেশী, অভারতীয়। আমার এ কথাটা ঠিক কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নলিনীবাবুর এই গ্রন্থেরই শেষে সন্নিবেশিত গ্রন্থপঞ্জী থেকে। এগারোটা বই-এর নাম উল্লেখ করেছেন তিনি, যে সব বই তাঁকে সাহায্য করেছে; আর আশ্চর্য্য এই সব কয়টিই অভারতীয়ের রচনা। এই ব্যাপারটি থেকেই কি বোঝা যাবে না, নলিনীবাবু 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী'-দের সম্বন্ধে যে তথ্যের সন্ধান করেছেন, তাতে তিনি নিজের দায়িত্বে দেশবাসীর একটা অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করে সত্যিকারের একটা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'বিচিত্র মণিপুর' দিয়ে যে কাজ সুরু করেছিলেন এ গ্রন্থে তাঁর সে কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

কতগুলি বই-এর নাম দিয়ে নলিনীবাবু তাঁর সহজ সারল্য প্রকাশ করেছেন মাত্র। আসলে এ বইগুলো থেকে তিনি যে সাহায্য পেয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য লাভ করেছেন তিনি নিজেরই চোখ কান আর সংবেদনশীল মনের কাছ থেকে। চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, কান দিয়ে যা শুনেছেন, তারই প্রত্যক্ষ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এখানে; শুধু তাই নয়, হৃদয় দিয়ে যা তিনি অনুভব করেছেন তাকেও প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সহজভাবে। সুতরাং এ প্রত্যক্ষদর্শন এবং সাহিত্যিকসুলভ অনুভূতির স্বাভাবিক মিশ্রণের ফলে, এ গ্রন্থটি কেবল মাত্র একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত বা গদ্যকাব্য হয়ে ওঠেনি, ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে একটি খাঁটি রসঘন কাহিনীও হয়ে উঠেছে। একটা ভ্রমণকাহিনীকে কালির অক্ষরে লিপিবদ্ধ করাতেই কৃতিত্ব নয়, আসল কৃতিত্ব হচ্ছে তাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে সৃষ্টি করায়। কে না স্বীকার করবে, নৃতত্ত্ব বা কোনোও একটা দেশের নিছক ভৌগোলিক বর্ণনা পাঠকের মনে বারবার ক্লান্তি এনে দেয়, কিন্তু বর্ণনার জৌলুসে সেই ভূগোল আর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যদি সকলের কাছেই সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তবে আর বলতে দ্বিধা থাকে না যে, এ সম্ভব শুধু বর্ণনাকারের লেখনীর গুণেই। নলিনীবাবুর কলমের যে সে গুণ আছে, পর পর তাঁর দুটো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে সে কথা অকুণ্ঠায় স্বীকার করি।

সিংভূমের বর্ণনায় লেখক কিন্তু বড় বেশী উচ্ছল হয়ে পড়েছেন। ভালো লাগার স্বাভাবিক প্রেরণায় হয়ত তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত মনের বিচারে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতে চেষ্টা করতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন, এ উচ্ছলতার ফলে তাঁর বর্ণনা যতখানি সাহিত্যরূপ পেয়েছে, কাহিনী ততখানি বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। তবে এ দোষটা শুধু অংশ বিশেষেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নইলে, সম্পূর্ণ বইটি সম্বন্ধে এ কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, এ কাহিনীগুলোর আকর্ষণ অনিবার্য্য।

অনিল চক্রবর্ত্তী

কবিতা

চিত্রোৎপলা, গীতিমঞ্জরী } কানাই সামন্ত, সাহিত্যিকা, কলকাতা, মূল্য যথাক্রমে আড়াই টাকা ও একটাকা

প্রথমটি কবিতার বই, দ্বিতীয়টি গানের। চিত্রোৎপলার কবিতাগুলি গদ্যছন্দে লেখা, প্রায়শ জীবনের সহজ, সাধারণ পরিবেশকে আশ্রয় করে কবিত্বের প্রবাহ। রচনাগুলোর মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য আছে যা মনোহর ও উপভোগ্য। শান্ত ও মধুর একটি সুর সমস্তগুলি কবিতার মধ্যে মৃদুভাবে ধ্বনিত হচ্ছে, কোথাও চমকপ্রদ উপমা বা অ-সাধারণ বর্ণনাচাতুর্যে উদাত্ত হয়ে ওঠেনি; একারণে কোনো উদ্ধৃতির দ্বারা এর স্নিগ্ধ মাধুর্যটি বোঝানো শক্ত। কবিতাগুলি পড়ে শেষ করলে একটা আবেশের অনুভূতি মনে সঞ্চারিত হয়। রচনার ভঙ্গী সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক, একারণে কবির বৈশিষ্ট্য ততটা

স্পষ্ট নয়। কিন্তু লেখকের চিন্তা ও ভাষার অনাড়ম্বর সরলতা প্রত্যেক পাঠকেরই অন্তর স্পর্শ করবে।

গীতিমঞ্জরী আঠারটি গানের সমষ্টি। গ্রন্থকার আশা পোষণ করেন যে 'সুর বাদ দিয়েও হয়তো কিছু রসগ্রহণ করা সম্ভব হবে'। প্রকৃতই এখানেও কবিত্বের অভাব নেই। কিন্তু মনে হয় সুরসংযোগেই রচনাগুলির যথার্থ উপভোগ সম্ভব। চতুর্দশ সংখ্যক রচনাটি আমার খুব ভালো লাগলো :

নিশান্তের বৃষ্টি অবসানে
দক্ষিণে ধূসরকান্ত
স্নিগ্ধশান্ত মেঘ-মাঝখানে
অকম্পিত নারিকেল আলোকের স্নানে
ঊর্ধ্বে তুলে শির।
কখন মিলায় আলো। অশ্রান্ত বৃষ্টির
দিগ্বিদিকে চিক নেমে আসে।
অশান্ত বাতাসে
নারিকেলশীর্ষ ঘন দোলে
দিগ্বলয় কোলে।

দু'খানি বইয়েরই প্রচ্ছদপট নন্দলাল বসুর আঁকা। ছাপা বাঁধাই প্রকৃতই মনোরম।

অজিত দত্ত

ফরিয়াদ—মতিউল ইস্‌লাম। প্রকাশক—আল্‌হামরা লাইব্রেরী। দাম—১॥০

বাংলা কাব্যসাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুল ইস্‌লামের আবির্ভাব ঘটেছিলো কয়েক দশক পূর্ব্বে। কিন্তু এতবড় একজন প্রতিভাবান কবিকে পুরোভাগে পেয়েও এখনও পর্য্যন্ত কেন যে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তেমন আশাপ্রদ কবির আবির্ভাব ঘটলো না, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। প্রাচীনপন্থী কবিতা রচনা করে কয়েকজন অবশ্য কিছু কিছু নাম কিনেছিলেন, কিন্তু কাব্যবিচারে তাঁদের রচনা বিশেষ মূল্যবান কিছু নয়। অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন তরুণ মুসলমান কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের রচনা বিস্ময়কর কিছু না হলেও নতুনত্বের দাবী করতে পারে। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও আশার কথা এই যে তাঁরা সত্যিকারের কবিমনের অধিকারী। ভালো রচনা কম হলেও তার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়।

মতিউল ইস্‌লামের নাম এই তরুণ কবিদের ক্ষুদ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ফরিয়াদ তার প্রমাণ। যদ্দূর মনে পড়ে কবির আর একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আমার হাতে পড়েছিলো প্রায় সাত আট বছর আগে, কিন্তু ভাবে ভাষায় ও রচনারীতিতে মতিউল ইস্‌লামের কাব্যে এত পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে, 'ফরিয়াদ'-কে নিঃসন্দেহে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

'ফরিয়াদ'-এর কবি নৈরাশ্যের অন্ধকার ছিন্ন করে নতুন প্রভাত-আলোর সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আশাবাদী, তাই যদিও একবার তাঁর মনে হয়;

অতল সমুদ্রে লুপ্ত মনের ভাস্কর,
খুঁজিয়া না পাই আজ কোথায় কখন ছিল—
কলিকাতা নামে এক মুখর নগর!

তথাপি, তাঁর আশাবাদী মন এ অবস্থাকে সাময়িক মনে করেই উচ্চারণ করে:

মৃত্তিকা কুমারী যেথা স্ফীতবক্ষ সাহসে দুর্জ্জয়
ফলাও সেখানে তুমি বলস্ফূর্ত্ত সোনার ফসল।

মতিউল ইস্‌লামের কবিতা সুন্দর এবং সুখপাঠ্য স্বীকার করি, কিন্তু ফরিয়াদ পড়ার পর একটা কথা স্বতঃই মনে জাগে, সাময়িক অব্যবস্থার মধ্যে যে হতাশা তাই যদি কবিমনকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখে, তবে মহত্তর মঙ্গলের পথে এগিয়ে যাবেন তিনি কি সম্বল করে! মনে হয় কাব্যবস্তুর প্রাণমূলের সন্ধান এখনও কবি পান নি, তবে আশা করা যায়, এ বন্ধনদশা কেটে গেলে তিনি, সত্যিকারের ভালো কাব্যরচনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে মতিউল ইস্‌লাম প্রায় নিখুঁৎ, কয়েকটি সনেট তো গাঢ়বদ্ধতায় বেশ ভালো। শব্দচয়ন ব্যাপারে আরও খানিকটা সাবধানতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

অনিল চক্রবর্ত্তী

ত্রিশূল: অমলেন্দু গুহ, দীপ্তিকল্যাণ, রাম বসু (প্রচারক—প্রগ্রেসিভ ফোরাম, কলেজ ষ্ট্রীট: দাম ছ আনা)
নোতুন পৃথিবী ও অন্যান্য কবিতা: সন্তোষকুমার চন্দ (প্রকাশক—সংস্কৃতি প্রকাশনী, বরিশাল: দাম চার আনা)

যে নির্মল আন্তরিকতার ফলে কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে ইদানীং তার বড়ো দুর্ভিক্ষ। মনে হয়, শব্দবিন্যাসের তীক্ষ্ণ জৌলুষ, মিলের আকস্মিকতা ইত্যাদি সব কিছু মিলে কবিতার ক্ষেত্রে একটা ঘোরতর স্নায়ু-যুদ্ধ চলছে, একটা বিশুদ্ধ ঠাট্টা। কিন্তু মন এতে তৃপ্ত হয়না, এর আন্তরিকতাহীন অপরিচ্ছন্ন প্রভাবে ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

এ রকম হয় কেন? কবিতার বহির্বিন্যাস যাঁদের এতখানি করায়ত্ত, তাঁদের কবিতায় কেন এই আন্তরিকতাটুকুর সন্ধান পাইনা? নিঃসংশয়ে এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে আদর্শহীনতা অথবা, তার চেয়েও যা মারাত্মক, আদর্শকে পরিহাস করবার মনোবৃত্তি। এই আদর্শহীনতাই খুব সম্ভব প্রগল্‌ভ পরিহাসপ্রবণতাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে সাহায্য করে, কোনও চরিত্র লাভ করতে দেয়না কবিতাগুলিকে। যা বল্‌লাম, তাকে অনেকেই পিউরিট্যানসুলভ উক্তি মনে করে আতঙ্কিত হতে পারেন, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যে জিনিসের আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তা যে পিউরিট্যান মিল্টনের কবিতারই চারিত্রিক দৃঢ়তা একথা অনস্বীকার্য।

'ত্রিশূল' কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে হলো। এখানি একটি 'কলেজীয়' কাব্যগ্রন্থ; কলেজীয় চপল মনোবৃত্তির সবটুকুই এর মধ্যে বর্ত্তমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে ট্রামের লেডীজ সিটে কোনো মনোহারিনীর পরিবর্ত্তে 'খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা দেউলিয়া কেরানীর দল'কে দেখ্‌বার বিড়ম্বনা, নিজের ক্লাসের পার্সেণ্টেজের মমতা ত্যাগ করে বান্ধবীর ক্লাসে গিয়ে তাঁর প্রসাদলাভের করুণ প্রয়াস, অধ্যাপকবৃন্দকে কটাক্ষ করে তাঁদের মারাত্মক সমালোচনা এবং আরো একশো রকমের চপলতাই ত্রিশূলের কবিতাগুলির উপজীব্য; মাঝে মাঝে আদর্শবাদ নিয়ে যে তুমুল টানাটানি চলেছে তাকে সস্তায় বাজীমাৎ করবার চেষ্টা ছাড়া আর কি বল্‌ব!

আশ্চর্যের কথা, তিনজন লেখকের আঙ্গিক, শব্দচয়ন ইত্যাদির উপর প্রশংসনীয় অধিকার রয়েছে অথচ তা সত্বেও, শুধুমাত্র নাবালক চাপল্যের দোষে, আন্তরিকতাবর্জিত এই কবিতাগুলি দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে।

'নোতুন পৃথিবী ও অন্যান্য কবিতা'র মধ্যেও কোনো উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া গেলনা। অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে লেখকের ভাবালুতার আতিশয্য একটি মারাত্মক ত্রুটি হয়ে দেখা দিয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাটক

বাঁধ ভেঙে দাও
হে বীর পূর্ণ করো } —মন্মথকুমার চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী।

বাংলাদেশে নাটক আজো সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয় হয়েই আছে। তার জন্য দায়ী বস্তুতঃ নাট্যমঞ্চকর্ত্তৃত্বের রুচি ও বিচার। হয়ত কেউ কেউ বল্‌বেন, মঞ্চস্থ করা যেতে পারে অথচ সাহিত্য হিসেবেও সার্থক এমন নাটক যদি সত্যি সত্যি রচিত হয়, তা হলে সমালোককে এ অভিযোগের অবকাশ গ্রহণের সুযোগ নাট্যমঞ্চের কর্ত্তারা সত্যিই দেবেন না। কিন্তু কথাটা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ, আমরা দেখেছি, এমন দু' একটি নাটক বাংলাসাহিত্যে সত্যিই রচিত হয়েছে যা সাহিত্য হিসেবে সার্থক তো বটেই, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষেও যা নির্ব্বিঘ্নে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দেখা গেছে, রঙ্গমঞ্চে তাদের গ্রহণ করবার কোনো প্রশ্নই কখনো ওঠেনি। তাই, যদি মনে করা যায়, রঙ্গমঞ্চের এই ঔদাসীন্যের জন্যই এইসব নাট্যকারেরা যথেষ্ট ক্ষমতা নিয়েও নাট্যরচনার চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে যান, তা' হলে বোধ হয় খুব অন্যায় কিছু বলা হয় না।

মন্মথকুমার চৌধুরী সেই সার্থক নাট্যকারদের অন্যতম। এটা বড় আশার কথা যে, নিরাশ না হয়ে তিনি একাগ্র মনে নাটক রচনা করে চলেছেন। 'বাঁধ ভেঙে দাও' তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে আখ্যায়িত করা বোধ হয় ভুল। এটি-একটি প্রহসন, কিন্তু খাঁটি বিদ্রূপ। দেশ যখন চরম সঙ্কটের মুখোমুখি তখনও আমাদের দেশের তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁদের অদ্ভুত খামখেয়ালি

নিয়ে ব্যস্ত আছেন। দেশের উন্নতির জন্য নাকি তাঁরা সত্যই অত্যন্ত চিন্তিত, তাই তাঁদের পরিকল্পনার অন্ত নেই। কিন্তু দেশের জন্যে যাঁরা যশাভিলাসী না হয়ে সত্যিকারের কাজ করে চলেছেন একান্ত গোপনে গোপনে, তাঁদের সেই সুপরিচালিত কার্য্যধারার তুলনায় এই সব বিদ্বজ্জনের অন্তঃসারশূণ্য পরিকল্পনা যে কত ব্যর্থ, কত মূল্যহীন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনই যখন এই দুই আদর্শের সংঘাত ঘটে, যখন প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এসে দাঁড়ান তাঁরা।

বেশ বোঝা যায় নাট্যমঞ্চের অপেক্ষা না রেখেই নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করেছেন। উদ্দেশ্যটি মহান এবং সময়োচিত, কিন্তু নিতান্ত সত্য হলেও অপ্রিয় সত্য বলেই বোধ হয় নাট্যকার প্রহসনের রূপটি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু বল্‌তে বাঁধা নেই, তাঁর এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হবে না। চারদিকে যে আঘাত সুরু হয়েছে, তাতে কোন প্রবঞ্চনাই টিকে থাকতে পারবে না, এক সময় তাকে সে প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে পড়তেই হবে। 'বাঁধ ভেঙে দাও' সেই আঘাতেরই সাহিত্যপ্রতীক মাত্র।

* * * *

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নেকনজর নাটকের প্রচারের পক্ষে মস্ত সহায়ক, কিন্তু এমন নাটকও বাংলাদেশে রচিত হয় যে এই সৌভাগ্য (?) থেকে বঞ্চিত হয়েও পাঠক মহলে যথেষ্ট আদৃত হতে পারে, তার প্রমাণ মন্মথকুমারের 'হে বীর পূর্ণ করো'। এ নাটকটি তাঁর প্রথম রচনা, অথচ মাত্র কিছুদিনের মধ্যে তার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, তরুণ নাট্যকারের পক্ষে এমন ঘটনা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। 'হে বীর পূর্ণ করো' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরই তার বিস্তৃত সমালোচনা পূর্ব্বাশায় প্রকাশ করা হয়েছিলো। সুতরাং নতুন করে আর তার সমালোচনা করার প্রয়োজন বোধ হয় নেই।

অনিল চক্রবর্ত্তী

অনুবাদ

ফেরে নাই শুধু একজন : অনুবাদক-নেপালশংকর সরকার (প্রকাশক-জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ ; মূল্য ৩৲)

উনিশ শ' আটত্রিশ সালের কথা। চীনজাপান যুদ্ধ তখন পুরাদমে চলছে। ফ্যাসিস্ট্‌দের যুদ্ধে হারিয়ে দেবার সম্পূর্ণ বাহাদুরী যাঁরা ইদানীং সরবে দাবী করেছেন পৃথিবীর সেইসব 'গণতন্ত্রী'রা তখনও জাপানীদের সংঙ্গে মিতালী বজায় রেখে চলেছেন। সেই সময় এশিয়ার এক পরাধীন দেশ বিপন্ন চীনে সহানুভূতির দূত স্বরূপ একদল ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রাদি পাঠায়। এ'কাহিনী বেয়াল্লিশ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট্ ইচ্ছে করে ভুলে গিয়েছিলেন এবং এখনও অনেক বামপন্থীরা ভুলে যান।

পরিচ্ছন্ন ছাপা ও আঁটোসাঁটো বাঁধাই এই বইটি 'কংগ্রেস্ মেডিক্যাল মিশনে'র সেই বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী নিয়ে লেখা খাজা আহম্মদ আব্বাসের And One Did Not Come Back এর বাঙলা অনুবাদ। যে পাঁচজন ডাক্তার চীনে যান তাঁদের মধ্যে একজন—দ্বারকানাথ কোট্‌নিস্—আর ভারতবর্ষে ফিরে আসেন নি। তিনি শেষ পর্য্যন্ত চীনদেশেই ছিলেন, বেয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বরে তাঁর সেখানে মৃত্যু হয়। বইটির নাম তাঁর মৃত্যুকে লক্ষ্য করেই নির্বাচিত হয়েছে।

বইয়ে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা' সবই সত্য হ'লেও উপন্যাসের মত পড়তে লাগে। মিশনের সদস্যদের চরিত্রই শুধু নয়—তাছাড়া বিস্তর পরিচিত অপরিচিত চীনা চরিত্র মনে দাগ রেখে যাবে। মাদাম সান ইয়াৎসেন, কম্যুনিষ্ট নেতা চৌউএন্‌লাই, রিউই এ্যলে—প্রভৃতি দু'একটি আঁচড়ে চমৎকার ফুটেছে। তাছাড়া কাহিনীচ্ছলে আমরা যুদ্ধকালীন চীনের একটি ভাল ছবিও পাই। মিশনসংক্রান্ত কতকগুলি পরিষ্কার ফটো বইটির আর একটি সম্পদ।

মূল ইংরাজী বই পড়িনি! তবু অনুবাদ বেশ স্বচ্ছল মনে হোল, অনুবাদ বলে লেখা না থাকলে হয়তো চেনাই যেতো না। একটি ভাল বইয়ের অনুবাদ করিয়েছেন বলে প্রকাশক ধন্যবাদভাজন। যতদূর জানি, ঠিক এই ধরণের 'সাংবাদিক' বই—কি মূল, কি অনুবাদ,—আমাদের দেশে একটু অবহেলিতই হয়ে আছে। অনুবাদের বিষয়নির্ব্বাচনে প্রকাশক বেশ একটু নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন —অনুবাদসাহিত্য পাঠকেরা অন্ততপক্ষে এ'রায়টুকু নিঃসন্দেহে দিতে পারবেন।

রবি চক্রবর্ত্তী

সঙ্কলন ও সাময়িকী

অগ্রদূত—ঢাকা প্রগতিশীল পাঠগৃহ সম্মেলনের পক্ষ থেকে কালীপ্রসাদ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

ললিতা—সম্পাদক মুরারী দত্ত ৫৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলকাতার বাইরে থেকে এবং প্রায় অপরিচিত লেখকের রচনায় পুষ্ট হয়ে কোনো সাহিত্য-সঙ্কলন যে সত্যি ভালো হতে পারে 'অগ্রদূত' তার নিদর্শন। পরিচিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র নবেন্দু ঘোষের নামই চোখে পড়লো। তাঁর 'আতঙ্ক' গল্পটি পড়ে বোঝা গেলো, তিনি নবীন উৎসাহীদের ঠকানোর চেষ্টা করেন নি। কিন্তু বিস্মিত করেছে মাধুরী রায়ের ছোট গল্প 'ফরেষ্টার'। এমন সুসংবদ্ধ খাঁটি গল্প রচনা করা বোধ হয় বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত বাঙালী লেখিকাদের পক্ষেও কষ্টকর। রাখাল ঘোষ এবং ত্রিদিব চৌধুরীর প্রবন্ধ দুইটি কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণই নয়, আকর্ষণীয়ও। কবিতা সম্পাদনা কিন্তু মোটেই ভালো হয়নি। চিত্ত ঘোষের কবিতাটি মাত্র এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্প আমাদের দেশে নতুন নয়। এবং বাংলাদেশেই এমন কয়েকজন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠশিল্পী বলে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত চিত্রশিল্পের আদর আমাদের দেশে ব্যাপকতা লাভ করতে পারলো না।

তাই, যদি এমন কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় যাতে ভারতের এই সুপ্রাচীন ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা আছে, তবে মন সত্যই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। 'ললিতা' সেই চেষ্টাই কচ্ছে। জানি, ললিতার কর্তৃপক্ষকে প্রথম প্রথম অনেক বাধাবিঘ্ন পার হতে হবে, কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা যদি বজায় থাকে তা'হলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরাই যে জয়ী হবেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ললিতার যে সংখ্যাটি আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকে মনে হয়, সে আন্তরিকতা তাঁদের আছে।

অনিল চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

পূর্ব্বাশা ঃ আষাঢ়—১৩৫৪

নূতন প্রকাশিত
প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
'Though there are several excellent books on the great Mauryan emperor, we have long been looking for a monograph like the present one which is comprehensive, yet not big, satisfying yet not boring.
—Amritabazar.
তিন টাকা
পূর্ব্বাশা লিমিটেড
পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা

নূতন প্রকাশিত
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো
'We stand at the crossway now and we have no doubt that the perusal of the book will aid us to steer the ship of the Indian State in the right direction.'
—Amritabazar.
এক টাকা দুই আনা
পূর্ব্বাশা লিমিটেড
পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা

পূর্ব্বাশা, আষাঢ়
১৩৫৪

মা
(স্টেন্‌সিল্‌)

শিল্পী
উমারঞ্জন দত্তগুপ্ত

দশম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় • ১৩৫৪

গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব

লুই ফিসার

স্বাধীনতা, শান্তি আর প্রাচুর্য্যই পেতে চায় মানুষ। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সদাশয়তা, সৌহার্দ্য, সততা, শালীনতা প্রভৃতি সহজ, চিরন্তন ও ব্যক্তিগত গুণগুলোর জন্যেও পৃথিবীর মানুষ উদ্‌গ্রীব। এসব গুণ একনায়কত্বে উপহসিত হয় আর গণতন্ত্রে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত নয়।

ধনতন্ত্র অনেকের দেহকেই ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু মনে একটা বিদ্রোহ আর অনুসন্ধিৎসা তৈরী করে তোলে। একনায়কত্ব দেহকে ত ধ্বংস করেই, এমন কি প্রতিবাদ আর চিন্তার শক্তিকেও তা নষ্ট করে দেয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একনায়কশাসিত দেশগুলোর অধিবাসীদের মনে যে সদাজাগ্রত ভয় বিরাজ করে এবং দিবারাত্রির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রের যে অত্যাচার তাদের জীবনকে দুর্ব্বহ করে তোলে তা থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া। শুধু তাই নয়।

পৃথিবীকে সভ্যতার পথে এগোতে হলে, গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের সর্ব্বাধিক কল্যাণসাধন করতে হলে শাসনযন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা থাকলে চলে না। বামপন্থীরা এবং প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীরা একচেটে ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের আপদ থেকে মুক্ত একটি পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায়ই একচেটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র তৈরী করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—কিন্তু তা অধিকতর আপদের কারণ হয়ে ওঠে। বিশালকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের, জীবনযাত্রার উপকরণের ও ব্যাঙ্কের যৌথ মালিকানা, ভূস্বামী এবং তদনুগত রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্কট থেকে নিজেদের নৌকোটিকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা প্রভূতক্ষমতাশীল রাষ্ট্রের এক-নায়কত্বে নৌকোটি চৌচির করে দেন। সে-রাষ্ট্র শান্তি, সুদক্ষ অর্থনৈতিক পদ্ধতি, বাস্তব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তার বিধান না করে ব্যক্তিকে দাসত্বের বন্ধনে বন্দী করে তোলে। সরকারের কাছে আবেদন করে বা সমবেত প্রচেষ্টায় গণতন্ত্রভুক্ত একজন নাগরিক তাঁর দাবী খানিকটা মিটাতে পারেন। কিন্তু একনায়কত্বে রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির আবেদনের কোনো মানে নেই—কারণ রাষ্ট্রই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা।

ভবিষ্যতের সমাজ তৈরী করবার আশায় অন্ধকার হাতড়ে বলশেভিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ এই দুই-ই ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়ায় বিত্তবান শ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিকরা শক্তি ও সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল। তারপর সোভিয়েট রাষ্ট্র শ্রমিকের হাত থেকে শক্তি কেড়ে নিয়ে তাদের শক্তিহীন করে তুলেছে। আধুনিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির কি স্থান—সে-সমস্যার সমাধান মস্কো করতে পারেনি। জার্ম্মেণীতে শিল্পপতি আর মধ্যবিত্তশ্রেণী মিলে একটি দৈত্যাকার নাৎসী-রাষ্ট্র নির্ম্মাণ করেছিল—সে-রাষ্ট্র শিল্পপতি আর মধ্যবিত্তশ্রেণীকে দাসত্বে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও তদনুসঙ্গী শক্তি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে একটি নূতন ও দুষ্ট ফ্র্যাঙ্কেনষ্টিনের জন্ম দেওয়া হয়। আমলাতন্ত্রের অত্যাচার অচিরেই ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারে পর্য্যবসিত হয়; কারণ একনায়কত্বের কর্ম্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্বের আশা বা স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। ট্রট্স্কি বলতেন সোভিয়েট রাশিয়া আমলাতন্ত্র-শাসিত, তা ঠিক নয়। সোভিয়েট রাশিয়া ষ্টালিন ও তাঁর সন্ত্রস্ত অনুচরদ্বারা শাসিত।

অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র থেকে অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে লাফ দেওয়া—সমস্ত সম্পদ, শিল্প ও অর্থের মালিকানা রাষ্ট্রের প্রভুত্বে সমর্পণ করা সমস্যার সমাধান নয়। বরং তা গুরুতর ভাবে বিপজ্জনক। এমন কি যেসব দেশে রাশিয়া বা জার্ম্মেণীর চেয়ে গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কঠোরতর ঐতিহ্য বর্ত্তমান সেখানেও সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্র স্বাধীনতার সঙ্কট তৈরী করে তুলতে পারে। শক্তিমান রাষ্ট্রকে আমি ভয় করি। সেখানে ব্যক্তি তার কৃপার পাত্র হয়ে ওঠে। যেখানে রাষ্ট্রই কর্ম্মদাতা—সেখানে ধর্ম্মঘট অচল। যেখানে

সবকিছুতেই রাষ্ট্রের মালিকানা সেখানে ব্যক্তিগত সাংবাদিকতার ঠাঁই কোথায়? রাষ্ট্রই যদি সংবাদ সরবরাহ করে রাষ্ট্রের সমালোচনা কি করে সম্ভব হয়? একনায়কত্বে একনায়ক নিজে, তাঁর ক্রিয়াকলাপ, তাঁর পদ্ধতি সমালোচনার নাগালে নেই—তাঁর অধীনস্থ যেসব লোক পদচ্যুতির জন্যে চিহ্নিত, তাদেরই একমাত্র সমালোচনা হতে পারে।

একটা জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন আমি সম্পদশালী ও ব্যাঙ্কারদের হাতে তুলে দিতে রাজি নই। সবার সম্পদ তাঁরা নিজেদের মুনফা তৈরীর কাজেই নিয়োগ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকে এ-কাজের ভার দিতেও আমার ঘোরতর আপত্তি। আজকের দিনের সমাজে সংযম ও ভারসাম্য বিধানের ভিত্তিতে একটি অর্থনীতি তৈরী হওয়া উচিত। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মূলধনকে সংযত করবে আবার রাষ্ট্রের ভারসাম্য বিধান করবে ব্যক্তিগত মূলধন—সেখানে বিত্তহীন বা সামান্য বিত্তবান উৎপাদক বা ক্রেতা হিসেবে নাগরিকরা রাষ্ট্র ও মূলধন এ উভয়েরই সংযম ও ভারসাম্য রক্ষা করবে।

একনায়কশাসিত প্রধান প্রধান দেশগুলোতে—রাশিয়া, জার্ম্মেণী, ইতালিতে আমি বসবাস করেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি এসব দেশের যে কোনো একটির চেয়ে, সর্ব্বদোষ সত্ত্বেও, গণতন্ত্রই ভালো। অভিজ্ঞতা থেকেই বল্‌ব যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করাই প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত। স্বাধীনতার বিনিময়ে যে পেট ভরে খেতে পাওয়া যাবে এ তা-ও নয়। এ দুটোর একটাও কোনো একনায়ক দিতে পারেন নি। যারা স্বাধীন আবহাওয়ায় আছে—এবং একনায়কত্বে স্বাধীনতার অবসান হ'তে দেখেনি, তারা স্বাধীনতা হারানো যে কি তা বুঝ্‌তে পারবে না। উনিশ বছর আমি য়ুরোপের ঘটনাবহুল ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে অর্থনৈতিক পদ্ধতি সুনীতি ও সুবিচারের উপর নির্ভর না করলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একনায়কত্বের কবলিত হতে বাধ্য।

কবিতা

স্বর্গ-বীজ

বুদ্ধদেব বসু

তারা ! …তারা ! …স্বর্গ-বীজ ! জ্যোতির জন্মের রতি ! দেবতার
রেতঃস্রোত ! কোন ক্ষেত্র লক্ষ্য তার ? উমার তপস্যা ব্যর্থ, ব্যর্থ উর্বশীর
তপস্যা-মৃগয়া। উষ্ণ আর্দ্র পৃথিবীর নীবীর নিগড়ে
বাঁধেনি শিবির ; পীন ঘন ঘাসের বাসর-গন্ধে
বন্দী সে হ'লো না ; পর্বতে কর্দমে বনে বর্তুল পৃথুল
আতিথ্যের অতন্দ্র আহ্বান পেলো না সন্ধান তার। আর-
কোন, কোন ক্ষেত্র ? … ঐ পার হ'লো ছায়াপথ, কোটি-কোটি বিশ্ব-কলি,
আলোর বিশাল কাল—
কার, কার আকর্ষণে ? ছার মানে উর্বশী-উমারে,
তবু ঝরে ; হার মানে পৃথিবীর নিবিড় প্রার্থনা ; তবু ঝরে,
ঝরে স্বর্গ-বীজ ! জ্যোতির অমর ঝড় ! দেবতার
দিব্যতার স্রোত ! শুধু ঝরে, কোথাও পড়ে না। আকাশে, আগুনে, জলে,
জড়ে, মৃতে, প্রেতে, ভবিষ্যতে ; ঝরে স্ফীত বর্তমানে,
প্রাণের কম্পিত প্রান্তে ; — কোথাও ধরে না, কোথাও না !
—কোথাও না ? … তবু ঝরে কল্প-কল্প ধ'রে, যদি পড়ে, যদি ধরা পড়ে
কোনো কণা জ্যোতি-যোনি কল্পনায়, কবি-কল্পনায় !

কবিকে আমি কী-রকম ভাবি, সে-কথা বলতে চেষ্টা করেছি এই কবিতায়। কোনো কবিতা প'ড়ে আমার আনন্দ যখন অসীমে পৌঁছয়, যখন শেক্সপিঅরের কোনো-কোনো লাইন মনে-মনে ভাবি, কি রবীন্দ্রনাথের কোনো গান, কি ইএটস-এর শেষ বয়সের কোনো ধ্রুবপদ, তখন কি কবিকে মনে হয় এই ছেঁড়াখোঁড়া সংসারেরই একজন মানুষ, না মহাপুরুষ, না দেবতা ? আমার প্রিয় লেখক অল্ডস হক্সলি, দেখলুম, তাঁর শেষ বইটিতে বলেছেন মহাপুরুষ

আর কবিতে প্রভেদ শুধু এই যে যে-দিব্যদৃষ্টি কবির কাছে আসে মাঝে-মাঝে, মহাপুরুষের সেটি নিত্যসঙ্গী। যখন জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পকলার ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট হয়নি, তখন কবি, ঋষি, ওঝা, ডাইনি, ভেলকিওলা, এরা সকলেই ছিলো সমগোত্রীয়, লোকচক্ষে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী। আমাদের দেশের 'গুণী' কথাটায় আজ পর্যন্ত একটা অলৌকিকের গন্ধ লেগে আছে। অবশ্য অতিপ্রাকৃত ব'লে আজকাল কিছু আর মানি না আমরা; ধর্ম, বিজ্ঞান আর শিল্পকলার পার্টিশন-স্যুট মঞ্জুর হ'য়ে গেছে ইওরোপের রিনেসান্সের সময়েই; তবু কবির সঙ্গে মহাপুরুষের সম্বন্ধ আকস্মিক নয়, কবির সযত্নবিন্যস্ত বাণী আর সাধু-সন্তের দৈব উচ্চারণ একই সুরের তরঙ্গ তোলে আমাদের কানে আর মনে।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের বাণী শোনেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তিনি সর্বদ্রষ্টা। তার মানে, যা নেই, যা এখনো হয়নি, স্থানে ও কালে যা বহুদূরে প্রসারিত, সে সমস্তই ধরা পড়ে তাঁর মনে। এইটেকে আমরা বলি কল্পনাশক্তি। কবিরও প্রধান শক্তি কল্পনা। কিন্তু কল্পনার চরম চূড়াতেই যাঁর বাসা, তাঁর কাছে তো উপলব্ধিই প্রধান, উচ্চারণ নগণ্য; তাই কবির চেয়ে অনেক বড়ো তিনি, কিন্তু কবি নন। যীশুর, বুদ্ধের, এমনকি গান্ধির বচনে ও প্রবচনে এমন অনেক কথা আমরা পাই যাকে এক-একটি অপরূপ কবিতা ব'লে বুকের মধ্যে ভ'রে রাখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বুদ্ধকে, যীশুকে, গান্ধিকে যদি কবি ব'লে ফেলি, তাহ'লে আধুনিক কোনো মানুষেরই সেটা সহ্য হবে না।

আর-এক শ্রেণীর মানুষ নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার অধিবাসী, তারা উন্মাদ। উন্মাদের মন সম্বন্ধে যত বেশি তথ্য জানা যাচ্ছে, ততই প্রমাণ হচ্ছে যে কবি আর পাগলের আত্মীয়তার উল্লেখ ক'রে শেক্সপিঅর নিছক সত্যই বলেছিলেন। যা নেই, সেইটেকে দেখতে পায় পাগল; কাল্পনিক মানুষ, কাল্পনিক ঘটনা কাল্পনিক সুখদুঃখ নিয়ে দিন কাটায়;—সকলেই জানেন যে কবির অভ্যাসও এ-ই। কাব্যরচনায় ব্যাপৃত কবি, আর অলীক চিন্তায় আচ্ছন্ন পাগল— এ-দুজনের মনের প্রক্রিয়ায় কিছুদূর পর্যন্ত মিল থাকতেই হবে। কিছু দূর, কিন্তু বেশি দূর নয়; কেননা পাগলের কল্পনা শুধুই তার একলার, অন্ধকার গোপন জগৎ সেটা, কাউকে বলা যায় না, কোনো সঙ্গী নেই—আর সে জন্যই সে পাগল। কিন্তু কবিকল্পনার ভিত্তি মানবজাতির সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, তাই তিনি যখন অতিপ্রাকৃতকেও ভাবেন তখনও বাস্তববোধ থেকে চ্যুত হন না, দশমুণ্ড রাক্ষস বা মীনপুচ্ছ নারী সমস্তই মানিয়ে যায়; তাই তাঁর কল্পনা আর কল্পনার প্রকাশ অবিচ্ছেদ্য, তাঁকে বলতেই হবে, বলা না-হ'লে তাঁর ভাবাই অসম্পূর্ণ; আর সেই একই কারণে বিশ্ব-সুদ্ধ লোক তাঁর কল্পনার শরিক, তাঁর চিন্তার সহযোগী। সমস্ত মানুষের অচেতন মন হঠাৎ যেন বিশেষ-একজন মানুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে: তাঁকেই কবি বলি

আমরা। পাগলের কল্পনা তার কারাগার ; কবির কল্পনায় তাঁর জীবন্মুক্তি। পাগলের কল্পনা তার প্রাইভেট প্রপার্টি ; কবিকল্পনার লীলাভূমি বিশ্বজীবন। তার ক্ষেত্র কত-যে বিস্তৃত, তার দৃষ্টি কত-যে সত্য, তা এই থেকেই বুঝি যে আধুনিক মনোবিজ্ঞান যা-কিছু আবিষ্কার করেছে তার মূল কথাটা ধরা পড়েছিলো সভ্যতার আদিযুগে পৃথিবীর সাহিত্যেই। নামকরণে, উদাহরণে, ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানকে সাহিত্যের সাহায্য নিতে হয়েছে পদে-পদে। গ্রীক নাট্যে, মহাভারতে, শেক্সপিঅরে এমন কত চরিত্রের দেখা পাই, যারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে ফ্রয়েডীয় চিন্তা ফ্রয়েডই প্রথম করেননি। কঠিন পরিশ্রমে বিজ্ঞান এতদিনে যে-সত্য আবিষ্কার করলো, তা প্রতিভাত হয়েছিলো কোন সুদূর অতীতে কবিকল্পনায়।

যে-সমগ্র সত্যের সঙ্গে মহাপুরুষের সহবাস, বিজ্ঞানী তার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করেন, আর সেই সমগ্রেরই চকিত আভাস পান কবি। কল্পনার যে-কৈলাসে সে-আভাস ঝলক দেয়, সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে কোনো কবিই অবশ্য পারেন না, তাঁকে নেমে আসতে হয় সংসারের সমতলে, যে-কোনো জীবের মতো দেহধারণের যন্ত্রণায়। আর কল্পনার চরম চূড়া —মহাপুরুষ যেখানে অধিষ্ঠিত—সেটি স্পর্শ করতে পারেন শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে। তাই ব'লে অন্য কবিরা কি ব্যর্থ? মহৎ জন্মের মাতা যাঁরা হ'তে পারেন না, শুধু স্বর্গ-বীজের প্রার্থনায় রাতের পর রাত জেগে কাটান, তাঁদের প্রার্থনা কি ব্যর্থ হয়? না, ব্যর্থ হয় না ; তাঁরা পৃথিবীকে প্রস্তুত করেন কোনো-না-কোনো শেক্সপিঅর কি রবীন্দ্রনাথ কি ইএটস-এর জন্য, যাঁদের বাণীবিন্যাসের কোনো-কোনো মুহূর্তে মূর্ত হ'য়ে ওঠে কবিত্বের স্বর্গলোক, দেবত্বের দিব্যতম স্বরূপ।

স্বাধীন ভারতবর্ষ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের অবসান আসন্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষের যে মূর্ত্তি আমাদের কল্পনায় ছিল, বাস্তব মূর্ত্তির সঙ্গে তার মিল থাক্‌বেনা সত্যি কিন্তু তা সত্বেও যা আসন্ন তাকে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাই বল্‌তে হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা—অখণ্ড বা খণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রশ্ন এখানে খুব প্রাসঙ্গিক নয়। যুক্তভারত এবং পাকিস্থান ভারতবর্ষের দুই অংশই এই স্বাধীনতার স্বাদ পাবার অধিকারী হবে বলে আমরা আশা করি।

একটি দেশের বা জাতির জীবনে আজকের দিনে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দান যে কতো প্রচুর হতে পারে তা আমাদের কল্পনাতীত। বিশেষ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ফসল যদি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিপলিং-এর জাতি-বৈরিতা সত্বেও আমরা বল্‌ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব এবং তা সম্ভব ভারতবর্ষেরই মহামানবের সাগরতীরে। একদিন ভারতবর্ষ প্রাচ্য-সংস্কৃতিকে স্তন্যপান করিয়েছে—প্রাচ্যের প্রাচ্যত্বের উৎস আজও এখানে শুকিয়ে যায়নি। এখনও ভারতবর্ষেরই জলবায়ুতে প্রাচ্যসংস্কৃতির ঘ্রাণ পাওয়া যাবে—ভারতবর্ষেরই মাটিতে প্রাচ্যের ঐতিহ্য দৃঢ়মূল হয়ে আছে। কিন্তু এ-প্রাচ্যত্ব নিয়েও ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-বাহী পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণচঞ্চলতা, জীবন-স্পৃহা বিজ্ঞানসাধনা এখানে অনাদৃত হয়ে পড়ে নেই। ব্রিটিশকে আমরা গ্রহণ করিনি, ব্রিটিশও চায়নি যে আমরা তাদের গ্রহণ করি কিন্তু আমাদের গ্রহণ করবার শক্তিকে আমরা উপবাসী রাখিনি এবং ব্রিটিশ-শাসনের অবসানে সে-শক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি অভিনব সমন্বয় তৈরী করবার সুযোগ লাভ করবে। প্রাচ্যের মানবতাবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যন্ত্রশক্তির মিলন হলে যে অপূর্ব্ব জীবনের জন্ম হবে তা শুধু ভারতবর্ষেরই কাম্য নয়, সমস্ত পৃথিবী সে-জীবনের কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে। এই মহাভূমিকা অভিনয় করবার সুযোগ প্রাচ্যের আর কোনো দেশের নেই—নিজের স্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহত রেখে প্রাচ্যের আর কোনো দেশ পাশ্চাত্যের সঙ্গে এতো দীর্ঘ পরিচয়ে আবদ্ধ থাকেনি। এ-ভূমিকা একান্তভাবে ভারতবর্ষেরই।

কিন্তু এ শুধু সম্ভাবনা, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল নয়। কারণ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা

স্বাধীনতার পথ-মোচন করে মাত্র—তারপরও স্বাধীনতা তৈরী করতে হয়। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা স্বাধীনতার প্রথম অধ্যায়—স্বাধীনতার পূর্ণ ইতিহাসে আরো কথা আছে। রাষ্ট্রিক মুক্তির পর আরো তিনটি মুক্তির সংগ্রাম আমাদের সম্মুখীন। এ-তিনটি সংগ্রামে জয়ী হলে বোঝা যাবে যে ভারতবর্ষ সত্যি স্বাধীন হ'ল—বলা যাবে যে এবার তার পৃথিবীর নেতৃত্ব করবার পালা সুরু হবে।

মুক্তির এই তিনটি অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সংক্রামক ব্যাধির পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জন্মের হার বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য দারিদ্র্যের শিকড় চালিয়ে চলেছে। দশবছরে যে দেশে ৫ কোটি লোক বেড়ে যায় সে-দেশের দারিদ্র্য-মোচন করা যে কি দুরন্ত সমস্যা এখন থেকে তা আমরা সত্যি করে উপলব্ধি করতে থাকব। উপকথার কাহিনীর মতোই এ-দারিদ্র্য নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা, আবেদন-নিবেদন, বক্তৃতা-বিবৃতি করেছি—এখন এর বাস্তব সত্তার সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হ'বে। ষ্টার্লিংব্যালেন্স নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এ-প্রচণ্ড দারিদ্র্য দূর হ'বেনা। গান্ধীজির চরকা এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষাও সারা দেশ জুড়ে সাড়া তুলতে পারবেনা, কেননা বিংশশতকের চমক-লাগা ভারতবর্ষকে তার পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নেওয়া সাধ্যের অতীত। আর বাকি রইল শিল্প-প্রসার। কিন্তু ভারতবর্ষের শক্তি অনুপাতেই এখানে শিল্পপ্রসার হবে—পৌরাণিক এমন কোনো ময়দানবের আবির্ভাব হবেনা যার শক্তিতে রাতারাতি সর্ব্বপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্ম্মিত হতে পারে। কতো বৎসর ব্যাপী কতোগুলো পরিকল্পনার সাফল্যের শেষে যে ভারতবর্ষ দস্তুরমতো শিল্পোন্নত হতে পারবে এবং দারিদ্র্য দূর করবার মতো ভোগ্যবস্তু উৎপাদন ও বণ্টন করতে পারবে, অঙ্কের সাহায্যে তার সন্ধান পেলেও সাম্প্রতিক দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। যদি কারো এমন মোহ থেকে থাকে যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার পরই এক অদৃশ্য যাদুবলে আমরা দারিদ্র্য-মুক্ত হ'ব মোহভঙ্গের জন্যে তার এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে আমরা লুই ফিসারের কথাগুলো স্মরণ করতে পারি: "...to lift fourhundred million persons even as little as one notch upward is a mammoth undertaking; individuals cannot handle it. In fact Britain alone is probably too weak to deal it. India's problem requires the kind of international pooling of resources that produced the atomic bomb and beat the Axis." (*The Great Challenge*) ফিসার সাহেবের প্রথম বাক্যটি সম্পর্কে আমরা দ্বিমত নই কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটির সহৃদয়তাকে সমর্থন করতে পারিনে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূর করবার অভিপ্রায় ব্রিটেনের ছিল কি না সন্দেহ। বৈদেশিক ধনতন্ত্র যাযাবর পাখীর মতো—এদেশের ফলেই তার রুচি, মাটির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। তাঁর তৃতীয় বাক্যটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে ফ্যাসিবাদ

পৃথিবীর আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল বলেই তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্পদ জড় করা সম্ভব হয়েছে এবং ধনীর দুলাল অ্যাটম বমের জন্ম হয়েছে—ভারতবর্ষের দারিদ্র্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে কোনো আশঙ্কার কারণত নয়ই বরং তাতে তাদের আশ্বস্ত হবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। মাত্র গতযুদ্ধে শিল্পোন্নত হয়ে অষ্ট্রেলিয়াও আজ ভারতবর্ষের প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছে। আজ মনে পড়ে ভূতপূর্ব্ব বাংলার লাট অষ্ট্রেলিয়াবাসী কেজী গান্ধীজিকে অষ্ট্রেলিয়ান উল উপহার দিয়েছিলেন। যাই হোক, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ এবং ধনকুবেররা কোনদিন সমবেত হবেন না—আমাদের ব্যাধি আমাদেরই দূর করতে হ'বে। উৎপাদনকে প্রভূত ও ত্বরান্বিত করবার যে কৌশল বিংশশতাব্দীর কাছ থেকে আমরা শিখ্তে পেরেছি তাকে আশ্রয় করেই আমাদের এগোতে হ'বে—আমাদের পদক্ষেপ ক্ষিপ্র না হোক, মন্থর পদক্ষেপেই নিশ্চিত ভাবে এগোতে হবে আমাদের। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-বাসস্থান এই চারটি লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমাদের পদক্ষেপ সুরু হবে। উৎপাদন ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাক্লেও কোনো ক্ষতি নেই—এসব কাজে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক, উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করতে পারলেই রাষ্ট্রের শ্রম, শক্তি, অর্থ অনেকখানি বেঁচে যায়। তাছাড়া ব্যক্তিবিশেষের তহবিলে সঞ্চিত অকর্ম্মণ্য অর্থের সদ্গতি না করে গোড়াতেই রাষ্ট্র কেন ঋণের জন্যে বিদেশের দ্বারস্থ হ'তে যাবে? আর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে উৎপাদন হলেই যে আমরা কোনো বিশেষ শ্রেণীর কবলমুক্ত হতে পরি তা-ওত নয়! সোভিয়েট রাশিয়ায় কারখানার কর্ম্মাধ্যক্ষদের একটি শ্রেণী তৈরী হয়েছে, তারাই রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিক অনুগ্রহপুষ্ট। বুর্জ্জোয়ার পরিবর্ত্তে এই শ্রেণীর উদ্ভবে লাভ কতোটুকু হতে পারে জানিনে তবে এটুকু জানি এ উৎপাদনেও একটি আমলাতন্ত্রের আসন বিছিয়ে দিয়ে উৎপাদনের পূর্ণ বিকাশের পথ সুচারুরূপে রুদ্ধ করা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পপ্রচেষ্টা অনুকরণ করে নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেই আমাদের একটি পথ বেছে নিতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় শাসকের ভূমিকা ত্যাগ করে রাষ্ট্রকে জননীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'বে -ঘোষণা করতে হ'বে দারিদ্র্য দূর করবার জন্যেই আমাদের উৎপাদন—দারিদ্র্য দূর করবার জন্যেই বণ্টন। এ-ভূমিকারও দায়িত্ব অনেক, শ্রম অনেক। রাষ্ট্র যদি শ্রমোন্মুখ হ'তে চায়, উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করেও যথেষ্ট পরিশ্রম করবার সুযোগ তার আছে। অধীনতায় জড়তাপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রাণে শিল্পোৎসাহ জাগিয়ে তোলা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ব্যাপার। রাষ্ট্রের পক্ষে এ-শ্রমটুকু করা সম্ভবপর হলে ভারতবর্ষের জীবন-যাত্রার মন নিঃসন্দেহে এক গাঁট উঁচুতে উঠে যাবে। আর সেই সঙ্গে দেখা যাবে দারিদ্র্যের সংক্রমণ—জন্মের হার—নীচুতে নেমে আস্ছে।

• এই অর্থনৈতিক মুক্তির পরেকার অধ্যায়ই আমাদের সামাজিক জড়তা থেকে মুক্তি। নূতন অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করলেই সামাজিক জড়তায় খানিকটা ভাঙন ধরে যায়।

ব্যাপকভাবে শিল্পোৎপাদন আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় পরিবর্ত্তন আন্‌তে বাধ্য—মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে আমরা যে আচারগত, সংস্কারগত এবং ধর্ম্মাত্মক জাতিগত প্রাচীর তুলে রেখেছি শিল্পোৎপাদনের যৌথপদ্ধতি ভুক্ত হয়ে সেই প্রাচীরকে আমরা অটল রাখ্‌তে পারবনা। কিন্তু তা বলে নূতন অর্থ নৈতিক পদ্ধতির উপর বর্ণভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ঘুচাবার সবটুকু ভার ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বেনা। সামাজিক অবিচারকে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করে তার সমাধানকল্পে সচেতন চেষ্টা করতে হবে। আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন দরকার। জীবিকার্জ্জনের উপায়কে আমরা জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাব্‌তে শিখে গেছি—আমাদের সংস্কারলালিত মনের পরিবর্ত্তন পরোক্ষ উপায়ে সম্ভবপর নয়। মনের পরিবর্ত্তনের জন্যে তাই মনের কাছেই আবেদন করতে হয়। জাতিবর্ণের বহিরাবরণ মুক্ত করে মানুষকে মানুষ হিসেবে চিনে নেবার জ্ঞান যে আমাদের নেই তা নয়—কিন্তু সে-জ্ঞান এতোই অধ্যাত্মিকতাস্পর্শী যে ব্যাবহারিক জীবনে তার স্পর্শ আমরা লাভ করতে পারিনে। জীবনের সহজ পরিচয়ে মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়াই আজকের দিনের জ্ঞান। আমাদের লক্ষ্য থাক্‌বে এ-যুগের যুক্তিবাদী মানুষ হওয়া—মানুষ বলেই যে মানুষের কাছে মানুষের সম্মান, এ-যুগের এই সহজ যুক্তিকে মেনে নিয়ে শ্রেণীহীনতা অর্জ্জন করা। এই শ্রেণীহীনতা দ্রুত অর্জ্জন করতে হলে সামাজিক মনেরও পরিবর্ত্তন দরকার। সামাজিক মনের পরিবর্ত্তন কামনা করেই গান্ধীজি বলেছিলেন: "Classless society is the ideal not merely to be aimed at but to be worked for and in such society there is no room for classes or communities." (*Feb. 1946.*)। অর্থনীতিই সামাজিক শ্রেণীর নির্ম্মাতা কিন্তু শ্রেণী যখন সমাজ নামক একটি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন শুধু অর্থের নীতিই তার জীবনে সক্রিয় থাকেনা, সমাজের নীতিও তার জীবনকে প্রভাবিত করে। কাজেই শ্রেণীহীন সমাজ শুধু অর্থনীতিরই দায় হতে পারেনা, সমাজেরও নিজস্ব দায়। উপাদানের বা শ্রেণীর রূপ নিয়েই সমাজের রূপ নয়, সমাজ খানিকটা স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী হতে বাধ্য—আর তাই সমাজের একটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। সমাজের এই স্বতন্ত্র সত্তার পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পাই আমরা নারীপুরুষের সম্বন্ধের ভেতর। অর্থনৈতিক অধীনতার জন্যেই সবসময় মেয়েদের পুরুষরা হেয় জ্ঞান করেনা—যে-দেশে মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে সেখানেও তারা পুরুষের সমান মর্য্যাদায় এসে পৌঁছুতে পারেনি। তার মানে এখনও সেসব দেশে পুরুষের মনে সামাজিক সংস্কার সক্রিয়—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরও সেখানে মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের দায় রয়ে গেছে। সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ মাষ্টারি, কেরাণীগিরি, এঞ্জিনিয়ারি, ডাক্তারি

নয়—এমন কি পাইলট বা সৈন্য হওয়াও নয়--সে-পথ মানসিকতা, নারী এবং পুরুষের মানসিকতা। তাই সামাজিক জড়তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমাদের মনকেই প্রথম তৈরী করতে হবে। প্রাক্তন্ স্বাধীনতার যুগ থেকে পরাধীনতার সাম্প্রতিক যুগ পর্য্যন্ত সমাজ আমাদের মানসিকতায় যতো জঞ্জাল এনে জড় করেছে তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ ভাবে এই শতাব্দীর মানুষ হওয়াই হবে আমাদের সাধনা।

এ-শতাব্দীর মানুষ হতে হলে অতীত থেকে আমাদের মুক্ত হয়ে আসা চাই। অতীতে আমরা বাস করছিনে বলেই অতীতের প্রতি খানিকটা কাল্পনিক মোহ আমাদের থেকে যায়—অতীতের প্রশংসায় তাই আবেগের স্পর্শই বেশি, যুক্তির বালাই বিশেষ কিছু নেই। অতীত থেকে মুক্তিই আমাদের মুক্তির তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায়। অতীতের মোহে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন যেখানেই ক্ষুণ্ন হচ্ছে সেখানেই অতীতকে আঘাত করতে হবে। অতীত থেকে মুক্তির মানে তাই আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তি। কিন্তু সাংস্কৃতিক মুক্তির মানে এ নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা বর্জ্জন করে চল্‌ব। যে, সংস্কৃতি জীবনকে সুন্দর করে তোলে—মানুষের সঙ্গে পথ চলবার পাথেয় সংগ্রহ করে দেয়, তাকে বর্জ্জন করবার কোনো প্রশ্নই কোনোদিন কারো যুক্তিতে আস্‌তে পারেনা। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দিচ্ছে—এগিয়ে দিচ্ছে মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর পরিসরে সেখানে সে-সংস্কৃতির সাধনা আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে তুল্‌তে পারেনা। সমগ্র অতীতকে নিয়ে আমাদের ধ্যান ও সাধনার বৃত্তিই শুধু মারাত্মক—সে-অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। আবার আমরা দশম শতাব্দী থেকে যাত্রা সুরু করব—এ-ধরণের কল্পনা মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো শতাব্দীতেই মানুষের কিছু না কিছু অবিস্মরণীয় দান আছে—পরেকার শতাব্দীর সাংস্কৃতিক যাত্রা আগেকার শতাব্দীগুলোর সাংস্কৃতিক দান নিয়েই সুরু হয়। শতাব্দীগুলো সময়ের ঊষর মরুভূমি নয়—প্রত্যেকটি শতাব্দী মানুষের মনের কারুকার্য্যে খচিত, মানুষের কর্ম্মের স্তম্ভশোভিত। শতাব্দীর শিল্পশালাগুলো থেকে বিচিত্র জীবনের রূপ আর রীতিকে আমরা চিনে নিই—বুঝ্‌তে পারি আমরা এগোচ্ছি—আমরা এগিয়ে যাই। যদি সত্যিকারের প্রাণশক্তি আমাদের থাকে তাহলে অতীতে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে থাক্‌বার অপঘাত কোনোদিন আমাদের জীবনকে স্পর্শ করবেনা কিম্বা অতীত থেকে কিছু কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে আনতেও আমরা ইতস্তত করবনা। নিজেদের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাক্‌লেই আমরা হয় শুধু অতীতকে, নয় শুধু বর্ত্তমানকে আঁকড়ে ধরতে চাই। দশম শতাব্দীতে যারা আশ্রয় নেয় তাদের মন যতোটুকু দুর্ব্বল—অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে বিংশ শতাব্দী নিয়েই যারা মেতে থাকতে চায় তাদের মনও ঠিক ততোটুকু দুর্ব্বল। গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের দান হয়তো খুবই সামান্য—সংস্কৃতির ভাণ্ডার

থেকে ভারতবর্ষ শুধু ঋণগ্রহণই করে এসেছে কিন্তু এ-ঋণগ্রহণ তার ঋণের উপর নিরুদ্বেগে বসবাস করবার জন্যে নয়—ঋণ নিয়েছে সে নিজেকেই পুনর্গঠিত করবার জন্যে। মনে রাখতে হবে, বিংশশতাব্দীকে গ্রহণ করছি আমরা একবিংশ শতাব্দী নিজেরা নির্ম্মাণ করব বলে। আমাদের অতীতের প্রগাঢ় উপাদানের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শক্তি মিশিয়ে আমাদেরই রচনা করতে হবে একবিংশ শতাব্দীর সার্ব্বজনীন সংস্কৃতি। আর তা করতে হলে অতীতের বন্ধন শিথিল করে নিয়ে বিংশশতাব্দীতে পরিপূর্ণভাবে বাস করতে হবে। বিংশ শতাব্দীকে গ্রহণ মানে বিংশশতাব্দীতে নিমজ্জন নয়—নিমজ্জনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করে আনবে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপরীত মুখী ধারা আমাদের মনে যে কাজ সুরু করে দেয়নি তা নয়—দু'রকম জীবনবোধের দ্বন্দ্ব আজ অতি প্রত্যক্ষভাবে আমরা উপলব্ধি করছি। পাশ্চাত্যের মননক্ষেত্রেও অনুরূপ দ্বন্দ্বের ধ্বনি শোনা যায়—হাক্সলি, এলিয়ট, কোয়েস্টলার পাশ্চাত্যের রৌদ্রদগ্ধ আকাশে আজ প্রাচ্যের মেঘমন্দ্র শুনছেন; যেমি প্রাচ্যের ছায়াঘন অন্ধকারে আমরা পাশ্চাত্যের আলোর ঝল্‌কানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ-দেখা আর এ-শোনা হয়ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক মুক্তির পরেকার অধ্যায়ে আরো নিবিড় হবার সুযোগ পেয়ে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে। এখন চলেছে দ্বন্দ্বের যুগ—নবসৃষ্টির সূচনায় যা চলে থাকে। অনেক হতাশা, অনেক অন্ধকার পার হ'তে হবে আমাদের—নিজেদের ভেঙে গড়ে নিতে হবে অনেক রকমে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হয়তো অতিক্রান্ত হবে এই প্রস্তুতির পালায় কিন্তু তারপর আমাদের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। জওহরলালের সঙ্গে এ-কথা ভাবতে আমাদের দ্বিধা নেই যে "Perhaps we are living in one of the great ages of mankind and have to pay the price for that privilege. For the great ages have been full of conflict and instability, of an attempt to change over from the old to something new."

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাতাশ

এই সব প্রজা নাতোয়ান প্রজা—খাজনা দিতে অপারগ প্রজা। প্রাণধনের, ভক্ষ্যভোজ্য। সবাই খুদকস্তা, দু'পাড়ায় দু'চাপে দু'জাতের বসতি। খুব বেশি ফাঁক-ফারাক নেই। ডাকলে শোনা যায়, কাঁদলে শোনা যায়। একই রকম রোগে-ভোগা ছেঁড়া কানি-পরা হা-হন্ত চেহারা। ডিগডিগে পেট, জিরজিরে বুক। শুধু হাতের থাবাগুলো চওড়া, আঙুলগুলো মোটা-মোটা। লাঙল-ঠেলা আর মাটি-ঘাঁটার ঢেরা-সই। শক্তির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু শক্তি নেই। হাতের মুঠোর মধ্যে অতিষ্ঠ নিঃস্বতা। বর্বর মাটি যারা উর্বর করল তারাই কিনা সব চেয়ে অকিঞ্চিৎ!

'আমরাও গরুর মতই খাটি, গোয়ালে গিয়ে ছানি খাবার মত দু মুঠো ভুষি খাই।'

'তা-ও জোটেনা হর-রোজ। খাজনা টেনে আর সংসার টানতে পারিনা।'

'তা ছাড়া নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি। আসলের উপরে সুদ, খাজনার উপরে ক্ষতিপূরণ। মড়া না পুড়লেও পাটুনীর কড়ি মারা যায় না কিছুতেই।'

না, দেবেনা তোমরা খাজনা। বলে নারায়ণ। পাশে দাঁড়িয়ে উষসী। হাল না, বকেয়া না, খাজনা দেবেনা এ বছর।

কী অমানুষের বছর পড়েছে এবার। সময়মত জল হয়নি। সব জমি জাগেনি তাই। দড় হয়ে আছে, তিরিক্ষি হয়ে আছে। আর-আর বার ধান হত যেন মেঘ করে থাকত। এবার ধান হয়েছে না দুবেবা হয়েছে। এবারে ঠিক ভাতের অভাবে মারা পড়ব। কার্তিকে জল না হয়ে যখন অঘ্রানে হল তখনই বুঝেছি ফলাফল। যদি বর্ষে কাতি, সোনা রাতি-রাতি। যদি বর্ষে আগন, হাতে-হাতে মাগন।

সস্তার বাজার সে আর নেই। দর-দাম তেজী হচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। তেল-নুন, পেঁয়াজ-

লঙ্কা, আর তাদের অক্ষণের বন্ধু হুঁকো-তামাক। মজলিস আর গুলজার হয় না। আহ্লাদ-আমোদ ইস্তফা নিয়েছে জীবন থেকে। ভাত-কাপড়ের দুঃখে বুঝি বা এবার সবাই ফেরার হয়ে যাব।

না, কোনো ভয় নেই। খাজনা দিবি নে এ বছর। ধান ছাড়বিনে। জমি আঁকড়ে পড়ে থাকবি। বাজার রাখবি দালাল-ফড়ের হাতে নয়, তোদের হাতে। তাতেই সুরাহা-সুগতি হবে। মুখ দেখতে পাবি সুদিনের।

কিন্তু কী জঙ্গীবাজ জমিদার!

তা আর বলতে। উষসী নিজের চোখে দেখে এসেছে তার চেহারা। দুর্বল প্রজা, খাজনা দিতে পারেনি, পাইক এসে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। কয়েদ করে রেখেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়েছে। শেষে গরু বেচে জমি বেচে মিটিয়ে দিয়েছে খেলাপী খাজনা। যে দেবে বলে কথা দিয়ে আর ফিরতে পারেনি, ঘর জ্বালিয়ে তাকে নিঃস্বত্ব করে দিয়েছে। আর, নিষ্পীড়নের কী সে দুর্দান্ত প্রকার-পদ্ধতি। হালের খাজনা দিচ্ছে, উশুল পড়ছে তামাদী বকেয়ার ঘরে। নায়েবনজরে কেটে নিচ্ছে মোটা অংশ, এমনকি চেকের দাম, যে পেয়াদা তাগাদায় গিয়েছিল তার খাই-খোরাকি। তা ছাড়া বাব-বাবিয়ানা কত! মোটর কিনবে প্রাণধন, তার জন্যে মোটরোয়ানা চাই, গ্রামে কে বেশ্যাবৃত্তি করতে বসেছে তার জন্যে নাগর-সেলামি। দেবতাস্থাপনের জন্যে ঈশ্বরবৃত্তি, অথচ সেই দেবতার কাছে এসব প্রজার ঘেঁসবার অধিকার নেই। কথায়-কথায় ভেট-বেগার। মাগনা খেটে যাবে কিন্তু খেতে পাবেনা। চারদণ্ড খাড়া না থাকলে অমনি জরিমানা।

দিনের পর দিন চোখের উপর দেখেছে এই নির্যাতনের দৃশ্য, প্রতারণার অনুষ্ঠান। সইতে পারেনি উষসী। নিজের গ্রাসের অন্তরালে দেখেছে এদের অসভ্য ক্ষুধা, নিজের আরামের অন্তরালে কর্কশ লেগেছে এই দগ্ধানি। নিজে অপমানিত বলেই হয়তো বুঝতে পেরেছে ওদের অপমান, নিজের বঞ্চনার মাঝে ওদের অকিঞ্চনতা। কিন্তু ওদের মত সেও কি অকর্মক হয়ে থাকবে? অসাড় আকাশে কি ঝড় উঠবেনা? ওদের মধ্যে সব চেয়ে যা ভয়ের, তা ওদের ঐ স্তূপীভূত ভয়, অনড় অসহায়তা। সেই অচেষ্টা কি একেবারেই অচিকিৎস্য? ওদের ভয় বলে উষসীও কি ভয় পাবে? ওরা বসে আছে বলে কি উষসীও থাকবে কোণমুখো হয়ে? উষসী যখন জাগতে পারল তখন ওরাই বা জাগবে না কেন? ক্ষীণশ্বাস নদীই যদি জাগতে পারল, তখন জাগবেনা কেন সেই নিবাত সমুদ্র? নিথর সমুদ্র?

উষসী প্রথম দেখা দিল করুণার বেশে। এল নিচে নেমে। যে প্রজা বেগার দিতে এসেছে তাকে খেতে দিলে পেট পুরে। যাকে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে খালাস করে দিলে।

যার জরিমানা হয়েছে তার হাতে গুঁজে দিলে দণ্ডের টাকা। যে গরু বেচে খাজনা শুধেছে তাকে দিলে খেসারৎ।

মহালে ঢ্যাঁটরা পড়ে গেল অসুরের ঘরে সুরধুনী এসেছে।

এত অল্পে মন ভরছিল না উষসীর। ভিতরে সে প্রবেশ করতে চাইল। নারায়ণ তাকে খুলে দিলে দরজা। বললে, দেখুন, কোত্থেকে আসছে আপনাদের সম্ভোগের সম্ভার, কোন উপবাসীর ঝুলি থেকে। যদি সত্যিই কিছু করতে চান, দেখুন, হাতে করুণা নেবেন কিনা, না কুঠার নেবেন।

কোন সন খাজনা দেবে? হাল সন, মা-ঠাকরুণ, সালিয়ানা দাখিলা নিয়ে যেতে চাই। কেন বকেয়া উশুল দেবেন? প্রজা যে সন উল্লেখ করছে তাইতেই আদায় নেবেন। না, নিতে পারবেন না রাজার নজর, নায়েবসম্মান। আমার সামনে ফর্সা ফারখৎ লিখে দিন। তোমার কী? জমা একবার দাখিল-খারিজ করে নিয়েছি তবু আবার ষোল আনা খাজনার দাবিতে আর্জি করেছে। সে কি কথা? অন্য সরিকে কবুল করতে চায় না জমা-বিভাগ। তাতে কি? ও যখন ওর অংশ-মত মিনহাই পেয়েছে তখন আর ওকে ঠকানো কেন? তুমি কে ওখানে বসে আছ মন-মরার মত? নদীতে জমি প্রায় আদ্ধেক ভেঙে গিয়েছে, তবু খাজনা হারাহারি কমি করে নিচ্ছেনা। কোন বছর কতটা নদীগত হয়েছে তার জরিপী প্রমাণের ভার প্রজার ঘাড়ে। আদালতে তা প্রমাণ হয়ে যাক, খাজনা মকুব পাবে। তার আগে যতক্ষণ না ইস্তফা দিচ্ছে, আমরা এক কাগ-ক্রান্তিও ছাড়বো না। সে কি সর্বনেশে কথা! খরচ করে জরিপ করাবে নির্ধন প্রজা, নদী যাকে নিরন্ন করল? নদীর যেমন জমির লালসা, জমিদারের তেমনি খাজনার? আশ্চর্য। চোখের উপর নদী দেখে আন্দাজে বুঝে নিতে পারেন না পিত জমির পরিমাণ? সেই বুঝে ধরাট করে দিন।

এমনি চলছিল প্রাণধনকে লুকিয়ে-চুরিয়ে। সুমার খাজাঞ্চিরা একটু বা প্রশ্রয়ের ভাব থেকে এদিক-ওদিক সুসার করে দিচ্ছিল প্রজাদের। কিন্তু বেশিদিন এ ভাবে চললে রাব-দাব মান-ইজ্জৎ সব তো যাবেই, সমস্ত জমিদারিই যাবে রসাতলে। তাই ব্যাপারটা কানে উঠল প্রাণধনের। একটু বা পল্লবমণ্ডিত হল। নারায়ণই মূল গায়েন।

গর্জন করে উঠল প্রাণধন: 'এ সব কী আরম্ভ করেছ?'

নিমেষে বুঝে নিল উষসী। শান্তস্বরে বললে, 'সুখী হবার চেষ্টা করছি।'

'সুখী হবার?' থমকে গেল প্রাণধন।

'হ্যাঁ, নিজের জন্যে কিছু করবার মধ্যে আর সুখ নেই। চেষ্টা করছি, পরের কোনো কাজ করতে পারি কিনা। পরের উপকার করতে পারার মত সুখ নেই পৃথিবীতে।'

'এখানে চলবেনা এ সব কেলেঙ্কারি।' প্রাণধন দাঁত-খামাটি করে উঠল। 'আমারই ঘরে বসে আমারই বনেদ খুঁড়বে ?'

'যদি বলো তো তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাব।'

চলে যাব! উষসী যেন দেখতে পেয়েছে সেই চলে-যাওয়ার দেশ। এক অন্তহীন রিক্ততার রাজ্য। যেখানে রিক্ততা সেখানেই শক্তি, সেখানেই সংগ্রাম। আর যেখানেই শক্তি আর সংগ্রাম সেখানেই সত্য।

সেই রিক্ততার রাজ্যেই অনন্তবীর্যের জন্ম হবে একদিন।

এর পর প্রাণধন একটা অশ্লীল মন্তব্য করলে, যা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। বললে, যেতে হলে তার কথার অপেক্ষা করবে না, অপেক্ষা করবে তার নাগরের ইসারা। তবিল অনেক সে তছরুপ করছে, কিন্তু খাজাঞ্চিখানায় নাগরসেলামিটা যেন দিয়ে যায়।

সেদিন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

এক প্রজা এসেছিল বাকিপড়া নিলামী জমি বন্দোবস্ত নিতে। হাতনাগাৎ সব পাওনা সে মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত, জারির খরচ, এমন কি বয়নামার খরচ—নায়েবনজর পর্যন্ত, তবু তাকে তার বাস্তু-বিলেন ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কেন, ব্যাপার কী? সেলামি চাই। বিঘে ভুঁই কুড়ি টাকা সেলামি। বাহাল বন্দোবস্তে সেলামি নেবে—এ কী নৃশংসতা? উষসী ঝামটে উঠল। উপরালার রুবকারি পেয়ে গেছে, কাছারি আর কানে তুলছেনা এই মেয়েলি কাকুতি। উষসীর গায়ে যেন অপমান লাগল। সে জিগগেস করলে, কত টাকা? প্রজা বললে, দশ বিঘে, দু শো টাকা। মরিয়ার মত উষসী উপরে চলে গেল, ঘোমটা-খসা পিঠের উপরে অবাধ্য চুল এলিয়ে দিয়ে। আলমারি খুলে বার করে আনলে টাকা। প্রজা হাত বাড়ায় না দেখে টাকাটা জোর করে গুঁজে দিলে তার মুঠোর মধ্যে। বললে, 'একমুষ্টে ফেলে দাও মুখের সামনে। দেখি তোমার জমি থেকে তোমাকে কী করে বিচ্ছেদ করে রাখে এরা।' পরে নায়েবকে লক্ষ্য করে: 'আদালতে গিয়ে এবার চূড়ান্ত দরখাস্ত দাখিল করুন। অন্তত একটা আমলনামা দিয়ে দিন একে।'

প্রাণধন যখন শুনল হন্যে হয়ে উঠল।

'তোমাকে বলেছি না নিচে কাছারিতে যেতে পারবে না কোনো দিন? খাতক-প্রজার ব্যাপারে মাথা গলাতে পারবেনা?'

'তোমাকে বলেছি তো, আমার আর কিছুতে সুখ নেই। এ সংসার আমার কাছে শ্মশান-মশানের মত। শুধু, দুঃস্থ-দুঃখী কাউকে কখনো কিছু আরাম দিতে পারি, জোরের থেকে জুলুমের থেকে, অন্যায় শোষণের থেকে রক্ষা করতে পারি—এটুকুই আমার আরাম।'

সুখসন্ধানী প্রাণধনও কিছু কম নয়। আর, সে সর্বদা সুখ চেয়েছে স্থূল হাতের মধ্যে।

তাই সে হঠাৎ বাঁ হাতের মুঠিতে উষসীর খোলা চুলের মোটা একটা গুচ্ছ সজোরে টেনে ধরল।

উষসী একটা টুঁ শব্দ করল না। গা পেতে মার খেল পৃথিবীর মত।

গৃহশত্রুকে নিপাত করে প্রাণধন বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হতে চাইল। কাছারিতে নেমে তলব হল হিসাব তজ্জদিগের। মা জগদম্বাই জানেন সে কী বুঝবে গণা-গাঁথার, শুধু একবার চোখ লাল করে নারায়ণকে কড়কে দেওয়া। ডাক হল নায়েবের। কি, কাজকাম ঠিক হচ্ছে সবাইকার? না, বেদের রোজগার বাঁদরে খাচ্ছে?

প্রায় সেই দশা। সবিনয়ে বললে সদরনায়েব। নারায়ণবাবু খালি ভুল করছেন। বকেয়ার খাজনা হালের ঘরে উশুল টানছেন। জাহাজ প্রায় তলাফুটো হতে চলেছে।

ডহর ডাঙ্গা করে ছাড়ব। সত্যি?

বোঝবার দোষে দু-এক ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, কিন্তু প্রজা যেখানে স্পষ্ট হাল বলে খাজনা দিচ্ছে শঠতা করে তা তামাদী বকেয়ার ঘরে উশুল দেব বা সুদের অন্দরে কেটে নেব তা বরদাস্ত করি কি করে? নারায়ণ বললে অকম্প দৃঢ়তায়।

প্রথমে তর্ক। শেষে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনায় প্রাণধন নারায়ণের গাল বাড়িয়ে এক চড় কসালে। সামান্য অবজ্ঞেয় আমলা, তার এই ঔদ্ধত্য!

উপরে বসে উষসী একটা চীৎকার শুনতে পেল। যেন একটা অনড় দুঃস্বপ্ন জাঁতার মত বুক চেপে আছে, এমনি ভয়ার্ত শব্দ। সন্দেহ নেই, প্রাণধনের গলা। উষসী নেমে এল মন্ত্রজীবিতের মত। তবে কি প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে? আক্রমণ করেছে কাছারি? নখে-দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রাণধনের উপর?

না, নারায়ণ হাতে-হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে মার। বেশি ঘাল করতে পারেনি, আর-আররা এসে মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। উষসীকে রক্ষা করেছে তার বৈধব্য থেকে।

উষসী বেরিয়ে এল রাস্তার উপরে। দ্বিপ্রহরের প্রাখর্যে। প্রতিবাদের স্পষ্টতায়।

বললে, 'চাকরি ছেড়ে চললেন নিশ্চয়ই—'

'হ্যাঁ, আপনি?'

'আমি ঘর ছেড়ে।'

'বলেন কি?' নারায়ণ তাকাল উষসীর দিকে, তার খোলা চুল ঝামরানো মুখ-চোখের দিকে। বললে, 'ভেবেছেন কী পরিণাম? এই দোর চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আপনার কাছে।'

'এক দোর বন্ধ তো হাজার দোর খোলা। আমাকে আপনি আপনাদের কাজের মধ্যে নিয়ে চলুন, বিপ্লব তৈরি করার কাজে।' ধীর পায়ে উষসী চলতে লাগল পাশে-পাশে:

'আমার দিদিও রাজনীতিতে গিয়েছে। কিন্তু, সে হচ্ছে ভাবের রাজনীতি, বাস্তবের রাজনীতি নয়।'

একটা ধূলির ঘূর্ণি উড়ে গেল।

'সঙ্গে কিছুই আনেন নি তো ?' জিগগেস করলে নারায়ণ।

'কিছু না।'

'সেইটেই মুক্তি, রিক্ততার মুক্তি। চাষা-মজুরদের অভাব-অভিযোগ টাকা-পয়সা দিয়ে সরাসরি আমরা মিটিয়ে দিই সেটা কাজের কথা হবেনা। আমরা ওদেরকে সাহায্য করব তা ঠিক, কিন্তু সাহায্য করব, যাতে ওরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। যাতে সবাইকে টেনে বা ঠেলে নিয়ে আসতে পারে একটা বড় ও মজবুত জীবনের মধ্যে। আপনার এতদিনের খয়রাত তাই বৃথা হয়েছে।'

'না, বৃথা হয়নি। ওরা আমাকে চিনতে পারবে, সন্দেহ করবে না অনাত্মীয় বলে।'

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত রাগটাই না বড় হয়ে ওঠে। যেন বড় হয়ে ওঠে ওদের কল্যাণের অভিলাষ। প্রতিহিংসা নয়, প্রতিবিধিৎসা।

কিন্তু জমিদার কী জঙ্গীবাজ !

তোমরাই বা কম কিসে ? বলতে লাগল নারায়ণ। যতক্ষণ তোমরা একা ততক্ষণ তোমরা অসহায়, কিন্তু যখনই তোমরা একত্র, একীকৃত, তখনই তোমরা দুর্জয়। কথায় বলে, একা না বোকা, কিন্তু একত্র না একচ্ছত্র। অনায়াসে তখন তোমরা জালিমের জুলুম ঠেকিয়ে দিতে পারবে। তোমাদের কোনো দাবিই কানুন-বরখেলাপ নয়। হ্যাঁ, খাজনা দেবেনা এ বছর। জমিদার তার খাস জমিতে ভেরি বেঁধে জল আটকে রেখেছে, দোন দিয়ে সিঁচতে দেয়নি পাশের জমিতে, একটা মুড়ি পর্যন্ত কেটে রাখেনি। ফসল হবে কি করে ? যাদের ধান-কড়ারি জমা তারা দেবেনা এবার ধান। যেখানে নিজের খোরাক নেই সেখানে পরের ঘরের খানাপিনা ?

সাহেবীমুলুকে যুদ্ধ লেগেছে—তার তাপ-ভাপ পৌঁছুচ্ছে এসে এদেশে। এদেশেও আগুন লাগাবে। প্রজায়-জমিদারে, খাতকে মহাজনে, মজুরে-পুঁজিদারে। তোমরা দুই পাড়া দুই জাত, হিন্দু-মুসলমান নও, তোমরা একজেতে, তোমরা সগোত্র—একই শুষ্কীকৃত জনপিণ্ড। তাই বলছি, হও একজোট, হও একজিদ্দি। আস্তে আস্তে এগোও। আজ শুধু এক বছরের খাজনা, আস্তে আস্তে সমস্ত জন্মজীবনের রাজস্ব। আজ শুধু এক কেতা জমি, দু চার বন্দ ; আস্তে-আস্তে সমগ্র মেদিনী।

খাজনা না দিলে ক্রোক-বিক্রি করে নেবে যে। শোনা যাচ্ছে ঐ কোটালের হাঁক-ডাক। বাস্তবের সুরে কথা বলে চাষীরা।

তোমরা জাননা, কত দূর তোমরা এগিয়ে এসেছ। অর্জন করেছ কত অধিকার। পেয়েছ দান-বিক্রির স্বত্ব, লোপ করে দিয়েছ হস্তান্তরী মাশুল। খাইখালাসী আপনা থেকে ছুটে যাচ্ছে, জমি বাড়লেও জমাবৃদ্ধি রয়েছে মুলতুবি। তারপর বাকি খাজনার দায়ে অস্থাবর করা উঠে গেল। গ্রেপ্তারিটা আছে বটে কিন্তু কে নেবে সেই চালুনি করে ঘোল বিলোবার ঝক্কি? টাকা ধরতে পেলনা তো শরীর ধরে কি হবে? ধরবার মধ্যে ধরবে ঐ জমিখানা। ধরুক, কিনে নিক ইস্তাহার করে। কিন্তু, তারপর, নিক না-হয় বাঁশগাড়ি দখল, কিন্তু, খবরদার, কেউই বন্দোবস্ত নেবেনা। না, কেউই না। এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-গাঁ ও-গাঁ, খুদকস্তা—পাইকস্তা—কেউই আসবে না। এই জমিতে। মুনিষ-কিষান, ভাগীদার-বর্গাইত পর্যন্ত না। হও একজোট, হও একজিদ্দি। জমি অটুট হয়ে পড়ে থাকবে তোমার নিজের হেপাজতে। তোমার উচ্ছেদ নেই, তোমার বিলোপ-বিনাশ নেই। কেউ তোমাকে হটাতে পারবে না, খসাতে পারবে না। নতুন ফসলে স্বাক্ষরিত হবে তোমার নতুন দিনের অধিকার।

আস্তে-আস্তে এই নিলামী-দখলও উঠে যাবে একদিন। নতুন আইন পাশ হবে। যাদের মাটি তাদের জমি। যাদের চাষ তাদেরই তাজ-তক্ত।

মাঠের বাইরে ছোট একখানা মাটির কোঠাবাড়ি, পাশেই রান্নার দোচালা। পাশ-গাঁয়ের তালুকদারের থেকে ভাড়া নিয়েছে নারায়ণ। আছে আরো দুটি যুবক কর্মী, সবাই চরকিবাজির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতারাতি কিছু একটা করে ফেলার জন্যে ব্যস্ত। ছুটোছুটি, সোরগোল, কথার স্ফুলিঙ্গ। শুভ্র রোদ্রে বাজছে যেন সতেজ জীবনের বাজনা।

একটি মুচি-বায়েনের মেয়ে আছে রান্নার তদারকে। হাড়ি-হাজরার ছেলে জল এনে দিচ্ছে দূরের টিপ কল থেকে। বেদামে ওষুধ নিতে এসেছে গেঁয়ো অভাবী অভাজনরা।

হ্যাঁ, দিদি উপরতলায় থাকে। দিদি আমাদের গঙ্গাজল। আর বাবু? বাবু থাকেন নিচে, সঙ্গীদের সঙ্গে। কিছুই তাঁর ঠাঁই-ঠিকানা নেই, কখনো শহরে, কখনো গাঁয়ে, কখনো বা পুলিশের হাজতে। বাবু আমাদের ভোলানাথ। রুদ্রদেব।

ঐ যে আসছেন ওঁরা।

দূর থেকে দেখতে পেল তামসী। রোদের আকাশে দুটি শুভ্র বিহঙ্গ। বিপ্লবের অগ্র-নায়ক। নবজীবনের বার্তাবহ।

উষসীর মাথায় কাপড় নেই, সিঁথিটা শাদা, আঁচলটা হাওয়ায় বিস্ফারিত। যেন ধূমলেশহীন একটি অচঞ্চল বহ্নিরেখা।

'এ কি, আপনি? আপনি এখানে?'

'তুমি? দিদি?'

উষসীকে আনন্দতপ্ত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল তামসী। কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তোকে আশীর্বাদ করতে এসেছি।' পরে নারায়ণের মুখের দিকে উজ্জ্বল চক্ষু তুলে: 'এসেছি আপনাদের কাজে হাত মেলাতে।'

'আমি জানি আপনি আসবেন।' নারায়ণ উৎসাহে জ্বলে-জ্বলে উঠল: 'জানি, আমাদের যাত্রায় সঙ্গচ্ছেদ হবেনা। গরুর গাড়িতে একত্র এসেছি, পায়ে-হাঁটা বন্ধুর পথেও আপনাকে পাশে পাব। আমাদের কাজের মধ্যে আপনাকে পেলে আমাদের কাজ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে। আপনি জানেন না আপনি সেই দীপবতী নারী যার ক্ষীণ শিখার বিন্দুতে রয়েছে দীপান্বিতার প্রতিশ্রুতি।'

তামসীর মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় শির-শির করে উঠল। সেই শ্বেত বিহঙ্গ কি রৌদ্রদীপ্ত আকাশ ছেড়ে ছায়ামণ্ডিত নীড়ের মুখে ধাবমান হল নাকি? তামসী হেসে উঠল। হেসে উঠল সুহাসস্নিগ্ধ উষসীর মুখের দিকে চেয়ে। প্রশ্রয়শীল সারল্যে।

'শুনেছি আপনার নাকি ভাবের রাজনীতি। ভাব ছাড়া কাজকে কে মহান করবে? কাজ তো তৃণগুল্ম, ভাব হচ্ছে বিশাল বনস্পতি। আমাদের কাজের চষা মাঠে আপনি এসে ভাবের বীজ পুঁতুন। খড়কুটো জড় করে আগুন যদি বা জ্বালি, তাতে আপনি সঞ্চার করে দিন আত্মাহুতির প্রতিজ্ঞা। সেই ভাবের আন্তরিকতার উত্তাপ না থাকলে জ্বলবে কেন সেই অগ্নিকুণ্ড?'

সূক্ষ্ম উপেক্ষার সৌজন্যে তামসী আবার হাসল। বললে, 'কাছের মানুষটিকেই ভুলে যাচ্ছেন বুঝি? আমি তো ভাব, বাষ্প—আর এ হচ্ছে দৃষ্টান্ত, বাস্তব। ভাবের চেয়ে উদাহরণ অনেক বেশী মূল্যবান। ভাবুন তো কত বড় অঘটন ঘটাল এ। কত বড় কাজ।' উষসীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সস্নেহে।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা কি আর আমি জানিনা?' নারায়ণ লজ্জিত স্তব্ধতায় ধীরে-ধীরে চলে গেল অন্তরালে।

কিন্তু দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর গাছের ছায়ার নিভৃতিতে আবার এসে সে একান্তে তামসীর কাছে বসেছে। অদূরে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে উষসী, শান্তের মত, নিরাকাঙ্ক্ষের মত। জীবনে তার আর কোন স্পৃহা নেই, উত্তেজনা নেই, তার শুধু এখন কাজের জলস্রোত, কাজের নির্মলতা।

'এর মধ্যে বড় শহরে গিয়েছিলুম—'

'কী খবর?'

'প্রথম দিনেই গিলটি প্লিড করে বসেছে। একেবারে বাজে-ক্লাশ। এক ডাকেই ছ মাসের আর-আই।'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল। শূন্য হয়ে রইল।

কিন্তু সব চেয়ে অবাক করল তাকে সংবাদটা নয়, সংবাদদাতার কণ্ঠস্বরটা। যেন একটা প্রচ্ছন্ন উল্লাস। যেন তীক্ষ্ণ অবজ্ঞা। বা, একটু কৌলীন্যের অহংকার। যারা আসামী, যারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত, সবাই তারা তার উপকারের যোগ্য নয়। তাদের মধ্যে যে জাত-অজাত মানে, মানে বা মান-অমানের মানদণ্ড।

'তাই বলে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। যে পিছিয়ে পড়ল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ফেরানো যাবেনা পদক্ষেপ।'

'তার মানে?' তামসী তাকাল ক্লান্তের মত।

'তার মানে কে কখন জেল থেকে বেরোবে তার প্রতীক্ষায় মুলতুবি রাখা যাবেনা আমাদের জেলে যাওয়া।'

দু জনে হেসে উঠল। তামসীর হাসি ফুরিয়ে গেলেও নারায়ণের চোখের কালোতে লেখা রইল সেই হাসির উদ্বৃত্তি।

সে পালাবে, চিহ্নহীন হয়ে পালাবে। মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলল তামসী। এখানে থেকে সে উষসীকে আবৃত করবেনা, ছায়াচ্ছন্ন করবেনা। তার জীবনে ব্যর্থ করে দেবেনা বিপ্লবের সম্ভাবনা।

সেই ছেলেবেলার মত দিদির গা ঘেঁসে নির্ভাবনায় শুয়ে আছে উষসী। রাত্রের অন্ধকারের শান্তিতে ঘুমের নির্মলতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এত ঘুম, এত শান্তি, এত সমর্পণ উষসী পেল কোথায়?

'তুমি আমার জন্যে এতটুকু ভয় কোরো না।' মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বলে উঠল উষসী: 'আমি আমার জীবনে পরম আশ্রয় পেয়ে গেছি।'

কে সে? উন্নিদ্র চক্ষু মেলে চমকিত অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল তামসী।

'কেউ না। শুধু আমার এই কাজ। আমার এই কাজের সারল্য। এই কাজের পবিত্রতা।'

'সুখ পাচ্ছিস?'

'সুখের আর ওর নেই। যে ভীরু তাকে সাহসের ভাষা দিচ্ছি, যে দুর্বল তাকে দিচ্ছি সমর্থ সঙ্গের স্পর্শ, যে অন্ধ তাকে দেখাচ্ছি নবপ্রভাতের স্বপ্ন তার মত সুখের আর আছে কী, দিদি?'

'ঘা সইতে পারবি?'

'যে আঘাত আমাকে মূল্য দেবে, সম্মান দেবে, তা সইতে পারব না?'

কাটল খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'দিদি। দিদি, ঘুমুচ্ছ ?'

'না। কেন ?'

'তোমার কথা তো কিছু বললে না—'

'বলব, ভোর হোক।'

কিন্তু ভোর হতে না হতেই বাড়ি ঘিরেছে পুলিশে খানাতল্লাস করবে। আছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। (ক্রমশঃ)

সন্তোষকুমার

পুলকেশ দে সরকার

সেদিন সন্তোষকুমারের সঙ্গে দেখা। বৌবাজারের মোড়ে লোহার শীক্‌টা নিয়ে ট্রামলাইনের পয়েন্ট খুঁচিয়ে দিচ্ছে। না হয়তো, ট্রামপোস্টের সঙ্গে লাগানো তারের হাতলটা ধরে টানতে গিয়ে আরামে ঠেস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমার সঙ্গে দেখা। খাকি পোষাক গায় দিয়ে, কালো টুপিটাকে ওরই মধ্যে একটু ট্যারচা ছন্দে বসিয়ে দিয়েছে, যেন, ভেতরের স্যালুনে-ছাঁটা কেশবিন্যাস একেবারে লোকচক্ষুর অগোচরে না যায়।

চেনা যায় না। ধুতি পাঞ্জাবীর খাঁচায়ই ওর চেহারা দেখতে অভ্যস্ত। সেই দেহটাকেই খাকি কোট-প্যান্ট আর কোম্পানীর জুতোয় ঢুকিয়ে দিলে চেনার চৌহদ্দি ছাপিয়ে যায় বৈকি।

তবু চিন্‌লাম। ট্রামের অপেক্ষায় ঐ ট্রামপোষ্টটার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলাম।

এই যে সন্তোষকুমার,······

পরিচিত 'জন' দেখে প্রথমটায় সে যেন হক্‌চকিয়ে উঠল, মুহূর্তের চেতনায় সম্ভবত ঐ বাহুরে পোষাকটা আর ছোট কাজটার উদ্দেশে অভিশাপ জানালো, সম্ভবত, তার পরেই এক মুখ হাসি নিয়ে বলল, এই যে······

সন্তোষকুমার পোষ্টের তারটা ছেড়ে দিয়ে লোহার শীক্‌টা নিতম্বে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।

বল্লে, বহু দেশদেশান্তরে ঘুরলাম হে, রকমারি চাকরী করলাম, চাক্‌রী বড়োই হোক্ আর ছোটোই হোক, এক জিনিস। গোয়ালিয়রে দেড়শ টাকার চাকরী এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলাম, তোফা ছিলাম, কিছুই করতে হত না, একদিন একটু কথার এদিক ওদিক, ব্যস্, নাঃ বেশ আছি, বেশ আছি······

ঘটং ঘটং ঘটং ঘটং·········পর পর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। পয়েন্ট খুঁচিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সন্তোষকুমারের যেন গ্রাহ্যই নেই।

বেশ আছি, বেশ আছি, প্রয়োজনও কম, বিয়ে থাওয়া তো করিনি ; আর চাকরীই যদি করতে হয় তবে ছোটো চাকরীই ভাল, ঝামেলা কম ; তা ছাড়া কি, এই ধরনা শীক নিয়ে পয়েন্ট খুঁচিয়ে দেয়া, দাঁড়াও, এক সেকেণ্ড,·········

ততক্ষণে দুইদিকে অনেক কটা ট্রামই দাঁড়িয়ে গেছে। সন্তোষকুমারের যেন কোন তাড়া নেই ; ধীরে সে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল, পয়েন্টের কাছে গিয়ে লোহার শীক্‌টা ঢুকিয়ে দিল, একটা খটাৎ করে শব্দ হল, তারপর তেমনি ধীরে সন্তোষকুমার আমার কাছে ফিরে এল।

অথচ, সে বলতে লাগল, কাজের ইম্‌পর্ট্যান্সটা তো চাক্ষুষ দেখলে। এক লহমায় একটা বিড়ি ধরাবার উপায় নেই। তোমায় বলতে কি, এর মধ্যে বেশ একটা রোম্যান্স বোধ করি (ইংরেজী যে একেবারে ভোলেনি সন্তোষকুমার এইটেও জানাতে চায় বুঝি), অদ্ভুত একটা ফিলিং, কড়ারোদে যখন ট্রাম বাস আর লোক চলাচল করে তখন এইখানে দাঁড়িয়ে বুঝি এই গতিশীল পৃথিবীকে আমি এক মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে যাবে এখান থেকে ওয়েলিংটন অবধি, শুধু আমার একটা পয়েন্টের খোঁচার অপেক্ষায়। বেশ আছি, মাগ ছেলেপুলে নেই, রাতে মাথা গোঁজার একটা জায়গা করেছি, অফ্‌ডেতে এই 'রূপম'-এই ঢুকে পড়ি হাইয়েষ্ট ক্লাশ টিকিট নিয়ে আর নিতান্ত দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়তো ঐ······বুঝলে ভায়া ?

অহেতুক হেঁ হেঁ করে হেসে বললাম, চলি ভাই, অনেকদিন পর দেখে বড় সুখী হলাম, আর ভালই যখন আছ—

কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ভালই আছি, ভালই আছি·········

এই আত্মতুষ্টিতে আর বাধা দিতে ইচ্ছা করল না, একটা নিউমার্কেটের ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে পড়লাম। একটা বসবার জায়গাও পাওয়া গেল। খুব কায়দায় একটা দেশলাইর কাঠি ধরিয়ে বিড়ির মাথায় লাগাবার পর ফস্ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পাশের ভদ্রলোক কোন এক শ্রোতার উদ্দেশে বললেন, পারতে আমি কখখনো ফার্ষ্ট ক্লাশে যাই না, কেন যাব, আরে ট্রাম তো একটাই, যাবে তো এক জায়গায়ই, ফার্ষ্ট ক্লাশ আর সেকেণ্ড

ক্লাশের মধ্যে একগণ্ডা পার্থক্য, আরে রেখে দিন গদী, সেকেণ্ড ক্লাশে ছারপোকা থাকবে এতো জেনেই ওঠা, থাকনা দুটো ছারপোকা, হেঃ বলে কতটুকুই বা যাওয়া, কোঁচাটা একটু ছড়িয়ে নতুবা সঙ্গের বইখানা চেপে বসলেই ল্যাঠা চুকে যায়। একটা পয়সাই বা বেশী দেব কেন, বিদেশী কোম্পানীকে ?

ট্রামারোহী এই সন্তোষকুমারের দিকে একবার ভাল করে তাকালাম। সংসার সমরাঙ্গনে বেশ দৃঢ়পণেই যুদ্ধ করছেন ; লড়াইয়ের ছাপ সর্বাঙ্গে, বয়স কত, অনুমান করা দুঃসাধ্য······

ছা-পোষা মানুষ, মশাই, একটা পয়সাই কি কম, আধভাগা লঙ্কা হয়ে যায় মশাই, তাই কোত্থেকে আসে ? এই যে যারা ফার্ষ্ট ক্লাশে যাচ্ছে তাদের ক'জন উপার্জ্জনের মহিমা বোঝে ? ওতে আছে কারা ? কোম্পানীর দেয়া মান্থলী নিয়ে দারোয়ান, পিয়ন, ক্যানভাসার দালাল না হয়তো মনিঅর্ডারের দৌলতে ধনবান ছাত্র, অবলা নারী, দেউলে জমিদার বা হঠাৎ-বাবু অথবা সিনেমাগামী পার্টি। উপার্জ্জনের কামড় যারা যানে, তারা জানে একটা ফুটো পয়সার ইকনমি। এ বিষয়ে আমি খুব সুখী মশাই, কাপড় চোপড় নিজেরাই কেচে নি, চমৎকার নীল দিতে পারেন আমার স্ত্রী, বাটী গরম করে ইস্ত্রী যা করবেন, মানে, কি বলব, ছোঃ ষ্টিম লণ্ড্রী······তরিতরকারীর খোসা না ফেলে চচ্চরি যা করেন, ও মশাই, না খেলে বুঝবেন না······

এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ জায়গার অপেক্ষায় থেকেও জায়গা না পেয়ে লোহার রড্ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, একটা জায়গা হতেই বললাম, বসুন। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, না, বেশ আছি। বসলেই তো মশাই রক্তমোক্ষণ, ছারপোকার জ্বালায় অনবরত ভীষ্মের শরশয্যা বোধ না করে বকের মতো খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ। তাছাড়া একটু ফাঁকাও বোধ করছি। বেশ আছি।······

বসে গল্প করে বেশ কাটল যাই বলুন, ইকনমিষ্ট সন্তোষকুমার উঠতে উঠতে বললেন, এই ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়ে এমন আর কি রাজ্যলাভ হত।

তিনি নেমে গেলেন। তাঁর শ্রোতা অকস্মাৎ আমাকে লক্ষ্য করেই বলে উঠ্‌লেন, সন্তোষ, আসলে মনের সন্তোষই বড় কথা, মনে যদি ঐ জিনিসটি না থাকে মশাই তবে সিংহাসনও কাঁটার মনে হয় আর মনে সুখ থাক্‌লে বনও স্বর্গ। আর ও জিনিসটি জানেন, মশাই সব জায়গায় হাজির হবে। কারও মনগোমর ক'রে থাকার জো নেই। যে যে অবস্থায়ই থাক্, সুখে থাকার একটা যুক্তি সে বের কর্‌বেই। সত্যি, আমিও ভাবি, সংসারে এত রকমের ভালমন্দ অবস্থা, ছোট বড় লক্ষ রকমের অবস্থা মানুষের, নানারকম বিপরীত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও মানুষ বাঁচে কি ক'রে ? বিরাট্ এয়ার কন্‌ডিসণ্ড প্রাসাদের উঁচু কোঠায় রেডিও

খুলে যারা খানা খাচ্ছে তাদেরই বেয়ারার যখন এঁদো বস্তিতে হাড়িয়া খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তখন সে কি পার্থক্যটা বোঝে না ? বোঝে, কিন্তু এই বোঝাই যদি স্থায়ী হ'ত, মানে, দিনরাত মগজে যদি উপরওয়ালা সুখী আমি অসুখী এইটাই জেগে থাকৃত তবে তার সাধ্য ছিল সে একমুহূর্তও বাঁচে ? পাগল হ'য়ে একটা কুকাণ্ড ক'রে নির্ঘাৎ মারা যেত। মারা যে যায় না, তার কারণ, সে ওরই ভেতরে একটা আত্মতুষ্টির দর্শন খাড়া ক'রে ফেলে। হাড়িয়া খেয়ে সে স্ত্রীকে গালমন্দ ক'রে বলে, জানিস, আমার সায়েব পর্যন্ত আমাকে সামলে কথা কয়, আমাকে ছাড়া খানা হয় না, আমি না ধরলে জামা খোলা হয় না, সেদিন জুতো পালিশের জন্য আমার পিঠ্ চাপড়ে দিল, হে হে, আরে আমি নইলে সায়েব অচল, আর তুই কিনা............ এই, এই দর্শন। আচ্ছা, চলি, ব'লে ভদ্রলোক মোক্ষম কথাটি ব'লে নেমে গেলেন। তাঁর আচরণে একথাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্ল, মশাই, কথার সার বুঝে নিয়েছি ; সবকথার শেষ কথা, চরম কথা, যা ব'লে গেলাম, এর পরে আর কাউকে বল্‌তে হবে না। সববুঝে বসে আছি।

আমিও নাম্‌লাম। একটা বিরাট্ প্রাসাদেই যাব। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। কয়েকটা 'কেস্' পেয়েছি, দিতে যাব। সত্যি, এতবড় অট্টালিকা, এতো কেবল আমাদের মতো এজেন্ট আর অর্গানাজাইরদের জন্য। এই বাড়ীর প্রত্যেকটা ইটের স্তর আমাদের.........হ্যাঁ, এ বাড়ীর মূল স্রষ্টা আমরা—আমি। গেট্‌ম্যান্ কি তার গুরুত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে—ঐ লিফ্‌ট্‌ম্যান। ফস্ করে পানের দোকানটায় দাঁড়ালাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে পানওয়ালাকে বল্‌লাম, একটা ক্যাপস্টান, আয়নায় নিজের চেহারা দেখ্‌লাম, মন্দ নয় চেহারাটা, সুন্দর, নাক চোখ একরকম সায়েবী সায়েবী বল্‌তে হবে, স্যুট পরলে কেমন মানাবে ? পাঞ্জাবী ধুতিতেও বেশ মানিয়েছে। চেহারাটা ইম্‌পোজিং কি বলেন, নিজেকেই জিগ্‌গেস করলাম, নিশ্চয়ই, নিজেই জবাব দিলাম। পানওয়ালা সিগারেটটা এগিয়ে ধরেছে। ওকি একটুও বুঝতে পারেনি আমার পজিসান্, ওকি তাকিয়ে আছে ? সিগারেটটা নারকোলদড়ির জ্বলন্ত ডগায়ই ধরিয়ে নিলাম, ধোঁয়া ছাড়্‌তেই মনটা কেমন হাল্কা হ'য়ে গেল। কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে বেশ অভ্যস্ত আল্‌তো হাতে, যেন এ অধিকার আমার বংশগত, আমি জন্মাবধি একাজ ক'রে আসছি, কত সহজ আমার কাছে, লিফ্‌টের বোতামটা টিপে দিলাম। একটা বোতাম টেপার অপেক্ষা, লিফ্‌ট্ নেমে এল, ঘ্যাট্ ক'রে থাম্‌তেই হুট্ ক'রে ঢুকে পড়্‌লাম, দাঁড়ালাম কি, যেন হাওয়ায় উড়্‌ছি। 'তেতলা', কাউকে উদ্দেশ না করেই উচ্চারণ করলাম।

লিফ্‌ট্‌ম্যান গম্ভীর। কোনদিকে না চেয়ে কোলাপ্সিবল্ বেড়া দুটো ছড়াৎ ছড়াৎ ক'রে-আট্‌কে দিল ; সুইচ্‌টা অফ্ ক'রে দিতেই লিফট উঠতে লাগল ; কারও মুখে কোন সাড়া নেই ;

কেবল লিফট ওঠার একটা একটানা মৃদু 'কু' শব্দ। ঘ্যাট্ ক'রে থামল একজায়গায়; লিফ্‌টম্যান ছড়াৎ ছড়াৎ ক'রে দুটো কোলাপ্সিবল বেড়া খুলে দিল; বল্‌লওনা একবার, যান। নিপুণ ছিমছাম হাত, নিখুঁত একেবারে। আমিও কিছু বল্‌লাম না, গ্যাট্ গ্যাট্ ক'রে সোজা বেরিয়ে গেলাম। পেছনে লিফটম্যানের হড়াৎ শব্দ, আবার চল্‌ল কোথাও। ও জানে ওর গুরুত্ব, বিদ্যুৎগতিতে ওর কাজ; লোকের তর্ সয় না। ও-ও তাড়িৎবেগে নাম্‌ছে উঠ্‌ছে, দু'তলা চারতলা। ও জানে, ওকে ছাড়া, এই সব ব্যস্তবাগীশদের উপায়ান্তর নেই।

এই দুনিয়ায় আত্মতৃপ্তি বেশী, না, আত্মহত্যা বেশী? জীবনের বৈরাগ্য বেশী, না, আসক্তি বেশী? এই-মাটীর চাকাটা যে পাই পাই করে ঘুরছে, এ কার ওপর?······

······খেয়ে না খেয়ে লেখাটা করেছেন, চমৎকার, ছাপাকে হার মানিয়ে দেয়।······

লেজার বাবু সন্তোষকুমারের সর্বাঙ্গ ঝল্‌কে উঠ্‌ল, একরাশ রক্ত হার্ট থেকে গল্ গল্ গতিতে সমস্ত স্নায়ুতে ছুটোছুটি করে, মুখে এসে ছাপিয়ে পড়্‌ল, তার পরই একটু ফাঁক করা মুখে দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠ্‌ল, মুক্তোর মতো অক্ষরগুলোর দিকে বাকা বেড়ালের মতো মাথাটা একবার একাৎ একবার ওকাৎ করে তাকিয়ে বল্‌লেন, যান্, আপনি বড় বাড়াতে পারেন।

না, সত্যি······বুঝতে দেরী হ'ল না, তিনি আবার আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি চান। লেখাটা যে ভাল তিনি তা জানেন। সত্যি লেখাটাও ভাল। প্রশংসার পর সন্তোষকুমার আরও টেনে টেনে লেখেন। বোঝেন, লেখাটা ভাল। সুস্বাদু একটা খাবার খেলে মুখ যেমন লালে ঝোলে ভরে যায় তেম্‌নি একটা তৃপ্তি সন্তোষকুমারের— আত্মতৃপ্তি। ঠিক এই সময়টা কি মনে পড়ে তাঁর মাইনের কথা, সংসারে হাহাকারের কথা, দুধের অভাবে রিকেট ছেলেমেয়ের কথা? পড়ে না। আত্মতৃপ্তির দোলা তাঁর সর্বাঙ্গে— চমৎকার, চমৎকার! যুদ্ধের আগে কেনা সোয়া বারোটাকার জুনিয়ার প'কারটা আস্তে লেজারের পাশে রেখে দিয়ে ব্যাক ব্রাশে সাঁটা মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে একবার নিষ্কলঙ্ক খাতাটা দেখে নিলেন। সমস্ত খাতাটাই এমন, মুক্তোয় পরিপূর্ণ, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত। তাকের ওপর সাজানো এত বছরকার খাতাগুলো। নিপুণতা ক্রমেই বাড়ছে। হ্যাঁ ছিল, এমন দিন, যখন হাত কাঁপত, আজ তা নিষ্কম্প, দৃঢ়, নিশ্চিত। এই লেখা দেখেই তো বড়কর্তা তাঁর চাকরীর সুপারিশ করলেন। সন্তোষকুমারের স্ত্রী বলেন, তোমার চিঠি পেলে কি লিখেছ তা দেখবার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি চিঠিটার দিকে, এমন লেখা কি করে করলে, হ্যাঁগা। মেজ মেয়ে মীনেটার হয়তো এম্‌নি লেখা হবে, তাঁরই হাতের লেখায় হাত ঘুরোয়।···

জীবনদ্বন্দ্বে বাঁচবার পূরো এক ডোজ আত্মতৃপ্তির টনিক খেয়ে লেজার কীপার সন্তোষকুমার গা ঝাড়া দিলেন, কলম এসে পড়ল আঙুলের চাপে।

নীচে এসে রিক্সা করলাম। না হোক প্রিয় রোল্‌স রয়েস, একা একটা হাঁটুর ওপর আর এক পায়ের ম্যাঙ্কল তুলে খানিকটা কাপ্তি মেরে বসলাম। রাজা রাজা—কেমন নৃত্যের ছন্দে চলছে, কেমন ঠুং ঠাং সঙ্গীত, দিব্যি আরামে খোলা হাওয়ায় চলন, সিগারেটের ধোঁয়াগুলো স্পাইরাল করে ছাড়তে লাগলাম। "বাঁয়া" হিন্দীতে চালককে নির্দেশ দিলাম, রিক্সা বাঁ দিকে মোড় ফিরল। "রোকো"—গাড়ীকে রুখতে বললাম—আমার গাড়ী। হাতের সিগারেটটা টোকা মেরে দূরে ফেলে দিয়ে নামলাম।

রিক্সাওয়ালা রিক্সা নামিয়েই হাতের গামছা ঘুরোতে ঘুরোতে বলল, "মারে পসে না" ;— আমার দেয়া পয়সা নিতে নিতে বলল, দেখিয়ে, এই-সা জল্‌দি কৌন আয়গা ?

সত্যি, মজবুত তার দেহ, ঘোড়ার মতো ছুটে সে এসেছে, এত তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছোবার আত্মপ্রসাদ তার হ'তেই পারে। পক্ষীরাজ ; আমিও খুসী হয়ে একটা আনি বেশী দিয়ে দিলাম। রিক্সাওয়ালাও আর কোন কথা খরচ না করে রিক্সাসহ হেলতে দুলতে চলতে লাগল।

বাঁচে কি করে ? কি নেশায় মাতাল হয়ে এরা বাঁচে ? মানুষ আকাশ চিরে ঝড়ের বেগে হিল্লী থেকে দিল্লী যাচ্ছে, নীচে, সমাজের অনেক নীচে এই মজবুত লোকটা অলিগলিতে ছুটোছুটি করে বুক ছিঁড়ে ফেলছে। কিন্তু আমায় যখন সে টেনে নিয়ে এল তখন কি তার একথা মনে ছিল, গরম পীচের পথে, বর্ষার কাদায় বা কনকনে শীতে ছুটতে গিয়ে একথা কি তার মনে পড়ে ? একথা কি তার মনে পড়ে যখন ভাড়া করা রিক্সার চাকায় চাকায় সে তেল দেয়, গদিটাকে ঝেড়ে আবার বসিয়ে দেয়, হাইড্রেনের জল কৌটা ভ'রে চাকার রবারে ছিটোয় ? রাতে যখন ঐ রিক্সার গদীতেই মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়ে, তখন কি সে তৃপ্ত, ট্যাকের পয়সায় মস্‌গুল, না, শরীরের রগে রগে কট্‌কটে বেদনায় বিকৃত ? ঠোঙায় সযত্নে তুলে ধরা দুখানা মাছিপড়া জিলিপী খেতে সে যে অমৃতস্বাদ পায় তার জীবনে তা কতটুকু বা কতখানি ?……

প্রতিবেশী দীনবন্ধুবাবু তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে উন্মত্তের মতো আদর করছেন। ছেলেটা দীনবন্ধুবাবুর মতোই আবলুস, খাঁদা নাক আর নির্মম বিধাতার কৃপায় কিঞ্চিৎ ট্যারা। স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ নয়। আদরের আবেগে শিশুর নাকের নীচে খানিকটা পরিত্যাজ্য বস্তু গড়াচ্ছে, দীনবন্ধুর খেয়াল নেই। আদর করছেন।

দীনবন্ধুর নিজের স্বাস্থ্য মন্দ নয়, স্ত্রীর রং শুনেছি ফর্সাই কিন্তু চিররুগ্না, আরও শুনেছি, সুখী দম্পতি। সপ্তাহে একদিন সিনেমা দেখতে চেষ্টা করেন এবং কৃতজ্ঞা স্ত্রী

ইনিয়ে বিনিয়ে স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্বেও কি ভাবে 'নিজে' (মানে স্বামী) জোড়া টিকিট করে আনেন তা বলেন এবং জহর গাঙ্গুলী শেষটায় পদ্মা দেবীকে কি বল্লে তা রসিয়ে রসিয়ে বলেন। দাম্পত্যসুখ একেবারে উপ্চে পড়তে চায়। পড়শীদিদিকে উদ্দেশ করে বলেন, আমি মিষ্টি খাব না, কিন্তু এক ঠোঙা খাবার রোজ আনা চাই। খাও না, অর্ডার দেয়া ভীম নাগ। বলেন, এ আর কি খাচ্ছ, কাজটা আগে হাসিল করি—তোমায় বাদাম পেস্তার ওপর রাখব। তারপর কি ঝলকে ঝলকে হাসি যেন টিউবারকিউলার লাঙ্স্ রাপ্চার করেছে।

দীনবন্ধুবাবু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, প্রথমবারের কথা ভগবান জানেন, দ্বিতীয় বার দাঁত ওঠার পর থেকে কোন দিনও দন্তরুচিকৌমুদীতে কোনরকম সংস্কারের হাত পড়েছে কিনা সন্দেহ, শতঃস্তেন-ই একমাত্র উল্টির রক্ষাকবচ ওতে পান আছে, ভীমনাগের সন্দেশ আছে, রোহিত মৎস্য আছে, চিংড়ির কাট্লেট আছে, দু'পয়সার তেলেভাজা আছে, পুডিং আছে। কিন্তু গায়ে সাবান দেন, মট্কার জামা চড়ান, ডাইং ক্লিনিংয়ের আর্জেন্ট ধোয়া কাপড় জড়ান, লেটেষ্ট ফ্যাসানের সিগারেট খান। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী খাস কল্কাতার কুলীন কায়স্থের মেয়ে, পিতা লক্ষ্মীর দরগায় এত সিন্নী দিয়েছেন যে মেয়েকে প্রাইমারী স্কুলের ওমুখো হতে দেননি। কিন্তু কল্কাতার মেয়ে জানে না কি?

অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীর গয়না নিয়ে দীনবন্ধু একবার ভাগলপুর গেছলেন। খবরের কাগজে সাড়ে তিন টাকা ইঞ্চিতে ফিরে এস আবেদন জানিয়েও নিরুদ্দিষ্টের খোঁজ মেলে নাই; তারপর ছ'মাস পর ভিখিরী শিব যখন এসে দাঁড়ালেন তখন পতিব্রতা সতী চোখের জল ফেলে বল্লেন, তুমি এসেছ এই ঢের। গয়নার কথাটা একসপ্তাহ মুলতুবী রইল। সপ্তাহ পরে ঝড় উঠ্ল।

দীনবন্ধু শপথ করে বলেন, মাগের গয়না খাব তেমন বাপ তাঁকে জন্ম দেন নি; 'আগে তোমার পাওনার দ্বিগুণ মেটাবো তারপর আমার'···বলে ছেঁড়া জামাটা তুলে নিয়ে বাটার দুটাকা পনের আনায় পা ঢুকিয়ে বেরোন। পেটেন্ট ওষুধে চোরাবাজার করে প্রথম টাকাট্াই মিষ্টান্নভাণ্ডার আর বীণা সিনেমায় গেল।

পড়শীর কানে বর্ষা ঋতু সুরু হল—প্রবল; জহর, কানন, ছবি, পদ্মা···নোন্তা আর আর ছানার জিলিপী। সুখী দম্পতি। হুলুস্থুল করে রেশনিংয়ের দিনে পাঁচজন ডেকে ছেলের জন্মদিন। সুখী দম্পতি।

বাড়ীতে ঢুকতেই শুনি দোতলার ঝি কাঁদুনির সুরে আমার স্ত্রীকে বল্ছে, মিন্ষে বেঁচে থাকতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, আজ আমি জ্বলে পুড়ে মরছি মা। আমি বল্তাম, ছি, তিনি তোমার মা, তিনি তোমায় পেটে ধরেছেন, তাঁর মতো গুরুজন কি আছে। তাঁকে

অমান্যি ছি। কি বল্‌ব মা, একথা বল্‌লে, ক্ষেপে উঠ্‌ত, বল্‌ত, তুমি কি আমার স্ত্রী নও, মা হলেই কি তোমায় যাচ্ছেতাই করবে নাকি, ইস্ত্রীর সম্মান আমি দেব। শাশুড়ীর পায়ে পড়ে বল্‌তাম, ওর অপরাধ নেবেন না, মা। ওকে আপনি পেটে ধরেছেন। ওমা তাতে মাগী বল্‌ত কি, পেটে যে আমি ধরেছি সে কি তুই মনে করিয়ে দিবি হারামজাদী···এরই মধ্যে কোথায় যে সে থাকৃত—একেবারে রুখে আসৃত······

বোধ হয় আমাকে দেখে ফেলেছিল, থম্‌কে গেল; ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি বলে সরে পড়ল।

স্ত্রী এসে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মিন্‌ষের স্মৃতি জেগেছে, হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, নব্‌নের মার কাছে শুনেছি, বেঁচে থাক্‌তে মিনষের হাড়মাস এক করে ছেড়েছে। আবার হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

আমাকে পেয়ে কি আমার স্ত্রী সুখী? এ হাসিতে কি তারই ইঙ্গিত, অপরের সুখের কথায় ঠাট্টা; কিসে কি পেয়ে সুখী জান্‌তে ইচ্ছে করে। সংসারের খিটিমিটি আর দড়িকলসীর মাঝে কি তৃপ্তির একটা পাৎলা পর্দা আছে নাকি?

খেতে বসে গতিকে চেপে ধরলাম। গতি আমার চাকর।

কি গতি, ইস্ত্রির ওপর রাগ গেছে?

রাগ কি বাবু, পরিষ্কার জলের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, জাগটা বদ্‌লে দি, কি একটা ময়লা দেখাচ্ছে।

জলটা বদ্‌লে দিতেই বল্‌লাম, না, এবার রাগ করেই বাড়ী থেকে এলে কিনা?

এবার গতি ঘরের চৌকাঠে বসে পড়ল। না, ওর মেজাজটা ঐ এক ধরণের। নইলে যত্নআত্তি খুব করে।

আহা, তা করবে বৈকি, তোমার ইস্ত্রী।

হ্যাঁ, আমাদের তো বাবু ভদ্দর লোকের মত নয়, ছোটলোক আর বলে কেন, ঝগড়াঝাটি আমাদের একটু হয়েই থাকে। তাও জানি বাবু, ছেলেবেলায় ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে ওর ঠাক্‌মা। সে আহ্লাদ সোয়ামীর ঘরে খাটবে কেন? নইলে, সংসারে কুটোটি আমার নাড়্‌তে হয় না। উদয়াস্ত কি পরিশ্রমই করতে পারে, ইস্‌।

স্বাস্থ্য কেমন?

বেশ স্বাস্থ্য বাবু; বেশ শরীল, সবই ভাল, কেবল ঐ যা···তাও খড়ের গাদার মতো, দপ্‌ করে জ্বলে বটে নিভেও দপ্‌ করে।

আগুন ছড়ায় না, কি বল ?

না। ওঃ যাঃ, বাবুর আঁচাবার জলই দিইনি।…

স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন। ফেটে পড়তে চাইছেন হাসিতে।

পরদিন সকালে। খেতে বসেছি। গতি এসে নীরবে দাঁড়ালো।

বাবু, একটা নিবেদন—

বল—বল—

দিন কয় ছুটি যদি দিতেন…একবার…

একবার বাড়ী যাবে ? এই না সেদিন এলে ?

দু'টো দিন বাবু, তিনদিনের দিন এসে পড়ব। হ্যাঁ নিশ্চয়।

বুঝ্লাম, কাল রাতে গতির ঘুম হয়নি। আরও বুঝ্লাম, সমাজের গতি এগিয়েও যে বার বার পিছিয়ে যায় তার কারণ, সমাজের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এই সন্তোষকুমারেরা সমাজকে ধারণ করে আছে।

থিয়োরী : অসামাজিক সমাজে একক মানুষের স্বাধীন পথনির্বাচনের চেষ্টায় সমাজদেহে সর্বজনীন উত্তমপুরুষ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে; কিন্তু প্রতিযোগিতার উপসংহারে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে স্তরবিন্যাস ঘটে যায় মানুষ তাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, স্বাধিষ্ঠানের একটা যুক্তি নিজেই খাড়া করে। সমাজে বহু বিরোধ ও পার্থক্যের দরুণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটেনা তার মূলে রয়েছে এই আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদের যুক্তি। উত্তম-পুরুষের অহং আর আত্মতুষ্টির যুক্তি বর্তমান অসামাজিক সমাজের অনিবার্য প্রসব।

তাঁতী বৌ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সবদেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার-যুগ, আর একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাংলা দেশেও তা আছে, অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোর আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প একটা বলছি :

অভিমন্যু বসাকের ছেলে গোকুল বসাক বাপের ব্যবসায় উন্নতি যতটা করলে অবনতি তার চাইতে কম করে নি। অভিমন্যুর ছিল আটপৌরে ঠেঁটি আর বচকানা কাপড়ের ব্যবসায়, পয়সা যা পেত তাতে দিন চলে যেত, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সে তাঁতী বৌএর নামে একটা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে। গোকুল যতদিন পারা যায় কাঁধে লাল গামছা ঝুলিয়ে খসবু দেয়া পান খেয়ে নিছক ঘুরে বেড়ান ছাড়া কিছু করল না। বাপের শ্রাদ্ধশান্তি হবার পরদিন সে তাঁতঘরে ধূপ দিয়ে যন্তরপাতিগুলি নিজের মতো করে গুছিয়ে নিল, লোকে অবাক হল দেখে, যে গোকুল অপদার্থ প্রতিপন্ন হয়ে গেছে সে বাপের আসনে বসে বাপের মতো ঠেঁটি আর বচকানা বুনে যাচ্ছে যেন কতদিনকার অভ্যাস।

লোকে বলে পরিবর্ত্তন তারপরে যেটা হল তার জন্যে তারা প্রস্তুতই ছিল, কাজেই বাপের শোক গা-সহা হতেই গোকুল একদিন তার তাঁতঘরে সব উল্টে পাল্টে ভেঙে চুরে ফেলল যখন তখন তারা আদৌ অবাক হল না। তবু গোকুল তাদেকে অবাক করল ; তিন গুরুবার পার হয়ে যাবার পর চারের বারে গোকুল বিকেল বেলায় কচি কলার পাতায় কি একটা মুরে নিয়ে গ্রামের জমিদার বাড়ীর দিকে রওনা হল। সে সব দিনের পাইক বরকন্দাজের বংশে প্রবাদ আছে, গোকুল জমিদারের কাছে গেল না, গিন্নিমার কাছে গেল না, সোজা যেয়ে উপস্থিত কাজলার (দিঘীর) ঘাটে যেখানে জমিদারের নোতুন-আনা বেটার বৌ আর নোতুন বিয়ে হওয়া মেয়ে ইসারায় স্বামীর গল্প করছে। গোকুল যখন ফিরে এল তখন তার হাতে বেটার বৌ-এর হাতের একগাছা রুলি। এই হচ্ছে গোকুলের মসলিন বুনবার প্রথম কথা। গঞ্জে পাঠাবার মতো সরেস জিনিস তার তাঁতে উৎরাত না, বিশেষ করে ফুলের কাজগুলিতে সোনার আঁশ খাটাতে সে পারত না, বড় জোর সাদা সুতো লাগাতে পারত ; আর বহরে সেগুলি পোষাকি শাড়ীর মতো হত না, কাজেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েকটি মুহূর্ত্ত ছাড়া বড় বেশী কারো চোখে পড়ত না তার কারিগরি,

বড় জোর সকালে কোন স্বামী দেখত রাত্রির লুকনো মালাগাছির সাথে বিছানায় 'পড়ে আছে মাকড়সার সাদা জালির মতো কি একটা।

গোকুল মাঝারি গোছের গুণী কিন্তু বড়রকমের খেয়ালি ছিল, কিন্তু এরকম থাকলে ফল ভালো হয় না। বড়গুণীর বড় খেয়ালে যা ঘটে খেয়াল মিটবার পর তার জের থাকে না, কিন্তু মাঝারি গুণী বড় খেয়াল ধরলে, কিম্বা সেজ গুণী মেজ খেয়ালে হাত বাড়ালে খেয়ালের জের অত সহজে মেটে না। সাধারণ ঘরের মেয়ে সহসা একরাতে মসলিনের সাত পাক পরলে সকালে বিছানা ছাড়বার সময়ে স্বামীকে না জানিয়ে বিছানার একপাশে আলগোছে মসলিন খুলে রেখে যেতে যেমন পারে না এও তেমনি আর কি। গোকুল তার খেয়ালে জড়িয়ে গেল।

পূজোর পর দিয়ে শীতের গোড়ায় ইদিল-সাহীতে পরগণার হাট বসত একমাসের জন্য। সব হাটেই সেকালে না না ধরণের পণ্য আসত, কিন্তু পরগণার হাটে কতগুলি বেশী দামী জিনিস আসত যা সব হাটে আসত না। দামী জিনিসগুলির জন্য এসব হাটের একটা দিক আলাদা করা থাকত, সব দোকানের পসরা ফুরিয়ে যাবার পর হাটের এদিকে ভিড় লাগত।, জমিদারেরা নিজে আসতেন, এমন কি উজিররাও কেউ কেউ আসতেন কোন কোন পরগণায়। এদিকে বাঁদী বান্দার দোকান; টাকা দিয়ে বান্দা পাওয়া যেত যোয়ান বুদ্ধিমান কৌশলী, পাঠান মোবলা, খোজা হিন্দু যার যে রকম চাই। বাঁদীও পাওয়া যেত মুলতানী, গুজরাটি, আফগানি, সাদা, গোলাপি, শ্যামলা, কখনও বসরা থেকেও আসত। এসব দোকানের বর্ণনা ইতিহাস যা দিয়েছে তার চাইতে ভাল বলা যায় না। আনার কলি, নুরজাহাঁ এ সব দোকানের বেসাতি।

গোকুল ক'খানা মসলিনই বেচে ফেলেছে, দোকান ছেড়ে সে মেলায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কি কিনি কি কিনি ভাব। অন্য যে দু একজন গুণী এসেছে তারাও ঘুরছে। কিন্তু হাটের একটা দিকে সে কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছে না। গায়ের জোরে কম বলে নয়, এদিকে এগোতে সাহসে কম পড়ছিল। লাঠি বল্লম নিয়ে এক এক দল লাঠিয়ালতো আছেই, খোলা কিরিচ হাতে পাহাড়ের মতো উঁচু ঘোড়ায় চেপে ঝক্‌ঝকে সাঁজোয়া পরা সিপাইও আছে কয়েক দলে। গোকুল ভাবল—বোধ হয় রাজা মহারাজরা কেনাকাটা করে এখানে। কিন্তু ভয়ে কৌতূহল চাপা যায় না। মেলার শেষ দিন এসে গেল, গ্রামের সাথীরা চলে গেল কিন্তু গোকুলের যাওয়া হ'ল না। ওদিকের সব দোকান উঠে গেছে, এদিকেরও দু একটা মাত্র অবশিষ্ট। প্রথমে সিপাইরা গেছে, তারপরে গেল লাঠিয়ালরা, একদিন গোকুল দেখল এবার এগোন যায়।

একটা মাত্র দোকান খোলা ছিল, গোকুল এগিয়ে যেয়ে দেখল দোকানে কোন

বেসাতি নেই, দোকান ভেঙে চলে যাবে বলে একটা চাকর গালিচাগুলি পর্দ্দাগুলি জড়ো ক'রে গাঁটরি বাঁধছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে ওদের দোকান ভাঙা দেখল, কেউ ওকে একটা প্রশ্নও করল না—ভালো কি মন্দ। অবশেষে সাহসে ভর ক'রে সে জিজ্ঞাসা করল—কিসের দোকান গো ?

ছোট ফরসি টানতে টানতে বুড়ো দোকানি বেড়িয়ে এসে বললে,—মালতো নেই বাপু, আর তুমি কিনবেই বা কি ?

—যা হয় কিছু, খালি হাতে মেলা থেকে ফিরব।

—তা দেখ বাপু এদিকে এস। আমার দুর্ণাম গেয়ে বেড়িও না, ভালো মাল নেই, বেছে নিয়ে যাবার পর না-পছন্দ এক আধটা আছে। —এই বলে ঝানু দোকানি যেমন দোকানের ওঁচা ভাঙা মাল হাতখালি করবার জন্য যে-কোন দামে ক্রেতাকে গছাতে চেষ্টা করে তেমনি ক'রে গোকুলকে ডেকে নিল।

পর্দ্দা তুলে গোকুল দেখল কোন মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয় মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলি দেখা যায় সারা গায়ের শ্যামল চামড়ার নিচে। গোকুল অবাক্ হ'ল, কিন্তু সে বোকা নয়, বুঝল কিসের দোকান এটা। হঠাৎ বললে—আমি কিনব। কেন বললে একথা গোকুল সেদিনও বল্‌তে পারে নি, কোনদিনই বলতে পারবে না। তার একার সংসারে ঝি-বাঁদীর কি বা কাজ। গ্রামের লোকেরা বলে সে খেয়ালে এ কাজ করেছিল। মসলিন বিক্রীর টাকা বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বলল—আমার কেনা হল।

পথে দুর্ব্বল রোগা মেয়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে কষ্ট যত না হ'ল তার চাইতে বেশী হ'ল রাগ। সে যে ঠকেছে, গ্রামের লোকরা আর একবার তাকে বোকা-তাঁতী বলবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। সমস্ত শরীরে লড়বর করছে হাড়গুলি। আধময়লা ডুরে ঠেঁটি পরবার ধরণটাই বা কী! চোয়ালের হাড়গুলির নিচে চোখ ডুবে গেছে, কাঁধের হাড়ের জোড়া পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কঙ্কালই হোক, কঙ্কালের গড়নের মধ্যেত একটা ছন্দ থাকা উচিৎ। মেয়েটার যেন কোমড় নেই এত সরু জায়গাটা, গোকুল ভাবছিল মচ্ ক'রে একটা শব্দ হবে, তারপরে দু' টুকরো হ'য়ে যাবে কোমড়ের কাছে। গোকুল বললে, আস্তে চল্, বাপু। গোকুলের মনে হ'তে লাগল,—মুচিরা মাঝে মাঝে যেমন বুড়ো গরু হাটিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে এও যেন তেমনি। হাতে করে তুলে ফেলে দেবার মতো হ'লে সে ছুঁড়ে ফেলে দিত তার বোকামির নিশানা কারো চোখে না পড়ে এমন জায়গায়।

পথে ঘাটে বেরলে লোকে ঠাট্টা করবে এই ভয়ে গোকুল ঘরে বসে তাঁত বোনে, আর অন্তত কিছু কাজ যাতে করতে পারে মেয়েটা সেজন্য রাতারাতি সবল ক'রে তুলবার জন্য যখন তখন মেয়েটাকে ধমকে ধমকে খাওয়ায়। মেয়েটা কাঁদে আর খায়, আর

মাঝে মাঝে বাইরে মেলে রাখা লাটাই ঘরে তোলে আর ঘরে তোলা লাটাই রোদ্দুরে দেয়। গোকুল তার দিকে চেয়েও দেখে না; চোখের কোনায় যদি হঠাৎ কখনো পড়ে, সাড়া শরীর ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে: কি বিশ্রী কি বিশ্রী।

মানুষ যেমন হঠাৎ একদিন মরতে পারে, তেমনি হঠাৎ একদিন বাঁচতেও পারে, এমন কি হঠাৎ যে কোন সময়ে যে কোন রকম পরিবর্ত্তন তার জীবনে আসতে পারে। ভাদ্র মাস। সন্ধ্যার পর থেকে পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো বর্ষা নেমেছে। খাওয়াদাওয়া সেরে গোকুল ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় হিসাব দেখছে। আজকাল সে বুড়িয়ে গেছে যেন, মেয়েটাকে কিনে যে টাকা লোকসান হ'য়েছে তাই উশুল করতে যেয়ে সেই যে টাকা পয়সার হিসাবে নেমেছে ক্রমাগতই তাতে জড়িয়ে পড়ছে।

মেয়েটা চট পেতে বারান্দায় শোয়, কদিনের বৃষ্টিতে কাদা হ'য়ে গেছে মাটির দাওয়া তবু তার মধ্যে শুয়ে থাকে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেলে ক্রমে দেয়ালের কাছে সরে আসে, তারপর উঠে, শেষে দেয়ালের সাথে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা শরীর জলে ভিজে যায়, হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা মেখে সে ঘুম ছেড়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটায়। যদি কোনদিন বৃষ্টির ছাঁট কমে যায় দেয়ালের গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ে আবার।

গোকুলের চোখে তন্দ্রা এসেছিল, বাইরে পর পর তিন চার বার প্রবল বজ্রগর্জ্জন হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে বৃষ্টি নেমে এল। দূরের জানালা দিয়েও বৃষ্টির ছাঁট এসে গোকুলের গায়ে লাগছিল, সেটা বন্ধ করবার জন্য উঠে এগিয়ে যেতেই তার কানে কান্নার শব্দ এল। কে বা কাঁদছে, ভয় পেয়ে ছেলে মানুষের মতো, অসহায় অব্যক্ত কান্না। মা রাগ করে ছেলেকে শেয়ালের অন্ধকারে নামিয়ে দিলে ছেলে যেমন ক্রুদ্ধ মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে তেমনি কান্না। অদ্ভুত লাগল গোকুলের, কে কাঁদে তার ঘরের পাশে এই বাদলা রাত্রিতে। অথচ অদ্ভুত লাগবার কথা নয়, বাড়ীতে আর একটা প্রাণী আছে, এই তিমির ঘন দুর্য্যোগের রাতে বাহিরে বৃষ্টির নিরাশ্রয় ধারার মধ্যে। গোকুলের অবশেষে মনে পড়ল বাঁদীর কথা। বাঁদী কাঁদে এমন করে মানুষের মতো! গোকুলের মনে হল বাঁদী যেন মানুষ হয়েছে।

দরজা খুলে দিল গোকুল, তবু নড়ে না বাঁদী। অন্ধকারের মাঝে নজর ঠেলে দিয়ে গোকুলের লজ্জা বোধ হল। ঝড়ের ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য জানালার গরাদ চেপে ধরে যখন বাঁদী দাঁড়িয়েছিল তার একমাত্র বাস উড়ে গেছে ঝড়ে তাও লক্ষ্য নেই বাঁদীর। ঘরে ঝুলানো সকালের তাঁত থেকে নামানো শাড়ীখানা হাত বাড়িয়ে বাঁদীর দিকে এগিয়ে দিয়ে গোকুল ঘরের অন্ধকারে সরে গেল। সেখান থেকে হুকুম করলে বাঁদীকে ঘরের ভেতরে যেতে।

বিছানায় বসে সে ভাবতে লাগল কি বিড়ম্বনায় সে পড়েছে খেয়াল চরিতার্থ করতে

যেয়ে। মানুষ, হোক্ সে বাঁদী, এমন নির্ব্বোধ হয় কি করে? লাথি আর মিষ্টি কথার তফাৎ বোঝে না। অবশ্য বোঝে কি না এ পরখ করে দেখেনি গোকুল, কারণ লাথি যে সব বাঁদীকে মারা যায় তারা অন্তত মান অপমান বুঝবে, নতুবা কি লাভ লাথি মেরে। এ তাও বুঝবে না। ক্ষিধে পেলেও যে খায় না, ক্ষিধে না থাকলেও খাও বললেই যে খায়; গোবর ঘেঁটে হাত ধোবার ইচ্ছা যার হয় না, পায়ের নখ উল্টে যেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলেও যাকে বলতে হয় হাত দিয়ে রক্ত চেপে ধরে রক্ত বন্ধ কর,—সে যে কি পরিমাণ নির্ব্বোধ! শুধু নির্ব্বোধ নয়, নির্ব্বাকও; ভাষাহীন নয়, ঠোঁট নড়ে, কথা যোগায় না।

গোকুল রাগ করে বলল—কাপড় পরেছ তবে ঘরে আসছ না কেন? ঘরে এসে দরজা দাও, ঘর ভিজে গেল জলে, কি আপদ!

বাঁদী ঘরে এসে দরজা দিল।

গোকুল আবার রাগ করে বলল, এবার ঐ কোণটায় শোও, শুয়ে চোখ বোঁজ, চোখ বুঁজে ঘুমাও। আরও বলে দিতে হবে।

ভীতা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, অন্ধকারেও মনে হল কি যেন বলতে চায় সে। এমন হয় নির্ব্বাকের ইসারা যত সহজে যত গভীর ভাবে বোঝা যায় প্রগলভ বক্তৃতাও তত নয়। গোকুল বুঝল বাঁদী কৃতজ্ঞতা জানাতে চাচ্ছে, তার বাহুর উৎক্ষেপে, দেহের ভঙ্গিতে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে—প্রাণ দিলে।

গোকুল বললে, এখন শোও গে যাও। কিন্তু একথার পরও বাঁদী যখন নড়ল না বরং হাঁটুভেঙে বসে পড়ল দরজার পাশে তখন গোকুল না উঠে পারল না। গোকুলের বোধ হল বাড়ীর কুকুরটির মতো বাঁদীটিও তার। উঠে যেয়ে প্রদীপ তুলে সে দেখল বাঁদীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে নিঃশব্দে। মনে হল একটা মিষ্টি কথা বললে তার প্রভুত্ব খর্ব্ব হবে না। বললে—কেঁদো না, বাপু; সবার জীবনই সুখের হয় না।

বাঁদী উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের ম্লান আলো তার অঙ্গে অঙ্গে পড়ল। সবজে মোটা মস্‌লিনের অন্তরালে বাঁদীকে দেখে গোকুল কথা হারিয়ে থেমে গেল। হাড়ের কাঠামোর পরে মেদমাংস লেগেছে এ খানিকটা প্রত্যাশা গোকুল করেছিল; কিন্তু কি বিশ্রী কি বিশ্রী করে চোখ ফিরিয়ে নেয়া অভ্যাস হয়ে গেছে বলে গোকুল কোনদিনই এ বস্তুটির আভাস পায় নি। বক্ষের রসপূর্ণ বৃত্তাভাস, নিতম্বের উন্নয়ন, উরুর উষ্ণ মসৃণতা আর সব ছাপিয়ে উঠেছে চোখের দিশেহারা কষ্ট!

গোকুল করবার মতো একটি মাত্র কাজই ভেবে পেল—বাঁদীর হাত ধরে বলল, ভয় নেই তোমার।

গোকুলের মনে হল এত করুণ, এত কিশোর! এ কি কোনদিন ভাবা গেছে এ এত

অল্পবয়সী। গোকুলের মনে হল এত স্নেহ সে দিতে পারে একে তবু না হয় স্নেহের শেষ, না হয় তা জানানো। বিছানায় বসে গোকুল তাকে পাশে বসাল, দুহাতে তার মুখ তুলে ধরে ভিজে ঠাণ্ডা কপালের দিকে, চোখের দিকে, চোখের জলের দিকে চেয়ে রইল। বারেবারে বলল—কাঁদিসনে, কাঁদিসনে। কোথা থেকে সাহস পেয়ে বাঁদী দুহাতে গোকুলকে আঁকড়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। সকালে তাঁতঘরে যেয়ে গোকুল প্রথমে কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করলে যা জীবনে কোনদিন করেনি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? স্নায়ুগ্রন্থিগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন শ্বেত-চন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের মধ্যে খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হল বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠছিল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল তাঁর খোঁজ করতে যেয়ে গোকুল দেখল শুভ্র মসৃণ উরুদেশের ছায়া সেটা। ঘরে ফিরে এসে গোকুল দেখলে তার শয্যায় (গত রাত্রির কথার সাথে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক হল একটু) বাঁদী উপুর হয়ে শুয়ে আছে। মনে হল কাঁদছে সে।

গোকুল ফিরে গেল খানিকটা বাদে আবার ফিরে আসবার জন্য। এবার এসে সে বসল শয্যার পাশে; বললে,—কি নামে ডাকব তোকে তাই বল্। তোকে না হলে আমার চলবে না, কোনদিন কারো চলেনি।

গোকুলের তাঁতঘর থেকে দিবারাত্রি গান শোনা যায়, যে গান গলা নিরপেক্ষ, সুর নিরপেক্ষ, চাষা হলুদে ধান কাটতে যে গান গায় কতকটা তেমনি।

অল্প বয়স যতদিন থাকে মানুষ প্রবীণ গৃহস্থের অনুকরণ করতে ভালোবাসে, যেমন ছোট ছোট মেয়েরা করে খেলাঘরে। গৃহকর্ত্তা হয়ে একদিন রাত্রিতে গোকুল বাঁদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, -শোন বলি তোকে, একটা জিনিস আমাদের নেই; একটা ছেলে না হ'লে যেন চলছে না তাই নয়? বড় খালি খালি, শুধু দুজন।

বাঁদী বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল মাত্র।

দু চার দিন বাদে গোকুল কথাটা আবার বললে তাকে, বাঁদী শিউরে উঠে বললে—না।

—নয় কেন?

বাঁদী গোকুলের কাছে সরে এসে থর থর করে কেঁপে উঠল।

কথাটা গোকুল ভুলল না। কি হোল তার কে বলবে, এর পরে প্রায় রোজই যখন তখন কথাটা সে বলতে আরম্ভ করল। কখনো বাঁদী না শুনবার ভান ক'রে অন্য দিকে চেয়ে থাকে, কখনো গোকুলের মুখের দিতে চেয়ে নির্ব্বাক মিনতি করে।' কি বলে সে বোঝা শুধু যায় না, চোখের দীর্ঘ ছায়া দেখে মনে হয় বড় করুণ মিনতি সে।

বাঁদীর ছোটখাট শরীরটার মধ্যে একটা ছোট মন আছে সেটা গোকুলের গলা শুনলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। দোকানির তাঁবুতে যত মেয়ে ছিল সবার চাইতে সে ছিল ভীরু। মানুষ দেখলে তার জিভ জড়িয়ে আসে কথা ফোটে না, স্তম্ভিত হয়ে যায় ভেতরটা।

সেদিন রাত্রিতে বাঁদীর করুণ দৃষ্টিতে মন ভিজল না গোকুলের, পাশ ফিরে সে শুয়ে থাকল। বাঁদী জানাতে চায় গোকুলকে সুখী করতে না পেরে সে দুঃখী, সেইটুকু জানানোর জন্য বাঁদী শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোকুল ধমক দিয়ে উঠল—কি আপদ ঘুমাতে দেবে না বুঝি। বাঁদীর কান্না বন্ধ হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডও বোধ হয়।

সারা রাত বাঁদী বসে রইল, সারা রাত ধরে তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নিজের উপর রাগ হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে এনে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে ইচ্ছা হল, কেন সেটা থেমে যায় বারে বারে, কেন সেটা আলোড়িত হয়ে একটা কথা উঠে আসে না, যে কথায় গোকুল সুখ পায় আরাম পায়।

নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে গোকুল পরের দিন রাগ করলে না। শুধু বললে—আমার মনে হয় ও তুই পারবি নে, সব মেয়ে পারে না।

মিষ্টি কথায় বাঁদী অভিমান (সামান্য মাত্র, বেশী করতে সে ভয় পায়) ক'রে পাশ ফিরে রইল। গোকুল নরম করে বলল—এই দেখ কি এনেছি, এইটে হাতে বেঁধে দি আয়, সিদ্ধস্থানের মাটি আছে এতে, দেখি তারপরে কি হয়।

বাঁদী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—হবে ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ।

হাতে কবজ বেঁধে অনেকদিন পরে আজ না কেঁদে বাদী গোকুলের বুকের সাথে মিশে গেল।

কিছুদিন পর একদিন বাঁদী গোকুলকে নিজে থেকে ডেকে বলল,—ফকির এসেছে ও গাঁয়ের মাঠে, যাব ? ওরা বলল।

—যাবি কেন ? ও বুঝেছি, তা তোর ভরসা নেই বুঝি কবজে ?

—না।

—কি করে যাবি। সে নাকি সন্ধ্যার পর একা একা চুল খুলে দিয়ে নোতুন কাপড় পরে যেতে হয়। ভয় করবে রে, ও মাঠে রাতের বেলা যেতে আমারই ভয় করে।

—যাব।

—ফকির খুব ভালো আমিও শুনেছি। তা আমিও কিছু দূরে দূরে তোর সঙ্গে থাকব কি বলিস ?

—না যেতে হয় না।

—তাই বলেছে। আচ্ছা যাস তাই। ফিরতে দেরী করিস নে আমি পাগল হয়ে যাব।

বাঁদী গিয়েছিল। নোতুন শাড়ী পরে, কপালে খয়ের টিপ এঁকে, চোখে কাজলের রেখা দিয়ে যে রকমটা লোকে বলেছিল ঠিক তেমনি করে এলোচুলে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোট মাঠ, মরা নদীর সাঁকো, ময়না-কাটার খাল পার হয়ে ঝোপরা অশ্বত্থ গাছের তলে বড়মাঠে ফকিরের কাছে। ভয়ের ঘামে নেয়ে উঠেছিল বাড়ী থেকে সাত পা যাবার আগে তবু গিয়েছিল।

ভোর বেলার একটু আগে সে ফিরে এল। গোকুল দাঁড়িয়ে ছিল আলো নিয়ে, অবাক হয়ে গেল বাঁদীকে দেখে। কোথায় খয়েরের টিপ, কোথায় চোখের কাজল। ক্লান্ত সর্ব্বহারা দৃষ্টি। আলো তুলে গোকুল তাকে পরিহাস ভরে বলল—ডাকাতের দলে পড়েছিলি না কি রে ?

—না।

—ভয় না হয় নাই পেলি, পেয়েছিস কিনা আমি জানছি। আহা হা পড়ে গিয়েছিলি সাঁকো থেকে। ঠিক তাই, এই তো কাপড়ও ভিজে।

—না।

—রাগ করেছে, পাগলি। সত্যিরে আমার জন্য এত কষ্ট হল তোর।

গোকুল বাঁদীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল, নোতুন গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছিয়ে, কাপড় বদলে বিছানায় বসাল তাকে, বাঁদীর চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে।

গোকুল বিছানায় বসে বললে,—আমি জানি, আমি জানি, অভিমান হওয়া তোর অন্যায় নয়। আমাকে সুখী করবার জন্য তুই যে সাহস দেখালি, যে কষ্ট করলি তারপরে তোকে প্রবোধ দেয়া যায় না। তুই বলেই পেরেছিস, আর কেউ তোর তাঁতীর জন্য এতটা করত না।

বাঁদী কি একটা বলবার চেষ্টায় বার কয়েক ঠোঁট দুটি নাড়ল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেয়ে বাইরের অন্ধকারে বারান্দায় শুয়ে পড়ল, গোকুলের একশ' ডাকে সারা দিল না।

বাঁদী দু তিন মাস কথা বললে না ভালো করে, রাঁধলে না খেল না, চুল বাঁধলে না শুধু আকাশের দিকে চেয়ে দিন কাটাল। গোকুল দূরে থাকে, সুযোগ পেলে কাছে আসে কোমল করে কথা বলে। গোকুল ভাবে অভিমান করবেই তো বাঁদী সে কি সোজা কথা রাত করে ঐ ভয়ের মধ্যে যাওয়া।

একদিন পাড়া থেকে বেড়িয়ে ফিরে গোকুল বলল—শুনেছিস, তাঁতীবৌ, তোর সেই

ফকিরটা মরে গেছে। গলায় বাঘে না কিসে কামড়েছিল তার ঘাতেই দু তিন মাস ভুগে ভুগে মারা গেল। ভেবেছিলাম একদিন ভালো করে সিন্নি দিয়ে আসব হল না তা।

বাঁদী রুক্ষ গলায় বলল—এখনো যাও, গোরে দেয় নি বোধ হয়, দিয়ে এস, সিন্নি।

—রাগ করলি তুই? দেখতো কত বড় দয়া করেছে ফকির আমাদের। মন্তরে ফল হতেও পারে তো। চৌকাট চেপে ধরে বাঁদী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের স্বরের তীব্রতার প্রত্যুত্তরে গোকুলের রোষের আকাঙ্ক্ষায় তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু গোকুল রাগ করল না। এমন হয় সংসারে, অনুগৃহীতের একটি মাত্র আত্মদানের ফলে তার স্থান অনুগ্রহীতার সমপর্য্যায়ে উঠে যায়। গোকুল অপ্রতিভ হয়ে পালিয়ে গেল। মনে মনে সে খুঁজতে লাগল কি করে বাঁদীর অভিমানটুকু দূর করা যায়।

একদিন বাঁদী কথা বলল। নিজে থেকে গোকুলকে ডেকে লজ্জায় মুখ লাল করে বলল—হবে, পাবে তুমি এতদিনে।

তারপর একটু কাঁদল বাঁদী। সারা মুখ বিকৃত হয়ে দুর্ব্বার লবণাক্ত অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

গোকুল বললে—কাঁদ, কাঁদ, আনন্দে কান্না পায়।

তাঁতীদের মধ্যে যারা গোকুলকে খাতির করত তার ওস্তাদীর জন্য, তারা এল, ওপাড়া থেকে জোলাদের রহিমবুড়ো এল জনকয়েক সাকরেদ নিয়ে, যে দোকান থেকে মাঝে মাঝে গোকুলের মসলিন বিক্রী হয় ধনীদের মধ্যে এল সে। কতক নিজে থেকে এসেছে, কাউকে আনা হয়েছে ডেকে। রাঙাপাড় কোড়া ঠেঁটি পরে বাঁদী (এখন সে তাঁতী বৌ) বসেছে রকে, কোলে ছোট্ট ফুটফুটে টুলটুলে একটা ছেলে। গোকুল সকলের সামনে জোড় হাত ক'রে দাঁড়াচ্ছে সকলে এগিয়ে যেয়ে আশীর্ব্বাদ করছে। গোকুল কারো কথা শুনল না রহিম বুড়োর পায়ের ধূলো নিয়ে ছেলের মাথায় বার বার মাখিয়ে দিয়ে বলল,—আশীর্ব্বাদ কর চাচামিঞা, তোমার মতো হাত হয়। এক মুখ হেসে বুড়ো বলল—হবেরে হবে, বাপের বেটা হবে।

সকলে চলে গেলে গোকুল ঘরে যেয়ে বসল, শোবার ঘরের ওদিকটার একখানা কাঠাল কাঠের চৌকি পড়েছে। একরাশ রঙিন কাঁথার ভাঁজ স্তরে স্তরে সাজান; গোকুল সকলকে বানাতে দিয়েছিল নিয়ে এসে আজ সাজিয়েছে। তাঁতী বৌ তখনও বাইরে বসে ছেলে কোলে ক'রে। গোকুল ডাকল—ঘরে এস বৌ, খোকনমনির ঠাণ্ডা লাগবে।

তাঁতী বৌ ঘরে এসে বলল—চেঁচিও না বাপু ষাঁড়ের মতো, লজ্জা করে না যেন। এক উঠোন লোকের সামনে আমাকে ছেলে কোলে করে বসালে।

গোকুল হাসতে হাসতে জবাব দেয়।—বাস্‌রে, তোর ছেলে তুই কোলে নিবি না।

তাঁতী বৌও হাসে, তাঁতী বৌ কথা বলে। দুজনে হাসে, দুজনে কাঁদে।

তাঁতী বৌ ছেলে শুইয়ে এসে বসল গোকুলের পাশে।

—খুসী হ'য়েছ তুমি?

—হাঁ।

—আমাকে এখন আর তেমন মনে পড়বে না, তাই নয়?

—বাসরে কত কত কথা তুই শিখেছিস।

দিন যায়, রাত্রি যায়; গোকুল ছোট চৌকিখানার পাশে ঘোরে আর ছেলেকে দেখে আর ষাঁড়ের মতো চেঁচায়—বউ দেখ সে, দুধ তুলছে। কখনো বলে—দেয়ালা কাটছে দেখে যারে দেখে যা। কখনো নিজেই রান্নাঘরের দরজায় যেয়ে বলে—একটা কথা বলি হাসবি না, খোকা আমাকে চেনে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়ে।

রাত্রিতেও ঐ একই কথা হয়। গোকুল বলে—এই তো উঠে বসবে, একটা চাঁদির গোট বানিয়ে দেব। কিন্তু তোর ছেলে কি ভদ্রলোক ভেবেছিস ফোকলা মুখের নালে নালে বুক ভরে রাখবে।

তাঁতী বৌ যদি অনুযোগ করে—দিনরাত তোমার ওরই কথা—। কাছে সরে যেয়ে গোকুল বলে, যার জন্য ওকে পেলাম সে বুঝি ফেলনা, কি বোকা রে তুই।

চাঁদির গোট হার গড়াল গোকুল, ছেলে কিন্তু উঠে বসবার কোন লক্ষণই দেখাল না, নাল দিয়ে বুক ভেজা দূরের কথা। পাঁচমাস গেল, সাতমাস গেল বছর ঘুরে এল ছেলে বাড়ল না পর্য্যন্ত। শুকিয়ে গেল, মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন কত কালের বুড়ো, হাসে না পর্য্যন্ত।

গোকুল বৌকে ডেকে বলে—একি হ'লরে?

তাঁতী বৌ প্রবোধ দিয়ে বলে—সেরে যাবে বড় হলে দেখ।

রাতে ছেলে ঘুমায় না, কি একটা কষ্টে সারারাত কাঁদে, সারারাত কাঁতরায়। তাঁতী বৌ বাইরে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়; তাঁতীও উঠে আসে।

তাঁতী বৌ বলে—একি হ'ল ছেলে?

তাঁতী বলে—কপাল।

ওঝা এল, কবরেজ এল; চিকিৎসা হ'ল কিন্তু সবাই ছেলের ভ্রূকুটি দেখে ফিরে যায়। শেষে অনেক ধরনা দিয়ে অনেক কষ্টে গোকুল সিদ্ধস্থানের ঠাকুরাণীকে নিয়ে এল। অনেক কথা অনেক মন্ত্র অনেক চালান সারা সকাল সারা দুপুর ধরে চলল। সারাদিন না খেয়ে আগুনের কাছে ঠায় বসে থেকে তখন গোকুলের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, তাঁতী বৌ ঢ'লে পড়েছে দেয়ালের গায়ে। সন্ধ্যা লাগা লাগা সময়ে সিদ্ধা মুখ খুলে বলল—তুই বউ বদলা গোকুল, এ বৌ-এর রিষ্টি যোগ আছে, এর কাছে ভালো ছেলে তুই সাতজন্মেও পাবি না।

গোকুল বোধ করি ঝিমিয়ে পড়েছিল প্রথমে তার কানে যায় নি কথাগুলি। সিদ্ধা স্পষ্ট করে বলবার জন্য আবার বলল—বুঝলি রিষ্টিযোগ, ও বৌ তোর বৌই নয়। বৌ বদলে নোতুন ক'রে বিয়ে কর।

এবার লাল চোখ মেলে গোকুল সিদ্ধার দিকে চাইল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল—বেরো, বেরো—ভণ্ডামি করার জায়গা পাওনি; বৌ বদলাব!

সিদ্ধা চলে গেল, সারা দিনে স্নান খাওয়া হয়নি তবু সে রাত্রিতে খাওয়ার জন্যও কেউ উঠল না। গোকুল একটু সরে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল। চূড়ান্ত আশা ভঙ্গের এমন মূর্ত্তি আর দেখেনি। তাতী বৌ স্থির অকম্পিত হয়ে বসে রইল। ছেলেটা রাত্রিতে কতবার কাঁদল কেউ উঠেও দেখলে না।

ব্যাপারটা গোকুলের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল। প্রথমে সে নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই যা দেরী হয়েছে—তাঁতীবৌ আবার বাক্‌হীন হয়ে পড়েছে। দিনকে দিন যেন সে বোকা হয়ে যাচ্ছে। তাঁতী একদিন ডেকে বলল—তুই কি আবার আগের মতো শুধু বোকার মতো চেয়ে থাকবি, শুধু কাঁদবি নাকি?

তাঁতীবৌ একটু হেসে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে লাগল।

গোকুল আবার জিজ্ঞাসা করল—তুই কি শুধু বসে বসে বাতাস করবি নাকি, তার চাইতে ঘুমো না হয়, তোর মনওতো ভালো নেই, শুয়ে থাক আমার পাশে।

তাঁতীবৌ চুপ করে শুয়ে পড়ল। গোকুল বললে,—তোর এই শোওয়াটা যেন আমার ভালো লাগল নারে, কেমন যেন আগের মতো, যেন তোর নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই, শুতে বললাম আর টুপ করে শুয়ে পড়লি।

তাঁতীবৌ শত অনুরোধেও মুখ তুলল না, গোকুলের বুকে মুখ গুঁজে প্রাণপণে দুহাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল।

দিনকে দিন তাঁতীবৌ শুকিয়ে যেতে লাগল, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠে চোখটিকে আগের চাইতে বিস্তৃত করে দিয়েছে। চলে যেন না চললে নয়, বলে যেন না বললে নয়।

তাঁতী একদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে ডেকে বলল—কথা বলি শোন, শুধু দুঃখ করলে চলবে না, ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে তো।

তাঁতীবৌ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, যেন বুঝতে পারে না,—কে ছেলে তাকে বাঁচানোই বা কী। গোকুল ভাবে কি অদ্ভুত ভাগ্য তার, সংসারে দুঃখের কথা বলবার জন্যও কি একটা লোক থাকবে না। তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, রাগ করে সে বলে,—নিকুচি করি তোর চোখের, কথা বলিস না কেন? জিভ ক্ষয়ে গেছে?

মারবার জন্য হাত তুললে শিশু যেমন ভয়ে চোখ বোঁজে তেমন করে চোখ বুঁজে

কেঁপে উঠল তাঁতীবৌ। গোকুলের খুন চেপে গেল যেন, লাফিয়ে উঠে বলল,—চুলের মুঠি ধরে বের করে দেব পাজি কোথাকার। তারপরে কোঁচার খোঁটে চোখ মুছতে মুছতে নিজেই বেরিয়ে যায়।

গোকুল করাঘাত করে কপালে আর রকে বসে লক্ষ্য করতে থাকে তাঁতীবৌকে। ঠিক তাই, এতদিনকার এত কথা ঘরকন্না সব যেন স্বপ্ন, চেহারা শুকানোর সাথে সাথে ঠিক আগের ব্যারামটা ফিরে এসেছে তাঁতীবৌএর। গোকুল নড়লেই ভয়ে কেঁপে ওঠে তার প্রাণ, বুক শুকিয়ে জিভ গলার মধ্যে আটকে যায়। বসে থাকে, কি ভাবে ; এক এক দিন রান্না করতে না বললে রান্না করতেও ভুলে যায়।

রাত্রিতে গোকুল শেষ চেষ্টা করবার জন্য তাঁতীবৌকে ডেকে নিল ; মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কোলে করে বসল তাকে। দুহাতে মুখ তুলে ধরে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকল, তারপরে বলল—বল আমাকে, সত্যি করে বল, আর ভালো লাগে না আমাকে, কথা তোকে বলতে হবে। অন্য বউদের মতো কথা বলতে তুই জানিস না তা জানি, তবু যেমন বলতি তুই নিজের তৈরী এক আধটা তেমনি বল, বলতে হবে তোকে।

—লাগে।

—লাগে তো? তবে কেন অমন করিস। এ ঘর সংসার কি তোর নয়, দিনকে দিন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিস, আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিস, এখন তো ছোট্ট মেয়েটি নস বোকা বোকা হয়ে থাকবি।

তাঁতীবৌএর ঠোঁট কেঁপে উঠল।

গোকুল ব্যাকুল হয়ে বলল,—বল, যা বলতে চাচ্ছিস বল।

তাঁতীবৌ বলল—বউ বদলা।

প্রথমে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে তারপরে হো হো করে হেসে খুব হাসির কথা যেমন বারবার করে আবৃত্তি করে তেমনি করে গোকুল বলতে লাগল,—বউ বদলা…বউ বদলা… একসময়ে সে বলল,—ঘুমা তুই, বদলাতে হয় কিনা হয় সে আমি জানি ; এই ভেবে বুঝি দিনকে দিন বোকা হয়ে যাচ্ছিস।

আর একবার কবরেজ গুণী ওঝা নিয়ে মেতে উঠল গোকুল। একে পায় তো ওকে ছাড়ে, ওর খ্যাতি শোনে তো ছুটে যায়, ওর একটু দুর্ণাম শোনে তো ছাড়িয়ে দেয় ওকে। ছেলেটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর বৌকে ডেকে বলে, একটু উন্নতি হয়েছে নারে? বৌ সাড়া দেয় না, সাড়া না দিলেও সে নিজেই বুঝতে পারে উন্নতি কিছুমাত্র হয় নি।

এমনি করে ছেলেকে দেখতে দেখতে একদিন গোকুলের খুন চেপে গেল মাথায়,

হারামজাদা পাজি, ভাগারের শকুন, বাঁদরের বাচ্চা কোথাকার, যেমন দেবতা তার বরও তেমনি, অমন মরখুটে ফকির না হলে এমন ফল হয় তার মন্তরে।

ক্ষুদ্র প্রাণীটির জ্বালাময়, নিদ্রাহীন আলো অন্ধকারের অভিজ্ঞতা হয় তো সেদিনই শেষ হয়ে যেত যদি নিজের কথাগুলি কানে যেতে কানে আঙুল দিয়ে গোকুল ছুটে না পালাত।

সারাদিন এদিক ওদিক কাটিয়ে গোকুল সন্ধ্যার পরে ফিরে এল। একটুখানি জ্যোছনা উঠেছে সেদিন। উঠোন পার হতেই গোকুলের নজর পড়ল তাঁতীবৌ-এর 'পরে, জ্যোছনার একটা ফালির মাঝখানে সে বসে আছে, শান্ত স্থির পটের ছবির মতো। স্নিগ্ধতার আশ্বাসে পায়ে পায়ে যেয়ে বসল তার পাশে। সকালের তাণ্ডবের জন্য নিজের অনুতাপের অবধি নেই, একটু আশ্বাস পেলে একটু সান্ত্বনা পেলে দোষ স্বীকার করে বুকের ভার নামিয়ে একটু কাঁদেও হয় তো, সময় বয়ে যায়, কেউ কথা বলে না। চোরের মতো মুখ করে তাঁতী বৌ বসে থাকে।

কিন্তু এবার গোকুল রাগ করে না। সারা দিন আজ সে ব্যাপারটাকে উল্টে পাল্টে বুঝবার চেষ্টা করেছে। তাঁতী বৌএর বা দোষ কী, সে কী কিছু কম সহ্য করেছে? তারও তো ছেলে, তারও তো কষ্ট হয় ছেলেটার অসুখে। গোকুল শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে বোকা বলেছে, বোকার চাইতেও বোকা বলেছে; কি আশ্চর্য্য এ সোজা কথাটা বুঝতে পারে নি সে,—তার পুরুষের প্রাণে যদি এত কষ্ট ছেলেটার জন্য, আর যে মা তার প্রাণ তা হলে কত বেশী পুড়ে যায়। দোষ কী তাঁতীবৌ এর সে যদি কথা না বলে, বোকার মতো চেয়ে থাকে, অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেত। এ সব ভেবেই গোকুল বসেছিল কাছে এসে।

—ও বৌ কথা বল্, তোর পায়ে ধরি। আমার দোষ আমি বুঝতে পেরেছি, সব আমার দোষ, তোর দিকে আমি চেয়েও দেখি নি।

—কি বলব বল।

—কিছু কী তোর বলবার নেই। আমি এলেই যদি তোর এত কষ্ট হয়, আচ্ছা আমি যাই।

—না যাস্ নে, একটা কথা বলব তোকে।

গোকুল সান্ত্বনা পাবার আশায় বৌ এর পায়ের কাছে বসে পড়ে।

—বলব বলেই এখানে বসে আছি। ও কোনদিন ভালো হবে না, তোর দোষ নয়, ওর দোষ নয়, দোষ আমার। আমার রিষ্টি যোগ আছে।

কথা কয়টি বলে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো তাঁতী বৌ নেতিয়ে পড়ল। কথা নোতুন নয়, এর চাইতে দৃঢ়স্বরে অনেক বেশী আড়ম্বর করে সিদ্ধা বলেছিল, এর চেয়ে বেশী গভীর করে গোকুল নিজেও ভাববার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাক্‌বিহীনার স্বরে এমন

একটা সব-আশা-নষ্ট হবার শেষ কথা বলবার সুর ছিল যে গোকুল আহতের মতো খাড়া হয়ে বসল।

—বলিস কি রে ?

—হ্যাঁ সত্যি। আমার নিশ্বাসে তুমিও বাঁচবে না। ওরা বলে—আমার মনে হয়……

—কি বলে ওরা ? তা হলে আর আমি জানতাম না এতদিনে, ওরা ভুরা দেয়।

—না জানতে না। মেয়েরা ছাড়া কেউ বোঝে না, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, যে দিকে দু চোখ চলে যায় আমাকে চলে যেতে হবে।

—তুই চলে যাবি !

তাঁতী বৌ উঠে দাঁড়াল যেন যাবার জন্য সে প্রস্তুত, বললে—হ্যাঁ।

—তুই জানতি এতদিন, সে জন্য আমার সংসারে অলক্ষ্মী লেগেছে।

পরদিন সকালে উঠে গোকুলকে দেখা গেল না, তার পরদিনও না, তারপরও না। তাঁতী বৌ বড় কান্নাই কাঁদল। কিন্তু সুখে দুঃখে শুধু কান্না শুধু আর্ত্তের মতো চেয়ে থাকা যার ভাব প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন সে যে কাঁদবে বেশী কথা নয়। দু দিন সে উঠল না, রাঁধল না, খেল না। মাঝে মাঝে শুকিয়ে ওঠা স্তনটা শিশুর মুখে গুঁজে দিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করে। অনাহারের অবসাদ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে তাও যেন বুঝতে পারে না। গোকুলের মুখ মনে পড়ে আর সব অন্ধকার হয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু একসময়ে তাকে উঠতে হল। দুঃখে পাথর হয়ে যেতে যেতে তাকে নড়ে উঠতে হল। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে বলেই সে আহার্য্যের সন্ধানে রান্না ঘরের দরজায় যেয়ে দাঁড়াল। এই প্রথম মনে হল, গোকুল নেই, কে তাকে বলবে রান্না করতে যেতে, কখন কি করতে হবে কেই বা তাকে বলবে। আবার কান্না পেল তার, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো ভয়ে নিচুস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দুঃখের গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন সে আঁ আঁ করেও কাঁদে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে রোজই সে আশা করে থাকে গোকুলের রাগ পড়লে ফিরবে সে। এক একদিন বর্ষা নামে। গোকুলের বিছানায় মাথা কুটে সেদিন সে কাঁদে, বর্ষার শব্দের মধ্যে তার বোবা কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেছে এমন দু একজন তার কান্না শুনে রাম নাম করতে করতে তাড়াতাড়ি হেঁটে গোকুলের চৌহদ্দি পার হয়ে যায়।

তারা বলাবলি করে কোন কোনদিন—গোকুলের বাঁদীটা বুঝি। গোকুল গেছে বিয়ে করতে শুনলাম। তা হবে। বেচারার বড় কষ্ট একা একা ভয় ভয় করে বোধ হয়।

গোকুলের নাম শুনে তাঁতী বৌ উঠে যায় ভালো করে শুনবার জন্য, শুনতে পায় গোকুল গেছে বিয়ে করতে।

সারাদিন সারারাত ধরে কথা কয়টি মনের মধ্যে, মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে; গোকুল গেছে বিয়ে করতে' একবার শেষ হবা মাত্র আবার 'গোকুল গেছে……' আরম্ভ হয়ে যায়। দু হাতে রগ্ চেপে চোখ বন্ধ করে কোন রকমে এই কথার আবর্ত্তন সে থামাতে পারে না।

রাতের উঠোনে তাকাতে তার ভয় করে, তবু খুট করে শব্দ হ'লে সে উঠে যায় দরজার কাছে, গোকুল একবার একটু কথা বললে সে দরজা খুলে দেবে। এক একদিন ঘুম ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হ'য়ে ওঠে, মাঝরাতে উঠে বসে বুকের ভেতরটা তার ধক্ ক'রে ওঠে, যদি তাঁতী ফিরে যেয়ে থাকে তাকে না পেয়ে। সেদিন থেকে সে দরজা খুলে রাখল। বিছানায় শুয়ে সারা রাত ঘুমোতে পারল না, ঘামে ভিজে যেতে লাগল সারা দেহ। দরজা-বন্ধ ঘরে গোকুলের পাশে শুয়েও যার ভয় যায় না, সে আজ দরজা খুলে রেখেছে সারা রাত ধরে।

এক একদিন সন্ধ্যা বেলায় গা ধুয়ে সে গোকুলের দেয়া ভালো শাড়ীগুলি বের করে পরে। কপালে টিপ থাকে, বিনুনি করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয় চুল (খোঁপা বাঁধে না, গোকুল খোঁপা বাঁধা পছন্দ করে না) তারপরে বারান্দায় যেয়ে বসে থাকে। গোকুল হাটে যাবার সময়ে এই করতে বলে যেত তাকে। সারাদিনই কাজ করতে করতে থেমে যেয়ে ভাবে গোকুল কোন কাজটা কি রকমে করতে বলেছিল, ঠিক তাই করে সে। এক এক সময়ে অবাক হ'য়ে যায় সে ঠিক কাজগুলি সে কি ক'রে করে। এমন বুদ্ধি তার কোথা থেকে হ'ল। মনে মনে ঠিক করে কি ক'রে কথা বলতে হয় স্বামীর সাথে তাও সে শিখে নেবে কোন নোতুন বউকে ধরে। গোকুল এলে বলবে তাকে।

কোন কোন দিন সে ভাবে শুয়ে শুয়ে, যদি কোন দেবতা বর দিত তাকে, তার মতো চেহারা আর গোকুলের মতো স্বাস্থ্য। এমন কি হয় না, কোন গুণী এসে দু হাতে তুলে একটা সন্তান তাকে দিয়ে যায়, একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটা ছেলে। দু হাত ভ'রে নেয় সে তা হ'লে। বুকের মধ্যে টনটন্ করে ওঠে তার, ঘুমন্ত রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়। আছে বৈ কি এমন গুণী, দয়াসাগর তারা। কিন্তু সে যদি ফকিরের মতো হয়। কথাটা মনে হতেই তাঁতী বৌ আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, দম বন্ধ হ'য়ে আসে, গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে। ছেলেটাকে ধুম করে বিছানায় ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মরেছে মরেছে বেশ হ'য়েছে। বাঘের কামড়ে গলা ফুটো হ'য়ে মরেছে। তাঁতী বৌএর চোখ দুটি চক্ চক্ ক'রে ওঠে। গলা ফুটো ক'রে দিলে যে তপ্ত রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে তার স্বাদে বমিও আসে আনন্দও হয়। রক্তে মুখ ভরে উঠল ভেবে—থু থু ক'রে উঠল তাঁতী বৌ। না দরকার নেই, কোন গুণীর কাছে সে আর বর চায় না। শুধু গোকুল ফিরে

আসুক, বৌ নিয়ে ফিরুক, সেই নোতুন বৌটার ছেলে মেয়ে হোক, তাদের মানুষ করবে তাঁতী বৌ। তবু একদিন স্বপ্নে দেখে একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটা ছেলে।

একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গোকুলের প্রত্যাশায় বসে থেকে থেকে মাঝ রাতে শেষে ঘুমে গা এলিয়ে এসেছে, বসে বসে ঢুলছে তাঁতী বৌ, এমন সময়ে উঠোনে পায়ের শব্দ হ'ল যেন। তাঁতী বৌএর মনে হ'ল বলে—এসো, আমি তোমার জন্য জেগে আছি দেখ, আজই শুধু নয়, বহুরাত্রি এমন জেগে আছি। পাছে ফিরে যাও বলে প্রদীপ জেলে রেখেছি, দরজা খুলে রেখেছি। কিন্তু কথা তার বলা হ'ল না; হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে দম বন্ধ করে দিল যেন। মনে হ'ল কাঁদতে না পারলে সে মরে যাবে তবু কাঁদলে না, দেখবে সে প্রথম মুহূর্ত্তে তার তাঁতীকে, পোড়া চোখ বারবার করে মুছতে লাগল। কিন্তু পায়ের শব্দ যখন একেবারে তার পাশে এসে থামল তখন মুখ তুলতে সে পারল না। একটা সুন্দর সুবাস আসছে; তাঁতী বৌ ভাবলে, সুখে ছিল গোকুল তাই। কিন্তু মান সে করবে না, মান করা তার সাজে না, কি আছে তার গরবী হবার।

মুখ তুলে তাঁতী বৌ বিস্ময়ে ভয়ে অভিনবত্বে দিশেহারা হ'য়ে গেল। স্বপ্নের মতো তাঁতী বৌ ভাবল—তুমি দেবতা, তুমি এলে; আমার দুঃখ, তাঁতীর দুঃখ, ঐ ছেলেটার দুঃখ সব এক হ'য়ে তোমাকে টেনে এনেছে। তাই এত সুবাস। তাই এত সুন্দর তুমি। তোমার মুখের দিকে আমি চাইব না, দেবতার মুখের দিকে চাইতে নেই। আমি বলতে পারি না, তুমি তো আমার মনের কথা জান।

তাঁতী বৌ হাঁপাতে লাগল, অনভ্যস্ত কথা বলবার পরিশ্রমে তার ফুস্ ফুস্ ভারি হ'য়ে এল।

—শোন্ তাঁতী বৌ, গোকুল ফিরবে না। তুই এত দুঃখ করবি কেন, আর গোকুল যদি ফেরেই কখন যা দিয়ে তোকে সে কিনেছে তার চাইতে দশগুণ আমি তাকে দিয়ে দেব। বুঝতে পেরেছিস আমার কথা। আজই নয়…। চিনিস তো আমাকে, রাজবাড়ীতে দেখেছিস তো আমাকে।

মূর্ত্তিটি সাপ হ'য়ে কামড়ালেও তাঁতী বৌ এতটা শিউরে উঠতনা। পলকে দূরে সরে যেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পৃথিবী তখনও পায়ের তলে দুলছে। তীব্র রুক্ষ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রাগ ক'রে কি বলতে গেল সে, মুখ দিয়ে বের'ল—ছি ছি তোমাকে দেবতা বলেছি, ছি ছি ছি।

—শোন তাঁতীবৌ একবার ভেবে দেখ। গোকুল যতই ভালো হ'ক সে ফিরবেনা। আর ফিরলে তোর বদলে সে যতটাকা চায়।

—ছি ছি ছি ছি।

আগন্তুক কখন চলে গেল, কে তাকে তাড়িয়ে দিল, এসব কিছু মনে নেই তাঁতী বৌ এর। নিজের কানেই সে এক সময়ে শুনতে পেল অব্যক্ত ঘৃণার সেই -ছি ছি। প্রথম সাধারণ বোধ ফিরে আসতেই ভয়ের একটা আর্ত্তশব্দ ক'রে উঠে যেয়ে দরজার সবগুলি খিল এঁটে দিল সে।

এমনি একা থাকা, এমনি বিপদ এর বোধ করি প্রয়োজন ছিল। এমন বেহুঁস হয়ে এমন কোমল প্রাণ নিয়ে যারা চলে তারা না পারে নিজে বাঁচতে না পারে অন্যকে প্রাণ দিতে। ভয় যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ ভয় এমন আড়ষ্ট করে রাখে যে নিজেকে পিঁপড়ের মতো তুচ্ছ মনে হয়, ভয় এসে চলে গেলে একটু দম্ভ হয়, অন্তত আত্মবিশ্বাস আসে। দোকানির তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে তাঁতী বৌ জেনেছিল তার এবং তার মতোদের কাজ হ'চ্ছে শুধু কোমল হওয়া শুধু মধুর হওয়া, চোখে শুধু মায়া রচনা করা, ছায়ার মতো নিবিড় করা দৃষ্টিকে। আজ সে সহসা বুঝল কঠোর হ'তে হয়, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে হয়।

প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁতী বৌকে তার উঠোনের পৃথিবীর বাইরে পা দিতে হ'য়েছে। আহার্য্যের চেষ্টায় এর তার সাথে কথা বলতে হয়, মিশতে হয়। হঠাৎ কারো কথা শুনলে তার প্রাণ শুদ্ধ আড়ষ্ট হ'য়ে যেত এখন সে হাটে যায়, অপরিচিত দোকানির সাথে কেনা বেচা নিয়ে কথা কাটাকাটি করে। পয়সা উপার্জ্জনের ফিকির সে নিজেই বার করছে মাথা দিয়ে। জোলারা আসে তার কাটা সুতো নিতে। পাকা কারবারির মতো সে বাকি রাখে না, কথার খেলাপ করে না।

মাঝে মাঝে সমবয়সী মেয়েদের সাথে গোকুলের কথা নিয়েও আলাপ করে। মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এরকম অবস্থা হ'লে তাদের স্বামীরা কি করত। কেউ বলে—ফিরবে একদিন, এই রূপ ফেলে কেউ থাকতে পারে। সেদিন রাত্রিতে গোকুলের দেয়া মসলিন পরে আরসি ধরে নিজেকে দেখে নিজের অবাক লাগে—তা কি হয়, এর জন্য কখনো কেউ ফেরে যদি এতদিনের এত কান্না তাকে ফেরাতে না পেরে থাকে। আবার কেউ বলে—দেখ কোথায় আবার বিয়ে সাদী করেছে। সেদিন রাত্রিতে আরসির সামনে বসে ভাবে,—কিছুইতো বদলায় নি, যেদিন প্রথম গোকুল তাকে বলেছিল --তোকে না হ'লে আমার চলবে না সেদিনকার মতোই তো সব আছে।

সে ভাবে—এ সবের জন্য দায়ী সে, গোকুলকে সে নিজে ঠেলে বার করেছে বাড়ী থেকে। অভিমান করে বলেছিল তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু সে তো তখন বুঝত না স্বামী আর কাউকে বিয়ে করলে কত কষ্ট। হাসিও পায় কখনো—কি বোকা ছিল সে ; গোকুল কথা বলতে যতো বলত, ততো সে বোকা হয়ে যেত। কি বলতে হয় কি করে জানবে সে। এখন যখন মেয়েরা বলে, রাত্রিতে কে কি বলেছে স্বামীকে তখন তাঁতী বৌ শোনে আর

অবাক হয়ে যায়—এদের চেয়ে অনেক মিষ্টি কথাই তো গোকুলকে বলতে পারত, গোকুলের কাছে গেলে মনেও হত।

পাড়ার সব বাড়ীতে যায় সে, সব বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলিকে সে আদর করে। তার ছেলেটা এখন হামা দিতে শিখেছে; হ'ক অনেক দেরী তবু শিখেছে তো। পাড়ার সব ছেলেমেয়েই এমন কিছু ফুলের মতো সুন্দর নয়, সবলও নয় সবগুলি। গোকুল এলে এসব সে বুঝিয়ে বলবে, গোকুল তো বোকা নয়, সে বুঝবে। আছে সুন্দর ছেলেও আছে, ফুলের মতো সুন্দর ছেলেও একটা দুটো আছে। এই তো গাজনের মেলা থেকে সন্ধ্যার একটু আগে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে ফিরতে ফিরতে ছোট দুটি ছেলেকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কার ছেলে গো? নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেও সাধ মেটে না তার। ঠিক এমনি চেয়েছিল সে আর গোকুল। এগিয়ে যেয়ে ছেলেদের সাথের ঝিটিকে জিজ্ঞাসাও করেছিল সে—কিন্তু নাম শুনবার পর তার মনে হল যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে, রক্তহীন মুখে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

সেদিনকার রাত্রির কথা মনে পড়ল, সেই জ্বলন্ত ধক্‌ধকে চোখ, ঠিক তেমনি চোখ ছেলে দুটিরও। কিন্তু সত্য দেবশিশুর মতো ছেলে দুটি।

সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলল—কি যেন লাগল পায়ে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য মানুষের মন। মনের মধ্যে একটা ক্লেদাক্ত আবিল সম্ভাবনা কি করে বাসা বাঁধল কখন; তাকে অস্বীকার করে তাড়ানোর জন্য তাঁতী বৌ সারা পথ সারা মন দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল—চাই না, চাই না, ছি ছি ছি। বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করল।

একদিন গোকুল ফিরে এল। তাঁতী বৌ বসে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এমন সময়ে গোকুল এসে দাঁড়াল পিঠের কাছে। গোকুল সারা পথ পুনর্মিলনের এই সময়টুকুর কথা ভেবে আন্দাজ করতে পারছিল না কি বলবে তাঁতী বৌ, তারপরে কি করবে সে। তাঁতী বৌ উঠে দাঁড়াল, কাঁদল না, বোকার মতো চেয়ে থাকল না, একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলল—বস, হাত ধুয়ে আসি।

হাত ধুয়ে আসতে একটু দেরী হল; কুয়োর পারে দাঁড়িয়ে হয়তো বা একটু কেঁদেছিল, অনেক দিনের অভ্যাস তো। মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে পাখা নিয়ে তাঁতীর পাশে বসে বাতাস করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় ছিলে এতদিন, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? খাওয়া দাওয়া ভালো হত না?

কিছুক্ষণ পরে বলল—ভালো মন আমার, এতদিন পরে এলে প্রণাম করতেও ভুলে গেছি।

নিচু হয়ে তাঁতীর ধুলোভরা পা বুকের পরে চেপে ধরল।

গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অন্ত খুঁজে পায় না।

তাঁতীকে সেধে সেধে খাইয়ে ঘরে নিয়ে এসে বসল যেন তার বাড়ীতে গোকুল অতিথি, এত আদর যত্ন। এক সময়ে হাসতে হাসতে বললে তাঁতীবৌ,—আমারই জিত হল দেখ। কই পারল ডাকিনিরা ধরে রাখতে আমার তাঁতীকে। তাঁতী মুখ নিচু করে থাকে। দুহাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে তাঁতীবৌ যেমন গোকুল এককালে তার ধরত।

কাজ করতে করতে ফিরে এসে তাঁতীবৌ বলে—কিন্তু ওরা কি লোক গো?

—কারা।

—তোমার সেই ডাকিনিরা যারা তোমাকে ধরে রেখেছিল, তারা কি শুধু ছলাই জানে, পুরুষটাকে কি খেতেও দিতে নেই।

রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে দেরী করে তাঁতীবৌ ঘরে এল। গোকুল দেখে অবাক—মসলিন পরেছে তাঁতীবৌ, খয়েরের টিপ কপালে, চোখে কাজল। অথচ এ সবের জন্য অনুনয় বিনয় করে করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁতী রাগারাগি করেছে এককালে। তাঁতীবৌ মুচকি হেসে গোকুলের কোলে যেয়ে বসল, নিজে সেধে মুখের পরে মুখ নামিয়ে আনল।

—এ কি গা পুরে যাচ্ছে যেন, জ্বর হয়েছে তোমার?

—হয়।

—রোজ হয় জ্বর? কি সর্বনাশ! কি করে হল।

—জানিনে, রোজই হয়, বড় কষ্ট হয়রে।

তাঁতীবৌ লজ্জায় যেন মরে গেল, লজ্জা তার সারা গায়ে পুড়ে উঠল। মসলিন ছেড়ে ঠেঁটি পরে সে ফিরে এল বিছানায়, বলল—ছি আমাকে বলোনি কেন?

তাঁতীকে নিজের পাশে শুইয়ে বলল—কষ্ট হচ্ছে মাথায়?

—হ্যাঁ।

তাঁতীবৌ ভেবে পায় না কি করবে। বুকের মধ্যে তাঁতীর মাথাটা টেনে এনে বলে—চোখ বুঁজে থাক ঘুমিয়ে পড়বি।

—আমি কি বাঁচব না, বৌ,—গোকুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ছোট ছেলের মতো তাঁতীকে টেনে নিয়ে তাঁতীবৌ বলে—ষাট্, ষাট্।

একটু হাসি পায় গোকুলের, বলে—তুই যেন মা হলি।

—দূর পাগল।

—আমি সেরে উঠব। তোর কাছে থাকলে সেরে উঠব।

তাঁতীবৌ গোকুলকে নোতুন করে দেখছে যেন, কোথায় গেল তার রাগ। হুকুম করা দূরের কথা নড়তে চড়তে বৌ না হলে তার চলে না।

কবরেজের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে ওষুধ এনে দেয় তাঁতীবৌ, সারাদিন চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁতীকে। অবোধ শিশুর মতো আকড়ে ধরে রাখে বুকের কাছে। ষাট বালাই! এক একদিন যখন ঘুম আসে না তাঁতীর, ছড়া কাটে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, গল্প করে। কিন্তু জ্বর তবু কমল না, সন্ধ্যা হতেই জ্বর আসে। হাড্ডি সার হয়ে গেছে তাঁতী। তাঁতীবৌ ভেবে পায় না কি করে এমন হল, কিসে সারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় তার মনের দুঃখে এমন গা পুড়ে যায়। গত দিনগুলির কথা মনে হয়। তাঁতীর কোন সাধই সে পূরণ করতে পারেনি। ভাবে, তাঁতী যদি নাই বাঁচে কোন সাধ তার পূরণ হবে না কোনদিন।

একদিন রাত্রিতে ঘুম ভেঙে তাঁতী দেখল বৌ কাঁদছে।

—কাঁদছিস তুই?

—দূর, কই না, কাঁদব কেন?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাঁতীবৌ বলে—ঘুমা লক্ষীটি, আমি হাত বুলিয়ে দি।

—কত তো দিলি।

—সে কি বেশী কথা নাকি? তোর তো কোন সাধই মিটল না আমাকে দিয়ে।

—সব মিটেছে।

—তুই আমাকে ভালোবাসিস, দয়া করিস তাই। একটা ছেলে চেয়েছিলি, তাও না।

একটু নীরবতার ফাঁকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, কিন্তু কার নিশ্বাস দুজনের কেউ বুঝতে পারল না।

এরপরে কি যেন হ'ল তাঁতীবৌএর, মাঝে মাঝেই মনে হয় সে গোকুলের আশা পূরণ করতে পারেনি। ভাবে এর চাইতে অনেক ভালো হত যদি গোকুল আগেকার মতো গঞ্জনা দিত তাকে। গোকুলের প্রভাহীন চোখ দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে, চোখের চারিদিকের ঐ কালো ও যেন গোকুলের মনের ছাপ, সেখানে আশা নেই, শুধু অন্ধকার, শুধু একটা মূক অভিযোগ। সংসার করার সামান্য সাধও মেটেনি। গোকুল মুখ ফুটেতো বলেই না, জিজ্ঞাসা করলেও অস্বীকার করে পাছে তার মনে ব্যথা লাগে। গোকুল এত ভালো বলেই না এত কষ্ট হয় তার জন্য তাঁতীবৌএর।

চার পাঁচদিন খুব বেশী জ্বর হবার পর সেদিন রাত্রিতে গোকুলের জ্বর কম।

—আজ ঘুমাতে পারব, তুইও ঘুমিয়ে নে একটু—এই বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁতী বৌএর ঘুম এল না।

বাইরে ভাদ্র মাসের আকাশ থেকে টুপ্ টুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে বাতাসের সাথে ঝর ঝর করেও পড়ছে। ও পাশের বিছানায় ছেলেটা কেঁদে উঠল। গোকুলের মুঠি থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁতী বৌ উঠে দাঁড়াল। ছেলেটাকে চাপড়ে থামিয়ে খোলা জানালার কাছে যেয়ে দাঁড়াল সে। কেন তার কোলে এলনা একটা সুস্থ সবল ছেলে। গাজনতলার হাটে দেখা ছেলেদের মতো একটা পেলে গোকুল হয়তো বাঁচবার জোর পেত। মনে হল তার অন্ধকারকে জিজ্ঞাসা করে—এত নিবিড় করে সে গোকুলকে সুখী করতে চায় তবু কেন পারবে না সে। তাঁবুর অন্ধকারে গোকুলকে দেখবার প্রথম দিন থেকে সবগুলি দিনের ছবি একটার পর একটা যেন পর্দ্দার গায়ে ফুটে উঠতে থাকে। সেই বাদলা রাত্রি যেদিন ঝড়ের অন্ধকারের প্রাণঘাতী ভয় থেকে গোকুল তাকে আশ্রয় দিয়েছিল; তারপর প্রথম প্রেমের অত্যদ্ভুত বাকহীন দিনগুলি। কত সাহস তার হয়েছিল যেদিন অন্ধকারের আড়ালে ফকিরের কাছে গিয়েছিল মন্তর আনতে, সে কি তার সাহস, সে তো গোকুলকে সুখী করবার ইচ্ছা, তার দয়ার প্রতিদান দেবার প্রাণপণ প্রয়াস। তারপর একদিন গোকুল চলে গেল। গোকুলের জন্য প্রতীক্ষার দিবারাত্রিগুলির কথা ভাবতে যেয়েই মনে হল তার সেই রাত্রির কথা যার স্মৃতিতে পৃথিবী ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। ছি-ছি। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষের মন: গাজনতলার হাটে দেখা দেবশিশুর মতো ছেলে দুটিকে দেখবার পর তাদের পরিচয় পাবার পর মুহূর্ত্তের জন্য যে ঘৃণ্য সম্ভাবনার কল্পনাতে শিউরে উঠেছিল তার মন, আজও তেমনি সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি তাকে দিশেহারা করে দিল। ছি ছি ছি, তবু তেমনি ফুটে উঠতে লাগল কল্পনাটা।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল। অন্ধকারের বুকে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কি এমন করে চোখে দেখবার মতো হয়ে ফুটে ওঠে। যেন ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির কিছুটা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, বাকিটুকু ঘটবেই। ভবিষ্যতের তাঁতী বৌ অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠেছে, তার ছায়াটুকু মাত্র যেন জানলার এ পারের এই তাঁতী বৌ।

জানালা থেকে ফিরে এসে তাঁতীবৌ ঠেঁটি পালটে মসলিন পরল; একবার সে দেখবার চেষ্টা করল ভবিষ্যতের ঐ আধচেনা মেয়েটার কপালে টিপ আছে কিনা, কাজল আছে কিনা চোখে। দেখা গেল না যেন, যেটুকু চোখে পড়ল তার মধ্যে কোমলতা নেই, স্নিগ্ধতা নেই; রুক্ষ ভাস্বর রিক্ততায় সে যেন জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল তাঁতী বৌ। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় ঝর্‌ঝর্ ক'রে উঠল উঠোনের পারের আমগাছটার মধ্যে। তাঁতী বৌ উঠোন পার হল, সদর পার হ'ল, সদরের দরজা ঠেলে বন্ধ করে দাঁড়াল পথের পারে। অন্ধকারে সামনে পেছনে একাকার হয়ে গেছে। সামনে তবু নজর চলে। পেছনের যে দরজাটা এইমাত্র সে বন্ধ করে দিল

হাতড়েও সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঢ় অন্ধকারে আর সব অনুভূতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ভয়ে শুধু উদরের অন্ত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বারে বারে।

জমিদার বাড়ীর বাগান পার হয়ে এল তাঁতী বৌ। লোকের মুখে শুনে শুনে সেও আর সকলের মতো জানে কোথায় সে ঘরটি। প্রতিবার পা ফেলতে রিন্ রিন্ করে উঠছে পায়ের গিরাগুলি। রুদ্ধ দরজার ফাঁকে একটু আলো পড়ল চোখে। দরজা ধরে দম নিতে লাগল তাঁতী বৌ। কি করে দরজা খুলে গেল তাঁতী বৌএর মনে নেই। তার একবার মনে হয়েছিল কেঁদে ফেলবে সে। প্রবল প্রতিরোধ হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে উঠতে না দিয়ে ঘরের মাঝখানে যেয়ে দাঁড়াল সে।

বর্ষণক্লান্ত আকাশে ভোরের পাখী ডেকে উঠবার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনও প্রদীপটি জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি এখুনি জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ুগ্রন্থিগুলিকে অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানা দেখবার লোভ হল তার। ঘুম ভালোই হচ্ছে গোকুলের। কয়েক বিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তাঁতী বৌ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলে সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলের বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে দেখতে তাঁতী বৌ ঘুমিয়ে পড়ল।

মানবতার বর্ত্তমান সঙ্কটে

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস্‌-সি,

কী কর্ত্তব্য?

এ প্রশ্ন আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচ্য বিষয়। এখানে শুধু ভারতের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা বলছি না— সমগ্র জগতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে, যে অনিশ্চয়তার থমথমে ভাব বিরাজ করছে, তারই কারণ এবং করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসেছি।

মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে আমরা দুটি বিশ্ব যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলাম, পুরাণ-বর্ণিত পাশুপত

অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক পরমাণু-বোমার উদ্ভাবন ও পরিণাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, মানুষের পাশব-বৃত্তির জাগ্রত রূপ দেখলাম।

পৃথিবীতে দ্রুত দারুণ পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জীবনের ধারা এমনভাবে বদলে গেছে যে তার গুরুত্ব এবং গতিবেগ আমাদের বিস্মিত বিমূঢ় করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ধারাবাহিক ঘটনা-স্রোতে। পরিবর্ত্তনের যে ঝড় আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আমরা এখন সবেমাত্র তার শক্তি ও তীব্রতা বুঝতে সুরু করেছি।

এ পরিবর্ত্তন কোন বহির্জগৎ থেকে আসে নি, অকস্মাৎ কোন নীহারিকার সঙ্গে আমাদের গ্রহের সংঘর্ষ ঘটে নি, কোন ভীষণ রকমের অগ্ন্যুৎপাত বা মারাত্মক রকমের সংক্রামক ব্যাধিও দেখা দেয় নি। এ পরিবর্ত্তন এসেছে মানুষের নিজেদেরই ভিতর থেকে। জনকয়েক লোক পরিণাম ও পরিণতির কথা চিন্তা না করে গুটিকয়েক আবিষ্কার করেছে, আর সেই আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ফলে সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমে পরিবর্ত্তন হতে থাকে, তারপরে আমরা দেখতে পাই কী হচ্ছে, আর তারও পরে অর্থাৎ পরিশেষে আমরা বুঝতে পারি তার ফলাফল।

বিজ্ঞানের কল্যাণে অথবা অভিশাপে annihilation of space বা দূরত্বের অবলোপ ঘটায় মানুষের সামাজিক সংগঠন যে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কতখানি যে তার প্রভাব তা আমরা সবেমাত্র বুঝতে সুরু করেছি এই বিংশশতাব্দীর সূচনায়। রেল, ষ্টিমার এরোপ্লেন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার-যন্ত্রের উদ্ভাবনে সমগ্র পৃথিবী আজ একাকার হয়ে গেছে। কোন স্থান আজ অনধিগম্য নয়, কোন দেশ আজ অনাবিষ্কৃত নয়, কোন জাতি, কোন ঐতিহ্য কোন কৃষ্টি আজ অপঠিত নয়।

তাহলে এই জ্ঞানই কি আমাদের কাল হল বুঝতে হবে? তাহলে কি মাসারিকের সঙ্গে আমারও সুর মিলিয়ে বলব—"knowledge offers us lucidity and lofty light, but it makes us unhappy"?

কিন্তু তা তো নয়। আসল কথা হল, দূরত্বের অবলোপ যে মানবজাতির জীবনেতিহাসে বিপ্লবের সূচনা করেছে সেইটেই প্রথমে উপলব্ধি করা যায় নি। মানুষ যে নিত্য নূতন পরিবেশের সম্মুখীন হচ্ছে, ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ, বৃহৎ হতে বৃহত্তর জগতের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি এতদিন আকৃষ্ট হয় নি। আমরা তাই চেষ্টাও করিনি কিভাবে এই ক্রমবর্দ্ধমান নিত্যপরিবর্ত্তনশীল পরিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক বা জীবনের সংহতি স্থাপন করতে হবে কোন্ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেখতে হবে।

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্যের মতই নূতন নূতন উদ্ভাবনগুলিকে আমাদের প্রথমটায় এক-একটি আশ্চর্য্য বলে মনে হয়েছে। পূর্ব্বেকার সাতটি আশ্চর্য্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবন

যাত্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটলেও আধুনিক কালের প্রত্যেকটি ছোট বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে দুরপনেয় প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এসম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উৎপাদন বৰ্দ্ধিত হয়েছে এবং তার গুণাবলীও হয়েছে উন্নততর। ফলে বাজার থেকে ছোটখাট উৎপাদনকারীর উচ্ছেদ করে বড় ব্যাবসাদার তাঁর Big Business ফেঁদেছেন। নূতন নূতন কলকারখানা, নূতন ধরণের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, উন্নত ধরণের নাগরিক জীবনের অভ্যুদয় ঘটেছে। দূরত্বের অবলোপ ঘটায় একদেশে খাদ্যাভাব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা অপর কোন উদ্বৃত্ত দেশ থেকে পূরণ করে নেওয়া চলে এবং তার ফলে মানুষ আজ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এ ছাড়া কয়েক বছরের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও এমন উন্নতি সাধিত হয়েছে যে মানুষ আজ সুস্থদেহে শতায়ু হবার সঙ্গত আশা করতে পারে। তবে আর সত্যযুগের বিলম্ব কি?

তবু আজ বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন যথেষ্ট নয়, কাজের অনুপাতে কর্ম্মী প্রচুর নয় অথচ বেকারের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৰ্দ্ধিত হয়ে চলেছে, দুর্ভিক্ষ হবার কথা নয় তবু পঞ্চাশের মন্বন্তরে শুধু বাংলাদেশে ত্রিশলক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণকর অবদানগুলি থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে, প্রাচুর্য্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্ত্তে দেশের নর-নারায়ণের ভাগ্যে ঘটেছে অভাব, দুঃখ ও লাঞ্ছনা।

কিন্তু কেন এমন হয়? মানুষেব সঙ্গে মানুষের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, জাতির সঙ্গে জাতির আসল সম্বন্ধটুকু আমরা আজও নির্ণয় করতে পারিনি। কেমন যেন একটা সংশয় কী যেন অনিশ্চয়তা আমাদের সহজভাবে পথ চলার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে শিল্প, রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনায় এই সংশয় ও সন্দেহ বিদ্যমান তা নয় মানুষের নিজস্ব সামাজিক, পারিবারিক এবং বিবাহিত জীবনের মধ্যেও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব নেই। সেদিন সংবাদপত্রে দেখছিলেম বিলাতে গত তিন মাসে ১৭০০ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। এ ছাড়া আত্ম-হত্যা এবং নর-হত্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আত্মবিশ্বাস যার নেই সে পরকে বিশ্বাস করবে কেমন করে।

গ্র্যামবর্গের "Wearied Souls" অথবা মাসেটের "Confession of a Child of Our Age" যিনি পড়েছেন তিনি অবিশ্বাসকেই মানুষের সকল দুঃখের আকর ও কারক বলে নির্দ্দেশ করবেন। অবিশ্বাসী গ্র্যামের ক্লিষ্ট অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করে কেঁদে বলে, এমন কি কেউ নেই যার পায়ে আমি নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করতে পারি, চোখের জলে যার পা দুটি ভিজিয়ে আমি নিজের অপমানের কাহিনী, পরাজয়ের কাহিনী, দুঃখের কাহিনী

ব্যক্ত করে হাল্কা হতে পারি, যার নিবিড় মমতাভরা উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতে পারি। মাসেটের অক্টেভের স্বীকারোক্তিও কতকটা এই রকম। উনিশ বছরের অক্টেভ তার প্রিয় সখার সঙ্গে আপনার প্রণয়িনীর অবৈধ-সংসর্গের কথা একদিন জানতে পেরে বিশ্বাসঘাতকতার বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে বন্ধুর সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে সে আহত হয়। ব্যর্থ-প্রেম, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসে জর্জ্জরিত হয়ে আত্ম বিস্মৃত হবার জন্যে অক্টেভ আকণ্ঠ মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। এই সময়ে ব্রিজিটি নামে ফুলের মত একটি মেয়ে তার দুঃখে বিগলিত হয়ে নিজেকে তার কাছে উৎসর্গ করে দেয়। অক্টেভের তখন মত্ত অবস্থা—সমগ্র নারীজাতি তার কাছে ঘৃণিত—শুধু ভোগের সামগ্রী। নিষ্পাপ ব্রিজিটি তার হাত থেকে কম নিগ্রহ ভোগ করে নি। পরিশেষে একদিন যখন অক্টেভ ব্রিজিটিকে হত্যা করবার জন্যে ছুরিকা উত্তোলন করেছে সেই সময়ে হঠাৎ তার গলার হার-সংলগ্ন ক্রুশচিহ্নটি দেখে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। অক্টেভ ব্রিজিটিকে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু তখন তার অনুতাপ সুরু হয়ে গেছে। তাই ব্রিজিটির কাছ থেকে সে দূরে চলে যায়—দূরে থেকে চোখের জলে সে নীরবে ভালবাসা নিবেদন করবে তার নবলব্ধা প্রিয়তমার উদ্দেশে।

শুধু গ্র্যাম বা অক্টেভ বলে নয়—এ হল আধুনিক কালের ব্যাধি বিশেষ—মাসারিকের ভাষায় বলা চলে, The Disease of the Century.

কিন্তু কেন এই ব্যাধি? কেন এই দুর্ব্বলতা? কেনই বা আমরা নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত ভেসে চলব নিরুদ্দেশ যাত্রায়?

আজকের প্রধান অভাব হল, এমন একটা সুস্পষ্টনীতি যার ভিত্তিতে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ রচিত বা নির্ণীত হবে, এমন কতকগুলি অবিসম্বাদী সূত্র যার প্রতিপালনে আমাদের জটীল সভ্যতার রহস্যগুলি সরল হয়ে ধরা দেবে এবং যা জীবনের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করতে পারবে।

আজকের বিজ্ঞান মানুষকে অমিত শক্তিশালী করে তুলেছে। তার সকলপ্রকার ঐহিক কল্যাণ ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানপূর্ব্বক মানুষ আজ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের এত সম্পদ সত্বেও তার পর্য্যাপ্ত নৈতিক জ্ঞানের অভাব কেন?

এ প্রশ্নের দুরকম উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

র‍্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকজনের মতে আমাদের নৈতিক প্রথাগুলি ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়তে সুরু করেছে। পূর্ব্বেকার প্রত্যেকটি নৈতিক আদর্শ যার ব্যবহার আজকের অতি লাভজনিত মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করে দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধে সাহায্য করতে পারত অথবা ত্যাগ ও সংযমের যে আদর্শ সাম্প্রদায়িকতার ও আত্ম-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সক্ষম

হত সে সমস্ত আজ নিরর্থক বলে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং বিজ্ঞানের উপর সমস্ত পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার অর্থই আমরা বিস্মৃত হয়েছি—অধিকাংশ সময়েই আমরা অল্প-বিস্তর ধূর্ত্ত পশুর ন্যায় আচরণ করে থাকি। "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না" এ ধরণের মনোবৃত্তি আজ একমাত্র মহাত্মাজী ছাড়া আর কজনের মধ্যে অনুসন্ধান করা যায় ?

মহামতি এইচ, জি, ওয়েলস্‌ কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। নীতি বা নৈতিকতা অর্থাৎ মর‍্যাল বা মর‍্যালিটির অর্থ আমরা কী বুঝি, কতখানি বুঝি ? নীতির অর্থ হল আচার এবং প্রথা, নৈতিকতা হল জীবনের আচরণ—যা নিয়ে আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সামাজিকতা গড়ে ওঠে। একশো বছর আগেকার নীতি আজকের পরিবর্ত্তিত যুগে শুধু যে অচল তাই নয় ক্ষতিকরও প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ভেবে পাই না কিভাবে পুরাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করতে হবে এবং কিভাবেই বা পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত নীতির নূতন ধারণাগুলি প্রবর্ত্তিত করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, আগেকার দিনে অনেকগুলি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। জীবনের মান তখন যদিও আজকের মত এত উন্নত ছিল না তবু তা ছিল শান্ত নিরাপদ এবং স্থিতিশীল। ছোটবেলা থেকেই দেশবাসীদের রাজভক্তি, আইনানুরক্তি ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হত এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলে নানারূপ শাস্তি ও শাসনের ব্যবস্থা করা হত। এইভাবে নিজ নিজ রাষ্ট্রের সামাজিক জীবন সুসংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশের গৌরবময় ইতিহাস জানতে হত এবং স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণ বলে শ্রদ্ধা করা হত।

আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবধান-প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে দূরত্বের অবলোপে। ফলে যাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রা-প্রণালী এতদিন পৃথক ছিল তারা একে অপরের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ সুখ-সুবিধা পাবার জন্যে একসঙ্গে ভীড় করে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিয়েছে। দেশের বাণিজ্য আজ শুধু আপন রাষ্ট্রের মধ্যে নিবদ্ধ নয়—পৃথিবী ব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। ইংরাজবণিক এদেশে প্রথমে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ক্রমে লোভ তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। কোথায় কতদূরে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে রয়েছে ছোট্ট একটি দ্বীপ, তারই শ্বেত অধিবাসীদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রতিনিবৃত্তি করতে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী আজ দুশো বছর ধরে অর্দ্ধাহারে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছে। এইভাবে সবাই শিখেছে বিদেশীকে ঘৃণা করতে—সকলেরই মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

এর পরে আসে যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ আজ শুধু দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে না, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক সকল দেশই ক্রমে যুদ্ধজালে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

রাজনীতি বিশারদগণের মতে আজ আবার একটা বিশ্ব-যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। মানবতার এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। রাজনীতিকগণ হয়ত এই বলে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন যে "moral progress has not kept pace with material advance," আমরা কিন্তু এত সহজে নিবৃত্ত হতে পারি না। Moral progress বা নৈতিক অগ্রগতি বলতে তো উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গীকেই বোঝায়। আর তা আমাদের আয়ত্ত করতেই হবে।

পূর্ব্বেই বলেছি শুধু রাজনৈতিক জীবন-প্রণালীতে গলদ রয়ে গেছে তা নয়, আমাদের খাওয়া-পরা আচার-ব্যবহার এবং চাল-চলনের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে তা আজকের নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন করে সংস্কৃত করে নিতে হবে। আমাদের আয়ত্তাধীনে আছে বিরাট শক্তি—আমরা আজ এক নূতন পরমাণু-যুগের সৃষ্টি করেছি—কিন্তু আমরা তার উপযুক্ত ব্যবহার জানি না—আমরা জানি না তার কতখানি কিভাবে খরচ করব অথবা আরো সঞ্চয় করতে থাকব। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এবং লাভ সঞ্চয়ের জন্যে বহু অর্থব্যয়ে বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হল। ইতিমধ্যে ক্রয় করবার ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেতার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। ফলে আর্থিক যন্ত্রটি কঁ্যাচকোঁচ শব্দ করে থেমে যাবার উপক্রম করছে—আর এর থেমে যাওয়ার অর্থ হল বিশ্বব্যাপী অভাব এবং অনশন। কিছুতেই একে থামতে দেওয়া হবে না—ঢেলে সাজিয়ে আবার নূতন করে চালু করতে হবে।

কিন্তু এই ঢেলে সাজানোর ব্যাপারটা যে ঠিক কি রকম তা আমরা আজও কেউ বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে তা না করলে ধ্বংস ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই। যাদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব তারা সংশয়াকুল চিত্তে এই অনিশ্চয়তাভরা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের অতিক্রান্তির জন্যে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আজ এমন দিন এসেছে যে সমস্ত সংশয় দূরে সরিয়ে রেখে সকল সংস্কার-বিমুক্ত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এমন এক নীতির উদ্ভাবন করতে হবে যাতে পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে এক অখণ্ড পৃথিবী শতদলে বিকশিত হয়ে ওঠে। ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি যার স্বপ্ন দেখেছেন, জওহরলাল সেদিন দিল্লীতে সূচনায় শুধু এশিয়াবাসীদের নিয়ে যে সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলেন, তারই মধ্যে আজকের কর্ত্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। John Dewey-র ভাষাতেই বলি, আজকের কর্ত্তব্য হল "the task of transforming this great new society into the great world cummunity".

স্বর্ণ

প্রবোধকুমার সান্যাল

আমাদের বাংলোটি ঠিক যে-অঞ্চলে দাঁড়িয়ে সেটি বাঙ্গলা ও বিহারের সংযোগস্থলে। আমাদের বাগানের পূবদিকে যে মোটরপথ, সেই পথটি এঁকে বেঁকে চ'লে গিয়েছে রামপুরহাট থেকে দুমকার দিকে। কোন কোন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাঙ্গাবৌকে নিয়ে আমাকে দুমকায় যেতে হয়,—সেখানে ওঁর পিসতুতো বোন আদুরীর শ্বশুরবাড়ী।

একদল মহুয়া আর কেঁদগাছের জটলার মাঝখানে এই বাংলোটি সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। এদিকটা খুব নিরিবিলি। শহর থেকে খানিকটা হেঁটে আসতে হয় ব'লেই বন্ধুবান্ধবের সমাগম সম্ভবত কিছু কম। তা ছাড়া, আর একটা কথা, এ বাড়ীতে ছেলেপুলে নেই ব'লেই রাঙ্গাবৌয়ের পক্ষে এই নির্জনতাটা যেন বেশীরকম বুকচাপা। ফলে, বাংলোর গায়ে বড় সড়কটা ধ'রে যাত্রীপূর্ণ মোটরবাসখানা যখন হু হু শব্দে চ'লে যায়, আমরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠি। কান পেতে থাকি, যদি কেউ গাড়ী থেকে নামে, যদি কোনো পরিচিত মানুষের গলার সাড়া পাই। কিন্তু গাড়ী কোনদিনই থামেনা, কারো সাড়াই পাইনে—মোটরবাস হু হু শব্দে ছুটতে ছুটতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এমনি ভাবেই থেকে এসেছি আমরা দুজন,—নিতান্তই দুজন। আমরা দুইয়ে মিলে এক, এবং একাগ্র, এবং অভিন্ন। দুইটি শব্দ মিলিয়ে যেমন একটি বাক্য, দুইটি কলিতে যেমন একটি পরিপূর্ণ নিটোল সঙ্গীত। জীবনের কোটরে আমরা দুট পাখী একত্র বাসা বেঁধে নিশ্চিন্ত আনন্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

সহসা একদিন আমাদের চমক ভাঙ্গে।

একখানা মোটর বাস আমাদের বাগানের কাছাকাছি এসে সেদিন যেন হাঁসফাঁস ক'রে থামলো। চকিতে রাঙ্গাবৌ কেমন একটা অব্যক্ত কণ্ঠস্বরে কি যেন ব'লে থেমে গেল। আমার চেতনাটা সহসা যেন ক্ষুরধার উদগ্র হয়ে কান পেতে রইলো। আমাদের নিঃসঙ্গ জীবন সঙ্গলাভের জন্য আতুর।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, খুটিয়া?

মালী সাড়া দিল না।—

সেটা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকের কোন একটা তারিখ। শাল-শিশু-মহুয়া থেকে অবিশ্রান্ত শুকনো পাতা ঝ'রে চলেছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আমাদের বাগানের কাঁকর পাথরের পথে ঝরাপাতা মাড়িয়ে কা'রা যেন সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। রাঙ্গা-বৌয়ের পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলুম। এবং বেরিয়ে এসে সামনেই যে-মেয়েটিকে দেখলুম, তা'কে দেখে আমরা দুজনেই অবাক। সে আমাদের সেই স্বর্ণলতা।

রাঙ্গাবৌ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কোত্থেকে এলে ?

স্বর্ণ হাসিমুখে বললে, উড়ে !

আমি বললুম, একা এলে ?

এবার স্বর্ণ হাসলো না। চোখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, একা নয়ত কি সাতটা দারোয়ান আছে আমার ?

বলতে বলতে স্বর্ণ নিজেই আমাদের বারান্দায় উঠে এলো। তার পরণে সেই বহুকালের জানা নরুন-পেড়ে ধুতি, হাতে একগাছি ক'রে কাঁচের চুড়ি,—এবং আগে পায়ে চটি দেখা যেত, এখন একেবারেই খালি পা। হঠাৎ আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে ফস ক'রে স্বর্ণ বললে, কী দেখছো ? এখনো একাদশীতে নির্জলা উপোস ধরিনি। যেদিন এই কাঁচের চুড়ি আর নরুন-পেড়ে ধুতি ছাড়বো,—সেইদিন, তা'র আগে নয়। বলি, চমক বুঝি এখনো ভাঙলো না ?

বললুম, ভেঙেছে।

তাহলে এবার ঘরে ডেকে নাও ?

আমি আর রাঙ্গাবৌ দুজনেই হাসলুম। রাঙ্গাবৌ বললে, তুমি ত' নিজেই এসেছো !

স্বর্ণ বললে, তা হলে শোনো,—আবার যেন আঁক্ ক'রে চমকে উঠো না,—আমি একলা আসিনি।

বললুম, তবে ?

স্বর্ণ আমাদের বাগানের দিকে একবার তাকালো। পরে ডাকলো, কই রে ভিখু ? এবার বেরিয়ে আয়।

বাগানের ওধারে ছোট ছোট ঝাউ বসানো ছিল। তারই পাশ থেকে এবার একটি ফুটফুটে বালক হাসিমুখে বেরিয়ে এলো। ছেলেটির বয়স সাত আট বছরের বেশী নয়। স্বর্ণ হাসিমুখে বললে, এসো বাবা !—রাঙ্গাবৌ, ছেলেটার হাতে কিছু দাও ত' ভাই কাল সন্ধ্যে থেকে কিছু খায়নি।

রাঙ্গাবৌ নড়তে পারলো না। পলকের মধ্যে আমাদের পায়ের তলায় যে-ভূমিকম্প

ঘটে গেল, যে-দুর্ভেদ্য আবছায়ার মধ্যে সমগ্র পরিদৃশ্যমান সৌরজগৎ শূন্য হয়ে এলো—তারই ভিতর দিয়ে রাঙ্গাবৌ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। আমি সহসা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাঙ্গাবৌয়ের হাতে চাপ দিয়ে বললুম, ছেলেটিকে কিছু খেতে দাও ত?

রাঙ্গাবৌ দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। তার পথের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করলুম, এ কে, স্বর্ণ?

সহাস্যে স্বর্ণ বললে, কে বলো ত?

গলার আওয়াজ আমার প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। তবু বললুম, ছেলেটির মুখের সঙ্গে তোমার মুখ একেবারে মেলানো, তাই রাঙ্গাবৌ চমকে গেছে।

স্বর্ণ বললে, মায়ের সঙ্গে সন্তানের মুখ মিলবে বৈ কি।

এরপরে আমার যে অদম্য ও অসহ্য কৌতূহল মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল, সেটি শান্ত হোলো রাঙ্গাবৌয়ের পায়ের শব্দে। রাঙ্গাবৌ দ্রুতপদে এসে ভিখুর হাত ধরে বললে, এসো বাবা আমার সঙ্গে, কিছু খাবে চলো।

রাঙ্গাবৌ এখানে আর দাঁড়াতে চায়না কেন তা আমি জানি। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলে গেল। বছর এগারো আগে একটি দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্বর্ণ মাথার সিঁদুর মুছে কোরাধুতি পরে এলো। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে স্বর্ণ ঘরকন্না করেছিল মাত্র মাস ছয়েক; আমি নিজে বিয়ে করেছিলুম তার বছর খানেক আগে। স্বর্ণদের বাড়ী হোলো কুমিল্লায়। প্রকাশ্যে স্থানীয় মেয়েমহলে সে লেখাপড়া নিয়ে থাকতো, এবং গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য চাঁদা তুলে তাদের ব্যয়ভার বহন করতো। স্বভাবে অত্যন্ত প্রখরতা ছিল বলে মেয়েমহলে সে যথেষ্ট প্রিয় ছিল না। স্বর্ণর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় চাঁদপুরের পুলিশ আদালতে।

সেই স্বর্ণ আবার কবে বিয়ে করেছে, কবে তার সন্তান হোলো, কোথায় কি ভাবে সে ছিল এতদিন, এসব আমার কিছুই জানা নেই। রাঙ্গাবৌ মধ্যে মাঝে তার নাম করতো, আমি কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারতুম না। ওই পর্যন্তই, তারপর এতকাল চলে গেছে।

কিন্তু আজও তার বিধবার সজ্জা দেখে আমার নিজের মুখের চেহারাটাই আমার কাছে বিসদৃশ লাগছে। ভয় অথবা লজ্জা, অথবা ঘৃণা, কিম্বা বিস্ময়—ঠিক বোঝানো কঠিন। স্বর্ণর মুখে চোখে কেমন একটা বিহ্বল বেপরোয়া উন্মাদনার আভাস লক্ষ্য করা যায়, ওটার মধ্যে আমার নিজ অতীতের একটা ইসারা আছে বলেই এখন যেন ভয় পাই। কিন্তু আমাদের এই মনোবিকারের প্রতি স্বর্ণ একটুও ভ্রূক্ষেপ করতে চায়না। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে স্বর্ণ বললে, কত যে খুঁজেছি তোমাদের, কেউ কি বলতে পারে? দেশ ছেড়ে রাজ্যি ছেড়ে একেবারে জঙ্গলে এসে ঢুকেছ। তুমি নাকি এখানকার পি-ডবলু-ডির ছোটসায়েব?

শেষকালে চাকরি ? এত দেশের কাজ, এত জেল খাটাখাটি,—এবার বুঝি ভাঙা ঘর জোড়া দিতে বসেছ ?

আমি হাসছিলুম।

স্বর্ণ ব'ললে, উঃ, দেশ স্বাধীন হলে তোমাদের যে কি হোতো আমি তাই ভাবি।

বললুম, কেন ?

তোমরা ত তখন বেকার ! না বক্তৃতা, না দল নিয়ে মাতামাতি, না জেলে যাবার হুড়োহুড়ি ! তার চেয়ে আগে ভাগে এই ভালো ! দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ তুমি ভালোই করেছ।

স্বর্ণ বার দুই পায়চারি করে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরের এদিক থেকে ওদিকে বার কয়েক পাক খেয়ে একসময়ে বললে, কতদিন হোলো বলো ত ? বোধ হয় বছর এগারো—না ?

বললুম, হ্যাঁ, তা প্রায় হোলো বৈ কি।

স্বর্ণ বললে, এর মধ্যে অনেক জমিয়েছ দেখছি ! আসবাব পত্র, শাল দোশালা, এত ভালো ভালো সাজ সজ্জা,—দুহাতে রোজগার করেছ মনে হচ্ছে !

রাঙ্গাবৌ এবার শান্তভাবে বেরিয়ে এলো। বললে, ছেলেটির কী চমৎকার কথাবার্তা, কি মিষ্টি স্বভাব !

স্বর্ণ ফস করে বললে, নেবে তুমি ওকে ?

রাঙ্গাবৌ হাসিমুখে বললে, প্রাণ ধরে দিতে পারবে ?

স্বর্ণ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে রাঙ্গাবৌয়ের কথার জবাব দিল। বললে, ওকে একদিন প্রাণ ধরে তোমার হাতে দিইনি ? কৃতজ্ঞতা ভুলে গেছ ?

বিপ্লবী মেয়েটির কথায় যেন সেই আগেকার মতো একটি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়লো। রাঙ্গাবৌ তাড়াতাড়ি হেসে উঠে বললে, এবার বুঝি তাই অনুতাপ হচ্ছে ?

আমি বললুম, মেয়েলি তর্ক থামিয়ে এবার একটু ঠাণ্ডা হও দেখি ?

আমার সঙ্কেত রাঙ্গাবৌ বুঝে নিল, এবং পলকের মধ্যেই সে এগিয়ে এসে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরে বললে, কত জিনিস তুমি জীবনে পেয়েছিলে, কিন্তু কোনোটাই ত' হাতে নাওনি। এসো আমার সঙ্গে।

রাঙ্গাবৌয়ের সঙ্গে স্বর্ণ ভিতরে গেল। কিন্তু স্বর্ণের শেষ কথাটা নির্ভুল ভাবে আমার কানে এলো। স্বর্ণ বললে, হাতে করে কিছু নিইনি বটে, কিন্তু যা পাবার তা আমি পেয়ে গেছি, রাঙ্গাবৌ।

ছেলেটা আমাদের দুজনকে এইটুকু সময়ের মধ্যে বশীভূত করেছে অথবা অভিভূত করেছে, ঠিক বুঝতে পারছিনে। ওর মাথায় রাশিকৃত ঝাঁকড়া চুল, বুঝতে পারা যায় নাপিতের খরচ নেই। পরণে আধময়লা হাফ সার্ট, আর হাফ প্যান্ট,—চোখে মুখে কেমন একপ্রকার বন্যতা। এরই মধ্যে দুবার গাছ থেকে পড়েছে, চোট খেয়েছে মন্দ নয়। দুদিনের মধ্যেই কোথাকার দুটো সাঁওতালি ছেলের সঙ্গে ভিখু বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। ফলে, কাঁচা আমলকি যোগাড় করেছে রাশি রাশি। আমার কাজের ফাঁকে বার কয়েক ভিখুকে কাছে ডেকে গোপনে আদর করেছি, কিন্তু তার মন পড়েছিল গাছের আড়ালে ডাকা ডাহুকের দিকে,—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি! আমি বুঝতে পারি রাঙ্গাবৌ এক এক সময়ে ভিখুকে কেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়! ভিখুকে নিরিবিলি তার পাওয়া দরকার। দুজনের মধ্যে কত অসংলগ্ন আলোচনা, কত রকমের জটিল প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে মীমাংসা। রাঙ্গাবৌ ওর সঙ্গে যায় আমলকির বনে, ওর সঙ্গে মহুয়ার ফল কুড়িয়ে বেড়ায় সারাদিন। খুটিয়া আমাদের জন্য রান্নাবান্না করে।

সেদিন স্বর্ণ বললে, ছেলেটাকে ঘুষ খাওয়াচ্ছে তোমার বউ, দেখতে পাচ্ছ ত?

আমি বললুম, কিন্তু ওর ভিখু নাম রাখলে কেন বল ত?

ওকে যে ভিক্ষে করে পেয়েছিলুম।

স্বর্ণর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। হাসিমুখে সে পুনরায় বললে, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করে ফেলো?

বললুম, করলে কি সহজে জবাব পাবো?

কেন পাবে না? স্বর্ণ যেন ফোঁস করে উঠলো। বললে, আমি কি সেই মেয়ে? কখনো লুকিয়েছি? কখনো মিছে কথা বলেছি? মনে করতে পারো কখনো ঠকিয়েছি তোমাকে?

এমন সময় রাঙ্গাবৌ এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু স্বর্ণ থামলো না। বললে, আগুন দেখে তোমরা ভয় পেয়েছিলে, আর আমাকে আগুন নিয়ে খেলা করতে হয়েছিল,—আমার ভয় পাবার সময় ছিল না।

তাড়াতাড়ি বললুম, আগেকার কথা সব আমার আর মনে নেই, স্বর্ণ।

কেমন করে থাকবে? তুমি যে এখন ছোট সায়েব। কিন্তু বাইরে চেয়ে দেখো,—বান এসেছে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি শুধু সামলাচ্ছ নিজের ঘর, নিজের স্বার্থ, নিজের পুরনো সংস্কার।—স্বর্ণর চোখে যেন আগুন ধকধক করছে।

আমি আর কথা বাড়াতে সাহস করলুম না, টুপিটা হাতে নিয়ে মসমস করে বেরিয়ে গেলুম।

যখন ফিরলুম, ভরা দুপুর। দেখতে পাওয়া গেল বাগানের ফটকের কাছে রাঙ্গাবৌ আর ভিখু,—কি যেন গভীর আলোচনায় দুজনে মশগুল। আমি সাইকেল্ থেকে নেমে সামনে দাঁড়ালুম। সাইকেলের দিকেই ভিখুর ঝোঁক বেশি। আমি বললুম, চড়বি? চড়তে জানিস?

ভিখু বললে, আগে শিখে নিই।

সাইকেলখানা তার হাতে দিলুম। ভিখু খুব খুশী। রাঙ্গাবৌ বললে, ছেলেটার দিকে ওর মার একটুও লক্ষ্য নেই, দেখেছ?

বললুম, কেমন করে জানলে ওর মা?

জানতে কতটুকু সময় লাগে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, এ কেমন করে সম্ভব?

রাঙ্গাবৌ বললে, স্বর্ণর পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে?

তুমি কি বলতে চাও স্বর্ণ দ্বিতীয়বার বিধবা হয়েছে?

আমি জানিনে।

এর বেশি আলোচনা করাটা আমাদের দুজনের কাছেই অপ্রিয়। আমি নীতিবিদ্ নই, এবং সমাজনীতি রক্ষা করাও আমার পেশা নয়। কেবল এক সময় বললুম, স্বর্ণ কি থাকবে এখানে কিছুদিন?

রাঙ্গাবৌ চুপ করে রইলো। একসময় আমি বললুম, কিছু শুনেছ তুমি?

রাঙ্গাবৌ বললে, এখানে থাকবে কদিন তা জানিনে, কিন্তু ওর যাবার জায়গা কোথাও নেই, এ আমি জানি।

কেন ওর শ্বশুরবাড়ী?

রাঙ্গাবৌ আমার মুখের দিকে তাকালো। পরে বললে, শ্বশুরবাড়ী কোথায় সে নিজেই জানেনা। তাছাড়া ও যাবার জন্যেও আসেনি।

ভিতরে এসে আমি একবারটি থমকে দাঁড়ালুম। পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে আমার বইয়ের আলমারিগুলি সাজানো থাকে। আজ দেখি স্বর্ণ আলমারিগুলি খুলে রাশি রাশি বই মেঝেতে নামিয়ে নিজে সেগুলির মাঝখানে বসে নাড়াচাড়া করছে। আমাকে দেখে মুখ তুললো। বললে, এসব করেছ কি?

বললুম, কেন বলো ত?

এত জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছ কেন?

বই কাগজকে তুমি জঞ্জাল বলো?

বলি, যদি তোমার আমার জীবনের সঙ্গে তার যোগ না থাকে।—স্বর্ণ বলতে লাগলো,

গত দশ বছরের কোনো চিহ্ন তোমার এই দেরাজগুলোয় নেই তা জানো ? পৃথিবী উল্টে গেছে, জীবনের চেহারা গেছে বদলে,—আর তুমি ? তুমি দশ বছর আগে থেমে গেছ, আর এগিয়ে চলতে পারোনি। এগুলো মরা বই, এর কোনো দাম নেই, কোনো কাজেই এগুলো আসবে না,—অথচ তুমি এগুলো পুষে রেখেছ, কারণ, এ তোমার সখ, তোমার শোভা, তোমার বিলাস।

হেসে বললুম, তোমার চাবুকের আওয়াজ বেশ লাগে, স্বর্ণ। পাখীরাও খড়কুটো গুছিয়ে বাসা বাঁধে, জানো ত ? হ'তে পারে আমি পথ ভুলেছি, কিন্তু তুমিও ভুল পথে চলেছ।

উপদেশ।—স্বর্ণ মুখ তুলে তাকালো। ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে পুনরায় বললে, কিন্তু বিশ্বাস যদি ভাঙে ? যদি শ্রদ্ধা হারায় ? থাকে কি ?

বললুম, তুমি কি এইটি জানাবার জন্যেই এখানে এসেছ ?

না, আমি এলুম প্রতিবাদ জানাবার জন্যে ! তুমি জমিয়ে তুলেছ সেইটেতেই আমার আপত্তি। তুমি নেবার জন্যে এবার হাত বাড়ালে কেন, তাই শুনতে চাই। এই গরীবের দেশে তোমার অবস্থা ফিরলো কেমন করে আমাকে বলো ত ?

এবার হেসে বললুম, ওঃ এই কথা। বেশ ত, এক কথায় জবাব চেয়ো না,—এখানে থাকো কিছুদিন, গল্পগুজব করা যাবে !

স্বর্ণ ভ্রূ কুঁচকে বললে, কিছুদিন কেন, যদি চিরদিন থাকি ?

আমি আবার হেসে উঠলুম।

স্বর্ণ বললে, তামাসা নয়, আমি সত্যিই থাকবো এখানে। তোমার বাড়ীতে ঝি নেই, সময়-অসময়ে দেখবার কেউ নেই,—সুতরাং আমি আর যাবো না। দুটি-দুটি খেতে দিয়ো, একপাশে পড়ে থাকবো।

বললুম, কিন্তু ঝি-এর কাজ অন্য জায়গাতেও জুটতো।

দু'একখানা বই নাড়াচাড়া করে স্বর্ণ বললে, আমি জানি তুমি আমাকে তাড়াতে চাও, কিন্তু রাঙ্গাবৌ আমাকে ছাড়তে চায় না। এই তিন দিনের মধ্যেই ভিখুকে সে দখল করেছে।

বললুম, ঝি-এর ছেলের সঙ্গে মনিব-গিন্নির সম্পর্ক জানো ত ? ছিটে ফোঁটা দয়া, একটু আধটু উচ্ছিষ্ট, মেনিবেড়ালের স্নেহ, পোষা কুকুরের প্রভুভক্তি। ভিখুকে তুমি এত নীচে নামাতে চাও কেন ?

স্বর্ণ বললে, তবে কোন্ দাবি নিয়ে এখানে থাকবো ?

বললুম, মানুষ যেমন থাকে মানুষের কাছে।

যদি কোনো দাবি জানাই ?

বেআইনী দাবি জানালে শুনবে কে ?

স্বর্ণ বললে, এ তোমার কোন আইন যে, একদল থাকবে আশ্রিত, আর একদল থাকবে সম্পদে গর্বিত ? একই জায়গায় থেকে কেন এই উঁচুনীচু সম্পর্ক ? তুমি দেবে আর আমি নেবো ? তুমি খাওয়াবে, আর আমি খাবো ? কে তুমি ? কোন্ অধিকারে তুমি আমার চেয়ে বড় হতে চাও ?

বললুম, কথাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে স্বর্ণ ?

এমন সময় রাঙ্গাবৌ দুটি খাবারের থালা হাতে নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, সাইকেলখানা রেখে ভিখু কোথায় গেল বলো ত ? আমার ভাবনা হচ্ছে। খুটিয়াকে খুঁজতে পাঠালুম, কিন্তু সেও ফেরেনি।

রাঙ্গাবৌর উদ্বেগের প্রতি স্বর্ণ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলো না। বরং ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, কথাটা সেইদিকে যাচ্ছে যেদিকে এযুগের মানুষের মন এগিয়ে চলেছে। তুমি জমিয়ে তুলেছ, তাই তুমি চাকার ওপরদিকে উঠেছ,—আমি জমাতে চাইনি, তাই নেমে গেছি চাকার নীচে। ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাওনা কেন ? চোখ বুজে অন্যায়টাকে ধরে রাখতে চাইছ কোন্ বুদ্ধিতে ?

আমাদের কোনো কথা রাঙ্গাবৌর কানে ঢুকলোনা। খাবার জল টেবিলের ওপর রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল। স্বর্ণ তার ছেলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, একথাটা এই ক'দিনে রাঙ্গাবৌ বিশ্বাস করেছে।

আমি বললুম, স্বর্ণ, তোমার নিজেকে পোড়াবার আগুন তুমি নিজেই মনের মধ্যে জ্বালিয়েছ, সেই আগুনে তুমি বাইরে অগ্নিকাণ্ড করতে চাইছ।

স্বর্ণ উঠে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। একসময় থেমে বললে, মানুষের বাঁচবার জন্যে খাওয়া, আর এককালের সভ্যতাকে অন্যকালে এগিয়ে দেবার জন্যে সন্তানধারণ—একথা কি তুমি মানো না ?

কথাটা অস্পষ্ট, তবুও মানি।

তবে ধন সম্পত্তি আর জায়গা জমি নিয়ে এই বিবাদ কেন ? যা তোমার থাকবে না, তাই জমাবার কেন এই চেষ্টা ? তুমি ছিলে আমাদের দলের একজন ছোটখাটো নেতা। সেদিন তুমি আমাদের কি শিখিয়েছিলে ? দুর্গম পথে আমাদের ঠেলে দিয়ে তুমি কেন এসে জন্তুর মতন জঙ্গলে লুকিয়েছ ?

বললুম, তোমাদের এই বুদ্ধির জন্ম হয়েছে ঈর্ষার থেকে।

স্বর্ণর মুখে এতক্ষণ পরে হাসি দেখা দিল। বললে, এইবার মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু এ তোমার অত্যন্ত ভুল। মনে রেখো, সকলের দাবি সমান—এই কথাটা

এসেছে ঈর্ষার থেকে নয়, ভালোবাসার থেকে। ভালোবাসার এত বড় চেহারা এযুগে দেখা যাচ্ছে বলেই একদল তাকে ধ্বংস করার ফন্দী আঁটছে।—তুমি হলে সেই দলের লোক।

স্বর্ণর বলার ভঙ্গীতে আমরা দুজনেই হেসে উঠলুম।—

মেয়েলি ছাঁদে ঢালা মেয়ে স্বর্ণ নয়। তর্ক করে পুরুষের মতন, ভাষাটা পুরুষের। ইতিমধ্যে ভিখুকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে একপ্রকার নিশ্চিন্তই আছে। মাতা ও পুত্রের মাঝখানে আসক্তির যোগ বড়ই কম, এবং সেটা আমাদের চোখে একটুখানি বিসদৃশ সন্দেহ নেই। স্বর্ণর জীবনে কোথায় একটা ইতিবৃত্ত চাপা রয়েছে, সেইদিকে আমাদের স্বামীস্ত্রীর দৃষ্টি অনেকটা সজাগ থাকে বৈ কি।

সেদিন কথা তুললুম, আর কিছু না হোক, ছেলেটাকে একটু আধটু লেখাপড়া শেখাও, মানুষ করে তোলো?

স্বর্ণ বললে, শেখাবার মতন লেখাপড়া জানা আছে কার? লোকসমাজে ভেড়া ছাগলের সংখ্যা নাই বাড়লো?

তবে মানুষ হবে কেমন করে?

মানুষ করতে গিয়ে যদি বনমানুষ হয়, কিম্বা তোমার মতন?

আমার দুরবস্থা দেখে রাঙ্গাবৌ খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। আমি বললুম, পেটের ছেলের ওপর এই অবিচার সইবেনা, স্বর্ণ।

স্বর্ণ বললে, ভয় পেয়োনা, দেশে মানুষ থাকলে ভিখুও একদিন মানুষ হবে।

ওর বাবার মৃত্যু হয়েছে কতদিন?

ওর বাবা!—স্বর্ণ রাঙ্গাবৌর দিকে তাকালো। পুনরায় বললে, যতদূর মনে হয় ওর বাবার মৃত্যু হয়নি।

রাঙ্গাবৌ সহসা যেন কেঁপে উঠলো। আমি বললুম, তবে তুমি এই বৈধব্যের সজ্জা নিয়েছ কেন?

স্বর্ণ হাসলো। বললে, আমার শরীরের ওপর দিয়ে একজন পুরুষের অস্তিত্ব দিনরাত ঘোষণা করতে থাকবো—এই দাসীত্বই বা কেন? সবাই রাঙ্গাবৌ হয়ে জন্মায়নি।

তুমি কি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল?

স্বর্ণ ঠোঁট উলটিয়ে বললে, সত্যি বলতে কি, আমি একবারও বিয়ে করিনি।

রাঙ্গাবৌ এবার অধীর কণ্ঠে ব'লে উঠলো, অমন সব্বনেশে কথা বলতে নেই,

স্বর্ণ। ভিখুর কপালে কালি মাখিয়ো না। ভিখু যেন চিরকাল মাথা উঁচু ক'রে বেঁচে থাকে।

আমি রাঙ্গাবৌর মতো অত অধীর হইনে। স্বর্ণর হাস্যমুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু ছেলেটাকে সত্যিই ত আর পথ থেকে কুড়িয়ে পাওনি তুমি! —রাঙ্গাবৌ, তুমি যদি অত অস্থির হও তবে রান্নাঘরে গিয়ে বসোগে।

স্বর্ণ বললে, আমি ত বলেছি ভিখুকে ভিক্ষে ক'রে পেয়েছি।

কা'র কাছে ভিক্ষে করেছিলে?

তা'র নাম-ধাম কোনটাই জানতে চাইনি। আমাকে ভিক্ষে দিয়েছে এই যথেষ্ট।

বললুম, ভিক্ষে করতে গেলে কেন?

স্বর্ণ বললে, তবে শোনো। যে কারণে তুমি ঘর বেঁধেছ, সেই কারণেই আমি সন্তান ভিক্ষে করেছি। তোমার সংযম নেই, কেননা জৈবজীবনকে তুমি গৃহকর্ম নাম দিয়েছ; আর আমি যে সংযত তা'র প্রমাণ, ওটাকে ওইখানে শেষ ক'রে অন্যদিকে মন দিয়েছি। এবার আমি সাংঘাতিক অস্ত্র হাতে নিয়ে জগদ্ধাত্রী হ'বো, তা'র কারণ অসুরকে দাবিয়ে রেখেছি পায়ের তলায়। ওটার কাছে আর আমি হার মানবো না।

কথাটা শুনতে শুনতে রাঙ্গাবৌর চোখ দুটো যেন পলকের জন্য জ্ব'লে উঠলো। এবার সে মৃদুস্বরে বললে, কিন্তু ভিখুর একটা পরিচয় ত' থাকা দরকার! ধরো, ভদ্রসমাজে—

খুব সহজ। —স্বর্ণ বললে, তুমি ওর মা হও, ছোটসায়েবকে ভিখু বাবা বলুক। অভ্যস্ত নীতিবুদ্ধির সংস্কার ত্যাগ করো, দেখবে কোথাও আর বিরোধ নেই।

রাঙ্গাবৌ বললে, এতে কি তোমার সম্মান বাড়বে, স্বর্ণ?

আমার সম্মানকে তোমার নীতিজ্ঞানের সঙ্গে বাঁধতে চাও কেন? মহাবীর কর্ণের পিতার সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাই ওকে বলা হয় আদি অগ্নিকুণ্ডের সন্তান! এতে কর্ণ আর কুন্তী কেউই ছোট হয় নি। জন্মটা আকস্মিক, মনুষ্যত্বের পথটা চিরকালের। ভিখুর বাবা যে-খুশী হোক আমার আপত্তি নেই, আমি ওর মা—এই যথেষ্ট। মহাভারতের সভ্যতা মাতৃপ্রধান, পিতৃপ্রধান নয়।

স্বর্ণ সেখান থেকে চ'লে গেল।

আমরা স্বামী স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। —মনে হোলো রাঙ্গাবৌ যেন খানিকটা আঘাত পেয়েছে, তা'র নিজের জীবনের শাস্ত্রটার সঙ্গে স্বর্ণকে সে মেলাতে পারছে না। কিন্তু আমি স্তব্ধ হয়েছিলুম এই কারণে যে, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মোহবন্ধনটাকেও স্বর্ণ জয় করেছে,—তা'র কথাবার্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অস্পষ্ট আসক্তিও আমি খুঁজে পেলুম না। সন্তানটাকে জঠরে ধারণ করেছি বলেই যে চিরস্থায়ী বাঁধনকে স্বীকার ক'রে নেবো—এমন কোনো কথা নেই।

স্বর্ণ বা'র বা'র এই কথাটাই বলেছে। সে বলে, স্বামী নামক কোনো পদার্থ মানিনে, মানি পুরুষকে, মানি সৃষ্টিকর্তাকে। তোমরা ঘর বেঁধেছ, তাই ঘরগড়া নীতিও স্বীকার করেছ,—কিন্তু আমি যদি এই সংস্কারকে বুঝতে না পারি? যদি বলি যে-কোনো জাতের পুরুষ হলেই মেয়েরা খুশী,—কেননা আসলে প্রয়োজন সন্তান,—স্বামী নয়। স্বামী বলো, পুরুষ বলো, তা'রা হোলো উপকরণ,—পূজা হোলো সন্তানের। সন্তান আমার হয়েছে, সুতরাং পুরুষকে আর আমার দরকার নেই! আমার পথ আমি নিজে বেছে নেবো!

সেদিন প্রশ্ন করেছিলুম, তোমার পথ মানে?

স্বর্ণ বললে, আমার দেশ, আমার জাতি, আর নিজের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক জীবন,—যাকে বলে স্বাধীন!

বললুম, কিন্তু স্নেহ ছাড়া সৃষ্টি নেই! স্নেহহীন সৃষ্টি মানে মরুভূমি। কোনটা তুমি চাও?

উপমা দিয়ো না।—স্বর্ণ বললে, ওতে আসল কথা ফোটেনা। তুমিই একদিন বলতে, আমাদের সকল রকম কল্পনার চেয়েও জীবনটা বিরাট, বিরাটতরো তার তপস্যা। স্নেহহীন সৃষ্টিকে বলছ মন্দ? তুমিই না মেঘনা নদীর ধারে একদিন এক সভায় বলেছিলে, সৃষ্টি মানে প্রকৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক? ঝড়ে পুরনো ঘর ওড়ায়, বান এসে নতুন জমি বানিয়ে যায়, ভূমিকম্পে হয় নতুন সভ্যতার পত্তন, আর যুদ্ধ আসে জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে নেবার জন্যে,—কিন্তু এরা যে স্নেহহীন! আমার জীবনের মাটিতে একটি ফসল ফলেছে,—জঠরের অন্ধকার রহস্যলোকে তাকে সস্নেহে লালন করেছি, তার ফলে বীজ থেকে অঙ্কুর, ফুল থেকে ফল। তারপর সে ত' জগৎসভার ভোজ্য! আমার সঙ্গে ভিখুর আর সম্পর্ক রইলো কোথায়?—এই বলে স্বর্ণ চুপ করে গিয়েছিল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলখানা নিয়ে আফিসের দিকে চলে গেলুম।

চেয়ে দেখি শালবনের তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে স্বর্ণ বহুদূর চলে যায়। তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হয় পিছনের পায়ের দাগ মুছে গেলেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এদিকে কোথায় যেন সাঁওতালপাড়া, কোথায় যেন আছে তালের জঙ্গলে ঘেরা জলের বাঁধ,—স্বর্ণ তারই সন্ধানে ফিরছে। সুন্দর ছায়াবীথিকা, সভ্যতার থেকে দূরে, পারিপার্শ্বিক গ্রাম-জীবনের স্বভাব-সরলতা,—স্বর্ণ সেই নিরিবিলি পথের ধারে হয়ত বসে ভাবলো, এইখানে যদি বাকি জীবনের জন্য একটুখানি জায়গা পেতুম! যখন সে ফিরে আসতো, চেয়ে দেখতুম, তার চোখে মুখে কেমন একপ্রকার বন্যতা। বুঝতে পারা যেতো, কত বাসনা আর ক্ষুধার দাগ রেখে এসেছে সে পথে-পথে। আমি যেন তার নাগাল পেতুম না।

এই কদিনেই স্বর্ণ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি ভাঙতে চাইনে, গড়বার শক্তিও

আমার নেই'। আমি শুধু অস্বীকার করে যাবো। অভ্যস্ত ভাবনার ধারাকে আমার জীবনে কোনোদিন ঠাঁই দিতে পারবো না। তুমি মুক্তির সমুদ্র সামনে দেখে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকেছ, আর আমি বাঁধনের ভয়ে সমুদ্রের অন্ধকারে ভেলা ভাসিয়েছি। তলিয়ে যদি যাই, তবে সেইখানে যাবো যার তল খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন এই অগ্নিহোত্রী আমাদের কাছে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হোলো। রাঙ্গাবৌকে ডেকে বললে, সত্যি বলো, ভিখুকে কি তুমি নিতে পেরেছ?

রাঙ্গাবৌ অবাক হয়ে দাঁড়ালো। স্বর্ণ বললে, ভিখুর ভার আমি আর বইতে পাচ্ছিনে রাঙ্গাবৌ।

রাঙ্গাবৌ বললে, কোথায় যাবে তুমি?

স্বর্ণ হেসে বললে, যেখানে যায়নি কেউ এর আগে।

উষ্ণকণ্ঠে আমি বললুম, থাকবে কোথায়? তোমার চলবে কেমন করে?

স্বর্ণ বাঁকাচোখে বললে, পুরুষের আত্মাভিমানে ঘা লাগছে বুঝি?

রাঙ্গাবৌ বললে, ভিখুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

ভিখুকে ধরে রাখলে দুজনেই দুঃখ পাবো। তোমরা ওকে নাও ভাই।—এই বলে স্বর্ণ আমার দিকে তাকালো।

আমি বললুম, কোন অধিকারে নেবো?

স্বর্ণ বললে, যে পালন করে সে পিতা!

ভিখু তোমায় ছাড়বে কেন?

আমি এখন ভিখুর সঙ্গী,—মা ও সন্তান নয়। তার সঙ্গী থাকলেই সে খুশী। তাছাড়া ওর মেরুদণ্ড বজ্র দিয়ে তৈরী, আমি গেলে ও নুইবেনা।—স্বর্ণ বললে, আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, রাঙ্গাবৌর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। বেদনা আর আনন্দের জারক রসে সেই অশ্রু মেলানো। স্বর্ণ তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, ওই চোখের জল ভিখুর মাথায় পড়ুক,—ভিখুর কোনো অভাব থাকবেনা।—ও কি, চেয়ে আছো যে?

বললুম, কি শুনতে চাও?

স্বর্ণ বললে, তুমি কি এত বড় কাপুরুষ যে, একটি শিশুর ভবিষ্যৎ হাতে নিতে পারো না?

বললুম, আশ্রিত বাৎসল্য?

স্বর্ণ বললে, না গো না, সোজা হিসেব। ভিখু তোমার সন্তান।

রুক্ষকণ্ঠে বললুম, ধাপ্পা!

অধীর কণ্ঠে স্বর্ণ বললে না, না, মনের মধ্যে তলিয়ে দেখো, কল্পনায় ভাবনায় বেঁধে নাও,— বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করো,— ভিখু তোমারই সন্তান।

বললুম, এ শুধু যাবার আগে রাঙ্গাবৌকে জব্দ করার চেষ্টা।

রাঙ্গাবৌ দৃঢ় শান্তভাবে এগিয়ে এলো। বললে, এত ছোট আমি হতে পারবো না। আমি নিলুম ভিখুকে, আমি ওর মা,-- কায়মনোবাক্যে। ওর আমি চিরদিনের মা।

ভিখু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাঙ্গাবৌ ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিল। স্বর্ণ এবার হাসিমুখে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা ভিখু, তোর বাবা কে রে?

আমার দিকে নির্দেশ ক'রে। ভিখু বললে, ওই ত।

আমি বললুম, ওরে হতভাগা, কেমন ক'রে জানলি আমি তোর বাবা?

ভিখু বললে, এ বাড়ীতে ঢোকার সময় মা আমাকে বলেছে।

রাঙ্গাবৌ মাথা উঁচু ক'রে বললে, এখবর সত্যি হ'লে আমার দুঃখ নেই, মিথ্যে হলেও আনন্দ নেই। আমার ঘরে এতদিন পরে আলো জ্বললো এই আমার লাভ।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, কিন্তু স্বর্ণ যে তোমার স্বামীর চরিত্রের ওপর দাগ দিয়ে যাচ্ছে গো।

রাঙ্গাবৌ বললে, একটুও না। এ সন্তান যদি তোমারই হয়, তোমার চরিত্রে দাগ দেবে কে?

তার মানে?

মানে আমার কোল ভরেছে। এই আমি চেয়েছিলুম। —ব'লে রাঙ্গাবৌ ভিখুকে নিয়ে সেখান থেকে স'রে গেল।

পরদিন ভোরে খুটিয়া আমার ঘুম ভাঙালো। বললে, বাবু ঘরের দরজা খোলা, গেট্ খোলা।

আমি বললুম, তাই নাকি? আচ্ছা, তুই যা—

খুটিয়া শশব্যস্তে বললে, বাবু, নতুন দিদিমণিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, বটে, আচ্ছা—তুই যা।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাঙ্গাবৌ ঘরে ঢুকে বললে, ওগো শুনছ? স্বর্ণ আমাদের না জানিয়ে চ'লে গেছে,--ভিখুকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে। ভিখুকে বিশ্বাস ক'রে রেখে গেলোনা।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বললুম, তুমি স্বর্ণকে এখনো চেনোনি। দেখো দেখি আমলকি গাছের ডালে, ভিখু হয়ত মনের আনন্দে ফল পাড়ছে। ছেলেটা ভারি দুরন্ত।

রাঙ্গাবৌ ছুটে বেরিয়ে গেল, এবং মিনিট দুই পরে হাস্যগৌরবে ফিরে এসে বললে, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, ভিখুকে খুঁজে পেয়েছি। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল। আমি বাঁচলুম।

কোলাহল-কলরবে ঘর মুখরিত ক'রে রাঙ্গাবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চোখ বুজে স্বর্ণকে অনুসরণ করছিলুম। তার পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু তারপর আর তা'কে খুঁজে পাচ্ছিনে। কোন্ দিকে সে গেল? বিহারের পথ ধ'রে বৃহত্তর ভারতে, কিংবা বাঙ্গলায়—যেখানে বা'র বা'র সোনা গ'লে গিয়েও সোনাটা ঠিক থাকে?

চিত্রকলা

পাটলীপুত্র, রাজগৃহ এবং নালন্দার শিল্প-ঐতিহ্য স্মরণ করে সম্প্রতি বিহারে খানিকটা শিল্পকলার চর্চ্চা সুরু হয়েছে। পাটনার 'শিল্পকলা পরিষদে'র কার্য্যাবলী থেকে এ সুসংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে তাঁরা শুধু চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনীর আয়োজনই করেন নি—ভালো ভালো চব্বিশটি কাজের একটি প্রতিলিপি-সঙ্কলনও প্রকাশিত করেছেন। সঙ্কলনটির নাম 'চিত্রাবলী'। চিত্রাবলীতে যশস্বী শিল্পী যামিনী রায়ের পাঁচটি চিত্র ছাড়া যাঁদের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে তাঁরা হচ্ছেন রাণী চন্দ, দীনেশ বক্সী, উপেন্দ্র মহারথী এবং দামোদরপ্রসাদ অম্বষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির দু'টি তৈল-চিত্রে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে তাঁর প্রাক্তন প্রতিভায় এখানে আমরা দেখ্‌তে পেলাম। বিচিত্র বর্ণের প্রতি শিল্পী-মনের প্রগাঢ় আকর্ষণই শুধু ছবি দু'টিতে প্রতিভাত নয়—এই দুই মহাব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পার্থক্য শিল্পীর বর্ণবিচারে অনায়াসে ফুটে উঠে শিল্প এবং শিল্পীকে গভীর মর্য্যাদা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মনন আর গান্ধীজির বৌদ্ধ শান্তিই শিল্পীর দৃষ্টিলোকে সাড়া তুলেছে দেখ্‌তে পাই। অপেক্ষাকৃত নূতন পদ্ধতিতে আঁকা দু'টি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রেও শ্রীযুক্ত রায়ের বর্ণ ও তুলির অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এদু'টি ছবিকে 'কালার স্কেচ্' বা বর্ণের খসড়া-চিত্র বলা যায়। রেখার ও রঙের দ্রুত বিন্যাসেই এ-ধরণের ছবি তৈরী হয়ে ওঠে। সত্যি বল্‌তে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্ষণিকের জন্যেই আমাদের গভীরভাবে ভালো লাগে, মুহূর্ত্ত যত গুড়িয়ে যায় আমাদের ভালো লাগাও তত ম্লান হয়ে যেতে সুরু করে; কাজেই সেই গভীর ভালো-লাগাকে রেখার ও রঙের দ্রুত বিন্যাসেই রূপায়িত করতে হয়—তাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চমকটুকু অব্যাহত থাকে। বহু সময়ব্যাপী বর্ণধাবনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে প্রতিরূপ তৈরী হয় তাতে নিখুঁত বর্ণাণুকৃতি ফুটে উঠ্‌লেও ভালোলাগার চমকটুকু থাকে না আর তাই শিল্পহিসেবে তার ত্রুটী দেখা যায়। পাশ্চাত্য পদ্ধতির 'কালার স্কেচ' থেকে শ্রীযুক্ত রায়ের স্কেচ্‌গুলো স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে বর্ণের প্রতি তাঁর মনের প্রবল আকর্ষণেরই দরুণ। ছবিগুলোতে বর্ণের প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য যে বর্ণাধিক্যে ছবিগুলো দর্শকের চোখকে পীড়িত করে তোলে না। ইদানীং শ্রীযুক্ত যামিনী রায় যে পদ্ধতির ছবি আঁক্‌ছেন তেমন একটি ছবির প্রতিলিপিও 'চিত্রাবলী'তে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। ভৃঙ্গার হাতে উপবিষ্ট নারীমূর্ত্তি—অনায়াসেই 'দেহভৃঙ্গার' বলে ছবিটির পরিচিতি দেওয়া যায়। মূর্ত্তিটির দেহভঙ্গী ভৃঙ্গারের অনুরূপ—তাছাড়া 'দেহভৃঙ্গার'-ভাবটির

আরো সার্থকতা লক্ষিত হবে মূর্ত্তিটির নিটোল অবয়বে ও গুরু নিতম্বে। ছবির গভীর নীল, মৃত লাল রং আর রেখা-ভঙ্গিমা পোটোদের স্মরণ করিয়ে দিলেও পিকাসোর পৃথুলতা ও বর্ণপ্রলেপে প্রাচীনতার আভাস এবং মিশরীয় কারুকার্য্যের স্পর্শ অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই। মূর্ত্তিটিকে অঙ্কনপদ্ধতি অনুসারে স্থাপিত করা হয়নি—পাতাকাটা বা জাফরির কাজে (এ-পদ্ধতির একটি চিত্র এ সংখ্যা পূর্ব্বাশায় প্রকাশিত হয়েছে) ফ্রেমের সঙ্গে ছবিটির অংশ-বিশেষ যেমন সংলগ্ন রাখ্তে হয়—মূর্ত্তিটির শিরোদেশ, নিচুলপ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ নিম্নভাগ চারদিককার প্রান্তবন্ধনীর সঙ্গে ঠিক তেম্নি যুক্ত হয়ে আছে। পশ্চাৎপটের কয়েকটি পত্রচিহ্ন আমাদের প্রাচীন শিল্প পাতাকাটার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও ভঙ্গীর সমাবেশেও এমন সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে ছবিটি যাতে একে আজকের দিনের চিত্রকলা বলে সাদরে গ্রহণ করতে মন একটুও ইতস্তত করেনা।

শ্রীযুক্ত যামিনীরায়ের চিত্রগুলোর পর শ্রীযুক্ত রমেন চক্রবর্ত্তীর একটি 'বাউলে'র স্কেচ ছাড়া খুব বেশী উল্লেখযোগ্য কাজ আর নেই। আর সবাই শিল্পশিক্ষার্থী—এখনও কেউ শিল্পী হ'তে পারেন নি। শিক্ষার্থীর কাজ হিসেবে দামোদরপ্রসাদের দু'টি প্ল্যাষ্টার-মূর্ত্তি, 'আধুনিক ভারতীয় পদ্ধতি'তে আঁকা উপেন্দ্র মহারথীর 'সিদ্ধার্থের ত্রিতাপ' ও 'কুমার সিদ্ধার্থের অন্তিম শৃঙ্গার' চিত্র দু'টি আর সত্য মুখার্জ্জির জলরং ও রেখা-মিশ্রিত 'পল্লীকোণ'-ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিহারের শিল্পোদ্যম সার্থক হয়ে উঠুক!

সাময়িক সাহিত্য

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা—দিলীপকুমার বিশ্বাস। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী। দাম—১॥০

ভারতবাসী কারা? ভারতবর্ষ কি শুধুই হিন্দুজাতির না শুধু মুসলমানের? এ প্রশ্নের সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর—ভারতবর্ষ উভয়েরই। বহু শতাব্দী আগে মুসলমানেরা এ দেশে এসেছিলো; সেদিন হয়তো তাদের পরিচয় ছিলো তারা লোভী, তারা আক্রমণকারী। কিন্তু সময়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে যে ইতিহাস বিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁচেছে, সেখান থেকে আমরা যে সাক্ষ্য জোগার করতে পারি, তাতে জানা যায়, মুসলমান জাতির ঐ পরিচয়টাই সম্পূর্ণ নয়, এমন কি তার সবটাও সত্য নয়। মুসলমান রাজা বা রাজত্ব সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা যা-ই শিখে থাকি না কেন, এ খাঁটি খবরটা আজ আর ভারতবাসী কারো কাছেই গোপন নয় যে, বহু শতাব্দী ধরে একই সঙ্গে বসবাস করতে করতে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এ একতায়ও অবশেষে ফাটল ধরলো, এলো কলঙ্কময় ১৯৪৬ সাল—যে কলঙ্ক আজও একেবারে নিঃশেষে মুছে যায়নি। ইতিহাসের যে ধারা এতদিন ধরে এমন অব্যাহত গতিতে চলে আসছিলো তার মুখে কিসের বাধা এসে দাঁড়ালো যার ফলে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো? বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক এ সমস্যার সমাধানেরই সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুধু বর্ত্তমানকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে চান নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে এ সমস্যাটির দিকে তিনি তাকিয়েছেন, এবং জাতিগতভাবে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যকে বিচার করে, উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধের বীজ সত্যি সত্যি কোথাও লুকিয়ে ছিলো কিনা, যা আজ এমন বিষবৃক্ষের রূপে মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠেছে। অল্প কথায় হলেও, সব দিক দিয়েই তিনি বিচার করেছেন এবং বুঝতে
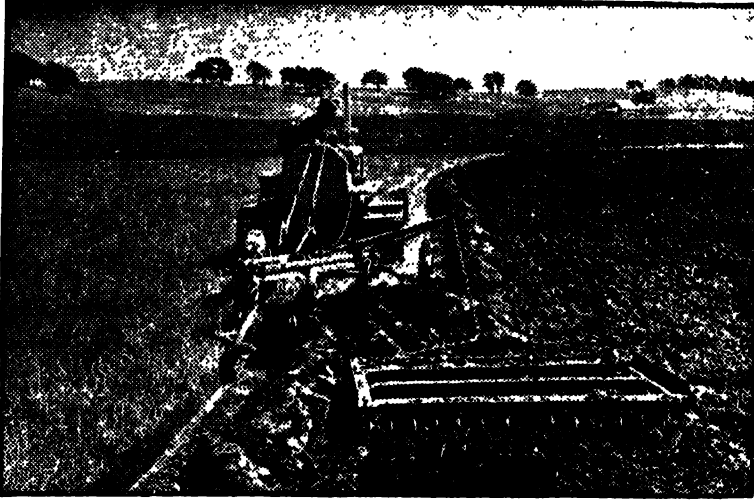
পেরেছেন, এই বিষ এসে প্রবেশ করেছে তৃতীয়পক্ষের চেষ্টায়—সুবিধাবাদী বিদেশীর প্ররোচনায় ফলেই ঘটেছে এই আত্মঘাতী বিরোধ।

আজ একটা জিগির উঠেছে হিন্দু এবং মুসলমান এক জাতি নয়; শুধু সেখানেই সে উচ্চরব শেষ হয়ে যায় নি, তারপরও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এই দুই সম্প্রদায়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এতই বিপরীতমুখী যে উভয়ের মিলন একরকম অসম্ভব। সুতরাং লেখক প্রথমেই নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, হিন্দু বা মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই নিজেদের 'বিশুদ্ধরক্ত জাতি' বলবার অধিকার নেই। তারপর ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন লেখক। ভারতে মুসলিম যুগের বহু-তথ্যসমন্বিত আলোচনা করে দিলীপবাবু দেখিয়েছেন, মুসলমান সম্রাটদের আমলেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক কলহ কখনও আজকের মত প্রকট ছিলো না, বরং এমন দেখা গেছে কোনো কোনো সম্রাটের আমলে হিন্দু-মুসলমান প্রায় একাত্ম হয়েই ছিলো, সম্রাট আকবরের আমলই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এমন কি সাম্প্রদায়িকতায় কলুষিত মন নিয়ে রাজত্ব করতে গিয়ে ঔরংজেব পর্য্যন্ত যে শেষ অবধি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলন সে কথার উল্লেখ করতেও লেখক ভোলেন নি। 'সংস্কৃতির মিলন' পর্য্যায়ে লেখক অত্যন্ত সুযুক্তি সহকারে বলেছেন, শুধু সাহিত্য নয়, শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনোদিনই কোনো বিরোধ ছিলো না। দারাশিকোহ্ যেমন হিন্দুধর্ম্মকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের কবিকুলও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক মুসলমান নৃপতিগণের গুণগান করতে কুণ্ঠিত হন নি।

ইতিহাসের শিক্ষাকে সামনে রেখে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করে লেখক দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষ যেমন হিন্দুর, তেমনি মুসলমানের। একে অন্যের সঙ্গে আগেও যেমন কখনও বিরোধ ছিলোনা, এখনও সে বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু সুবিধাবাদী তৃতীয়পক্ষের অভিভাবকতায়, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী নেতার প্ররোচনায়, আর সব চেয়ে মারাত্মক অন্ধ বিশ্বাসী অজ্ঞান জনসাধারণের মূর্খতার ফলে সে বিরোধ আজ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়েছে। তাকে রোধ করা যায় নি। এ সঙ্কট সময়ে এ গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার বাঞ্ছনীয় সন্দেহ কি, কিন্তু যাঁরা বিদ্বান হয়েও ইতিহাসকে অস্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন না, যাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বৃহত্তর মঙ্গলকে বলি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, সেই সব পণ্ডিত-মূর্খদের ফেরাবে কে?

কিন্তু তবু আমরা দিলীপকুমারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁর এই গ্রন্থের জন্যে। ক্ষুদ্র হোক্, তবু তাঁর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার সঙ্গে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মানবজাতির প্রতি সত্যিকারের কল্যাণ-কামনার যে পরিচয় তিনি স্বাক্ষরিত করে রাখলেন, এ গ্রন্থের প্রত্যেক পাঠক তা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করবেন।

অনিল চক্রবর্ত্তী

আষাঢ় সংখ্যা হইতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সূচীপত্র

পূর্ব্বাশা ঃ শ্রাবণ—১৩৫৪

বাপুজি

শ্রীযুক্ত যামিনী রায় অঙ্কিত
আলেখ্যের আলোকচিত্র

দশম বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা
শ্রাবণ ● ১৩৫৪

অতঃ কিম্

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এক প্রকারের স্বাধীনতা ত' পাওয়া গেল, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর যথাশীঘ্র খুঁজতে হবে, সহজভাবেও মনোহারী করে সাজাতে হবে যাতে জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায়, আপন স্বার্থের অনুকূল ভেবে তাকে গ্রহণ করে। স্বার্থ আবার আধুনিক কালে আবদ্ধ থাকলে চলবে না ; যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে স্বার্থকে না চালালে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। এইখানেই চিন্তাশীলদের পরীক্ষা। জনপ্রিয়তা জলাঞ্জলি দিতে তাঁরাই তবু সক্ষম, নেতাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব। তাঁদের দৃষ্টি বর্ত্তমানের যাদুরেখায় দিশাহারা হয় না, কুক্কুটের মতন তাঁদের বিচরণ খড়ির দাগে ব্যাহত হয় না।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য কি প্রকারের স্বাধীনতা আমরা পেলাম। ইংরেজ সাধু কি অসৎ বিচারের প্রয়োজন নেই ; কারণ, স্বরাজ্য চালাবেন যাঁরা তাঁরা বলছেন ইংরেজরাজ সদিচ্ছায় চলে যাচ্ছেন, অতএব অসাধু প্রেরণা এই নিষ্ক্রমণের পিছনে থাকলেও তার প্রভাব স্বাধীন ভারত কাটাতে পারবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস এবং আমাদেরও সেই বিশ্বাস থাকা চাই ; এটুকু না থাকলে নিজেদেরই খেলো করা হয় আর স্বাধীনতার কোনো প্রতিজ্ঞাই

থাকে না। তার মানে নয় যে ব্রিটিশ ইম্পিরীয়ালিজ্‌ম দেশ থেকে উঠে গেল, আর আমাদের কোনো সাবধানতার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে, এবং এখনও আছে, তবে সেটা প্রাথমিক নয়। অনেকে কিন্তু এখনও তাকে প্রাথমিকই ভাবছেন। তাঁদের চিন্তা কতটা গতকালের সন্দেহে পুষ্ট আর কতটা বৈজ্ঞানিক বলতে পারি না। আমার মতে ব্রিটিশ ইম্পিরীয়ালিজমের পিছুহটার, এমন কি রূপ পরিবর্ত্তনের, কারসাজি আমরা বুঝতে পেরেছি, এবং বুঝতেও পারব। কখনও কখনও আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হয়; আবার সময় সময় 'যেন আমরা শক্তিশালী' এই ধারণাও মনে বল আনে। তর্কের খাতিরে কেবল নয়, দেখে শুনেই এই প্রতীতি হয়। আজ আমাদের মন থেকে অতিরিক্ত সন্দেহ দূর হওয়াই মঙ্গল। দূর হবার পরই স্বাধীনতার স্বরূপ ফুটে উঠতে পারে।

আপাতত, স্বাধীনতা নঙর্থকই রয়েছে। জহরলালই স্বীকার করেছেন যে শাসন-ক্রিয়াটি পর্য্যন্ত আর চলছে না। দেশে দুর্ভিক্ষ আসেনি এটা মস্ত কথা বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। দেশের মানসিক আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়েছে; সেখানে ঝড়ও বইছে নিশ্চয়, কিন্তু সেই ঝড়ে ভারতবর্ষের দুটো টুকরা ভেঙ্গে গেল। ইংরেজ-বিদ্বেষ এখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হল; এবং এই বিদ্বেষে সৃষ্টি-শক্তির হ্রাস হয়েছে মানতেই হবে। তাই হিসেব-নিকেশে স্বাধীনতার সদর্থক দিকটা এই বছরে যে খুলেছে তা মনে হয় না। এশিয়ান কনফারেন্‌স্ বসেছিল, এখানে ওখানে ভারতের দূত পৌঁচেছে, এই প্রকারের দু' চারটি দফা সাজান যায় বটে; কিন্তু বাঁ দিকের তালিকা প্রায় শূন্য। বরঞ্চ ক্ষতিটাই নজরে পড়ে। এখনও জমিদারী গেল না, এবং বহু প্রদেশে মজুরদের মাথায় বাড়ি পড়ছে। তৎসত্ত্বেও আমরা স্বাধীনতার সম্মুখীন হচ্ছি। ভাগ্যতাড়িতের সুদিন আমোদ প্রমোদেই কাটে, সৃষ্টির সুযোগ দুয়ারে আঘাত করে চলে যায়, অভাগা শুনতে পায় না। এমনটি যাতে না হয় সেজন্য এখন থেকে ভাবতে হবে। কংগ্রেস-লীগের নেতারা বহু চিন্তা করেছেন এতদিন, তবু কেন আমরা যন্ত্রচালিতের মতন অগ্রসর হলাম ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে স্বাধীনতার সদর্থক রূপ-সৃষ্টির জন্য আজ অন্য চিন্তাপদ্ধতির প্রয়োজন। তার প্রধান প্রতিজ্ঞা বিপক্ষবিচার নয়, স্বপক্ষবিচার। চিন্তার মুখ আমাদের ঘোরাতেই হবে।

মুখ ঘোরাবার প্রথম অবস্থা নেতৃত্বের বিশ্লেষণ। যদি কখনও ভারতের ইতিহাসে তার আবশ্যক হয়ে থাকে ত' এখন, এই মুহূর্ত্তে। বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কে যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল তার প্রেরণা ভাব, ভাবনা নয়। আমি বলছি বিচার, বিশ্লেষণ। অবশ্য অযথা, অসময়ে সমালোচনাও নিরর্থক; তাতে বিদ্বেষ বাড়ে, কাজ এগোয় না। খানিকটা এই জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টির কার্য্যকারিতা কমে গেল। সোশিয়ালিস্ট পার্টিরও বিশ্লেষণে কম্‌তী নেই, কিন্তু তাঁদের কার্য্য-ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না অন্য কারণে; তাঁরা

একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপক্ষে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছেন যাতে তাঁদের শক্তিক্ষয় হচ্ছে। যেকালে চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তন পার্টির কাজ, ব্যক্তিবিশেষের নয়, তখন বামমার্গী সমস্ত দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একমাত্র উপায় মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশত তার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। তবে শ্রমিক কিষাণদের নীচে থেকে তাগিদ এলে সম্ভব হবে। সেই জন্য, আমার মতে, স্বাধীনতাকে সদর্থক করতে হলে শ্রমিক-কিষাণদের সঙ্গে প্রত্যেক বামমার্গী দলের আরো আন্তরিকভাবে যুক্ত হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এইখানেই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বাধবে বিরোধ। কিন্তু উপায় কি?

পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রটি দৃঢ় হলে অন্য চিন্তাও কি ভাবে পরিণত হয় তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অন্য চিন্তার অর্থ অনাবশ্যক চিন্তা নয়। বরঞ্চ অনেকের ধারণায় এইটাই এখন একান্ত আবশ্যক। আজকাল assets and liabilities-এর ভাগ নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা চলছে, বড় বড় বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে, এবং আমরা শুনছি যে এমন শক্ত ব্যাপার আর কিছু নেই। অবশ্য শক্ত মানতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন শক্ত জানা চাই। প্রথম কথা এই যে জনসাধারণের হাতে কোনো তথ্যই নেই; যতটুকু আছে তাও সরকারের দফ্‌তরে; সেখানেও সাজান নেই, কারণ আমাদের সরকার ঐ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনো অনুসন্ধান করেন নি। দেশের আয় (Income) কি কেউ জানেনা। ইংরেজ ঐ প্রকার জ্ঞানে আস্থাবান নয়; মাত্র এই কয় বছর ইংলণ্ডে বাজেট্ এবং সঙ্গে দেশের আয় সংক্রান্ত একটা হিসেব পার্লামেণ্টের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ ইংরেজের দাসত্ব কাটিয়েছেন, ঐ জ্ঞানের প্রতি অনাস্থাটি ছাড়া। দ্বিতীয় কারণ এই যে দায়ভাগের সোজা, মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করলে সর্ব্বনাশ, তাই হিসাব যত গোলমেলে রাখা যায় ততই সুবিধা। মূল বক্তব্য এই: division of assets প্রকৃত পক্ষে ভাগ নয়, গুণ, অর্থাৎ Capital accumulation। যাঁরা ধনসঞ্চয় পদ্ধতি সম্বন্ধে ভেবেছেন তাঁরাই জানেন সে-পদ্ধতিতে একাধিক স্তর ও অবস্থা আছে যা বুঝে ধণিকশ্রেণী ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষে বণিক সম্প্রদায় ধনিক হচ্ছেন। ভারতবর্ষের সমস্যা কি ভাবে এই ব্যবসা-বানিজ্যের ধন উৎপাদনের উপাদানে পরিণত করা যায়, তার অন্ততঃ দুটি পন্থা আছে: (১) ব্যক্তিবিশেষের খরচ করবার পর যতটুকু জমেছে তাই দিয়ে assets কিনে নেওয়া, এবং (২) জন কয়েক পুঁজিদার মিলে কিংবা ব্যাঙ্কের সাহায্যে assets-গুলির মালিকানা, titles of ownership, অধিকার করা। এটা হল acquisition-এর স্তর। তারপর realisation, অর্থাৎ ownership of means of productionকে instruments of the productive process-এ রূপান্তর। আপাততঃ আমাদের দেশে দুটি পন্থাই অনুসৃত হচ্ছে; তবে দ্বিতীয় পন্থার দিকেই ঐতিহাসিক ঝোঁক। যখন realisation-এর জন্য Saved capital যথেষ্ট নয়,

তখন finance-group ও bank-capital চাই। তাই এই division of assets-এর গতিটা Concentration of the ownership of titles-এর দিকে, অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার দিকে হতে বাধ্য। কেবল তাই নয় acquisition ও realisation-এর মধ্যে কিছু সময় যাবেই যাবে, বিশেষতঃ যখন Capital goods মিলছে না। এই অবসরে যতবার title of ownership হাত ঘোরে ততই লাভ। খাট্টা ও ফট্‌কা বাজারের খবর সকলেই জানেন। মালিকানা-সত্ব বিক্রীর সময় মালিক চান বেশী দাম, আর কেনবার সময় কম। এখন যদি মালিক ও ক্রেতার দল শক্তিশালী হন তবে সরকারের ওপর তারা এমন জোর দিতে পারেন যাতে তাঁদের সুবিধা মত মালের ও সত্বের দর বাড়ে কমে। সর্ব্বদেশে তাই হয়েছে, এখানেও তাই হচ্ছে, ও হবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াও ধনিকশ্রেণী সম্মিলিত চেষ্টায় বাজার দর ঘুলিয়ে দিতে পারেন আমরা জানি। এত গেল দায়ভাগের স্বরূপ, যার মুল কথা হল ধনবৃদ্ধি। বিশ্লেষণটি আরো একটু চালালে দেখি ধনবৃদ্ধি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ধনবৃদ্ধির দায়িত্ব কার, তার উদ্দেশ্য কি? যদি বলি দায়িত্ব সরকারের, আর উদ্দেশ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন, তবে দায়ভাগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় আপনা থেকে। কারণ তাতে মালিকানা-সত্বের হাতঘোরা বন্ধ হয়, বাজার দর, acquisition ও realisation-এর অন্তরালে একটি শ্রেণীর হাতে না প'ড়ে, তার লাভের জন্য না উঠে না নেবে, জনসাধারণের প্রয়োজনে নির্দ্ধারিত হতে পারে। যদি আমাদের অর্থনীতিবিদ্ বুদ্ধিজীবিরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার দিকটা লক্ষ্য করেন তবে তাঁদের এমন বিপাকে পড়তে হয় না। সেই জন্যই বলছিলাম আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা একেবারেই ঘুরিয়ে দিতে হবে। সেজন্য জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি অত্যন্ত দৃঢ় করা চাই। না করলে আমরা ঠকব এই হিসেবের মারপ্যাঁচে। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাশ বির্লার ফিরিস্তিতে assets গুলোকে fetish ভাবে ধরা হয়েছে, অর্থনীতিবিদও তাছাড়া তাদের অন্য কিছু ভাবতে আমাদের বলেন নি; তাই ব্যাপারটা অত গোলমেলে ঠেকছে। আদৎ কথাটা নিতান্ত সরল—কার জন্যে দায়ভাগ, কার জন্যে স্বাধীনতা। এতটা লেখবার প্রয়োজন এই যে সামনের কয়েক মাসের মধ্যে, এই রাজকীয় গোলমালের অন্তরালে ধনিক-শ্রেণী আপন শক্তি বাড়িয়ে নেবেই নেবে। অর্থনীতি এতদিন তাদের তরফদারী করে এসেছে, এবার বোধ হয় অর্থনীতিবিদ্-সম্প্রদায়ের স্বাধীন হবার সময় এসেছে। তাঁদের দায়িত্ব এই যুগে খুবই বেশী। কিন্তু নতুন শ্রেণীর সঙ্গে আন্তরিক যোগ না থাকলে দায়িত্বজ্ঞান আত্মম্ভরিতাই থেকে যায়।

দৃষ্টিকোন পরিবর্ত্তনের আরেকটি সিদ্ধান্ত মুসলমানদের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন। যদিও আমি থাকি এমন দেশে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কলুষিত করেনি তবু বিদ্বেষের বহরটা আমার অজ্ঞাত নয়। এই সেদিন সীতাপুর জেলায়

মোহনলাল গৌতমের মতন আগষ্ট-বিদ্রোহী, সোশিয়ালিস্ট একজন তালুকদার সন্তান, হিন্দুসভার মনোনীত সদস্যের কাছে ভোটে হেরে গেলেন। গৌতমের তরফে সমগ্র কংগ্রেস-বাহিনী ছিল। এই অঞ্চলে ব্যাপারটা কল্পনাতীত। তাই বিদ্বেষ যে অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাকে উলটে দিতে হবে। আজ বাঙলা ভেঙ্গে গেল; দুঃখের কথা নিশ্চয়। এককালে বিভাগে আপত্তি আমরা জানিয়েছিলাম, এবার নিজেরাই চাইলাম। দুঃখ এই, তখন কেন পুনর্মিলন চেয়েছিলাম তার গূঢ়ার্থ আজও প্রকট হয় নি। বাইরে ছিল তার দেশাত্মবোধ, অন্তরে ছিল permanent settlement বজায় রাখার অজানিত চাহিদা। এবারও আমরা পুনর্মিলন চাইব—কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে রাখতে নয়। তাকে ভেঙ্গেই পুনর্মিলন সম্ভব। পাকিস্তন-রাষ্ট্র তৈরী হবার পরের দিনই এই ভাঙ্গন সুরু হবে। যদি আমাদের দৃষ্টিকোন সত্যই বদলে থাকে তবে সেই ভাঙ্গনে পাকিস্থানকে সকলেরই সাহায্য করতে হবে। কেবল তাইতেই বিদ্বেষ দূর হবে বলছিনা, তবে একত্রে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্টির পথ খুলতে পারে; এবং সৃষ্টির সুযোগেই হৃদয়ের যোগ হয়। এতদিন যে প্রয়াস চলেছে তাতে না ছিল প্রাণ, না ছিল অর্থ, ছিল আদর্শবাদ; তাই Muslim mass Contact-এর মতন অদ্ভুত পরিকল্পনা দেশের সামনে রাখা হয়েছিল, তাই সেটা নিষ্ফল হল, উলটো ফল ফল্‌ল। এটা মার্কসীয় ব্যাখ্যা নয়, অতি সাধারণ মানসিক ব্যাখ্যা। জনসাধারণ সৃষ্টির সুযোগ পায়নি; জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানরাই প্রধানতঃ মজুর-কিষাণ, নির্য্যাতীত-প্রপীড়িত-অশিক্ষিত; তাই খেয়োখেই চলেছে, এবং সেখানে মুসলমানরাই হিন্দুর চেয়ে আগুয়ান। এই সোজা কথাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে হলে তাকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে হবে; চোখে আদর্শবাদের ঠুলি পরলে স্বাধীন ভারতের প্রতীক রূপ প্রকট হবে না। মুসলমান-প্রীতির অন্য কোনো অর্থ নেই। বলা বাহুল্য, United Bengal আন্দোলনের সঙ্গে এই বিচারের কোনো যোগ নেই।

আরেকটি দৃষ্টান্তঃ দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ নানা কথা বল্লেও একই মনোভাব দেখিয়েছেন। সে-মনোভাব বিশেষ নয়, ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারেও তাই দেখি, অর্থাৎ trusteeship। এই একটি কথা যে পৃথিবীর কত সর্ব্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদেশেও তার নমুনা দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী পুঁজিওয়ালাদের, রাজন্যবর্গকে, সকলকেই অধস্তনশ্রেণীর trustee হতে বলেন; জওহরলাল Constitutional Monarchy কিংবা Ownership চান। এটা উনবিংশ শতাব্দীতে হয়ত চলত—তাও পুরোপুরি চলেনি—এখন ত' একেবারে অচল। আমাদের এখন সোজাসুজি peoples government চাইতে হবে, এবং সেই সঙ্গে peoplesরা

ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্রীড়নক যাতে না হয় তার ওপরও নজর রাখতে হবে। Balkanisation-এর এক উত্তর Balkan peninsula-তেই এবং তার আশেপাশেই আছে। দেশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সব সমস্যা যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেখানে একত্রে সামন্ত, ধনিক, বিদেশীর ষড়যন্ত্র। তাকে ভাঙ্গতে একমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের নতুন শ্রেণীর সামর্থ্য আছে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেই, লীগেরও নেই। সৌভাগবশত বাঙলার সামনে এই সমস্যাটি প্রধান নয়; তবু দেশীয়, করদ-রাজ্যের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়লে মনের দিক থেকে অন্ততঃ খানিকটা লাভ হয়।

এই প্রবন্ধে মাত্র গোটা কয়েক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করলাম। সেগুলি একত্র করবার পর দেখি একটি মাত্র প্রশ্ন উঠেছে—কিভাবে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সম্ভব? বুদ্ধিজীবি হিসেবে একটি উত্তর কলমের মুখে প্রথমেই আসে: পৃথিবীতে যতগুলো বড়ো Civil War হয়েছে তার ইতিহাস মন দিয়ে পড়া। আমরা আজ বছর কয়েক Socialist classics পড়ছি; তাতে উপকারই হয়েছে গড়পড়তা: আজ সেই সঙ্গে Civil War-এর সাহিত্য পড়ার দরকার হয়েছে, বিশেষতঃ আমেরিকার। (যেমন ধরা যাক Leo Huberman-এর We the People) স্পেন, চায়নার গৃহবিবাদটাও জানতে হবে। কিন্তু মাত্র পড়েশুনে যে বড় বেশী দেশের উপকার হবে মনে হয় না। একটা না একটা দলের সঙ্গে যোগ চাই। কোন্ দল? দেশের যতগুলো বামমার্গীদল রয়েছে তাদের দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি, তাদের কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। প্রধান কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদবিদ্বেষ। এতে জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ হয়েছে, অষ্ট্রিয়া লোপ পেয়েছে আমরা সকলেই জানি।

Social Democratic আর Communist Partyর ঝগড়াতেই হিট্‌লারের অভ্যুত্থান সহজ হয়। Otto Baner, Brunthal প্রভৃতি অষ্ট্রিয়ান সোশিয়ালিষ্ট নেতাদের নিজেদের লেখাতেই প্রমাণ হয় যে অত বিদ্যাবুদ্ধি অত সততা থাকা সত্ত্বেও সঙ্কটের সময় তাঁরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য সেই দেশেই অমান্য হচ্ছে ত আমাদের দেশ কোন্ ছার! আমাদের কাছে Social Democracy-ও যা Communismও তা—দুটোই ধরতাই বুলি। অতএব বামমার্গী দলের মিলন বইএর সাহায্যে ঘটাব না। এই খানেই বিচারের প্রয়োজন। বামমার্গীর অন্তর্বিবাদের কারণ কি ব্যক্তিগত হিংসা?

সৌভাগ্যবশত আমি একাধিক পার্টির কর্তৃপক্ষদের চিনি। হিংসার চিহ্ন আমি পাইনি। তাঁরা কি ঐতিহাসিক জ্ঞানে কিছু কম? মোটেই না। প্রকৃত বিদ্বান তাঁদের মধ্যে দেখেছি। হৃদয় অনুন্নত, কারুর বেশী কারুর কম? তাও মনে হয়নি। দেশকে কেউ

বেশী কেউ কম ভালবাসেন ? প্রেমের কষ্টিপাথর আমার কাছে নেই, তবে সকলেই জেলে গেছেন, সকলেরই স্বার্থত্যাগ রোমাঞ্চকর। সকল দলেরই আস্থা কিষাণ মজুরের ওপর। পন্থার পার্থক্যটাও কারণ নয়, সেইটাই প্রশ্ন। জীবনের অন্য দিক থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মানুষের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে সে কতটা নতুন শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার ওপর। নতুন শক্তি সম্বন্ধে কারুর মতভেদ নেই; তা হলে যোগ-সাধনেই পার্থক্য এইটাই বিচারে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বামমার্গীদের গৃহবিবাদের কারণ কোনো দলই শ্রমিক কিষাণের সঙ্গে রীতিমত যুক্ত নয়। আমি কারুর নিন্দা করছি না, কেবল বিচার করছি কেন বামমার্গীর দল মিলতে পারছেনা। অবশ্য সেজন্য নতুন শ্রেণীর অপরিণত অবস্থাও দায়ী; খানিকটা কারণ এই জীবনের objective situation-এর স্কন্ধে দায়িত্ব চাপিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া সোশিয়ালিস্ট-শোভন নয়। তা ছাড়া, আজকার মজুররা—কিষাণেরা না হয় সর্ব্বদাই একটু পিছিয়ে থাকে—কি সত্যই অপরিণত ? আমার সন্দেহ হয়েছে নয়। আমার বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে শীঘ্রই বামমার্গীর মিলন ঘটবে। নচেৎ অতঃ কিম্-এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

"গণআন্দোলনে দলাদলির আবির্ভাব অবধারিত। পৃথিবীর গতি বন্ধ হয়ে যায়নি—পৃথিবী চলছেই; কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেউবা বাস্তব গতির আদর্শে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যান এবং নূতন প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক দলই নিজেদের একেকটি নামাঙ্কন করে' নিজেদের মত অনুসারে আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চান। আন্দোলনের এই আভ্যন্তরীন জীবন মারাত্মক নয়—বরং এতে আন্দোলনের সজীবতাই প্রকাশ পায়, মনে হয় আন্দোলনটি নূতন ঘটনা সম্পর্কে সচেতন। যেসব দলাদলির নীতিগত ভিত্তি নেই তাদেরই নিন্দা করতে হয়—ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্যে ঘোঁট পাকানো বাস্তবিকই গর্হিত। এতে বোঝা যায় বিপ্লবের সঙ্গে এ আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই—এ শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠালিপ্সার জন্মভূমি; শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত সব রকম প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বা শ্রেণীর কল্যাণকে সামনে না রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরী করবার জন্যেই এখানে জন্ম নেয়।" আলবার্ট উইস্‌বোর্ড

মধুসূদনের নাটক

করালীকান্ত বিশ্বাস

আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তি উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। বাংলা নাটকের তখন পরীক্ষার যুগ। সংস্কৃত নাটকের সহিত নাট্যকারেরা পরিচিত ছিলেন, আদর্শ ভাষা হিসাবে সংস্কৃত তাঁহাদের সম্মুখে। আবার নূতন ইংরাজী নাটকের অভিনয় তাঁহারা দেখিয়াছেন এবং বাঙ্গালী অভিনেতা প্রশংসনীয় সাফল্যের সহিত ইংরাজী নাটকের অভিনয়ও করিয়াছে। আদর্শ হিসাবে ইংরাজী নাটকে নূতনত্ব আছে। নূতন জিনিস চমক লাগায়, আকৃষ্ট করে। এই দুইটি আদর্শ ছাড়া বাংলা দেশের নিজস্ব নাটকীয় অনুষ্ঠান যাত্রা ত ছিলই। তদানীন্তন রুচিতে নিতান্ত সেকেলে মনে হইলেও যাত্রা হইতে দুই চারিটি উপাদান গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। কারণ দর্শকদের তাহা খুসী করে। এলিজাবেথীয় যুগে ইংলণ্ডের নাটকে জনপ্রিয় *Comic Interlude* হইতে Fool এর ভূমিকা গৃহীত হইয়াছিল। জনপ্রিয় হইলেই যে তাহা ভাল্‌গার হইতে হইবে এমন কোনও অর্থ নাই। প্রতিভাবান শিল্পী জনপ্রিয় উপাদানকে আপনার ক্ষমতা দিয়া সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারেন। তাহাতে রুচিও পরিবর্ত্তিত হয়।

তখনকার দিনের নাট্যকারেরা এই তিনটি প্রভাবের অধীনে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও রচনায় একটি উপাদানের প্রভাব, কোথাও বা একাধিক। কিন্তু যে কারণে বাঙ্গালীদের ইংরাজী অভিনয় বেশী দিন দর্শকদের তৃপ্ত করিতে পারে নাই, সেই কারণেই প্রথম যুগের নাট্যকারেরা সংস্কৃত আদর্শের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। তখন অস্পষ্টভাবে জাতীয়তাবোধ জাগরূক হইয়াছে, জাতীয় ঐতিহ্যের নূতন চেতনা দেখা দিয়াছে। জাতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম বাহন সংস্কৃত সাহিত্য। এই কারণেই সংস্কৃত নাটকের আদর্শের প্রতি অনুরাগ দেখা দিয়াছিল। গঠনের দিক হইতে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ একাধিকভাবে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কেবল সূত্রধার অথবা নান্দী নহে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী বৃত্তি, পঞ্চ অবস্থা প্রভৃতি যথোপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হইত। প্রাচীনকালে সর্ব্বপ্রকার কলা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ এবং উপাদান একটি শৃঙ্খলার

মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা হইত। ফলে প্রত্যেক কলারই একটি নির্দিষ্ট ফর্ম কিছুদিনের মধ্যেই স্থির হইয়া যাইত। সংস্কৃত নাটকের গঠনে অলঙ্কারশাস্ত্রের কঠোর শৃঙ্খলা রহিয়াছে। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা নূতন নাটক রচনা করিতে গিয়া এই শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যে কেন্দ্রীভূত কাহিনী থাকিলে এই শৃঙ্খলা সার্থক হইত তাহা না থাকায় প্রথম যুগের নাটকের ফর্ম একেবারেই শিথিল। প্লট নাই বলিয়া নাটকের গতি নাই, ক্লাইম্যাক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় নাটকের লক্ষণেরও তাহাতে অভাব। যেখানে কাহিনী নাই, চরিত্রসৃষ্টি সেখানে সম্ভব নহে। তথাপি রামনারায়ণ যে তখনকার দিনে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার কারণ তিনিই প্রথম বাঙ্গালীর জীবন অবলম্বন করিয়া বাংলা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রথম যুগের নাটক সম্বন্ধে কোনও ভ্রান্ত ধারণা হওয়া সম্ভব নহে। বাংলা নাটকের প্রথম প্রচেষ্টা, প্রথম সাহসিক পরীক্ষা হিসাবে নিশ্চয়ই কিছু প্রশংসা দাবী করিতে পারে।

পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পূর্ব্বে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে নাটক অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কথা কেহ ভাবেন নাই। এই রঙ্গালয়ের মারফতেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দেন। বেলগাছিয়ার প্রথম অভিনয় সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ। ইংরেজ অভ্যাগতদের বোধসৌকর্য্যার্থে নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করিবার ভার পড়ে মধুসূদনের উপর। এই অনুবাদ করিতে গিয়া মধুসূদন বাংলা নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকখানি যখন রচিত হয় সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগ তখন অতীত। অনেকে মনে করেন শ্রীহর্ষের সময় নাটক আদৌ অভিনয়ার্থে রচিত হইত না, অন্তত রত্নাবলী রচনার উদ্দেশ্য অভিনয় নহে। অভিনীত হইতে পারা নাটকের অন্যতম প্রধান গুণ। নাট্যকারের লক্ষ্য থাকা উচিত অভিনয়োপযোগিতার দিকে। এদিকে দৃষ্টি না থাকিলে যে সব ত্রুটি দেখা দিতে পারে তাহা গ্রীক ট্রাজেডীর সহিত সেনেকার নাটক তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। রত্নাবলী নাটকের ত্রুটিও হয়ত এই কারণে। মধুসূদনের এই ত্রুটি অপ্রীতিকর মনে হইয়াছিল। বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী নাটকের অভিনয় বহুপ্রশংসিত, কিন্তু সে প্রশংসার কতখানি নাট্যকার এবং নাটকের প্রাপ্য তাহা বিবেচনার বিষয়। মধুসূদন রত্নাবলী নাটকখানি সন্তোষজনক মনে করেন নাই, মৌলিক নাটকের প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবেই অনুভব করেন।

সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলেন। এইভাবে এত অল্পদিনে একখানি সমগ্র নাটক রচনা মধুসূদনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। ইহার পূর্ব্বে মধুসূদন বাংলায় রচনা করা ত দূরের কথা, কখনও চিঠিপত্রও বিশেষ

লেখেন নাই। তাই মধুসূদনের পক্ষে শর্ম্মিষ্ঠা রচনা বিস্ময়কর। অবশ্য কোন একটি শ্রেষ্ঠ নাটকের সহিত তুলনা করিলে উহার অনেক ত্রুটি চোখে পড়িবে। কিন্তু এরূপ তুলনায় শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি অবিচার করা হয়। তুলনা করিতে হইলে সমসাময়িক বাংলা নাটকের পাশে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তখন নাট্যকার রামনারায়ণের দেশজোড়া খ্যাতি, তখনকার দিনে আদর্শ নাট্যকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামনারায়ণ একাধিক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। অনুবাদে যথেস্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও তাহা অনুবাদ, মৌলিক রচনার সহিত তুলনীয় নহে। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ছাড়া ইতিপূর্ব্বে রচিত আরও মৌলিক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগুলি অভিনীত হইয়াছিল কি না তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। মধুসূদন ও রামনারায়ণের রচনা অভিনীত হইয়াছিল।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বে কোনও প্লট নাই। উহা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। বাঙ্গালীর কৌলিন্যপ্রথার প্রতি বিদ্রূপই ইহার উদ্দেশ্য। প্রায় প্রত্যেক দৃশ্যে প্রচুর হাসির খোরাক আছে, তাই সংহত কোন প্লট না থাকিলেও অভিনয় দর্শকদের প্রীত করিয়াছে। কাহিনী নাই, ঘটনাও সেখানে অনুপস্থিত। এই দুইয়ের অভাবে চরিত্র সৃষ্টি করাও রামনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

মধুসূদন একটি সুসংহত কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কাহিনীর আরম্ভ পরিণতি ও শেষ আছে। ইহার পূর্ব্বে নাটকে এমন সংহত কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পৌরাণিক বিষয় গ্রহণ করিয়াও মধুসূদন কাহিনী গঠনে অনেক মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। নাটকের প্রয়োজনে মহাভারতের কাহিনী পরিবর্ত্তিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তনে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার সুযোগ মধুসূদন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বদলে নানা চরিত্রের জবানীতে তিনি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক নাটকের কোরাস অনেক সময় এইরূপে কাহিনীর অংশ বিশেষ দর্শককে বলিয়া দেয় কিন্তু তাহাতে নাটকের গতি ব্যাহত হয় না। শর্ম্মিষ্ঠায় মাঝে মাঝেই দুই জন অপ্রধান চরিত্রের দীর্ঘ আলাপে কাহিনীপ্রকাশ শর্ম্মিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ত্রুটি। ভাষার দিক হইতেও আধুনিক বিচারে অচল ত বটেই, এমনকি রামনারায়ণের ভাষার সহিত তুলনা করিলে শর্ম্মিষ্ঠার ভাষা অনেক আড়ষ্ট। সংস্কৃত নাটকের মত মাঝে মাঝে দীর্ঘ উপমাও নাটকে অচল। রামনারায়ণের নাটক হইতে শর্ম্মিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব কাহিনীর গঠনে এবং চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টায়। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী যতই অস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হউক না কেন, সব মিলিয়া একটি রূপ তাহাদের আছে। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিয়া মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যে, এবং বাংলা ভাষাতে, হাতেখড়ি। প্রথম চেষ্টার সব রকম ত্রুটি ইহাতে

আছে। তথাপি তখনকার অপর নাটকের সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে মনে হইবে যে শর্ম্মিষ্ঠা একজন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রথম প্রয়াস।

শর্ম্মিষ্ঠা রচনাকালে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন: "It is my intention to throw off the fetters forged by a servile admiration of everything Sanskrit." পরে পদ্মাবতী রচনাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন: "If I should live to write other dramas, you may be rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding real National Drama." ইয়োরোপীয় আদর্শ অনুকরণ করিয়া জাতীয় নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব কি না তাহা সমসাময়িক বাংলা নাটকের প্রতি চাহিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। জাতীয় নাটকের সৃষ্টির জন্য কেবলমাত্র যে প্রকৃত আদর্শ নির্ব্বাচন প্রয়োজন তাহা নহে, আরও অনেক কিছু স্থির করিতে হয়। জাতীয় নাটক সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এখন স্বীকার করিতে বাধা নাই যে তখনকার দিনে Servile admiration of everything Sanskrit বাংলা নাটকের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্যতম বাধা ছিল। মধুসূদনের ন্যায় এই মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করা প্রয়োজন ছিল এবং মতানুযায়ী নাটক রচিত না হইলে বাংলা নাটকে নিজস্ব ধারা সৃষ্টি হইবে না। তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হইবে না। বাংলা নাটকের দর্শক বাঙ্গালী, তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের সঙ্গে নাটকের ব্যবধান যদি বেশী হয় তবে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইলেও আপনার বলিয়া দর্শকেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। প্রকৃত জাতীয় নাটকের অন্যতম লক্ষণ এই ব্যবধান রহিত করা। সংস্কৃত নাটক যে সামাজিক পরিবেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল না। কাজেই খাঁটি বাংলা নাটকের পত্তন করিতে হইলে প্রথমে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ছিল।

মধুসূদনের সংকল্প সাধু হইলেও শর্ম্মিষ্ঠা রচনাকালে তিনি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি নাটক রচনা করিবার সংকল্প করিয়াই অভিজ্ঞান শকুন্তলা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। শকুন্তলা নাটকের প্রভাব শর্ম্মিষ্ঠায় বহু আছে। ডক্টর সুকুমার সেন দেখাইয়াছেন যে অনেকস্থানে শর্ম্মিষ্ঠা শকুন্তলার ভাবানুবাদ। কিন্তু তথাপি ইহাকে শর্ম্মিষ্ঠার প্রধান ত্রুটি বলা যায় না। শর্ম্মিষ্ঠার রচনাকাল বাংলা নাটকের প্রথম পরীক্ষার যুগ ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি সমস্যার তখন সমাধান হইতে বাকি। নাটকের ভাষা প্রধানতম সমস্যা। বাংলা গদ্য তখন এতটা বিকাশ লাভ করে নাই যাহা সুষ্ঠুভাবে নাটকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে দুঃসাহসিক প্রতিভা থাকিলে একেবারে কথ্য

ভাষায় নাটক রচনা সম্ভব মধুসূদনের সে প্রতিভা ছিল। কিন্তু নাটকের ভাষা-সমস্যার সমাধান তিনি অন্যভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন। পদ্মাবতী রচনা করিয়া তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, "I am of opinion that one drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees." তখনকার দিনের গদ্য অথবা মধুসূদন যে গদ্য নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় অমিত্রাক্ষর যে নাটকের অনেক উপযুক্ত মাধ্যম তাহাতে সন্দেহ নাই। পদ্মাবতীতে তিনি স্থানে স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার এই প্রথম। পদ্মাবতী নাটকের এই কারণে ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন যে কত নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল তাহা এস্থলে আলোচনা না করিলেও চলে। বাংলা নাটকে এই ছন্দের উপযোগিতা যে কতখানি তাহা 'কলি'র প্রথম স্বগতোক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

পদ্মাবতী মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক। গ্রীক পুরাণ হইতে Judgment of Paris এর কাহিনীটি ভারতীয় কাঠামোয় ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। কাহিনী গঠনে মধুসূদন এখানে যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠায় যে সব ত্রুটি ছিল পদ্মাবতীতে তাহা অনেক দূর হইয়াছে। ভাষা অনেকটা সরল, কাহিনীর গতিও শর্ম্মিষ্ঠার মত শিথিল নহে। মধুসূদন এখানে স্পষ্টই নাটক রচনার কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই দুইটি নাটকের তুলনায় শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি নিজের ব্যক্তিগত আকর্ষণের কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যক্তিগত রুচি সমর্থনযোগ্য। নাটক রচনার কৌশলে এবং ভাষায় শর্ম্মিষ্ঠা হইতে পদ্মাবতী উন্নততর হইলেও, নাটকের চরিত্রগুলির নিজের কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। শচী, মুরজা এবং রতির ইচ্ছাধীনে তাহারা চলাফেরা করিতেছে। তাহার সুখ দুঃখ তাই অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হয়—মন স্পর্শ করে না।

কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের পূর্ণতর ক্ষমতার পরিচায়ক। কৃষ্ণকুমারী নাটকের মঙ্গলাচরণে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দই নাটকের উপযুক্ত ভাষা। তবে দর্শকদের কান এই ছন্দে অভ্যস্ত নহে, তাই তিনি কৃষ্ণকুমারীতে আদৌ অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ করেন নাই। হয়ত পদ্মাবতীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ দর্শক ও পণ্ডিতদের মহলে বিরূপ সমালোচনা হইয়া থাকিবে। বাংলা গদ্যেরও যে নাটকের ভাষা হইবার মত গুণ আছে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। যে কারণেই হউক, কৃষ্ণকুমারীতে তিনি গদ্যই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং এই গদ্য অপর দুইটি নাটক অপেক্ষা অনেক সরল। পৌরাণিক উপমা প্রয়োগ করা

মধুসূদনের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। কথিত আছে যে সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও তিনি অনেক সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে উপমা প্রয়োগ করিতেন। সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া মধুসূদন কতখানি গ্রীক বা ল্যাটিন সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা পণ্ডিতদের বিচার্য্য। কিন্তু পুরাণ হইতে উপমা প্রয়োগে এবং ছন্দের নির্ব্বাচনে মনে হয় প্রাচীন বৈদেশিক কবিদের মধ্যে মিল্টনই মধুসূদনকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পৌরাণিক উপমা স্থান বিশেষে খুবই কার্য্যকরী, তবে নাটকের উক্তিতে উহার প্রয়োগ সংলাপকে অকারণে ভারী করিয়া তুলিয়াছে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচিত হইবার পরে তাহা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবে বলিয়া সমস্ত ঠিক হয়, এমন কি রিহার্সালও আরম্ভ হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাহা আর অভিনীত হয় না। সাহিত্যপরিষদ হইতে মধুসূদনের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। তিনি বলেন যে আধুনিকদের ব্যঙ্গ করাতে তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি পাইকপাড়ার রাজাদের এই প্রহসনখানির অভিনয় বন্ধ করাইতে বাধ্য করেন। ইহা একটি অন্যতম কারণ হইতে পারে। তবে কারণটি যথেষ্ট যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে প্রাচীনপন্থীদের প্রতি বিদ্রূপ আছে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু আসলে উহা ভণ্ড ধার্ম্মিকদের প্রতিই আক্রমণ। যাহারা প্রাচীন সংস্কারের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া লোকাচারকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া কতকগুলি আচরণ মাত্র সম্বল করিয়াছে, ফলে প্রাচীন অথবা নবাগত কোনটিই গ্রহণ করিতে পারে না, ধর্ম্মের আচরণ যাহাদের মুখোস মাত্র, আক্রমণ তাহাদেরই প্রতি। কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি লেখকের সমালোচনা হইতে মনে হয় যে প্রাচীনপন্থীদের মনে এই প্রহসন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আধুনিকেরা চটিয়াছিল 'একেই কি বলে সভ্যতা' দেখিয়া। সামান্য পরিবর্ত্তনে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মূল সামাজিক ত্রুটি আজিও বাংলা দেশ হইতে দূর হয় নাই, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার এখন হয়ত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের এই প্রহসন দুইখানি অভিনীত হইল না। কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্য সম্বন্ধেও মধুসূদনের সন্দেহ ছিল। বেলগাছিয়ায় নাটক তিনখানি অভিনীত হইল না, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও অভিনয়ের কোন উদ্যোগ দেখাইলেন না। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হওয়াতে বেলগাছিয়া নাট্যশালাই উঠিয়া গেল। মধুসূদনের নাট্যরচনার উদ্যমও শেষ হইয়া গেল।

প্রহসন দুইখানিতে, বিশেষ করিয়া 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানিতে

গঠনের যে উৎকর্ষ মধুসূদন দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে যে সারল্য আনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে আশা হয় যে পরবর্ত্তীকালে নাটক রচনা করিলে আরও উন্নত ধরণের নাটক রচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত। কৃষ্ণকুমারী নাটকেও প্রথম চেষ্টার দ্বিধা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, লেখক আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। নাটকের উপাদান আরও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীতে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য অথবা সংলাপ একেবারেই নাই, নাটকীয় ঘটনা শেষ পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর এবং মদনিকার চরিত্র পূর্ব্বে রচিত যে কোনও নাটকের চরিত্র অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। কৃষ্ণকুমারী তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ নাটক নিশ্চয়ই, বাংলা নাটকের ইতিহাসেও তাহার স্থান অবিসম্বাদিত। তথাপি মনে হয় নাটকখানি যেন একটু পাণ্ডুর, একটু প্রাণহীন। তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাতে ভীমসিংহ বিচলিত, কন্যাস্নেহের সহিত রাজকর্ত্তব্যের সংঘাত ভাল ফোটে নাই। বরং শেষের দিকে ভীমসিংহ একটু বেশী 'নাটুকে'। জগৎসিংহের প্রতিশোধ লিপ্সাও মনে রেখাপাত করে না। পাইকপাড়ার রাজাদের নিকট হইতে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহ না পাইয়া মধুসূদন নাটক রচনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী রচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে তিনি 'রিজিয়া'র আখ্যানভাগ লইয়া নাটক রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। Indo-muslim বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিলে passion-এর প্রকাশ দেখাইবার সুযোগ অনেক বেশী একথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন। রিজিয়া যদি তিনি লিখিতেন তাহা হইলে কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা পূর্ণতর একখানি নাটক যে বাঙ্গলা সাহিত্য লাভ করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শেষ জীবনে তিনি 'মায়াকানন' নাটকটি রচনা করিয়াছিলেন। রচনা তিনি সম্পূর্ণ করিলেও সংস্কার করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার প্রমাণ আছে। সংস্কৃত অবস্থাতেই উহা প্রকাশিত হইয়াছে ধরিয়া লইয়া উহাতে মধুসূদনের রচনা কতখানি আছে নিশ্চিত বলা যায় না। তবে মায়াকাননে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারীর সহিত একটি মূলগত ঐক্য আছে। তিনখানি নাটকেই নিয়তিই সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজীবনের এই একান্ত নিয়তিনির্ভরতা গ্রীক ট্র্যাজেডিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধুসূদনের নাটকেও তাহা হয়ত গ্রীক ট্র্যাজেডি হইতেই আসিয়াছে। মধুসূদনের আপন জীবনের ব্যর্থতাতেও ভাগ্যের খেলা অস্পষ্ট নহে। মায়াকাননের নিরাশাময় অবসান হয়ত তাঁহার নিজের জীবনের ব্যর্থতারই পরিচায়ক।

মধুসূদনের নাটক কয়খানি বিচার করিতে হইলে সমসাময়িক নাট্যকারদের সহিত তুলনা করা উচিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মধুসূদনের পূর্ব্বে অথবা একই সময়ে

অনেকে নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নাটুকে রামনারায়ণের রচনাই সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রাহ্য, প্রথম প্রকৃত নাট্যকার হিসাবে। রামনারায়ণ হইতে মধুসূদন অনেক দিক হইতেই মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। কাহিনী অবলম্বনে, প্লট গঠনে, নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভাবনায় মধুসূদন নিশ্চয়ই রামনারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরিত্রসৃষ্টিতেও মধুসূদনের কৃতিত্ব বেশী, কিন্তু রামনারায়ণের ভাষা মধুসূদন অপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ ও সরল। প্রহসন রচনাতে রামনারায়ণ একটি বিশেষ ষ্টাইল সৃষ্টি করেন। রামনারায়ণের প্রহসনে আক্রমণ তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝ খুব বেশী। মধুসূদনের প্রহসনগুলিতে আক্রমণের তীব্রতা নিতান্ত .কম নহে ; কিন্তু মধুসূদনের Joke, হাস্য সৃষ্টি করিবার জন্য হালকা ঠাট্টা রামনারায়ণের প্রহসনে নাই। যে সমস্ত বিষয় লইয়া রামনারায়ণ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, সমাজের সেই সকল ত্রুটি রামনারায়ণের যুগেই অপস্রিয়মান; এখন তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। কাজেই রামনারায়ণের নাটক এখন পাঠ করাও দুঃসাধ্য। সাহিত্য ইতিহাসের পাঠক ছাড়াও অপরে মধুসূদনের রচনাগুলি পাঠ করিয়া এখনও আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু রামনারায়ণ পরবর্ত্তী যুগের নাট্যকারদের রচনার একটি আদর্শ জোগাইয়াছেন। মধুসূদনের ভাগ্যে dramatists' dramatist হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। প্রাচীন ইতিহাসে যে নাটকের উপাদান মিলিতে পারে এই সন্ধান মধুসূদনই দিয়াছিলেন। তথাপি পরবর্ত্তী যুগের নাট্যকারদের আদর্শ রামনারায়ণ, মনোমোহন বসু—মধুসূদন নহেন। কিন্তু মধুসূদনের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী অনেক লেখকের রচনা কালের প্রভাবে লীন হইয়া ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের নাটকগুলি কালের পেষণে প্রস্তরীভূত হইয়া আজও বর্ত্তমান।

কবিতা

সবুজ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো পড়েনি চোখে এতটুকু সবুজ আকাশ।
উঁচু পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে উড়ে যেতে হাঁস—
নক্ষত্র-বিলাস অবকাশ।
কত সম্ভাবনা খুঁজে খুঁজে
বিহ্বল পাখির মত মাথা ঠুকে খিলানে, গম্বুজে
আকাশের একটু বিস্তার,—
জীবনের খোলা জানালার
একটিও পাখি থেকে কোনো রং, স্বাদ, ঘ্রাণ আর
পাইনা পাইনা একবার।

বুজে গেছে এ জীবন কাদা আর পাঁকে,
যেমন পোকাকে ঘিরে মাকড়সা থাকে।
রোদ, ফুল, অবকাশ মৌমাছি পাখে
নেই নীল অরণ্যের স্বাদ।
দীঘির জলের মত কাদা-ঘোলা মতন আহ্লাদ।
মনে নেই কোনদিন নীলাকাশে
জেগেছিল চাঁদ।

কোথায় ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত নীল মহাকাশ?
মসৃণ সিল্কের মত মিহি রেনেসাঁস—
কতদূরে সবুজ আভাস?

এখানে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে সবুজ ইশারা।
দিগন্তে কোথাও নেই আকাশের নীল আকর্ষণ।
হৃদয়ো গিয়েছে বুজে সংকুচিত পাখার মতন—
নক্ষত্রের নেই আয়োজন।

আমরা ভেবেছি শুধু আকাশের 'পরে আছে আরেক আকাশ ঃ
সবুজ শস্যের ভারে খোলা মাঠ, ফসলের ঘ্রাণে সব ভিড় করে হাঁস
হৃদয়কে কাছে পাই ঃ নামে অবকাশ,
সপ্রতিভ মুখ এক রাঙা অভিলাষ।

যে আকাশ ঢেকে আছে সবুজে সবুজে
স্বাদ তার মরা-পৃথিবীতে মরি খুঁজে।

রাত্রি

চিত্ত ঘোষ

সূর্য্যদীপ্ত দিন
দিগন্তে বিলীন ;
সমুদ্রের রাত :
অরণ্যের অন্ধকারে
কি পাখী শিকার করে
কৌশলী কিরাত।

নীল চোখে ঘুম :
ঝরা পাতা, শিশির নিঝুম ;

তবু যেন চাঁদ হাসে
কারা কথা কয়,
মৃত্তিকার অন্ধকারে ঘুম ভেঙে
কারা জেগে রয়।

আরেক জগত—
সূর্য্যের প্রত্যাশী নয়
রাত্রির কাঙাল।
প্রান্তরে সন্ধ্যায় সেথা
অবিচ্ছিন্ন কুহকের
মুগ্ধ মায়াজাল।

আকাশের মৃত অন্ধকার—
বীতবহ্নি—অবরুদ্ধদ্বার,
স্তব্ধ মাঠ—স্তব্ধ শাল বন,
নীল চোখে পৃথিবীর বিস্মিত স্বপন।

ঘুমন্ত আকাশ তবু শোনে
সূর্য্যহীন সময়ের বনে
বিষন্ন মৃত্যুর কোন গান;
অবরুদ্ধ হৃদয়ের কোন অবসান,
অথবা সে অতীতের শরবিদ্ধ প্রাণ
বেদনার আকুতি জানায়,
বিবর্ণ মানুষ তবু শতাব্দীর অন্ধকারে
বধিরের মতন ঘুমায়।

ঘুম—শুধু ঘুম
ঝরা পাতা—শিশির নিঝুম

তবু কারা জেগে থাকে
কারা জাগে রাত
অরণ্যের অন্ধকারে
কি পাখী শিকার করে
কৌশলী কিরাত।

দ্বিপ্রাহরিক

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

দীপ্র আলোয় দ্বিপ্রহরে
অগ্নি ঝরে।
সময় সাগর দিগন্তহীন
মনের খেয়ায় দূর গগনে হয় বিলীন—
চায় বিরাম—
পরম বাণী এই লভিলাম।

শুনি মনে
বনছায়ায় অনেক ছুটির আমন্ত্রণে
মহাকালের মহল খোলে—
অবকাশের মাধুরিমায় হৃদয় ভোলে।

শৃঙ্খলিত বিবশ প্রাণে
মধ্যদিনের মেদুর গানে
শ্রমের দাহ ক্লান্তি আনে।
দীপ্র আলোয় দ্বিপ্রহরে
মৃত্যু ঝরে, অগ্নি ঝরে।
নাই বিরাম—
অশ্রুজলে তাই লিখিলাম।

বনানীকে

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উত্তর হাওয়ার দিনে
মাঠের হলুদ তৃণে
নীল ছোঁওয়া অন্ধকারে, নির্জন ছায়ায়,
নিস্তরঙ্গ জলের মতন
সন্ধ্যা নামে, হাওয়ার তরঙ্গে
ঝরে স্থর
অস্পষ্ট মধুর,
যখন ঘাসের বন
শীতল শিশিরে ডুবে যায়,
কোন এক কার্তিকের
কিংবা অঘ্রাণের
মাঠে মাঠে হাওয়ার তরঙ্গে
সে সব আশ্চর্য শব্দ।

আকাশের নিবিড় নিস্তব্ধ
গোধূলি মদির নীল, নীল যবনিকা
বিচ্ছিন্ন মেঘের মত পাতার অরণ্যে চেয়ে দেখা ;
বনানী তোমার মন
জানে কী সে
নির্জনতা কখন ঘনায়,
দু'চোখে বিস্ময় ছেয়ে আসে
ছায়ানীল তারার আকাশে !
হঠাৎ কখন
নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়,
রাত্রিচর পাখী কোন' উড়ে যায়
একটি রেখার শিষ টেনে
হাওয়ার তরঙ্গে আর পাতার অরণ্যে।

স্মরণ

তারাপদ গংগোপাধ্যায়

প্রিয় মালু, তোকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। যদি বলো এ চিঠি লেখা কেন, উত্তর দিতে পারবো না। যেমন নিজের জীবনের অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারি নি তোর কাছে, এমনকি নিজের জীবনের ঘটনাপরিক্রমা পর্যন্ত বলি নি তোর কাছে। তোর অকুণ্ঠ আত্মীয়তায়, সারল্যে নিজকে অনেক সময় বিস্ময়ান্বিত বোধ করেছি। কিন্তু ঐটুকুই, আর বেশীদূর এগুতে পারি নি। আর আমার জীবনে নতুন কোন ঘটনাও ছিলো না যা বল্‌তে পারি কারো কাছে, যেটুকু ছিলো সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু আজকে মনে হয় তোকে কাছে পেলে ভাল হ'তো। নিজকে খুলে ধরতে পারতুম, নিজের মনের দ্বন্দ্ব আর আকুতি সেটা পরিস্কার করে নিতে পারতুম। জানি না এখন তুই কেমন আছিস, ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত আছিস্ না নিজকে বাঁচিয়ে রেখেছিস সব কিছু থেকে। যাক্‌, যার জন্যে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি সেটাই জানাই আগে। একদিন বিকেল বেলা স্বামী এসে বল্লেন— প্রদোষকে চিন্‌তে না? সে আস্‌ছে এখানে চেঞ্জে।

যাঁর নাম বল্লেন তাঁকে চিন্‌তে পারি নি প্রথমে। তারপর যখন খুলে বল্লেন, চিন্‌লুম। সত্যি করে বল্‌তে কি খুসীও হ'লুম। খুব খুসী, খুসীর আবেগে কপালের সিঁদুরটা দিতে গিয়ে একটু এদিক ওদিক হোয়ে গেলো। আয়নার ভিতর নিজের চোখদু'টো দেখ্‌লুম কেমন চক্‌চকে হোয়ে উঠেছে। ফিরে বল্লুম—তিনি না জেলে ছিলেন এ্যাদ্দিন।

—ছাড়া পেয়েছে। একটু চুপ্‌ কোরে থেকে বল্লেন আবার—একটা ভাল দেখে ঘর গুছাতে হয়। আমাদের শোবার ঘরটা ছেড়ে দি।

—দেখো যেটা ভাল বোঝ সেটা করো।

—আমার মনে হয়, ও বেশ অসুস্থ। বোধ নয় জিরোতে চায় এখানে ক'দিন।

আমি এর কোন উত্তর করলুম না।

প্রদোষবাবুকে যেদিন চিনি সেটা খুব ভাল স্মৃতি নয় আমার কাছে। কিন্তু সে স্মৃতিই যে মনে একদিন আকুলতা জাগাবে তাও ভাবি নি কোনদিন। জানিস্ তো, নিজে ভাল গান গাইতে পারতুম, এ নিয়ে গর্ব ছিলো আমার। কলেজ ছাড়ার পরও সারা ভারতবর্ষ বেড়িয়েছি নিজের এই গর্বটুকু ছড়িয়ে দেবার জন্যে। সত্যি বল্‌তে কি, বোম্বে রেডিয়োতে গাওয়ার পর অনেক প্রশংসা-লিপি পেয়েছিলুম, সেটা আমার গর্বের স্মারক। কিন্তু কোন মিউজিক কম্পিটিসনে যোগ দিইনি, কারণ যে নিয়ে এ্যাদ্দিন গর্ব করছিলুম তা যদি সেখানে

স্থান না পায়, সেটা আমার পরাজয়—এ গ্লানি সইতে পারতুম না কোনদিন। কিন্তু এ পরাজয়ই সইতে হ'লো একদিন।

বিয়ের পর প্রথম শশুর বাড়ীতে পদার্পণ করলুম। বনেদী বংশের বনেদী চাল। ঘর সংসার জমজমাট। ভাসুর ননদ দেওর। অভাব নেই কিছুর। বৌ দেখ্‌তে এসেছে সবাই। নিজের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে যে এ্যাদ্দিন গর্ব করতুম তাও দেখি ঝাপ্‌সা হোয়ে আস্‌ছে। দেখি আমিও ঘাব্‌ড়ে গেছি। বুকটা আমার কাঁপ্‌ছে, ঘামে ভিজে উঠেছি। সে ধাক্কা যখন কাটালুম, পরদিন আর এক পরীক্ষা, বিকেলে আমায় নিয়ে সবাই বসেছে গান শুন্‌বে। মস্ত হল। ওঁর বন্ধুবান্ধবে, ননদজাদের সাথীতে ঠাসাঠাসি। আরও ভয় এ বাড়ীতে যারা বউ হোয়ে এসেছে আর যারা আছে, কেউ রুচিতে শিক্ষাদীক্ষায় কম নয়। আমার বড় জা ভাল গান গাইতে পারেন, আই·এ পর্যন্ত পড়েছেন। মেজো জা স্কুল কিম্বা কলেজের শিক্ষা নেই, কিন্তু তিনি শিক্ষিতা। সবচেয়ে তাঁর বড় গুণ, তিনি ছবি আঁক্‌তে পারেন, ঘরের দেওয়াল তিনিই চিত্রিত করেছেন শুন্‌লুম। আর সেজো আমি। সবাইএর মনে কি আছে জানি না কিন্তু আমি শংকিত হোয়ে উঠ্‌লুম। কি হ'বে আমার এখানে, কোন পরীক্ষা? এ্যাদ্দিন যা থেকে বাইরে থাক্‌তে চেয়েছি, তাই জড়িয়ে ধরলো আমায়। গ্যাসের বাতি জ্বল্‌ছে। তানপুরা বাঁশের বাঁশী সেতার সব আনা হোয়েছে, সব ফরাসের ওপর শোয়ানো। কি গাই এখানে আধুনিক না ক্লাসিক? ভয় করতে লাগ্‌লো, সত্যি বল্‌ছি ভয় করতে লাগলো। আমার বড় ভাসুর বল্লেন—গাও বৌমা লজ্জার কি। দেখি আমার শাশুরী এসে পাশে বসেছেন—এতে লজ্জার কিছু তো নেই। যে জিনিষ জানো তা নিয়ে আনন্দই তো করবে। কেমন একটা মস্ত ভরসা পেলুম, সত্যি বল্‌ছি সাহস পেলুম এই কথাটায় এই ভরসায়—যেন বরাভয় এলো।

সেদিন দুর্গা রাগিনীর একটা গান গেয়েছিলুম মনে আছে। শুনেছি দুর্গা সুর মেয়েদের গলায় ভাল ফোটে না। কিন্তু আমি গানটা গাইলুম নানাভাবে চিত্রিত করে; আমার যে অস্তিত্ব, এ্যাদ্দিনকার যে বিস্তৃতি সেটা স্থিতিবান হোক, জীবন্ত প্রাণবান। গান যখন শেষ করলুম, হলটা থম্‌থম্ করছে। মনে হোলো এখন কি হয়, কিছু কি মন্তব্য আসে? শাশুরী বল্লেন—বেশ শিখেছো, সাধনা করে শিখেছো। সত্যি বল্‌তে কি খুসী হ'লুম, মনের অন্তর্বাস খুসীর আবেগে ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌লো। দেখি বড় জা আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লেন—চমৎকার। জয়জয়ন্তী জানিস্, গা। জমে উঠ্‌বে। আমার হাসি এলো। নতুন বৌ হোয়ে এসেছি, আবার যদি কেউ গাইতে না বলে গাই কি ক'রে। দেখ্‌লুম আমার স্বামী বসেছেন ভাসুরের কাছাকাছি। খুসীর আবেগে তাঁর চোখমুখ ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর। আমার নীলাকাশ ভরে উঠ্‌লো। আমার শ্বশুর এসে কখন বসেছিলেন খেয়াল করি নি,

তিনিই বল্লেন—আরও কয়েকখানা গাও। অনেকেই শুনতে এসেছে। অনেক আবার কে? চোখ তুলে দেখি, বোধ হয় শ্বশুরের বন্ধুবান্ধব—গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত।

এই যে জীবনের প্রাপ্তি এর থেকে আর বড় প্রাপ্তি মেয়েদের কি হ'তে পারে। এত আদর, এত স্নেহ, এত সম্ভ্রম—আর কি বেশী চাওয়া হোতে পারে। খুসীতে উজ্জ্বল হোয়ে আরও গান গাইলুম। কত গান গেয়েছিলুম ঠিক মনে নেই, তবে অনেক। গানের ভাষা প্রাণ পায় যে বৈচিত্র্য দিয়ে সেই বৈচিত্র্যই টেনেছিলুম।

কিন্তু অবশেষে, যখন শেষ গানটা গাওয়া হোয়ে গেছে, ভাসুর জিগ্যেস করলেন একজনকে—কি রকম লাগ্‌লো। কথাটা বল্‌তেই আমি মুখ তুলে চাইলুম। দেখি যাকে বল্‌ছে,ন তিনি মৃদু একটু হাস্‌লেন।

—আমার মতটা কি একান্তই প্রয়োজনীয়?

দেখি আমার ভাসুর উত্তর করলেন—প্রয়োজনীয় না হলেও মার্জিত।

কথাটা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লুম। আবার এক ঝলক তাকালুম। সেইটুকুর ভিতর দেখলুম শুধু, চোখে চশমা, খদ্দর গায়।

—খুব ভাল আমার লাগে নি। যে অনুভূতিতে গান প্রেরণা পায় সেটুকু পাইনি।

হঠাৎ মনের ভিতরটা হা হা করে উঠ্‌লো। বুকের ভিতরকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস একযোগে বন্ধ হোয়ে গেলো কেন। আমার সামনে বসে ননদ জারা নানা আলোচনা করছে। কিন্তু আমার কাণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। আবার তাকাতে চেষ্টা করলুম। কৈ ঐ ভদ্রলোক? ফের কিন্তু আর তাকাতে পারি নি। সত্যি, এ কি লজ্জা এ কি কথা! আমার চোখ দিয়ে জল আস্‌তে চাইলো দুঃখে। জানিস্ তো, আমরা মেয়েরা বড় অভিমানী। আমাদের লজ্জা—সে লজ্জা যদি বাহিরকে না টান্‌তে পারলো, আমরা মরে যাই অভিমানে। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগ্‌লো ততই মনে হোতে লাগ্‌লো সেদিন, ভদ্রলোকের এ অভিমানের কথা, ঈর্ষার কথা। কিম্বা ব্যক্তিত্বকে একক করবার জন্যে নিজের আত্মগর্বিত মনকে উঁচুতে ধরে রাখা। রাতে স্বামীকে পর্যন্ত জিগ্যেস করলুম —কি রকম লাগ্‌লো গান।

স্বামী বল্লেন—ভাল।

—ভাল কেন। দোষ ত্রুটি কি কিছুই নেই?

—ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে আমার চোখে ধরা পড়ে নি। স্বামী হাস্‌লেন, আদর করে কাছে টান্‌লেন। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। স্বামী জিগ্যেস করতে লাগ্‌লেন, হঠাৎ কাঁদার মানে কি, উত্তর দিতে পারি নি সেদিন। কিন্তু আজকে ভেবে লজ্জায় মরে যাই, মনে হয় নিজকে ছোট অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু আমার এ বেদনা হোয়ে রইলো যেন, যেন দাগ। তারপর দেখ্‌লুম ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর স্থান আছে। তিনি যা করেন তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় সবাই। তখন মনে হোলো কে এ যাকে ছাড়া এ বাড়ীর অর্দ্ধেক কানা ?

শুন্‌লুম একদিন। একধরণের মানুষ আছে না যারা সব কিছু থেকেও নিরালা থাক্‌তে চায়, এঁ সে ধরণের মানুষ। আরও শুন্‌লুম কাঁথীতে লবণ আইন করবার সময় বুকে লাথি মেরেছিলো পুলিশ। সে ব্যথা এখনও সারে নি। এখনও মাঝে মাঝে বুকের ব্যথায় কষ্ট পান। শুনে যেন মরে গেলুম, নিজে কেমন ব্যথাও পেলুম। এত কষ্ট কেন, কিসের জন্যে, কিসের তাগিদে ? দেখতুম যখন বাড়ীতে 'আস্‌তেন, কথা বল্‌তেন চল্‌তেন ফিরতেন—আশ্চর্য সীমা রেখে। যা বলেন তা যেন নিজেরই। মনে হয় অনেক পরীক্ষার পর, অনেক সাধনার পর, অনেক জীবন উপলব্ধি করার পর— তাঁর কথা, বসা, চলা। যে ভাবে বলেন—মনে হয় তার ভিতর জোর আছে, চিন্তা আছে, দাবী আছে। কিন্তু জোর দিয়ে তো বলেন না, অন্যকে টানবার জন্যেও নয় তো, অন্যের যুক্তির ওপর নিজের চিন্তাটা স্থায়ী করবার জন্যেও যেন নয়—যা মনে এসেছে তাই শুধু বলে গেলেন। কিন্তু সব শেষে মনে হয় তার অস্তিত্ব, তার বিস্তৃতি। অনেক দিন আড়ালে আড়ালে থেকে দেখেছি, শুনেছি—আর ভেবেছি এ রকম তো জীবনে দেখি নি। অনেক সকাল সন্ধ্যায় গল্প করেও কাটিয়েছি, কিন্তু একদিনের জন্যেও আমায় নিয়ে আলোচনা করেন নি। আমার গান নিয়ে, যেটা আমার সুখের স্বপ্ন—তা নিয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলেন নি। অনেক সময় রাগ হোয়েছে, মনে হোয়েছে কেন তিনি বলেন না আমায় একটা গান গাইতে—কত সাধ, ইচ্ছা, বাসনা। সেদিন তাঁর চোখে যা ফোটাতে পারি নি, তিনি যদি বলেন একদিন গাইতে আমি ফুটিয়ে তুল্‌তে পারবো। আমি বাঁচবো, আমার প্রাণের গতি-স্বচ্ছলতা আস্‌বে। অনেক সময় দুঃখের আতিশয্যে তাঁকে মনে হোয়েছে সিনিক, তিনি যেন পারিপার্শ্বিককে ঘৃণা করেন। কিন্তু একদিন শুনে আশ্চর্য হোয়ে গেলুম। তিনি এক সময় ভাল গান গাইতেন, খুব ভাল। কিন্তু কাঁথীর ঘটনার পর আর গাইতে পারেন না, বুকে লাগে। স্বামীকে জিগ্যেস করলুম—সত্যি ! স্বামী বল্লেন, সত্যি। তবে কার ওপর এ্যাদ্দিন অভিমান করেছি। সত্যি, মানুষ চেনা বড্ড দুর্ঘট। না হয়, এর ওপর কেন রাগ করেছি ? কেন ? এ যে বড় দুঃখের মানুষ, বড় বেদনার ! এরপর যখন একা যেতুম, মনে হোতো তার কাছে বসে থাকি। এঁকে ভালবাসা যায় অন্তরে বসানো যায়—তার বেশী চাইতে গেলে মন ওঠে না। মনে হয় নিজকে দূরাগত, অস্পষ্ট।

তারপর একদিন শুনলুম—ধানবাদে এ্যারেষ্ট হোয়েছেন। তারপর পূরো পাঁচ বছর, পূরো পাঁচ বছর।

আর সেদিন স্বামী এসে বল্লেন এখানে আস্‌ছেন—আমাদের এই মধুপুরের বাড়ীতে। খুসী আমি হ'বো না তো কে হবে।

যেদিন আস্‌বেন ঘসামাজা করলুম নিজকে। নিজের রূপ নিয়ে যে গর্ব ছিলো একদিন সেই রূপ ফোটালুম না, ফোটালুম আমার পারিপার্শ্বিককে। সাধারণ একটা শাড়ী পরলুম, কপালে সিঁদুর পরলুম যত্ন করে, খয়েরি রংএর ব্লাউজ আঁটলুম। কিন্তু যখন এসে নাম্‌লেন আশ্চর্য হোয়ে গেলুম। এ কি চেহারা! পাণ্ডুর, যেন হোল্‌দে। চোখের ওপর চশমাটা ঢিলে হোয়ে গেছে। চুলগুলো বড় হোয়ে কানের পাশ অবধি নেমেছে। যে নাকটা ছিলো তীক্ষ্ণ, সরু সরল—সেই নাকই সমস্ত মুখের ওপর বেখাপ্পা। মনে হয় ওঁকে জীর্ণ, রোগক্লান্ত। আমায় দেখেই হাস্‌লেন এক গাল—ভাল আছেন। ভাল আছি জানালুম, হাত তুলে নমস্কার করলুম। ঘরে নিয়ে বসাবার পর চারিদিক দেখ্‌লেন। তারপর আমার ওপর চোখ তুলে বল্লেন—বেশ গুছিয়েছেন। আমি হাস্‌লুম। স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করলেন দেশের খবর, বল্লেন—খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়তে পারতুম না, এতখানি দোষ করেছিলুম। বলে সহজ সরলভাবে হেসে উঠলেন—আর আজ থেকে আমার ছুটী। এখানে ক'দিন জিরিয়ে নি। বলেই আমার দিকে মুখ তুল্লেন—না হয় টিক্‌বো না হয়তো বেশীদিন। তারপর তোর কি খবর। স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন। আমি ওঁদের ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলুম। দুধ গরম করলুম, ডাবের জল, কমলা নিলুম। হাতে নিয়ে দিতেই হেসে ফেল্লেন—ডাক্তারের কাছে রোগীর রোগ লুকোবার উপায় নেই। ছাখো অতুল পথ্য পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমি হেসে ফেল্লুম কথাটা শুনে, বল্লুম -আপনার চেহারা তো রোগ লুকোতে দিচ্ছে না। কথাটা শুনে চুপ কোরে রইলেন কিছুক্ষণ, তাপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—বোধ হয় অথর্ব হোয়ে গেলুম অতুল। সুভাষ বসুর অন্তর্ধানের পর আমায় পাঁচ মাস সেলে আট্‌কে রেখেছিলো। তিনি কোথায় গিয়েছেন এ খবর আমি জানি এই সন্দেহে। এখন ঘুম হয় না, মাস চার হয় একদম ঘুমুতে পারি নি। একটু এদিক ওদিক হ'লেই বুকের ব্যথাটা জোর দিয়ে ওঠে। এ্যাদ্দিন একটা বুকে ব্যথা ছিলো এখন দু'টো বুকে। নিঃশ্বাস নিতে মনে হয় হাড় পাঁজর ছিঁড়ে গেলো বুঝি। ও কষ্টও কষ্ট মনে করি না, কিন্তু ঘুম যে হয় না এ কষ্ট সইতে পারি না। ঘুমের জন্যে এখন বড় কাতর। যদি ভালমত ঘুমুতে পারি আবার হয়ত বেঁচে উঠ্‌তে পারি।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তা দেখে হেসে ফেল্লেন তিনি—কাঁদছেন

কেন, কাঁদবার কি আছে। গর্কির একটা কথা জানেন তো, We are dangerous to the government as we speak the truth। এটাই সত্য, truth I have realised, truth I have seen, এর থেকে আর সত্য কি।

কিন্তু আমি চলে এলুম সেখান থেকে। মানুষের এই পরিণতি কেন? কেন এই দুঃখস্বাদ? সেদিন এর উত্তর পাইনি। আজকে মনে হয় পেয়েছি। জীবন দেখার একটা আশ্চর্য অনুভূতিও এসেছে।

এরপর যদ্দিন ছিলেন কাছে কাছে থাক্‌তুম। তিনি রসিকতা করতেন আমি উপভোগ করতুম, তিনি গল্প করতেন আমি শুন্‌তুম। এ এক আশ্চর্য স্বাদ। অনেক সময় মনে হোতো, রোগক্লিষ্ট শরীর নিয়ে কোথায় পেলেন এই আশ্চর্য আনন্দের উচ্ছ্বাস। এ যে চিরবসন্ত, চিরপ্রশান্তি।

কিন্তু একদিন রোগটা যেন কেন বেড়ে গেলো। বেশ ছিলেন, হাস্‌তেন গল্প করতেন, রাত্রে ঘুমও হ'তো। কিন্তু সকালে উঠে দেখি তিনি কাশছেন, কপাল লাল হোয়ে উঠেছে, ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত। চোখ বোজা, মুখখানা লাল। কপালে হাত রাখ্‌তেই দেখি চোখ মেলে চাইলেন। তারপর হাস্‌লেন ও কিছু না, নিত্য নৈমিত্তিক। বসুন।

—কিন্তু আপনার গা পুড়ে যাচ্ছে।

—রাতে ঘুম হয় নি, সেজন্য। বিকেলের দিকে থেমে যাবে আবার। অতুল কই।

—আস্‌ছে।

—হ্যাঃ অতুলকেই পাঠিয়ে দিন।

কি জন্য আমায় যেন উঠিয়ে দিলেন। আমি গরম দুধ পাঠিয়ে দিলুম। বেশ গল্প করলেন দু'জনে দেখ্‌লুম। মনে হোলো যে অসোয়াস্তি পাচ্ছিলেন কেটে গেছে তা। কিন্তু তখন কি জানি, তিনি মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন, সমস্ত কিছু—সমস্ত ব্যাথা বেদনা।

সন্ধ্যের দিকে আমার স্বামী এসে জানালেন—একটা কাজ করতে পারবে। আমি চোখ তুল্লুম, এমন কি কাজ।

—বড্ড অসোয়াস্তি বোধ করছে। একসময় শুধু বল্‌ছিলো গান শুন্‌তে চায়, একটা গান গাইতে পারবে?

মনের ভিতর যেন একটা দোলা দিলো। কি করি, কি করি এখন? অনেকদিন তো গাই নি, গলার স্বতঃসিদ্ধ ভাব কি আছে? তবু স্বীকার করলুম। মনে অনুশোচনা

এলো, কেন সেধে বলি নি এ্যাদ্দিন, কেন নিজে গিয়ে দাঁড়াই নি। মনটা বেঁকেও উঠ্‌লো ওঁর উপর, কি চাপা। মুখফুটেও কি বল্‌তে দোষ ছিলো।

ঘরে ঢুকে দেখি চুপ কোরে শুয়ে আছেন। ডাক্তার সাম্‌নে, স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পদশব্দে মুখ তুলে চাইলেন, তারপর হাস্‌লেন—কি খবর, আপনারা বড্ড ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন আমায় নিয়ে।

—আপনি গান শুন্‌বেন বলেছিলেন। কোন ভূমিকা না করেই বলে ফেল্লুম।

হাস্‌লেন কথাটা শুনে, খুসীও হ'লেন দেখ্‌লুম। বল্লেন—ও জিনিষে তো কোনদিন অরুচি নেই।

আমি গাইলুম মীরাবাঈএর সেই ভজন। 'ম্যায় চাকর রাখো জী'। আশা এখানে, সবুজ আশা। জীবনের কথা, মানুষের কথা। আমার জীবনের ভবিতব্য, মানুষের জীবনের ভবিতব্য। সব, আমার জীবনের সব। যদি বাঁচাতে পারি, যদি মনে কোন প্রতিক্রিয়া আন্‌তে পারি।

গান শেষ করে দেখি তাঁর চোখে জল। এ কি পাওনা, একি মূল্য? হেসে বল্লেন—চমৎকার। আর কিছু না। কিন্তু আমি তো জীবন পেয়ে ছিলুম, নতুন আশা?

কিন্তু রইলো না। তার পরদিন নিয়ে গেলেন কলকাতায়, এক্সরে করে দেখবে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিলো। আমার মনে হোলো যেতে নাহি দেবো। জানালায় দাঁড়িয়ে এই কথাটাই মনে হোলো। তিনিও হেসে বল্লেন—ফিরে আমি আস্‌বোই, আপনার গান শুন্‌তেই আস্‌বো।

কিন্তু আসেন নি।

আজকে জল ঝরছে। সারা চোখে, সারা মনে—দেশময় পত্রিকা ওঁর গুণগান গেয়েছে দেখলুম। কিন্তু ওরা কেউ জানে না, তিনি কি ছিলেন—আমি জানি তাঁর জীবন কি ছিলো, কি হোতো এবং কি হোতে পারতো। কিন্তু হয় নি, হয় নি কেন এর উত্তর নাই দিলুম। আমার জীবনের উত্তর পেয়ে গেছি, এটাই সান্ত্বনা, এটাই পাওনা, এটাই আমার সব।

বাংলার দারিদ্র্য

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দারিদ্র্যের উপকারিতা নিয়ে সেক্সপীয়র যতো অবিস্মরণীয় শ্লোকই রচনা করে থাকুন যারা সত্যিকারের দরিদ্র তারা তা থেকে বিন্দুমাত্রও প্রেরণা লাভ করবেনা। "The poor do not praise poverty"—কথাটিতে শ্লোক-মাহাত্ম্য না থাকলেও নির্জ্জলা সত্যের অভাব নেই। আজন্ম দারিদ্র্যের ব্যাধি বহন করে কেউ দারিদ্র্যের প্রশংসা করতে পারে না—অন্ততঃ ইদানীংকার ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে অগ্রসর হবে না।

পরাধীনতার দিনগুলোতে পরাধীনতার প্রিয় সহচর দারিদ্র্যকে আমরা নিরুপায় ভাবে বরণ ও বহন করেছি। পরাধীনতার অবসানে ন্যায্যতঃ দারিদ্র্যের অবসান হওয়া উচিত। পরাধীনতার মতোই দারিদ্র্যকেও আর আমরা বহন করবনা—এমন একটা ইচ্ছা আমাদের মনে তীব্র হয়ে না উঠ্‌লে দারিদ্র্যের অবসান অসম্ভব। আমাদের রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্যের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে—এখন সামাজিক কর্ত্তব্যের সুরু হওয়া দরকার। সমাজ দারিদ্র্যের অবসান চায়—সমাজের প্রথম এবং প্রধান দাবী তা-ই। তাই আজ যে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন ভারতবর্ষে বা স্বাধীন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাইবে তার ভিত্তি সমাজের এই প্রথম ও প্রধান দাবীর উপর রচিত হওয়া চাই। দারিদ্র্য দূর করবার তীব্র ইচ্ছা এবং অটল কর্ম্মশক্তি নিয়েই নূতন রাষ্ট্রকে আবির্ভূত হ'তে হবে।

স্বাধীনতা অর্জ্জনের গুরু দায়িত্ব কংগ্রেস বহন করেছেন—নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্বও সম্প্রতি কংগ্রেসের উপরই ন্যস্ত। রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জ্জন আর রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন এ দু'টি কাজের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু সমাজের কল্যাণকামনাই যখন রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জ্জন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনকে উদ্‌বুদ্ধ করে তখন সেই পার্থক্য সঙ্কুচিত হয়ে আস্‌তে বাধ্য। দেশের দারিদ্র্য-মোচনে কংগ্রেস ইচ্ছা ও শক্তির অভাব বোধ করবেন না বলেই সমাজমন আশা করে। ভারতভুক্ত নববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে রাষ্ট্রাদর্শ ঘোষণা করেছেন তা থেকে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতি পরিচ্ছন্ন হয়ে ফুটে উঠেছে—আমরা বুঝতে পেরেছি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পত্তন করতে চান। সমাজতন্ত্রকে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন বলে বর্ণনা করা যায়—কাজেই দেশের দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের আদর্শে রাষ্ট্র-পরিচালনার সঙ্কল্প করেছেন।

কিন্তু সমাজতন্ত্র কথাটির সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা আর আজকের দিনে কেউ দিতে

পারেন বলে মনে হয়না। সমাজতন্ত্র বল্‌তে অনেক কিছুই বোঝায়, অনেক কিছুকেই সমাজতন্ত্র বলা হয়। মার্ক্স-লেনিন-ষ্টালিন-গান্ধীজি ("Socialism is a beautiful word and so far as I am aware in socialism all the members of society are equal—none low none high...." *Gandhiji—Harijan 13-7-47.*) সবাই সমাজতন্ত্রী অথচ সবাই এঁরা বিভিন্ন মতের সমর্থক। তবে এঁদের সবার মতবাদেই একটি অভিন্ন সুর শুনতে পাওয়া যায়—সেদিক থেকে এঁরা সবাই এক। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হলে সেই সুরটিকে আমাদের অবলম্বন করতে হ'বে। সবাই এঁরা বলছেন দেশের সম্পদের উপর কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের অধিকার নেই—অধিকার সমগ্র সমাজের। দেশের সম্পদের উপর সমগ্র সমাজের অধিকার স্থাপনের প্রস্তাবই সমাজতন্ত্রের ঐক্যতানে মূল সুর। কিন্তু অধিকার কথাটি সবার মনে সমান আসন পায়নি—অধিকারের একটি খণ্ডিত রূপই সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রের অবয়ব তৈরী করেছে। অধিকারের সম্পূর্ণ রূপটিকে সাম্যবাদের দায়িত্বে অর্পণ করে সমাজতন্ত্রবাদে খানিকটা অধিকার ভুঞ্জন করতে পারলেই যেন সমাজ আপাতত খুশী। সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা না-ই বা থাক্‌ল, কয়েকটি ক্ষেত্রে অধিকার অর্জ্জন করে কিছুকাল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌-এ বসবাস করা মন্দ কি? আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ সমাজকে ব্যক্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়নি, আংশিক মুক্তি দিয়েছে—সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের পূর্ণ স্বরাজ নয়, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্‌। সমাজতন্ত্রবাদকে এ-মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে গেলে তার একটা সংজ্ঞা নিরূপণ অসাধ্য নয়। অর্থনীতির ভাষায় তার এ-ধরণের একটা সংজ্ঞা হতে পারে: সমাজতন্ত্রবাদে প্রকৃতিজাত এবং মানুষের তৈরী সমস্ত মৌলিকদ্রব্যের মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট; জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে খানিকটা সাম্য-বিধানই তার লক্ষ্য।

এ-সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে, একদিকে ধনতন্ত্র এবং অপরদিকে সাম্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের সূত্রগুলো ধরা পড়ে। বলাবাহুল্য যে পার্থক্যগুলো ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনমূলক। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনের মৌলিক ব্যাপার ও বিষয় যেমন ব্যক্তিকর্ত্তৃত্বাধীন, ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদনও ঠিক তা-ই। সাম্যবাদ উৎপাদনের এই দুই স্তরকেই সমাজিক কর্তৃত্বে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ ধনোৎপাদনের মৌলিক ব্যাপার ও বিষয়ের উপর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই নিরস্ত হয়, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বে ও মালিকানায় থাক্‌লে তার আপত্তি নেই। বণ্টনের বেলায় দেখ্‌তে পাই ধনতন্ত্র সেখানে গুরুতর অসাম্যের সৃষ্টি করে চলেছে; জাতীয় আয় বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধনতন্ত্র সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকে স্ফীতকায় এবং বৃহৎ অংশকে অনশনজীর্ণ করে তোলে। সাম্যবাদ এই অসাম্যের উচ্ছেদ-প্রয়াসী; সাম্যবাদ

মনে করে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যবস্তু বিতরণ করা হবে। সমাজতন্ত্রবাদ ততটুকু অগ্রসর হ'তে রাজি নয়, তাই বলে—সামাজিক শ্রমের ভাণ্ডারে মানুষ তার খুসীমাফিক শ্রম দান করুক, উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী মানুষ ভোগ্য-বস্তুর অধিকারী হবে। কাজেই সমাজতন্ত্রবাদে অসাম্যের অবসানের সম্ভাবনা নেই—ব্যক্তিগত আয়ের গভীর অসাম্য মোচনের জন্যেই সমাজতন্ত্রবাদ সচেষ্ট। সেখানে অসাম্য থাকবে কিন্তু উঁচু পাহাড় আর গভীর গহ্বর তৈরী করে ধনতান্ত্রিক চিত্র অঙ্কন করবেনা। ধনতন্ত্র বিশ্বময় যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে তাতে ধনতন্ত্রের প্রতি বীতস্পৃহ হওয়া প্রত্যেক অনুন্নত দেশের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু ধনতন্ত্রের উৎপাদন-শক্তি সম্বন্ধে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র বিন্দুমাত্র সন্দিহান নয়। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি-জাত অদ্ভুত উৎপাদন-শক্তি ব্যক্তিগত মুনফার উদ্দেশ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই সে-শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সে শক্তিজাত পূর্ণ সম্পদ থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়ে চলেছে। সাম্যবাদ সে-শক্তির পূর্ণ বিকাশ কল্পনা করে; সমাজতন্ত্রবাদ মনে করে, সমাজের প্রয়োজন অনুসারে সে-শক্তির বিকাশ সম্ভব। সামাজিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ধনতন্ত্র কেবল মুনফার নির্দ্দেশেই চল্‌তে চায় বলে আজকের দিনের সমাজ তার অদ্ভুত উৎপাদন-শক্তির সুযোগ গ্রহণ করবার লোভেও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনা।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিগত মুনফার বৃত্তিকে সমাজতান্ত্রিকরা যথোচিত আক্রমণ করে থাকেন বটে কিন্তু মুনফা-বৃত্তি যে উৎপাদনের সহায়ক এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন না। জন্ ষ্ট্রেচির এ-কথাগুলো থেকেই তা বোঝা যায়ঃ "The conception that men will work only in so far as they are encouraged to work by increased rewards is a product of the developing economic system of the last five hundred years." (*The theory and Practice of Socialism*). কাজেই উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদে সমাজতন্ত্রও উৎপাদন-ব্যবস্থায় মুনফার বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। যে কোনো উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করাই মুনফার বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া—এবং যেহেতু সমাজতন্ত্র নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করতে ইচ্ছুক নয় তারই জন্যে বলা যায় যে ধনতন্ত্রের মুনফাপ্রবণতা থেকে সমাজতন্ত্র নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের আধুনিক রূপ সম্বন্ধে এটুকু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা এই কারণে যে নববঙ্গের আসন্ন রাষ্ট্ররূপ সমাজতান্ত্রিক হবে। বৈদেশিক ধনতন্ত্র আমাদের আর কিছু না দিক—শোষণের পীড়ন বুঝিয়ে দিয়ে গেছে—কাজেই ধনতন্ত্রের উৎপাদন-ক্ষমতা স্বীকার করলেও উৎপাদন-বৃদ্ধির উপায় হিসেবে তাকে আমরা গ্রহণ করবনা। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে

দারিদ্র্য দূর করবার কর্ম্মসূচি যদি আমাদের গ্রহণ করতে হয় তাহলে আধুনিক সমাজতন্ত্রের শরণ নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ-সমাজতন্ত্রের মূল সুর হচ্ছে, সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদন এবং 'উৎপাদনের প্রয়োজনে মুনফার প্রশ্রয়'। 'মুনফার প্রয়োজনে উৎপাদন'—এই ধনতান্ত্রিক নীতিকে এড়িয়ে যেতে পারলে দারিদ্র্যের উপশম অনিবার্য্য। আর আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি।

উৎপাদনের রূপ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বাংলাদেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান নয়। উৎপাদনের উপকরণের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। নববঙ্গের এমন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের তৈরী উৎপাদনোপকরণ আছে কি যার উপর নির্ভর করে আমরা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করতে পারি? গোটা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ মূলত কৃষির উপরই নির্ভরশীল। যে পরিমাণ যন্ত্রশিল্পের প্রসার এখানে হয়েছে তার মারফৎ জাতীয় আয়ে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো অঙ্ক সংযোজিত হবেনা। এই কৃষিতেও আবার বিচিত্র কৃষি-সামগ্রী উৎপন্ন হয়না—ধান আর পাটই আমাদের মুখ্য কৃষি-সম্পদ। বাঙালী জনসাধারণের মুখে দুবেলা অন্ন তুলে দেবার সামর্থ্যও এ-দু'টো সম্পদের নেই। কাজেই আমাদের দারিদ্র্যের ছবিটি সত্যি ভয়াবহ। এ বছরের হিসেবে নববঙ্গ ২৬,০০,০০০ টন চা'ল বাজারে দিতে পারবে—কিন্তু মাথাপিছু দৈনিক আধসের হিসেবে বছরে নববঙ্গের অধিবাসীদের ৩২,০০,০০০ টন চা'ল দরকার। কাজেই দুবেলা প্রত্যেকের মুখে গ্রাস তুলে দিতে হলে নববঙ্গকে ৬০০,০০০ টন চা'ল কিনতে হ'বে—১২৲ টাকা করে মণ কিনতে হ'ল চা'ল কেনার খাতে নববঙ্গকে ২২ কোটি টাকা খরচ করতে হয়। —(*Report of the President of 'Bengal Rice Merchats' Association*)। পাট বিক্রীতে নববঙ্গ যে ক' কোটি টাকা পেতে পারে—তা বাদ দিলেও ভাত জোটাবার জন্যে তার বেশ কয়েক কোটি টাকা দরকার। আজ হোক বা কাল হোক আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেই এ-টাকার সংস্থান করতে হ'বে। অবশ্য তার আগে নববঙ্গের ৬০ লক্ষ বিঘে পতিত জমিতে ধান উৎপন্ন করবার ব্যবস্থা করে দেখা উচিত যে চা'লের এই ঘাট্তি দূর করা যায় কি না। নববঙ্গের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপে এই বিষয়টি যদি সর্ব্বপ্রথম স্থান না পায় তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের পথে যে একটি পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি হবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

খাদ্যের ব্যাপারে এ ঘাট্তি চুপ করে সয়ে যাওয়ার মানে জনসাধারণের উৎপাদনশক্তি এম্নি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে অনশনের ভীতিতেও তা আর উর্দ্ধগামী হতে চায়না। জাথার-বেরি আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে দারিদ্র্যের কারণ বলে বর্ণনা করলেও একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন: "Whatever tends to reduce the productivity of the people must be regarded as a cause of poverty." —এই 'whatever'-টি

শুধু আধ্যাত্মিকতা বা স্বাভাবিক কর্ম্মবিমুখতা নয়। আমাদের উৎপাদন-শক্তি ইংরেজ আমলে প্রেরণা লাভ করেনি; ইংরেজ-সরকার আমাদের অর্থনীতি অনুযায়ী দেশের সম্পদবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা করেননি। পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করতে হলে যে-পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয় তা সাধারণ চাষীর সাধ্যের অতীত। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায়ই কেবল এই দুরূহ কাজটি সম্ভবপর ছিল। কিন্তু খাদ্যের মতো এমন জরুরী প্রয়োজনের তাগিদেও রাষ্ট্র জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের উৎসাহ সঞ্চার করেন নি। রাষ্ট্র যেখানে সমাজের প্রভু সেখানে সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে উৎসাহিত ও বর্দ্ধিত করবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞদের নীরবতা এবং আমাদের উৎপাদনশক্তির ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে তাঁদের প্রগল্ভতা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, হাস্যকর। খনিজ-সম্পদ সম্পর্কে ইংরেজ আমল যে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, কৃষি সম্পর্কে যদি তা-ও অনুসরণ করত তাহলে এদেশের লক্ষ লক্ষ বিঘে পতিত জমি অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থাক্‌তনা। কৃষিকর্ম্মে উৎপাদনবৃদ্ধির বিন্দুমাত্র স্পর্শ আমরা ইংরেজের ধনতন্ত্র থেকে লাভ করতে পারিনি।

কৃষি-বিষয়ে আমাদের সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাই কৃষির বর্ত্তমান অনুন্নত স্তর থেকেই সুরু করতে হবে। কৃষির মতো একটি জরুরী উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দরিদ্র ও অশিক্ষিত কৃষকসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যৌথকৃষিকেন্দ্র তৈরী করাও হয়ত সম্প্রতি সম্ভব নয়, তাই রাষ্ট্রকে দেখ্‌তে হ'বে যাতে দেশের সর্ব্বত্র, বিশেষ করে পতিত জমির অঞ্চলে, কতকগুলো যৌথকৃষি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবার সুযোগ পায়। শিক্ষিত ও সুযোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে, ভূমিহীন কৃষকদের শ্রম-নিয়োগে এবং রাষ্ট্রের অকৃপণ সাহায্যে এ-ধরণের কৃষিপ্রতিষ্ঠান অচিরে নববঙ্গের শস্যসম্পদের অপূর্ণ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধির এই ন্যায্য ও প্রাথমিক দাবী যদি নববঙ্গের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুচারুভাবে পূরণ করতে পারেন তাহলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য সত্যি করে আমাদেরও হ'লো।

ছুটি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপকার করবার নেশা কখনো কখনো যে ব্যাধির মতো পেয়ে বসে এটা আগে জানতনা সুকুমার।

তোমার আমার এবং আরো দশজনের মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষ। শ্যামবর্ণ, লম্বা দোহারা চেহারা, কপালটা প্রতিভাবানের মতো প্রশস্ত হতে গিয়ে হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। বাপ একটা বিলিতি ব্যাঙ্কের পুরোণো চাকুরে, বাগবাজারে নিজেদের একখানা প্রায় পুরোণো মাঝারি ধরণের দোতলা বাড়ি। ব্যাঙ্কে যা আছে সুকুমারের ছোট দুটি বোনের বিয়ে দিয়েও ভবিষ্যতে অপব্যয় করবার মতো উদ্বৃত্ত থাকবে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত জীবনের পরিতৃপ্ত আবহাওয়ায় বড় হয়েছে সুকুমার, কলেজে লেখাপড়া করেছে এবং ছাত্রনেতা হয়ে না উঠুক নেতাদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়িয়েছে বিশ্বস্ত অনুগামীর মতো। তিন মাস অনার্সের ক্লাস করেছে, অঙ্কের জন্যে ডিস্টিংশনটা না পেয়ে বি-এটাও পাশ করে গেছে। তারপর পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েটে ভর্ত্তি হয়ে যখন ল-টাও সুরু করবে ভাবছে এমন সময় একশো টাকা মাইনেতে বাপ ওকে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

অতএব আর কিছুই করবার নেই। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন সুকুমার। তিন পুরুষের বাঁধা শড়কে বাঁধা নিয়মে পা ফেলে এগিয়ে চলা—ব্যতিক্রম নেই কোথাও, ব্যত্যয় নেই কোনো কিছুর। নটা-পাঁচটার ঘড়ির কাঁটায় ঘুরছে নিয়ন্ত্রিত নির্ভুল দিন; কড়া ইস্ত্রীর শার্টের ওপরে ছিটের কোট, পকেটে পানের ডিবে আর নস্যির কৌটো। কোনো কোনো দিন অফিসের পরে ছোটে খেলার মাঠে—মোহনবাগানের সীজন-টিকেট কেনা আছে একটা; মাঝে মাঝে সিনেমায় যায়, লরেল-হার্ডির ভাঁড়ামিতে প্রাণ খুলে হাসে। ছুটিছাটার দিনে আবার কখনো যায় বন্ধুর বাড়ি বৈদ্যবাটিতে—বাঁধা পুকুরে হুইল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করে।

বেশ ছিল সুকুমার।

কিন্তু এক একটা দিন আসে। এক একটা আশ্চর্য দিন। জীবনচক্রের সঙ্গে রুটিনে মেলানো বাঁধা ছুটি নয়, একটা আকস্মিক ব্যাঙ্ক হলিডে। রেসের মাঠে পাঁচ টাকার বাজী জেতবার মতো কিংবা ক্রশ্-ওয়ার্ড পাজ্‌লে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া তিন টাকা সাড়ে

ন আনার মতো একটা ছুটি—ছেলেমানুষের মতো খুশি করে তোলে মনকে। অকারণে নিজেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে মনে হতে থাকে, মনে হয় অপ্রত্যাশিত একটা সম্পদ এসে পড়েছে মুঠোর মধ্যে; কী ভাবে তাকে ব্যয় করা যাবে, কী উপায়ে সার্থক করে তোলা যাবে তাকে, ভেবে যেন দিশে পাওয়া যায়না।

এমনি একটা দিন সুকুমারের বাঁধা পথটাকে অকারণে বাঁকিয়ে দিলে একটু; বেলা সাড়ে নটায় ডালহাউসি স্কোয়ারে যাওয়ার পথে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে একটা অচেনা গলিতে ঢুকে পড়বার মতো।

সকালে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে স.ঙ্গই মনে হয়েছিল জানলা দিয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে নতুন একটা অপরিচিত আকাশকে; বৃষ্টি-ধোয়া অপরূপ একটা পরিচ্ছন্নতা, একটা আশ্চর্য নীলিমা; মেঘের ছোটো ছোটো টুকরোগুলো যেন ছুটির অহেতুক আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুটপাথের ওপরে তারের জালে শিশু শিশুগাছটার পাতাগুলো অতিরিক্ত সতেজ আর সবুজ—তাদের ওপর দিয়ে পি:লে পিছলে পড়ছে সোণালি রোদ। পাশের বাড়ির কার্ণিশে তিন চারটে পায়রা, চোখ বুজে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সকালের রোদে নিমগ্ন হয়ে গেছে। ওদিকের ছাতে একটি কিশোরী মেয়ের একখানা টুকটুকে মুখ আর একরাশি এলোচুল যেন এই প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটির সঙ্গে এক তারে আর এক সুরে বাঁধা।

ভারী খুসি মনে বিছানা ছেড়ে উঠল সুকুমার। চা খেল, দাড়ি কামালো, তারপর কড়া ইস্ত্রির শার্ট আর ঘামে মলিন কলারওয়ালা ছিটের কোটটাকে সরিয়ে রেখে পরলে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী, গুণ্ গুণ্ করে গান গাইতে গাইতে নেমে এল রাস্তায়।

বাগবাজার স্ট্রীট্ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল চৌমাথাটার দিকে। একবার বেল্‌গাছিয়ায় পূর্ণর ওখানে গিয়ে তাস খেলে আসা চলে, আড্ডা জমানো চলে হাতীবাগানের ফোটো আর্টিষ্ট 'কমন' মামার ষ্টুডিয়োতে। কোথায় যাওয়া যেতে পারে এবং কোথায় গেলে এই উপরি-পাওনার দিনটিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যাবে এটা নিশ্চিতভাবে স্থির করবার আগে মনে পড়ল কাঁটাপুকুরে একবার ভবানীর খোঁজ করলে মন্দ হয় না। এত কাছাকাছি থাকে অথচ বছরখানিকের মধ্যে দেখাই হয়নি ভবানীর সঙ্গে।

কথাটা মনে পড়তেই ঠোঁটের কোনায় সরু এক ফালি কৌতুকের হাসি ফুলে গেল সুকুমারের। ভারী বিনীত আর ভালো মানুষ ভবানী—অকারণ বিদ্রূপ আর অহেতুক বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করে চমৎকার আনন্দ পাওয়া যায় খানিকটা; বিব্রত বিপর্যস্ত ভবানী প্রাণপণে চা আর খাবার খাইয়ে মুখবন্ধ করবার চেষ্টা করে তার, কাতর স্বরে বলে, কেন ভাই ওসব পুরোণো কথা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করছ, যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে।

কলেজ জীবনে কো-এডুকেশন ক্লাশের একটুকরো রোমান্সই হচ্ছে ভবানীর ব্যথার জায়গা। তার আহত বেদনার্ত মুখের যন্ত্রণার রেখা এক ধরণের জৈব আনন্দে উল্লাসিত করে তোলে সুকুমারকে।

সুকুমার দরজার কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিলে ভবানীর বোন পূর্ণিমা। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করলে সুকুমার। সেদিনকার ছোটো মেয়েটি এক বছরের ভেতরে দস্তুরমতো একটি তরুণী হ:য় উঠেছে—ভারী আশ্চর্য তো।

পূর্ণিমা, ওরফে নিমু কেমন চমকে উঠল, সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, ওঃ, আপনি! নিমুর চমকটা লক্ষ্য করে সুকুমার হেসে উঠল: কেন, আমাকে আর কিছু ঠাউরেছিলে নাকি? অনেকদিন আসতে পারিনি—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। তা ভবানী কোথায়?

—দাদা?—নিমুর মুখের রঙটা বদলে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল: দাদা তো নেই বাড়িতে।

—বাড়িতে নেই!—সুকুমার নিরুৎসাহ হয়ে গেল: বেরিয়েছে বুঝি!

নিমু কথা বললে না। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে। একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিমুর মুখের ওপরে বুলিয়ে নিয়ে সুকুমার বললে, তবে আর কী হবে, যাই। ভবানী এলে বোলো, আমি এসেছিলাম।

নিমু এবারেও জবাব দিলে না, কেমন বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল। ঠোঁট দুটো একটুখানি শিউরে উ:ঠই থেমে গেল, যেন কী একটা বলতে গিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। তারপরে আবার আস্তে আস্তে তেমনি ভাবেই নাড়ল মাথাটা।

কেমন খটকা লাগল সুকুমারের, কেমন যেন মনে হল ঘুম ভাঙা চোখ মেলে জানলা দিয়ে যে নীল নির্ম্মল উজ্জ্বল দিনটি সে দেখেছিল তার সঙ্গে এর সুর মিলছে না। একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইল ব্যাপার কী, কিন্তু পরক্ষনেই মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, আচ্ছা, আসি আজ।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় পেছন থেকে ডাক এল, শুনুন?

সুকুমার থেমে দাঁড়িয়ে গেল। নিমু ডাকছে।

বিষণ্ণ ম্লান স্বরে নিমু বললে, মা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

এটা অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞাসায় কপাল কুঁচকে সুকুমার বললে, আমার সঙ্গে? কেন?

জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়েই নিমু বললে, ভেতরে আসুন।

কিন্তু ভেতরে পা দিতেই তীব্র একটা অস্বস্তি সুকুমারের শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল। অভাব আর অস্বাস্থ্য যেন শ্বাসরোধকারী খানিকটা গ্যাসের মতো পাক খাচ্ছে সমস্ত বাড়িটাতে। ভবানীদের অবস্থা ভালো নয় এটা সুকুমার জানত, কিন্তু সে যে এত খারাপ সুকুমার তা কল্পনাও করতে পারেনি। বাইরের ঘরের মধ্যবিত্ত রূপটা নিম্নবিত্ত অন্তঃপুরকে কী বিভ্রান্তিকর একটা প্রচ্ছদপট দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, ভাবতেও রোমকূপগুলো একসঙ্গে শির শির করে শিউরে উঠল সুকুমারের।

যে ঘরে নিমু তাকে নিয়ে গেল, সে ঘরটিতে এই আলোয়-ভরা প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটিও সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্নতায় স্তিমিত হয়ে আছে। উপরি-পাওয়া ছুটির দিনটি এখানে এসে রূপায়িত হয়েছে মৃত্যুবিবর্ণ শোকদিবসে। চুণ-বালির আস্তরখানা নানা রঙে চিহ্নিত, নোংরা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকানো চলেনা। একটা পচা চিমসে গন্ধ সমস্ত নাকমুখকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে—ইঁদুর মরে পচতে শুরু করেছে কোথাও। ঘরের একটিমাত্র জানালা—ওদিকের বাড়ির নোনাধরা একটা দেওয়ালে অবরুদ্ধ, জানলা আর দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গাটুকু আকীর্ণ হয়ে আছে পাহাড় প্রমাণ ছাইয়ে আর আবর্জনায়, সম্ভবত ওখানেই স্বর্গীয় হয়েছে ইঁদুরটা। ঘরে তক্তপোষ নেই; মেজেতে ময়লা বিছানা, দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে রঙচটা গোটাকয়েক ট্রাঙ্ক, লক্ষ্মীর আসন, নিম্নবিত্তের গৃহস্থলীর সরঞ্জাম।

গরমে আর দুর্গন্ধে যেন দম আটকে এল সুকুমারের, সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘামের স্রোত নামতে লাগল ময়লা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে। একটা ছেঁড়া শাল বুক পর্যন্ত টেনে ভবানীর মা শুয়ে আছেন। ব্যাধি। এই ঘরের সঙ্গে এমনি একটা অসুস্থতা না থাকলে সমস্ত জিনিসটাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এবং, সুকুমারের অবচেতন মন আশা করতে লাগল ব্যাধিটা যক্ষা হওয়াই উচিত।

কিন্তু হাঁপানি। কামারশালার ইঁদুরে-কাটা পুরোণো হাপরের মতো শব্দ করতে করতে ফ্যাসফেসে গলায় ভবানীর মা বললেন, এসো, বোসো বাবা।

এদিকে ওদিকে বিপন্নের মতো তাকালো সুকুমার—বসবার একটা জায়গাই খুঁজতে লাগল বোধ করি। তারপর ধপ করে মরীয়া হয়ে মেজের ওপরেই বসে পড়ল।

মা বললেন, আহা হা, মেজেতে বসলে কেন? এই বিছানায় উঠে বসো।

—দরকার নেই, বেশ বসেছি এখানে।

পচা ইঁদুরের গন্ধ নাকের ভেতরে টানতে টানতে ঘামতে লাগল সুকুমার, এই অন্ধকার অবরুদ্ধ ঘরে লক্ষ কোটি ব্যাক্‌টিরিয়ার অনিবার্য সঞ্চার কল্পনা করে গায়ের

চামড়াগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসতে লাগল তার। কিন্তু চোখ বুজে একটা ভাঙ্গা কুয়োর ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো সুকুমার বেপরোয়া হয়ে গেছে—যা হওয়ার তাই হোক।

তারপর সেই ভাবে বসে বসে তাকে শুনতে হল ভবানীর মার দুঃখের কাহিনী। বক্তব্যের আসল তাৎপর্য—আজ আট মাস থেকে ভবানী নিরুদ্দেশ।

হাঁপানির ফ্যাস্‌ফেসে আওয়াজের সঙ্গে গোঙানি মিশিয়ে ভবানীর মা বলে যেতে লাগলেন: যুদ্ধ থামল, চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বোঝোই তো বাবা, অভাবের সংসার—দুটো চারটে কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। তাই বলে বাড়ি থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি। দুটো পয়সা পাঠানোতো দূরের কথা, একটা খবরও কি দিতে নেই। এদিকে আমি রুগী মানুষ, জাহাজের মতো এতবড় সংসারটাকে চালাই কী করে? আঠারো উনিশ বছরের ওই তো ছোট ভাইটা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পায় তাতে এক হপ্তা চলেনা। এতবড় আইবুড়ো বোন—সবশুদ্ধ কি আমি গলায় দড়ি দেব, না গঙ্গার জলে ডুবে মরব?

কথার শেষে ভবানীর মা কাঁদতে শুরু করলেন, দুটো জলের রেখা কালি-পড়া চোখের কোল বেয়ে চোয়ালভাঙ্গা পাণ্ডুর গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ময়লা বালিশে। সহানুভূতিতে মন ভরে উঠলনা সুকুমারের, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলনা—শুধু মনে হতে লাগল পচা ইঁদুরের গন্ধটার মতো অস্বস্তিকর নারকীয়তার অনুভূতিটাই তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। পেছন থেকেও যেন চাপা কান্নার একটা আওয়াজ আসছে, মুখ না ফিরিয়েও সুকুমার বুঝতে পারছে প্রায়ান্ধকারে ছায়ার মতো নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে আছে কিশোরী মেয়ে নিমু—যার ভালো নাম পূর্ণিমা।

উপসংহারে ভবানীর মা বললেন, তুমি তো তার বন্ধু বাবা—যেখান থেকে পারো ভবানীর একটা খবর এনে দাও।

—চেষ্টা করব, আপনি ভাববেন না—সুকুমার উঠে পড়ল।

দরজার বাইরে যখন পা দিল, তখন চোখে পড়ল কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিমু। তার বিষণ্ণ নির্বাক মুখের ডৌলটিতে, তার চোখ থেকে অশ্রুর কণার মতো মিনতি এসে যেন আছড়ে পড়ছে সুকুমারের সর্বাঙ্গে। আচমকা, একটা অকস্মিক মুহূর্তে যেমন হয়—নিমুকে অত্যন্ত ভালো লাগল সুকুমারের, মনের ভেতরে গুন্‌গুন্ করে কে বলে উঠল, ওর নাম পূর্ণিমা।

কিন্তু সুকুমার আর দাঁড়ালো না।

বৃষ্টি-ধোয়া একটা চমৎকার সকাল, ক্রস্‌-ওয়ার্ড পাজ্‌লে তিনটাকা সাড়ে ন আনা

পেয়ে যাওয়ার মতো একটা ছুটির দিন। এই অপরূপ সকালটিকে হারিয়ে ফেলে একটা অন্ধকূপে যেন আত্মহত্যা করতে বসেছিল সুকুমার। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, রোদে ঝলমলিয়ে ওঠা শিশুগাছটার কচি-কোমল পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বুক ভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলে।

অত্যন্ত দ্রুতবেগে পালিয়ে যেতে চাইছিল সুকুমার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কাঁটাপুকুর লেনের এই অন্ধকার একতলা বাড়িটার কথা। পচা ইঁদুরের গন্ধটা এখনো যেন স্নায়ুগুলোর উপরে চেপে বসে আছে। বাইরে এত বিস্তীর্ণ —এমন একটা পরিপূর্ণ জীবন থাকতে কেমন করে সে ওই অন্ধকার মৃত্যুর গর্তটার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ?

সুকুমার জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। এ বেলা আর বেল্‌গাছিয়ায় পূর্ণর ওখানে যাওয়া যাবেনা, তবে হাতীবাগানে মামার ষ্টুডিয়োতে এখনো আড্ডা জমানো যেতে পারে।

আর ঠিক সেই সময় এমনি অঘটনটা ঘটে গেল।

হঠাৎ পাওয়া একটি ছুটির দিন; পূজো পার্বণ নয়, তবু ছুটি, দশটা বাজে, তবু কড়া ইস্ত্রীর শার্টের ওপরে ছিটের কোট চাপিয়ে অফিসের দিকে ছুটতে হচ্ছেনা সুকুমারকে; তাকে ঝুলতে হচ্ছেনা ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রামে, বাগবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে নির্বিকারভাবে সে লক্ষ্যহীনের মতো পথ চলছে। সব কিছু ব্যতিক্রম—সব কিছু আলাদা। আর ব্যতিক্রমের দিন বলেই কি মনের ভেতরেও এই ব্যতিক্রমটা ঘটল সুকুমারের ?

আশ্চর্য, সুকুমারের চলার বেগটা কমে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। তারও পরে এক সময় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

মন্দ কী। মন বললে, মন্দ কী, এই তো বেশ। আজকের এই আশ্চর্য নতুন সকালটি একটা নতুন কিছুর দিকেই তাকে টেনে নিয়ে যাকনা। পূর্ণর ওখানে গিয়ে ব্রীজ খেলা—সে তো আছেই, যে কোনো একটা ছুটির দিনের সঙ্গেই তো সেটা অঙ্গাঙ্গী। মামার আড্ডায় গিয়ে জমে-বসবার ভেতরেও কোনো বৈচিত্র্য নেই—প্রতিদিনের বাঁধা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সেটা একাকার হয়ে গেছে। আজ একটা ভালো কিছু করবে সুকুমার—বৃহৎ একটা কিছু, মহৎ কোনো একটা প্রয়াস। হঠাৎ অতিরিক্ত সবুজ হয়ে ওঠা শিশুগাছের পাতাগুলোর মতো আকস্মিকতার রঙ লাগিয়ে নিজেকে সে-ও নতুন করে তুলবে।

—সুকুমার বাবু ?

মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটা ডাক দিয়ে নেমে এল গণেশ।

—আজ অফিস নেই বুঝি ?

সংক্ষিপ্ত ছোট্ট জবাব দিলে সুকুমার : নাঃ।

—দিব্যি আছেন। —গণেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। ভাবটা যেন সুকুমার রোজই এই ধরণের ছুটি পাচ্ছে আর বাপের পয়সায় সিনেমা দেখে আর রেস্ খেলে বেড়ানো গণেশের খাটতে খাটতে একেবারে প্রাণান্ত হয়ে গেল।

তেমনি সংক্ষেপে সুকুমার বললে, হুঁ।

—আজ একটায় ভালো বই আছে "শ্রী"তে—যাবেন ? র‍্যাণ্ডম্ হারভেষ্ট্। রোমাণ্ড্ কোলম্যান যা একখানা প্লে করেছে—একেবারে চেটে খাওয়ার মতো। চলুন না।

—না।

—না কেন ? খাসা ছুটির দিনটে আছে—

—আমার সময় হবেনা—গণেশকে এড়িয়ে সুকুমার দ্রুত এগিয়ে গেল।

মন্দ কী—এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

চলতে চলতে সুকুমারের মনে হতে লাগল, বাস্তবিক, এর কোনো অর্থ হয়না। তুমি বেশ আছো, নিশ্চিন্তে বেঁচে আছো তুমি। অফিস, চাকরী, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা, নিজের বাড়ি—পরিতৃপ্ত সচ্ছল জীবনযাত্রা। কিন্তু ওইখানেই তো সব নয়! এতবড় পৃথিবী, এত মানুষ, এত দুঃখ। সকলের দুঃখ তুমি ঘোচাতে পারোনা, দায়িত্ব নিতে পারোনা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অভাব অভিযোগ মিটিয়ে দেবার। কিন্তু যতটুকু পারো ততটুকু কেন করবেনা, কেন সাধ্যমতো তোমার দাক্ষিণ্যকে বিস্তীর্ণ করে দেবেনা দুহাতে ?

তা ছাড়া—তা ছাড়া ভবানী তার বন্ধু। একেবারে অন্তরঙ্গ না হোক, সহপাঠী তো বটে। ছাত্রজীবনে এক ধরণের হৃদ্যতাও তো ছিল। আজ এই অপূর্ব ছুটির দিনে—আশ্চর্যভাবে একটা বন্ধুকৃত্য করবার সুযোগ এসেছে সুকুমারের। মন্দ কী।

কেমন সুন্দর দৃষ্টিতে নিমু তাকিয়েছিল সুকুমারের মুখের দিকে। হঠাৎ অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, হঠাৎ যেন চোখ পড়ে গিয়েছিল আসন্ন সন্ধ্যায় ধূপছায়া রঙ্ আকাশের প্রথম নক্ষত্রটির দিকে। পূর্ণিমা নামটি ওর সার্থক—কিন্তু বর্ষার পূর্ণিমা। জলভরা মেঘের টুকরোতে যখন থেকে থেকে চাঁদের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অতি প্রখর, অতি প্রগল্ভ জ্যোৎস্নার চাইতে বর্ষার পূর্ণিমাই ভালো।

চৌমাথায় এসে বড় একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়ালো সুকুমার। পকেটে

হাত দিয়ে দেখল দুটো দশটাকার, তিনটে এক টাকার নোট আর কয়েক আনা খুচরো পয়সা। এতেই বেশ কুলিয়ে যাবে।

—আঙুরের সের কত করে ?

—চার টাকা।

—বেদানা ?

—তিন টাকা।

—খেজুর ?

—আড়াই টাকা।

কপালটা চুলকে নিলে সুকুমার, মনে মনে একবার হিসেব করে নিলে টাকার পরিমাণটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ চলে গেল আকাশের দিকে। জানলা দিয়ে যেমনটি দেখেছিল, ঠিক সেই রকম নীলিমোজ্জ্বল আকাশ; চৌমাথায় নানামুখী ট্রামগুলোতে ঢং ঢং করে বাজছে ছুটির ঘণ্টা। আজ আর পকেটের হিসেব করলে চলবেনা।

—সবগুলো দাও আধসের করে।

পেছন থেকে কে ঘাড়ে হাত দিলে। চকিতে মুখ ফেরালো সুকুমার।

পূর্ণ। সারা মুখ ভর্তি করে একসঙ্গে বোধ হয় গোটা তিনেক পান খেয়েছে, পানের রস নীচের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নেমে পড়েছে চিবুক পর্যন্ত; একদিকে ঠোঁটের কোনে চুণের দাগ লেগে আছে। সবশুদ্ধ মিলিয়ে মস্তবড় একটা হাঁ করে হাসল পূর্ণ। ওর হাসিটা ওই রকম, একেবারে আল্‌জিভটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ণকে একপলকে দেখেই সুকুমারের অত্যন্ত বিশ্রী লাগল, ভারী ভাল্‌গার বোধ হল যেন।

পূর্ণ বললে, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—ওঃ।—নিরুৎসাহিত গলায় সুকুমার জবাব দিলে।

—ভেবেছিলাম তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে একেবারে দক্ষিণেশ্বর চলে যাব। দেখছি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে বাড়ি গিয়েও তোমাকে পাওয়া যেতনা। তা ব্যাপার কী ? এত ফল কিনছ কী জন্যে ? কারো অসুখ নাকি ?

—হুঁ।

—কার অসুখ ?—পূর্ণ উদ্বিগ্ন হতে চেষ্টা করলে।

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সুকুমার। সব জিনিস কেন এমন করে খুঁটিয়ে জানতে চায় পূর্ণ, কিসের জন্যে ওর এই অহেতুক কৌতূহল ? আর দুর্ভাগ্যটাও এম্‌নি যে ঠিক সময় বুঝেই যেন মস্তবড় একটা হাঁ করে হতভাগা তার সামনে এসে দর্শন দিলে।

পূর্ণ আবার জিজ্ঞাসা করলে, কার অসুখ ?

স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ পড়ল সুকুমারের মুখে। তারপর পরিচ্ছন্ন গলায়, মন স্থির করে নেওয়ার নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিষ্কার বলে গেল সুকুমার: আমার ভবানীপুরের মাসিমার।—ফলের ঠোঙাটা আর দোকানির দেওয়া ভাঙানিগুলো তুলে নিয়ে সুকুমার বললে, খুব বেশি অসুখ। এসব ফল তাঁরই জন্যে।

পূর্ণর কৌতূহল তবু থামেনা। যে মানুষগুলো মোটা হয়, বুদ্ধিও দিনের পর দিন তাদের ভোঁতা হয়ে আসে নাকি ? গলার স্বরে আরো খানিকটা দুশ্চিন্তার খাদ মেশাতে চেষ্টা করলে পূর্ণ: তাই নাকি। তবে তো ভারী বিপদের কথা! অসুখটা কি হে ?

সুকুমার ততক্ষণে একটা সরীসৃপের মতো পিছলে পড়েছে সেখান থেকে। পূর্ণকে আর একটা কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে ধরে ফেলেছে চলন্তি একটা ট্রামের হাতল। পাদানীতে উঠতে উঠতে বলে গেল, চললাম ভাই, আজ আর কথা কইবার সময় নেই।

পূর্ণ জিজ্ঞাসু একটা কাকের মতো সেখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

টন্ টন্ টন্। ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে ট্রাম চলেছে। সুকুমার প্রায় খালি ট্রামটার একেবারে সামনের সীটটাতে গিয়ে বসল। ভালো লাগছে—বড় বেশি ভালো লাগছে। কর্মহীন এই নিশ্চিন্ত দিনটাতে কী আশ্চর্যভাবে কাজ জুটে গেল তার। ওই একতলার অন্ধকার ঘর, পচা ইঁদুরের গন্ধ—মাঝখানে একটি দুঃস্থ পরিবার। মুহূর্তের মধ্যে একটা নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠেছে সুকুমার, একটা আশ্চর্য কর্তৃত্ব, অপূর্ব একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার হাতের মধ্যে। এই পরিবারটির সে উপকার করতে পারে, সাধ্যমতো তাদের অভাব মোচন করতে পারে, এই মুহূর্তে সে তাদের অভিভাবক। আজ এই ছুটির সকালে এই কর্তৃত্বের লোভটা ছাড়তে পারবেনা সুকুমার, হারাতে পারবেনা হঠাৎ পাওয়া ছুটির মতো হঠাৎ পাওয়া এই অধিকারটাকে।

মন্দ কী—মন্দ কী। নিজে বার বার কথাটাকে আওড়াতে লাগল সুকুমার। মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলে, সাধারণ মেধা, সাধারণ দিনযাত্রা। বহুর ভেতরে মিশে গিয়ে আলাদা কোনো রূপ ছিলনা সুকুমারের, নিজের কোনো রঙ্ ছিল না। আজ একটা বড় কিছু করবার উৎসাহে, মহৎ কোনো কিছুর অনুপ্রাণনায় সে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে, অনন্য—একক হয়ে গেছে। আজকের দিনটি নিজের বাঁধা গণ্ডিটার বাইরে টেনে এনেছে তাকে। সুকুমার একে হারাতে পারবে না। নিজের ভেতরে যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল সুকুমার।

হেদোর সামনে এসে সে ট্রাম থেকে নামল।

শুনেছে, এলোপ্যাথিতে হাঁপানি সারেনা, কবিরাজীই তার সব চাইতে ভালো চিকিৎসা।

এখানে এক বড় কবিরাজ আছেন—পুরোণো রোগ সারাতে তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত। একবার তাঁর পরামর্শ নিলে মন্দ হয়না।

কবিরাজ বললেন, বলুন, কী চাই ?

—ভালো হাঁপানির ওষুধ দিতে পারেন ?—উৎসাহে আকুলতায় সুকুমারের চোখ দুটো যেন দপ দপ করে উঠতে লাগল : টাকার জন্যে ভাববেননা, আমার ভালো ওষুধ দরকার।

কাঁটাপুকুর লেনে সুকুমার যখন পা দিলে বেলা তখন বারোটার ওপারে গড়িয়ে গেছে।

একহাতে ফলের ভারি ঠোঙ্গাটা, আর একহাতে কবিরাজী ওষুধ। উজ্জ্বল নির্মল সকাল দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ হয়ে জ্বলে যাচ্ছে কলকাতার ওপরে। শিশুগাছের বৃষ্টি-ধোয়া সবুজ পাতাগুলোর ওপরে চল্‌তি গাড়ির ধূলো উড়ে পড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে একটা বিবর্ণ আস্তরণ।

ক্লান্ত পা ফেলে এগোচ্ছে সুকুমার। কিন্তু সমস্ত ক্লান্তি মনের ভেতরে যেন কোথায় একটা উজ্জ্বল আনন্দের ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাওয়া ছুটির দিনটি এমন হঠাৎ যে তাকে এভাবে পরিপূর্ণ করে দেবে একি জানত সুকুমার ?

আজ সে অধিকার পেয়েছে, আজ সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে একটা স্বাতন্ত্র্যে আর একাকিত্বে, একটা অনন্যতায়। এখন মনে পড়ছে ঘুম থেকে উঠে সে দেখেছিল ওদিকের ছাতে একটি কিশোরী মেয়ের একখানি সদ্য ফোটা মুখ, একরাশ ভিজে চুল পিঠ বেয়ে ভেঙে পড়েছে তার। প্রথম আলোয় উজ্জ্বল সে মুখখানি খুশিতে ভরা সকালটাতে একটুখানি সোনার রঙ্ ছুঁইয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তখন কি জানত সুকুমার ওই মুখখানার ভেতরে ব্যতিক্রম করা নতুন অলোর মতো আরো একটা ব্যতিক্রমের সংকেত রয়েছে ?

সমস্ত পথটা নিজের ভেতরে বুনেছে স্বপ্ন আর চিন্তার জাল। কী থেকে কী হয়ে যেতে পারে, কোথা থেকে কোথায় চলে যেতে পারে সুকুমার। অভিভাবক হওয়ার সহজ আর সাবলীল এই দাবীটা শুধু কি ওইখানেই থেমে যাবে তার ? শুধু কিছু ফল, কিছু ওষুধ কিনে দিয়ে, কিছু পরিমাণে দানের দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ?

বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হয়েছে, বেশ বড় হয়ে উঠেছে নিমু—যার ভালো নাম পূর্ণিমা। ভিজে ভিজে মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন বর্ষার পূর্ণিমা। হয়তো রূপ যথেষ্ট

নেই পূর্ণিমার কিন্তু লাবণ্য আছে, আছে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার অপরূপ স্নিগ্ধতা। আইবুড়ো মেয়ে—ভবানীর মা কাতরোক্তি করেছিলেন। স্বচ্ছন্দে, অত্যন্ত অবলীলাক্রমে পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে পারে সুকুমার, দরিদ্র সংসারটির ভার মোচন করতে পারে, পারে বড় একটা কিছু—একটা কিছু মহৎ—

মন্দ কী! সুকুমারের মন বললে, এই ভালো।

উত্তেজিত আনন্দে কাঁপা হাতে দরজার কড়া নাড়লে সুকুমার। বুকের ভেতরে হৃদপিণ্ডটা অস্থির ভাবে দুলতে লাগল, পূর্ণিমা এসে এখনি দরজা খুলে দেবে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভূত দেখার মতো তিন পা পিছিয়ে গেল সে। দরজা খুলে দিয়েছে ভবানী।

উজ্জ্বল হাসিতে ভবানী বললে, এসো, এসো। তুমি আজই খবর নিয়েছিলে ওদের কাছে শুনলাম। এলাহাবাদে চলে গিয়েছিলাম ভাই—শ তিনেক টাকার একটা বড় চাকরী জুটিয়েছি ওখানে। তিনদিনের ছুটি পাওয়া গেল, তাই দশটার ট্রেনে এসে নেমেছি। এসো এসো, ভেতরে এসো—

দাঁতে দাঁত চেপে শুকনো গলায় সুকুমার বললে, নাঃ থাক। আজ আর ভেতরে যাবোনা, কাল পরশু এসে দেখা করব।

ফলের ঠোঙ্গা আর ওষুধের বোতলটা কঠিন নির্দয় মুঠিতে আঁকরে ধরে দ্রুত গতিতে সুকুমার এগিয়ে চলল। ক্ষিদে, তেষ্টা আর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা তার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আজই, আজই কেন ফিরে এল ভবানী? কেন অন্তত একটা দিন সে দিলনা সুকুমারকে, কেন এমন করে ছুটির এই আশ্চর্য সকালটাকে সে এভাবে হত্যা করল?

সে আশ্চর্য সকালটা আর নেই। ছুরির শানানো ফলার মতো ঝলসাচ্ছে রোদ। তবু এখনো ‘শ্রী’-তে গেলে হয়তো “র‍্যানডম্ হারভেষ্ট”-এর টিকেট পাওয়া যাবে, অথবা পূর্ণকে জোগাড় করে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রোগ্রামটাও হয়তো অসম্ভব নয়।

কিন্তু—!

মেঘমেদুর

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

এতক্ষণে বসবার যায়গা পাওয়া গেল একটু, লোকাল ট্রেণে শিয়ালদ'-টু কাঁচরাপাড়া। কতটুকুই বা রাস্তা। কিন্তু ধকলটা যেন ঢাকা মেলের, সেই লাইন দিয়ে টিকিট কাটা, ঢুকতে গিয়ে গেটের সামনে হুড়োহুড়ি। গাড়ীতে উঠেও কি স্বস্তি আছে? বসার জন্য মারামারি, কামড়াকামড়ি, ঠেলাঠেলি ভীড়। দু'টি চারটি করে রেশন ব্যাগ পার হচ্ছিল এতক্ষণ, এবার প্রকাণ্ড তরকারীর ঝাঁকা একটা উঠে আসবার চেষ্টায় আছে। জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে রইল পঞ্চানন। অসময়ে আকাশ ভরে মেঘ করে আছে। ভেতরে চাপা গুমোট আর ক্লেদাক্ত ঘামের গন্ধ, পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় কপাল সে মুছে ফেলল। নাকি নেমে যাবে গাড়ী থেকে? কিন্তু সুরেনের চিঠি পাওয়ার পর দু'টি শনিবার এসে চলে গেছে, কাঁচরাপাড়া যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সুরেনের চিঠি বার করল অনেকবার, একথা ওকথার পর সুরেন লিখেছে, 'ভাই পঞ্চানন, জানি তোমার সময় কম, কিন্তু কাউকে কোন কাজের ভার দেব তিনকুলে তো এমন কেউ নেই আমার তুমি ছাড়া, তুমি বরং একটু কষ্ট করে কোন এক শনিবার চলে যেও কাঁচরাপাড়ায়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ধরে টরে যদি একটা বেডের ব্যবস্থা করতে পার। বাঁচব যে না তাতো জানি। তবু শেষের কটা দিন যদি শুয়ে পড়ে সরকারী খানা খেয়ে যেতে পারি সেই বা মন্দ কি? আমার দরখাস্তের নকল আর ওদের চিঠি পাঠালেম এই সাথে।'

মাস চারেক হ'তে চলল সুরেন টি, বি, নিয়ে কলকাতা ছেড়েছে। আর কি করতে পারে পঞ্চানন? অফিসের কলিগের কাছ থেকে সুরেনই বা আর কত আশা করে? তারপর অফুরন্ত সময় যদি হাতে থাকত তাহ'লে না হয় দেখা যেত। পঞ্চাননেরও অফিস আছে, ঘর-সংসার আছে, হাত-টানাটানি আছে, তবু কোনদিকে চায়নি পঞ্চানন। অসুখের গোড়া থেকে তার যেটুকু সাধ্য তা সে করেছে। আর্দ্ধেক চার্জ্জে এক্স-রে করিয়ে দেয়া থেকে সুরু করে মায় ফল কিনে খাওয়ান পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমনি কারো কাছ থেকে কোনরকমে সৌজন্যের স্বাদ যদি পেল একবার, তা হলে তার আর রক্ষা নেই। মাসে মাসে এখনও সুরেনের চিঠি আসে, 'এনজিয়ার্স ইমালসন ফুরিয়ে এল', পারতো ক্যালসিয়াম টেবলেট এক ফাইল।' দাম অবশ্য মাঝে মাঝে একেকবার পাঠিয়ে দেয় পরে। কিন্তু দামটাই তো সব নয়, তার পিছনেও হাঁটাহাঁটি আছে।

ভাঁজ না করেই কাগজগুলি পঞ্চানন বুকপকেটে গুঁজে রাখল। পাশের বেঞ্চিতে জায়গা নিয়ে আরেক দফা বচসা সুরু হয়ে গেছে। মোটা গোছের একটা লোক কৌশলে সে দুর্য্যোগ এড়িয়ে এসে পঞ্চাননের পাশে বসে পড়ল। পাশে মানে তার উরুর ওপর নিতম্ব রেখে। পঞ্চানন হতবাক্। লোকটা কিন্তু অনর্গল বকে যাচ্ছে, 'ব্যাপার তো মোটে আধঘণ্টার। তারপর কার বা জায়গা, কে বা বসে। সবই তো খালি পড়ে থাকবে, নামবার সময় কেউ কি একবার পিছন ফিরেও চেয়ে দেখবেন? না কি বলুন?' মুখে কথা বলছে আর ওদিকে ঠেসেঠুসে জায়গা করে নিচ্ছে। এর পরে আর কার কি বলার থাকতে পারে? নিলর্জ্জতারও একটা সীমা আছে। গণদেবতার নামে চোখে যাদের জল আসে, পঞ্চাননের ইচ্ছে হল তাদের কাউকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

গাড়ী যখন কাঁচরাপাড়া গিয়ে পৌঁছল বেলা তখন পাঁচটা বেজে গেছে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ-জোরা মেঘ এবার একটু একটু করে গলতে সুরু করেছে। ষ্টেশনে লোকজন একেবারে কম, হয়ত এই বৃষ্টির জন্যই। ওপারে সেডের মধ্যে তিন চার জন লোক বেশ গুছিয়ে বসে বিড়ি টেনে টেনে গল্প করছে। পোঁটলা পুঁটলি আশে পাশে আছে দু'একটা। কিন্তু ওদের ভাব দেখে মনে হয় না যে যাবার তাড়া আছে কোন, অপেক্ষায় আছে কোন ট্রেণের জন্য। রেলওয়েপোষাকপরা এক ভদ্রলোক, এ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার হবেন বোধ হয়, বাইরে এসে একবার আকাশের দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন, তারপর আবার নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকলেন রুমে। চারদিকে কেমন একটা অলস ঝিমিয়ে-পড়া ভাব। পঞ্চাননের মনে পড়ল, অফিস থেকে বেরিয়ে অবধি চা খাওয়া হয়নি। দোকানের চা সে খেতে পারেনা। নিদেন ঠেকায় পড়লে ক্বচিৎ কোনদিন এক আধ কাপ হয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনিমার কথা, বাসার কথা। এইটুকু দূরে এসেই মনে হচ্ছে যেন কত দূর—বিদেশে এসে পড়েছে। অনিমাদের চায়ের পাট এতক্ষণে সারা হয়েছে নিশ্চয়ই। আজ আর সে বসে নেই—অফিসে আসার সময়ই পঞ্চানন জানিয়ে এসেছে কাঁচরাপাড়া হয়ে ফিরবে আজ।

চায়ের ষ্টলে ঢুকে দেখল সেখানেও ভীড় নেই, মুখোমুখি বসে দুটি ছোকরা চা খাচ্ছে, খাকির সার্ট প্যাণ্ট পরা, বোধহয় রেলওয়ে ওয়ার্কসপেই কাজ করে, ওদের সারা গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লেগেছে, হয়ত বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ঘোরাঘুরি করে এসে চায়ের কাপ সামনে রেখে আয়েস করছে। একজন আবার চায়ের টেবিলে তাল ঠুকে চাপা গলায় একখানা ইমন কল্যাণ আলাপ করছে। বেশ গলাটুকু ছোকরার, তাল তেহাই জ্ঞান আছে, চা খেতে খেতে গানের কলি দুটি বড় ভাল লাগল পঞ্চাননের, ইচ্ছে হ'ল ওখানে চুপচাপ বসে থাকে আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু ওরা উঠে পড়তেই পঞ্চাননের মনে পড়র্ল তাকেও যেতে

হবে, যেতে হবে খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে। ওদের ডেকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল পঞ্চানন।

'নতুন টি বি হসপিটাল হচ্ছে এখানে একটা, সেটা কোনদিকে বলুনতো ?'

'সে তো এখানে নয়।' বলল একজন, 'তা প্রায় মাইল ছয়েক হাঁটতে হবে আপনাকে, রিক্সা নিতে পারেন, কিন্তু এই বাদলার দিনে দেড় টাকা হেঁকে বসবে। তার চেয়ে হেঁটেই চলে যান, রেললাইনের পাশ ধরে এই এক রাস্তা।'

অগত্যা হাঁটতে হ'ল, লেবেল ক্রশিং পার হয়ে মসৃণ চওড়া রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে ডান দিকে, আমেরিকানদের কি একটা ঘাঁটি বসেছিল মাঠের মধ্যে, সেই প্রয়োজনে এই রাস্তা, যুদ্ধের সময়কার। কয়েক মাস আগেও বেপরোয়া জীপ-কার ছুটত এই পথ দিয়ে দিবারাত্র। শক্ত মজবুত চাকার পিছনে পীচের মসৃণ পথ পিছলে পড়ত। সে প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, আজ সে রাস্তা গাড়িহীন, মানুষজন চলে কি চলেনা। কিন্তু পঞ্চাননের গতি না বাড়িয়ে উপায় নেই, কাজ সেরেই আবার ফিরে যাওয়ার গাড়ী ধরতে হবে। কোলকাতা পৌঁছতে কত রাত হবে ঠিক কি ? মাথার ওপর চুট্ চুট্ করে বৃষ্টি প'ড়ে সমস্ত মাথাটা প্রায় ভিজে উঠেছে। একটানা ছিঁচকে বৃষ্টি, জোরেও আসছেনা আবার থেমেও যাবেনা। সারা বিকেল সারা রাত এই তালে চলবে। অদৃশ্য সুরেনের ওপর মনে মনে জাতক্রোধে ফুলে উঠল পঞ্চানন।

আরও অনেকক্ষণ হাঁটার পরে পাওয়া গেল হাসপাতাল, হাসপাতাল এখনও কেবল গড়বার মুখে। অবশ্য তৈরী করার ভাবনা ভাবতে হয়নি। আপাততঃ সেটুকু আমেরিকানদের দৌলতেই মিলে গেছে। এ্যাজবেসটসের সেড্ দেয়া লম্বা ঘরের সার নির্ভুল জ্যামিতিক পরিমাপে তোলা। ছবির মত সমান সোজা সোজা জানালা, আবার দু'টো সারির মধ্যে পারাপারের লম্বা হল্। বেড়াহীন, সরু সরু আস্ত গাছ সমান্তরাল করে পোঁতা, তার মাথায় সেড্। পায়ের তলায় ঘাস, কচি সবুজ ঘাস ঘরগুলির কোলে কোলে। খাট লম্বা ঘাস কমপাউণ্ড ছাড়িয়ে যতদূর চোখ যায় সেই পর্য্যন্ত। ঢুকবার রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে মনে হবে ঠিক যেন একটা দ্বীপের মত। সম্পূর্ণ আলাদা। এ জায়গা থেকে কোনদিকে যাওয়া যায়না, যাওয়ার দরকারের কথা মনে পড়ে না। এর ছ' মাইল পশ্চিমে কাঁচরাপাড়া নেই। ওপরে খোলামেলা আকাশ আর পায়ের তলায় কচি সবুজ ঘাস। ক'মাস আগে আমেরিকানরা এখানে নেচে কুঁদে চলে গেছে, ক'মাস পরে হয়ত রোগী ডাক্তারের ভীড়ে এ জায়গা মুখর হয়ে উঠবে। মাঝখানের এই কটা দিন শুধু নীরব প্রতীক্ষায় নিথর হয়ে পড়ে আছে জায়গাটা।

না, একেবারে নিথর এখন আর নয়। সে কেবল মনে হচ্ছে এই বাদলার দিন

বলে। না হ'লে, পঞ্চানন এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা ঘরের সামনে অফিস ব'লে বোর্ড ঝুলান রয়েছে। জানালার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে লোহার পেসেন্ট-বেড্ দু'চারটা। টুকটাক জিনিষপত্রও আসা সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অফিস বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আজ আর কোন কাজ হবে না। অফিসের দারোয়ানের কাছেই পঞ্চানন একথা জানতে পারল। অবশ্য দারোয়ানের বেশ আর এখন তার নেই। চাপরাশ খুলে রেখে বারান্দায় বসে এবার সে অন্য ডিউটি দিচ্ছে। একটু দূরেই গরু চ'ড়ে বেড়াচ্ছে একটা। অতঃপর কি করা যায় ভাবতে ভাবতে পঞ্চানন চেয়ে রইল সেই দিকে। নিশ্চিন্ত আরামে গরুটা ঘাস চিবিয়ে যাচ্ছে, কুচুর কুচুর শব্দ উঠ্‌ছে আর সেই তালে লেজ নড়ছে একটু একটু। পঞ্চানন একবার ভাবল ফিরে চলে যায়, সুরেনকে যাহোক দু'কথা বানিয়ে লিখে দিলেই চলবে। তার দোষ কি সে তো এসেই ছিল। দেখা না হ'লে সে দোষ কার। সে দোষ সুরেনের কপালের। আবার ভাবল, এই পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে! তার চেয়ে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সাথে দেখা করে শেষ কথাটা শুনে গেলেই তো হয়। তা হয়। অবশ্য সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত ধাওয়া করার হুকুম নেই কারো। অনুরোধে পড়ে দারোয়ান যে দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে এটুকুও তো বে-আইনী। তা হোক, কথাতো মোটে দুটি।

সামান্য একটু গিয়েই সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কোয়ার্টার। স্থায়ীরকম এখনও কিছুই করা হয়নি, তবু হাসপাতালের আগে আগে চলে কোয়ার্টার! পাকাপোক্ত না হোক বাঁকারীর ছোট খাটো গেটের নিষেধ উঠেছে সামনে। অপ্রশস্ত বারাণ্ডার কিনারে কিনারে টবের আশ্রয়ে বিদেশী ফুলের গাছে ফুল দেখা দিয়েছে। গেটের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল পঞ্চানন। মিঃ মুখার্জ্জি একা নন। পাশে একটা আর্মচেয়ারে আরেকটি মেয়ে এলিয়ে আছেন। পঞ্চাননকে আসতে দেখে তিনি উঠে বসলেন। আর মুখার্জ্জি এবার হাত পা ছড়িয়ে দিতে চাইলেন খাড়া চেয়ারে বসে যতটা সম্ভব ততটা। বিরক্তিতে আঙুলমোড়া বইটা পড়ে যেতে চাইল। পঞ্চানন বুঝতে পারল, বড় অসময়ের অভাজন হয়ে এসেছে সে, মেঘলা আকাশের নিচে একান্ত নিরিবিলিতে যে কবিতার সুর বাজছিল এতক্ষণ তার ছন্দপতন হ'ল। ঢোলা পাজামা আর ঢিলে ওভারঅলের নিচে মুখার্জ্জি নিঃস্পন্দ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'পেসেন্ট কোথাকার, আই মিন কোন ডিষ্ট্রিকট্? লেটেষ্ট X'ray report এনেছেন সঙ্গে?'

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরল। ভুরু কুঁচকিয়ে দরখাস্তে চোখ বুলালেন মুখার্জ্জি। নিস্পৃহ অবহেলায় শব্দ করে পড়ে গেলেন নাম ধাম ঠিকানা।

'মানিকগঞ্জ—that is Dacca ? Sorry, ঢাকার সিট সব ফিলআপ হয়ে গেছে,' আবার হাত বাড়ালেন রিপোর্টের জন্য।

কিন্তু রিপোর্ট কোথায় পাবে পঞ্চানন? সুরেন রইল দেশের বাড়ীতে, সেখানে বসে তো আর ফোটো তোলানো যায়না। ফের যদি ফোটো তোলাতেই হয় সেও তো কোলকাতায় এনেই, কিন্তু তার আগে এমন ভরসা তো পাওয়া চাই যে এখানে ভর্ত্তি হতে পারবে, চিকিৎসা চলবে। না হলে অনর্থক টানা হ্যাঁচড়া করে কি লাভ। খরচও তো আছে। পঞ্চানন বুঝিয়ে বলতে চাইল একথা।

মুখার্জ্জির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে।

'এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না যে এখানে এসে মরবার জন্য রোগী ভর্ত্তি করা হয়না। এনে ঢোকালেন আর দু'দিন ভুগে সাবাড় হল। হস্‌পিটাল সেজন্য নয়। যাদের জন্য চেষ্টা চলবে কেবল তাদেরই আমরা নেব। আর তার বিচার হবে লেটেষ্ট রিপোর্ট দেখে। আপনার সুরেন বিশ্বাস, ছ'মাস আগে যাকে ধরেছে তার অবস্থা আমরা দেখে নেব না নিয়ে দেখব? সে ছাড়াও তো পেসেন্ট আছে, জানেন Whole Bengal-এ টি. বি.-র সংখ্যা কত?'

পঞ্চানন তা জানেনা, সে শুধু মনে মনে ভাবল, সুরেন মরে যাক্ দেশের বাড়ীতেই। ওর চিকিৎসার দরকার নেই।

'Excuse me, আমার আরও কাজ আছে,' চট্ করে মুখার্জ্জি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ওভারঅলের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলেন অফিসের দিকে।

পঞ্চাননও পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ পেছন থেকে চাপা গলার ডাক এল, 'দাঁড়ান।'

ফিরে দাঁড়াল পঞ্চানন।

'কোন সুরেন বিশ্বাস? একি জাফরগঞ্জের সুরেনবাবু?'—মিসেস্ মুখার্জ্জি প্রশ্ন করলেন।

বিস্মিত হয়ে পঞ্চানন বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি চিনলেন কি করে? আপনার জানাশোনা নাকি?'

মিসেসের মুখ হঠাৎ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অপরাধীর ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উনি আমার চেনা।'

'কোলকাতায় যখন চাকরী করত তখন থেকে বুঝি?'

'না, তারও আগে থেকেই।'

মুখার্জ্জির কথার ধমকে পঞ্চানন এতক্ষণ ভাল করে ওঁর দিকে তাকাবার সুযোগ পায়নি। হয়ত সাহসও না। এবার চোখ তুলে চেয়ে দেখল। পাতলা তন্বী চেহারা। চমৎকার ফর্সা চোখ-জুড়ান গায়ের রং। সযত্ন প্রসাধনের রূপটা গৌণ, কিন্তু তার স্নিগ্ধ

সৌরভ এসে নাকে লাগছে। ছাইরংয়ের শাড়ি পরেছেন হয়ত আজকের আকাশের রংয়ের সাথে মিলিয়েই। ঘনবদ্ধ কবরীর খাঁচে আঁচল লেপটে আছে অত্যন্ত আলগোছে, যে কোন মুহূর্ত্তে খসে পড়লেই হোল। বড় বড় টানাটানা চোখের পাতায় কাজল নেই, তবু মেঘের ছায়ায় মনে হ'ল যেন কতকালের কাজলপরা চোখ।

মিসেস মুখার্জ্জি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। ওঁর মন কি ফিরে গেল সেই আগের দিনে, সুরেনের চাকরী করারও আগের দিনগুলিতে? সে-দিনের ইতিহাস পঞ্চানন জানেনা, কিন্তু ওঁর মুখের রেখায় তারা কি ধরা দিল না?

হঠাৎ তিনি আবার জিজ্ঞেস্ করলেন, 'এখন কেমন আছেন উনি? ওঁর কি একবারও প্লেট নেয়া হয়নি?'

'হয়েছিল,'—পঞ্চানন জবাব দিল, 'সন্দেহ হবার সাথে সাথেই প্লেট নেয়া হয়েছিল।'

'কি ছিল রিপোর্টে?' মিসেস্ মুখার্জ্জি উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

'দু'টো লাঙ্স্ই তখন এফেক্টেড', পঞ্চানন বলল।

'দুটোই?' অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে মিসেস স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হঠাৎ কোন কথা বলতে না পেরে পঞ্চানন শুধু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখল, টানাটানা দুটি চোখ উপছে দু'ফোটা চোখের জল গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে কোলের ওপর ঝরে পড়ে গেল। নতুন জলভারে আবার টলমল করছে চোখ। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল পঞ্চানন। মেঘের ছায়ায় কালো জলভরা চোখের মধ্যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের তিন তলার সুরেন বিশ্বাস যেন ফুটে উঠল। সেই টুইলের সার্ট, ভাঙাচোরা চোয়াল, মরা মাছের মত ক্লান্ত বিবশ চাউনি। ছুরি দিয়ে চারফালি করে কাঁচা টমেটো কেটে খাচ্ছে সুরেন। কাঁচা গলাগলা টমেটো। পঞ্চাননের গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠত।

'কাঁচা খাও কেমন করে, একটা বুনো গন্ধ পাওনা সুরেন?'

সুরেন হাসত, বলত, 'সে প্রথম প্রথম দু'একদিন, কিন্তু ভাই খাবে তো কাঁচা খাও, ওর সবটাই ভিটামিন।'

আঁচল তুলে দু'চোখ মুছে ফেললেন মিসেস মুখার্জ্জি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'যে অবস্থাই হোক্, চেষ্টা তো করতেই হবে, চিকিৎসা তো হওয়া চাই।'

'কিন্তু এখানে ভর্ত্তির আশা যে কতটুকু তা তো নিজের কানেই শুনলেন। তবে আপনি যদি অনুরোধ করেন, বলেন একটু মিঃ মুখার্জ্জিকে তা হলে সে কথা আলাদা।'

'আমি?' মিসেস মুখার্জ্জি কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'না না আমি নয়। আপনিই ওঁকে ধরুন আবার। আজ নয়, আরেক দিন। আজ হয়ত আর কোন কথাই শুনবেন না। যে করেই হোক ওঁকে সারিয়ে তুলুন। বলুন আসছেন আরেক দিন?'

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে পঞ্চানন সম্মতি জানাল, 'আসব।'

তারপর এক পা দুই পা করে ফিরে চলল পঞ্চানন। ছিঁটে বৃষ্টি আরও কমে এসেছে। এখন যেন কেবল সূক্ষ্ম, শুষ্ক গুঁড়া ঝরে পড়ছে চারদিকে, শব্দহীন। অফিস ঘরের পাশে গরুটার মুখ কামাই নাই। মুখ নাড়ার সাথে সাথে তেমনি লেজ দোলাচ্ছে আস্তে আস্তে। চারদিকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই। তবু পঞ্চাননের মনে হল, সে যেন আর একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়। মনে মনে বলল পঞ্চানন, আছে, সুরেন আছে। তিন কুলে তোমার কেউ না থাক্, এই জনমানবহীন ঘাসের রাজ্যে এখনও তোমার জন্যে একজনের চোখের জল পড়ে। কাঁচরাপাড়ার মেঘের ছায়ায় সে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে রইল, সে চোখের আজ একটিমাত্র ভাষা 'ওঁকে সারিয়ে তুলুন।'

যে যা-ই বলুক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আটাশ

তামসী ধড়মড় করে উঠে বসল। যেন স্বপ্নের ঘোরে বুকের আঁচলটা বিস্রস্ত করলে। কী লুকোবে, কাকে লুকোবে, কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

না, কিছুই তার লুকোবার নেই। ভয় করবার নেই। শুয়ে আছে সে মাটিতে সপ পেতে, থাক-দেয়া ইঁটের উপর বসানো তক্তপোষের উপরে নয়। কোনো বেআক্কেল চোর আশ্রয় নেয়নি এসে অন্ধকারে।

তাকাল একবার উমসীর দিকে। অভঙ্গ ঘুমে আবৃত হয়ে আছে। যে আঘাত তাকে মূল্য দেবে, সম্মান দেবে তা সহ্য করবার জন্যে সে সমর্পিত।

গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাল তামসী। বললে, 'পুলিশ এসেছে।'

'এসেছে ?' যেন এতদিন এরই জন্যে প্রতীক্ষা করে ছিল তেমনি প্রচ্ছন্ন তৃপ্তির সুরে উষসী বললে, 'এবার আমি জেলে যাব। অনেক বড় হয়ে যাবে আমার পৃথিবীর পরিধি।'

আনাচ-কানাচ আগাপাস্তলা সার্চ হচ্ছে বাড়ি-ঘর। সদর-মফস্বল। শুধু পুঁথি-পত্র বা বোমা-বারুদ নয়, কিছু বা মালেরও সন্ধান করতে হচ্ছে। জমিদারের বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে সম্প্রতি।

এই বাক্সটা কার ?

কারুর নয়, সকলের। আলাদা করে কোনো মার্কা-মারা নেই আমাদের। যখন যার দরকার তখন সে ব্যবহার করে। কাপড়-চোপড় বালিশ-বিছানা। সমস্ত কিছু।

স্ত্রীলোক ? স্ত্রীলোক নেই বাড়িতে ?

ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন।

কথা বলতেই শিখতে হবে, কাজ করতে নয়।

হ্যাঁ, উপরেই যাবে এবার। না, স্ত্রীলোকদের সরে যেতে বলার কোনো মানে হয় না। এরা একেবারে পর্দা-ঘেরা কুলবালা নয়। এরা পগার ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখেছে।

এই স্যুটকেসটা কার ?

'আমার।' তামসী বললে গম্ভীর ভাবে, যেন কত বিত্তবিভব রয়েছে ঐ বাক্সের মধ্যে।

দিন, চাবি দিন। চাবি লাগেনা, অমনি খোলা যায় আঙ্গুলের টিপনিতে। তা হ'লে, বাক্সরও কোনো আঁটুনি-বাঁধুনি নেই, সমান ঢিলঢিলে! সমান আলগা-আদুড়!

তামসীর কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু এখুনি কী হয়েছে!

স্যুটকেসের কোন তলা থেকে বেরুল একটা রুমালে-বাঁধা পুঁটলি। সেই পুঁটলিতে নানা ছাঁদের নানা ঝলকের গয়না। গলার, বাহুর, মণিবন্ধের। টুকরো-টুকরো আগুনের হলকা। টুকরো-টুকরো বিদ্যুতের চমকানি।

অসম্ভব একটা ভোজবাজি হয়ে গেল তামসী ভাবতে পারে কিন্তু উষসী পারল না। সে স্পষ্ট স্বচক্ষে দেখল দিদির বাক্সর ভিতর থেকেই বেরুল এই গয়নার পুঁটলিটা। পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাত-সাফাই করে বাক্সর মধ্যে চালান করে দিয়েছে এই গাঁজাখুরি আষাঢ়ে গল্পের জায়গা নেই। তা ছাড়া, পুলিশ পাবে কোথায় এ জিনিস? এ যে তার নিজের গায়ের গয়না। অন্তত অনেকগুলি তো বটেই। শুধু ঐ পুষ্পাহারটা বোধহয় নতুন।

উষসীর নিজের গলার প্রশ্ন পুলিশের গলায় ফুটে উঠল : 'এ সব আপনি কোথায় পেলেন ?'

মুখ-চোখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তামসীর। গলা কাঠ হয়ে এসেছে, হাঁটু দুটো ভেঙে পড়বে বুঝি। চোখে ধাঁধাঁ দেখছে। নিশ্বাস টান্‌তে পারছে না।

'বলুন।' মনে হল যেন পুলিশ নয়, উষসীই ঝাঁকরে উঠেছে। গলার স্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁজ মেশানো।

তবু উষসীরই চোখে চোখ রেখে আশ্রয় খুঁজল তামসী। তাকাল প্রায় ভিক্ষুকের মত। মনে হল নিচে নারায়ণের মত সেও এগিয়ে এসে বলবে, এ আমাদের দুজনের বাক্স, আলাদা দখলের কোনো সীমানা করা নেই। এ আমার নিজের গায়ের গয়না, বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর কোনো জিনিসপত্তর আনিনি বটে কিন্তু গায়ের গয়না কে ছেড়ে আসে ? আর গায়ের গয়না তো গায়ে এঁটে বেড়ানো যায় না, তাই দিদি এলে দিদির বাক্সর মধ্যে সরিয়ে রেখেছি।

কত সহজ, কত আপাতসুদর্শন।

কিন্তু উষসীর চোখে এতটুকু প্রশ্রয় নেই, ততটুকু সজলতা। যেন একটা ঘোরালো কালো সন্দেহ মৃত-নিশ্চল পাথর হয়ে রয়েছে। কালো পাথরের টুকরোর মতই কঠিন সেই দৃষ্টি। তাতে এতটুকু মমতা নেই, মার্জনা নেই, বিশ্বাসের অবকাশ নেই। চোখের শুভ্রতাটা যেন বিশুষ্ক আকাশের দয়াহীন রুক্ষতা।

তামসীর ইচ্ছে হল, নিজে যা বুঝছে, সোজাসুজি বলে দেয় সেই কথাটা। বলে দেয়, এ আর-কিছু নয়, প্রাণধন আর তার সরকারের কারসাজি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, গলার স্বরে ফোটাতে পারবেনা এমন সারল্য যা শুনে পুলিশে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে উষসী। প্রাণধন আর তার সরকার কেনই বা এই চতুরতা করবে তার কোনোই স্পর্শনীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেনা। আরো অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত বলবে কি, বিকলাঙ্গ কামনার প্রতিঘাতের প্রতিশোধ ? কিন্তু, জিগগেস করি, কোথা থেকে এল এই প্রতিহননের তীব্রতা ? কোন কুহক-কৌশলের পরিণামে ?

সবকথা জলের মত পরিচ্ছন্ন করে বুঝিয়ে দিতে পারবে তামসী ? না, কেউ বুঝবে ? না, এই আবিষ্কারের প্রসঙ্গে এটা কারু বোঝবার ?

কুণ্ঠিত অভিমানী চোখে আবার, আরেকবার তাকাল তামসী। দেখল উষসীর চোখ অন্য দিকে ফেরানো।

'কি, চুপ মেরে গেলেন যে। বলুন, একটা কিছু কৈফিয়ৎ দিন। কি করে এল এ আপনার বাক্সে ?'

'জানিনা।' তামসীও চোখ ফেরাল।

'কিন্তু আমরা জানি। আপনি এসব চুরি করে এনেছেন।'

'চুরি করে!' তামসী মাটির উপর বসে পড়ল না। নীরক্ত ঠোঁটে বিকৃত রেখায় একটু হাসল।

'হ্যাঁ, অন্তত গৃহস্বামীর বা প্রাণধনবাবুর সেই অভিযোগ। কেন, ওঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন না কত দিন?'

'ছিলাম।'

'সংসারে কর্ত্রীত্ব করেননি সে কদিন?'

'হয়তো করেছিলাম।'

'তাঁর তখন স্ত্রীহীন সংসার—'

'হ্যাঁ।' তামসী তাকাল উষসীর দিকে। দেখল সে আর দাঁড়িয়ে নেই, বসে পড়েছে মাটির উপর। বিবর্ণ মুখ, ভূতাবিষ্ট চাউনি।

'বাড়িতে তাঁর স্ত্রী না থাকার সুযোগে সহজেই কর্ত্রীত্ব আদায় করতে পেরেছিলেন—ঠিক কিনা? আর সেই সুযোগে গোছা করে চাবি বেঁধেছিলেন আঁচলে?'

'হ্যাঁ, চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম বটে।' তামসী শুষ্করেখায় আবার হাসল।

'চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন কেন একেবারে বাক্স নিয়ে করেছিলেন। শেষে আর লোভ সামলাতে পারেননি। ভেবেছিলেন বোন তো ভেগে গেছে এবার তার জিনিস যা পাই কিছু হাতিয়ে নি। অন্তত তার গা-ছাড়া গয়নাগুলো হাতছাড়া করি কেন? কি, তাই না?'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল। দেখল উষসী দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে। অস্ফুট একটা কাতরোক্তিও তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে হয়ত।

উষসীর কাছ থেকে আর কোনো আশা নেই। দেখা যাক প্রাণধনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কি না।

'শুধু চুরিই ভাবছেন কেন?' তামসী স্বচ্ছকণ্ঠে বললে, 'প্রাণধনবাবু তো নিজের থেকে উপহারও দিতে পারেন। পারেন না? এত দিন তাঁর সংসারি করে দিলাম, সেই জন্যে কিছু মাইনেও তো আমার পাওনা হবে!'

তাই। তাই ঐ পুষ্পহার। উষসী যেন আরো ডুবে গেল।

'কিন্তু প্রাণধনবাবুর নালিশটা অন্যরকম। যাই হোক, যা বলবার আদালতে বলবেন। এখন চলুন।'

উষসী হঠাৎ মুখ তুলে ঝামরানো মুখে ঝাঁকরে উঠল: 'আমাদের ধরতে আসেননি?'

'নিশ্চয়।' পুলিসের কর্তা নিরাসক্ত ভাবে হাসল: 'আপনাদেরটা খটখটে কেস, কোনো গোলমাল নেই। আর এ একেবারে কাদাকিচেল। আপনারা ডিভিশন ওয়ান আর এ একেবারে থার্ড ক্লাশ—' পুলিশের লোক ঢোঁক গিলল: 'একটা রাজনীতি, আরেকটা, কি বলে ওটাকে—দুর্নীতি।'

উষসী কে তা আর নিশ্চয়ই জানতে বাকি নেই পুলিশের। তবু তার কাছে সে এতটুকু দুর্নীতি দেখলে না। উপায় কি, যেমনি ভাবে নালিশ হয়েছে তেমনি ভাবেই তো দেখবে। তবু পুলিশের দেখার চেয়ে উষসীর দেখাটাই বেশি করে দগ্ধ করছে তামসীকে। যেমনি ভাবে শুনল তেমনি ভাবেই সে দেখল।

নইলে একটা কথাও সে জিগগেস করল না কেন? বরং থানায় যাবে শুনে বিশেষ ভাবে সাজগোজ করতে বসল। ভাবখানা এমন, আমিই বেশি সুন্দর, বেশি সম্মানার্হ, আমি বিপ্লবিনী। আর তুমি হেয়, অপকৃষ্ট, তুমি থাক অমনি শ্রীহীন হয়ে। আমি ডিভিশন ওয়ান, আর তুমি খোসাভুষি।

দু দলে ভাগ হয়ে গেল তারা, সময়ে ছেদ দিয়ে। প্রথম দলে উষসী-নারায়ণরা। শেষ দলে তামসী একা। প্রতীক্ষমান ভিড় ওদের সঙ্গে-সঙ্গেই গেছে। তামসীর সঙ্গে-সঙ্গে শুধু পথ।

প্রথমবার সে যখন থানায় যায় পায়ে হেঁটে, তখন তার পরনের শাড়িটা এর চেয়ে অনেক খেলো আর নোংরা ছিল। কাকিমার কাছে গিয়েছিল একখানা শাড়ি চাইতে, কাকিমা মুখ ঝামটা দিয়েছিলেন। তবু সেদিনকার সেই গ্রাম্য অসংস্কৃত বেশবাসে নিজেকে তার কত সুন্দর মনে হয়েছিল, কত যৌবনধন্য। সেদিনও পথচারীদের চোখে ঠিক প্রশংসার দৃষ্টি ছিল না, তবু, যে যাই বলুক, নিজের বুকের মধ্যে তপ্ত হয়ে ছিল বড় কাজের তৃপ্তি, রক্তের মধ্যে আত্মদানের মদিরা। কিন্তু আজ এ কী হল? বুক শূন্য, রক্ত শীতল, সমস্ত পথস্পর্শ কলুষকুৎসিত।

আজকের উষসীর মতই তার অহংকার ছিল। অভিজাত রাজনীতির অহংকার। নীতির চেয়ে রাজসিকতাটাই যেখানে প্রধান। আজ তার সমস্ত অহংকার ভেঙে-চুরে ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাক। রণধীরের জন্যে আবার তার ব্যাকুলতা ফিরে আসুক।

জেল-হাজতে গেল তামসী। তার কে আছে যে মোক্তার ধরবে তার জন্যে? জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে? কানে-কানে পরামর্শ দেবে পালিয়ে যাবার? গায়ে-পায়ে শৃংখল খোলবার দুঃসাহসিক পরামর্শ?

শুধু আছে একজন মেয়ে-গার্ড। প্রায় বুড়ো হয়েছে কিন্তু সধবাত্ব যায়নি, কপালে গোলাকার সিঁদুর, পরনে চওড়াপাড় শাড়ি। স্বামী কোথায় প্রশ্ন করলে বলে নিরুদ্দেশ

হয়েছে। ভয় নেই, এই জেলেই দেখতে পাব একদিন। ঠিক কয়েদী হয়ে আসবে আমার লেগে।

সেই মাঝে-মাঝে দুঃখ করে। বলে, 'এমন ভরাভর্তি বয়েস, ছিমছমে চেহারা, গয়না তুমি চুরি করতে গেলে কেন? কত লোক অমনি যেচে-সেদে দিয়ে যেত ভারে-ভারে। ঘিয়ে খেতে, দুধে আঁচাতে। তা না, এ কি অনাছিষ্টি!'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝের উপর নিঝুম হয়ে বসে থাকে তামসী।

পাহারাউলী ঘন হয়ে সরে আসে। গলা নামিয়ে বলে, 'হাতের চেয়ে আম বড় করলে চলবে কেন, ঠিকমত চাল-চালাকিটি থাকা চাই। ভেক না হলে ভিক্ষে মেলে কি? তাই আমার কথা শোন। এবার যখন ছাড়া পাবে, ঠিকমত ফাঁদ পেতে ঠিকমত ফন্দি ধরবে। এই তো সময়। হাটবাজারের বেলা বেড়ে গেলে কাজ বাজাবে কখন? কথায় বলে যদ্দিন ছরৎ তদ্দিন। আমার কথাটি কানে তুলো বোনঝি, দেখবে ভুঁই থেকে টুই পর্যন্ত গয়নায় মোড়া হয়ে আছ। সৎপরামর্শ শুনে আমরাও কোন না দু একখানা গায়ে তুলেছি! এই যে যুগলবালাকে দেখছ—ডাকাতের ঘরের ডাকাতনী—এখন মোটা টাকা খরচ করছে, বলি, টাকা পেলে কোথায়? আমার বাপু ওল-কুটকুটে মুখ, কারু কুলকুষ্ঠি আমার অজানা নেই—'

থামতে বললে থামে না। মশার কাঁসর বাজছে, ঘুম নেই চোখের কোণে। বসে-বসে শুধু পচা পচাল শুনতে হয়।

প্রথমবার সে যখন কাঠগড়ায় গিয়ে উঠেছে, হাবেভাবে উল্লেখ করেছে শুধু তেজস্বিতার ইঙ্গিত। চুল বেঁধেছে, শাড়ির পাড়টা চওড়া করে পাট করে রেখেছে বুকের উপর, বসতে টুল দিলেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভঙ্গিতে এনেছে দৃপ্তির ব্যঞ্জনা। কখনো ব্যঙ্গময় হাসি হেসেছে সাক্ষীদের বাচালতায়, উকিল-মোক্তারের লম্ফঝম্পে। কিন্তু আজ? আজ সে বসেছে একেবারে খাঁচার তক্তার উপরে, আঁচলে মুখ ঢেকে। রুক্ষ চুল, অপরিচ্ছন্ন শাড়ি, দলিত-চূর্ণিত চেহারা।

সেদিন যে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধবার ছুঁতে যে হাত বাড়াত মাঝে-মাঝে, সে আজ কোথায়? তারা জেল-হাজতে আলাদা-আলাদা থাকত, কিন্তু মিলত এসে এক কাঠগড়ায়। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যহের সেই প্রথম অভিনন্দনের হাসিটি ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সময়কার বিষণ্ণতাটুকু প্রকৃতির মানচিত্রে আর লেখা নেই। মনে হত এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হোক সমস্ত জীবনে। কিন্তু আজ? মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে আদালতের জনতার দিকে তাকাল একবার তামসী। প্রাণধন আর নগেন সরকার সাক্ষী দিতে এসেছে। উঃ, এ যন্ত্রণা শেষ হবে কতক্ষণে?

আনডিফেণ্ডেড যাচ্ছে। একজন ছোকরা মোক্তার এগিয়ে এল কাঠরার গরাদের দিকে। বললে, 'আপনার নিজের কোনো লোক নেই?'

'না।'

'সাফাই নেই কোনো ?'

'না।' তামসী মুখের থেকে আঁচল সরাল। বললে, 'আমি গিলটি প্লিড করব।'

কাঠগড়ায় তার পাশের জায়গাটা আজ শূন্য, কিন্তু যেখানে সে যাবে সেখানে তার শূন্যতা কি সাম্যসঙ্গের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেনা? মনের থেকে ঘুচে যাবেনা কি সমস্ত বন্ধন-ব্যবধানের বেদনা? সেই পরিচ্ছন্ন অভিনন্দনের হাসিটি কি আবার ফুটে উঠবেনা তার চক্ষুতে-অধরে ?

(ক্রমশঃ)

রাজনীতিজ্ঞরা আজ শান্তির জন্যে যে সোচ্চার কামনা ব্যক্ত করছেন তা যদি আন্তরিক হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের উচিত শক্তিদ্বন্দ্বের সমস্যাটিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়া। যে একটি বৃহৎ সমস্যার সঙ্গে মানবজাতির প্রত্যেকটি প্রাণী জড়িত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং কূটনৈতিক বিতর্কে সে সমস্যাটিরই প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া উচিত। এ সমস্যার সমাধানে যে সামরিক হিংসাকেই শুধু বাতিল করতে হয় তা নয়—যতদিন পৃথিবীতে আস্তিকতার ও শক্তিদ্বন্দ্বের খেলা চলবে ততদিন পর্য্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হবেনা। নানাজাতির প্রতিনিধিদের যে সভাসমিতি হয় তার আলোচনায় এ সমস্যাটিরই প্রথম স্থান হওয়া উচিত : **কি উপায়ে পৃথিবীর নারীপুরুষশিশুরা প্রচুর খাদ্য পেতে পারে।**

আলডুস্ হাক্সলি।

নাগরিক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

মহানগরী। স্বর্গলোকের ইন্দ্রপুরীর নাম বৈজয়ন্তী। সেখানে অন্ধকার নাই—আলোর রাজত্ব। সেখানে দুঃখ নাই শুধু সুখ আছে। সেখানে অশান্তি নাই শুধু শান্তি আছে। সেখানে অতৃপ্তি নাই শুধু তৃপ্তি আছে। সেখানে দৈন্য নাই পরম ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করছে সে পুরী। সেখানে জরামরণ নাই আছে অনন্ত যৌবন এবং অমরত্ব। হিংসা নাই দ্বেষ নাই পাপ নাই, প্রেমের রাজত্ব প্রীতির নিলয়, পুণ্যের পবিত্রতায় নিষ্কলুষ, পবিত্র। তার ধ্বংস নাই; মানুষ বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্বর্গপুর থাকবে।

এ মহানগরী মাটির বুকের উপর রচনা করেছে মানুষ। সম্ভবতঃ ওই বৈজয়ন্তীর মতই একটি পুরী রচনা করবার কল্পনায় সে সভ্যতার উন্মেষের প্রথম দিন থেকে পুরুষানুক্রমে বিভোর হয়ে আছে। ভাঙছে-গড়ছে, গড়ছে-ভাঙছে। অনিচ্ছায় ভাঙে স্বেচ্ছায় ভাঙে। প্রকৃতির মধ্যে চলে ভাঙাগড়া, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা—আকাশে ওঠে কাল বৈশাখীর ঝড়, ঝড় আনে মেঘ—মেঘের বর্ষণে আসে প্রলয় প্লাবনের মত বন্যা—সেই ঝড়ে নগর ভাঙে, বন্যায় ডুবে যায়, পলিমাটি চাপিয়ে দিয়ে যায় স্তরে স্তরে। ঝড় বন্যার সঙ্গে আছে আগুন। নগরকে যে দীপমালা মানুষ পরায়—তারই আগুন লাগে; যে অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন মানুষ করে জীবনের প্রয়োজনে—সেই আগুন লাগে; আগেকার কালে আসত লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল—আসত নিষ্ঠুর অভিযানকারীর দল—তারা আগুন লাগিয়ে দিত—নগরীর মাথায় মাথায়, সম্পদভরা নগরীর ঘরে ঘরে; নগর পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত। মানুষ কিন্তু আবার গড়ত। এই নূতন গঠনে তার রূপ হত অভিনব, উজ্জ্বলতর। তার জীবনের আধুনিকতম আবিষ্কারকে সে কাজে লাগাত। আজকাল অভিযানকারী আগেকার কালের মত ঘোড়ার ক্ষুরে ধূলো উড়িয়ে বর্ষাফলকে মানুষের মুণ্ড গেঁথে দাউ দাউ ক'রে জ্বালানো মশাল হাতে নগরে ঢুকে আগুন লাগায় না। মাথার উপরে ওড়ে এরোপ্লেন—তাই থেকে ফেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক বোমা—বিপুল শব্দ

ক'রে বিস্ফোরণ হয়—মানুষের সাধের রচিত নগরীর ঘর বাড়ী টুকরো হয়ে ধূলো হয়ে ভেঙে পড়ে, ইনসেণ্ডারী বোমায় আগুন লাগে। যেকালের কথা বলছি তখন এ্যাটমবম্ তৈরী হয় নি, যুদ্ধ তখনও লাগে নি; সুতরাং এ্যাটমবমের কথা থাক। আগুনে পুড়ে বোমায় ভেঙে নগর ধ্বংস হয়; মনে হয় এ আর কখনও গড়ে উঠবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর আবার মানুষ গড়ে সমৃদ্ধতর নগর। আগুনের পর আছে ভূমিকম্প—তারপর আছে মহামারী—মানুষের সৃষ্ট আবর্জ্জনা থেকে উদ্ভব হয় মৃত্যুরোগের। মহামারীতে নগর হয় জনশূন্য—খাঁ-খাঁ করে।

ইতিহাসে গল্প আছে—গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মহানির্ব্বান লাভের জন্য যাত্রাপথে—গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটল বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে বলেছিলেন—আনন্দ শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি—ভাবীকালে এইখানে গড়ে উঠবে এক মহানগরী। কিন্তু উত্তরকালে অগ্নি দাহে এবং জলপ্লাবনে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

বুদ্ধের ভবিষদ্বানী ব্যর্থ অবশ্য হয় নাই। অজাতশত্রুর পত্তন করা পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল একদিন, সে নগর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছিল; মাটির তলা থেকে আজ তাকে খুঁড়ে বের করছে মানুষ। কিন্তু পাটলীপুত্র একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের পরে আবার পাটলীপুত্র গড়ে তুলেছিল মানুষ, মুসলমানের রাজত্বে পাটনা ভেঙেছে গড়েছে আবার ইংরেজের আমলে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে আজ সে নূতন করে গড়ে উঠছে।

বিংশশতাব্দীর বাঙালীর স্বর্গলোক কলকাতা মহানগরী। ইংরেজ এর পত্তন করেছে। জঙ্গলে ভরা লোনা জলে জর্জ্জর—শ্বাপদ সরীসৃপে ভরা পাঁচখানি জনবিরল মৌজা-মৌরসী বন্দোবস্ত নিয়ে জবচার্ণক পত্তন করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য গড়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। চারিদিকে খাল কেটেছিল নবাবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। সে আমলের ইংরাজেরা—ইংরাজদের দালালেরা, বাবুর্চ্চি খানসামা প্রভৃতিরা বসতি গ'ড়ে মহানগরীর সূত্রপাত করেছিল। সে সবের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু খাল, আর আছে পুরানো কেল্লার কয়েকটা কোনের প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন। ডালহৌসী স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের রাস্তার ওপাশের ফুটপাথ ধরে গেলে—দেখতে পাওয়া যায়। দুশো বছর ধরে ভেঙেছে-গড়েছে, আবার ভেঙেছে আবার গড়েছে। ছোটরাস্তা ভেঙে বড় রাস্তা হয়েছে, মাটীর উপর খোয়া বিছানো রাস্তা খুঁড়ে পাথর কুচি ঢেলে রাস্তা হয়েছে, তার উপর পিচ ঢেলেছে। শহরের বুকের বস্তী পুরানো আমলের চকমিলানো বাড়ী ভেঙে এই সেদিন তৈরী হয়েছে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু। রাস্তার দুপাশে আগে ছিল কেরোসিনের আলো তারপর হয়েছিল গ্যাসের বাতি তার সঙ্গে এখন হয়েছে

বিজলীবাতি। বস্তী ভেঙে, উঠিয়ে সেখানে হয়েছে বড় বড় বাড়ী। আগে ছিল কাদার গাঁথনী তারপর হয়েছিল চুন সুরকী—এখন এসেছে সিমেণ্ট; টালির ছাদের পরিবর্ত্তে কংক্রীটের ছাদ। লোহার বিম দিয়ে ছাঁদাছাঁদি ক'রে সাততলা আটতলা বাড়ী। ভিতরে লিফট্। বিজলীর আলো বিজলীর পাখা। বৈজয়ন্তীপুরের মত অন্ধকারকে দূর করবার জন্য আলো জ্বলে সারা রাত্রি। দুঃখকে দূর করে নিরবচ্ছিন্ন সুখকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আয়োজনের অন্ত নাই। দৈন্যকে ঘুচিয়ে সম্পদের রাজ্য ঝলমল করছে। জরামরণকে দূর করবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা করে গবেষণা, দেশদেশান্তরের গবেষণা তাদের টেবিলের উপর পড়ে থাকে—ফ্যানের হাওয়ায় পাতার পর পাতা উল্টে যায়। বৈজ্ঞানিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—উপায় নাই—এ মহানগরী পরাধীন দেশের মহানগরী, এখানে তার উপায় নাই। কর্পোরেশনের আছে স্বাস্থ্য বিভাগ—মহামারী এবং অন্যান্য রোগ থেকে নগরীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এ মহানগরী স্বর্গলোকের নগরী নয়, পৃথিবীর উত্তপ্ত মাটির বুকের উপর এর অবস্থিতি, সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে পিচ গলে, মেঘলা দিনের গুমোটে ভারী হয়ে ওঠে এর বাতাস, লক্ষলক্ষ মানুষের নিশ্বাসে, যানবাহনে ছুটোছুটিতে, পায়ের আঘাতে ধূলিকণায় ভরে যায় বায়ুস্তর। প্রবল বর্ষণে রাস্তা ঘাট ডুবে যায়। ডাস্টবিনে আবর্জ্জনা পচে দুর্গন্ধ ওঠে। চারিদিকে নানারোগের বীজানু ছড়ায়—মানুষকে অক্রমণ করে। মানুষ মরে। যক্ষা, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া-ম্যানিঞ্জাইটিস, মধ্যে মধ্যে দুটো একটা উদ্ভট রোগ দেখা যায়, দেশদেশান্তর থেকে আসে নূতন রোগ। সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে যায়—স্বাস্থ্যবিভাগ গোড়াতেই তাকে নিবারণ করবার চেষ্টা করে। খবরের কাগজে সপ্তাহে সপ্তাহে মৃত্যুর খতিয়ান প্রকাশিত হয়, গত সপ্তাহের খতিয়ানের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়।

মাটির বুকের উপরের মহানগরী, অশান্তি আছে কিন্তু অশান্তি নিবারণের জন্য আছে শান্তিরক্ষক পুলিশ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দেয়, যানবাহন চলমান জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশী শাসকের পুলিশ, শান্তিরক্ষার নামে দমন করে, দুর্নীতি অন্যায়কে রোধ করতে গিয়ে উৎপীড়ন করে, ঘুষ আদায় করে।

ধরিত্রীর ধূলার উপরে ইট-কাঠ, লোহা-পাথর-চুনসুরকী-সিমেণ্ট-পাথরকুচি-পিচ দিয়ে তৈরী মহানগরী। স্বর্গপুরীর মহানগরী নয়—এখানে হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, পাপ আছে, আবার প্রেম আছে, প্রীতি আছে, পুণ্য আছে; পবিত্রতা আছে, কলুষ আছে; আলো আছে, অন্ধকার আছে; জ্ঞানের বিজ্ঞানের লীলাভূমি, গাঢ়তম অজ্ঞানতার বিকারে মুখর, লক্ষীর দ্যুতিময় শ্রীতে উজ্জ্বল, দৈন্যের অধিষ্ঠাত্রী অলক্ষ্মীর কুৎসিৎ রূপের বীভৎসতায় বীভৎস এ মহানগরী।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সীকলেজ তার পর হ্যারিসন রোড, হ্যারিসন রোডের ওপারে বিখ্যাত গুণ্ডার বস্তী। সায়েন্সকলেজের গায়ে কসাইগুণ্ডাদের আড্ডা। বড় বড় রাস্তায় গ্যাসের আলোর উপরে ইলেকট্রিক বসেছে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত মোটর চলেছে, চকচকে ঝকঝকে দামী মোটর। গলিতে গলিতে গাঢ় অন্ধকার, সেখানে ছায়ামূর্ত্তির মত মানুষ চলা ফেরা করে। মানুষের বুকে ছুরি বসায়, পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। খালের ধারে বস্তীতে কেরোসিনের ডিবে অথবা হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে চলে বীভৎসতর তাণ্ডব, বড় রাস্তার ধারে রঙ্গমঞ্চে চলে চারুকলাসম্মত অভিনয়, সিনেমার স্ক্রীনে ভেসে ওঠে হিমালয়ের কোন অজ্ঞাত দিগন্তের অপরূপ শোভা, সেখানকার আনন্দরাজ্যের অপরূপ আনন্দমহিমা। রামকৃষ্ণ, কেশব সেন, বিবেকানন্দের লীলাভূমি, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মভূমি, রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি, শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের বাসভূমি, সুরেন্দ্রনাথ-দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়-সুভাষচন্দ্রের বিকাশভূমি এই মহানগরী। আবার এই মহানগরীর পুলিশ রেকর্ডে আছে হিংস্র অন্যায়ের নিষ্ঠুরতম অপরাধের ইতিহাস। এই মহানগরীর পথে পথে নিত্য ছুটে চলে উদারন্নের জন্য চিন্তায় অধীর অস্থির কেরাণীর দল, খিদিরপুরের ডকে জাহাজ থেকে নামে দ্রবসম্ভারের পর দ্রব্যসম্ভার, চালান যায় এখানকার কাঁচা মাল। ডকের চারিপাশে—গুদামে গুদামে—পাট-চা-কয়লা স্তূপীকৃত হয়ে থাকে। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান—ইউরোপিয়ানেরা দাঁড়িয়ে থেকে কুলীদের দিয়ে জাহাজ বোঝাই করায়—মধ্যে মধ্যে পেটে লাথি মারে, পিলে ফেটে কুলীরা মরে। চৌরঙ্গীর এখানে সেখানে টমিরা জোট বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

সুযোগ পেলে মেয়েদের হাত ধ'রে টানে; বাধা দিতে গেলে সঙ্গীপুরুষের নাকে ঘুঁষি মারে—পেটে লাথি মারে। ড্যাম নিগার বলে গালাগালি দেয়। বিদেশী এ মহানগরী তৈরী করেছে শাসনের জন্য শোষণের জন্য, সমগ্র দেশের সকল ব্যবস্থা সকল নিশ্চিন্ততা সকল ঐতিহ্যকে বিপর্য্যস্ত করবার জন্য। এই মহানগরীর বুকের উপর বসেই দেশে রেললাইন, টেলিগ্রাফ বসাবার পরিকল্পনা হয়েছে। হাওড়া ষ্টেশনে গেলে প্রথম ষ্টীম ইঞ্জিন 'ফেয়ারী কুইনকে' দেখতে পাওয়া যায়। এইখানে বসেই মুরশিদাবাদের শেষ নবাবের অধিকার উচ্ছেদের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল—সই হয়েছিল। এইখানে বসেই লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কায়েম করে বাংলাদেশে মেকী সামন্ততন্ত্র অর্থাৎ ভুয়ো রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর জমিদারশাসিত সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইখানে বসেই লর্ড ওয়েলেসলী লর্ড ডালহৌসি ভারতবর্ষকে গ্রাসের সকল কূটনীতির পরিকল্পনা করেছিল—তাকে রূপায়িত করেছিল। সিপাহীবিদ্রোহদমনের সকল ব্যবস্থা এখান থেকেই হয়েছিল।

মর্ত্ত্যে বৈজয়ন্তীপুরীর ভূমিকার মত রচিত এই মহানগরী এই দেশের মাটির উপরে এই দেশেরই নদীর তটপ্রান্তে রচিত—তবু এখানে আমরা পরবাসী; দীপাবলী শোভিত আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর মধ্যেও আমরা তিমির লোকের অধিবাসী। সেই সংঘাতে সেই দ্বন্দ্বে এই মহানগরীতেই প্রথম স্ফুরিত হয়েছে তিমিরবিদারণ মন্ত্র; সুরু হয়েছে তার সাধনা। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর এখানেই প্রথম সূর্য্যালোকের স্পর্শ পেয়েছে। ধরিত্রীর সকল পীড়িত মানুষের আর্ত্তনাদ এই মহানগরীর বুকে বসেই এখানকার মানুষ শুনতে পেয়েছে। আকাশস্পর্শী অট্টালিকা এবং দৈন্যের ভারে মুখ থুবড়ে পড়া বস্তীর ঘরের বৈষম্যের অবিচার অন্যায় এখানে বসেই মানুষ উপলব্ধি করেছে। এখানেই হয়েছে কংগ্রেসের স্মরণীয় অধিবেশন। এই মহানগরীর শিশুই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। এই মহানগরীর বুকে যে ভাবনার আজ উদ্ভব হ'ত সেই ভাবনায় পরদিন ভাবিত হ'ত সমগ্র ভারতবর্ষ।

এইজন্যই এ মহানগরী শত গ্লানি সত্ত্বেও বাঙালীর স্বর্গ। সমগ্র দেশের ভাবীকাল এইখানে রচিত হচ্ছে, বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এইখানেই হয় এ দেশের মানুষের ভাববিনিময়, লেনদেনের বোঝাপড়া। বিমল এ মহানগরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই সে পল্লীকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে, এইখানেই সে বাস করবে, এইখানেই তার স্থান তাকে করে নিতে হবে।

শীতার্ত্ত সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ জমেছে, প্রবল না হ'লেও জোরালো হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি খানিকটা হয়ে গেছে দুপুরে, এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু আরও বৃষ্টি হবে বলেই মনে হয়। মাঘ মাস। প্রবাদে আছে ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ। মাঘের শেষেই বর্ষণ হয়েছে এবং আরও হবে, রাজাও ধন্য রাজা—রাজার রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না, কিন্তু দেশ পুণ্য দেশ কিনা সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে লোকে। বিমল কিন্তু সন্দেহ করে না। পুণ্য দেশ তাতে সন্দেহ কি? পাপ নেই এ কথা সে বলে না, কিন্তু পাপের চেয়ে পুণ্য যে বেশী তাতে তার সন্দেহ নেই। সে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। ওই দিকেই অবশ্য কালিঘাট আদিগঙ্গা কিন্তু মা কালী বা মা গঙ্গাকে সে প্রণাম করে নি; কালীঘাটের অল্প উত্তর পশ্চিমে আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, তার খানিকটা দূরে প্রেসিডেন্সী জেল। প্রণাম করলে সে ওই জেল দুটির ফাঁসীর মঞ্চকে।

অন্ধকার নামছে। মেঘলা আকাশের ছায়া অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছে। কার্জ্জন পার্কে মরসুমী ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য আর দেখা যাচ্ছে না। ধূসর মেঘের পটভূমিতে ইডেন গার্ডেনের ঘন বৃক্ষসমাবেশকে দেখাচ্ছে যেন কাজলের মত গাঢ় কালো রঙে আঁকা বনশোভার

মত। মেঘলা সন্ধ্যার গড়ের মাঠের ফাঁকা বুকের উপর অন্ধকারের মধ্যে কুয়াসার মত একটা ধোঁয়াটে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তারই মধ্যে জ্বলছে সারি সারি আলো। মনে হচ্ছে যেন ঘষা কাচের মধ্যে জ্বলছে আলোগুলি।

বিমল গাছতলার একটি বেঞ্চে বসেছিল। সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে এল এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোয়। পিছনে ষ্ট্র্যাণ্ডের ওধারে গঙ্গায় জাহাজের ষ্টীমারের বাঁশী বাজছে। গঙ্গার ধারে মিলে ভোঁ বাজল। খিদিরপুর বেহালা আলিপুরের ট্রামগুলো আসছে বিপুল গতিতে ফাকা মাঠের উপর দিয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ এবং ঘন্টার শব্দ উঠছে। চৌরঙ্গি ধরে চলেছে বাস, মোটর, লরী; হর্ণ বাজছে, ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে। কোথাও বোধ হয় কোন হোটেলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। পার্কটার মোড়েই বিক্রী করছে ঘুঘনি, দহিবড়া পকৌড়ি, গরমভাজা বেগুনী, আলুর চপ। কাগজওলারা সান্ধ্য সংস্করণ কাগজ বিক্রী করছে। কয়েকজনে রেসের বই নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে। উত্তরে সাততলা বাড়ীটার মাথার উপরে গোলকের মাথায় খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বলছে, ধর্ম্মতলার মোড়ে গিসগিস করছে লোক; আলো ঝলমল করছে; উত্তর পশ্চিম কোনে খাবারের দোকানটার মাথায় ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে।

—শুনুন।

ফিরে তাকিয়ে দেখেই বিমল বিরক্ত হল। বিশবাইশ কি চব্বিশপঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ডাকছিল। আধুনিক রুচি অনুযায়ী কাপড় চোপড় পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একটা ব্যাগ। সে তাকে ডাকছিল—শুনুন।

মেয়েটির সঠিক পরিচয় না জানলেও মেয়েটিকে সে প্রায় নিত্যই এখানে দেখে। এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য হয় তাকে নিয়ে। শুধু ওই মেয়েটি একা নয়, আরও অনেক আসে। কালীঘাটের ট্রাম থেকে একটি মেয়ে নামে, নামে সে উল্কার মত গতিতে, ভিড় চিরে চলে হন হন ক'রে। পাশ থেকে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সামনে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়ালে তবে সে দাঁড়ায়। তারপর গিয়ে ওঠে কোন রেঁস্তোরায় অথবা ওঠে ট্যাকসীতে অথবা ঘুরে পশ্চিম মুখে চলতে থাকে ইডেনগার্ডেনের দিকে। বিরক্ত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি এর পরেই যে কথা বললে তাতে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, সে বললে—আপনিই তো বিমল বাবু!

চমকে উঠল বিমল। মেয়েটি তার নাম জানলে কেমন করে? শঙ্কিত হ'ল সে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের কোন ফন্দী নয় তো? কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করে ফল কি? শত্রুই

বা তার এমন কে আছে ? ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সে বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এল। কাছে আসতেই বিমল তাকে দেখে আরও একটু বিস্মিত হল। যাকে সে ভেবেছিল এ তো সে নয়। একে কখনও দেখেছে বলে মনে হল না। মেয়েটি বললে—আপনাকে আমি রেডিয়ো অপিসে দেখেছি। আজই বিকেল বেলা সেখানে আপনি গিয়েছিলেন না ?

—হ্যাঁ।

—আপনি গল্প পড়লেন সেখানে। বাইরের ঘরে বসে শুনলাম। আপনার নাম বললে। পড়া শেষ ক'রে আপনি বাইরের অপিসে এসে চেক নিলেন, আপনাকে তখনই দেখেছি আমি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন ? আমাকেই বা আপনার প্রয়োজন কিসের ?

—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—বিপদ ? কি বিপদ ?

—কলকাতায় এসেছি আমি—। আমার বাড়ী ঢাকা। রেডিয়োতে গান করেন—ওখানে খুবই প্রতিপত্তি আছে ব'লে শোনা যায়—অরুণ মুখার্জ্জি, চেনেনে আপনি ? চুল কোঁকড়া, খুব ফরসা রঙ।

—চিনি বৈ কি।

—তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমি অনেক বড় ফিল্ড পাব। রেডিয়োতে তিনি প্রোগ্রাম ক'রে দেবেন—সিনেমাতে ব'লে দেবেন, সেখানে আমি স্কোপ পাব। আমি তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে—।

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেললে—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললে—আমার কোন আশ্রয় পর্য্যন্ত নেই। আমি—আমি—। আর সে কথা বলতে পারলে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—সে কি ? স্তম্ভিত হয়ে গেল বিমল।

—আজ রাত্রিটার মত আমায় কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন ?

বিমল একটু চিন্তায় পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না সে। মেয়েটি যার নাম করছে

সেই অরুণ মুখার্জ্জিকে সে জানে। অনেকেই জানে কলকাতা শহরে। বিশেষ করে ফ্যাশানেবল সোসাইটিতে। কখনও ধুতি পাঞ্জাবী কখনও স্যুট কখনও পায়জামা আচকান কখনও পাঞ্জাবী ও চুস্ত পায়জামা পরে বেড়ায়, মোটরেই দেখা যায় বেশীর ভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কিসে সে বিশেষজ্ঞ নয়। কোন দলে সে মেশে না। তার পাশে অহরহ কোন না কোন তরুণী বান্ধবী থাকেই। যাকে বলে আলট্রামডার্ণ। বাপ দিল্লীতে বড় চাকুরে। সম্ভবত পুত্রের যোগ্য বাপমা। সম্প্রতি কোন বিখ্যাত শিল্পীর বাড়ীতে তাকে দেখেছিল বিমল, তার সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবিনীর পোষাকপরা এক তরুণী—পরিচয়ে জেনেছিল সে অরুণরায়ের সহোদরা, তাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোক সে হ'ল অরুণের ভগ্নীপতি। কোন বিখ্যাত সমালোচকের আসরে তাকে দেখেছিল, সেখানে ছিল একটি ভিন্নপ্রদেশবাসিনী কবিযশপ্রার্থিনী এক বান্ধবী। মেট্রোসিনেমার দরজায় দেখেছিল—সঙ্গে ছিল একটি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে, সে নাকি ভারতীয় নৃত্য পটিয়সী। অরুণ মুখার্জ্জী খ্যাতিমান দ্যুতিমান এবং সকল কর্ম্মে পারঙ্গম—। মেয়েটি বললে—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

বিমল স্পষ্টই বললে—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যে কাহিনী বললেন—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কাহিনী নয় সম্পূর্ণ সত্য। হাতের ব্যাগ খুলে সে একখানি পত্র বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন, অরুণবাবুর পত্র।

পত্রখানি হাতে নিয়েও পড়লে না, বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করব? এখানে আমি একা থাকি, একখানি ঘরে, খাই হোটেলে—আপনার ব্যবস্থা কোথায় করতে পারি ভেবে তো পাচ্ছি না। আপনি উঠেছিলেন কোথায়?

—হোটেলে। মেয়েটি তিক্ত হাসি হাসলে। বললে—খরচপত্র দিয়ে অরুণবাবু হোটেলে ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন। ষ্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েও এসেছিলেন। তার পর—। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মেয়েটি—তারপর বললে—হোটেল থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসেছি।

—দেশে চলে গেলেন না কেন?

—না। দেশে আমি ফিরব না। সে বারবার ঘাড় নেড়ে তার সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত প্রকাশ করলে।—দেশে আমার কেউ নেই; আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। মানুষের উপর বিশ্বাস ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। বড় অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনাকে ধরেছি। একটু স্তব্ধ থেকে হঠাৎ বললে—নইলে—। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। তারপর বললে—সাহিত্যিকদের দুর্ণামের কথাও আমার অজানা নয়। তবুও দুর্ণামে তাদের ক্ষতি হয় এবং ওই অরুণ মুখার্জ্জী কি—হঠাৎ থেমে

সে এসপ্ল্যানেডের গেটটার থামের গায়ে লাগানো একখানি সিনেমার পোষ্টারের দিকে অঙুল দেখিয়ে বললে—ওই লোকটা—

—কে ? বিস্মিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলে। কোন লোকটা ?

—ওই যে পোষ্টারে ছবি রয়েছে। লোকটার নাম করতেও ঘেন্না হচ্ছে আমার।

'অভিসারিকা' নামক নবতম চিত্রাবদানের পোস্টারে নায়ক রতন রায়ের হাসি মুখ দেখা যাচ্ছিল। আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকায় রতন রায়কে দেখা যাবে। আগামী ২রা মার্চ্চ ১৯৩৭ সাল শুভ উদ্বোধন হবে ছবির। দিনটি শুভদিন তাতে সন্দেহ নাই।

মেয়েটি বললে—অরুণ মুখার্জ্জী—কি ওই লোকটার সঙ্গে তাঁদের তুলনা আমি করি না। তা ছাড়া—এ সব বিষয়ে আপনার সুনামের কথাই শুনেছি। লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে ভরসা হয়। তাই—অসঙ্কোচেই উপযাচিকা হয়ে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। রাত্রিটার মত কোন ভদ্রলোকের অন্দর মহলে আমাকে আশ্রয় দেখে দিতে হবে আপনাকে। এরই মধ্যে কতকগুলো গুণ্ডা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

বিমল শেষ কথাটায় চকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই বললে—আসুন। কালীঘাটের ট্রাম।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কালীঘাটের ট্রাম। সে উঠে পড়ল। পিছন পিছন মেয়েটিও উঠল। বিমল তাকে লেডীস সিটে বসিয়ে দিয়ে সামনের সিটটায় বসল। ১৯৩৭ সালের কথা—কলকাতায় এত ভিড় ছিল না তখন, ট্রামখানা খালিই যাচ্ছিল। সিটে বসে বিমল তার হাতের চিঠিখানা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, বললে—রাখুন আপনার চিঠি।

—না। পড়ুন আপনি। আমি চাই চিঠিখানা আপনি পড়েন।

খামখানা ঘুরিয়ে দেখে বিমল চিঠিখানা পকেটে রাখলে। মেয়েটির নাম—অরুণা ঘোষ।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকলা

আলোকচিত্রের যুগে আলেখ্য অঙ্কন স্বাভাবিকভাবেই মন্দীভূত হবে—তা নিয়ে আমাদের সন্তপ্ত হবার কারণ নেই। আকৃতির অতি সূক্ষ্ম রেখা ও ডৌল সমন্বিত ছায়াকেই যখন আলোকচিত্র ধরে আন্‌তে পারে, সাধারণের ধারণায় তখন প্রতিকৃতি রচনায় শিল্পীর রং আর তুলি অবান্তর মনে হতে বাধ্য। আলেখ্য অঙ্কনের প্রতি সাধারণের ঔদাসীন্যই ক্রমে ক্রমে শিল্পীদের আলেখ্য অঙ্কনে নিরুৎসাহিত করেছে। সাধারণ মনকে কে বোঝাবে যে আকৃতির প্রতিকৃতি রচনা করা ছাড়াও আলেখ্য-অঙ্কনে আরো কিছু আছে। 'রূপ' কথাটিকে যদি বহিরবয়বের সীমাতেই আবদ্ধ করে না রাখি তাহলে আলেখ্য অঙ্কনকে আকৃতির রূপদান বলে অভিহিত করা যায়। আকৃতির অন্তর্গত কতগুলো বিষয়ও এই 'রূপ' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। আলোকচিত্রের কাছ থেকে আমরা একটি মানুষের নিখুঁত দেহাবয়ব পেতে পারি—মানসিকতার মূর্ত্তি পাইনে। মানসিকতার মূর্ত্তি ধরা দিতে পারে শুধু শিল্পীর দৃষ্টিতে—ফুটে উঠ্‌তে পারে শিল্পীর রং আর রেখায়। শিল্প-স্ফূর্ত্তির এটুকু অবকাশ আছে ব'লেই শিল্পীরা আজ অবধি আলেখ্য অঙ্কন থেকে পুরোপুরি নিরস্ত হননি। ১৬৫৯-সনে রেম্‌ব্রাণ্ট নিজের যে আলেখ্য নিজে অঙ্কন করে গেছেন—তার রেখার সূক্ষ্মতা ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যই কেবল চিরদিন শিল্পীমনকে আলেখ্য অঙ্কনে প্রেরণা দেয়নি—সে-আলেখ্যে রেম্‌ব্রাণ্টের সম্পূর্ণ শিল্পী সত্তা প্রতিভাত বলেই তা শিল্পীদের কাছে ঐশ্বর্য্যবান। এ আলেখ্যে আমরা ৫৩ বৎসর বয়েসের প্রৌঢ় রেম্‌ব্রাণ্টকে দেখ্‌তে পাই—মানুষটিকে না দেখে দেখ্‌তে পাই যেন একটি গভীর দৃষ্টিকে—সমস্ত ছবিটি থেকে শিল্পীর সেই দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দু'টিই যেন বিশাল হয়ে ফুটে ওঠেছে। শিল্পীকে আঁকতে গেলে তাঁর দৃষ্টিক্ষমতারই রূপদান করতে হয়—রেম্‌ব্রাণ্টের এই রূপদান ছবিটিকে সার্থক করেছে।

আলেখ্য অঙ্কনে এ-ধরণের শিল্প-প্রতিভার অধিকারী অবনীন্দ্রোত্তর বাংলা শিল্প-জগতে অনেকেই আছেন—শ্রীযুক্ত যামিনী রায় অঙ্কিত এ ধরণেরই একটি আলেখ্যের প্রতিরূপ এ সংখ্যা পূর্ব্বাশায় মুদ্রিত হ'ল। কিন্তু সাম্প্রতিক যুগের কোনো শিল্পী আলেখ্য-অঙ্কনে বিশেষ উৎসাহী নন এবং উৎসাহী হলেও কেউ তাঁরা এধরণের প্রতিভার বিকাশ দেখাতে সমর্থ হননি—আমাদের অভিযোগ তা-ই।

সাময়িক সাহিত্য

উপন্যাস : শত্রুপক্ষের মেয়ে—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স। দাম—৩৷০

অগ্নিসংস্কার : প্রধূমিত বহ্নি—মনীন্দ্রনারায়ণ রায়। সমবায় পাবলিশার্স। দাম—৫৲

গল্প : উল্টোরথ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। মিত্র ও ঘোষ। দাম—২৷৵০

মনোজ বসুর রচনার সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটেছে, এমন কোনো পাঠকের হাতে তাঁর এই সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস শত্রুপক্ষের মেয়ে যদি গিয়ে পৌঁছে, তা হলে তিনি লেখকের এই আশ্চর্য্য রূপান্তর দেখে স্তম্ভিত হবেন সন্দেহ নেই, কারণ এর পূর্ব্বে মনোজ বাবুর যে উপন্যাসখানি পাঠকসমাজ হাতে পেয়েছিলো সেই 'সৈনিকের' সঙ্গে এই নতুন বইটির ভাবে ভাষায় ও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে এতই তফাৎ যে, সময়ের দিক থেকে বিচার করলে একই লেখকের কাছ থেকে এমন দুইটি উপন্যাস পরপর পেলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যেহেতু মনোজ বাবু সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন অনেকদিন এবং ইতিমধ্যে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্পগ্রন্থ পাঠকমহলে প্রচারিত হয়ে গেছে, সেই হেতু মনোজবাবুর রচনার সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকেরই পরিচয় প্রাচীন। এবং আমার এ বিশ্বাস যদি মিথ্যা না হয় তা হলে, এই গ্রন্থের সমালোচনার পূর্ব্বে পাঠকসাধারণকে মনোজ বাবুর প্রাথমিক রচনাগুলির, বিশেষ করে 'বনমর্ম্মর' এবং 'পৃথিবী কাদের' গল্পগ্রন্থ দুইটির কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করি। তার কারণ, শত্রুপক্ষের মেয়ের সঙ্গে এই দুইটি বই-এর সামঞ্জস্য যেমন ভাষায় তেমনি রচনারীতিতেও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। তা ছাড়া, বাঙালী পাঠকসাধারণের নিশ্চয়ই মনে আছে, শত্রুপক্ষের মেয়ের কিয়দংশ বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, যে সময়টায় মনোজবাবু নিশ্চিতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেননি অথচ যখনকার রচনায় অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছিলেন। সুতরাং, প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বয়সের দিক থেকে দেখলে শত্রুপক্ষের মেয়েকে সর্ব্বকনিষ্ঠ বললেও, এ বিপর্য্যয় ঘটেছে তার বহুবর্ষ অজ্ঞাতবাসের জন্যই। এ কথাটা মনে থাকলে যে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে সহজভাবেই উপন্যাসটিকে গ্রহণ করতে পারবেন।

বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার যখন পরিপূর্ণভাবে এবং প্রবোধকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণভাবে শহরজীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্যরচনায় অগ্রসর হলেন তখন বিশেষ ভাবে গ্রাম্য-জীবনকে আশ্রয় করে যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করে চলছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাম করতে হয় শৈলজানন্দের এবং কিছুদিন পর এলেন তারাশঙ্কর। শৈলজানন্দ গ্রাম্যপরিবেশে সাধারণ গ্রাম্য-জীবনের আলেখ্য আঁকলেন তাঁর সাহিত্যে, কিন্তু তারাশঙ্কর একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকালেন গ্রামের দিকে। ধ্বংসোন্মুখ জমিদারকুলকে কেন্দ্র করে গ্রামের আভ্যন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য নরনারীর জীবনবোধেরও রূপান্তর কেমন করে ঘটতে সুরু করেছে, তারই

ইতিহাস যেন সাহিত্যরূপ নিয়ে দেখা দিলো তারাশঙ্করের রচনায়। অল্পকথায় বল্‌তে গেলে বলা যায়, তারাশঙ্করের রচনা, গ্রামীন ঐতিহ্যেরই সাহিত্যিক রূপায়ন। একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে বাঙালী পাঠকের দল সানন্দে গ্রহণ করলেন তারাশঙ্করকে এবং তৎসমায়িক পরবর্তী কয়েকজন সাহিত্যিকের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া গেলো। মনোজ বসু যখন প্রতিষ্ঠার মুখে, বাংলা উপন্যাসসৃষ্টির প্রচেষ্টায় তখন এই ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রখর সুতরাং শত্রুপক্ষের মেয়ের বিষয়বস্তুও এই নবাগত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। এ থেকে আপাতভাবে মনোজবাবুর ওপর তরাশঙ্করের প্রভাবের কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে রকম মনে করলে ভুল হবে, কারণ সমসাময়িক রচনাকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মিল থাকলেই যে একের ওপর অন্যের প্রভাব নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হবে সেটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বরং বলা চলে, যে পর্য্যন্ত লেখক আপনার শক্তির পরিচয় নিজেই খুঁজে পান নি, সে পর্য্যন্ত তিনি সাধারণভাবে পাঠকমহলেরই রুচি ও ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত থাকেন। কিন্তু শক্তিধর সাহিত্যিকের আচ্ছন্নভাব কাটে শিগ্‌গীরই এবং তাঁরই প্রভায় আলোকিত হয় পাঠক, সমাজ এবং সমসাময়িক সাহিত্য। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলে, ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে মনোজবাবুতে যে তারাশঙ্করের কোনো প্রভাব বর্ত্তায়নি, উভয়ের রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই তা সহজে ধরতে পারবেন।

শত্রুপক্ষের মেয়ে এক জমিদার পরিবারের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আরও পরিষ্কার করে বল্‌লে বলা যায়, এ কাহিনী দুইটি আত্মমর্য্যাদায় সচেতন পরিবারের অনমনীয় সাম্মানবোধের উদ্ধত বিরোধ। একদিকে অমিতপ্রতাপ জমিদার নরহরি চৌধুরী, যাঁকে ভীতিবিহ্বল প্রজাকুল চেনে বাঘা চৌধুরী নামে, আর একদিকে তাঁরই প্রাক্তন বন্ধুস্ত্রী সৌদামিনী যাঁর স্বামী শিবনারায়ণের শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এই বাঘা চৌধুরীও। কিন্তু এ বিরোধ শেষ পর্য্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে উভয় পরিবারের মিলনে—পরিণয়বন্ধনে। স্থানকালপাত্র হিসেবে যে ব্যাপক পরিমণ্ডলে তাঁর ঘটনাবস্তুকে গ্রহণ করেছেন লেখক, তাকে তিনি নিপুণভাবেই প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রধান চরিত্র বস্তুতঃ দুইটি—নরহরি এবং সৌদামিনী, এবং গ্রন্থের নাম শত্রুপক্ষের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, এ উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্র হচ্ছে নরহরি। সুতরাং, তাঁরই জীবনের উত্থান-পতন, তাঁর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লেখক বিশেষ করে রূপায়িত করেছেন এ গ্রন্থে।

অতএব, শত্রুপক্ষের মেয়েকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে, ঘটনাপারম্পর্য্যীক বিভিন্ন অবস্থার পরিবেশে নরহরির চরিত্রকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। লেখক দেখিয়েছেন, নৃশংস নরহরি চৌধুরী আকস্মিক কিছু নয়, আসলে তাঁর সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে তিনি নৃশংসতার মূর্ত্ত প্রতীক শ্যামশরণের বংশধর, যিনি ইতিমধ্যে কিংবদন্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, কিন্তু এই নৃশংসতার অন্তরালেও আর একটি হৃদয় আছে নরহরির যে হৃদয় দিয়ে তিনি অবলীলায় নিজের পরাজয়কে স্বীকার করে নিতে পারেন, তাই শিবনারায়ণের কাছে পরাজিত হয়েও তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে তিনি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নি; পরে আর একবার অন্তরের নিঃস্বতাকে নিরাবরণ করে দিয়ে সৌদামিনীর উপযুক্ত পুত্রের হাতে তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা সুবর্ণকে তুলে দিতে পেরেছিলেন তিনি এই হৃদয়েরই উদারতায়। তবু আত্মমর্য্যাদায় প্রখর নরহরি; যত কিছু ছলচাতুরী এবং

নির্ম্মম প্রবৃত্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে তা কেবল তাঁর এই আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই। এই দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়কে লেখক অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় আমরা যদিও বল্‌তে পারি যে তিনি এই প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছেন, তবু আমার বল্‌তে কুণ্ঠা নেই, নরহরির প্রৌঢ়-জীবনের রূপটিকেই তিনি বিশেষ করে আঁক্‌তে সমর্থ হয়েছেন। প্রৌঢ়ত্বে এসে নরহরি তাঁর অভিজ্ঞতায় চিন্‌তে পেরেছেন মানব-প্রকৃতিকে, বুঝ্‌তে পেরেছেন অগ্রগতির অনিবার্য্য ধারাকে, যাকে রোধ করে পুরাতনকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাঁর আজীবন সাধিত কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু তাতে কোনো অনুতাপ নেই—আপাতশত্রু শিবনারায়ণের প্রশান্তির মধ্যে পৌঁছেই যেন তিনি লোকোত্তর এক জীবনকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই কোনো পরাজয়ই আর তাঁর কাছে পরাজয় নয়।

সৌদামিনী নরহরির শত্রুপক্ষের মেয়ে। বল্‌তে দ্বিধা নেই, লেখক তার প্রতি সুবিচার করেননি। সৌদামিনীর পরিণতি স্বাভাবিক, কিন্তু নরহরির মত লোকের সঙ্গে যে শত্রুতা করতে সাহস পায় সে কেন আগাগোড়া এমন অন্তরালবাসিনী? স্ত্রীলোক বলেই কি? তবু ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু পরিচয় তাঁর পাওয়া গেছে, সেখানেই এই নারী আত্মমর্য্যাদায় মহীয়সী, আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

মালাধর, চিন্তামণি, ভানুচাঁদ পার্শ্বচরিত্র হলেও সার্থক। সবকিছুকে ছাপিয়ে চিন্তামণির প্রভুভক্তি এবং তার মৃত্যু আশা করি প্রত্যেকটি পাঠককে খানিকক্ষণের জন্য অভিভূত করে রাখবে। কয়েক আঁচড়ে সুবর্ণ আর কীর্ত্তিনারায়ণকে লেখক বেশ স্পষ্ট আর সুন্দর করে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন সন্দেহ নেই।

চরিত্ররূপায়নে সার্থক হলেও ঘটনাসৃষ্টিতে মনোজবাবু কয়েক জায়গায় বড় বেশী খেয়ালিপণার পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে সে ঘটনাগুলি যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি তাই-ই নয়, মাঝে মাঝে তাদের অস্বাভাবিক বলেও মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ শ্যামশরণ সম্বন্ধে কাহিনীগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবাদ বাক্যের মতো তার কথা উত্তরকালের লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গেলেও, যা কেউ দেখেনি, কানে শুনেছে মাত্র, তাকে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব কতগুলো রূপকথা শোনানো অবান্তর নয় কি? তা ছাড়া ষ্টীমার আর ষ্টীমারের এক নির্ব্বোধ সাহেবকে নিয়ে লেখক যে খণ্ড-গল্পের অবতারণা করেছেন, তা যেমন অনর্থক তেমনি মূল্যহীন। এ গল্পাংশটুকুতে যথেষ্ট হাস্যরস আছে এবং পরিপূর্ণ একটি গল্পের রূপেই যদি তাকে আমরা পেতাম তা হ'লে আমরা মনোজবাবুর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা দেখে হয়ত অবাকই হতাম, কিন্তু এখানে এ উপন্যাসে এই অংশটুকুকে সংস্থাপিত করে তিনি সে সম্ভাবনাকে তো নষ্ট করেছেনই, অধিকন্তু উপন্যাসটিকে পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করে ফেলেছেন। মনোজবাবুর রচনাকে অপমান করতে চাই না, তথাপি তাঁকে অনুরোধ করে বল্‌তে ইচ্ছা করে, পরবর্ত্তী সংস্করণে এ অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে যদি তিনি পারেন তা হ'লে হয়ত ভালোই হবে।

পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করেছি, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তারাশঙ্করের রচনার সঙ্গে হয়ত এ গ্রন্থের কিছু মিল থাকতে পারে কিন্তু রচনাশৈলীতে তারা একান্তই পৃথক, এবং আরও বলেছি এই যে, শত্রুপক্ষের মেয়েতে 'বনমর্ম্মর'-এর মনোজবাবুকেই পাঠক আবার ফিরে পাবেন। আমার এ কথা

থেকেই আশা করি যে কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন, এ উপন্যাসে মনোজবাবুর সেই রোমান্টিক মন ও রচনারীতিকেই ফিরে পাওয়া যাবে গত কয়েক বছোরের রচনায় যাকে তিনি ইচ্ছে করেই ছেড়ে এসেছিলেন। শত্রুপক্ষের মেয়ে পড়ে আমার অন্ততঃ মনে হলো, মনোজবাবু যে ভাবেই নিজেকে ব্যক্ত করতে চান না কেন, তাঁর আসল মুক্তি হচ্ছে এই রোমান্টিকতায়ই। ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। যেখানেই লেখক বর্ণনায় হাত দিয়েছেন সেখানেই তিনি শরৎচন্দ্রের ভাষার কাছে অবধারিতরূপে ধরা পড়েছেন। গ্রন্থের সূচনা এবং উপসংহারের অংশটুকু পড়লেই যে কেউ আমার কথা সত্য কিনা তার প্রমাণ পাবেন।

শত্রুপক্ষের মেয়ে মনোজবাবুর বিরাট উপন্যাস 'যুগান্তরের' প্রথম খণ্ড মাত্র। তিন খণ্ডে এ গ্রন্থ শেষ হবে। এবং শেষ খণ্ডে লেখক অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত তাঁর ঘটনাকে বহিয়ে আনবেন, এ আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতেই বাকী দুই খণ্ড হাতে পাবো, এ আশা আমরা করতে পারি বোধ হয়।

মাত্র দশবৎসর আগেও বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের ঘটনাবস্তু প্রধানত গড়ে উঠেছিলো নিতান্তই পারিবারিক সামাজিকতাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে, সে সাহিত্যের ক্ষেত্র বদলেছে। সাহিত্যকে যদি সমাজের দর্পন বলে স্বীকার করতে হয়, তা হলে এ পরিবর্ত্তনকেও গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধবার প্রথম লগ্ন থেকেই ভারতবর্ষের অবস্থা এমন দ্রুত রূপান্তরিত হতে সুরু করেছিল যে তাকে কোনোক্রমেই চোখ বুজে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিলো না, আর এই দ্রুত পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে গেছে। সুতরাং যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের পটভূমিতে যদি আমরা এই দ্রুত পরিবর্ত্তমান সামাজজীবনেরই আভাস পাই তা হলে তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। বাংলাসাহিত্যে এই অবস্থান্তরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু গল্পউপন্যাস রচিতও হয়ে গেছে। প্রধূমিত বহ্নি সেই তালিকায় একটি নবতন যোজনা মাত্র।

এখন, এই যে পরিবর্ত্তন, একান্ত স্থূলভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তা প্রধানত দুই দিক থেকে মানুষের মন ও ভাবনাধারণাকে স্পর্শ করেছে। প্রথমত, এ পরিবর্ত্তন একটি প্রত্যক্ষ বিপর্য্যয়রূপে সামাজিক জীবনধারাতে গিয়ে প্রবেশ করেছে, যাকে কেন্দ্র করে প্রবোধকুমার সান্ন্যাল এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পও রচনা করেছেন; দ্বিতীয়ত এ পরিবর্ত্তন এসে নাড়া দিয়েছে মননশীল নরনারীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায়—এই রাজনৈতিক চেতনাকে আশ্রয় করে ইতিমধ্যে কয়েকটি সুবৃহৎ উপন্যাসও রচনা করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মনোজ বসু এবং আরো কয়েকজন। প্রধূমিত বহ্নি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস।

প্রধূমিত বহ্নির মূল ঘটনাবস্তু হচ্ছে এই: কম্যুনিষ্টকর্ম্মী অরুণাংশুর সঙ্গে মতবিরোধ চলেছে কংগ্রেস-স্যোশালিষ্ট পার্টির অক্লান্ত কর্ম্মী সুবোধের। বুদ্ধিমতী নার্স সুভদ্রা মনের দিক থেকে ভালোবাসে অরুণাংশুকে, কিন্তু মতের দিক দিয়ে সে সমর্থন করে সুবোধকে। সুতরাং স্পষ্টই

বোঝা যায় বিশেষ করে সুভদ্রার মানসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ।

প্রধূমিত বহ্নি 'অগ্নিসংস্কার' নামক বৃহৎ উপন্যাসের প্রথম পর্ব্ব মাত্র, সুতরাং এ-খণ্ডে এই রাজনৈতিক বিরোধ বা সুভদ্রার মানসিক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি যে পাওয়া যাবে না তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি আপত্তি তুললে বোধ হয় কিছু অন্যায় হবে না। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, 'প্রত্যেক পর্ব্বেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে।' কিন্তু আগাগোড়া বইটি পড়ে মনে হলো, লেখক যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে পাঠকদের কোনোরকম নোটিশ না দিয়েই কলম থামিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হয়, এরকম একটা ভূমিকা দিয়ে পাঠকসাধারণকে বিভ্রান্ত করা লেখকের মোটেই উচিত হয় নি। যদি জানা না থাকতো যে এ-কাহিনী দ্বিতীয় পর্ব্বের অপেক্ষা রাখে তা হলে একে নিঃসন্দেহে অপাঠ্য বলে অভিহিত করতাম।

সে যাই হোক, দ্বিতীয় পর্ব্বের আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে আমারও বল্‌তে আপত্তি নেই, মনীন্দ্রবাবু সত্যি সত্যি একটি ভালো কাহিনীকে অবলম্বন করেই উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। সাধারণ একটি শ্রমিক ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে দুই দলের মধ্যে তাই যে কেমন করে মাথা চাড়া দিয়ে সমস্ত কিছুকে তছ্‌নছ্‌ করে দিলো, তা এখানে শুধুমাত্র একটি কাহিনী হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার নিদর্শন অনেক জায়গায়ই পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং কাহিনী হিসেবে প্রধূমিত বহ্নি অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গল্পটির মধ্যে আরো একটি দিক বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। সে হচ্ছে নরনারীর প্রেম। কুমারী সুভদ্রা হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুপ্রাণনায় ভালোবেসেছে অরুণাংশুকে, শুধু তাই নয়, সে তার প্রেমিকের অজাত সন্তানকে জঠরে ধারণও করেছে। আবার সুভদ্রাকে নীরবে ভালোবেসে এসেছে একান্ত কর্ম্মপ্রাণ সুবোধ, কিন্তু সে একটিমাত্র দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত ছাড়া আর কথনো সুভদ্রার কাছে নিজেকে ধরা দেয় নাই। রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে একদিকে যেমন কাহিনীর জটিলতা বেড়ে চলেছে, প্রেমের এই দুই ধারা কাহিনীকে আর এক দিক দিয়ে তেমনি জটিলতর করে তুলেছে। তার ফলে, ঘটনাপরম্পরায় প্রধূমিত বহ্নি পাঠকের মনে আগাগোড়া একটা কৌতূহল সমানভাবে জাগিয়ে রাখতে পারে।

চরিত্রচিত্রনে সবচাইতে সার্থকসৃষ্টি বোধ হয় সুভদ্রা। প্রেমের দিক থেকে সে যেমন নিস্বার্থ ও খাঁটি, কর্ম্মের দিক দিয়েও তেমনি ক্লান্তিহীন। মনে ও দেহে এমন সুস্থ মেয়ে কি বাংলাদেশে মেলে না? কেন যে তাকে গড়ে উঠ্‌তে হয়েছে বাংলার বাইরে সুদূর পশ্চিমে তার কারণ বুঝলাম না। তারপর নাম করতে হয় সুবোধের। সুবোধ ভালোবেসেছে সুভদ্রাকে, কিন্তু সে ভালোবাসার স্রোতে নিজেকে সে ভাসিয়ে দেয়নি। যে মুহূর্ত্তে সে সুভদ্রার কাছে তার দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করে ফেলেছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে তার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেকে টেনে নিয়ে গেছে সুভদ্রার কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেখানেও সে থাকতে পারেনি নিজের কর্ত্তব্যকে অবহেলা করে। তাই আবার তাকে ফিরে আসতে হলো তার পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষেত্রেই। নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে আবার সে ইউনিয়নের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে

শাস্তি পেয়েছে। আগাগোড়া ঘটনার ভেতর দিয়ে সুবোধের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তাতে সে অসাধারণ কিছু নয়, সমস্ত দোষ ত্রুটি নিয়েই সে পরিপূর্ণ। এ দুইটি চরিত্র বাদ দিলে বলা যায়, এ-উপন্যাসের আর একটি চরিত্রও সার্থক নয়। অরুণাংশু তো হাস্যকর। সে বড়লোকের ছেলে হয়েও সর্ব্বস্বত্যাগী, সে মজদুরের বন্ধু, সে রূপবান, সে পণ্ডিত। পেছনে এত বড় ভূমিকা থাকা সত্বেও তার কার্য্যকলাপ থেকে আমরা শুধু বুঝতে পারি সে একটি অকাট মূর্খ প্রবঞ্চক, হয়তো এর চাইতেও বেশী কিছু। প্রেম সম্বন্ধে তার মুখ থেকে বড় বড় কথা শুনেছি, কিন্তু কোন যুক্তিতে যে সে সুভদ্রাকে ত্যাগ করে গেলো তা কিছুতেই বোঝা গেলো না। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে তার মতামত পাতাজোড়া, কিন্তু তার কর্ম্মধারা থেকে দেখা যায়, সে মনের দিক থেকে একান্তই অসহায়। এ চরিত্রটিকে নিয়ে যে লেখক কি করতে চেয়েছিলেন, তিনিই জানেন, আমি অন্ততঃ বলবো, অরুণাংশুকে তৈরী করতে তিনি পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আর বাকী থাকে অরুণাংশুর মা, বাবা এবং অনামিকা ও প্রতুলবাবু। কিন্তু তাদের কথা উল্লেখ না করাই ভালো। অনামিকাকে যে সমাজের মেয়ে করে লেখক গড়েছেন, তার অবস্থা দেখে মনে হয় সে সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই এবং কল্পনাও দুর্ব্বল। এদের তুলনায় প্রায়-অবান্তর চরিত্র শ্যামাচরণদাও অনেক সার্থক।

আঙ্গিক প্রাচীনতাধর্ম্মী। সেটা দোষের নয়। কিন্তু এখানে একটা জিনিস বড় খারাপ লাগলো এই যে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনা নিয়ে লেখক অনেক জায়গায়ই বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। এলাহাবাদে রমেনবাবুর বাড়ীর ঘটনাটি আগাগোড়াই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক—যেটুকু প্রয়োজন তা খুব অল্প কথাতেই শেষ করা চলতো। সুবোধের দেশের গাঁয়ের বিবরণটিতো একেবারেই অবান্তর।

ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে প্রযুগিত বহ্নি বিশেষ কিছু চমকপ্রদ নয়। অনেক জায়গায়ই ভাষার জড়তা লক্ষ্যণীয়। আর বর্ণনাবাহুল্যে সমগ্র বইটি ভয়ানকরকম ভারাক্রান্ত। মনীন্দ্রবাবুকে শব্দচয়নে আরো বেশী সাবধান ও মনোযোগী হতে অনুরোধ করি। এমন অনেক শব্দ এবং বাক্য আছে যা কেবল প্রবন্ধের জন্যেই ব্যবহার করা চলে, এ রকমের রসসাহিত্যের জন্যে যে সব কথা একেবারেই ব্যবহারযোগ্য নয়। আর একটা ব্যাপার দেখলাম, এ কাহিনীর প্রতেকটি লোকই যেন কথায় কথায় 'কুণ্ঠিত' হয়ে পড়েন, আর 'শব্দ' না করে কেউই যেন হাসতে পারেন না। এটা কিন্তু লেখকের দৈন্যের পরিচয় দেয়।

আশা করি 'অগ্নিসংস্কারের' দ্বিতীয় পর্ব্ব—ভস্মাবশেষ—শীঘ্রই আমরা হাতে পাবো। তাতে, নিশ্চয়ই আশা করতে পারি, লেখক সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবেন।

•

উল্টোরথ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চতুর্থ গ্রন্থ, মধ্যে একটিমাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, বাকী তিনটিই গল্পগ্রন্থ। এই থেকেই একরকম ধরে নেওয়া যায় তাঁর প্রকৃত রচনাশক্তি বিশেষভাবে ছোটগল্প সৃষ্টিতেই আবদ্ধ। কিন্তু যদি মনে করা যায় নরেন্দ্রনাথ উপন্যাস-রচনায় ছোটগল্পের কৃতিত্ব বজায় রাখতে পারেন না বলেই সে-পথে সাহস করে দ্বিতীয়বার আর এগোননি, তা হলে সে-ধারণা

অত্যন্ত ভুল হবে, কারণ, মাত্র একটি উপন্যাস 'দীপপুঞ্জ' প্রথম হয়েও তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তবু যে তিনি ইতিমধ্যে আর দ্বিতীয়বার উপন্যাসরচনায় হাত দিলেন না, আমার মনে হয় তার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে এই যে, একদিকে তিনি যতখানি হিসেবী ও সাবধানী অন্যদিকে ঠিক ততখানি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক। এর ফলে, যেমন ক্রমাগত প্রচুর লিখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি মানবজীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রতি দৃষ্টি রেখে উপন্যাস-রচনায় হাত দিতেও তিনি পারেন না। প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর যতগুলো গল্প প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশ গল্প পড়ে আমার এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথ-মিত্র তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনগুলোর মধ্যে যে ছোট ছোট ব্যথাবেদনা আর আশা আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পান, সেখান থেকেই, সেই সহজ-সরল জীবনধারা থেকেই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু আহরণ করে নেন। সাধারণ পাঠকের কাছে কতখানি বিশ্বাস্য বলে মনে হবে জানি না, তবে আশা করি প্রত্যেক লেখকই আমার এ-কথা স্বীকার করবেন যে, এই ছোট ছোট পটভূমিকায় ছোট ছোট চিত্র বা গল্প রচনা করা যতটা সম্ভব, উপন্যাস-রচনা করা নিশ্চয়ই ততখানি সম্ভব নয়। অবশ্য এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উঠ্‌তে পারে যে, মানবজীবনের সাধারণ ঘটনাপুঞ্জকে আশ্রয় করেই যদি এক একটি গল্প রচিত হতে পারে, তা' হলে সেই জীবনকে অবলম্বন করে পরিপূর্ণ একটি উপন্যাস কেন গড়ে উঠ্‌তে পারবে না? এ প্রশ্নের সাধারণ ও সহজ উত্তর এই হ'তে পারে যে, যে বৈশিষ্ট্যের জন্য 'বিন্দুর ছেলে' 'দর্পচূর্ণ' বা 'নটু মোক্তারের সওয়াল' ছোটগল্প হয়েও সত্যি সত্যি ছোট গল্প নয়, সেই কারণেই, শুধু দৃষ্টি ও পটভূমিকার প্রসারতার জন্য এবং লেখকের বিশেষ অনুভূতিসঞ্জাত রচনারীতির ফলেই ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের জীবনধারার সাহিত্যরূপ ছোটগল্প বা উপন্যাসের আকার নেয়।

ঠিক এই কারণেই উপন্যাসকার না হয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পক্ষে সার্থক ছোটগল্প-লেখক হওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি মানুষকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখতে চাননি। সাধারণ মধ্যবিত্ত-জীবনের অতি-সামান্য দৈনন্দিন খুটিনাটিকে কেন্দ্র-করে যে ক্ষুদ্র আবর্ত্তের মধ্যে সাধারণ বাঙালী পরিবারের মানুষগুলি দিনের পর দিন একই গতিতে সমতলভূমির নদীর মতই সরল স্রোতধারায় বয়ে চলেছে, সেখানে বৃহতের কোন আভাস নাই, এমন কি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে হয়তো কোনো বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে না। তাই, মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনকে বিষয়বস্তু করে ছোটগল্প রচনা করা উপন্যাসরচনার চেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের এই বৈচিত্র্যহীন ঘটনাপরম্পরাকে আশ্রয় করেই মানুষগুলি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না, বিচিত্র ভাবনাকল্পনাকে নিয়েই তারা পরিপূর্ণ বিকাশ পায়। এ অবস্থায় গল্পের প্রথম এবং প্রধান বিষয় গল্পের ঘটনাটুকুই নয়, বরং বলা উচিত এ-ধরণের গল্পের পরিণতির জন্য দায়ী নরনারীর মনগুলি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগুলোর সম্বন্ধে এ কথা বোধ হয় আক্ষরিকভাবে সত্য। তাঁর রচনায় মানুষ বা ঘটনা উপলক্ষ মাত্র, আসল কথাই হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা। এ দিক থেকে বলা যেতে পারে—গোচরে বা অগোচরে নরেনবাবু সাধারণভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই চলেছেন। অবশ্য

তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মানিকবাবুকে অনুকরণ করে যাচ্ছেন। আমি যা বল্‌তে চাচ্ছি তা হলো, রচনাপ্রণালী ও বিষয়বস্তুর সংস্থাপনে উভয় লেখকের সামঞ্জস্য।

নরেনবাবুর ছোটগল্প সম্বন্ধে এতক্ষণ বিশদভাবে যে আলোচনা করা হলো, উল্‌টোরথের প্রায় সবগুলো গল্প থেকেই তার সত্যতা প্রমাণ করা যাবে। বিশেষ করে উল্‌টোরথ, সংক্রামক, যথাস্থান, সৌরভ, দুর্জ্ঞেয় এবং পটক্ষেপ সম্বন্ধে এ উক্তি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, লেখক এমন সাবলীলতায় প্রত্যেকটি মানুষের মনকে তাদের চিন্তাধারার পথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যে এমনটা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, বস্তুতঃ ঘটনাগুলো এখানে কিছু নয়; যে-কোনো একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে লেখক যেন মানুষগুলির মনের রহস্যই উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। পরস্ত্রী হয়ে সুবর্ণ ফিরে এলো, কিন্তু প্রিয়লালের প্রতি তার দ্ব্যর্থবোধক রহস্যালাপে তার হৃদয়ের পরিচয় প্রিয়লালের কাছে রহস্যাবৃত হয়ে থাকলেও পাঠকের কাছে তা সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে। সরযূ ও শশাংকের চরিত্র একেবারে পরস্পর-বিরোধী হলেও একে অন্যের সঙ্গে বহুদিন বসবাসের পর যখন প্রকৃত মুহূর্ত এলো উভয়কে চিনবার তখন দেখা গেলো, পরস্পরের চরিত্র একে অন্যের মধ্যে তাদেরই অলক্ষিতে সংক্রামিত হয়ে গেছে। এই যে মানসিক পরিবর্ত্তন তার খোঁজ তো শুধুমাত্র ঘটনাবিশ্লেষণেই পাওয়া সম্ভব নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চরম সার্থকতা পেয়েছে যথাস্থান-গল্পটিতে। উমা যাকে মনেপ্রাণে শুধু ঘৃণাই করে এসেছে দিনের পর দিন, কি এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তারই মুখের একটি মাত্র কথায় সে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ক্ষণমুহূর্ত্তের এই বিহ্বলতাটুকুই গল্পটির সব।

এই বইতে, এমন কি নরেনবাবুর সমগ্র রচনার মধ্যেই হয়তো চাঁদমিঞা এবং সেতার তাঁর রচনারীতির অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এবং আশ্চর্য্য এই, এই গল্প দুইটিই এ-বইএর মধ্যে সব চাইতে ভালো। চাঁদমিঞার বিষয়বস্তু যেমন অন্যান্য গল্পগুলো থেকে একেবারে ভিন্ন, তেমনি তার পরিবেশ ও রচনারীতিও সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সুলভ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি লেখকের আত্যন্তিক ঝোঁক এক এক জায়গায় লক্ষ্য করা গেছে, তথাপি, নরেনবাবুকে ধন্যবাদ, সে-ঝোঁকের মুখে কলমকে নির্ব্বিঘ্নে ছেড়ে দিয়ে ঘটনার প্রতি তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে থাকেন নি, যা হওয়া তাঁর মতো লেখকের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিলো না। এখানে গল্পের নায়ক উপনায়ক বা নায়িকা কেউই যেমন সাধারণ পরিবেশের মানুষ নয়, তাদের মনগুলি এবং কার্য্যকলাপও তেমনি অনেকটা অসাধারণ। সব মিলে চাঁদমিঞা গল্পটিতে এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরী হয়ে উঠেছে, সার্থকভাবে যাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কোনো অপরিণত হাতের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। এ গল্পটি সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্যনীয় বস্তু হচ্ছে এর ভাষা ও ভঙ্গি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিখুঁৎ সামঞ্জস্য রেখে নরেনবাবু এখানে তাঁর ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা এই বই-এরই যে কোনো গল্পের পক্ষে হাস্যকর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে পারতো। সেতার-গল্পে লেখক যেন তাঁর সাধারণ পদ্ধতিরই বিপক্ষাচরণ করে দেখিয়েছেন, ঘটনা ও অবস্থান্তরে পড়ে মানুষের মন ও প্রকৃতি কেমন করে বদ্‌লে যায়। ঘটনার আবর্ত্তে পড়েই
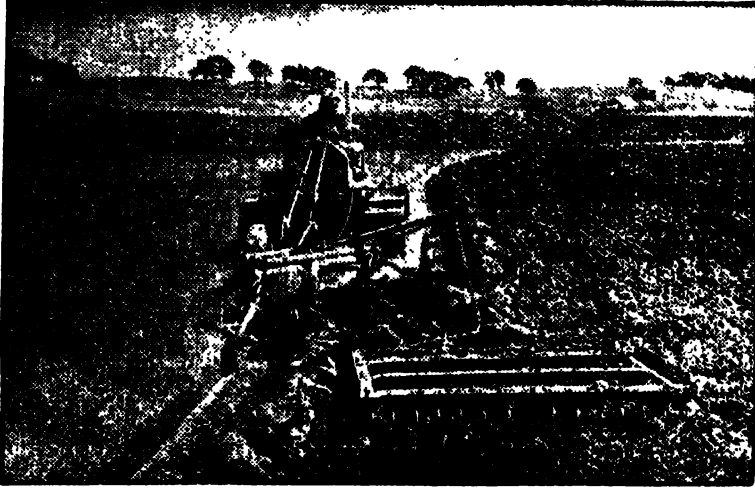
নীলিমার মানসিক পরিবর্ত্তন এমনভাবে ঘটতে সুরু করেছিলো, নিজের ওপর তার নিজের যেন কোনো হাতই ছিলো না।

ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থ যাঁর তৃতীয় গল্পসংগ্রহ, তাঁর ভাষা ও রচনারীতিতে বিশেষ কোনো ত্রুটি থাকার কথা নয়। উল্‌টোরথে সেদিক দিয়ে সত্যি সত্যি কোনো ত্রুটি নেইও। তবে, একটা বড় খারাপ এই লাগ্‌লো যে, নরেনবাবু একাধিক গল্পে বিশেষ এক অবস্থাসৃষ্টিতে প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার আগে যদি তিনি মনোযোগ দিয়ে একবার গল্পগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতেন, তা হলে এই ত্রুটিটুকু থেকে বইটি সহজেই রেহাই পেতো। আর স্ফুলিঙ্গ গল্পটি আমার ভালো লাগেনি। পরিণতিতে গল্পত্ব একটুও বজায় থাকেনি, মনোবিশ্লেষণেও কিছু বিশেষত্ব নেই। এ-সংকলন থেকে গল্পটিকে বাদ দেওয়াই বোধ হয় উচিত ছিলো।

অনিল চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

পূর্ব্বাশা ঃ ভাদ্র—১৩৫৪

নিয়মাবলী

১। পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখ প্রকাশিত হয়।

২। চল্‌তি মাস হইতে গ্রাহক হইতে হইবে, পুরাতন সংখ্যা দেওয়া যাইবে না।

৩। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষান্মাসিক ৩৲।

৪। ষ্ট্যাম্প সঙ্গে না থাকিলে প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হইবে না।

৫। প্রতি মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইতে হইবে।

৬। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন।

৭। দশ কপির কম মফঃস্বলে এজেন্সী দেওয়া হয় না, এবং অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হইবে না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা, রেল পার্শ্বেলে পাঠাইবার খরচ আমরা বহন করিব। কমিশন বাদ কাগজের মূল্য অগ্রিম দেয়।

টাকাকড়ি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা—

পূর্ব্বাশা লিমিটেড।

পি ১৩, গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা।

ফোন: ক্যাল ১২৪৯

দশম বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা
ভাদ্র • ১৩৫৪

বিদ্রোহী বাংলা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কতো দূর হতে যেন নদীর ঘ্রাণ আসে !
ভুলে থাকা যায়না—
দেবতার মতো নদীকে মনে পড়ে ।
পাহাড়ের এক অশান্ত দেবতা এই নদী—
তীব্র তুষার ভেঙে তৈরী করে নীল জল,
পাথরের রেণুতে মৃদু মাটি রচনা করে—
তারপর মাটি আর জলে সমতল ।
হয়তো কোনো মানে নেই এই রচনার,
সমুদ্রের আণবিক উল্লাসে নিজেকেই ভেঙে দিতে হবে যদি
শান্তির নীড় কেন আর ?
কোনো মানে নেই রচনার—
তাই দেবতার মতো মনে হয় নদীকে ।
ভুলে যেতে চাই—

তবু মনে হয় কোথায় যেন আছে সেই প্রাচীন দেবতারা—
গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র।

গঙ্গা!
কালো অরণ্যের চোখে বিদ্যুৎপ্রভা—
কোন্ কালো মানুষের মনে বিদ্যুতের মতো এসেছিল তার নাম?
তা'রা বুঝি পাথরের মানুষ -পাথরের দেবতা যেমন নদী।
পাথরের পথ কেটে ছড়িয়ে গেছে তা'রা দূর পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিগন্তে—
অগ্নিগিরির লাভার আভায় যুগ থেকে যুগান্তরে;
সৌর মত্ততার অবসান তখন পৃথিবীতে,
ক্লান্ত পৃথিবীর নিঃসঙ্গ প্রাণ তা'রা—
মানুষের পৃথিবীর প্রথম যাত্রা।
প্রথম যাত্রা তবু অফুরন্ত তার চলা—তার দোলা অফুরন্ত।

চোখ মেলে তাকাল পলিনেসিয়ার বনভূমি—
সুদূর প্রাচ্যের জনপদ,
পশ্চিমের উপকূল জ্বলে উঠল প্রাণের প্রতিভায়।
তৃণের তৃষ্ণা এবার যুগল জনস্রোতে—
পথ-প্রমত্ত প্রাণের তরঙ্গ পাথরের পুরীতে বন্দী হ'ল।
সমতলের মানে ছিল,
মানে ছিল গঙ্গার,
এবার মানুষের মনে তাদের মানে ছিল।

তাদের শ্রুতিতে ছিল কি নদীর প্রথম নাদের ভাষা—
স্মৃতিতে তার সর্পিল গতি?
গুহার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো কুণ্ডলীমুক্ত সাপ
বেরিয়ে এলো সর্পিল জলধারা—
দেহময় কি বিপুল চঞ্চলতা।
দেহের অন্ধকার হতে সন্তানের মতো
পৃথিবীর দেহ থেকে শস্যের মতো প্রাণের কি অপূর্ব্ব উৎসার।

শক্তির বিগ্রহ বন্দনায় তাই মুখর হল সমতল—
প্রাণের অর্চ্চনায় ধরিত্রীর সঙ্গিনী হল গঙ্গাভূমি।
শ্যামাঙ্গিনীর সর্পিল ছন্দে মোহিত কতো সন্ধ্যার আকাশ—
মথিত কতো পুরুষের বিদ্যুন্ময় শক্তি ;
প্রাণোৎসিনী ধরিত্রীকে অনুভব করেছে নারী তার দেহের নগ্নতায়
গঙ্গাকে পেয়েছে শিরা-উপশিরায়
হিমাচল-নীলাচলকে স্তনাগ্রচূড়ায়।
প্রথম প্রভাতের আভায় গঙ্গাম্বুপাতপ্রতিম কণ্ঠ :
প্রকৃতিপুরুষের উল্লসিত কলনাদ ঃ
ওম্-হূঙ্-শৃঙ্-ক্লীঙ্।

শক্তির নিঃস্পন্দতায় নিবিড়—সমতল,
অরণ্যের শ্যামল রচনা—সমতল,
তবু তুমি পার্ব্বতী—
পর্ব্বতের লিপিলেখা সমাপন হয়নি তবু।
তাই তোমার তনুর আমন্ত্রণ পামীরের পিঙ্গল আকাশে।
তমসার অবসানে কি আশ্চর্য্য প্রভাত তোমার!
কুমার শিব দাঁড়াল এসে কুমারী শ্যামার দ্বারে—
তাম্র জটাজাল তার লুপ্ত হল তোমার কালো চুলের বন্যায়
গৌর মরু-তনু স্নিগ্ধ নীলিমায় গলে গেল।
চঞ্চল চৈত্র বুঝি তখন অনবসান—
নীলঅরণ্যের হরিৎ-কামনা অনবসান!
পর্ব্বতের শুভ্রতা পেয়েছ, শ্যামলী,
তবু তুমি নিজেকে হারাওনি,
পুরুষ তোমার আভরণ, তোমার বিদ্যুৎ—মেঘময়ী!
তোমার ছায়া কোথায় হারাবে—
কে ছিনিয়ে নেবে তোমার শক্তি ?—
পামীরের পুরুষ তা পারেনি
পারেনি আর্য্যের ইন্দ্রমিত্রবরুণ।
সদ্যজাত সাগ্নিক ভারত কি দেবে তোমায়—

অগ্নির জন্ম তোমারই জঠরে, মহাদেবী,
পরমাকলা তুমি,
তুমি মাতা, তুমি মান, তুমি মেয়।

তুমি চাওনি তাদের,
আর্য্যের শ্বেতকামনা তবু প্রাচ্যের শ্যামদ্যুতিতে আত্মাহুতি দিয়েছে—
অতিথি হয়েছে ঋষিকুমার বিশ্বামিত্র-দীর্ঘতমা।
তাদের রক্তের স্মৃতি আছে কি গঙ্গার উত্তর তট-রেখায়?
আছে কি দক্ষিণ তটভূমিতে মোঙ্গলের পীত প্রপাতের চিহ্ন?
তাতল সৈকত মুছে দিয়েছে তাদের পদরেখা।
তুমি শ্যামল
অঙ্গবঙ্গসুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রের শ্যামলতায় শ্যামল—
পঞ্চজনের শ্যামল জননী তুমি।
তোমার বিচিত্রতায় তুমি একা—
তোমার একতায় বিচিত্রতা বিলীন।

বারবার তোমায় ছুঁয়ে গেছে মগধের মহাপিপাসা—
সমুদ্রগুপ্তের সমুদ্রসাধ প্রচুর-পয়সী সমতটে গিয়ে মিটেছে—
বারবার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ তুমি—
আরো নিবিড়, আরো নিবদ্ধ হয়েছ—
গাঢ় গূঢ় হয়েছে তোমার শক্তি
গৌর-বঙ্গের আলিঙ্গনে।
অবশেষে একদিন গৌড়-সেনার খড়্গ
ফিরিয়ে দিয়েছে আর্য্যাবর্ত্তের তরবারির আঘাত—
কর্ণসুবর্ণের কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে মহোদয়শ্রী।
শক্তির সফেন সুরায় উচ্ছল সে দিনগুলি তোমার
সমুদ্রের মতো,
সমুদ্রস্তনিত তুমি,
প্রাচীন পার্ব্বত্য স্নায়ুতে সমুদ্রের মত্ত ক্ষিপ্ততা।
শান্তির-নীড়ভাঙা পাখী উড়ে গেছে সমুদ্রদুর্গের প্রাচীর-চূড়ায়

তাম্রলিপ্তির নৌ মাস্তুলে।
কামরূপ-কান্যকুব্জ-কাশ্মীরের অসিতে কতো রক্ত দান করেছে তা'রা
কতো সহজ সে প্রাণোৎসর্গ—
বুঝি তা বিধাতারও বিস্ময়।
শৌর্য্যের সূর্য্যালোক বিচ্ছুরিত দিগ্বিদিকে—
কুটিরাঙ্গনে তবু তাদের চন্দ্রপ্রভা ঃ
গৌড়াঙ্গনার দুর্ব্বাকাণ্ডরুচির তনু
স্ফুটবাহুমূল
চন্দনার্দ্রকুচার্পিতসূত্রহার
অগুরুরূপউপভোগ
রণক্লান্ত কতো রজনীকে মোহময় করে তুলেছে—
গৌড়ের জননীজায়াদুহিতা তা'রা
স্বপ্নশক্তিসাধনার উৎস।

তারপর আরেক প্রভাত।
আবার কোন্ নব গঙ্গোত্রীর ধ্বনি—
মর্ম্মরিত মন কোন্ পীত উত্তরীয়ের প্রতীক্ষায়?
কোন্ হিমালয় আবার—
রৌদ্রময় তুষারচূড়ার কোন্ স্বপ্ন?
এ স্বপ্নের মহাশিল্পী কপিলাবস্তু—
গৌড়বঙ্গের ভূমিতলে এসেছে তার সৌরভ।
পেয়েছে মানুষ ঘর হারাবার গান,
মানুষকে কাছে পাবার প্রাণ—
জীবনকে নির্ম্মাণ করেছে তারা কর্ম্মের কারুকলায়।
সমুদ্রসন্তানের পীত সৌরভে
পরমসৌগত গৌড়পতির জন্ম হ'ল—
নির্ম্মিত হল বিক্রমশীলা—
মুগ্ধ যবভূমি গৌড়ের আলিঙ্গনে ধরা দিল।
শিল্পের কি বিপুল প্লাবন বিহারমণ্ডপের স্তম্ভগাত্রে—
ধর্ম্মরাজিকে, ধর্ম্মচক্রে, চৈত্যছত্রে।—

সুবর্ণব্রীহিসক্তা বাগীশ্বরীভট্টারিকামূর্ত্তি,
অষ্টমহাস্থানশৈলবিনির্ম্মিত গন্ধকুঠী—
অপরূপ শিলাস্বপ্ন!
কম্বোজ-আরাকান-গুর্জ্জর-রাষ্ট্রকূট-চোলচালুক্যের অসিঝঞ্ঝনার অন্তরালে
প্রাণের কি সৌম্য সাধনা।
এ-ধ্যানের প্রহরী সেদিন গৌড়-সেনানী
গৌড়ের জয়স্কন্ধাবার সেদিন
পাটলীপুত্র-মুদ্গগিরি-কান্যকুব্জের দুর্জ্জয় প্রান্তে।

অবশেষে একদিন আর্য্য এলো।
স্খলিত আর্য্য খলতার সুরঙ্গপথে প্রভু হল তোমার।
তবু তোমাকে পেতে নিজেকে ভুল্‌তে হয়েছে তার
শিব হয়ে খুলতে হয়েছে শক্তির মন্দির।
কিন্তু মন্দিরে বুঝি ছিলনা আর শ্যামা মূর্ত্তি—
ভৃঙ্গারের রক্তে মিশেছে তখন পীত সুধা
গেরুয়া হয়ে উঠেছে গৌড়ের মন:
মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ
ভীত, ত্রস্ত বৃষভানুদুহিতা আমি—
তুমি এসে আমার হাত ধরো, শ্যাম!
মহিষী তন্দ্রার হাত ধরেছে পরমবৈষ্ণব লক্ষ্মণসেন।
ইখ্‌তইয়ারের তলোয়ারে নালন্দায় আর্ত্তক্রন্দন—
শৈব রক্ত কোথায় আর?
তুর্কীর অশ্বখুরে শঙ্কিত লক্ষ্মণাবতী—
অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর কোথায়?
মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্—
বজ্রনির্ঘোষে স্তব্ধ হল পবনদূতের ধ্বনি—
গীতগোবিন্দের গুঞ্জন!

লখ্‌নৌটির মীনার উঠল,
ধূলিতলে গৌড়ের করোটি—

গম্বুজের শিরে চন্দ্রের শাণিত শৃঙ্গ !
ভাঙ্‌ল নীল আকাশ—
শ্যামল স্বপ্ন ভাঙ্‌ল,
তাই বুঝি ঘুম ভাঙল।
শোনো নদীর গান—ভুলে-যাওয়া গান শোনো আবার
ক্ষিপ্ততার গান শোনো গঙ্গার মোহনায়।
গৌড় নেই—আছে গঙ্গা—
বঙ্গ আর ব্রহ্মপুত্র আছে তবু।
দোলা লাগ্‌ল
স্মৃতির দোলা
তুর্কী শক্তির বিদ্যুতে দোলা জাগ্‌ল আবার।
সে-দোলায় দুল্‌ল বিষ্ণুর গদাচক্র—
দনুজমর্দ্দিনীর প্রহরণ।
সে-দোলায় ভুল্‌ল তুগ্রিল ঘূরের মাটির ঘ্রাণ—
দিশ্ হারাল সে গঙ্গায়
হারাল দিল্লীকে।
পাণ্ডুয়ার প্রান্তরে ফিরিয়ে দিল ইলিয়াস্
তুঘ্‌লকী ফৌজ আর ফরমান।
দিল্লীর বল্গায় বাঁধা পড়েনি 'বলঘাকপুর'—বিদ্রোহী বাংলা !

তোমারি মায়ায় যাদের ললাটে বিদ্রোহের শিখা
একটু ছায়া কি দেবেনা তাদের, বিদ্রোহিনী—
রোমাঞ্চিত অক্ষিপক্ষ্মের একটু স্নেহ ?
পাহাড়ের প্রাংশু সন্তান—
তোমার আদিম সন্তানের মতোই যে তা'রা—
প্রাণে শুন্‌তে চায় তোমার প্রাণের ধ্বনি,
তোমার চোখের স্বপ্ন বুন্‌তে চায় চোখে !
পেয়েছে তা'রা,
তোমার হৃদয় দিয়েছ তাদের
নিয়েছ তাদের হৃদয়ের পরিচয়—

মনের সমতল রচিত হয়েছে মাটির এ-সমতলে।
তার সুর মানুষের প্রথম কবিতার মতো অমর।
সে-অমৃতের সন্ধান পেয়েছে বাঁশুলীর মন্দির।
তখনো দিল্লীর ইবাদৎখানায় দীন্‌ইলাহীর জন্ম হয়নি
বাংলার কোলে যেদিন নদীয়ার জন্ম হ'ল।

কাবুলের খরপ্রবাহে দ্বিস্রোতা প্রমত্তা গঙ্গা।
দ্বাদশ সূর্য্য বাংলার ললাট-ললাম-
অঙ্গে তার মশ্লিনের রশ্মিজাল।
বারবার মুঘলের কামানাগ্নি নিভে যায়—
কামনাগ্নি জ্বলে ওঠে বারবার।
সমস্ত হিন্দুস্থানে সন্ত্রস্ত ধ্বনি :
জল্ল জলালুহু—আল্লাহু আকবর—
সুন্দরবনের সমুদ্রতটে সে-ধ্বনি পৌঁছয়নি—
শ্যামাঞ্চলে কোথায় লুকানো আছে অরণি কেউ জানেনা—
জানেনি মুঘলসম্রাট—
কোন্ স্ফুলিঙ্গ ছুঁয়ে গেছে সুজার রক্ত
সাজাহান তা জান্‌তনা!

মগফিরিঙ্গির শ্যেনলালসা সে-আগুন দেখেনি—
সে-আগুনে ঝল্‌সে যায়নি চার্ণকের চাতুরী
যে-আগুনে আলীবর্দ্দী স্তব্ধ করেছে বর্গীর কামান!
ক্লাইভের মসী-লেপে ম্লান হ'ল পলাশীর আকাশ
মসীলিপ্ত মুর্শিদাবাদ গঙ্গায় ডুবল—
শ্বেত হাসির উল্লাসে নিভে গেল শ্যামদ্যুতি!—
কিন্তু নিভল কি আগুন?

আহিতাগ্নি মাটির বেদনা থেকে যায়—
বিস্মৃত হয়েও মাটির আগুন রেখে যায় অগ্নিবীজ—
আগুনের স্পর্শমণি।

তাই অগ্নিভ্রূণের ব্যাকুলতা তিতু মীরের কেল্লায়,
সিপাহীর ক্ষিপ্ত মশালে তাই তার অশান্ত আবির্ভাব।
সে-মশাল জ্বল্‌ল বাংলার আকাশে—
পূরবইয়া আগুনের ফিন্‌কি স্পর্শ করল দিল্লীর শেষ মসনদ—
পেশোয়ার শেষ রক্ত!
নির্ম্মিত হ'ল ভারতবর্ষের বিরাট অগ্নিশালা!
তবু যেন অন্ধকার কাটেনি—টুটেনি মোহ—
কোন্ আগুনে তৈরী হবে পথ—
কোন্ অগ্নিদেবতায় ঢালতে হবে হবি—
জানেনি ভারতবর্ষ।

জানে তা বাংলা—জেনেছে অগ্নিগর্ভ শ্যামভূমি।
যুগে-যুগে কুটিরে-কুটিরে কি কঠোর অগ্নিতপস্যা—
কতো মায়ের অঞ্চলচ্ছায়ে সন্ধ্যাদীপের আভায়,
কতো বধূর বাসরদীপের দেহে,
রচিত যে অগ্নিশিখা,জানে।
এ-আগুন চায়নি নীল আকাশ—
রমনীয় রাত্রির অবকাশ চায়নি—
পায়নি ফুল আর ফাল্গুনের ঘ্রাণ—
জীবনের ভস্মতিলকে জীবনকে অগ্নিস্মৃতি দান করেছে শুধু।
সে-দান জানে বাংলাদেশ।

আগ্নেয় রাত্রির আজ অবসান—
প্রভাতের প্রপাতের ধ্বনি আবারও আজ—
নদীর কলনাদ!
মনে পড়ে নদীকে আবার
অশান্ত দেবতার মতো মনে পড়ে।
কোন্ মহাসমুদ্রসঙ্গম তার কামনা—
কতো দূর তটরেখায় প্রভাত-সমুদ্রের শুভ্র বিস্তার—
শান্ত হবে এ-দেবতা ভবিষ্যতের কোন্ শ্যামল সমতলে?

মহাত্মা গান্ধী

অমিয় চক্রবর্তী

লোকরক্ষা

সমগ্র মানব বসুন্ধরায় একটি অন্ধ যুগ আবর্তিত হচ্ছে সন্দেহ নেই। এমনতরো বিশ্বচারী হন্তা ইতিহাসের রঙ্গালয়ে দেখা দেয়নি। সহরে পল্লীপ্রান্তে বিষধূম্র ছড়িয়ে গেল জাতির নামে, ধর্মবর্ণ সম্প্রদায়ের মারণমন্ত্রতায় আজ সংসার শতচ্ছিন্ন। সভ্যতার অনুষ্ঠান চলেছে প্রাণের সর্বস্ব হরণ ক'রে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র নরবধের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। বিরোধের দেয়াল উঠেছে অবিভক্ত দেশে, বিজ্ঞানবাহী বর্বরতায় পূর্বপশ্চিমের সমাজ পরিকীর্ণ: প্রাণধারণের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। ইন্দোনেশিয়া, চীন, ইন্দোচীন, প্যালেষ্টাইনে প্রকাশ্য যুদ্ধ চলছে; মধ্যয়ুরোপ, জাপানে প্রতিহিংসার মৃত্যুপর্ব শেষ হয়নি; এমন দেশ নেই যেখানে সামরিক আয়োজন অথবা প্রাত্যহিক ভ্রাতৃহত্যায় মানুষ বিরত। এমন সময়ে ভৌগোলিক যার নাম ভারতবর্ষ সেই প্রাচীন ভূখণ্ডের মৃত্তিকায় একটি মানুষ দেখা দিলেন যিনি অগণ্য কোটি জনসাধারণেরই একজন হয়ে জীবনকে অনন্ত মূল্য দিতে চান। সেই মূল্য মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যায় কারণ তা মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু তা বাঁচবারই অমোঘ দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ কেবলমাত্র বাঁচার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না কেননা মনুষ্যত্বের দামেই তা মহার্ঘ। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সেই প্রাণণের সন্ধান দিলেন যা অস্তিত্বের সার্বজনীন অধিকার মেনে নেয়, প্রত্যেকের সত্তায় যার সত্য। ধনী বা নির্ধন, নির্দোষ অথবা পাপাচারী, যে-স্তরের মানুষই হোক্ শুভাশুভের দ্বন্দ্বে তাকে প্রাণের প্রাথমিক দাবি অর্থাৎ বাঁচা হতে বঞ্চিত করলে কোনো সমস্যার সমাধান নেই। হত্যার মধ্য দিয়ে প্রাণের উত্তর পাওয়া যায় না। ঘাতকের যুক্তিতে অসত্যকে আরো জটিল করে তোলা হয় মাত্র এই হোলো তাঁর দর্শন। অবনমিত স্বচ্ছ সেই দৃষ্টিতে নূতন মানবিক দিগন্ত আমাদের কাছে খুলে গেল। প্রাণের পৃথিবীর দিকে আমরা চেয়ে দেখলাম; কত বিরাট তার সম্ভাব্যতা।

আমরা বুঝেছি সহজীবনের আহ্বানেই মানুষ দুরূহতম সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হয়। বাঁচাও, বাঁচতে দাও। এই ডাক উঠেছে নারীর কণ্ঠে, অগণিত শিশু আহত আর্তজনের

ঘরে ঘরে। প্রাণণের ডাকে সাড়া দিলে জীবনের একটি মহতী ইচ্ছা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়; চতুর্দিক হতে সর্বজয়ী সহযোগিতা পাওয়া যায়। রোগী চায় বাঁচতে; তার রোগকে মারো, রোগীকে মেরোনা। এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে আরোগ্যের উদ্ভাবনা। বিভিন্ন মতাবলম্বীর মতকে আক্রমণ করো, তাদের প্রাণহরণ করলে মত বদলায় না, আরো ছড়িয়ে যায়। রাষ্ট্রিক সমাধানেরও মূলতত্ত্ব এই। জাতীয় সংঘাত, উচ্চনীচের নিপীড়ন, ধণিকের ধনলিপ্সা, জমিদারের জমিদারী সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের বাঁচবার চরম অধিকার মেনে নিলেই সংস্কারের অপরিহার্য পথ উদ্ভাবিত হতে থাকে। বাঁচবার দাম ফিরিয়ে দিলেন মহাত্মা গান্ধী। লোকরক্ষার দাবি নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন নরঘ্নিতার যুগে: এই তাঁর চরম পরিচয়।

মনে করলে ভুল হবে ভারতীয় সভ্যতারই বাণী লোকরক্ষার এই প্রতিজ্ঞা। প্রবণতা আমাদের সেই দিকে, কিন্তু প্রাচীন কালের ভারতবর্ষে তার দীর্ঘ সাক্ষ্য মেলে না। আজকের কথা না বলাই ভালো। বিসঙ্গত সত্যের অবাক্ দৃষ্টান্ত এই যে সংঘাতী য়ুরোপেও অহিংস্রতার চরম মন্ত্রোচ্চারণ হয়েছে যদিও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল। ভ্রাতৃহত্যা যখন দেশে বিদেশে প্রাত্যহিক সুলভ ব্যবসায়ে পরিণত সেই যুগে একটি মানুষ পূর্ব ও পশ্চিমের বহুতর সভ্যতার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত চরম ফল আগামী মানুষের হাতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

উপহাস বিরুদ্ধতার মধ্যেও সমগ্র জগতের শ্রদ্ধার দ্বারা প্রমাণ হয় মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং প্রাণরক্ষণ নীতি স্বীকৃত না হলেও উপেক্ষিত হয়নি। সমাজ সংসারের বহুবিবিধ অঙ্গনে প্রাণমন্ত্রের এমন সর্বাঙ্গীন সত্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই।

ভারতবর্ষের নবার্জিত আংশিক স্বাধীনতা মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত পথেই সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে এইটেই সর্বপ্রধান ব'লে স্বীকার করতে হবে।

লোক-সংগঠন

বাঁচবার সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিক দায়িত্বকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করতে পারলে মানুষের সাহচর্য-শক্তি কল্পনাতীত বহুগুণিত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী সমবায়ের নেতা। তিনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে এক করবার দুটি পথ প্রবর্তন করতে চান। প্রথম হোলো প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবজীবনের আধার এই দেহ মনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। এইখানে জীবিত মাত্রেরই মিল। মিলনের আরেকটি ক্ষেত্র খুঁজতে হয় জীবিকার সাম্যব্যবস্থায়। অর্থাৎ শক্তির তারতম্য মেনে নিয়েও এমন একটি সমানাধিকারের ভিৎ বাঁধতে হয় যেখানে আহার বিহার পরিচ্ছদের সর্বজনগত দাবি সমাজকে মেটাতেই হবে। মহাত্মা গান্ধী

প্রধানত সেই অপরিহার্য জনজৈবিক ভিত্তি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত। অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে উপরের উদ্ধত অসাম্যে আঘাত না ক'রে, যারা নিম্ন নিপীড়িত তাদের সামান্য অধিকার উন্নত করবার প্রয়াসে ফল আছে কিনা। কিন্তু গান্ধীজি জানেন লোক-চিত্তের বৃহত্তম আয়তনে মানবিক দাবি জাগাতে পারলে যে-শক্তির ক্রিয়া চলবে তাতে উপরের সমস্যা আপনিই অবসিত হবে।

সংঘশক্তির সন্ধানে তিনি গিয়েছেন গ্রামে। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ, জলাশয়ের আহার্যের ব্যবস্থা সুরু হোক সেইখানে কেননা ভারতীয় পল্লী হতে যদি সংকল্প জাগে তাহলে জনপদের যান্ত্রিক কেন্দ্রগুলিতে প্রচণ্ড অভিঘাত এসে পৌঁছবে। যেখানে সহরের জড়শাসন্ লৌকিক দাবি অগ্রাহ্য ক'রে অচল থাকে বা বিরুদ্ধশক্তির উদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়ায় সেখানে চাই সত্যাগ্রহের বিধান। পৃথিবীতে এমন কোনো শাসনযন্ত্র নেই যা লৌকিক সংঘশক্তিকে ঠেকাতে পারে কিন্তু সেই শক্তির ঐক্য আসে সব চেয়ে বড়ো মানব সত্য অর্থাৎ বাঁচবার বাঁচাবার সত্যকেই মেনে নিয়ে। হন্তার যুক্তি অবলম্বন করলে প্রত্যুত্তরও আসে সেই পথে, তার ফলে যন্ত্রের কৌশলই প্রধান হয়ে ওঠে। হাতের জোর হাতিয়ারের চেয়ে বেশি, যদি সহস্র বাহু এক হয়; বাহুর পিছনে মনের সৃষ্টিশীল ইচ্ছা জয়শীল না হলে মারণাস্ত্র অনুসন্ধান ক'রে পারস্পরিক মরণচক্রে প্রবেশ করতে হয়। এই নরঘ্নী পন্থা অনুসরণ ক'রে পৃথিবীর মহারাষ্ট্রগুলিও আজ কোন্ পরিণামের দিকে উত্তীর্ণ হচ্ছে তা স্পষ্টই দেখা গেল। সত্যাগ্রহ জাগে বাঁচবার অধ্যবসায়ে, সত্যাগ্রহের যুদ্ধপদ্ধতি সংঘশক্তির অহিংস্র অমোঘ প্রবর্ত্তনায়। জনচিত্তশালী ইচ্ছা যখন সমাজে বিদ্যুৎবাহিনী হয়ে দেখা দেয় তার বজ্রশক্তি রোধ করার সাধ্য যন্ত্ররাষ্ট্রের অতীত।

প্রায়শ্চিত্ত

অশুভগ্রহী সমাজের পাপ সচেতন দুঃখশীলনের দ্বারা শোধিত হয় মহাত্মা গান্ধীর এই বিশ্বাস। অর্থাৎ সকলের অন্যায়ের জন্যে বহুকে এবং বহুর হয়ে এককে কষ্টস্বীকার করতে হবে। হয়তো যে-নির্দোষ তারই তপ হবে কঠোর, কিন্তু উপায় নেই। এই বিশ্বাস প্রাচীন, অনেকে বলবেন মধ্যযুগীয়, কিন্তু গান্ধীজির ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত জীবনে প্রায়শ্চিত্তের বিধিকে না মানলে তাঁকে বোঝা যাবে না। আমাদের মন পরিতাপের সাধারণ সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রেই পিছিয়ে যায়, কিন্তু দাবানলের শান্তিবিধান ব্যক্তিগত দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে প্রশস্ততর হয়, তপস্যার দ্বারা সঞ্চিত তাপ আলোকিত স্নিগ্ধরূপী হয়ে ওঠে : মহাত্মা গান্ধীর দীক্ষা তাই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এই সংকল্পের বিরোধিতা আছে কিনা জানিনা। নোয়াখালিতে

দুঃসহ ব্রত গ্রহণ ক'রে চলেছেন তিনি; গ্রামে গ্রামে প্রশমিত পাপের পথ দেখিয়েছেন ত্যাগের পরিচর্যায়। স্বীকার করব অনশনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হয়েও মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রতে প্রায়শ্চিত্তের শিখা জ্বলতে দেখেছিলাম, সে কথা ভুলতে পারিনি। সেবারে তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হন। পূর্বে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুণায় গিয়ে গান্ধীজির অনশনব্রত দেখেছিলাম, হঠাৎ মনে হয়েছিল সঞ্চিত যুগের পাপ ক্ষয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কতদূর বিচলিত হয়েছিলেন ইতিহাসে তা লেখা আছে।

বহুজনের দুঃখতাপ শরীরে গ্রহণ ক'রে মানবকল্যাণী তপ করেছেন এমন কথা শুনতে পাই। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেদিন মহাত্মা গান্ধী অনশনের দশম দিনে মৃত্যুর অতি নিকটবর্তী হন, সমস্ত দেশে এমন কি বহির্জগতেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে বিমিশ্র বেদনা উন্মথিত হয়েছিল। তখন একটি কবিতায় গান্ধীজির প্রবর্তিত পুরানো প্রথার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। স্বরচিত সেই কবিতা এইখানে উপস্থিত ক'রে গান্ধীজির প্রায়শ্চিত্তনীতির মূল প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

অনশন মেলে হুতাশন
তাপী তিনি, মরণজীবন
মেলালেন তোমার আমার।
সৃষ্টির আগুন অগণন
খুলে দিল অরুণ গগন
পিছনে ভাঙ্‌ল কারাগার॥
তৃষ্ণাতাপ থাকে প্রাণ জুড়ে,
তবু তাকে ছেড়ে কিছু দূরে
দাঁড়ায়েছে আজ বহুলোক—
ভয়ের শিকল যায় পুড়ে
ছিঁড়ে দিল বন্ধনের শোক—
অগ্নিবাণী বুকে বুকে উড়ে॥
নীলাকাশে হোমশিখা তাঁর
সূর্যকে করেছে অঙ্গীকার;
দাহে তাঁর উজ্জ্বল ক্ষরণ
যত পাপ তোমার আমার।
—প্রাণের সন্ধানে সবাকার
তিলে তিলে মরণ বরণ॥

একথা না মনে ক'রে পারিনা যে এই প্রজ্জ্বলিত পাপের যুগে নোয়াখালিতে তাঁর একটি মহা-অগ্নিপরীক্ষার পুনরাবৃত্তি সামনে রয়েছে। শেষবারেও মহাত্মা গান্ধী সম্প্রদায়িকতার ঘনান্ধকারে কোনো আলোকপথ দেখতে পান নি। বিহারে পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, বারম্বার কলকাতায়—এবং বোম্বাই, আগ্রা, কানপুর, গড়মুক্তেশ্বরে, আরো কত নাম বলব—যে-সাংঘাতিক নরনারীহত্যা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেল তাতে মহাত্মা গান্ধীর পরীক্ষা কঠিনতর হয়েছে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ভারতীয় অন্ধকার সামান্য অপসারিত হলেও মানবসম্বন্ধের লোকালয়ে মিলন মনোভাব দেখা দেয় নি, সাম্প্রদায়িক দেয়াল কঠিনতর হয়ে খণ্ডতাকেই স্থায়ী করতে উদ্যত। এমন কালে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে ফিরে চললেন। সহজীবন, সহযোগিতা এবং সত্যাগ্রহের কর্ম্মী ভেদান্ধকারের যে-ভূমিকায় নূতন অধ্যায় সুরু করলেন তার পরিণাম কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু পাকিস্তান হিন্দুস্থান নয়, ভারতীয় লোকায়ত সত্যের নির্ভরতা। পৃথিবীজোড়া বিভেদের পর্বে এই উত্তরের জন্যে মানবজাতির একটি অপেক্ষা রয়ে গেল।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনে চরম পরীক্ষা আজ সমাগত ॥

"পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে সত্যাগ্রহকে পাশ্চাত্য একবার বুদ্ধিবিবেক দিয়ে দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করলে তা প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যেই বিকশিত হবার উপযুক্ততর ক্ষেত্র খুঁজে পাবে। যুদ্ধের মতোই সত্যাগ্রহের সার্থক সাধনায় জনসেবা, আত্মত্যাগ, সংগঠন ও শৃঙ্খলা দরকার। এসব গুণ আমার দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য সমাজেই আমি বেশি দেখ্‌তে পেয়েছি। সম্ভবত হিংসা-শিল্পের শিল্পীরা এখনও অহিংস প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের সার্থক যোদ্ধা হ'তে পারেন।"

কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী—'ওআর উইদাউট ভায়োলেন্স'

কবিতা

হিন্দুস্থান

সুধীরকুমার গুপ্ত

তোমার মাটিতে শুনি সেই মৃত্যু-জয়-করা গান
অমর প্রাণের হিন্দুস্থান।

দুশো বছরের জ্বালা, কলঙ্কিত কারার কাহিনী
সকল হৃদয় জুড়ে যে উজ্জ্বল সূর্য্যসাধে চিনি
কখনো মরেনা সেই আশা,
জানো তুমি কোন মন্ত্রে ঘৃণা হয়ে ওঠে ভালোবাসা

সুদূর অতীত থেকে সে কামনা আজকের কাছে
সে প্রেমের ঋণে বাঁধা আছে।
যে কামনা আগে কত সমতট, বিদিশার দিন
মূর্ত্ত কল্পনার রঙে বারংবার করেছে রঙীন,
আবার ধূলারও পরে সব ছেড়ে এসেছে সে চলে
আরো প্রেমে ধন্য হবে বলে।
সে আশ্চর্য্য প্রাণলোক, আনন্দিত বেদনার ভার
আমাদের উত্তরাধিকার।

যত রক্ত গেছে ঝরে আবার ধূলিতে যায় ঢেকে,
আবার দুর্ভিক্ষ আর মড়কের ধ্বংসস্তূপ থেকে
প্রাণের বন্দনা জেগে ওঠে।

শতাব্দীর ক্লান্তি ভাঙে, আমাদের চেতনাতে ফোটে
মুছে সব সাম্রাজ্যের সীমা—
তোমার সে কালজয়ী অনির্ব্বাণ রূপের মহিমা।

তাইতো মরিনি আজো, যত ব্যথা পাকনা হৃদয়
এ হৃদয় ভাঙবার নয়।
আসমুদ্র হিমালয় বাঁধা এক মমতার টানে
পরকে আপন বলে মানে।
আজকের এ হানাহানি, ক্ষণিক বিবাদ মুছে যাক,
আবার কাছে ও দূরে হৃদয় নিজেকে খুঁজে পাক।
নতুন নিশানতলে আমাদের প্রেমে নাও প্রাণ
সবার সাধের হিন্দুস্থান।

সান্যালদের কাহিনী

অমিয়ভূষণ মজুমদার

আমার বদ্ধমূল ধারণা হ'য়েছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে মানুষ পূরো জয়লাভটা কোথাও করতে পারেনি। প্রকৃতির নানা চর-অনুচর কোথায় কে লুকিয়ে রইল এমন পাকা যোদ্ধা মানুষের চোখেও পড়ে না; হঠাৎ একদিন দেখে প্রাসাদ-ভিত্তির পাথরের জোরার মুখে কি ক'রে একগাছা দুর্ব্বা গজিয়ে উঠেছে। অথচ আমরা বিনীত এবং নীচ বলতে দুর্ব্বার সাথে উপমা দিই, শক্ত বলতে বলি পাথর।

রূপপুর গ্রামের সান্যাল-বাড়ীতে প্রকৃতি ও মানুষের যুদ্ধের একটা বড় রকম মারপিট হ'য়ে গেছে, বলা-বাহুল্য মানুষ এখন পরাজয়ের কোন-ঠাসা অবস্থায়। শুধু সান্যালবাড়ী বলি কেন রূপপুর গাঁখানা গোটা ধরলেও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হবে। হয়তো বলব জুডিয়ার জির কথা কিম্বা জেট্‌-প্রপেণ্ড প্লেনের কথা কিন্তু ওদিকে খানিকটা সুবিধা করেছে বলেই মানুষের জয়ের কথায় বিশ্বাস কোর না। হায়রে মানুষ।

ভেবেছিলাম বন্য পাশব-বৃত্তিগুলিকে জয়ই করেছি, বলেছিলাম প্রীতির কথা স্নেহের কথা; প্রথমে ওরা যখন বলল আমার সকল প্রকার ভালোবাসার মূলে আছে আদিম রিরংসা তখনও (ওদের আমি চিরদিনই ছেলেমানুষ ভাবি) ভেবেছিলাম কি বলতে কি বলছে; সবাই মিলে যখন বলল ঠিকই বলেছে ওরা মনস্তত্ত্বের খাতে তখনও বোকার মতো মুখ করে দলে-ভারি ওদের দিকে চেয়ে বলেছিলাম,—তা হোক, তা হোক, মনের মধ্যে পশুগুলি থেকেও যদি থাকে তাদের বেশ মোটা সিকের শক্ত গারদে পোরা গেছে। কিন্তু আমি বোকা এটাই প্রমাণ হ'ল; দেখলাম, বশ করা দূরের কথা পশুগুলি শুধু গজরায় না, বেরিয়ে এসে বুকেও চেপে বসে, তার উন্মুক্ত ব্যাদান থেকে আদিম হিংস্রতার দাঁতগুলি মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করতে থাকে, তার লোল জিহ্বা রিরংসার ঘৃণ্য লালা-স্রাবে মানুষের সর্বাঙ্গ ক্লেদাক্ত হ'য়ে ওঠে।

কি কথায় কি কথা উঠে পড়ল। মানুষের পরাজয়ে বড় কষ্ট হয় আমার তাই এমন করে বলি, বিষয়বস্তুর কথাও ভুলে যাই।

বলছিলাম রূপপুর গ্রামের কথা। পদ্মা-নদীর তীরে ছিল এই গ্রাম, এই গ্রামের ঘাটে নৌকায় চেপে কাশিমবাজারের রেশম কুঠিতে যাওয়া যেত, আর মুরশিদাবাদকে বাঁয়ে রেখে যাওয়া যেত পূর্ণিয়ায়। তখন এ গাঁয়ের চওড়া মাটির পথে ধূলো উড়িয়ে টুংটাং ক'রে গোরুর গলায় ঘণ্টা বাজতে বাজতে অনেক গাড়ী যেত, মসলিন-পরা না হ'লেও দামি রেশমী-পরা বৌদের নিয়ে হুঁ হুঁ করে পাল্কীও যেত। তারপরে পদ্মা সরে গেল, লক্ষ্মীও সরে গেল, কে আগে গিয়েছিল এতদিন পরে জানা যায় না। পদ্মা শুধু প্লাবন দিয়ে ডুবায় না, সরে যেয়েও ডুবায়; এ গ্রামের বানিজ্যের ভরা-ডুবি হ'ল শুকনো ডাঙায়।

সান্ন্যাল বাড়ীর বৈঠকখানার ঝাড়ের আলো বাড়ীর সামনের বিঘে-পরিমাণ জমি আলো ক'রে রাখত; সৈয়দ গুলাম মর্ত্তুজার আলোও কম যেত না খুব, রায় বাবুদেরও না। একগ্রামে তিন জমিদারের সদর। ইংরেজ-আমল না হ'লে এদের মধ্যে যে ভুইঞা হবার জন্য যুদ্ধ হ'ত তা প্রায় ধরেই নেয়া যায়। একেবারেই হয়নি তাও নয়। ছোটখাট জমি সংক্রান্ত দাঙ্গার কথা বলছিনা একটা মিঠেকড়া বড় গোছের ব্যাপারই ঘটেছিল রায়বাড়ীর সাথে সান্ন্যালদের।

সান্ন্যাল কর্ত্তার মৃত্যু হ'য়েছে, বছর বাইশ বয়েসের এক সান্ন্যাল তখন গদিতে। রায়বাড়ীতে কোলকাতার কবিযাত্রা এসেছে, সান্ন্যাল গেছে শুনতে। বেশ আটপৌরে ব্যাপারে হ'য়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ এক দাসী ওদিকের চিকের পর্দার আড়াল থেকে এল সান্ন্যালের সামনে। হাতে রেকাবি, রেশমি রুমালের ঢাকনা, তার নিচে ঝাড়ের আলোর

নিচে ঝিকিয়ে ওঠা রাঙতায় মোড়া—একজোড়া পানের খিলি। খুসি হয়ে সান্ন্যাল পান নিতে যেয়ে হাত গুটিয়ে নিল। সান্ন্যালের চোখজোড়া তার বাপের মতোই লাল ছিল, এখন কাছে কোন ডাক্তার দেখলে বলত লোকটি এখনি পড়ে মরে যাবে, সারা দেহের রক্ত মাথায় এসে উঠেছে। সান্ন্যাল বেশ দেখতে পেয়েছে একটি পানে ছোট ছোট একপাটি দাঁতের চাপের হাল্কা দাগ। উচ্ছিষ্ট। সান্ন্যালের মনের অবস্থাকে ক্রোধ বললে কম বলা হয়। মুহূর্ত্তে কি হ'য়ে গেল। চিকের পর্দ্দার আড়ালে রায়বাড়ীর আর-সব মেয়েদের সাথে রায়ের নিজের মেয়েও ছিল। (কেউ কোনদিন বলতে পারবে না রায়ের মেয়ে নিজেই চিকের বাইরে অপেক্ষা করছিল, কিম্বা সান্ন্যাল তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে এনেছিল দলের মধ্যে থেকে, একথাও বলা কঠিন কি করে এমন দুষ্টবুদ্ধি খেলে গ্রামের একটা মেয়ের মাথায়।)

হুঙ্কার দিয়ে উঠল চাষীরা লাঠির সর্দ্দার রফাৎ বুড়োর সাথে—রায়বাড়ী থেকে চুরি হয়। মেয়ে চুরি হয়।

সান্ন্যালের সাথে লাঠিয়াল ছিল না, ছিল তাদের কালী বাড়ীর পূজারীর ছেলে কালীপ্রসাদ আর ছিল সান্ন্যাল নিজে। তুমুল গোলমালে আসর ভেঙ্গে গেল। দেখা গেল একটা ঘূর্ণির চারিদিকে রায়দের সবগুলি লাঠিয়াল পাগলের মতো ঘুরছে আর নাচছে আর হুঙ্কার দিচ্ছে। ঘূর্ণিটা ঘুরতে ঘুরতে চলতে চলতে সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এল।

ঘরে এসে হিসাব নিতে বসল সন্ন্যাল;—কালীপ্রসাদের বাঁ হাতের দুটি আঙুল গেছে আর সান্ন্যালের একটা কানের গোড়া দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে। ও পক্ষেব আট নয় জন গেছে, না জেনেও বলা যায়। সান্ন্যাল বাড়ীর সব দরজা তখন বন্ধ। প্রাচীরের ওপারে রায়বাড়ীর লাঠিয়ালদের হুঙ্কার স্পষ্ট হ'য়ে কানে পৌঁছাচ্ছে। সান্ন্যাল বাড়ীর সব লাঠিয়ালরাই বেরিয়েছে, কিন্তু প্রাচীরের ভেতরে তারা; হুকুম নেই বাইরে যাবার, ভেতরে তারা হুম্‌হুম্‌ করছে।

রায়ের মেয়ে মুখ নিচু করে মাটিতে বসে, দুঃখে কিম্বা অপমানে কিম্বা লজ্জায়; দুঃসাহসিকার যে লজ্জা হয় পথের শেষে এসে হয়তো তাই।

যাক সে কথা। এই থেকেই সুরু হ'য়েছিল সান্ন্যাল ও রায়দের প্রণয় ও দ্বন্দ্ব। দুপক্ষের লোকক্ষয় হ'ল, অর্থক্ষয় হ'ল, সান্ন্যালের গোটা দু'এক তৌজি গেল, রায়ের গেল নগদেই বেশী, বেশী মানে আমার তোমার নয়, রায়ের পক্ষেও সেটা বেশী।

সে রায় গেছে, রায়ের ছেলেরাও গেছে, নাতিরাও। তার পরের রাজত্বে রায়বাড়ীর অবশিষ্ট কাঠের দরজাগুলি, আর ভিটে জমিটুকু বিক্রী হ'য়ে গেছে। এখন নাকি তারা কোলকাতায় থাকে মস্ত ব্যবসায় তাদের কয়লার। এত তাড়াতাড়ি গেল বংশটা।

সান্ন্যালদের ইতিহাসও কতকটা তাই। সাদা চুলে লাল সিঁদুর পরে রায়ের মেয়ে

সান্ন্যালকে ডেকে বলেছিল,—আমি যাই, একটু পায়ের ধূলো দাও। সান্ন্যাল ছেলে বৌ-এর সামনে, নাতিনাত-বৌ-এর সামনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। বুড়ো বয়সে রায়ের মেয়ের এমন বশ হ'য়েছিল সেই ডাকাতে সান্ন্যাল তাই বা কে জানত।

কিন্তু সান্ন্যালের বংশ লোপ পায়নি। ঐযে লোকটিকে দেখছ ডাবা হুঁকোয় তামাক টানছে, (না সান্ন্যালের কর্ম্মচারীর বংশ নয়, তার নিজের বংশেরই) ঐ হ'চ্ছে বর্ত্তমানে সান্ন্যালের আমমোক্তার বল বা ওয়ারিশ। ওয়ারিশ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, নইলে সান্ন্যালের বৈঠকখানায় বসে এমন নিবিষ্ট হ'য়ে তামাক খাবে কে আমিরী চালে। আর আম্-মোক্তার বলা যায় এই জন্যে যে সান্ন্যালের করণীয় কাজগুলি সে-ই করে, যেমন ছোট একটা দুর্গাপূজা, গ্রামের অন্ত্যজদের দাঙ্গা হাঙ্গামায় শালিশী বা এমন সব কিছু।

এঁর নাম ইন্দুমৌলি সান্ন্যাল। আসল মূলের নাম ছিল মকরমৌলি, (অদ্ভুত নামটা, তা লোকটাও তো অদ্ভুত ছিল)। নামের মিলটুকু ছাড়া, ফ্রেনোলজিষ্টরা একটু ভালো ক'রে দেখলে আর একটু মিল পায় হয়তো যেমন নাকের সরল ঢালটির কোনে একটু ঐক্য কিন্তু মিলিয়ে দেখতে গেলে অমিলগুলিই বেশী ক'রে নজরে পড়ে। তামাটে গায়ের রং, রোগাটে চেহারা, নাকের নিচে মস্ত বড় সাদাটে গোঁফ, আধ-ময়লা মোটা কাপড়।

তামাক নামিয়ে রেখে সান্ন্যাল উঠে দাঁড়ালেন। সকাল থেকে আজ মেঘ কেটে গেছে, রোদও উঠেছে চন্‌চনে। কাল বড় দালানের ছাদ ধ্বসে গেছে বৃষ্টিতে, কাঠাল কাঠের পুরানো আলমারির ভেতরে রাখা চার পুরুষের পুরানো কাগজপত্তরগুলি ভিজে গেছে, সেগুলি রোদে দিতে হবে। দরকারি কাগজ যে খুব তা নয়। যে সব তৌজির সম্বন্ধ সে সব কাগজের সাথে সেগুলি ইতিমধ্যে দু তিনবার হাত বদলেছে। তবু অন্তত বাপ বড়বাপের নাম তো আছে। সান্ন্যাল অন্দরের দিকে রওনা হ'লেন। তার পায়ে হাতির দাঁতের খড়ম নয় যে কর্ত্তার পায়ের শব্দে অন্দর মহলে সাড়া পড়বে। (মকরমৌলির খড়মের একখণ্ড সেবার রান্নাঘরের পেছনে ডাঁটার ক্ষেত করতে যেয়ে পাওয়া গেছে, নিজের কোঁচার খোঁটে মুছে সেটাকে সযত্নে তুলে রেখেছেন ইন্দুমৌলি।) ইন্দুমৌলির বড় ছেলে কোলকাতায় আইন পড়ে আর রেলের অফিসে কি একটা চাকুরী করে। সেই পাঠিয়েছে বাপের জন্য লাল চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথম পরে ইন্দুমৌলি হেসেছিলেন, এখন অভ্যাস হ'য়ে গেছে, তা ছাড়া চামড়াটাও বেশ নরম।

হলদে খসাপচা কতগুলি কাগজ দু হাতে ভ'রে এনে রোদ্দুরে দিয়ে সান্ন্যাল আবার বৈঠকখানার বারান্দায় বসলেন। কাগজগুলি রোদ্দুরে দিতে যেয়ে হস্তান্তরের একটা দলিল চোখে পড়েছে,—দাতা মকরমৌলি, গ্রহীতা শ্রীমতী রাশেশ্বরী। সান্ন্যাল মনে মনে হাসলেন—গোটা জমিদারি ঘুস। রসিক ছিল বটে।

নিভন্ত হুঁকোটায় গোটা কতক টান দিয়ে সান্যাল আর একটু হাসলেন,--দিন কি ক'রে যায়। অদ্ভুত লাগে ভাবতে গেলে, যেন আজই নজরে পড়ল। শুধু মকরমৌলির দিন গেছে তাই নয়, তাঁর নিজের জীবনের বেশীর ভাগ দিনই গেছে। মকরমৌলির দিনের তুলনায় কিছু নয়, তবু কি দিন সে সব!

ইন্দুমৌলির বাবাকেও লোকে জমিদার বলত, অবশ্য তাঁকেও বলে,—তবে ইন্দুমৌলি নিজেও জানেন কিছুদিন আগেও যারা জমিদার বলতে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র বুঝত, এখন তারাই কথাটায় বোঝাতে চায় খানিকটা অবজ্ঞামিশ্রিত তাচ্ছিল্য।

আর শ্রদ্ধাই বল বা সম্ভ্রমই বল কেন বা লোকে তা করবে? কি আছে তার? সহায় সম্পত্তি ধনজন কিছু নেই, থাকবার মধ্যে নিচের মাঠে কিছু ধানের জমি, একটা ছোট মৌজার এক টুকরো, আর সামান্য কিছু লগ্নি কারবার।

বাড়ীটাকে এখনও লোকে জমিদার বাড়ী বলে সে তো উইর ঢিপিকেও লোকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বলে।

ইন্দুমৌলির কখনো মনে হয় ছেলেমানুষী এসব, কখনো কিন্তু অভিমানে চোখে জল আসে। হাসি পায় যখন তখন ধ্বংসের দিকে হেলে পড়া বাড়ীটার দিকে তিনি দেখেন আর ভাবেন হাত গুটিয়ে কেবা বসে ছিল সেই সুযোগে জঙ্গল আসল ঘাঁটিগুলি দখল করে ফেলেছে, এখন যুদ্ধ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাবার নীতিটা গ্রহণ করা যায়, অন্য আর একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখা ওদের তোড়কে। হুরমুর ক'রে পালাতে গেলে হারতো হবেই, চুরমার হ'য়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। কখনো দুতিন মাস এক নাগারে এরকম হালকা মনে হয় তার। এ রকম একটা অবস্থাতেই একবার তাঁর মনে হ'য়েছিল, চকমিলান দালানে বাস করা ভালো, কিন্তু তার চাইতেও ভালো খড়ো ঘরের পরিছন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। এরকম একটা অবস্থায় তিনি বৈঠকখানা ঘরের পেছনে গোটা দু'তিন খড়ের চৌরী তুলে ফেললেন, সেই থেকে সান্যাল পরিবার এই নোতুন বাড়ীতে থাকে। ইঁট নেই, পাথর নেই, নেই আস্ত শালের গুঁড়ি বসান কড়িবরগা, তবে পরিচ্ছন্ন, মনে হয় না মাথার উপরে ছাদটা ভেঙ্গে পড়বে।

এরকম মনের অবস্থায় তিনি যেন বেশ জোর পান, অনেক কিছু সহ্য করতে পারেন। '৪৪ খৃষ্টাব্দ যখন এল তখনও তাঁর এরকম মনের অবস্থাই ছিল। '৪৩-এর মম্বন্তুর থিতিয়ে যেতে যেতে চিতে সা ও মহিম সরকার যখন গ্রামে থাকবার পক্ষেও বড় হ'য়ে উঠল তখনও তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—ওদের টাকা অন্যায়ের টাকা, ওদেকে হিংসা করা সান্যালের সাজেনা। ওরা বড় হ'য়ে উঠেছে,

গ্রামের লোকেরা সান্ন্যালদের চাইতে ওদের যেন বেশী সমীহ করছে, তা করুক, গ্রামের লোকরা জানে আলকাতরায় চিটে গুড় মিশিয়ে বড় হয়েছে চিতে সা' আর মহিম নামের আগে জমিদার কথা জুড়ে নিলেও সকলেই জানে আসলে সে ময়দা, চাল ডাল এসব নিয়ে কি কি সব করে।

এমন কি যেদিন অত্যধিক বিনয় দেখিয়ে এসে মহিম খাজনা চাইল সান্ন্যালের কাছে (মহারাণীর খাসের প্রজা সান্ন্যালের কাছে) সেদিন কেমন লাগল একটু তাঁর, কিন্তু নির্ব্বিবাদে খাজনা এনে দিলেন তিনি, এমনকি মহিম যে দাখিলায় নিজের নামের আগে জমিদার কথাটা বসিয়েছে ছাপার অক্ষরে এ দেখেও দাখিলাখানা তিনি নিজের হাতেই নিলেন। মনে মনে একবার অবশ্য ভেবেছিলেন যে সামান্য জমির ফালিটার জন্য মহিমকে খাজনা দিতে হবে এখন থেকে সেটা ছেড়ে দিলেও হয়, মানে ঠিক কোথায় বোঝা না গেলেও আটকায় যেন এরকম ভাবে স্বীকার ক'রে নিতে।

আমরা যারা সহরে বাস করি আমাদের কাছে সান্ন্যালের চিন্তাধারাটা খানিকটা হাস্যকর মনে হবে। জমি যে কিনেছে সে যদি ট্রামের একটা চাকা হয় কিম্বা একটা লাইট পোষ্ট আমাদের তাকে খাজনা দিতে একটুও আটকায় না। সান্ন্যালদের হিসাব অন্য রকম। চেষ্টা করলেও মানুষ অভ্যাসের বিপরীত কাজ সব সময়ে করতে পারে না। মহিমের খাজনার ব্যাপারের পর পর চিতে সা'র ব্যাপারটা ঘটল।

বাজারে আলুর দাম বেড়েছে, আর কতদূর বাড়বে লেখাজোখা নেই। জমি মানে আলু। আলু মানে সোনা। সোজা হিসাবে চিতে সা' একদিন সান্ন্যালবাড়ীর সদর দরজার সামনের খালি জমিটা কিনে নিল। কিনে নেয়াতে খুব বেশী আপত্তি সান্ন্যালের ছিল না, দু'পুরুষ আগেই ও জমিটা তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। চিতে সা' জমি কিনেই থামল না, একটা বেড়া দিল, চাষ করল জমি। সান্ন্যাল ছোটবেলা থেকেই জানেন জমিটা তাদের নয় তবু ছোটবেলা থেকেই জানেন সান্ন্যালদের খাতিরেই হোক, বা অভ্যাসবশেই হ'ক মালিকরা জমিটাকে খালি ফেলে রাখে। একটু খচ্ ক'রে উঠল সান্ন্যালের মন।

খবর পেয়ে বেরিয়ে যেয়ে সান্ন্যাল বললেন—জমিটাকে নষ্ট করলে, চিত্তসুখ ?

—আজ্ঞে নষ্ট নয় তো, আলুর চাষ হবে যে। চিতে বিনয় সহকারে বলল।

—কিছু যে হবে তা বুঝেছি, জমিটা অন্য রকমে সকলে ব্যবহার করত কিনা তাই। অধিকতর বিনয়ী হ'য়ে চিতে বলল—আজ্ঞে শুনেছি পূর্ব্বে আপনাদের ঘোড়া টাঙ্গানো হ'ত এখানে, এখন তো বোধ হয় সে সবের দরকার নেই।

মুখের উপরে দাঁড়িয়ে এমন ঠাট্টা সান্ন্যালকে আজ পর্য্যন্ত কেউ করেনি, তিনি

বললেন—প্রাচীরের সবটাই পড়ে গেছে, কিন্তু সান্ন্যালবাড়ীর থামওয়ালা পাথরের সদর-দরজাটা দাঁড়িয়ে আছে এখনও দেখতে পাচ্ছ তো।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলেই তিনি থামলেন—অর্থাৎ অন্তত সেই পুরানো পাথরের খাতির একটু করা উচিৎ ছিল একথা তিনি বলতে পারলেন না মুখ ফুটে।

বৈঠকখানায় ফিরে নিজেই তামাক সেজে বসলেন সান্ন্যাল। অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়েও মনের ধোঁয়াটে ভাবটা গেল না। টাকা হয়েছে চিতের বলতে পারে সে—এ ভেবেও শান্তি পেলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সান্ন্যাল টের পেলেন, অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় পায়চারি করছেন তিনি, পায়ের কাছটায় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। তিনি ভাবলেন,—আবার তেমন হয় না, আবার ওঠেনা পাথরের থামের উপর চকমিলান বাড়ী, কিন্তু উপড়ি পথে চলতে সুরু করলে নাতিদের সময়ে কিছু হ'তে পারে হয় তো।

পরদিন সকালে মজুর ডেকে দালানগুলির দেয়াল থেকে অশ্বত্থ কেটে নামাতে লাগলেন, মজে-যাওয়া পুকুরপারের জঙ্গল কাটা হ'তে লাগল। দুঃখে জনান চার পাঁচশ' টাকা খরচ করে দম নেবার জন্যে থামলেন, চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সান্ন্যাল। জঙ্গল খানিকটা সরে গেছে, দেয়ালের অশ্বত্থের শিকড় উপরে ফেলতে যেয়ে দেয়ালের বড় বড় হাঁ-করা ফাটলগুলি বেরিয়ে পড়েছে, পুকুরের ধারের জঙ্গল কেটে ফেলতে অন্দরের অনেকটা বে-আব্রু হ'য়ে পড়েছে, কারণ সেদিকের প্রাচীরের অভাব পূরণ করছিল জঙ্গলগুলি। এসব কি আবার নোতুন করা যাবে? ঐ ফাটলগুলিকে ভ'রে দেওয়া যাবে কিম্বা পুকুর ঘিরে অন্দর ঘিরে যে প্রাচীর ছিল আবার যাবে সেটাকে তোলা? অভিমান অনেকটা কেটে গেছে তখন। সর্ব্বনাশ! একি কখনো সম্ভব? নিজের বাড়ীটা না হয় বুক দিয়ে পড়ে বাসযোগ্য করলেন; কিন্তু গ্রাম? ব্যাধি অশিক্ষা দারিদ্র্য কিম্বা তাদের স্থূল প্রতীক যে জঙ্গল পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাগুলিকে গ্রাস ক'রে ক্রমে এগিয়ে আসছে, অপরিত্যক্ত আঁকড়ে-ধরে-থাকা, স-মানুষ ভিটাগুলির দিকে? রাবণ রাজা দুহাতে পৃথিবী উপরে ফেলতে চেয়েছিলেন—সান্ন্যালের হাতে কি গ্রামখানার দিকে এগিয়ে আসা জঙ্গলের জোয়ার ঠেলে রাখবার জোর আছে?

সান্ন্যাল স্ত্রীকে ডেকে বললেন – নিষেধ করলে না, টাকাগুলি লোকসান দিলাম।

স্ত্রী মনে মনে হাসলেন, হয় তো বললেন—তবু যদি রায়ের মেয়ে হ'তাম। প্রকাশ্যে বললেন—নষ্ট হ'ল কোথায়, আমার কত ভালো লাগছে।

এরপরে অনেকদিন সান্ন্যাল আর অভিমান করেননি। ১৯৪৬-এর গোড়ায় এসে তিনি যা করলেন সেটা বোধ হয় সান্ন্যালদের বহু প্রমাণিত নির্ভীকতার ফল। একদিন

গ্রামের চাষীরা দেখল সান্ন্যাল খালি গায়ে মাথায় একটা গামছা চাপা দিয়ে নিচের মাঠের দিকে যাচ্ছেন। চাষীদের মধ্যে দু' একজন বুড়ো ছিল, তারা সান্ন্যালদের সেকাল দেখেছে, ফলে সান্ন্যালকে এখনো খানিকটা সমীহ করে, তারা এবেশে তাঁকে দেখে একটু অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করল—কোথায় যাচ্ছেন কর্ত্তা ?

—মাঠে।

—মাঠে ? সেখানে কি জরিপ হ'চ্ছে ? (হাঁ, তা জরিপের সময়ে জটিল অবস্থা হ'লে সান্ন্যাল কর্ত্তারা এর আগেও মাঠের দিকে গেছেন এক আধবার।)

—না, কিছু ঢ্যাঁড়স গাছ লাগিয়েছি, বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে, একটু নিড়িয়ে দিতে হবে।

—নিড়িয়ে দিতে !

নিজে হাতে না হয় নাই হ'ল তাই বলে সান্ন্যাল বাড়ীর কর্ত্তা যায় ক্ষেতের তদারক করতে, সে তো চাষার কাজ। একজন বুড়ো সহ্য করতে না পেরে বলল—বাড়ী যান কর্ত্তা রোদে কষ্ট হবে।

সেদিন অপ্রতিভ হ'য়ে ফিরে গেলেও, পরে অনেকদিনই সান্ন্যাল মাঠে গেছেন, এমন কি গাছে ফল নামলে সেগুলি বিক্রীর জন্য বাজারেও পাঠিয়েছেন। লোকে কথাটা এ কান ও কান করেছে। উপায় কী।

আমার ভাষায় বলা যায় সান্ন্যাল বাস্তবকে ধরেছেন। সেকালের প্রতাপের ছায়ালোক থেকে নেমেছেন একেবারে রোদেভড়া মাটিতে। একটু কষ্ট হয়েছে তাঁর, তবু হাসিমুখে ধরবার চেষ্টা করেছেন, জঙ্গলা লতাটি যেমন পাক দিয়ে ধরে কোন গাছকে। তিনি স্থির করেছেন মামলা মোকদ্দমা আর নয়, সেলাম কেউ না দেয় নাই দিল। অবশ্য আমরা বলতে পারি সেলাম আশা করাই বোকামি, কিন্তু তা হ'লেও অনেক দিনের অভ্যাস।

ছোটছেলে এসে বলল,—দেখে এলাম বাবা, ভারি সুন্দর সুন্দর সব কাপড় এসেছে, ছিঁট এসেছে এবার মহিম সরকারের দোকানে। আমাদের র‍্যাশান কার্ডখানা পাঠিয়ে দাও না। একজোড়া ভালো ধুতি যদি দিত পরতে তুমি।

সান্ন্যাল বললেন—থাকগে ও রকম চাইতে যাওয়া ভালো নয়।

—তুমি তো মোটা কাপড় পরতে পার না, আনিয়ে নাও একজোড়া।

দুর্ব্বলতা ছিল এককালে। হয় তো ছেলেটা তার মার মুখে গল্প শুনেছে। এখন আর নেই।

সান্ন্যাল বললেন—এই যে পরে আছি দেখছিস না।

অনেক বলে সান্ন্যালকে রাজি করিয়ে ছেলে গিয়েছিল কাপড় আনতে। দুপুর কাটিয়ে খালি হাতে ফিরে এল সে, কান দুটি লাল হ'য়ে উঠেছে অপরিসীম লজ্জায়। সান্ন্যালের সামনে ধপ করে র‍্যাশান কার্ডখানা ফেলে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, সান্ন্যাল বললেন,—কি হোল ? চোখের চেহারা আড়াল করবার জন্যে ছেলে ঘুরে দাঁড়াল।

সান্ন্যাল একটু রাগ করে বললেন—চাওয়াটাই ভালো হয় নি। কিন্তু কে বলে উঠলো ভিক্ষা নয় তো, অন্যায় কিছু তো চাই নি।

সান্ন্যাল অনেকক্ষণ একা বসেছিলেন বৈঠকখানায়, কি ভাবতে কোন সময়ে চোখের কোনে দু' এক ফোটা জল এসেছিল, গাল বেয়ে পড়ল, তারপরে শুকিয়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ এক একটা ঘটনা ঘটে যায় যাতে সান্ন্যালেব বদরাগ বিসদৃশ ভাবে গ্রামের কাছে ধরা পড়ে যায়। আগেকার দিনে যখন সান্ন্যালদের রাগকে লোকে তেজ বলত তখন যে তিনি এর চাইতে অনেক বেশী রাগ করতেন, এখন বুড়ো হয়ে করেন না, এই আপেক্ষিক উন্নতি কেউ দেখেও দেখেনা প্রশংসা করা দূরে থাক।

সান্ন্যালদের বাড়ীর পেছনে সাত আট বিঘে ভুঁইয়ে দশ পনর ঘর বাগদী প্রজা বাস করত সান্ন্যালদের। প্রজা ঠিক নয় সান্ন্যালদের লাঠিয়ালদের ক্ষয়াবশেষ বংশধর। এখন এরা লাঠি খেলে না, ম্যালেরিয়ায় ধোঁকে, না খেয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে অন্যায় কাজ করে, বড় ধরণের অন্যায় নয়, ছোট খাট ইতর কাজ। পূর্ব্বপুরুষদের কথা মনে করেই হোক কিম্বা খানিকটা অভ্যাসের বশে এরা এখনও মাঝে মাঝে সান্ন্যালদের ফাইফরমাস খেটে দেয়। এদের মধ্যে ছোকড়া বয়সী যারা তারা আপত্তি জানায় তবে এদের মোড়লস্থানীয়েরা তাদের যুক্তি সমর্থন করলেও সান্ন্যালের কান পর্য্যন্ত কথাটাকে পৌঁছতে দেয় না। সান্ন্যালও খুব কৌশলে খোলাখুলি অবাধ্যতার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলেন, ইদানীং কাজকর্ম্মে এদের প্রায় বলেন না, বললেও বকশিসের নাম করে সাধারণ চলতি মজুরী মিটিয়ে দেন।

এদের এক বুড়ী ছিল, সে সান্ন্যালদের উঠোন ঝাঁটপাট দিত, এঁটো কাঁটা যা হয় খেত। বুড়ী নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ। তায় আবার কানেও কম শোনে। লোকে গালি দিলেও রাগ করবার কিছু নেই তার।

এই বুড়ীর একদিন কি দুর্ম্মতি হল। সাত বছরের কালে বৌ হয়ে যখন সে গ্রামে এসেছিল তখন থেকে প্রায় প্রতিটি দিনই সান্ন্যালদের পুকুরে (পাথরে বাঁধান ঘাট ছিল যখন) স্নান করেছে। আজ সে গেল মাঠের ধারে বড় পুকুরটায় স্নান করতে।

আধঘণ্টা বাদে বুড়ী অর্দ্ধস্নাত অবস্থায় ফিরে এল কাঁদতে কাঁদতে।

—কি হোল বুড়ী ?

আরও খানিকটা কেঁদে বুড়ী বলল—স্নান করতে জলে নামতেই মহিম সরকার যমের

সরকারের মতো এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে জল থেকে তুলে এনেছিল ঃ বলেছে,—যাকে জমিদার বলিস সেখানে না যেয়ে আমার পুকুরে এসেছিস কেন মরতে। ঠ্যাং ভেঙে দেবে বলেছে এবং ভাঙবার আগাম স্বরূপ একটা চড়ও মেরেছে বুড়ীর গালে।

সান্ন্যাল-গিন্নী মুখ লাল করে ঘরে গেলেন। ডাকে-আসা কাগজ থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর মুখ দেখে শঙ্কিত হলেন সান্ন্যাল, বললেন,—কি হোল আবার ?

—গ্রামে কি পুরুষ নেই ?

—নেই আবার ; এখনও মরিনি তো।

—রসিকতা রাখ ;—এই বলে সান্ন্যাল-গিন্নী বুড়ীর মার খাওয়ার কাহিনী ব্যক্ত করলেন।

—কি করব বলো,—বলে সান্ন্যাল কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়লেন। চিরদিনের সহিষ্ণু সান্ন্যাল-গিন্নীর আজ যেন সহ্য হলনা ঃ কেঁদে ফেলে তিনি বললেন—চড়টা যে সান্ন্যালদের গালে পড়েছে তাও বুঝবে না ?

সান্ন্যাল খানিকটা হাসলেন, তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তেমনি হঠাৎ দেয়ালে ঝুলানো বহুদিনের পুরানো ধুলিমলিন চাবুকটা হাতে করে সান্ন্যাল-গিন্নী কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে গেলেন। এবার সান্ন্যাল-গিন্নীর ভয় হল ঃ হা ভগবান, কি লোকের হাতে পড়েছেন, ত্রিশ বছর পরে আবার তাঁর মনে হল কথাটা। ছোটছেলেকে খুঁজে বার করে পাঠালেন তাকে সান্ন্যালের পেছনে—যা বাবা যেমন করে পারিস ধরে নিয়ে আয় ; আমারই দোষ, সব কথা পুরুষদের কানে তুলতে নেই। ছেলে চলে গেলে ভাবলেন, কিন্তু কি করে সহ্য করা যায় এমন অন্যায়। বিনা কারণে এই হিংসা দ্বেষ কেন হয় মানুষের।

কিছুক্ষণ পরেই ছেলের সাথে সান্ন্যাল ফিরে এসেছিলেন অদ্ভুত ভাবে হাসতে হাসতে, হাসি নয় ঠিক।

কথাটা যে ওদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে সান্ন্যাল বেত হাতে বেরিয়েছিলেন মহিম সরকারকে মারবার জন্যে। একটা মীমাংসাও ওরা করেছে—সেটা বোঝা গেল যখন বুড়ী পরের দিন কাজ করতে এলনা। রাখাল ছেলেটা গিয়েছিল বুড়ীর খবর করতে। সে শুনে এসেছে—বাগ্দীরা বলেছে, যার কাছে থেকে অন্যলোকের হাতে মার খেতে হয় অত কেন তার ফুটোনি।

সান্ন্যাল-গিন্নী বললেন—হাসি পায় তোমার ?

লজ্জাও হচ্ছে সান্ন্যালের, তিনি যেন লাল কাপড় ফেরতা দিয়ে পরে যাত্রার রাজা সেজে বেরিয়েছিলেন পথে ; লজ্জা মানে অনুতাপ নয়, জ্বালা করছে মন ; নিজের উপরে রাগ হচ্ছে, সান্ন্যাল-গিন্নীর উপরেও। সান্ন্যাল-গিন্নী যখন খেতে ডাকতে এলেন, সান্ন্যাল রাগ করে বললেন,—যাও যাও খাব না।

আসল কথা পরে জানা গেল,—মহিম সরকারকে এরা কেউ বাবু বলেনা, দাদা, কাকা এমন সব গ্রাম সম্বন্ধে (পূর্ব্বে যা বহাল ছিল) ডাকে, বাবু বলতে গ্রামের লোকরা অভ্যাসবশে সান্ন্যালকে বোঝে। সান্ন্যাল শুনে হেসে ফেলেছিলেন,—তা তোরা একটু বাবু বললেও পারিস, যদি তাতে খুসি হয়।

কিন্তু এতদিন তবু কাজে অকাজে ওদের দু' চারজন চলাফেরা করত সান্ন্যালদের সদরের সামনে দিয়ে এখন তাও বন্ধ হয়েছে, সকালের হাল্কা অন্ধকার থেকে সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার পর্য্যন্ত সান্ন্যাল একাই বসে থাকেন বৈঠকখানায়। মাঝে মাঝে তামাক খান, ভেঙ্গে-পড়া নাটমন্দিরের উপর দিয়ে সারবন্দি নারকেল গাছগুলির মাথার উপর দিয়ে আকাশের দিয়ে চেয়ে থাকেন যেখানে একটা মাত্র বাজপাখী পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

একজন মাত্র লোক এখনও মাঝে মাঝে আসে সে হচ্ছে গ্রামের সনাতন বৈরাগী। বেঁটে খাট ফরসা চেহারার মানুষটি। হাসছে আর বিনীত হচ্ছে, এ ছাড়া আর কিছু মনে হয়না তাকে দেখলে।

বৈঠকখানার বারান্দায় উঠেই বলে একটু চরণধূলি দিন দাদা খাঁ খাঁ করছে প্রাণ। সান্ন্যালের কথা বলবার দরকার হয় না। যতক্ষণ বৈরাগী থাকে অনবরত কথা বলে, অনববত মিষ্টি ক'রে দাদা বলে আর কথায় কথায় জিভ্ কেটে হাতজোর করে।

একদিন সনাতন বলল,—আজ ঝগড়া করতে এলাম দাদা, একা একা কেন? গরীবের বাড়ীতে গেলেই হ'ত। (এইখানে জিভ্ কাটল) ছোটলোকের মুখের আস্পর্দ্ধা দেখলেন, দাদা, সান্ন্যাল যাবে কিনা বৈরাগীর বাড়া। আমার অন্যায় হ'য়েছে, আমারই আসা উচিৎ ছিল। এখন থেকে রোজ আসব।

—নিজের কাজ ফেলে তোকে রোজ আসতে হবে কেন?

—বলেন কী! আপনার কাছে আসব?

—তা বেশ করেছিস, ব'স।

—আজ একটা কথা বলতে এলাম, দাদা।

—কিরে?

—এমন দরকারী কথা নয়, বলছিলাম আপনি কিছুদিন গ্রাম ছেড়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে।

—কেনরে?

—শরীর ভালো হবে আবার কেন?

—বুড়ো বয়েসে শরীর দিয়ে আবার কি হবে, আসল কথা বল।

—ছেলেটার পড়াশুনাও তো দেখতে হয়। গ্রামের স্কুলে আর কতদিন থাকবে

বৈরাগী চেষ্টা করেও বলতে পারল না,—আর কেন, ঝড়ে উপড়ে-যাওয়া গাছের শুকনো গুঁড়ির মতো পড়ে থেকে আর কি লাভ। তার চাইতে নোতুন জায়গায় যেয়ে আবার বাঁচবার চেষ্টা করলে হয়। কিন্তু সান্যাল নিজেই বললেন, এখন মানে মানে সরে যাওয়াই ভালো।

—তা নয় দাদা, তা নয়। মানের কথা নয়। এদের পরে এই অন্ত্যজদের পরে রাগ ক'রে যাওয়া আপনার চলে না। যাবেন নিজের তাগিদে। মনে করুন না আপনার পূর্ব্বপুরুষের কথা, তাঁরা কি এ গ্রামে আসবার সময়ে নিজের গ্রামের উপরে রাগ করে এসেছিলেন? বাঁচতে হবে, সান্যালের বংশ রাখতে হবে, সেই তাগিদ। জল শুকিয়ে এলে একশ' বছরের পুরানো রুইও যেমন লাফিয়ে ওঠে জলের খোঁজে তেমন করে বেড়িয়ে পড়তে হবে। একটা বট পুরানো হ'ল, পুরানো গুঁড়ি রস টানলো না ব'লেই কি বটের মৃত্যু হবে? অনেক দূরে অন্য কোথাও তো ব' নেমেছে, সেই ব' থেকে আবার নোতুন বট বেরুবে, ছায়া দে'বে।

এমন সব কথা বৈরাগী দেখা হ'লেই বলে। চুয়াল্লিশে বলেছিল, পঁয়তাল্লিশে বলেছিলে, এখনও বলছে। হয়তো এ বাড়ীতে এসে এর পুরানো আবহাওয়ায় নিজেরই দম বন্ধ হ'য়ে আসে তাই ব'লে ফেলে। কিন্তু কোলকাতা থেকে ও যখন ঘুরে আসে তখনই পর পর কয়েকদিন খুব বেশী ক'রে বলে। কোলকাতায় রায়দের স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দেখেই বোধ হয় সান্যালদের অস্বচ্ছলতার কথা ওর মনে পড়ে।

বৈরাগী চলে গেলে সান্যাল ভাবলেন, শুধু ভাবা নয় স্ত্রীর সাথে বৈরাগীর কথাগুলি নিয়ে আলোচনাও করলেন। বৈরাগীর কথাটা গ্রহণ করবার জন্য বোধ হয় তাঁর অজ্ঞাতে অনেকদিন ধরে প্রস্তুত হ'চ্ছিল তাঁর মন।

ভূমিকা না ক'রে বললেন সান্যাল—রায়রা চলে গেছে, এবার আমরা যদি যাই কি রকম হয়? কথাটা আচমকা ব'লে সান্যাল-গিন্নী মুখের দিকে চেয়ে রইলেন,—কোথায় যাব?

—রায়দের মতো গ্রাম ছেড়ে। আজ সনাতন বলছিল; আর ভেবেও দেখলাম কথাটা মিথ্যা নয়। এক ছেলে থাকল কোলকাতায় আর একজন বড় হ'য়ে কোন ফরক্কাবাদে যাবে কে জানে। ওরা হয়তো কোনদিনই গ্রামের বাড়ীতে ফিরবে না। বড় ছেলে জমিদারের গন্ধই সইতে পারে না, ছোটটিও হাকিম টাকিম হবে বোধ হয়। তবে আর এ সব কেন আগ্‌লে রাখা।

—ঠাট্টা যতই কর কথাটা মিথ্যা নয়।

—সত্যি। এখন আমাদের দুজনকে বাদ দিয়ে চলতে হবে। ওদের দু'জনকে

স্থাপিত মতো একটা কিছু করতে হবে তো। আর বলতে কি মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় নোতুন করে জীবন আরম্ভ করুক ওরা। সনাতন মরা গাছের গুড়ির সাথে তুলনা দিচ্ছিল। আমারও মনে হয় নোতুন মাটি পেলে পুরানো বংশটা আবার একটু জোর পায় হয়তো।

—দুটো ছেলেকে যদি আমার কাছে রাখবার ব্যবস্থা করে দাও তাহ'লে তো আমার সাধই মেটে।

কিন্তু দুশো বছরের শিকড় এক কথায় মাটি ছাড়তে পারে না। এমন কি সান্ন্যাল-গিন্নীও থাকবার পক্ষেই এক এক সময়ে যুক্তি দেখান। '৪৩-এও সান্ন্যাল মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। সহরে যাবার কথায় বলেছিলেন—কে চেনে আমাকে, কার সাথে কথা বলব। কিন্তু '৪৬-এ এসে সান্ন্যাল আর পারছেন না। শিকড় নড়ছে। একটা ধাক্কা বড় গোছের দরকার ছিল, সেটাও এল, আর এলও অদ্ভুতভাবে। ঘটনাগুলি ঘটল যেন সান্ন্যালকে আর কিছুদিন থাকবার জোর দেবার জন্য ; ফল দাঁড়াল অন্যরকমের।

১৯৪৬-এর আগষ্ট এসে পড়েছে। ১লা আগষ্টে ভয় ক'রে উঠল সান্ন্যাল-গিন্নীর। ১৯৩৮-এর আগস্টে জেলও খাটল, মাথাও ফাটল ; ১৯৪২-এর আগষ্টে জেলের মধ্যে নতুবা পুলিশের গুলিতে প্রাণ যেত ; ছোটবেলা থেকেই ছেলের মুখে,—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, তারপর পর বছরের মাথায় আগষ্ট আসছে। তুমি লিখে দাও বাপু বাড়ীতে আসুক, লেখ আমার খুব অসুখ।

সান্ন্যাল চিঠি লিখেছিলেন, আশঙ্কা তাঁরও হ'য়েছিল, রসিদ-দিবসে কোলকাতা লাল হ'য়েছিল রক্তে এবার আগষ্টে কি হবে কে জানে।

কিন্তু কোথায় কি হ'লঃ মানুষ ভুলে গেল মেরুদণ্ড সোজা করে চলা, সূর্য্যের দিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তাকান ; ভুলে গেল নিজেকে সে অমর করেছে ; ভুলে গেল তার সব চাইতে বড় পরিচয় সে দেবশিশু নয়,—মানুষ। সাপের মতো লুকিয়ে থেকে মানুষ মানুষকে ছুব্‌লে খাচ্ছে। কোলকাতার রাজপথে রক্তস্রোত বইছে কিন্তু মানুষের রক্তবীজ—আত্মার রুধিরোৎসব নয় ; কোলকাতার পথ কাদা হ'য়ে উঠেছে হিংসার, লোভের, রিরংসার কদর্য্যতায়।

বাগদীদের যে ছেলেটার মুখ দিয়ে সব সময়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, সব সময়ে মুখ হাঁ হ'য়ে থাকে, জিভটাকে সরিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল,—খুব লেগেছে কইলকাতায়।

—কি লেগেছে রে ?

—মারামারি, হেঁদুমোছলমালে। উল্লাস সহকারেই সে বলল।

দুঃসংবাদের দ্রুতগামিতায় কোন সন্দেহ করতে নেই তা বোঝা গেল। এমন কি গ্রামের মুসলমান পাড়ার কোন্ কোন্ ছেলে কোলকাতায় মার খেয়েছে, খুন হ'য়েছে তা পর্য্যন্ত।

বিশ তারিখে খবরের কাগজ এল, সংবাদ পড়ে সান্ন্যাল-গিন্নী কেঁদে ফেল্লেন। সান্ন্যাল আর একবার তামাক লাগিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ছোটছেলে বলল—আমাদের গাঁয়ে লাগে যদি ?

—আমাদের গাঁয়ে ? লাগবে কেন রে ? তা ছাড়া আমার মনে হয় সৈয়দরা থাকতে লাগবে না। অনেকদিনের ঘর, আমাদের মতোই পুরানো।

—কিন্তু শুনলাম সৈয়দদের বড় ছেলে নাকি হিন্দুদের হাতে মারা গেছে কলেজ থেকে ফিরতে। এ রকম হ'লে সৈয়দরা শোকে বেসামাল হ'য়ে পড়তে পারে।

—কিন্তু কলেজে পড়বার মতো অত বড় ছেলে সৈয়দদের কারো নেই।

কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হ'ল, সৈয়দদের ছেলেটা মারা গেছে ; হিন্দুরা এ রকম করছে কেন ? সব দোষ মুসলমানের না ? শিক্ষার একটু দরকার হ'য়েছে,—প্রভৃতি কথা গ্রামের বাইরে গুঞ্জরিত হ'তে হ'তে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

শুধু কথা নয়। আশঙ্কাও এল।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে প্রথম কলকের তামাক টানছেন সান্ন্যাল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কচি মেয়েছেলের কান্না ভেসে আসতে লাগল কানে। কি হ'ল কার ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, সান্ন্যাল-গিন্নী অন্দর ও সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

—কি হ'ল ?

—বিপদই হ'য়েছে। এখন রাখি কোথায় বল।

—কে ?

—বুড়ীর নাতনী। কাল রাতে ওরা শুধু ভয় দেখাতে এসেছিল, আজ রাতে যদি দরজা খোলা না পায় আগুন দেবে।

সান্ন্যাল ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বললেন,—আমি কি করব বলো, আমার কি ক্ষমতা আছে।

—তাই ব'লে ওরা চলে যাবে ; আহা, মানুষের মেয়ে তো !

বুড়ী আর বুড়ীর নাতনী সবুজ গাছের পাতাটাতা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে খেয়ে আসে দিনের বেলায়। বিকেল থেকে সান্ন্যালদের পুরানো অন্দরের কোন ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। আর যা হ'ক, সান্ন্যালদের পাথরের ভিতে আগুন দেবার কসরৎ গ্রামের ওস্তাদরা জানে না।

কিন্তু এত সহজে রেহাই সান্ন্যাল কোনদিনই পান না। দু তিন দিন পরে একজন অচেনা লোক এসে উপস্থিত। কালো ময়লা গায়ের রং, পরনে একখানা লাল ছেঁড়াখোঁড়া পাটের কাপড়, গলায় কালচে ময়লা সূতোর একটা ফের আর অসংখ্য রুদ্রাক্ষের একটা মালা, কোলে লাল গামছায় মোড়া একটা কি।

—কে ? থাক্ থাক্।

প্রণাম শেষ করে লোকটা বলল,—আমি, কর্ত্তা, নন্দীপুরের বিষ্টু আচার্য্যি। দশখানা গাঁয়ের লোক আমাকে গুরু গোঁসাই ব'লে জানে। জাতিতে ব্রাহ্মণ।

—নমস্কার, আপনার কি করতে পারি আমি ?

—আজ্ঞে আপনি নয় তুমি ; আমার বাবা আপনার বাবার বিশেষ ভালোবাসা-ছোদ্দার পাত্র ছিলেন। অগতির গতি আপনার কাছে এলাম, এটাকে ছে-চরণে রাখুন, এই কাষ্ঠখানাকে।

এই বলে গামছায় ঢাকা জিনিসটা সান্ন্যালের পায়ের কাছেই নামিয়ে দিল।

ঢেঁকির মতো চেহারার একখানা ছোট কাঠ, সূঁচাল মাথার দিকে একটা ছোট ত্রিশূল লম্বভাবে পোঁতা, এটার গায়ে হেলান দিয়ে একটা বড় ত্রিশূল, দু তিনটে সরু সরু বেতের কোঁড়া। তেল-সিঁদূরের একটা পুরু স্তর পড়েছে কাঠখানার উপরে। সান্ন্যাল চেনেন, একে এরা 'পাট্‌বান্' বলে, মহাদেবের প্রতীক। চড়কের দিন এর পূজো হয় ; একে খুসি করবার জন্য এরা না খেয়ে থাকে, কাঁটার জঙ্গল সারা গায়ে বিঁধিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বেণ্টিঙ্কের প্রণীত আইন উপেক্ষা ক'রে জিভ ফুঁড়োয়, পিঠ ফুঁড়োয়, তাড়ি খায়, অশ্লীল চীৎকার করে ; এর কাছে গোপনে সলজ্জ মানত করে গ্রামের নোতুন বউ ; রুগ্ন মৃত্যুমুখী সন্তানের মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এর সামনে। মানুষের বর্ব্বর অমার্জ্জিত মনের প্রতীক, তবু মানুষের ধ্যানের প্রতীক।

—ছি ছি এ তোমাদের ঠাকুর, আমার পায়ের কাছে নামালে।

লোকটি অবশ্য আশ্রয় চায়। বলল—তার গাঁয়ের লোকরা বড় ভয় পেয়েছে, এই কাঠখানা ওদের কামড়ায় কিনা জানা যায় না কিন্তু এর পরেই ওদের রাগ। গ্রামের লোকরা বলেছে—ঠাকুর নিয়ে পালাও গোঁসাই গাঁয়ে শান্তি আসবে।

সান্ন্যাল শুনেছিলেন নন্দীপুর গ্রামে নমশুদ্র, কৈবর্ত্ত জেলে মিলে পাঁচ ছ'শ ঘর হিন্দু আছে, শুনেছিলেন ওরা সাহসী। বিরক্ত হয়ে বললেন—যাদের ঠাকুর তারা যদি ভয় পেয়ে কাছে না রাখে, আমি রাখতে গেলাম কেন ?

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলে ঘুম ভেঙে উঠে সান্ন্যাল তামাকের চেষ্টায় বাইরে এসে দেখেন লোকটা যায়নি। বারান্দায় উঠে বসে কাঠের থামে গা ঢেলে দিয়ে ঢুলছে।

এর পর চাল ডাল নিয়ে সান্ন্যাল-গিন্নীকে আবার রান্নাঘরে যেতে হ'ল। উপায় কী, একটা লোক না খেয়ে থাকে।

সান্ন্যাল বুঝতে পেরেছেন বিশ পঁচিশ জন যারা এসে তাঁর পুরানো ইঁটের স্তূপে আশ্রয় নিচ্ছে তারা ঠিক তাঁর আশ্রয় চায় তা নয়, তারা হিসাব করেছে খড়ের ও বাঁশের

তৈরী ঘরে আগুন যত তাড়াতাড়ি লাগে ইটের বাড়ীতে তত নয়, হোক ভাঙা চোরা সাপের আড্ডা।

একদিন ওদের কয়েকজন বলল,—লাঠি বানাই, কর্ত্তা, হুকুম দেন তো সড়কি ফালাও বানাই। মরতে হয় লড়ে মরি।

—ওসব এ গাঁয়ে কিছু হবেনা।

—পোস্তুত হই।

—তা যা ইচ্ছা হয় কর।

দু' তিন দিনের মধ্যে বিশ পঁচিশ জন মিলে বাঁশের ঝোঁপগুলি সাবার ক'রে ফেলল। অনবরত বাঁশই কাটছে, বাঁশই চাঁচছে, কিন্তু বাঁশ চাঁছার চাইতে বোধ হয় ওদের আনন্দ হল্লা করায়; রাস্তায় মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হল্লা করে আলোচনা করে কোনটায় সড়কির কলম হবে, কোনটায় ধনুকের কামানি হবে।

বাইরে ইতিমধ্যে রটে গেছে সান্ন্যাল পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবী আনিয়েছেন, লড়াই-এর জন্যে ভালোভাবে তৈরী হলেই মুসলমানের পরে হামলা দেবেন। সান্ন্যাল শুনে হেসেছিলেন—পাগল, ওরাও পাগল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাটাই ভাবছিলেন, তার মনে হল এ রকম আতঙ্কিত হওয়া ভালো নয়। আতঙ্কে মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। গ্রামের খুলু নসির শা' যাচ্ছিল তেলের ভাঁড় হাতে, সান্ন্যাল ডাকলেন, নসির শুনে যা।

নসির শুনল না, দৌড়ে পালাল না বটে, লম্বা লম্বা পা দুটি এমন অস্বাভাবিক করে ফেলতে লাগল যে সান্ন্যালের হাসি পেল। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ! পাগল।

কিন্তু পাগল নয় তার প্রমাণ দুদিন না-যেতেই হ্যাটকোট পড়া ছোট হাকিম দারোগাকে সাথে করে গ্রামে এলেন; সোজা সান্ন্যালের বাড়ীতে গেলেন।

—লুক হিয়ার সান্ন্যাল।

দারোগা একটু গলা নিচু করে বললেন,—সান্ন্যাল নয়, ইন্দুবাবু বলুন।

হাকিম ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—হোয়াট! (অর্থাৎ হাকিমকে হিসাব করতে হবে কথা বলতে!)

যাক সে কথা, হাকিম বললেন—আমি শুনতে পেয়েছি You are fomenting trouble. গ্রামের ছোটলোকদের জোট করে লাঠি সোটা তৈরী করে মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায় আছেন। I definitely give you to understand এ সব আমি সহ্য করব না।

—আপনি ঠিক সঠিক খবরটা পাননি। জিজ্ঞাসা করুন ওদের উদ্দেশ্য কি।

—হ্যাঁ, ওরাই আমাকে বলেছে।

—ওরা ? ওরা বলেছে ওরা লাঠি তৈরী করছে ? তৈরী হয়তো করছে, কিন্তু কেন ?

—আমি জানতাম জেরার মুখে মিথ্যা টেঁকে না। বদমাইস কোথাকার।

হাকিম চলে গেলেন, গ্রামের লোকরাও ফিরে গেল, আশ্রিতরা অন্দরে গেল। সান্ন্যাল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বসে আছেন, ফরাসের উপরে। বদমাইস! সান্ন্যাল হাঁপাতে লাগলেন, বদমাইস! গ্রামের লোকরা বলেছে, আশ্রিতরা বলেছে তিনি লাঠি নিয়ে তৈরী হচ্ছেন দাঙ্গার জন্য। তিনি ? আতঙ্কে মানুষ দিশেহারা হয়, অবক্তব্য কথা বলে, অকর্ত্তব্য কাজ করে ; কিন্তু বদমাইস!

খবর পেয়ে সান্ন্যাল-গিন্নী ছুটে এলেন, সান্ন্যালের সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া মাথাটা বুকের উপরে চেপে ধরলেন, ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে বলে লজ্জা হলনা, বললেন—দৌড়ে পাখাটা নিয়ে আয়, বাবা।

গ্রামের থেকে সরে যাবার পক্ষে এই যথেষ্ট ধাক্কা ; কিন্তু যা ঘটে সে আরও বেশী, সান্ন্যালকে আর একটা আঘাত পেতে হ'ল। মানুষে তাঁর বোধ হয় তবু খানিকটা বিশ্বাস অবশিষ্ট ছিল, সেটাও নিভে গেল।

সেই বুড়ীর নাতনী একদিন রাত্রিতে কেঁদে উঠল আবার ; এবার সান্ন্যালবাড়ীর নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই। সান্ন্যাল শুনলেন, বললেন,—বাইরের কেউ এসেছিল ? কে বলল,—না।

ভগবান গ্রামকে রক্ষা করুন সান্ন্যালদের রাগের হাত থেকে, যে রাগ একশ' বছর ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমিয়ে থাক। সান্ন্যাল ঘরে ফিরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন,—ভগবান, ভগবান, মানুষ হেরেছে, হার স্বীকার করেছে, আর কেন।

আগষ্ট গেল, সেপ্টেম্বার গেল, গোটা '৪৬ খৃষ্টাব্দ গেল ; বিহারের জন্য হ'ক বা অন্য একশ' কারণের যে কারণেই হ'ক গ্রামে দাঙ্গা হয়নি। লোকগুলি যেমন ছিল তেমনি আছে কিন্তু একটা বিষয় স্থির হয়ে গেছে সান্ন্যালরা গ্রাম ছাড়ছেন।

সেদিন সনাতন বৈরাগী এসে বলল, আর কত দেরী, দাদা ?

—হয়ে এল।

—এতদিন পরে অন্তরীণ থেকে মুক্তি পাবেন।

—আমি গেলে তুই যেন বাঁচিস।

—সত্যি তাই, অন্তত কথা বলার লোক এক আধজন পাবেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই চিঠি লিখল বড়ছেলে : বাবা, তোমার বাড়ী তৈরী শেষ। এখন আমরা অনায়াসে সুভাষনগরের বাসিন্দা বলতে পারি নিজেদের। জমিদার নয়, জলে ভেজা পচা গুঁড়ি নয় গাছের, সবুজ বেতের গাছ, সাধারণ মানুষ। আমার মনে

হয় তুমি এখানে এলে ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান না হ'ক অন্তত একজন কমিশনার হতে পারবে। আর একটা কথা, আমার মার কষ্ট বোধ হয় এতদিনে গেল; আর বোধ হয় তাঁকে বন্দিনী লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবেনা। আলো বাতাস, মানুষ সবাই আছে। তোমার বাড়ীর সামনে ছোট একটা বাগান আছে, বাগানের ভেতরে একটা বেদী বাঁধিয়ে নিয়েছি। হঠাৎ কোনদিন রাত্রি শেষ হবার আগে যদি তুমি সেটায় বসে সেতার বাজাও। আমার মনে হয় তোমার পুরানো সেতারের খোলটা আনা ভালো যতই পুরানো হ'ক, রঙ চটা হ'ক। এবার আমি শিখব। বিশ বছর আগে আমি আনন্দ পেতাম না, জোর করে তুমি শেখাতে চেয়েছিলে বলেই হয়তো। এখন আর বুরুং বুরুং বলে হাসব না, শিখব।

দেখ আসল কথাই বলা হয়নি, বলেও শেষ হয় না। আমরা স্বাধীন হব! স্বাধীন —যে স্বাধীনতা পাবার জন্য তুমি কলেজ ছেড়েছিলে ছোটবেলায়; সেই আশা...। একটা ব্যাপার যেন ভালো হলনা; বাংলা দেশ ভাগ হয়ে গেল। তা হ'ক, স্বাধীনতা আসুক আবার বাংলা এক হবে।

যদি পার শ' পাঁচেক টাকা পাঠিও, কন্ট্রাক্টর একটু তাগাদা দিচ্ছে।

সান্ন্যাল পড়ে হাসলেন, খুসিও হলেন, সকালের হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ যেমন খুসি হয়। বহুদিনের পুরানো ম্যালেরিয়ার আসবার দিন কেউ যদি বলে আজ জ্বর আসেনি, তেমনি।

২৮-এ জুলাই ছেলে এসেছে নিয়ে যাবার জন্যে,—স্নান আহারের পরে গল্প হচ্ছে। ছোটছেলে বলল,—আচ্ছা, হিন্দুস্থান, পাকিস্থান তো হল, আমাদের এ গাঁ তো পাকিস্থানে পড়ল।

—না তা হল না। হ'ল ভারতবর্ষ আর পাকিস্থান, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি রচনা হচ্ছে।

—পাকিস্থানেও তো হিন্দু থাকল, তারা কি করবে?

—কি আবার করবে।

হাসতে হাসতে ছোটছেলে বলল,—বসে বসে থাকবে, না-খাওয়ার মতো খাবে, শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান হবে।

—বলিস কিরে নিজের ধর্ম, নিজের কৃষ্টি কেউ ত্যাগ করে?

—কৃষ্টি!

ছোটছেলে হাসতে হাসতে কোন্ কোন্ মাল গুডস্‌ে বুক করা হবে তার ফর্দ্দ করতে বসল। বড়ছেলে চট দিয়ে আসবাবপত্র প্যাক করার বন্দোবস্ত করছে। ছোটছেলে সারা মুখে দুষ্টুমির চিহ্ন নিয়ে এসে দাঁড়াল কাছে, বলল—আচ্ছা এই সব মূক সহায়হীনদের তোমরা রেখে যাচ্ছ, কাদের দিকে চাইবে এরা, এই দেড়কোটি পাকিস্থানের বাঙ্গালী হিন্দু;

তোমরাও যাচ্ছ সহায়হীন যাদের প্রাণ, দুর্গত যাদের চোখের মণি।

বড়ছেলেও হাসল,—যা, যা, এসব পরে হবে। এখন রসিকতা রেখে বাসনগুলি গুছিয়ে দেগে।

পরদিন সকালে বড়ছেলে বলল,- আচ্ছা মা, বাবা নিজের খাটখানা রেখে যেতে বলছেন কেন? অমন সুন্দর খাট, সেকেলে মেহগ্নির জিনিস।

—উনি বললেন, ওঁর বাবার খাট নিয়ে যাবার কোন অধিকার নেই।

—তা হ'লে বদ্ধ ঘরে উইয়ের গহ্বরে যাবে ধীরে ধীরে?

—কি জানি বাপু, যার জিনিস সে যদি ফেলে যায় তোর কি মাথা ব্যথা।

—বলো না হয় বাবাকে।

— না রে ওঁর মনটা এমনি ভালো নয়, মুখটা থম থম করছে বলে মনে হয়।

—কেন, পুরানোকে ছাড়বার মায়া?

—তা যেন নয়।

তার পরদিন দুপুর বেলায় বড়ছেলে সান্ন্যালকে বলল,—আপনি নাকি আজ যাওয়া নিষেধ করেছেন?

—হ্যাঁরে, দিনটা ভালো নয়।

—বাহ্, আপনি তো বলেছিলেন, মহেন্দ্রযোগ আছে।

কেমন একটু হেসে সান্ন্যাল বললেন,—তুই কি মহেন্দ্রযোগ মানিস? কাল গেলেই হবে, বস।

বড়ছেলে বসল। অনেকক্ষণ ধরে তামাক টেনে সান্ন্যাল বললেন,—ভাগটা এ রকম হ'ল কেন বুঝলাম না যেন রে। শরৎবাবু যা বলেছিলেন তাও কি করা গেল না।

—কি করে হল। প্রস্তাবটা যে খুব বেশী যুক্তির বলে মনে হল না লোকের কাছে।

—তোরাও তো কোনদিন আর এসব দিকে আসবি না, তাই নয়?

—আমরা লিখে দিয়েছি, ভারতীয় ইউনিয়নে চাকরী করব।

—আচ্ছা, নড়াল নাটোর এসব জমিদার, মুক্তাগাছা সুসঙ্গ এঁরাও যাবেন?

—কে যাবেন, কে যাবেন না বলা কি করে যাবে, তবে সবাই তো স্বাধীনতার স্বাদ চায়, সেটাই স্বাভাবিক।

সান্ন্যাল উঠে ঘরের কোনে যেয়ে তামাক সাজতে বসলেন।

—আচ্ছা এখনই না যেয়ে, ধর, যদি দু' একদিন পরে যদি যাই, এযেন—

—পালান হ'ল? কিন্তু থেকেই বা তুমি কি করবে? উপকার?

সান্ন্যাল তামাকে ফুঁ দিতে দিতে ভাবলেন, না যেতে হবেই। এই কদর্য্যতার অপরিসীম

এই অমানবতার গহ্বরের বাইরে। ছেলে যখন উপকার কথাটা বলল তখন সেটা ঠাট্টার মতো শোনাল যেন।

বড়ছেলে এসে দাঁড়াল কাছে তখন সবে সকাল হ'য়েছে,---শুনলাম, এবেলা যাওয়া হবে না, বলেছ।

—হ্যাঁ। বস। তোর মাকে রান্নার যোগার করতে বলেছি। সন্ধ্যা বেলা যাব।

সান্ন্যাল ছেলে আসবার আগে কি ভাবছিলেন, বললেন,—দেখ, আসলে ওরা বোকা, লোক খারাপ নয়। ওদের ব্যবহারের কথা বলছি, তা দোষ ওদের নয় সবটুকু। আমাদের মনের গর্ব্বটা আঘাত পায়। জমিদার নই, অথচ জমিদারের প্রাপ্য সম্মান আশা করি খানিকটা, তাই অপমান বোধ হয়। সাধারণের পর্য্যায়ে নেমে গেছি অনেকদিন পূর্ব্বে, ওরা সাধারণ হিসাবে ব্যবহার করে সেটা খুবই স্বাভাবিক। আর খারাপ ব্যবহার ওরা তো সকলের সাথেই সকলে করছে। আত্মাভিমানে আঘাত লাগে ব'লে ওদের ব্যবহারকে বিদ্বেষ ব'লে মনে হয়। কি ছেলে মানুষ দেখ, চোখের সামনে জমিদারের পরিণতি দেখেও মহিম নোতুন করে জমিদার হবার চেষ্টা করছে।

দুপুর বেলায় সান্ন্যালকে বাসায় পাওয়া গেল না। সান্ন্যাল তখন গ্রামের রাস্তায় খুব ব্যস্ত ভাবে ঘুরছেন। বাগ্দী-পাড়ায় এসে একজন মোড়লকে পাকড়াও ক'রে বললেন,—তোমরা বড় বেকুব। বাড়ীর বেড়া পড়ে গেছে দেখ না? মেয়েছেলে নিয়ে বাস কর, এত বেআব্রু কেন? বিপদ হ'তে কতক্ষণ?... তা দরকার হ'লে আমার বাড়ীতে যেয়েও থাকতে পার।

ওরা জানে সান্ন্যাল যাচ্ছেন, মোড়ল পায়ের কাছে ব'সে পাওনা প্রণামটা দিল।
—আর দেখ, মোড়লের বেটা, যদি নন্দীপুর থেকে বিষ্টু ঠাকুর পাটবান্ নিয়ে আবার আমাদের বাড়ীতে এসে ওঠে, তাড়িয়ে দিও না যেন।

সান্ন্যাল কেমন ক'রে হাসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গোরুর গাড়ী দুটি ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছে। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। গাড়ী অনেকক্ষণ থামবে! ভিড় বলতে কিছুমাত্র নেই কাজেই সকলে সহজ হ'য়ে কথাবার্ত্তা বলছে।

—এতদিনে বোধ হয় শাপমুক্তি হ'ল,—বড় ছেলে বলল।

সঙ্কোচের স্বরে সান্ন্যাল বললেন,—কিন্তু ওরা একা থাকল রে?

গাড়ীটা হুই শব্দ ক'রে একটা একটানা হুইস্ল্ দিয়ে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে ষ্টেশনে ঢুকল।

বড়ছেলে সান্ন্যালের কথা শুনতে পায় নি; বলল,—কিছু বল্লে?

তারপর কুলিদের ডেকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনত্রিশ

ঠাণ্ডা হয়ে থাকার দরুণ মাসখানেক রেয়াত পেয়েছে তামসী। মাস এগারো পর বেরুল সে জেল থেকে।

সে দাগী, তার গায়ে পূর্ব-অপরাধের ছেঁকা লাগানো। তাই তার শাস্তিটা একটু বেশি হয়েছে। আগে সে ছিল ডাকাতের দেশের মেয়ে, এখন হয়েছে চোরের ঘরের কুড়ুনী।

এখন যদি দেখতে একবার তামসীকে। শুকিয়ে আদ্ধেকের আদ্ধেক হয়ে গিয়েছে। কাঠ বেরিয়ে পড়েছে—চোয়ালের, কণ্ঠার, কোমরের, আঙুলের প্রত্যেকটি গিঁটের। আঙরে গিয়েছে চেহারা, যেন বেরিয়ে এসেছে কোন নির্দয় বিভীষিকা থেকে। জীবনকে দেখে এসেছে আরেক চোখে। সেখানে শুধু পাপ আর বীভৎসতা। আশার এতটুকু অবকাশ নেই, নেই এতটুকু বিশ্বাসের নীলাকাশ। যেন, এ পথে যখন একবার এসেছে, এ পথেই চিরকাল চলবে, আরো ক্লান্তিকর পঙ্কিলতায়। জীবন আর তাদেরকে আশ্রয় দেবে না, দীপ দেখাবেনা, শোনাবেনা আশ্চর্য কোন দৈববাণী। ছাড়া পেলেও আবার ফিরে আসবে এখানে। শোণিতপায়ী সাপ বুকের মধ্যিখানে বিঁধিয়ে রেখে অন্ধকারের এক কোণে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরবে।

ভালোই হয়েছে। সমস্ত অন্তর ঢেলে স্বীকার করেছে তামসী। ভালোই হয়েছে। মনের কোণে কোথায় যেন একটু অহঙ্কার ছিল, অভিমান ছিল, সে বড়, সে উঁচু, সে পবিত্র—সে সামান্য গয়না-চোর নয়, সে দেশের জন্য জেলে গেছে, আদর্শকে সে নত হতে দেয়নি—নিঃশেষে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে সে-অহঙ্কার, মুছে গিয়েছে সে কৌলীন্যের রাজটীকা। ভালোই

হয়েছে। আগে তার আকুলতার মাঝে মহানুভবতার ভাব ছিল, স্নেহের মাঝে নির্মল অনুকম্পা। তাকে সে কৃতার্থ করবে এমনি অনুগ্রহের প্রস্রবণ। সেবকবাৎসল্য। বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে-উৎসমুখ, সেই করুণার অভিষেক। ভালোই হয়েছে। আগেরবার সে জেলে দেখে গিয়েছিল আশা, প্রতিজ্ঞা, জীবনের প্রতি প্রমত্ত আক্রমণ; এবার দেখে যাচ্ছে সে পাপ, হতাশা, জীবনের উপর প্রবল অনাসক্তি। ভালোই হয়েছে। তার আর কোন মোহ নেই, কুসংস্কার নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই, উপেক্ষা নেই। রুচি নেই, বিতৃষ্ণা নেই। তার পৃথিবী অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, রাজপথ থেকে অন্ধ গলিতে, অন্তঃপুর থেকে পরিত্যক্ত ফুটপাতে--বেড়ে গিয়েছে তার স্বাধীনতা, কূলহীন আবিল জলস্রোতে, অন্তহীন আশ্রয়হীনতার মধ্যে। লজ্জা নয়, ভয় নয়, নয় নয় অশ্রদ্ধা।

কেউ নেই আর আজ ফটকের বাইরে। শুধু বিকলাঙ্গ জীবন তিক্ত মুখে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। কলকাতা যাবার রাহা-খরচ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে—একটা খবরের কাগজ কিনল তামসী। লণ্ডনে প্রচণ্ড বোম-বর্ষণ হচ্ছে। ইংরেজ এবার হারবে। স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ। আর কোন খবর নেই, শুধু এ খবরে উত্তেজনা খুঁজল মনে-মনে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল তাতে তার কী। তাতে তার কী কৃতিত্ব!

তার কৃতিত্ব শুধু সংগ্রামে। এই স্তূপাকার পঙ্গুতার বিরুদ্ধে। সংগ্রামেই তার শুদ্ধি, তার মুক্তি, তার সার্থকতা। তার আশ্রয়-আয়োজন।

'সংগ্রাম চাই, আপোষহীন সংগ্রাম। এ আমাদের আপোষের মামলা নয়, রফানিষ্পত্তি করে এর মিটমাট হয় না। এ লড়াই করে ছিনিয়ে নেবার মামলা।' সামনের মাঠে কে বক্তৃতা দিচ্ছে: 'আপোষ করে যা পাওয়া যায় তা দুধ নয় ঘোল, সোনা নয় রাংতা। কাঁটা নেব না আমরা, মাছ নেব। দুষ্টু গরু নেবনা আমরা। দুষ্টু গরু থেকে আমাদের শূন্য গোয়ালও ভাল—'

মাঝে একবার জেল-বদল হয়েছিল তামসীর। এটা আরেকটা শহর, একেবারে অজানা। কিন্তু এই শহরে, এই মাঠের মধ্যে, পৃথিবীতে এত লোক থাকতে, ভবদেবকে বক্তৃতা দিতে শুনবে সে কল্পনাও করতে পারত না। ইতিমধ্যে দেশের অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে দেখছি। ঠিক দেখছি তো দূর থেকে?

মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল তামসী। হ্যাঁ, ভবদেবই বটে। আগুনের মত বক্তৃতা দিচ্ছে।

'হাত থাকতে জগন্নাথ হয়ে থাকবনা। চক্র ধরব কৃষ্ণের মত—'

ভবদেব কি বেরিয়ে আসতে পারে সহজে? সঙ্গে প্রশংসমান জনতার হুল্লোড়। তবু একপাশে দাঁড়িয়ে তামসী তার মুহূর্তটির অপেক্ষা করতে লাগল।

'এ যে, তুমি ? তুমি কোত্থেকে ?' ভবদেব প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

'বিস্ময়টা আমারও কিছু কম নয়।'

'এ কী চেহারা হয়ে গিয়েছে তোমার ? ব্যাপার কী ?'

'বা, জেল থেকে বেরুলাম যে আজ।' তামসী দমলনা এতটুকু।

'জেল থেকে! ও, হ্যাঁ ' ভবদেবের চাউনিটা কেমন কুণ্ঠিত হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে তাতে মিশল এসে বেদনার কুয়াশা, মমতার মাধুরী। সমর্পিত চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'তাই বুঝি আগ বাড়িয়ে যান নি আজ আর গাড়ি নিয়ে!' তামসী হাসল: 'একেবারে অচ্ছুৎ হয়ে গেছি, তাই না ?'

'জানিনা। কিন্তু এটুকু দেখতে পাচ্ছি ঠিক দিনটিতে তোমার সঙ্গে আমার ঠিক দেখা হয়ে যায়। তোমার মুক্তির দিনটি আমারো জীবনে একটি বড়-দিন নিয়ে আসে।'

'একটা গাড়ি ডাকুন।'

ভবদেব একটা সাইকেল-রিকসা ডাকল। বসল পাশাপাশি, পরিচ্ছন্ন ঘনিষ্ঠতায়। তামসী তার অস্পৃশ্য নয়, বিসর্জনের জিনিস নয়। বলতে কি, সেই তার জীবনে বিদ্রোহের প্রথম বিদ্যুৎরেখা এঁকে দিয়েছে। দিয়ে গিয়েছে মর্মরব্যাকুল অরণ্যের অস্থিরতা। ক্ষণকাল ঘরে এসে ঘরছাড়ার বংশীস্বর।

মাথার উপরে ঢাকনিটা তুলে দিল না কেউ। গায়ে মুখে চোখে পরিচ্ছন্ন রোদ পড়ুক।

'রাজার বিচারে দণ্ড পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আর নিজেকে নির্দোষ বলা যায়না, না ?' তামসী বললে ক্লান্তের মত।

'জানিনা। কিন্তু সত্যের দরজায় আগড় নেই। যা সত্য তা একদিন ঠিক দেখা যায়।'

'মিথ্যে কথা। তাই আজকের দিনটাকে আমার মুক্তির দিন বলবেন না। আমার আর মুক্তি নেই।'

'আছে।'

'আছে ?' চমকে উঠল তামসী।

'হ্যাঁ আছে। মুক্তি হচ্ছে স্রোতে, সংগ্রামে। বিপন্ময় জীবনের দুর্দমতায়। শুধু এগিয়ে যাও, যুদ্ধ করে যাও, বিশ্বাসের নেহাইর উপর জীবন পুড়িয়ে এনে কাজের হাতুড়ির ঘা মারো। তাতেই তোমার মুক্তি, তোমার দহনের পবিত্রতা।' বক্তৃতার জের মেটেনি বুঝি ভবদেবের: 'যে চোখ আজ তোমার লজ্জায় ঝাপসা হয়ে আছে, কাল আবার সেই চোখ গর্বের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আজকের দিনটা সত্য নয়, সত্য হচ্ছে সেই আগামী কাল।'

তামসী ম্লান মুখে বললে, 'সেই আগামী কাল আর আসেনা কখনো। যে একবার চোর সে চিরকালই চোর।'

না, আসে। এই ধরো সে নিজে। কী ছিল সে? সামান্য মাইনের কলেজের মাষ্টার। যা পেত তা দিয়ে সংসার চলত না, ডাইনে আনতে বাঁয়ে ফুরিয়ে যেত। সমাজের চোখের সামনে লজ্জিত মুখ করে বসে থাকত গোবেচারা হয়ে। কিন্তু আজ? আজ তার সংসারিক অবস্থা আরো নেমে গেছে। কিন্তু তার আনন্দের তার শক্তির তার গর্বের আর অবধি নেই। কেন, জিগগেস করছ? বুঝতে পারছ না? সে চলে এসেছে বৃহৎ সংগ্রামের মধ্যে, প্রচণ্ড বিপদের সামনে। প্রকাণ্ড সার্থকতার আবিষ্কারে। সেইটেই তো মুক্তি।

আরো খোলসা করে বলতে হবে? এক কথায়, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। ছাড়িয়ে দিয়েছেও বলতে পার। উগ্র রাজনৈতিক মতামতওয়ালা মাষ্টার কলেজের পক্ষে নিরাপদ নয় এই নিয়ে বিরোধ বাঁধল। মতামতগুলি ছাঁটতে-কাটতে পারলুম না। নিজেই কাটা পড়লুম। বেরিয়ে এলুম সেই কুম্ভীপাক থেকে। ভাবলুম, চাকরিটাকে বড় করতে পারবনা, কিন্তু ছবিটাকে বড় করি। চাকরিহীন জীবনে ছোট ছোট দুঃখ তো এমনি পাবই, কিন্তু বড় কাজের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখটাকেও বড় করে দেখি।

'কিন্তু কাজটা কি?' তামসীর প্রশ্নটা কেমন রুক্ষ শোনাল।

'সম্প্রতি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো। এই যুদ্ধটা যে আমাদের নয় সেইটেই প্রচার প্রমাণ করা। আমাদের যুদ্ধটা কী ও কার বিরুদ্ধে সেইটেই দিবালোকে প্রত্যক্ষ করে দেখানো। শুধু দেখানো নয়, ধনুকে জ্যা আরোপ করা, খড়গকে নিয়ে যাওয়া হননের উদ্যতিতে।'

'সে তো খুব উঁচুদরের কথা হল, কিন্তু সংসার চলছে কি করে?'

'চলছে না। ছুটকো জার্নালিজম করি। অনটনের অন্ত নেই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা সেই অভাবটা অনুভব করি না। আগে-আগে শুধু নিজের দারিদ্র্য দূর করতে চাইতাম, নিজের দুঃখটাই বেশি করে বাজত; এখন দেশের দারিদ্র্য দূর করতে চাই, তাই নিজের দুঃখটা আর দেখতেই পাইনা। আশ্চর্য, আমি কি করে যে এই মোড় ঘুরলুম, কি করে যে এই স্বাদ পেলুম জীবনের, বুঝতেই পারি না। তাইতো ভগবান মানতে সাধ হয় মনে-মনে। একদিন মনে আছে –'

'বলুন। ভাবছেন কী?'

'ভাবছি বলব কিনা।'

'বা, বলবেন বৈ কি।'

'একদিন মনে আছে তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে গাড়ি করে, আমি চুপচাপ রোয়াকে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হল, শুধু মুহূর্তের জন্যে মনে হল, যেন একলাফে উঠে পড়তে

পারি গাড়িতে, তোমারই মতো বেরিয়ে পড়তে পারি। তুমি আমাকে শান্তির বন্দর থেকে নিয়ে যেতে পার উত্তাল তরঙ্গমালায়।'

'কিন্তু, মনে রাখবেন,' তামসী হাসল: 'এ গাড়িতে কিন্তু আপনি আমাকে এখন নিয়ে যাচ্ছেন। আর নিয়ে যাচ্ছেন শান্তির বন্দরে। কল্যাণী কেমন আছেন?'

চমৎকার আছে। দেখেই বুঝতে পারল তামসী। অবস্থা আরো নেমে গেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভিযোগ করছে না। তার স্বামীর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ করছে যে সমস্ত দেশের প্রতি অন্যায়। স্বামীকে তাই সে যুদ্ধে যেতে দিয়েছে সেই অন্যায়ের নিরাকরণে। আর এই যে সে বিশীর্ণ সংসার নিয়ে আছে এই তার সংগ্রাম। এই যে পিছন থেকে স্বামীকে পরোক্ষ প্রবোচনা জোগাচ্ছে এই তার অনুযাত্রা।

আগে-আগে নিখেকো ঠিকে ঝি ছিল একটা এবার তাও তুলে দিয়েছে। এক হাতেই সৃষ্টির কাজ করছে, কিন্তু কেন-যেন সেই আগের অনাহ্লাদ নেই। নেই সেই বিরাগ-বিরক্তি। এ আর সামান্য সংসারের কাজ নয়, এ প্রায় যুদ্ধের আয়োজন। তার মোটা মজবুত আঙুলে কর্মের যে কর্কশ সাক্ষ্য ছিল, ভঙ্গিতে ছিল যে অধিকারের দৃঢ়তা, আজকে তাতে সে অর্থ-সঞ্চার করেছে। স্বাস্থ্যটা একটু ফিরেছে মনে হচ্ছে, আর ছেলেপিলে হয়নি। সজ্ঞান শ্রম ও সংযমে, সহনে ও অধ্যবসায়ে জীবনে সে মূল্য নিয়ে এসেছে, আপাত-তুচ্ছতার আবরণ সরিয়ে। সমস্ত কাজ উপাসনা, সমস্ত কষ্ট উৎসর্গ। এ একটা কী অদ্ভুত আবিষ্কার করল তামসী।

আর, কল্যাণীই বা এ কাকে দেখছে। টিমটিমে, মরাটে, গাল-গলা-ভাঙা কুৎসিত একটা বুড়োটে মেয়ে, খালি পা, মাথার চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনের শাড়িটা ধুলো-ওড়ানো। পাপের ছোপ লেগেছে মুখে, সারা গায়ে যেন কলঙ্কের ছিপটি। কে এই অনামুখী, বাসি উনুনের ছাই!

'চিনতে পাচ্ছ না?' জিগগেস করলে ভবদেব।

চিনতে পারছে বৈ কি। চিনতে দেরি হচ্ছে।

'তামসী। সেই যে—' কী ভাবে পরিচয় দেবে ভবদেব যেন হোঁচট খেল। বার্নিশ দিলে কথাটায়: 'এইখানেই ছিল কোথায় ঘাপটি মেরে, আজ বেরিয়ে এসেছে।'

'তা এখানে কেন?' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কল্যাণীর।

তা এমন আর সে কী অন্যায় বলেছে! পরিচ্ছন্ন গৃহস্থের অন্তঃপুরে এ সব আবর্জনা কেন? আদর্শ থেকে অনেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তা ঠিক, কিন্তু এ কী ভ্রষ্টতা! পাপের অনেকরকম চেহারা আছে কিন্তু ও কী কজ্জ্বলবর্ণ নির্লজ্জতা। আপন ভগ্নীপতি, বোন

যেখানে জীবিত, আর সেই বোনেরই গয়না নিয়ে সরে পড়া। এমন কাহিনী ডাস্টবিনে-নর্দমায়ও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাহিনী কে বলে! একেবারে আইনে-প্রমাণে জলজ্যান্ত।

ভবদেব চাইল বটে কুয়াশাটাকে সৌজন্যের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে, কিন্তু সৌহার্দের আর রোদ উঠল না সমস্ত দিন। তামসী গায়ে মাখল না এই অনাদর, প্রস্তুত হয়ে আছে সে অনেক অপভাষের জন্যে, আর, ভেবে দেখতে গেলে, তার অভিমানের আছে কি। তা ছাড়া সে এ বাড়িতে ভবদেবের অতিথি, তার যত দিন খুশি থাকবে সে এখানে, যত দিন না সে একটা ধীর-স্থির ভবিষ্যতের হদিস পায়। তার গায়ের ছাল-চামড়া লোহার আস্তর হয়ে উঠেছে, তাতে অপমানের সূঁচ ফুটবে কি করে? দুরত্যয় নরকে দুর্জন সংসর্গে থেকে থেকে সে কি সমস্ত দোষস্পর্শের অতীত হয়ে যায় নি? আঘাত-অতিক্রান্ত?

কল্যাণীর বড় মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেল তামসী। কাটা-ছাঁটা দুটো জবাব দিয়ে মেয়েটি কেটে পড়ল। ছোট ছেলে দুটো তার মুখের দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যেন সে খাঁচা-ছাড়া চিড়িয়াখানার জন্তু, ভয় পাবার জিনিস। হাত ধরে কাছে টানতে গেলে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, মা রাগ করবে।

পাশাপাশি দুটি ঘর, একতলা। ও-পাশের ঘরে কল্যাণী ভবদেবকে শাসাচ্ছে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায়।

'আমি ছেলেমেয়েদের বলব কি? আগের বার তবু গলা উচু করে বলতে পারতাম। যা হোক দেশের নামটা জুড়ে দিতে পারতাম এক ফাঁকে। কিন্তু এবারে বলব কি?'

'কিছুই বলবে না। শুধু বলবে, তোদের সেই মাসি। দেশের নামটা একান্তই জুড়ে দিতে চাও, বলবে অনেকদিন ধরে দেশভ্রমণ করে এসেছে। অধস্তন অপরাধীদের সেই নোংরা জেলটাও তোমার দেশ।'

'তোমার আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়। আর লোক পেলে না, রাস্তা থেকে কুটুম ধরে আনলে। আর এমন কুটুম, সব সময় তটস্থ, কখন কী নিয়ে পালায়!' সঙ্গে হালকা একটু হাসি।

ভবদেবও হাসির ফোড়ন দিলে: 'তোমার আছে কত সোনাদানা!'

'কিন্তু ভগ্নীপতিটি তো আছে।'

ভবদেব গম্ভীর হয়ে গেল। সে-গাম্ভীর্য যেন প্রহার করল কল্যাণীকে। কল্যাণী চট করে সুর বদলাল। বললে, 'যার অধঃপতন হয়েছে তারই জন্যে ভয়, যে সূর্য আকাশ আরোহণ করছে তার জন্যে ভয় কি। ভাবছি, ছেলেমেয়েগুলো কী ভাববে। এরি মধ্যে পাশের বাড়ির জানলায় সুরু হয়েছে উঁকিঝুঁকি।'

'জানলা-দরজা বন্ধ করে দাও।'

'দরজাও? তার মানে ও থাকিয়ে বাসিন্দে হয়ে যাবে?'

'ভয় নেই। বেশি দিন থাকবে না। থাকতে পারে না। আর যদি থাকেই, রেখে দিতে পারনা? তোমার সংগ্রামের মন্ত্রে শোধন করে নিতে পারনা ওকে? ঘটাতে পারনা ওর পুনর্জন্ম? নোংরা জেলটাকে আবার তীর্থে বদলিয়ে দেয়া যায় না?'

'ভরসা হয়না আর ওকে। যে এত খারাপ, এত কু—' কল্যাণী ছটফট করে উঠল: 'না বাপু, তুমি ওকে চলে যেতে বল। আমার এই সংসারের পবিত্রতা, আমার ছেলেমেয়ে—'

'মুখ ফুটে বলতে হবে না। নিজেই চলে যাবে।' ভবদেব লিখতে লাগল যেমন লিখছিল।

শোনা যাবেনা এমন দূরত্ব নয় ঘরটার। তামসী শক্ত হয়ে রইল।

বড় বেশি অহংকার হয়েছে কল্যাণীর। ভুইঁফোড় থেকে হঠাৎ বনেদী হয়ে পড়েছে, ছিল কেউকেটা এখন একজন প্রায় কেস্টবিষ্টু। কিন্তু অত জাঁক ভাল নয়, গুমোর ফাঁক হয়ে যেতে পারে এক দিন। কে বললে সে চলে যাবে এক্ষুনি? সে এখানে থাকবে আঁট হয়ে। পষ্টাপষ্টি বললেও সে নড়বে না। সে হাড়ে মাংস গজাবে। থোকা-থোকা চুল লম্বা করবে পিঠ ছাপিয়ে। শরীরে আনবে রহস্যের ঝিলিমিলি। তার পরে একদিন রাত্রে দক্ষিণ থেকে যখন হাওয়া দেবে তখন সে ঢল-ঢল লাবণ্য নিয়ে খোলা চুলে বসবে গিয়ে ভবদেবের নিভৃতিতে। ভবদেব হাত বাড়িয়ে ধরবে সেই স্খলিত কেশগুচ্ছ। ধরবে যেন বিদ্যুৎপুঞ্জিত কালো ঝড়ের রাত্রিকে। অকস্মাৎ এতদিনে খুঁজে পাবে তার জীবনের তাৎপর্য। খুঁজে পাবে তার বিদ্রোহের প্রতিচ্ছায়া।

তখন কোথায় তুমি কল্যাণীদি? কোথায় তোমার দেশের দিক্‌দেশ?

দাও না তোমার দুটো শ্রীমন্ত শাড়ি-জামা, দাও না মাথায় একটু গন্ধতেল, দাওনা ভালো-মন্দ দুটো খেতে পেট ভরে। আর গুরুগঞ্জনাহীন দাও না একটু বিশ্রাম। একটু তরতাজা হতে দাও, হাসতে দাও মন খুলে, কলরোলের সারল্যে। তারপর পাপীয়সীর ভেলকিটা একবার দেখ।

অত সাজগোজ তপজপেরই বা কী দরকার? কে অতদিন ধরে বসে থাকবে বোকার মত? দক্ষিণ থেকে আজই তো ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে। দীর্ঘকেশী না হতে পারলে কি চিত্তহারিণী হওয়া যায় না?

'উঃ, সেই দুপুর না হতে কখন বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরলেন এই প্রায় মাঝরাতে।' সেই দিন রাত্রেই ভবদেবের পাশের ঘরে গিয়ে তামসী কাঁদুনি গাইল: 'আমি সমস্তক্ষণ শুধু ছটফট করে মরেছি।'

শুনুক, শুনুক, পাশের ঘর থেকে শুনুক সব কল্যাণী।

'কেন বল তো ?' ভবদেব ঘর্মাক্ত পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল গা থেকে।

'সমস্তক্ষণ মুখ বুজে বসে থাকা যায় ? কাল থেকে আমি আপনার সঙ্গে বেরুব, ফিরবও আপনার সঙ্গে।'

'নিশ্চয়। একশোবার।' ভবদেব যেন একথাই শুনতে চাচ্ছিল এতক্ষণ।

'কিন্তু আজ ? এখন ? এখন কী হবে ?'

'কী হবে।'

'এখন আমাকে অপনি কবিতা পড়িয়ে শোনাবেন। কত দিন কবিতা শুনিনি আপনার মুখে।'

'কবিতা।' ভবদেব হেসে উঠল। 'কবিতা কোথায়! এখন বক্তৃতা।'

'না, না, যেমন করে একদিন আমাকে পড়াতেন, তেমনি করে আবার আজ পড়ান কবিতা। পায়ে পড়ি, সেই মায়াময় পরিবেশটা আবার আমাদের চারদিককার পৃথিবীর উপর নিয়ে আসুন।'

'মিছিমিছি ছেলেমানসি কোরোনা।' প্রায় অভিভাবকের সুরে ধমকে উঠল ভবদেব। 'সৈনিকের কাছে আর কোনো মায়াময় পরিবেশ নেই, শুধু রক্তাপ্লুত বাস্তবতা।'

'আপনি কী হৃদয়হীন।'

'য়্যাপেনডিক্সের মত হৃদয়কেও বাদ দিতে হয়েছে। কবিতাও তাই নির্বাসনে।'

'তা হলে আমি এখন কী করব ?' কেমন নিঃস্ব শোনাল তামসীকে।

'তুমি ? তুমি খেয়ে দেয়ে এখন ঘুমুবে।'

'আর আপনি ?'

'আমার খাবার ঢাকা থাকবে, আমি একটা বক্তৃতা তৈরি করব।'

'লিখবেন ?'

'হ্যাঁ, খুব একটা গরম বক্তৃতা। আর সেটা তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে ?' তামসীর গা ঝিমঝিম করে উঠল।

'কাল বিকেলে একটা সভার বন্দোবস্ত করেছি, বিরাট সভা। আর তোমার বক্তৃতাটা হবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। জ্বালামুখী বক্তৃতা।'

তামসী নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'কী হবে বক্তৃতা দিয়ে ?'

'কী হবে ? সমস্ত শহরে ট্যাঁড়া পড়ে যাবে কে এই ধ্বংসসাধিকা, কে এই বিপ্লবিনী ? সভায় পুলিশ থাকবে, হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। জেল হয়ে যাবে। জয় পড়ে যাবে দেশময়।'

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল তামসী। বুঝতে পারল এক পলকে। ভবদেব আবার তাকে জেলে পাঠাতে চায়, পারে তো এই মুহূর্তে। জেলে পাঠিয়ে আবার নতুন অধ্যায় জুড়ে দিতে চায় তার জীবনে। বিপ্লবের রক্তে ধুয়ে নিতে চায় তার চুরির কলঙ্ক, চরিত্রহীনতার কালিমা। তা হলে মনে-মনে ভবদেবও তাকে মেনে নিয়েছে চোর বলে, অসতী বলে। সংস্কার-সংশোধনের জিনিস বলে।

তামসীর মাঝে ভবদেব কোনোদিন তামসীকে দেখেনি, দেখেছে একটি বিদ্রোহের দীপশিখা। সেই দীপশিখা নিবে গিয়েছে চুপে-চুপে। অঙ্গারে আবার সে অগ্নিসঞ্চার করতে চায়, লৌহমলে আনতে চায় অপরাজেয় তীক্ষ্ণতা। যেমন রণধীরের বেলায় তামসী চেয়েছিল। বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল তামসীর।

ভবদেব হাসিমুখে বললে, 'না, না, তোমার অত ভয় পাবার কিছু নেই। বক্তৃতাটা আমিই দেব। তুমি শুধু শুনতে যেও।'

ভবদেব তখুনি বসে গেল কাগজ-কলম নিয়ে জ্বালামুখী বক্তৃতা লিখতে। কবিতাভিলাষিণী তামসীর দিকে ফিরেও তাকালনা। সে পেয়ে গেছে তার বিদ্রোহী চিন্তাকে, বিদ্রোহী ভাষাকে। তার আর প্রতিকৃতিতে দরকার নেই।

ক্রমশঃ

"মানব জাতির ভাগ্য নৈতিক শক্তির উপর এমন নির্ভরশীল আজকের মতো আর কোনোদিন হয়নি। সর্ব্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই একটি আনন্দপূর্ণ ও সুখময় রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।"

আইনষ্টাইন।

জাতীয় সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

সমগ্র জীবন নিয়ে সাহিত্যের কারবার ; জীবনের কোনো একটা বিশেষ দিক নিয়ে নয়। আত্মবিকাশের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে তার, সবগুলিকে নিয়েই সাহিত্যের পরিধি—এবং পরিপূর্ণতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সৌন্দর্য্যনীতি, এগুলি জীবনের এক একটা খণ্ডিত অংশ। কিন্তু সাহিত্য সব কিছুর মিলিত আবেদন দিয়ে গড়া একটা অখণ্ড সত্তা। বিভিন্ন আবেগের রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার ফলে পুষ্ট সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড।

ঠিক এই অর্থে বিচার করলে জাতীয় সাহিত্য ব'লে কোনো আলাদা কথা হ'তে পারে না। যথার্থ পদবাচ্য সমস্ত সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য এবং একই কালে তারা আন্তর্জ্জাতিক। সাহিত্যের অঙ্গনে জাতীয়তা এবং আন্তর্জ্জাতিকতায় খব বেশি তফাৎ নেই। থাক্‌লেও সেটা শুধু বিশ্লেষণবাদীর দৃষ্টিতে ধরা পড়বার মতো বিষয়। রসানুসন্ধানীর চোখে তা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেরই এক একটা বিশেষ যুগকে খণ্ডিত ভাবে বিচার করা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে সেই বিশেষ যুগের সাহিত্যে জাতীয় চিন্তা ও চরিত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা পরিস্ফুট হ'য়েছে যার সাহায্যে অনায়াসে ব'লে দেওয়া যায়, এই যুগটি অন্য আরেকটা যুগ থেকে পৃথক এবং এই এই বিষয়ে পৃথক। শুধু দুটি ভিন্ন যুগের মধ্যে পার্থক্যবিচারেই নয়, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যবিচারেও এই প্রক্রিয়া অনুরূপ ফলপ্রদ।

এলিজাবেথীয় যুগে ইংরিজি সাহিত্যে যে বিশেষ লক্ষণ প্রকট হ'য়েছিলো তা হচ্ছে অপরিমেয় প্রাণচাঞ্চল্যের লক্ষণ। ইউরোপে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের ঘোর কেটে যেতে মানুষের চিন্তা ও আবেগ জড়তার নির্ম্মোক ছেদন ক'রে যখন বিচিত্র পথে বিচিত্র ধারায় অভিব্যক্ত হ'তে লাগ্‌লো, সেই অমিত চাঞ্চল্যের দোলা এলিজাবেথীয় সাহিত্যের ঠিক মর্ম্মের মাঝখানটিতে এসে লাগ্‌লো। অভ্যস্ত বিধিবিধানের নাগপাশ থেকে চিন্তাধারার মুক্তি এবং গৃহের সঙ্কুচিত সীমা অতিক্রম ক'রে বিশ্বময় কর্ম্মের ব্যাপ্তি—এই দুই প্রকার স্বাধীনতার জয়গাথায় এলিজাবেথীয় সাহিত্য মুখর। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ক্রমওয়েলের স্বৈর নীতি ইংরিজি সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বদ্‌লে দিয়ে গেলো। তাঁর অনুগামীদের অতিমাত্রিক

নৈষ্ঠিকতার হিমশীতল স্পর্শে ইংরিজি সাহিত্যে বিশুষ্ক, নিরাবেগ বিচারবাদী রচনারীতি প্রবর্ত্তিত হ'লো এবং এই ধারা ভিক্টোরীয় যুগের সূচনাকাল পর্য্যন্ত চল্‌লো। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগেই ইংরিজি সাহিত্যের অন্য চেহারা। সামন্ততন্ত্র ও ভৌমিক আভিজাত্যের সমাধির ওপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিপ্লবের অমিত সম্ভাবনা তখন ইংলণ্ডের মানুষের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনিতে তখন ইংলণ্ডের আকাশবাতাস সমাচ্ছন্ন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাহাত্ম্যে অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস ও অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ের বাণী সমগ্র ভিক্টোরীয় সাহিত্যে এমন একটা সুর এনে দিয়েছে যাকে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য যুগের সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলি থেকে নিঃসংশয়ে আলাদা ক'রে দেখা চলে।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-রচয়িতা চণ্ডীদাসের কাল থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসরাধিক কালকে তিনটি সুস্পষ্ট রেখায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়টি হ'লো বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যায়, ভাবগত প্রেম ও ভক্তিবাদ যার মূল কথা। চণ্ডীদাস থেকে সুরু ক'রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ের বিস্তৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হ'লো মঙ্গল কাব্যের যুগ। এই যুগের প্রধান লক্ষণ হ'লো গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার। গৃহীসংসারীর পার্থিব সুখদুঃখের অনুভূতি এই যুগে বিশেষ মর্য্যাদা পেয়েছে, অথচ গৃহস্থের ধর্ম্মপ্রাণতাকেও অমর্য্যাদা করা হয় নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডী" দেবীমাহাত্ম্যকীর্ত্তনমূলক কাব্য হ'লেও তৎকালীন বাঙ্গালী গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার চিত্রটুকু তা'র ভেতরে কি সুন্দর ভাবেই না প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণভাবে বল্‌তে গেলে, মঙ্গলকাব্যে বাহিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একেবারে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের যুগের প্রান্তে এসে লেগেছে। যুগটাকে আরও প্রসারিত ক'রে ধরতে যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে কবি ঈশ্বর গুপ্তকেও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তে এসেই আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন ধারা শেষ হ'য়ে গেলো; তার জায়গায় নূতন ধারার পত্তন হ'লো।

ব্যাপকভাবে বিচার করতে গেলে রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু ক'রে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই যে অনধিক সোয়াশো বৎসর এইটেই বাংলা সাহিত্যের জাতীয় অধ্যায়। চাকার ভেতরে যেমন চাকা থাকে, নাটকের অভ্যন্তরে যেমন নাটক থাকে, তেমনি এই সুদীর্ঘকাল স্থায়ী জাতীয় সাহিত্যের অভ্যন্তরেও আবার জাতীয়তামূলক কতকগুলি বিশেষ যুগ আছে এবং জাতীয় ভাবোদ্দীপক কতকগুলি বিশেষ রচনা আছে। একটু পরেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করার অবকাশ আমাদের হবে, কিন্তু তার আগে একটি কথা ব'লে নেওয়া দরকার। রামমোহন থেকে যখন এই যুগের সূত্রপাত, তার থেকে স্বভাবতঃই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা চলে যে বাংলার জাতীয় সাহিত্যের অধ্যায়টি সাক্ষাৎ ভাবে ইংরাজ ও ইংরিজি

সাহিত্যের সংস্পর্শজনিত গূঢ় প্রভাবের ফল। এদেশে ইংরাজের অভ্যুদয় না ঘটলে আমাদের চেতনায় জাতীয়তার উন্মেষ হ'তো কি না সন্দেহ।

সুতরাং ইংরাজ-অভ্যুদয়ের পর আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ ও পরিপুষ্টি, সেইটেকেই জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। এই বিচারে রামমোহন থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তা-ই জাতীয় সাহিত্য। কিন্তু অতো হাল্কা ভাবে বিষয়টিকে দেখ্লে চলবে না। অতো বড় লম্বা যুগটিকে নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় সাহিত্যের যুগ হিসাবে বিচার ক'রে যদি তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়, তা হলে সেটা একটা বিরাট উদ্যমের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে এ রকম একটা কেন, দশটা প্রবন্ধেও কুলোবে না। কিন্তু এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হ'লো মাত্র সেই সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকের রচনাবলীর উল্লেখ করা যাঁদের লেখার মধ্যে আর সমস্ত লক্ষণকে অতিক্রম ক'রে জাতীয় ভাবোন্মাদনা রচনার প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'য়ে উঠেছে; কিম্বা উক্ত রচয়িতাদের একটা বিশেষ রচনাকালে জাতীয়তার লক্ষণটি তাদের রচনায় সব ছাড়িয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

রামমোহন রায়কে দিয়েই এই তালিকা সুরু। রামমোহন শুধু যে একটা নূতন যুগের সূচনার স্মারক হিসেবেই শ্রদ্ধেয় তা নয়, যে যুগকে তিনি সৃষ্টি করলেন তার বিচিত্র সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতার প্রতিটি অঙ্কুর তিনি স্বহস্তে প্রোথিত করে গিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে এবং কি মর্ম্ম পরিবেশন করবে তার আভাস এই যুগস্রষ্টার রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বটে, কিন্তু দেশপ্রেম মাত্র বিদেশীকে ভারতভূমি থেকে তাড়াবার ছলাকলা নয়, দেশহিতৈষণা মাত্র দেশের নিষ্ক্রিয় হিতকামনা নয়। যে সমস্ত সংস্কার, বিশ্বাস, অভ্যাস আমাদের মনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, আমাদের যদৃচ্ছা বিকাশের স্বাধীনতাকে সহস্র কৃত্রিম বিধিনিষেধের জালে সঙ্কুচিত ক'রে রেখেছে এবং পরিণামে জাতির শক্তি ও উদ্যমকে ফলপ্রদ হ'তে দিচ্ছেনা তার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করাই হলো সত্যিকারের দেশপ্রেম। এই অর্থে রামমোহন রায়ের রচনাতেই আমরা প্রথম দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখ্তে পাই। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন—এর সোজা অর্থ তিনি বাঙ্গালীর মন থেকে তার অভ্যস্ত চিন্তার জড়তা ঘুচিয়ে তাতে বিচারবুদ্ধির আলো ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। রামমোহনের বিদ্রোহ অন্ধ আচারের বিরুদ্ধে সচেতন বিচারক্ষমতার বিদ্রোহ; মেরুদণ্ডহীন আবেগের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মননের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের দ্বারাই তিনি বাঙ্গালী জাতির চিত্তে প্রথম জাতীয়তার বীজ রোপণ ক'রে গেলেন। সতীদাহপ্রথানিরোধ, কিম্বা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যম প্রভৃতি রামমোহনের সমাজসেবামূলক কাজগুলি এই বিদ্রোহেরই রূপান্তরিত ফল মাত্র।

তারপরেই আমরা নাম করবো মাইকেল মধুসূদন দত্তের। মাইকেলের বাইরেটাই মাত্র বিজাতীয় ছিল; কিন্তু অন্তরে তিনি জাতীয় ভাবধারার আদর্শের দ্বারা নিঃশেষে আচ্ছন্ন ছিলেন। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' তাঁর জাতীয় ভাবোন্মাদনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। মাইকেল জন্মবিদ্রোহী—আচারে, আচরণে, প্রবৃত্তিতে ও বিশ্বাসে। কিন্তু মাইকেলের ব্যক্তিত্বের মতো মাইকেলের স্বরূপটিও তাঁর স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল। আপাতঃদৃষ্টিতে মাইকেলকে পাশ্চাত্য ভাবাচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'লেও মাইকেল কোনো কালেই জাতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। জাতীয় ঐতিহ্যের যে যে অংশ তাঁর ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গতিপূর্ণ ব'লে বোধ হ'য়েছে মাত্র সেই সব অংশের বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিচার জাতীয়তাবাদী ছিলেন না; জাতীয়তার ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্ম নির্ব্বাচনপন্থী ছিলেন—গ্রহণ-বর্জ্জনের নীতি তিনি মান্‌তেন।

তার পরেই প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কতোটা পরিবেশন করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাক্‌লেও, এবিষয়ে মতদ্বৈধ নেই যে ভাষার ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা এবং সেই দিক দিয়েই বাংলা জাতীয় গদ্যের বুনিয়াদ তৈরীর অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁর। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচণ্ড বিদ্রোহী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ কর্ম্মের মধ্যে দিয়েই অধিকতর প্রকটিত হ'য়েছিলো, রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেননি। বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর যে সমস্ত সন্দর্ভ আছে সেইগুলিই এবিষয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য নজীর। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যদি মাত্র একটি মানসিক অভীপ্সা না হয়, কর্ম্মই যদি তার মর্ম্মকথা হ'য়ে থাকে' তা হ'লে দেশবাসীর চিত্তে জাতীয় চেতনা সঞ্চারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান যে অনেক সে কথা কে অস্বীকার করবে?

জাতীয়তার আদর্শের ভেতর প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম যথার্থ স্রষ্টা। ইংরিজি ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে অনেক গলদ, অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করতে না পারলে শুধু যে আমরা অশ্রদ্ধেয় হয়ে থাক্‌বো তাই নয়, আমাদের বহুপ্রার্থিত স্বাধীনতাও আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যাবে। তাই তিনি ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর সর্ব্বাধিক জোর দিলেন এবং এই দিক দিয়ে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে আদর্শ চরিত্ররূপে জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে বিবিধ বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ সামাঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে আমরা আবেগ ও মনন, চিন্তা ও চেষ্টা, বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতা কূটনীতি ও ধর্ম্মনীতিমূলক আচরণ একই কালে বিধৃত দেখতে পাই। আধুনিক অথবা পুরাতন আর

কোনো মহাপুরুষের চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রের এই সমন্বয়ের আদর্শটিকেই জাতির পক্ষে একমাত্র গ্রহণীয় নীতি বলে নির্দ্দেশ দিলেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসামান্য ঝোঁক যে তৎকাল-প্রচলিত ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দ্বারাও অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলো তার নজীর তাঁর রচনাবলীতে আছে। মিল-বেন্থামের হিতবাদের প্রথম ভারতীয় শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র ব্যষ্টির কল্যাণের সর্ব্বসাকুল্য ফলটাকেই সমষ্টির কল্যাণ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারার নিরিখে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষ প্রচেষ্টার ওপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়ে যৌথ প্রচেষ্টার মহান সম্ভাবনাকে একেবারেই হিসাবের মধ্যে গণনা করেন নি। কিন্তু তার থেকে এ বলা চলে না যে তাঁর প্রদর্শিত পথ পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার আলোকে ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। সমষ্টিবদ্ধ প্রচেষ্টার অশেষ মঙ্গলকর দিক আছে মানি, কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রটিই যদি অশোধিত থাকে, তা হলে যৌথ প্রচেষ্টায় কোনো ফলই হয় না, বরং তাতে উল্টো ফল দেখা দেয়। এইজন্যেই ব্যক্তিগত নৈতিক শুদ্ধির এতো প্রয়োজন। এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিক যুগের গান্ধীজিপ্রচারিত আদর্শ ও বঙ্কিমের আদর্শের ভেতর মূলগত কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না।

'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের শ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে রস পরিবেশন করেছেন তা শুদ্ধমাত্র শিল্পরস নয়। দেশবাসীকে জাতীয় ভাবধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্যজীবনের সাধনা এবং এই সাধনার অঙ্গীকারে তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্র উদ্দীপিত ছিল। নিছক জনচিত্তহারীগ্রন্থ রচনার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন নি, যে কাজ আর কেউ করলেও পারতেন। 'আনন্দমঠ,' 'সীতারাম,' 'দেবীচৌধুরাণী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসের উপজীব্য দেশাত্মবোধ; তেমনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', প্রভৃতি উপন্যাসের মূল অভিপ্রায় সমাজসংস্কার। এবং এই দুটি প্রেরণাই যে জাতীয়তাবাদের উৎস থেকে উচ্ছ্রিত হয়েছে তা না বললেও চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজসংস্কারের প্রেরণাটুকু আজকের বিচারে হয়তো যথেষ্ট প্রগতিশীল নয়; কিন্তু এই সংস্কার-কামনার পেছনে যে মন লুকিয়ে ছিল তার উদ্দেশ্যের সততাকে সন্দেহ করা চলে না। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' কিম্বা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর পরিহাস-রসিকতাগুলি আচ্ছাদন মাত্র; তার ভেতর দিয়ে তিনি জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রধানতঃ সমাজসংস্কারের ইঙ্গিত দিতেই চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িককালে ও তাঁর পরবর্ত্তী যুগে যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার ও সাংবাদিক বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে জাতীয়তা পরিবেশন ক'রে গেছেন তাঁদের ভেতর ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র,

অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার ঊনবিংশ শতকের অনেক চিন্তানায়কের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ও অধ্যাত্মানুভূতি অভিন্ন ছিল। ধর্ম্মীয় সাধনার পথে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশকেই এঁরা জীবনের সার ব'লে জেনেছিলেন। আজকের দিনে জাতীয়তাকে আমরা একটা ধর্ম্মীয় বিধিবিধানবিরহিত লৌকিক প্রেরণা ব'লে মনে করি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশে এই ধারণা গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল না। ঐশী প্রেরণা, ধর্ম্মীয় আচরণদ্বারা আত্মোন্নয়নের অভীপ্সা তখনকার সমাজপ্রধানদের হৃদয়বৃত্তি ও মননের সহিত অভিন্নভাবে জড়িয়ে ছিল। ফলে অনেকের রচনাতেই জাতীয়তা ধর্ম্মীয় অনুভূতির রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, অশ্বিনী দত্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার এঁদের ভেতর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মপ্রেরণার প্রবলতার জন্যে তো বটেই, ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে Doctrinaire Socialism-এর বাইরে সমাজতন্ত্রবাদের অঙ্কুর প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টার হিসাবেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে। নাট্যসাহিত্যে জাতীয়তার পথ প্রদর্শনকারী রচনা রূপে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এদিকে কবি নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক কাব্য হিসেবে কাব্যামোদী পাঠকের স্মৃতিতে চিরকাল অমলিন থাকবে।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী যে জাতীয়তার বেদীমূলে বাঙ্গালী কবি, সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার প্রকৃতি মূলতঃ নিষ্ক্রিয়—মনন ও হৃদয়াবেগের মধ্যেই তার প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংগ্রামের ভিত্তিতে সত্যিকার সক্রিয় জাতীয়তার স্ফূরণ হ'লো বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-নিরোধ আন্দোলনের সূচনায়। বিদ্রোহবহ্নিদীপ্ত এই নূতন জাতীয়তাযজ্ঞের ঋত্বিক ও হোতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক কালের বিচার এই নূতন জাতীয়তার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিলো। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং তারও আগে সুরেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাঙ্গালী কৃতী সন্তানেরা নবজাতীয়তার প্রথম সূত্রধর। কিন্তু এঁদের প্রবর্ত্তিত জাতীয়তা গোড়ার দিকে নিতান্তই আবেদননিবেদনসম্বল ছিল; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যাঁদের আমরা ভদ্রলোক ব'লে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি ক'রে

নেওয়াই পলিটিক্স।" কিন্তু ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতাপ্রসূত ঘোষণার ফলে "ভদ্রলোকের পলিটিক্স" সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করলো—জাতীয় দাবী ক্ষীণকণ্ঠ পোষাকী ভাষার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে বজ্রনির্ঘোষে গর্জ্জে উঠলো। বিদ্রোহের আভায় জাতীয়তাবাদীদের মুখাবয়ব রক্তিম আকার ধারণ করলো, দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্যোতনায় তাঁদের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হয়ে উঠলো। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র রচনায় বাগ্মিতায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ ঘোষ যথাক্রমে "সন্ধ্যা" ও "বন্দেমাতরম"-এর সম্পাদকরূপে অগ্নিগর্ভ স্বাদেশিকতাপ্রচারে এবং রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্দীপনা সঞ্চারে বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সূত্রপাত করলেন।

সাহিত্যের বিচারে এঁদের ভেতর রবীন্দ্রনাথের দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাতীয় সঙ্গীতে তিনি যেন দেশে একটি নূতন ভাবের বন্যা বইয়ে দিলেন। বাঙ্গালীর চিত্তে জাতীয় চেতনা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করতে তাঁর স্বদেশী গানগুলি কতোটা পোষকতা করেছে যোগ্য ইতিহাসকারের বিচারে একদিন তা নির্ণীত হবেই।

কিন্তু মাত্র স্বদেশী সঙ্গীতের মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবের চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ মনে করলে ঘোরতর ভুল করা হবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্যের সাধনা জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু বঙ্গভঙ্গনিরোধ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় একটি বিশেষ কালে তা অতিমাত্র সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার স্বরূপ কি? আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ভেতর এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেতর যা কিছু মহৎ, বরণীয়, শ্রদ্ধেয়, তার সংমিশ্রিত যৌগিকী ফল কবির কল্পনায় এক বিরাট সম্ভাবনারূপে প্রতিভাত হয়েছিলা এবং দেশবাসীর সমক্ষে তিনি সেইটেকেই একমাত্র গ্রহণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী স্বজন ও স্বগৃহের সীমা অতিক্রম করতে চায় না, তেমন জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। একটি বিরাট, বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিশ্বজাতীয়তাবাদের মধ্যে মুক্তিসন্ধান করুক, তার সমস্ত আদর্শের পরিপূর্ণতা খুঁজে পাক এইটেই তাঁর কাম্য ছিল। জীবন-সায়াহ্নে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি যে কঠোর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাকে প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর চিরপোষিত আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি "পূরব পশ্চিম"-এর মিলনে কখনও আস্থা হারান নি, তাঁর লেখনীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তিমদমত্ততার, তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার রূপটিই মাত্র ধিকৃত হয়েছিলো। কবি বুঝেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত, আন্তর্জ্জাতিক পটভূমি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে তাকে গৃহপ্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যে সঙ্কুচিত করলে তা আত্মঘাতনেরই

সমতুল্য হবে। জাতীয়তা কিম্বা স্বাদেশিকতার অর্থে শুধু বিদেশীর দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের চেষ্টাই বোঝায় না ; সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা আচার, সংস্কার, চিন্তা ও অভ্যাসের দাসত্বমুক্ত স্বাধীন প্রেরণার নামই জাতীয়তাবাদ। এই প্রেরণার বলে বলীয়ান মানুষ একই কালে খাঁটী দেশজ ঐতিহ্য ও আন্তর্জ্জাতিক শুভবুদ্ধির ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতে সক্ষম হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী কালে আর যাঁরা কাব্য ও নাটকের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি দেশবাসীর চিত্তে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। ক্ষুরধার ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে মোহগ্রস্ত জাতীয় বিবেককে কষাহত করে তাকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিও কম কাজ করেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত অগ্রণী। কিন্তু প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানমূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে রজনী গুপ্ত ('সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস') ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ('সিরাজউদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম') সমধিক সহায়তা করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম উল্লেখনীয়। জাতীয়-সঙ্গীত প্রচারে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের পর কবি অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কবি অজয় ভট্টাচার্য্যের দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

গান্ধিজীপ্রভাবিত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অধ্যায়ে (১৯২১—১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭) বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তার প্রচারপ্রচেষ্টা দুটি সুস্পষ্ট ধারায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে—রাজনৈতিক সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য। রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আধুনিক সংবাদপত্রসেবাকেও যুক্ত করতে হবে। নূতন পর্য্যায়ের স্বাধীনতাসংগ্রামে রাজনৈতিক সাহিত্যপ্রচারের মূলে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম প্রভাব। কতিপয় শক্তিশালী সাংবাদিকের লেখনী এই দুইজন দেশপূজ্য নেতার প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনার ফলেই সুতীক্ষ্ণ ও অপ্রতিরোধ্য হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সাহিত্যও এই কালে কম রচিত হয়নি। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ; বিপ্লবের ইতিহাস, দেশী ও বিদেশী দেশভক্ত সংগ্রামী বীরদের জীবনী, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কীর্ত্তি ও মতবাদ আলোচনা, মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদের অনুশীলন, কৃষক ও শ্রমিকের কর্ম্মতৎপরতামূলক সাহিত্য, সমাজতন্ত্রী সাহিত্য, বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতিকে এই অধ্যায়ের রাজনৈতিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

আধুনিক সাহিত্যে গোড়ার দিকে জাতীয়তার চেতনা নিতান্তই ক্ষীণ ছিল। অনেকখানি ফাঁকি ও মেকি নিয়ে শরৎচন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের পথপরিক্রমা স্বুরু হ'য়েছিলো। সুখের বিষয়, বয়স ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকরা প্রাথমিক ভুল অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া কতিপয় জাতীয়তাবাদী শক্তিশালী নূতন লেখকের আবির্ভাবেও সাহিত্যের আবহাওয়া পরিশোধিত হয়েছে। যুদ্ধকালের ভেতর যুদ্ধজনিত বিপর্য্যয়কে কেন্দ্র করে, বিশেষতঃ ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ভিত্তিতে, বাঙ্গলা ভাষায় অনেকগুলি প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। আগষ্ট বিপ্লবকে আশ্রয় ক'রেও সৎসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্তই শুভলক্ষণ। আরও একটি শুভলক্ষণ এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের ওপর থেকে কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রভাব—যা এককালে সাহিত্যকে প্রায় গ্রাস করতে বসেছিলো—ক্রমেই তিরোহিত হচ্ছে। (কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সুস্থ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কেউ গুলিয়ে ফেলবেন না)। ১৫ই আগষ্ট থেকে বাঙ্গলা সাহিত্যের নূতন পর্ব্ব নূতনঅভিযান স্বুরু হলো।

জাতীয় সঙ্গীত

মণিলাল সেনশর্ম্মা

স্বাধীনতার জন্য ভারতে যে সংগ্রাম চলে তার স্বপ্ন প্রথমে এই বাংলাই দেখেছিল আর প্রাথমিক সংগ্রামও একা এই বাংলা দেশই করেছিল বলে সর্ব্বপ্রথমে জাতীয়সঙ্গীত বাংলায়ই রচিত হয় এবং এখানেই প্রথম সে গান সম্মিলিতকণ্ঠে গীত হয়। কিন্তু জাতীয় ভাবধারার স্বরূপসৃষ্টি হওয়ার আগে বাংলায় জাতীয়সঙ্গীত হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়নি। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাব বাংলার মন জয় করে, জাতীয়তাবোধ পরে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে আর সারা ভারতের জন্য জাতীয়সঙ্গীতও বাংলাই রচনা করে দেয়।

প্রথম জাতীয়সঙ্গীত গীত হওয়ার আগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি গঠিত হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত নাটকের শুধু অনুকরণ নয়, সম্পূর্ণ নতুন আকারে বাংলা নাটক লেখা আরম্ভ হয়েছে আর নিরবচ্ছিন্নভাবে নাট্যাভিনয় চল্‌ছে। নীলদর্পণ, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর

যুদ্ধ রচিত হয়েছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছে। বাংলা গান নতুন আকারে রচনার এবং ইউরোপীয় কায়দায় দেশীয় ঐক্যতানবাদন তৈয়ারীর প্রচেষ্টা তখন চল্‌ছে। বাংলায় তখন সব দিক্ দিয়েই একটা জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। সে সময়ে রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা অনুযায়ী গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থে নবগোপাল মিত্রের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' নামে ভারতে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী কলিকাতায় খোলা হয়। সেই মেলার প্রথম উদ্বোধনে সম্মিলিতকণ্ঠে ভারতীয় প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত নিম্নলিখিত গানটি গীত হয়—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান,
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়।

এই গানটিকেই সেজন্যে বাংলার জাতীয়ভাব-উদ্দীপক প্রথম গান বলা চলে। পরের বৎসর দ্বিতীয়বারের মেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত নিম্নে উদ্ধৃত গানটি গীত হয়—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান"

সমসাময়িক পরবর্ত্তী অনেক কবিতায় জাতীয়ভাবে অভিভূত মনের ব্যাকুলতা ব্যক্ত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে রঙ্গলালের (১৮৫৯) "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায়," হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীতে (১৮৭০) 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়', গোবিন্দ্রচন্দ্র রায়ের (১৮৭৪) 'কতকাল পরে বল ভারতরে,' সত্যেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', হিন্দুমেলার একজন উৎসাহীকর্ম্মী মনোমোহন বসুর রচনা—'দীনের দীন সবার দীন ভারত হলো পরাধীন'—ইত্যাদি।

তখন যে সব জাতীয় গান রচিত হয়েছিল সেগুলির মূল্য জাতীয়ভাবউদ্দীপক কবিতা হিসাবেই। পাইকপাড়ার রাজাদের নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথমে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নাটকের সঙ্গে দেশীয় ঐক্যতানবাদন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল রচনা আরম্ভ করেন। তার আগে বাংলা নাটকগুলিতেও ইউরোপীয় অর্কেষ্ট্রায় পাশ্চাত্যসঙ্গীত বাজিয়ে নেওয়া হতো। কিন্তু 'মিলে সব ভারত সন্তান' অথবা 'কতকাল পরে বল ভারতরে' ইত্যাদি গান সকলে একসঙ্গে গেয়েই জাতীয়ভাব ব্যক্ত করেন। সুররচনার দিকে তাঁদের তখন লক্ষ্যই ছিল না। সে গানের

সঙ্গে যন্ত্র সমাবেশও প্রয়োজন মনে করা হয়নি। রচয়িতা গান কবিতাই রচনা করেছিলেন। কিন্তু দু একজন সুররসিক তাতে তুষ্ট না হয়ে সে কথাগুলিতে সুর বসিয়ে মানুষের মনে কথাগুলিকে ধরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন, তাতে জাতীয়ভাব প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য হয়।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর লর্ড লিটন যে ভাবে ভারতবাসীকে উত্যক্ত ও পীড়িত করেন তাতে সব চেয়ে বাঙ্গালীই আহত হয় বেশী। ইংরাজের তখনকার রুদ্রনীতির প্রত্যুত্তরেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে 'আনন্দমঠ' রচিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। আর তাতে 'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীতটি প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীদের অনেকে তখন গানটি শুনে উপহাস করেছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—"একদিন এ গানে ভারতের আকাশ বাতাস বিকম্পিত হবে। আর মাটি ধূলো হতে আরম্ভ করে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকবে।"—সে কথা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল তবে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। শুধু তাই নয়, দেশের বাইরে ভিন্ন প্রদেশবাসীকে নমস্কার জানাতেও 'বন্দেমাতরম' বলারই প্রচলন হয়। বর্ত্তমানে নেতাজি-প্রচলিত "জয়হিন্দ" সে স্থান দখল করেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। তখনকার বিদেশী-ভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দ আনন্দধ্বনিও করতেন বিদেশীর অনুকরণেই 'থ্রি চিয়ারস্' বলে। 'বন্দেমাতরম'-এর কথা তখন তাঁরা ভাবতেই পারেননি। পরবর্ত্তীকালে কবে ও কি ভাবে 'থ্রি চিয়ারস্'-এর পরিবর্ত্তে 'বন্দেমাতরম' দিয়েই আনন্দধ্বনির প্রচলন কংগ্রেসে হলো তার হিসাবই কেউ রাখলে না। কিন্তু সে সময়েও বাঙ্গালার কবিদের মনে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র ধ্বনিত হতে থাকে। তারই ফলে হেমচন্দ্র সে সময়ে রাখিবন্ধন উপলক্ষে বন্দেমাতরমকে উল্লেখ করে লিখলেন—"ভারত জননী জাগিল।" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ-রচিত—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গীত হয়েছিল। আবার যখন ১৮৯০-তে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সে সময়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মহাপূজা নাটিকা অভিনীত হয়। তাতেও অনেক দেশাত্মবোধক জাতীয় কবিতা ও গান ছিল। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা চলে—

"পাঞ্জাব, প্রয়াগ, অযোধ্যা, কনোজ মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার
মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর, উৎকল, বঙ্গ, বিহার ;
হিন্দু বা খৃষ্টান পার্শি-মুসলমান এক প্রাণ আসি সবে
একতা বিহীন ভারত সন্তান কেহ আর নাহি রবে।"

কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্ব্বপ্রথম 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গীত হয় ১৮৯৬

খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনে—বিডন উদ্যানে। রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে সভার উদ্বোধনে 'বন্দেমাতরম' গানটি গেয়েছিলেন। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গে অর্গেন বাজিয়েছিলেন। একে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত, তার উপর রবীন্দ্রনাথের সুধাকণ্ঠ সভার সকলকে বিশেষ করে ভিন্ন প্রদেশবাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। তারপর হতে সব কংগ্রেসেই 'বন্দেমাতরম' গানটি গীত হয়। এই গানটিকে জাতীয় গান ধরে নেওয়া হয়। সরলা দেবী কংগ্রেসের অনেকগুলি অধিবেশনেই এ গানটি অনেকবার উপস্থিত জনমণ্ডলীর অনুরোধে গেয়েছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ রচিত 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" গানটি গীত হয়েছিল।

১৯০১ সালে যখন পুনরায় কলিকাতায় কংগ্রেস হয় তাতে প্রথম দিন সরলা দেবী বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চাশ জনকে নিয়ে স্বরচিত গান করে খুব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। গানটির প্রথম কথা হলো—

'গাহ হিন্দুস্থান
অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাহ আজি হিন্দুস্থান।'

ঐ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত "চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান" গানটি 'কোরাসে' গীত হয়েছিল। ঐ সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সর্ব্ব প্রথম নিখিল ভারত শিল্প-প্রদর্শনীর যে উদ্বোধন হয় তাতে অতুলপ্রসাদ-রচিত 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আজি জগৎজনপূজ্যা" গানটি সরলা দেবী পরিচালিত সঙ্গীতসঙ্ঘ কর্ত্তৃক গীত হয়েছিল।

উনিশ শতকে রচিত জাতীয়-সঙ্গীতের কতকটা পরিচয় দেওয়া গেল। তারপরই বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী সঙ্গীতের এক ভীষণ বন্যা হয়। আর তখনকার রচিত অনেকগুলিই এখনও বাঙ্গালীর কানে কানে ধ্বনিত হচ্ছে। বাঙ্গালী যুবকদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে মনীষী তাঁর নাম—স্বামী বিবেকানন্দ। নিখিলবিশ্ব ধর্ম্মসভায় পৃথিবীর দৃষ্টি ভারতের দিকে আকর্ষণ করিয়ে ভারতে ফিরে এসেই তিনি বাঙ্গালী যুবসম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে তিনি দিব্য চক্ষে দেখছেন, বাঙ্গালী এক মেরু হতে আর এক মেরু পর্য্যন্ত জয় করবে। তিনি আরও বলেছিলেন 'বঙ্গ-যুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।' তাঁর সে সব কথায় বাঙ্গালীর মনে আশার, আত্ম বিশ্বাসের সঞ্চার হয়েছিল তাঁর অভয়বাণীতে বাঙ্গালী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কাজেরই পরিচয় স্বদেশীযুগ। তাঁর বাণীর আগে নিজেদের কার্য্যক্ষমতার

উপর বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিলনা; বাঙ্গালী যে মানুষ—সে বিশ্বাসও তাঁদের ছিলনা। যারা তাঁর কথায় জাতীয়ভাবে উদ্দীপনা পেয়েছিল তারা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও তাঁর 'বন্দেমাতরম'-কে লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর তারই প্রধান সারথী ছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ। পরবর্ত্তীকালে 'বন্দেমাতরম'-কে এত ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে শ্রীঅরবিন্দের দান প্রায় সবখানি। 'বন্দেমাতরম' বিপ্লবীদের মন্ত্র ছিল বলেই এক সময়ে 'বন্দেমাতরম' বলাও বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।

স্বদেশী-যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকের মধ্যে অনেকগুলি জাতীয়সঙ্গীত দিয়ে তখনকার বাংলাকে উপকৃত করে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা চলে—

"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ—
কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ—
*　　*　　*　　*
আমরা মা তোর ঘুচাব কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ,
দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ"
"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।"

'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র' অথবা 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' গানগুলিও সে সময়ে জাতীয়ভাব উদ্দীপনার যথেষ্ট সহায়ক ছিল। সে সময়ে কবি যামিনীকুমার লিখলেন—'জাগো ওগো কাঙ্গালিনী জননী।'

স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, যামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক কবিই স্বদেশী গান রচনা করেন। সেগুলির অধিকাংশই কবিতা, দুএকটা মাত্র গান। তার মধ্যে বর্ত্তমানে অনেকগুলিই লুপ্ত। সে সময়ে প্রায় সবগুলি জাতীয়-ভাব উদ্দীপক কবিতা ও গান একত্র করে নানা বই আকারেও ছাপা হয়েছিল। এর কিছু পরবর্ত্তীকালে ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুল-প্রচলিত নিম্নলিখিত গানটি রচনা করেন—

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট-মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে-জয় হে-জয় হে-জয়, জয়, জয়, জয় হে।"

সমসাময়িক কালে আরও একটি গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী—
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজো সব জন পশ্চাতে!"

স্বদেশী যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের গান লেখাও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক পরে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল আরও একটি জাতীয় গান গাইলেন—

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রিরা হুঁসিয়ার।"

—বাংলা ছাড়া ভারতের আর একটি উর্দ্দুতে লেখা জাতীয়সঙ্গীত প্রসিদ্ধিলাভ করে কবি একবাল লিখলেন—

"সারে জাঁহাসে সাচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা,
হাম বুলবুলে হ্যায় ইস্‌কি, ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা।"

কিন্তু আর কোন প্রদেশে জাতীয়সঙ্গীত রচনার দিকে লক্ষ্য ছিলনা। বাংলায় জাতীয়ভাব উদ্দীপনায় শিক্ষিত মহলে বাংলা নাটকের আর গ্রামে গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে যাত্রাগানগুলির অনেকখানি দাম রয়েছে। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের রচিত নাটক আর পরবর্ত্তীকালে মুকুন্দদাসের যাত্রা এইজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নাটক ও যাত্রার মধ্যে অনেক জাতীয়সঙ্গীত যোগ করা আছে। এই নাটকের জাতীয়-সঙ্গীতগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির সুর এখনও বাংলায় বহুল-প্রচলিত। এত প্রচলিত যে বাংলার গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সহরে ও মহানগরীতে এমন কি সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় যে গান গাওয়া হয় প্রায় সবগুলিই দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানের অনুরূপ সুরে বাঁধা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরে একটা পৌরুষভাব আছে। নেতিয়ে পড়া ঝিমিয়ে পড়া সুর তাঁর জাতীয় সঙ্গীতে নেই। তা'হলেও আজ দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' 'যে দিন সুনীল' রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' 'অয়ি ভুবন মনো-মোহিনী' 'দেশ দেশ নন্দিত করি' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ছাড়া সবই লোপ পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, অতুলপ্রসাদ, কাজি নজরুল ছাড়া অন্যান্য কবিদের জাতীয় গানগুলির গানের সুর কোন নির্দ্দিষ্ট করা ছিলনা। এক একটি গান এক এক সুরে গীত হয়েছে। আমাদের স্বদেশী যুগে প্রকাশিত স্বদেশী গানের এইগুলি হতে এক একটি কবিতা বেছে নিয়ে তাতে নিজেদের পছন্দমত একটা সুর বেঁধে এক এক সভায় জাতীয় সঙ্গীত বলে গাওয়া হতো। এতে দুটি বিষয় দেখতে পাওয়া যায়—তখন একটি জাতীয় সঙ্গীত সারা ভারত অথবা সারা বাংলার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল না; আর কবিতার দাম সুরের চেয়ে বেশী ছিল। সুরের কোন স্থানই ছিল না। 'বন্দেমাতরম' গানটির তিনটি বিভিন্ন সুরের স্বরলিপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সঙ্গীত প্রকাশিকায় ছাপানো আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ১৮৯৬ সালে যে সুরে 'বন্দেমাতরম' কংগ্রেস অধিবেশনে গান করেন তার সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া। আর সে সুরই পরবর্ত্তী কংগ্রেস অধিবেশনে গীত হতো। কিন্তু তার কোন সুর নির্দ্ধারিত ছিল না, এমন কি কোন গানও জাতীয়সঙ্গীত বলে কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় নি। সেজন্যে আমি "জাতীয়সঙ্গীতের রূপ" নামে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সে বৎসরই ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে অনেক বাকবিতণ্ডার পর 'বন্দেমাতরম' গানটির প্রথম দুটি কলি ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বন্দেমাতরমকেই যাতে জাতীয়সঙ্গীত বলে নির্দ্দিষ্ট করা হয় তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত গান্ধী এবং জওহরলালকে অনুরোধ করতে হয়েছিল। অথচ এক সময়ে এই 'বন্দেমাতরম' গান করা তো দূরের কথা উচ্চারণ করাও অপরাধ বলে গণ্য হতো। আর তা হয়েছিল স্বাধীনতাকামীদের দমাবার এবং জাতীয়তাবাদকে বিনষ্ট করার জন্যই। ইংরাজের এই গানটি ছিল একটি প্রধান শত্রু। সে জন্যই আজ বন্দেমাতরম জাতীয় সঙ্গীত।

যাহোক আমার সে প্রবন্ধটিতে দুটি বিষয় নির্দ্দিষ্ট করার জন্য অনুরোধ ছিল। প্রথম জাতীয়সঙ্গীত নির্দ্দিষ্ট করা আর তার সুরটিও নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া—যা আমরা যন্ত্রসঙ্গীতে ব্যবহার করবো। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি সে সভায় প্রতিবাদ ও বাকবিতণ্ডার আড়ালেই পড়ে গেল। তবে তারপরই বাংলার কংগ্রেসী দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে বিখ্যাত যন্ত্রী তিমিরবরণকে দিয়ে 'বন্দেমাতরম' গানটি কণ্ঠে ও যন্ত্রে গ্রামোফোন রেকর্ড করে রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু সারা ভারতের জন্য কোন সুর এখনও নির্দ্দিষ্ট নেই। আমার সে প্রবন্ধে তখনকার প্রচলিত 'বন্দেমাতরম' গানটির সুর জাতীয়সঙ্গীতের উপযোগী নয় বলে অনুযোগ ছিল। আর কেন সেগুলি উপযোগী নয় তাও দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, যে সুরে

পৌরুষভাব নেই, সম্মিলিত যন্ত্রধ্বনির উপযোগী সুর সেগুলি নয়, আর জনসাধারণের পক্ষে সেটি গঠন করাও সহজ নয়। আমি সে প্রবন্ধে বাংলার সুররচয়িতাগণকে অনুরোধ করেছিলাম যে তাঁরা যেন উপরে উল্লেখিত তিনটি বিষয় মনে রেখে সুর রচনা করেন—যেটি আমরা শুধু ভারতে ভারতীয়দের জন্যই গাইব না বরং সে সুরের 'যন্ত্র-ধ্বনি' এক মেরু থেকে আর এক মেরু পর্য্যন্ত প্রচারিত করব।

কিন্তু আজ ভারতীয় রেডিও প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের কোন্ সুরটি বাজানো হবে, সিনেমা-অন্তে শুধু যন্ত্রধ্বনি দিয়ে জাতীয়সঙ্গীতের কোন সুরটি বাজালেই আমরা সম্মান প্রদর্শন করবো তা ঠিক হয়নি। তবে শীঘ্রই সে-সুর আমরা চিনে নিতে পারব আশা করি। রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষ ও সিনেমা-গৃহস্বামীদের বর্ত্তমানে জাতীয়সঙ্গীত প্রতিদিন ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অনতিবিলম্বে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিদিন জাতীয়সঙ্গীতের রূপটি প্রচারিত করে দেওয়া সম্ভব হয়। এইটিই আজ আমাদের অভাব। যত শীঘ্র তার সমাধান হয় ততই দেশের পক্ষে ভাল।

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(দুই)

চৌরঙ্গির ভিজে পিচঢালা পথ আলোর ছটায় কালো অজগরের মসৃণ পিঠের মত চকচক করছে। পশ্চিম দিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে; শীতের বাদলায় ময়দান আজ জনহীন। পূর্ব্বদিকে ফুটপাথেও লোকের ভিড় নেই। দোকানের শো-কেসগুলি আলোকের প্রাচুর্য্যে ঝকমক করছে, বড়দিনের রঙীন কাগজের সজ্জা এখনও খুলে ফেলা হয় নি। ট্রামেও খুব ভিড় ছিলনা। যারা ছিল তারাও সকলেই প্রায় নেমে গেল ভবানীপুরে, জগুবাবুর বাজার থেকে পূর্ণথিয়েটারের মোড় পর্য্যন্ত। এদিকটায় লোকজনের ভিড় কিছুটা রয়েছে।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। অরুণা ঘোষ, মেয়েটির চিঠিতে ওই নাম লেখা রয়েছে। কি ভাবছে ওই জানে। অনেক উদ্বেগের পর একটা আশ্রয় পেয়ে পথশ্রান্ত পথিকের গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমনও হতে পারে, অথবা নিরাশ্রয় অবস্থার উদ্বেগে অধীর হয়ে এই অপরিচিত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে এখন তার ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার করছে স্তব্ধ হয়ে এমনও হ'তে পারে। বিমলও ভাবছিল। ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাবে। তার কয়েকজন সম্পদশালী আত্মীয় স্বজন আছেন। একটা রাত্রির মত আশ্রয় দিতে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু—। এই সম্পদ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিমল জীবনে দূরে রেখেই চলতে চায়। এই মানুষগুলির মনোভাব বিচিত্র, উদারতা আছে কিন্তু সে উদারতা চেষ্টাকৃত স্বভাবস্ফূর্ত্ত নয়, উপকার করেন কিন্তু চিরদিন মনে ক'রে রাখেন উপকার

করেছি বলে, প্রত্যুপকারেও এ ঋণ শোধ হয় না ; টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে শোধ নিয়েও বলে থাকেন বিপদের সময় টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম। শিক্ষাও এঁদের আছে—বি-এ, এম-এ, পাশও করেছে বংশধরেরা, বাড়ীর বহিরঙ্গে সাহেবীআনা প্রকট, সাহিত্য আলোচনায়, জীবনের আচার বিচারের সমালোচনায়, নারীর অধিকার এবং নরনারীর সম্পর্কের গণ্ডী বিচারে যে সব ভাল-ভাল কথা বলে থাকেন সে-সব শুনে বিমলের মনে প্রথম প্রথম আক্ষেপ হ'ত, মনে হ'ত এঁদের কত পিছনেই না পড়ে আছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মিথ্যাভাষণে এমন অদ্ভুত পটুত্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতি হিসেবে এ দেশের অন্য কোন শ্রেণী আয়ত্ত করতে পারেনি। মনের মধ্যে আসলে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যত সন্দিগ্ধ তত সংকীর্ণ; রঙ্গমঞ্চে কুললক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙমাখা লালপেড়ে শাড়ীপরা অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলে স্থান তাঁরা দেবেন, সমাদর ক'রেই স্থান দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে কুৎসিৎ সন্দেহ স্বভাব অনুযায়ী জেগে উঠবে তাকে স্থির সত্য বলে প্রচার করবার জন্য একমুখ অধীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। মিথ্যানিন্দাকে বিমল ভয় অবশ্য করেনা কিন্তু অকারণে তার অবকাশ দিতে সে চায় না কাউকে।

হাজরা রোড পার হয়ে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াল। বিমল উঠল—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডাকলে – উঠুন। ট্রাম বদল করতে হবে।

চকিত হয়ে মেয়েটি বললে—ও। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠল।

এসপ্লানেড থেকে আলিপুর হয়ে আসবে বালীগঞ্জের ট্রাম। দু তিনখানা রসারোড চৌরঙ্গিগামী ট্রামের পর একখানা বালীগঞ্জের ট্রাম। দাঁড়িয়ে থাকতে হল কিছুক্ষণ। ফিন্‌ফিনে বৃষ্টির সঙ্গে উত্তর দিকের বাতাসে শীতের রাত্রি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে ; মেয়েটির গায়ে একটা সোয়েটার কোট থাকলেও শীতে কাঁপছে সে। বিমলের ইচ্ছা হল তার গায়ের আলোয়ানখানা তাকে দেয় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করলে সে। থাক ; আর খানিকটা পথ বাকী, এটুকু পথ অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগবে সে সময়টুকু এ শীত কাঁপতে কাঁপতে সহ্য করতে হলেও সে কষ্ট খুব বেশী হবে না।

বালীগঞ্জের ট্রামেও ভিড় ছিল না। আলিপুর হয়ে যারা আসে তারা অধিকাংশই হাজরা রোডের মোড়ে নেমে গিয়েছে ; আবহাওয়া ভাল থাকলে এ সময়ের এই ট্রামে দু' চারটি যুগলকে প্রায়ই পাওয়া যায়, যারা বালীগঞ্জে থাকে নিজেদের লেক এলাকায় চেনালোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সম্ভাবনা এড়িয়ে আলিপুরের ট্রামে ময়দানের দিকে বেড়াতে যায়। আজ তারাও নেই।

ট্রাম রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর পথে মোড় ফিরল পূর্ব্বমুখে। মহানগরী বাড়ছে; আধুনিকতম

নগর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনায় রচিত হচ্ছে এই নূতন অংশ। প্রধানতম রাজপথ রাসবিহারী এ্যাভেন্যু পশ্চিম থেকে পূর্ব্বমুখে চলে গিয়েছে; বর্ত্তমান যুগের যানবাহনের সংখ্যার কথা এবং তাদের দ্রুতগামীত্বের কথা মনে রেখে সুপ্রশস্ত পথ তৈরী করা হয়েছে। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ট্রামের সঙ্গে অন্য যানবাহনের সংস্পর্শ এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াবার জন্য ট্রাম লাইনের পথটুকুকে উঁচু পাথরের ধারি দিয়ে বেঁধে পৃথক করে রাখা হয়েছে; পাথরের ধারির মধ্যে ভরাট মাটির উপর দিয়ে চলে গেছে ট্রাম লাইন। ট্রাম লাইনের দু পাশে পিচ বাঁধানো দু'টি স্বতন্ত্র মসৃণ পথ—যান বাহনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বাহন আর আজকাল বড় নাই, ক্বচিৎ দুখানা চারখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়, কখনও কখনও চলে কয়লা, ইট, সুরকী বোঝাই গরুর গাড়ী; কখনও চলে দুটো চারটে ধোপার গাধা--পিঠে নিয়ে চলে ময়লা কাপড়ের বোঝা। দু পাশের দুটি পথের একটিতে চলেছে পূর্ব্বমুখী গাড়ী—অন্যটিতে চলেছে পশ্চিমমুখী সারি। তার দু'পাশে প্রশস্ত ফুটপাথ।

ফুটপাথের পরে সারি সারি নূতন কালের ইমারত। প্রাচীনকালের ইমারতের রুচি ব্যবস্থা সমস্ত কিছু থেকে পৃথক। আলো এবং বাতাসের জন্য পাশাপাশি ইমারত-গুলির মধ্যে আট দশ ফুট খালি জায়গা পড়ে আছে; পিছনের দিকেও এমনি অনেকটা খালি জায়গা রাখতে হয়েছে; আগের কালের মত বাড়ীগুলি মাঝখানে উঠানওয়ালা চকমিলানি ছাঁদে তৈরী নয়; উঠান বা খালি জায়গাকে পাশে রেখে আলমারীর মত উঠে গেছে। একটি কি দুটি দরজা বন্ধ করলেই বাড়ীটি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়। বাড়ীগুলির প্ল্যানও বিজ্ঞানসম্মত; প্রতি ঘরে আলো বাতাসের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা যথা-সাধ্য করা হয়েছে। ফ্যাশনের দিক দিয়েও বাঙালীর রুচিবৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী বহিরঙ্গ থেকে এ্যামেরিকান ফ্যাশনের বাড়ী পাশা-পাশি দেখতে পাওয়া যায়, দু'একখানা বাড়ী জাহাজের ছাঁদে তৈরী। এখনও এদিকটা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গড়ে ওঠে নাই, শোনা যায় দু একজন অতি আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে এরোপ্লেনের চেহারায় বাড়ীর পরিকল্পনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই খালি প্লট পড়ে রয়েছে। কোন কোনটি জঙ্গলে ভরে রয়েছে—কোনটিতে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, কোন কোন বড় প্লট ভাড়া নিয়েছে দুধের ব্যবসায়ীরা, তারা এখানে গরু মহিষ রাখে। গোবর চোনার দুর্গন্ধ ওঠে কিন্তু চোখের সামনে দুইয়ে খাঁটী দুধ পাওয়ার সুবিধার কাছে দুর্গন্ধের অসুবিধা সহ্য করে নিয়েছেন এখানকার অধিবাসীরা।

মস্তবড় পার্কটার কোনে এসে দাঁড়াল ট্রামখানা। বিমল অরুণাকে ডেকে নেমে পড়ল ট্রাম থেকে।

বড়ো রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দুপাশে অসংখ্য ছোট রাস্তা। নূতন যুগে তৈরী শহরের এক অংশে গলি পথ নেই। এ যুগে গলি পথ অচল। পিচ-দেওয়া ঝকঝকে তকতকে রাস্তাগুলি—সুপ্রশস্ত না-হলেও প্রশস্ত। তারই মধ্যে একটা রাস্তা ধরে একটা ছোট পাঁচ মাথায় এসে দাঁড়াল বিমল। একদিকে একটা বিস্তীর্ণ বস্তী। প্লটের মালিকরা বাড়ী না করে বস্তী তুলে ভাড়া দিয়েছেন। হিসেব করে দেখেছেন—এতেই সুদ পোষায় বেশী।

অরুণা প্রশ্ন করলে—কোন দিকে আপনার বাসা?

বিমল পশ্চিম দিকটায় অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলে।

—ও যে বস্তী!

হেসে বিমল বললে—ওরই প্রান্তসীমায় থাকি। এই যে বস্তীর উত্তর দিকের রাস্তাটা—ওইটেই বস্তী এবং বাসার মধ্যে বাউণ্ডারী লাইন হয়ে রয়েছে। এ পাশে এই যে বাড়ীগুলো—এই সারিরই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা বাড়ীর একখানা ঘর নিয়ে থাকি আমি।

—আমাকে কোথায় রাখবেন? মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিমলের চট করে মনে পড়ে গেল তার স্বর্গগত বন্ধু সাহিত্যিক রবীন্দ্র মৈত্রের নাটক—মানময়ী গার্লস স্কুলের একটা কথা। নিঃসম্পর্কিত একটি পুরুষ ও নারী মনের জোর থাকলে—একই ঘরে ট্রেনের এক কম্‌পার্টমেণ্টের সহযাত্রীর মত রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রসিকতা করবার প্রলোভন ত্যাগ করলে সে। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল—সেটুকু সে গোপন করলে না, হাসিমুখেই বললে—ভাবছি সেই কথা।

তারপর বললে—আসুন।

একটু দূরে একটা কয়লার ডিপো—তার সঙ্গে ছোট একটি মুদীখানা। সেখানে গিয়ে বিমল ডাকলে—চিত্ত! সঙ্গে সঙ্গে একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

বিমলের গ্রামবাসী চিত্তরঞ্জন। বয়সে বিমলের কনিষ্ঠ—ছোট খাটো মানুষ—দেখে মনে হয় পনের ষোল বছরের ছেলে, কানে খাটো; আপন চেষ্টায় গড়ে তুলেছে এই মুদীখানা—কয়লার ডিপো; একদল লরীর মালিকের সঙ্গেও খানিকটা ভাগে কারবার আছে, নিজে একখানা লরী ড্রাইভ করে, মাল বইবার অর্ডারও সংগ্রহ করে, তার জন্য একটা বখরা পায় সে। ভাল ঘরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নাই। প্রথম যৌবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরেছে। মধ্যপথে গেরুয়া ছেড়ে

ড্রাইভারি করেছিল। দেশে ফিরে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করেছিল। সে ছেড়ে—প্রাইভেট-ট্যাক্সীর ড্রাইভারি করতে গিয়ে পেশোয়ারীদের স্মাগ্‌লিং-এর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল।

নূতন মাষ্টার বুইক গাড়ী নিয়ে কলকাতা থেকে যেত দুর্গাপুরের জঙ্গলের মধ্যের এক গোপন আড্ডায়, সেখান থেকে মাল নিয়ে রাত্রি দুপুরে ফিরত আড্ডায়। তার পাশে বসে থাকত একজন—কোমরে ছোরা, হাতে রিভলভার নিয়ে। পিছনের সিটেও থাকত দু জন সশস্ত্র লোক। ঘণ্টায় চল্লিশমাইলের দাগে স্পীডোমিটারের কাঁটা রেখে গাড়ী চালাত। রেল ফটকের দূর থেকে তীব্র দীর্ঘস্বরে ইলেট্রিক হর্ণ বাজিয়ে সঙ্কেত জানাত গেটম্যানদের। তারা প্রত্যেকেই এ হর্ণ চেনে। পঞ্চাশগজ দূরে ট্রেণ থাকলেও ফটক খুলে যেত। উল্কার মত গতিতে গাড়ী ট্রেণের সামনে দিয়ে পার হয়ে আসত। সেখান থেকে একদা আবার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বৎসরখানেক ঘুরে কাশীতে এসে বিবাহ করে। সস্ত্রীক দেশে ফিরে কিছুদিন চাষবাস ক'রে সংসারপাতার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানে ওই পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রা তার ভাল লাগেনি। এখানে এসে কয়লার ডিপো করে, তারপর জুড়েছে তার সঙ্গে মুদীখানা। ছোট একটি বাসাও আছে, এই বস্তীর মধ্যেই ছিটে বেড়ার ঘর, বাঁধানো মেঝে, টিনের চাল, সাধারণ বস্তীর ঘর নয়, বেশ একটু সম্ভ্রান্ত, স্বতন্ত্র কল-পাইখানা স্বতন্ত্র উঠানের একটা ফালি। অনেক কদর্য্যতার মধ্যে দিয়ে এসেছে চিত্তরঞ্জন কিন্তু তবু তার মনের সেই প্রসন্নতাটুকু আছে যার প্রসাদে সে মানুষকে অকপটে ভাল ব'লে গ্রহণ করতে পারে এবং চায়। কপটতা প্রকাশ করলে তখন সে ক্ষমা করে না, তার জন্য ছুরি বার করে বসে প্রকাশ্যেই এবং তার জন্য কোন ভয় নাই তার।

চিত্তরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভিতর থেকে উত্তর দিলে—দাদা।—আসুন-আসুন-আসুন। এই রাত্রে? বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে অরুণাকে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি? কি চান—?

বিমল বললে—ওঁর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি চিত্ত। উনি বড় বিপদে পড়েছেন—রাত্রিটার জন্য তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পার?

চিত্ত অরুণার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলে, বললে—কিছু মনে করবেন না। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনি হোটেল উজ্জয়িনীতে ছিলেন না? এ্যাকক্টর রতনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় উত্তর দিকের কোনটায়—।

অরুণার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চিত্ত বললে—ভুল হচ্ছে কি না জানি না কিন্তু—। আমি ওই হোটেলটায় কয়লা সাপ্লাই করি কি না! ম্যানেজার বারান্দায় চেয়ার টেবিল সাজাবার ব্যবস্থা করছিলেন—আমার তাড়াতাড়ি ছিল—সেখানেই গেলাম। ঠিক আপনার মত।

অরুণা এবার বললে—হ্যাঁ আমিই।

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—আপনিই। তাই তো বলি—এত ভুলই কি হবে আমার? তা হোটেল থেকে চলে এলেন কেন?

বিমল বললে—সে অনেক কথা চিত্ত। তবে উনি চ'লে এসেছেন—না-এসে উপায় ছিল না। হঠাৎ আমায় রেডিয়ো আপিসে দেখে আমার পরিচয় পেয়ে আমায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ধরেছেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিটার মত আশ্রয় ক'রে দিতে হবে। আমার তো ওই একখানি ঘর। অবশ্য ওঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার দোকানে থাকতে পারি।

—উঁহু। ঘাড় নাড়লে চিত্ত। বললে—কথা উঠবে। যারা ওঁকে দেখবে আপনার ঘরে তারা নানা কথা বলবে।

বিমল বললে—আমি বলছিলাম ওঁকে যদি রাত্রিটার মত বউমার কাছে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দাও—তুমি আমার ঘরে থাক।

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—সর্ব্বনাশ। আপনার বউমাটিকে তো জানেন না! সে এক সংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। ওঁর চোদ্দপুরুষ—আমার চোদ্দ দুগুণে আটাশ পুরুষ—আপনার হয়তো বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

—বাবু! ডিপোর কুলী একজন এসে দাঁড়াল।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে চিত্ত। কানে খাটো চিত্ত ছোটখাটো প্রশ্নোত্তর ইঙ্গিতেই সেরে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। কুলীটা বললে—বাবুলোক ডাকছে।

বিমল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানে—ডিপোটার ভিতরের দিকে কুলীদের ঘরে প্রায়ই চিত্ত এবং তার কয়েকজন বন্ধুর নৈশ আড্ডা বসে থাকে। এবং সে আড্ডায় চলে পান ভোজন। গোপনতা নাই, তবে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে ঘরের ভিতরেই বসে, গ্রীষ্মকালে ডিপোর কয়লার স্তূপের আড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় পাতে প্যাকিং কেসের টেবিল এবং কয়েকটা মোড়া ও টুল। চিত্ত এখুনি গিয়ে মদ্যপান করে আসবে—তারপর অসঙ্কোচেই ফিরে এসে ক্রমশিথিলবন্ধন রসনায় কথা বলতে সুরু করবে। সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তা হ'লে ওঁকে আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার এই মুদীখানাতেই শোব। বুঝলে!

চিত্ত বললে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঁচ মিনিট। আমি আসছি।

সে রাস্তায় নেমে পড়ল। বললে—এলাম ব'লে!

—কোথায় যাবে?

—আসছি।

অরুণা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমি আপনাকে বড় বিব্রত করলাম।

বিমল কোন উত্তর দিলে না। বিব্রত হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে বিনয় দেখাবার মত ঔদার্য্য তার ছিল না।

অরুণা বললে—আমি বুঝতে পারছি, হোটেল ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয়নি। কাল সকালে বেরিয়ে যা হয় করাই বোধ হয় ঠিক হত। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রতনবাবু যে রকম উৎপাত সুরু করেছিলেন—তাতে থাকতে ভরসা পেলাম না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী ছিল না, সম্বলের মধ্যে কয়েকগাছা চুড়ি বিক্রী করলাম দায়ে পড়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে যা থাকল তাতে অন্য হোটেলে উঠতে ভয় পেলাম। তা-ছাড়া—।

বিমলের কোন সাড়া না-পেয়ে মেয়েটি আর কথা বলতে উৎসাহ পেলে না। তবু মনে মনে সে আহত হল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নীরব হয়ে গেল।

আঘাত সহ্য করা অরুণার অভ্যাস আছে। আজ তিন বৎসর ধরে এই অভ্যাসই সে করে আসছে। বাপমায়ের সে একমাত্র সন্তান। মা ছিলেন চিররুগ্না বাপ ছিলেন কেরাণী। কেরাণী হলেও ভদ্রলোক ছিলেন আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন, গানবাজনা শিখিয়েছিলেন। সভাসমিতিতে নারীভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিতে দিতেন, মেয়েদের শরীর চর্চ্চার আখড়াতেও দিন কতক দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের মা রুগ্না বলে এতটা সম্ভব হল না, দেখা গেল তাতে সময়ের অসঙ্কুলান ঘটছে, না হলে রুগ্না মাকে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। সেই কারণে শরীর চর্চ্চার আখড়ার খাতায় নামটা কাটিয়ে স্কিপিং রোপ কিনে দিয়ে বাড়ীতেই খানিকটা স্কিপিং করতে বলেছিলেন। অন্য দফাগুলো অত্যন্ত হিসেবের সঙ্গে বেশ সুশৃঙ্খলায় চালিয়ে যেতেন। সকালে ঘরের হাল্কা কাজগুলো করতেন মা, অরুণা রান্না চাপিয়ে দিয়ে—সেইখানেই বসত বই নিয়ে। বাপ স্নান করে এসে অরুণাকে দিতেন স্নানের ছুটি, অরুণা স্নান সেরে কাপড়-চোপড় মেলে দিয়ে ফিরত, মা জল ঢেলে খাবার জায়গা করে—তৈরী রান্না পরিবেশনের ভার নিতেন। বাপ ও মেয়ে খেয়ে দু জনে এক সঙ্গে বের হত; মেয়েকে ইস্কুলে দিয়ে বাপ যেতেন—আপিসে। বিকেলে বাপের আগেই সে ফিরত। সে সময় অন্য মেয়েদের সঙ্গ পেত।

খানিকটা পথ একা অতিক্রম করতে হত কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা ঘটত না। সে সাহস তার বেশ ছিল। বিকেলে খানিকটা স্কিপিং করে—সে রান্না চড়াত। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে রান্না শেষ করে—গা ধুয়ে কাপড় কেচে—সে পড়তে বসত। অরুণার বাপ নিজে গান বাজনা জানতেন—সন্ধ্যায় তাঁর একটা গানের টুইশিনি ছিল—সেটা সেরে তিনি ফিরতেন সাড়ে আটটায়। অরুণা মাকে খাইয়ে তখন বসত বাপের কাছে গান শিখতে। সভা সমিতি কনফারেন্স, বারোয়ারী পূজা ইত্যাদির সময় মেয়ে কর্ম্মী দরকার হলে—অরুণাকে প্রথম-প্রথম্ তিনি নিজেই তাদের দলে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসতেন—পরে অরুণা নিজেই যেত—কোমরে কাপড় বেঁধে স্যাণ্ডেল পায়ে—বেণী ঝুলিয়ে নির্ভয়ে উৎসাহের সঙ্গে। সে সময় অরুণার সংসারের কাজগুলি বাপ নিজেই করতেন। চিররুগ্নতা সত্ত্বেও অরুণার মা ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ এবং পূর্ব্ববঙ্গের গতিশীল সমাজের উপযোগী মানসিকতাসম্পন্ন ; মেয়ের এই সব কাজকে তিনি এই দেশের সামাজিক রীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন ; সুতরাং কোন দিক দিয়ে কোন বাধা বা অশান্তির উপদ্রব হয় নি। জীবনের ক্ষেত্রটুকু সম্পদের উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ ছিল না বটে কিন্তু জলসিঞ্চন ও যত্নের অভাব ছিল না এবং মাথার উপরে ছিল না কোন আওতার অত্যাচার—তাই সতেজ স্বাস্থ্যেই সে বেড়ে চলেছিল। হঠাৎ একদা মা একেবারে শয্যাশায়িনী হলেন—তারপর ছ'মাস ভুগে মারা গেলেন, সেবার সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। অরুণা আঘাত পেয়েছিল—সে আঘাতের ফলে বইটই তুলে রেখে বলেছিল—পরীক্ষা আমি দিতে পারব না এবার।

বাবা একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন—না, না। পরীক্ষা দিতে হবে মা। একটা বৎসর নষ্ট হয়ে যাবে। সে হয় না। পড়াশুনোর মধ্যে বরং সান্ত্বনা পাবে, অনেকটা ভুলে থাকতে পারবে। ও সব ছেড়ে চুপ করে বসে থাকলে মন আরও খারাপ হবে।

পরীক্ষা দিতে হল অরুণাকে। সেকেণ্ড ডিভিশনে পাসও হল। বাপকে প্রণাম করতেই বাবা বললেন—আমার ইচ্ছে তুই ডাক্তারি পড়িস। কিন্তু তুই কি পারবি ?

অরুণা চুপ করে রইল, তার ওদিকে রুচি ছিল না। কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে তার কিশোর মনে তখন একটা স্বপ্ন লোকের সৃষ্টি করেছে।

বাপ কিন্তু কথা বলছিলেন তার অনুজ্জ্বল বর্ণের দিকে চোখ রেখে—তার মুখশ্রীর মধ্যে গঠনত্রুটিগুলির প্রতি লক্ষ্য করে। তবে তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণ এবং উদার। মেয়ের মৌনতা যে সম্মতি জ্ঞাপন করছে না এটুকু বুঝলেন—এবং মনে মনে ভাবলেন, বি-এ পাশের সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গীত পারদর্শিতার গুণ গৌরব থাকলে—মেয়েদের পড়িয়ে শুনিয়েও জীবনটা চালিয়ে যেতে পারবে। হেসে তিনি বললেন—কিন্তু তুই ডাক্তারীতে সুবিধে

করতে পারবি নে। আই-এ ই পড়। কোন কলেজে পড়বি, দেখ।

অরুণা বললে—আমি বাড়ীতেই পড়ব বাবা। আপনি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।

হেসে বাপ বললেন—তা হ'লে আমি কেরাণী না হয়ে কলেজের লেকচারার হতাম রে। সে কি হয় আমার দ্বারা! আর কেরাণীগিরি ক'রে বিদ্যার মর্ম্মবস্তু আমি ভুলেই গিয়েছি। চর্ম্মটুকু অর্থাৎ কোনরকমে ভাষার ব্যবহারটা মনে রেখেছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া জীবনে পথ চলতে হলে শুধু ঘরে বসে শুধু ম্যাপ দেখে রাস্তা চিনলেই চলে না, বেরিয়ে পথের সঙ্গে পরিচয় করতে হয়। কলেজ এডুকেশনের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

অরুণা কলেজে ভর্ত্তি হল।

ঘর যেমন চলছিল—তেমনি চলতে লাগল- বরং রুগ্না মায়ের তিরোধানে একটা সুবিধাই ঘটেছিল। গৃহিণীপনার মমতায় গৃহের পরিচর্য্যার যে সব আতিশয্যমূলক কাজ-কর্ম্মগুলি থাকে - সেগুলি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হল; মায়ের সেবায় যে সময় যেত সে সময়টা হাতে এল। বাসার মধ্যে--বোর্ডিংয়ের বাসিন্দের মত পিতাপুত্রীর জীবন চলতে লাগল।

আই-এ পরীক্ষার ছ'মাস আগে হঠাৎ অরুণার বাবা মারা গেলেন—গুণ্ডার ছুরিতে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সজীব আগ্নেয়গিরি ঢাকা। হঠাৎ একটা ছোটখাটো অগ্ন্যুৎপাৎ হয়ে গেল একদা। আপিস থেকে ফিরবার পথে একটা গলির মুখে একজন গুণ্ডা এসে তাঁকে ছুরি মারলে। মেরেছিল পেটে। অন্ত্রপাতি সমস্ত বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন।

ভাবতে ভাবতে আজ এই কলকাতা সহরের পথের ধারে বসে অরুণার মনে হল—স্থান কাল পাত্র সব তার হারিয়ে গেল। সে যেন চোখের উপর দেখতে পেলে তার বাপের মৃতদেহ। শুধু বাপের মৃতদেহই নয়। এর পরই তাদের পাড়ায় মারা গেল ওই গুণ্ডা-সম্প্রদায়ের দু'জন লোক। বাপ আর বেটা। ঠিক তার বাপের মত পেট চিরে দিয়েছিল। অরুণাকে ডেকে দেখিয়েছিল মৃতদেহ দুটি।

শিউরে উঠল অরুণা।

চিত্ত এসে এই সময়টিতেই বললে—আসুন। একটা ব্যবস্থা করেছি।

অরুণা তাকালে তার মুখের দিকে, তার মুখ থেকে বিমলের মুখের দিকে। তার দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন ছিল। সে জানতে চাইছিল—আশ্রয় স্থানটির কিছু বিবরণ। বুঝতে চাইছিল—সে স্থান গ্রহণ করা যেতে পারে কি না!

বিমলই প্রশ্নটা করলে—কোথায় ব্যবস্থা করলে ?

চিত্ত বললে—পাড়াতে তিন চারটি বিধবা বেড়ায় দেখেছেন, বেশ আপ-টু ডেট সাজপোষাক করে, পাড়ার ছোঁড়ারা যাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তারা কে ? কি করে তারা ?

চিত্ত হাসলে। বললে—আগে বিধবা মেয়েরা কাশী যেত। লোকেও পাঠাত—খারাপ মেয়েদের, আবার যার কেউ কোথাও নাই—সে যেত কাশী, বিশ্বনাথ রক্ষাকর্ত্তা—আর খেতেও পেত—ছত্র ছিল—মঠ ছিল। এখন আর কাশী যায় না। আসে কলকাতায়, তীর্থ বলুন তীর্থ—নরক বলুন নরক—যা খোঁজে পায়। এ বিধবা চারটি থাকে একটি বাড়ীতে—আমার বাড়ীওয়ালার বাড়ীর পাশেই এক বাঙ্গাল ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই তাঁর বাড়ীতে দুখানা কামরা ভাড়া দিয়েছেন, ওদের একজন তাঁর নিজের লোকও বটেন। বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল আছে, দোকান থেকে কাটা কাপড় নিয়ে এসে সেলাই করে দেয়, পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরে, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ পর্দ্দা তৈরী ক'রে বিক্রী করে। আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে—আমি অর্ডার টর্ডার যোগাড় করে দি। তাদের ওখানে গিয়ে বললাম। তা তারা রাজী আছেন। তবে বাড়ীটি পাকা মেঝে বস্তী। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো ?

অরুণার চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।—না-না-না। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—বিমল দা-কে দেন ধন্যবাদ। উনি যদি সঙ্গে করে না আনতেন আপনাকে—তা হ'লে—। কিছু মনে করবেন না যেন। ওই হোটেলটায় ওই এ্যাক্টর রতনলালের সঙ্গে দেখার পর আমার বিশ্বাসই হ'ত না—আপনি ভদ্রঘরের কি ভদ্রমেয়ে বলে। তবে উনি যখন সঙ্গে এনেছেন তখন আরও খারাপ দেখলেও বিশ্বাস করব আমি।

পাশের গলির মুখে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। বললে—কই চিত্তবাবু ? কে আসবেন ?

চমৎকার দেখতে মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখ—টিকালো নাক—বেশ মর্য্যাদাময়ী সুশ্রী মেয়ে। তেমনি সপ্রতিভ—অরুণাকে দেখে বললে—আসুন ভাই।

বিমলের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহসই হয় নি ইচ্ছে থাকলেও। আজকে এঁর দৌলতে সে সুযোগ হল।

বিমল প্রতিনমস্কার করলে,—বললে আপনাদের কথা চিত্ত আমাকে বলেছে। আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যই শ্রদ্ধা করি।

ক্রমশঃ

স্থানে ও স্তানে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো!

বুক যার ছোট হয়ে গেছে ভয়ে, উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা হয় ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ-হয় প্রশ্নের সঙ্গে তার ঝাঁঝ আরো বেশী।

পালাচ্ছি না, নরহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু'একজন বিশ্বাস করে। —সেকি! এখন কেন? পনেরই আগষ্ট যাক্? দু'একমাস দেখুন কি দাঁড়ায়? নিজে থাকেন আলাদা কথা, এসময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটের দায়ে থাকতেই যখন হবে, আনতেই যখন হবে, দেরী করে লাভ কি। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভাল, মনের জোর বাড়ে। —নরহরি জবাব দেয়।

ষ্টিমারে অসম্ভব ভিড়। পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ ষ্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গরুছাগলের মতই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল। নদীর বিস্তারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা ঘেঁষাঘেঁষি উদারতা। আজ সকলের চোখে মুখে নড়াচড়ায় বলায় ভঙ্গিতে, সমবেত গুঞ্জণে, একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমাসংখ্যাহীন অচেতন আদানপ্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতই মানুষ। মনে হয়, বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনা যেন উদার গভীর মানবতার আবর্ত্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেণে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ বার জন ডাকাত, অস্ত্রধারী, দু'জনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়ীতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না ডাকাতেরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের ষ্টেসন থেকে ছাড়ার পর গাড়ীর গতি একবার মন্থর হয়ে আসে, লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। গয়ণাগাঁটি সব সংগ্রহ করে, একটি তরুণীকে সাথী করে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধ হয় তাদের ছিল। উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়েটির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে ছোরা মেরে কাজ অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি

নেমে পালায়। একদল যাত্রী হৈ হৈ করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের গুলি তাদের ঠেকাতে পারে নি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।

নরহরি শুনেছিল অন্য কথা। এসব নিত্যকার ঘটনা আর এরকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেরে পড়ে থাকে বা বসে বসে ঝিমোয়। শেষটা তা হলে সত্যি নয়।

শিয়ালদা'র গাড়ী পৌঁছল দেরীতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে নরহরি একবার তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত সহরের ষ্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে ঐই সহরটির প্রতি তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ উত্তেজনা স্বপ্নের সমারোহে, বিয়েবাড়ীর আলো আর সানাইয়ের তানে, সুমিত্রাকে বাপের বাড়ী আনা নেওয়ার বিরহ মিলনের মাধুর্য্যে কি প্রিয় ছিল এ সহর তার কাছে। কদিন আগেও ছিল। প্রিয় আর রোমাঞ্চকর, তারই জমজমাট গৌরব। ঢাকায় বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুসী হয়ে অনুভব করেছে তার নিজের চঞ্চল রক্তের তাপ। ছাত্র অভিযানের জয়, লাখ নাগরিকের মিলন-অভিযানের জয়, ধর্ম্মঘটের জয়, মিলিটারী অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়—জয়ের পর জয়। তারপর যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায় মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নরহরির কাছে সহরটাকে অপ্রিয়, ঘৃণ্য করে তুলতে পারে নি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতর হয়েছে।

আজ সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে অন্ততপক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে এ সহরের হিন্দু মুসলমানরা। তার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। এ সহরে হিন্দুও থাকে না মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদের আস্তানা।

সুমিত্রার বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত হয় তো পৌঁছবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপ-ভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো বাবা এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তারটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভাল আছেন? কবরেজের ওষুধ খেয়ে কমেছে একটু?

মা পুরী গেছেন ওমাসে।

ওঃ! তা ভাল আছেন তো? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা

পড়ছি বাবাজী, মাথা ঘুরে যায়। উড়িষ্যার ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙ্গালী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে।

—মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হল। কিন্তু—

বড় শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতী বাঙ্গালী মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুণ্ডারা থাবলা দিচ্ছে বাঙ্গালী মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার সুরু করেছে, কি বিপদ ভাবতো!

মেজ শালা শ্যামল বলল, দু'টো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আর জন্মে ভুলবে না। মুড়ি মুড়কির দোকানের ওই অর্জ্জুন আর সতীশবাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুর ঝি আর অর্জ্জুনের বৌটাকে ছেলেরা ধরেছিল। তা আমরা ভেবে দেখলাম কি, যতই হোক আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত হবেনা। ভেবে চিন্তে তাই ছেড়ে দিলাম। জানো নরহরি, ভদ্র হয়েই আমরা আজ বিপদে পড়েছি। ওদের মেয়ের ওপর যদি অত্যাচার চালাতে পারতাম, ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

নরহরির খিদে পেয়েছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদর অভ্যর্থনা হয় নিখুঁত। বড়লোক নয় নরহরির শ্বশুর, অথচ ভেজিটেবিল ঘিয়ে ভাজা লুচির সঙ্গে সন্দেশ দেওয়া হয় তাকে জলখাবার। ঘরে তৈরী মিষ্টি ছানা নয়, দোকানের দামী সন্দেশ। খাবারের দোকান সব বন্ধ, তবু।

কার ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, তার বাচ্চাটার আওয়াজের মতই যেন মনে হয়। শালী সুষমারও হতে পারে। সুষমা তাকে শান্ত করছে, চুপ্, চুপ্, শীগগির চুপ্,—মুসলমান ধরে নেবে।

পাল্টা ছড়াও শুনেছে নরহরি: চুপ্ চুপ্, শিখ আসছে!

তা, দুমুখী ক্রিয়ার দু'মুখী প্রতিক্রিয়া হবেই।

অতুল সাবধান করে দেয়, কাজ না থাকলে বেরিয়ে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা করে বলে, বেরোনো মানেই প্রাণ হাতে করে বেরোনো। এখানে হাঙ্গামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হয়তো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুস্কিল ওইখানে, পরিমল বলে সায় দিয়ে, কোনটা সেফ্ কোনটা সেফ্ নয় জানাটানা থাকলেও বরং খানিকটা—

নরহরির মুখ দেখে ছোট শালা অমল বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মায়া আছে। দরকার থাকলে বেরোবেন, যেদিক সেদিক ঘুরবেন না, ব্যস্।

তুই তো বললি ব্যস্'—পরিমল চটে বলে, জানবে কি করে? ব্যাটারা ট্রাম চালু

রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই? ব্যাটাদের এরিয়ায় ভুল করে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিয়ায় ঢুকলে তোমরা সন্দেশ খাইয়ে দাও, না?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত ছোঁড়ার বিশ্রী গা-জ্বালানো কথাবার্ত্তা।

নরহরি সবিনয়ে বলে, বেরোবো আর কোথায়, দু'একটা জিনিষপত্র কেনা। কারো সাথে দেখা করার সময় হবে না। গোছগাছ করে দিনে দিনেই ষ্টেশনে চলে যাব সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি? পরিমল বলে।

চিঠি পান নি?

চিঠি তো পেয়েছি। মানে বাপু বুঝতে পারেনি চিঠির তোমার। মাথা খারাপ না হলে কেউ—

থাক্, থাক্। অতুল বলে, হবে'খন ওসব কথা। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ওবেলা বসে পরমর্শ করা যাবে। আজ তোমার যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া কর, মাথা তোমার ঠাণ্ডা হোক, ওবেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব!

আরও ঠাণ্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখার সময় ভেবেছিলাম দু'একদিন থাকতে পারব। সে উপায় নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

ষ্টেসনেও ঠিক করে নি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে সহরের সন্ত্রস্থ চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের জন্য দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিত মৃত্যুদানের ঘটনা, এ বাড়ীর হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আনছে। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কি বল তো? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না পাবে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে!

যে পারে সেই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা আনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করেছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে! শ্যামল হেসে বলে, তোমার তাড়াহুড়োটা পড়ল কিসে? টিঁকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলটপালট হচ্ছে তো চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে। এঁদের না নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পারে আমার।

সে কি!

তাই তো স্বাভাবিক। ঘরসংসার পেতে যারা আছে, যারা থাকতে চায়, তারা নিশ্চয় প্রিফারেন্স পাবে। আমি বৌ ছেলে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়, পালাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন?

বলেছে নাকি? তোমার তো হিন্দু আপিস! হিন্দু হয়ে কর্ত্তা তোমায় একথা বলল?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্ত্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ওদেশের লোক হয়ে? যখন খুসী ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরী থাকব, তবু কর্ত্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে?

যায় যাবে অমন কাজ! শ্যামল বলে বীরের মত, চাকরীর জন্য বৌকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সী মেয়ে বৌ একটিকে ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সী মেয়ে বৌকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন যদি যান, আর একটি মোটে বাড়বে।

ওসব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কি! কলকাতায় চলে আসবে, একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ী ফেলে চলে আসব? আপনাদের তো হাজার হাজার লোকের চাকরী যাচ্ছে, চাকরী দেবে কে আমায়?

সে যা হয় হবে, উপায় কি! তাই বলে—

আপনি তো বলে খালাস্!

সুমির মত অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ব্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধ হয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোল, এর মেয়ে আর ওদের বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হল। সুমিত্রা তার বৌও বটে, শত শত বৌয়ের কি হবে না হবে একথাটা সে কেন টেনে আনছে তার নিজের বৌয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এরা। একটু স্তম্ভিত হয়ে গেছে তার কথাবার্ত্তায়।

তোমার মতলব ভাল নয় নরহরি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকরী রাখতে চাও!

অতুল অতি কষ্টে বিবাদ সামলায় স্ত্রীর সাহায্য পেয়ে, সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই নরহরির শাশুড়ী হলুদলঙ্কা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি মারছিল দরজার আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকে নি, এবার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝণাৎ ঝণাৎ চাবির রিঙের আওয়াজ করল তিনচারবার পিঠে আছড়ে অছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবার আগে নরহরি ঘোষণা করল, হাজার হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুম্‌ড্‌ এতো জানা কথাই।

গুম খেয়ে যাবে ঠিক করেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুম্‌ড্‌ হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারা যা আরম্ভ করেছেন কলকাতায়, যদি হয় তো তাতেই সর্ব্বনাশ হবে আমাদের! আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে একটু একটু প্রগতিমূলক ও রাজনীতি চর্চ্চা করে বলে সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথার চেয়ে তার কথায় বেশী জ্বালা ধরে বাড়ীর লোকের গায়ে।

পার্কসার্কাসের আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য্য যে তার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনলে গায়ে জ্বালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে,—এ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে!

তুই চুপ কর! কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ার সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধাবাড়া খাওয়াদাওয়ারও। আজকের গাড়ীতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নরহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ীর লোক জানে শেষ পর্য্যন্ত নরহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু'একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি সমস্যার আগামাথা। নরহরি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে।

হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালমন্দ হিসাব করেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবেনা ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে—বাঙাল তো! সেবার ওর বড়খোকার চিকিৎসা করছিল এ পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের এলোপ্যাথি ডাক্তার—শ্বশুরবাড়ীতে পা দেবার দু'ঘণ্টার মধ্যে!

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে চিকিৎসায় বিশ্বাস করি সেই চিকিৎসায় মরুক!

কি কাটা কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান না করুন কিছু যদি ভালমন্দ হত ছেলেটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নরহরির! কী আপশোষটাই তাকে করতে হত গুরুজনের কথা না শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করার জন্য।

তাই, তাড়া না থাকলেও বারোটার মধ্যে খাইয়ে দেওয়া হল নরহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওয়া হল শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বৌদিদিদের হেফাজতে।

ঘণ্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা ভাবল কি, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসার এ সুবিধাটুকু না ছাড়াই ভাল। আগে বোঝাপড়া হোক, নরহরি স্বীকার করুক এখনকার মত বাপের বাড়ীতেই সে তাকে রাখবে, তারপর হাসিমুখে নিজেকে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয়নি? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না হলে চলবে কেন মেয়েমানুষের।

এসেই ঝগড়া সুরু করলে? বেশ তুমি! পান চিবানো বন্ধ রেখে পানরাঙা ঠোঁটে হাসে সুমিত্রা, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালেয় ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম? আশ্চর্য্য হয়ে বলে নরহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায় নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবেন না। তোমায় আমি যেখানে খুসী নিয়ে যাই, তাতে ওদের কি?

মনে মনে একটু চটে যায় বৈ কি সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ মা ভাই বোন যে গো! ভাবনা হবে না?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কি যে বলে! তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি রাস্তার লোক? বাপভাই বুঝি রাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয়? আমি বুঝি রাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধা হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলটপালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জ্জন নিরিবিলি মাধুর্য্যের ভূমিকা পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যায়।

আমি তো আজকেই যাব ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে?

তবে কি? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

কলহ এবং কান্না। আগে অনেক হয়েছে, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। অনেক আশা করে ওরই মধ্যে মিষ্টি হয়ে উঠে নরহরির বুক আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা কত নিবিড় কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানের পিতামাতার ভালবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙ্গে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বলো, নরহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মত করে বলল, আজ না গিয়ে পরশু যেতে রাজী আছি।

তোমায় যেতে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

ছেলেখেলা নয়, নরহরি বলে, রাগ অভিমানের কথা নয়। যদি না যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকী জীবনটা বাপের বাড়ীতেই কাটাতে হবে তোমার—বিধবার মত।

আমায় নয় মেরে ফেল তুমি!—আর্ত্তনাদ করে ওঠে সুমিত্রা, রাত বিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুসী করবে আমায় নিয়ে, তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফেল নিজের হাতে।

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নরহরি। বিষণ্ণ বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোট একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়ীতেই বোধ হয়—তার ছেলেটার মত গলা। অন্যের কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধ হয় কাঁদছে।
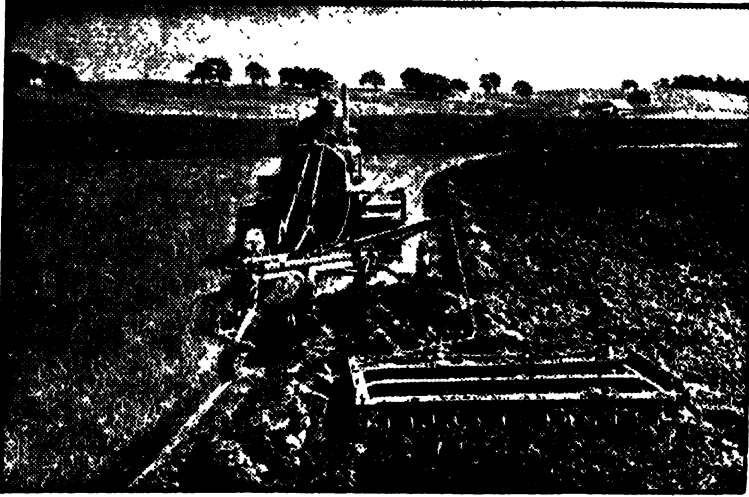
ক্ষুদিরাম

স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে আজ আমরা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করি সেই সব দীপ্তপ্রাণ মুক্তিসাধকদের যাঁরা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য অম্লানবদনে তাঁদের প্রাণ উৎসর্জ্জন করে গেছেন। এই প্রাণবহ্নির প্রথম পরিচয় দিয়ে গেছেন ক্ষুদিরাম—নিজের দেশকে ভালোবাসার অপরাধে যে যুবক মাত্র কুড়িটি বৎসরও বাঁচবার অধিকার পাননি। বিদেশীর দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ ছিলোনা, অভিমান ছিলোনা—সেদিন ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম রাজদ্রোহী ক্ষুদিরাম যে হাসি হেসেছিলেন, ভারতের অগ্নিমন্ত্রের উত্তরসাধকরা কোনদিনই তা ভুলতে পারে নাই—সেই উজ্জ্বল হাসির বরাভয় পেয়েই তারা অনন্ত সাহসে উজ্জীবিত হয়েছে, অনর্থক বলে মনে করেনি তাঁদের আকস্মিক জীবনাবসানকে। ক্ষুদিরাম তাঁদের অগ্রদূত, ক্ষুদিরাম দিয়েছেন তাঁদের দেশকে ভালবাসার মন্ত্র, দেখিয়েছেন তাঁদের অগ্রগতির পথ, এবং সব চাইতে যা বেশী তা হচ্ছে এই যে—তিনি ভবিষ্যৎ অনুগামীদের দিয়ে গেছেন মৃত্যুকে নির্ভয়ে এবং হাসিমুখে গ্রহণ করার মহান দীক্ষা। স্বাধীন ভারতের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তাই ভারতের প্রথম উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মুক্তিসাধকের স্মৃতির প্রতি প্রথম নমস্কার জানাই।

সূচীপত্র

পূর্ব্বাশা : আশ্বিন—১৩৫৪

নিয়মাবলী

১। পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখ প্রকাশিত হয়।

২। চলতি মাস হইতে গ্রাহক হইতে হইবে, পুরাতন সংখ্যা দেওয়া যাইবে না।

৩। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষান্মাসিক ৩৲।

৪। ষ্ট্যাম্প সঙ্গে না থাকিলে প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হইবে না।

৫। প্রতি মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইতে হইবে।

৬। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন।

৭। দশ কপির কম মফঃস্বলে এজেন্সী দেওয়া হয় না, এবং অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হইবে না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা, রেল পার্শ্বেলে পাঠাইবার খরচ আমরা বহন করিব। কমিশন বাদ কাগজের মূল্য অগ্রিম দেয়।

টাকাকড়ি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা—

পূর্ব্বাশা লিমিটেড।

পি ১৩, গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ১২৪৭

বটের ছায়ায়

দশম বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন • ১৩৫৪

বর্ত্তমান জগতে আমেরিকা

শশধর সিংহ

গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিত্ত ও ক্ষমতার দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেবল তফাৎ এই যে, যে-অর্থের প্রসার ও শক্তি এতকাল অন্তর্মুখী ছিল তাহা আজ বহির্মুখী হইয়াছে। আমেরিকার প্রভাব অধুনা বিশ্বব্যাপী। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইহার আর্থিক বা সামরিক শক্তির স্পর্শ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড ও পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলি যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সর্ব্বতোভাবে আমেরিকার মুখাপেক্ষী। ইংরেজ ও অন্যান্য শ্বেত জাতিগুলি যাইতেছে আর্থিক সংকটের যে-ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহাতে উর্ত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহাদিগকে মার্কিন দেশের সহযোগ খুঁজিতেই হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অনিবার্য্য বলিলেও ত্রুটী হইবে না। আর এই অবস্থার সুযোগ নিতেও ইয়াঙ্কীরা পশ্চাদপদ হইতেছে না। এশিয়া ভূখণ্ডেও স্থিতি একই প্রকার। জাপানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আমেরিকার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। চীনের প্রগতিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে আমেরিকার শক্তিচক্রের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যেও মার্কিন

স্বার্থ সেখানকার খনিজ তৈল সম্ভারের তীব্র গন্ধের সহিত মিশিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আফ্রিকা ভূখণ্ডও আমেরিকার ক্ষমতার নাগপাশ এড়াইতে পারে নাই। দক্ষিণ অতলান্তিকের অপরপ্রান্তে দক্ষিণ আমেরিকাতেও যুক্তরাষ্ট্রের জয়জয়কার। মধ্য আমেরিকা চিরকালই "ডলার" সাম্রাজ্যের একটা প্রধান খুঁটি। আর উত্তরের চরম সীমানায় ক্যানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামিল হইয়াও আমেরিকার অদৃশ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্যানাডার বর্ত্তমান অর্থগৌরব মার্কিন দেশের আর্থিক প্রাচুর্য্যের একটা দিক মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান যুগকে আমেরিকান শতাব্দী আখ্যা দিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বাহ্যতঃ আমেরিকার নিকট জগতের পরাভব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

এই ক্ষমতার উৎস কোথায় তাহা বিচার করিবার বিষয়। তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত কতগুলি বৈশিষ্ট্য মার্কিন রাষ্ট্রগঠন ও প্রগতিকে নানা দিক দিয়া এমন সব সুযোগ ও সুবিধা দান করিয়াছে যাহার তুলনা সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশে পাওয়া কঠিন। প্রথমেই ভৌগোলিক দিকটা দেখা যাক্, কারণ ইহা হইল রাষ্ট্রগঠনের প্রথম সোপান। আমেরিকার আয়তন (মোট ২,৯৭৩,৭৭৬ স্কোয়ার মাইল) য়ুরোপ হইতে কিছুটা ছোট্ট কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ। আর আবহাওয়ার দিক দিয়া দেশটি এমনভাবে গঠিত যে, ইহাকে একটি দেশ না বলিয়া বহু দেশের সমন্বয় বলিতে হইবে। উত্তরের শীতপ্রধান অঞ্চল হইতে সুরু করিয়া এই বিপুলায়তন মার্কিন রাষ্ট্র দক্ষিণের বাষ্পসিক্ত-গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাই আমেরিকা ফলেফুলে সমৃদ্ধ। গরম দেশের ও শীতের দেশের প্রায় সব রকম শস্যই এখানে উৎপন্ন হয়। এই সুজলা সুফলা দেশ কেবল যে খাদ্যের দিক দিয়াই সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল তাহা নহে, ইহা জগতের বুভুক্ষু দেশগুলির খাদ্যভাণ্ডারও বটে। বর্ত্তমান খাদ্যসংকটে ভারতবর্ষ কি পরিমাণে আমেরিকার মুখাপেক্ষী তাহা ইহার একটা দৃষ্টান্ত। খনিজ পদার্থের দিক দিয়াও মার্কিন দেশের প্রাকৃতিক সম্ভারের অন্ত নাই। কয়লা ও লৌহের প্রাচুর্য্যের দরুণ গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইস্পাৎ-উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। খনিজতৈল উৎপাদনেও মার্কিনবাসীরা এ যাবৎ পৃথিবীতে সেরা স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কয়লা ও লৌহের সংযোগ হইল সর্ব্বদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার আসল ভিত্তি। গত শতাব্দীতে বৃটেনের আর্থিক প্রাধান্য এই দুইটি খনিজ পদার্থের দৌলতে সম্ভব হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে জার্ম্মেনী ও আমেরিকার শিল্পের উত্থানও একই কারণে ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে জাগতিক শিল্পোৎপাদনের মোট পরিমাণের শতকরা ৪৪ ভাগ মার্কিন দেশ হইতে উদ্ভূত হইত। ১৯৪০ সাল হইতে আমেরিকার ভাগে এই অংশ যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা বাহুল্য। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইহার

ব্যাপকতা আরও বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির একটা কারণ অবশ্য জার্ম্মেনী ও জাপানের পরাজয়, আর অপর দিকে হইল ইহাদের ও অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের শিল্পের ধ্বংস ও অবনতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ য়ুরোপে সুইডেন ও সুইটজারল্যাণ্ড ছাড়া সব দেশেই শিল্পের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং ইহাদের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনাও করিতে হইতেছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিন দেশের উৎপাদন-শক্তি ও বৈভব বহু গুণে বাড়া সত্ত্বেও ঐ দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান হয় নাই। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে, এই সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াছে।

আমেরিকার ভৌগোলিক তথ্য আলোচনা করিতে গিয়া মার্কিনবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের একটা দিক সকলেরই চোখে পড়িবে। ইহাকে মানব চরিত্রের উপর ভূগোলের প্রভাব বলা যাইতে পারে। দেশের বিপুলায়তন ও নৈসর্গিক বৈচিত্র্য একদিকে আমেরিকানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারতা দান করিয়াছে ও ক্ষুদ্র দেশের মানসিক অসাড়তা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বাঁচাইয়াছে আর অন্যদিকে এই প্রভাব মার্কিন চরিত্রকে একাধারে সরসতা দান করিয়াছে ও বহুমুখী করিয়াছে। আমেরিকার শিল্প, বানিজ্য, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, এমন কি ঐ দেশের দানশীলতাতেও একটা বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের অপার বিস্তৃতি মার্কিনবাসীদিগকে কর্ম্মের অফুরন্ত সুযোগ দিয়াছে। অনেকে আবার মনে করেন যে, ইহাদের স্বাবলম্বন ও বিরামহীন কর্ম্মোদ্যম আমেরিকার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ দিক। ঐ দেশের "frontier" বা সীমান্ত প্রদেশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রায় তিন কোটি উৎসাহী, কর্ম্মক্ষম য়ুরোপীয় নরনারীকে আকর্ষণ করিয়াছে। বিপদ আপদের মধ্য দিয়া ইহারা নিজেদের ভবিষ্যতের দ্বার প্রশস্ত করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। ইহাদের অনেকে যাত্রার শেষ দেখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু যাহারা পারিল তাহাদের উদ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা দ্রুত বাড়িয়া চলিল, নূতন নূতন সহর গড়িয়া উঠিল ও ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল। কাহারো কাহারো মতে মার্কিন সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জনগণের পারস্পরিক আর্থিক সম্বন্ধের নির্দ্দয়তাও এই ঐতিহাসিক পরম্পরার একটা অপরোক্ষ ফল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, মার্কিন চরিত্রের মৌলিক গণতান্ত্রিকতা দেশের "pioneering" যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সাম্যভাব এবং অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে মাদকতা ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বর্ব্বরোচিত কর্কষতা আমেরিকার আদিমযুগের জীবন-সংগ্রামের কাঠিন্যেরই পরিচায়ক।

বর্ত্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম যুগের তেরটি উপনিবেশ হইতে সুরু করিয়া আজ আটচল্লিশটি রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। রাষ্ট্রের ঐক্য রাখিতে গিয়া ১৮৬০ সালে ইহাকে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়াও যাইতে হইয়াছে। রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে-মূল

বিরোধকে হেতু করিয়া উত্তরের রাষ্ট্রগুলির সহিত দক্ষিণের বিরোধ ঘটিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। ইহাদের আর্থিক বৈষম্য এখনও রহিয়াছে, দেশের দক্ষিণ অঞ্চলটি আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাদপদ। সুতরাং আইনতঃ দাসত্বপ্রথা রহিত হইলেও কার্য্যতঃ ইহার অবসান হয় নাই। নিগ্রোদের প্রতি অবিচার এখনও চলিতেছে। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের প্রভেদের মূলে রহিয়াছে আসলে ধনোৎপাদনের বিভিন্নতা। দেশের উত্তর অংশে ধনের প্রধান উৎস হইল শিল্প। ১৯০০ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে আমেরিকার কয়লা, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তির প্রয়োগ চারগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত অর্দ্ধশতাব্দীতে দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্প বহুগুণ বাড়িয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে কৃষিপ্রধান দক্ষিণাংশে আর্থিক প্রগতি মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ফলে আমেরিকার দক্ষিণাংশে দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান। আর শিল্পের প্রসার দ্বারা এই দারিদ্র্যের অপসারণ না করিতে পারিলে এখনকার পশ্চাদপদতা যাইবেনা, বর্ণ বিদ্বেষের উগ্রতাও কমিবে বলিয়া মনে হয়না।

আমেরিকার রাষ্ট্রসংস্থানকে মোটামুটি ফেডারেলী সংস্থান বলা যাইতে পারে। এই বিরাট দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে গিয়া কোন কেন্দ্রীভূত সংস্থান অনুকরণ করাও সম্ভবত হয় নাই। ফেডারেলী কেন্দ্র ও দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার বিরোধ এখনও অল্প-বিস্তর বর্ত্তমান তবে গত দশ পনেরো বছরে নিঃসন্দেহ কেন্দ্রের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। মুখ্যতঃ ইহার কারণ অর্থনৈতিক, গৌণতঃ পররাষ্ট্রীয়। ১৯২৯ সালে যখন আমেরিকায় হঠাৎ আর্থিক সংকট দেখা দিল এবং বেকার সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিল, তখন চিন্তাশীল আমেরিকানমাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের অর্থতন্ত্রকে কেবল ব্যক্তিগত খেয়াল ও সংযমন (control) এর উপর ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। এই নিদারুণ অর্থসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গীয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার "New Deal" পরিকল্পনার সূচনা করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল, আমেরিকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ রুজভেল্ট চাহিলেন মার্কিন ধনতন্ত্রের সংশোধন মালিক ও শ্রমিকের সহযোগের ভিতর দিয়া। এই হেতু তিনি মালিকদের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে কমাইতে সচেষ্ট হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের ক্ষমতা বর্দ্ধনেরও সুযোগ জোগাইতে সচেষ্ট হইলেন। ১৯২৯ সালের পর হইতে আমেরিকায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আইনতঃ মানিয়া লওয়া হইল এবং মজুরী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে "collective bargaining" বা সামূহিক চুক্তির নীতি আইনসুলভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই পর্ব্বে আমেরিকায় আরও প্রগতিশীল শ্রমিক আইন (labour legislation)-এর সূত্রপাত হইল।

বলা বাহুল্য, মালিক সম্প্রদায় রুজভেল্টের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে সুনজরে দেখেন নাই। কিন্তু এই সংকটময় সময়ে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের কিছু করিবার ক্ষমতা

ছিলনা। দেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক ও রিপাব্লিকান দলের মধ্যে শেষোক্ত দলটিই অবশ্য "New Deal"এর বিরুদ্ধাচরণ করিলেন বেশী—ঐতিহাসিক কারণে। রিপাব্লিকানদের প্রধান প্রভাব শিল্পপ্রধান উত্তর অঞ্চলে পর্য্যবসিত এবং ডেমোক্রেটদের আসল ঘাঁটি হইল দাসত্বপন্থী দক্ষিণ এলাকায়। যদিও একসময়ে রিপাব্লিকানরা দাসত্বপ্রথার বিরোধী ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যরক্ষার জন্য লড়িয়াছিলেন ও প্রগতিশীল ছিলেন, কিন্তু কালে ইঁহারা রক্ষণশীল দলে পরিণত হইয়াছেন। "Big Business" বা বড় বড় মালিকরা রিপাব্লিকান পার্টির পরিপোষক। ইহারা প্রগতিশীল আইন প্রণয়নের বিরোধী এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল। ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ বা "ডলার ইম্পিরিয়েলিজম্" বলিতে যাহা বুঝায়, ইঁহারাই হইলেন তাহার মুখপাত্র। মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনকে ইঁহারা মোটেই নেকনজরে দেখেন না। ডেমোক্রেটদের সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আদিতে ইঁহারা "State rights" বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের চরম স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন ও ইহাদের উপর ফেডারেলী কেন্দ্রের অনর্থক কোনপ্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অতীতে এই দুই দলের মধ্যে মতবাদের প্রভেদ যাই থাকুক না কেন, অদ্যকার পরিস্থিতিতে ইহা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, যদিও প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (১৯১৩-২১) ও প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৩৩-৪৫)এর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আদর্শবাদের দরুণ আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে ও বহির্জগতে ডেমোক্রেটিক দল প্রগতিশীল পার্টি হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই খ্যাতির হয়ত আরেকটা কারণও আছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রোগান (Brogan) তাঁহার "American Political System" পুস্তকে লিখিয়াছেন: "The basis of the Democratic Party was not the philosophical theory of the state, elaborated with some useful ambiguity by Thomas Jefferson. It was not the result of a careful exigens of the text of the constitution inspired by a fundamentalist belief in its literal interpretation. The real power of the Jeffersonian party came from what Lincoln, who professed to be a Jeffersonian, called the plain people, and the strength of the Jeffersonian party came from the fact, also noted by Lincoln, that God had made many more plain than fancy people." [রাষ্ট্রসম্বন্ধে টমাস জেফারসন্ যে-দার্শনিক মতবাদ চালু করেন সেই অনুসারে ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত হয় নাই। তাঁহার অর্থের অনিশ্চয়তাও এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বেশ কাজে লাগিয়াছে। অন্য দিকে মার্কিন সংস্থানের ভাষাগত নৈষ্ঠিক ব্যাখ্যা বা ইহার অন্তর্নিহিত দৈবিক প্রেরণার উপর ভিত্তি করিয়াও এই দল গড়িয়া

উঠে নাই। জেফারসনের দলের শক্তির আসল উৎস হইল ঐসব লোক যাহাদিগকে লিংকন—যিনি নিজেকে জেফারসনের চেলা বলিয়া গণ্য করিতেন—সাধারণ লোক আখ্যা দিয়াছেন। আর লিংকনের মতে জেফারসনের দলের ক্ষমতার আরেকটি সূত্র হইল এই যে, ভগবান অসাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধারণ লোক দৃষ্টি করিয়াছেন।]

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের "New Deal" দৃষ্টিভঙ্গীও সাধারণ লোকের চক্ষে ডেমোক্রেটিক পার্টির কদর বাড়াইয়াছে সন্দেহ নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থান হইতে ইহার স্থাপকদের চিন্তাধারার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকানরা অনেকে এই কনষ্টিটিউশনকে গণতন্ত্রবাদের চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু য়ুরোপে বিশেষতঃ বৃটেনের চিন্তাশীল লোকের মতে ইহার গণতান্ত্রিকতা বাহ্যিক মাত্র। এই মতামত সর্ব্বতোভাবে সত্য না হইলেও ইহার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাজনীতির ছাত্রদের জানা আছে যে, আমেরিকার তুলনায় বৃটেনের সংস্থানের একটা বিশেষ তফাৎ এই যে, ইহা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহজে রূপান্তরিত হইতে পারিয়াছে, অথচ আমেরিকার সংস্থান নিয়ম কানুনের নাগপাশে গতিশক্তিরহিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় বৃটিশ সংস্থানকে "flexible" কনষ্টিটিউশন বলা হয় আর মার্কিন সংস্থান হইল "rigid" কনষ্টিটিউশনের প্রতীক। অন্য কথায় একটি হইল "অলিখিত" আর অন্যটি "লিখিত"।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই প্রভেদের কারণ কি কেবল এই যে, আমেরিকার সংস্থান যখন লিখিত হয় তখন সে দেশের নেতারা "Separation of powers" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভাগনীতির তাৎপর্য্য সঠিক বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেকে বলেন যে, ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষমতাকে পরস্পর হইতে দূরে রাখিতে পারিলে কোন বিশেষ অঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে পারিবেনা এবং এই ভাবে গণতান্ত্রিকতা চিরস্থায়ী হইবে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক দিয়া এই মতের খানিকটা সার্থকতা আছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহা নিষ্ফল হইয়াছে। এমনকি এই সাংস্থানিক বিভাগের সুযোগ নিয়া আমেরিকায় প্রতিক্রিয়াশীলতা কায়েম হইয়া বসিয়াছে। "New Deal" পর্ব্বের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, প্রেসিডেণ্টকে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করিতে গিয়া কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলে ত ভুল হইবে না যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভাগ করিতে গিয়া আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের স্থাপয়িতাদের মনে যুক্তরাষ্ট্রকে বিপ্লবী চিন্তাধারার সংঘাত হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছাও ছিল। এইখানে আরেকটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আমেরিকার ইতিহাসে

ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বিপ্লবী সংগ্রাম (revolutionary war) বলা হয়। ইহা সত্য যে, এই সংগ্রামে বিপ্লবী মনোবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং সাধারণের মনে উপনিবেশিক যুগের সর্ব্বপ্রকার অসাম্য ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া আমেরিকায় সাম্যের ভিত্তিতে একটা সমাজ গড়িবার ইচ্ছাও প্রবল ছিল। দেশের নেতারা এই মনোবৃত্তির পূর্ণ সুযোগ নিতেও ছাড়েন নাই কিন্তু ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে যতটা পারা যায় ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং ১৭৮৯ সালের স্বাধীন আমেরিকার সংস্থানের ভিতর দিয়া জনসাধারণের বিপ্লবী ভাবকে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিবার ইচ্ছা ইঁহাদের ছিল না বলিলে সত্যের অপমান করা হইবে। স্বভাবতই মার্কিন কন্‌ষ্টিটিউশন সম্বন্ধে লেখকরা সাধারণতঃ মন দেন বা দিতে চাহেন নাই।

কিন্তু এদিকে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্রুত বদলাইয়াছে। আদিযুগের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়া আমেরিকানরা রাষ্ট্র গড়িতে সুরু করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে লোপ পাইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুরাতন জগতের সব রকম সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। দেশের লোকসংখ্যা বাড়িয়া প্রায় ১৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার সীমানা আজ এ্যাট্‌লান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার মত জমি আর নাই। ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্রও আমেরিকানদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ধনী-নির্ধনের প্রভেদও ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে চার বৎসরে শিল্পোৎপাদনের সূচক (index) ১১৯ হইতে ৬৪-তে নামিয়াছিল। একই পর্ব্বে শ্রমিকদের আয়ের অঙ্ক ৪০ অংশে কমিয়াছিল। আর বেকারের সংখ্যাও ২০ লক্ষ হইতে ১৪০ (কাহারো কাহারো মতে ১৭০) লক্ষে পৌঁছিয়াছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য পূর্ব্বের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে গিয়া ঠেকিল।

আমেরিকার গড়পড়তা আয়ের নমুনা হইতেও বোঝা যায় যে, সেখানকার গণ-দারিদ্র্যের কোন সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে জানা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সেখানকার এক-তৃতীয়াংশ লোক দারিদ্র্য-সীমার (poverty line) এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২৪-৩৫ সালের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৩২৫০ টাকার মত। সেই তুলনায় বৃটেনের আয়ের অঙ্ক ছিল ২৫৩৫ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের জাতীয় আয়ের অসম বিতরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের অধিকাংশ নাগরিকেরই আয়ের পরিমাণ ছিল অনেক কম। আরও দেখা গিয়াছে যে, আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্রমেই Dupont, Mellon, Mogan প্রভৃতি কয়েকটি বণিক প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। শোনা যায় যে এইরূপ ৫০টি "হৌস"

আমেরিকার আর্থিক জীবনের আজ হর্ত্তাকর্ত্তা। অনেক মার্কিন অর্থনীতিজ্ঞের মতে যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থসংকট ইহাদের ক্ষমতার অপব্যবহারেরই কুফল। যুদ্ধের মাঝে কিন্তু ইহাদের শক্তি আরও বাড়িয়াছে। এবং অনেকে ভয় করেন যে, শীঘ্রই আমেরিকায় আবার অর্থ-সংকট পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণাকারে দেখা দিবে। সম্প্রতি হেনরী ওয়ালেস এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতও দিয়াছেন। বিপদের কথা এই যে, এই সংকটের পরিণতি কেবল অর্থজগতেই পর্য্যবসিত থাকিবে না। আমেরিকার মালিকশ্রেণী গত অর্থসংকটের শোচনীয় পরিণাম হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন গত মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া। এবারও যে আরেকটা মহাযুদ্ধের উস্কানি দিয়া ইঁহারা নূতন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন না কে বলিতে পারে ?

মালিকশ্রেণীর ক্ষমতাবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায়ও শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা বাড়িতেছে। ১৯২৯ সালের পর হইতে এখানকার শ্রমিক জগতে Congress of Industrial Organizations (C IO) নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের উদয় হইয়াছে। ইহার সহিত পুরাতন American Federation of Labour (A F L) এর প্রধান তফাৎ এই যে, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ইহা রাজনৈতিক পন্থাতে বিশ্বাস করে। মনে হয় যে, ইহার ভিতর দিয়া মার্কিন শ্রমিকশ্রেণীর একটা স্বাধীন পার্টি বা দলের সূত্রপাত হয়তবা হইল,—কিন্তু আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন শতধা-বিভক্ত। সাদা কালোর বিরোধ, আমেরিকান শ্রমিক ও বহিরাগতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং শ্রমিক নেতাদের ব্যক্তিগত রেষারেষি যতদিন না যাইবে ততদিন রাজনৈতিক চিত্রের মামুলী কাঠামো পরিবর্ত্তিত হওয়া কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব বলিলেও ভুল হইবে না।

অধ্যাপক ল্যাস্কি লিখিয়াছেন: "Recent events have made it probable that this epoch of American history is drawing to a close. The United States have now developed all the typicel phenomona of European life. There is an hereditary leisured class, with much the same habits, though on an ampler scale, of a European aristocracy; there is a strong middle class whose access to favoured positions is becoming increasingly stereotyped; there is the characteristic proletariat of our great cities; and there is the historic division between the urban and rural interests growing clearly before our eyes. The foreign observer can see without difficulty how the American constitution could work without undue

conflict in an epoch of remarkable growth. His problem is to understand whether the equilibrium it protects can be harmonised with the needs of an era in which, as in our own, the chains of property to a special position in the State are seriously challenged." [সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে মনে হয় যে, মার্কিন ইতিহাসের বর্ত্তমান পর্ব্ব প্রায় শেষ হইতে চলিল। য়ুরোপীয় সামাজিক জীবনের অনুরূপ অনেক সমস্যা আজ যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা দিয়াছে। এই দেশেও একটা বনেদী শ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপীয় সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সহিত এই শ্রেণীর লোকদের কোন প্রভেদ নাই। কেবলমাত্র তফাৎ এই যে, আমেরিকার উচ্চবংশীয়দের জীবনযাত্রার পরিসর অপেক্ষাকৃত অনেক ব্যাপক। এখানে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয় জীবনে বাছা বাছা স্থানগুলি প্রায় ইঁহাদের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর আমেরিকায়ও আমাদের বড় বড় সহরের অঙ্গবিশেষ একটি শ্রমিকশ্রেণীর উদয় হইয়াছে। এখানকার সহুরে ও গ্রাম্য স্বার্থের ঐতিহাসিক বিভাগও দেখিতে দেখিতে উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী দর্শক মাত্র সহজেই দেখিতে পাইবেন কিভাবে আমেরিকার সংস্থান দেশের আশ্চর্য্যরকমের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিরোধ এড়াইয়া মোটামুটি কার্য্যকরী হইতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সম্পত্তির বিশিষ্ট স্থানের দাবীকে অধিকাংশ লোকই মানিতে রাজী নহে। এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, যে-আমেরিকান সংস্থান এতকাল সম্পত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে টিঁকিবে কিনা।" Cf. Forword to the First Edition of Professor Brogan's "The American Political System."] আমেরিকা আজ অন্য দেশের মত নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন। এই গুলির সমাধানের জন্য কি কি প্রচেষ্টা চলিয়াছে এবং ইহাতে কোন স্থায়ী ফল হইবে কিনা তাহার বিচার পরে হইবে।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রিশ

পরদিন সকালে কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। ঘুম থেকে উঠেই ভবদেব বেরিয়ে গেছে, কল্যাণী রান্নাঘরে। তামসী বাইরে তাকিয়ে দেখল, নারায়ণ। হাতে একটা পাকানো খবরের কাগজ।

দ্রুত হাতে খুলে দিল দরজা। উৎসুক উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলে, 'উষসী এসেছে ?'

নারায়ণ থ হয়ে রইল।

'উষসী কোথায় ?'

'বলছি।'

তার আগে একটু ভূমিকা সেরে নেওয়া দরকার। নারায়ণ অনেক আগেই জেল থেকে বেরিয়েছে আর বেরিয়ে অবধি খোঁজ রেখেছে তামসী কবে ছাড়া পাবে, কোন জেল থেকে। তার হিসেবের একদিন আগেই তামসীকে ছেড়ে দিয়েছে এখানে, তাই ঠিক সময়ে তার নাগাল পায়নি। চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু নিজেই এখন চমকে উঠল। না, চেহারা দেখে নয়, তার থাকবার আস্তানা দেখে। পৃথিবীতে এ বাড়ি ছাড়া আর তার মাথা গোঁজবার জায়গা ছিল না ?

মানেটা বুঝতে পেরেছে তামসী। ভবদেব যে দলে এসে ভিড়েছে সেই দলের সঙ্গে নারায়ণের দলের ঝগড়া। আদায়—কাঁচকলায়। প্রায় কেউ কারু মুখ দেখতে রাজি নয়। পরস্পর পরস্পরের কাছে দেশদ্রোহী। একজন যদি ভণ্ড, অন্যজন বাউণ্ডুলে।

আরেকটা মানের জন্য তামসী অস্থির হয়ে উঠল। বললে, 'তা হলে আপনার ওখানে যাব ?'

'নিশ্চয়।' নারায়ণ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল।
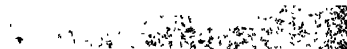
যেন তামসী তার দলের লোক। তার নিকটতর আত্মীয়। ভাবের আকাশ থেকে নেমে এসেছে বাস্তবের বন্ধুরতায়। কৃত্রিমতা থেকে প্রাণবান সারল্যে।

মৃদুরেখায় হাসল তামসী। বললে, 'তা হলে আপনার ওখানেই উষসী আছে। চলুন।'

উষসীকে মুখ দেখাতে আজ আর তার লজ্জা নেই। উষসীও বুঝুক কিছুকেই ঘৃণা করবার নেই, ভয় করবার নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু নারায়ণ যে পা তোলেনা। মুখে স্থূল বিস্ময় এনে বললে, 'উষসী আমার ওখানে থাকতে যাবে কেন?'

'আপনার কাছে নেই?' আঁৎকে উঠল তামসী: 'তার মানে? তবে ও কোথায়?'

'তার নিজের জায়গায়।'

'সে আবার কী?'

'নিজের জায়গায় মানে নিজের বাড়িতে। তার স্বামীর কাছে।'

তামসী পাথর হয়ে গেল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত। পুলিশ তাদেরকে ধরলে পর অনেক তদবির-তাগাদা করে উষসীকে প্রাণধন জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। ছাড়িয়ে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরে দরজা বন্ধ করে দেয়। টাকা খাইয়ে পুলিশকে দিয়ে ব্যাপারটা এমন ভাবে দাঁড় করায় যাতে উষসীর গায়ে দোষ না লাগে, উষসীর নামে শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দেয় প্রাণধন। পুলিশ কেস তুলে নেয় উষসীর বিরুদ্ধে, তার ফলে সে পুরোপুরি পড়ে গিয়ে প্রাণধনের খপ্পরে। এ একেবারে তার দুঃসহতম কল্পনার অতীত। যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ভেবেছিল সেই তাকে এখন চেপে পিষে ফেলছে।

তাই আপনাকে আমার চাই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অবধি শুনছি তার উপর অসহ্য পীড়ন চালাচ্ছে প্রাণধন। তার অমানুষিকতা ক্রমশ পৈশাচিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এর এক্ষুনি প্রতিবিধান চাই। তাকে তিল তিল করে মরতে দিতে পারিনা আমরা। সে জেল চেয়েছিল বটে কিন্তু এই অন্ধকূপ চায়নি। নির্যাতন সে কামনা করেছিল কিন্তু এমন আঘাত নয় যা তাকে মূল্য দেবেনা, সম্মান দেবেনা, একেবারে অনর্থক করে রাখবে। তাই আপনাকে আমার দরকার। আপনি আবার যাবেন প্রাণধনের বাড়িতে, আপনার হাতের ছোঁয়ায় খুলে দেবেন সেই বন্দীশালা, উষসীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন। আপনি ছাড়া আর কারু সাধ্য নেই। আপনি—

'ছি ছি ছি।' শতকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল তামসী: 'এই আপনার বিপ্লব? আপনার মনুষ্যত্ব? লজ্জায় মাটির সঙ্গে আপনার মিশে যেতে ইচ্ছে করছে না?'

এমন একটা তিরস্কারের জন্যে প্রস্তুত ছিল না নারায়ণ। বিস্ময়ে একেবারে ম্লান হয়ে গেল। বিবর্ণস্বরে বললে, 'কেন, আমি কী করলাম?'

'আপনি কী করলেন? একটা বিবাহিত ভদ্র মেয়েকে তার স্বামীর আশ্রয় থেকে বের করে আনলেন আর এখন কিনা বলছেন, আমি কী করলাম। আপনাদের রাজনীতির মত আপনারাও এমনি দায়িত্বজ্ঞানহীন তা বুঝতে পারিনি।'

অর্ধপথে নারায়ণ একটা নিশ্বাস রুদ্ধ করল। বললে, 'আপনি সমস্তটা ভুল চোখে দেখেছেন। উনি নিজের ইচ্ছায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন, স্বামিত্বের অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই প্রতিবাদে আমি তার সহযোগী ছিলাম মাত্র। আর কিছু নয়। দায়িত্বের কথা যদি বলেন, তা আমি ত্যাগ করিনি। আমি বরাবরই লক্ষ্য রেখেছি কি ভাবে আবার ঊষসীকে উদ্ধার করা যায়।'

'লক্ষ্য রেখেছেন শুধু আমার উপর।'

'আপনার উপর?'

'হ্যাঁ, রাজার আইন ভাঙা সহজ, লোকে বাহবা দেয়। কিন্তু সমাজের আইন ভাঙা কঠিন, চারদিকে চিৎকার পড়ে যায়। বোঝা গেছে আপনার মুরোদ, আপনার বিপ্লবীত্ব। সমাজব্যবস্থা ভাঙবেন আপনারা! স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ঠাট-কাঠামো বদলাবেন! মুখসাপটই শুধু আছে—' রাস্তায় নেমে এল তামসী।

'আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি।' তামসী এক-পা এক-পা করে চলতে লাগল। বললে, 'একটা বিবাহিত মেয়েকে নিদারুণ ভয় করলেন। দেখলেন অনেক এখানে জোর-জুলুম লাগে, অনেক চোট-জখম, অনেক ধুলো-মাটি। তাই আরও সব ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। দেখলেন কাছেই একটা বেছপ্রাণ কুমারী মেয়ে আছে তারই দিকে নজর দেয়া যাক। বিপদ কম, সম্ভাবনা বেশি। তাই না?'

'ছি ছি, আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনব ভাবতে পারতামনা।' সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণও চলছিল, থেমে পড়ল।

কণ্টকদৃষ্টিতে বিদ্ধ করল তামসী। বললে, 'উলঙ্গ সত্যকথা শুনলে এমনি মনে হয় বটে। কিন্তু বলুন তো, দৃষ্টিপাতটা একটু বেশী দীর্ঘ করেননি আমার দিকে? কবে কখন কোন জেল থেকে বেরুব তার পর্যন্ত দিন ক্ষণ হিসেব করে রেখেছেন। অথচ যাকে একটা ভীষণতর জেলের মধ্যে ঠেলে দিলেন বাইরে থেকে, তার বন্ধ দরজায় আজো আপনার করাঘাত পড়ল না?'

'সমস্ত জিনিসটা আপনি ভুল চোখে দেখছেন—' বড় ক্লান্ত শোনাল নারায়ণকে।

'তাই আমাকে দেখেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, আপনাকে আমার চাই, আপনাকে আমার দরকার অথচ যে আপনাকে চেয়ে, আপনার উপর নির্ভর করে, সমস্ত শাখা-শিকড় ছিঁড়ে-উপড়ে বেরিয়ে এল, তাকে আপনি অনায়াসে ত্যাগ করলেন, তার থেকে তুলে নিলেন সমস্ত দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক। কেন? কিসে আমি উষসীর চেয়ে বেশি মূল্যবান হলাম আপনার কাছে? কেন তার জেলের দরজায় অপেক্ষা না করে দাঁড়ালেন এসে আমার জেলের দরজায়? আমার প্রতি কেন আপনার এই পক্ষপাত?'

নারায়ণ তার হাতের কাগজটার দিকে তাকাল শূন্যচোখে। বললে, 'আমার পক্ষপাত আপনার জন্যে নয়, বিপ্লবের জন্যে। আপনাকে যদি এখন আমি চেয়ে থাকি বিপ্লবের জন্যেই চেয়েছি।'

'বলতে চান, উষসীর বিদ্রোহটা আমার চেয়ে কিছু কম?'

'মার্জনা করুন, ওরটা একটা সাময়িক বিক্ষোভ, অন্তঃপ্রেরিত বিপ্লব নয়। আর তোর ভাত খাবনা বলে আমাদের দেশের হাড়ি-মুচির মেয়েরা যেমন রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যায় এ কতকটা তেমনি। এ ঘর ছাড়ে, একে ঘর থেকে কেউ ছাড়িয়ে আনেনা। তাই এর রাজনীতিটাই ভাবের রাজনীতি। কিন্তু আপনি—'

'থাক আর ব্যাখ্যানা করতে হবেনা। আমি জানি আমি কি। আমি চোর, আমি কলঙ্কী, আমি কুৎসিত। তাই আপনাদের মহান সেই বিপ্লবের প্রত্যাশা আর আমার কাছে করবেন না। আমাকে এখন অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের নিজের-নিজের পথে যেতে পারেন।'

রাস্তার মোড় পেয়ে নারায়ণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আপনার কাছে এটুকু শুধু আমার অনুরোধ, আমার অন্তরের পবিত্রতাকে আপনি সন্দেহ করবেন না।'

আবার পবিত্রতা, দুর্ভেদ্য পবিত্রতা! অন্তরে-অন্তরে দগ্ধে যেতে লাগল তামসী। বললে, 'আমি নিজে অপবিত্র, তাই এখন আমার অপবিত্র সংস্পর্শই ভাল লাগবে। আচ্ছা, নমস্কার।'

কিন্তু নারায়ণ তক্ষুনি সরে পড়ল না। উৎসুক হয়ে বরং জিগগেস করলে, 'ওপথে কোথায় যাচ্ছেন?'

'কেন, ও-পথে কি রেলষ্টেশনে যাওয়া যাবেনা?' তামসী ফিরল।

সব রাস্তায়ই ঘুরে-ফিরে রেলষ্টেশনে যাওয়া যায়। কিন্তু ষ্টেশনে এখন কী!

'কলকাতা যাব।'

কলকাতার ট্রেন এখন ঢের দেরি। বরং যেটা অল্প কতক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে সেটায় উঠলে উষসীর ওখানে যাওয়া যেত একটানা। তামসী বরং সেদিকেই রওনা হোক।

'কেন, উষসীকে উদ্ধার করতে?'

'সেটাও তো বড় কাজ।'

'কেন, সে কাজ বুঝি পবিত্র থেকে করা যায় না? তাই যে অপবিত্র বেছে-বেছে তাকেই বুঝি সে কাজের ভার দিচ্ছেন! কেননা সে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে পারে, যেতে পারে যে কোনো বিপদ যে কোন পাপের মধ্যে—' তামসীর গলা বিষিয়ে উঠল।

নারায়ণ কথা বললে না।

'আর বীরত্ব দেখাবেন না। বরং প্রতীক্ষা করুন। দেখুন সত্যি সে সমস্ত চক্রান্ত ও অত্যাচার ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে কিনা, না, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। দেখুন তার বিপ্লবটা খাঁটি কিনা, মহৎ কিনা।'

তবু ষ্টেশনের দিকেই তামসী যাচ্ছে। বা, কলকাতা যাচ্ছি যে। তা যাকনা, কিন্তু এমনি খালি হাতে পায়ে কেন, কেন এই ছন্নছাড়ার পোষাকে?

উঃ, সেই ট্রাঙ্ক আর সুটকেশ দুটো কী জ্বালিয়েছে তামসীকে। প্রতিপদে বাধা, প্রতি ছেদে অস্বস্তি। ও দুটো গেছে না বেঁচেছে তামসী। পরিপূর্ণ রিক্ততার অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে হঠাৎ একটা মদিরস্পর্শ বুলিয়ে দিল।

'আর, এই ছন্নছাড়ার পোষাকে কেন বলছেন?' তামসী হাসল: 'যাচ্ছিও সে একজন ছন্নছাড়ারই কাছে।'

নারায়ণ কি চমকে উঠল?

'কী ভাবেন আপনি আমাকে? আমি কি একেবারে নিরাশ্রয়? আমাকে দেখবার-শোনবার, উপকার করবার কি আর লোক নেই ভেবেছেন?' তামসীর চোখের কোণে বিদ্রূপ ঝলসে উঠল: 'আমি যেমন, আমার কুটুম তেমন। যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।'

এবার নারায়ণের ফিরে যাওয়া উচিত। তবু কে সেই ছন্নছাড়া নামটা সে জেনে যেতে চায়। দেখে যেতে চায় তামসীর অহংকারটাকে।

'কে আপনার সেই ছন্নমতি?' হাতের কাগজটা আঁট করে চেপে ধরল নারায়ণ।

'নাম শুনলে চিনতে পারবেন।'

'কে?'

'অধিপ মজুমদার। হ্যাঁ, সেই অধিপ মজুমদার।'

যেন হেরে গেল নারায়ণ। এইবার তাকে ফিরতে হয় তার আপন কাজে। বিকেলে ভবদেবরা যে মিটিং করবে তা ভেঙে দেবার আয়োজনে। কিন্তু তামসীই তাকে ডাকল।

বললে, 'অনেকক্ষণ বসতে হবে ইষ্টিশনে। আপনার খবরের কাগজটা দিন। আজকের কাগজ তো ?'

তামসীর হাতের মধ্যে কাগজটা গুঁজে দিয়েই নারায়ণ দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেল-ষ্টেশনের থার্ডক্লাশ মেয়েদের নোংরা ওয়েটিং-রুমে একটা শান-বাঁধানো বেঞ্চির উপর বসল তামসী। কতগুলি হিন্দুস্থানী মেয়ে কেউ বা কারুর উকুন বাছছে, কেউ বা কারুর কাড়-পিঠের ময়লা তুলে দিচ্ছে রগড়ে-রগড়ে। নানারকম ছেঁড়া-খোঁড়া মালামালে ঘরটা ঠাসা। আগাগোড়া অকথ্য অপরিচ্ছন্নতা। তবু সব কিছুর সঙ্গে তামসী আশ্চর্যরকম প্রতিবেশিতা অনুভব করলে। বেঞ্চিতে বসে সে খবরের কাগজটা মেলে ধরল।

ভিতরের পৃষ্ঠায় একটা খবর নারায়ণ নীল পেন্সিলের মোটা দাগে দাগিয়ে দিয়েছে। মেলে ধরতেই সব-কিছুর আগে ওটার উপর চোখ পড়ল।

ছাইয়ের মত বিবর্ণমুখে পড়তে লাগল তামসী। বুক দপ দপ করতে লাগল। খবরটা সাংঘাতিক।

ক্রমশঃ

চাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

টাল খেলেও তবু ঘুরছে চাকাগুলো—চল্‌ছে, চল্‌বে। আয়েসী কায়দায় চল্‌তে গেলে হয়ত একটু টাল খাওয়া দরকার। গড়িয়ে যাবার এতোটা পথ কতোদিন পাওয়া যায়নি—চোখবুঁজে যেদিকে খুসী চলে যাও, কোনো ভাবনা নেই—জানের ডর নেই।

হাসানের কানে চাকাগুলোর আওয়াজ কেমন যেন তাজ্জব শোনাচ্ছে। ভুলেই গিয়েছিল সে এ-আওয়াজ। কোচবাক্সের উপর বসে বসে ঝিমুনি আস্‌ত যে-আওয়াজে, চল্লিশ বছর ধরে যার সঙ্গে তার চেনাশোনা—সাদা গোঁফদাড়ির আড়ালে ঠোঁটের উপর একটা মোলায়েম হাসি ফুটে উঠ্‌ল হাসানের—তা-ই কিনা বেমালুম ভুলে থাকতে হয়েছিল! তাজ্জব!

কিন্তু ঘোড়া তার বেতরিবত হয়নি—মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ঢিলে কদমে চল্‌তে লেগেছে। ঠিক আগেকার মতো। ব্যাটা চাল ভুলে যায়নি। অবশ্যি বেরোয়নি ও বেশিদিন—আড়গড়ায় দাঁড়িয়ে দানাপানি গিলেছে, পা ঠুকেছে, ল্যাজ নেড়ে মশা-ডাঁশ তাড়িয়েছে আর ঘড়ি-ঘড়ি হাঁচি ঝেড়েছে

কিন্তু যেদিন বেরোত, জান নিয়ে ছুটে পালাবার ত আর কামাই ছিলনা। হাসানের ভয় হয়েছিল আজও না ঠিক তেম্নি ছুট্ ছ্যায়! কি বে-ইজ্জতের ব্যাপার যে হত তাহলে। কাচ্চা-বাচ্চা সোয়ারীগুলো ভয় খেয়ে চিল্লাতে সুরু করত বেদম—বাবু হেঁকে উঠ্‌তেন, কি লাফিয়ে পড়ে চেঁচামেচি করে লোক জড় করতেন, বলা যায়না। সাব্যস্ত হত তারই কসুর। তারপর? তারপর কি হত কে জানে?

জানে—কি যে হ'ত খানিকটা বুঝ্‌তে পারে হাসান। গোলাম রসুলের কথা মনে পড়ছে হাসানের। জান নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল বেচারি! হাসান বুঝ্‌তে পারছিল তাড়া খেয়ে এসেছে গোলাম। কিন্তু তার গাড়ি কই—ঘোড়া? দম্ নিতে দাও মিঞা— বল্‌ছি সব। কিন্তু দম না নিয়েই বল্‌তে সুরু করেছে গোলাম। জখ্‌মী হয়ে ঘোড়া ছুটে পালিয়েছে—মুখের দু'পাশে তাজা খুন—এক নজর দেখ্‌তে পেয়েছিল সে, তারপরই নাকি কল্‌জেতে কামড় খেয়ে বেহুঁস হয়ে ছুটে এসেছে। গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা। আল্লা! এক গেলাস পানি পিলাও, হাসান মিঞা।

চোখের উপর থেকে নক্‌শাটা মুছে দিতে চেষ্টা করল হাসান—ডানহাতের চাবুকটা রাসধরা বাঁ হাতে গুঁজে দিয়ে হাতটা চোখের উপর বুলিয়ে আনলে। হাতের পিঠের রগগুলো ভিজে-ভিজে মালুম হচ্ছে। সত্যি কোথায় গেল গোলাম? এক বিঘৎ একটা ছুরী তাকে লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে নিতে দেখেছিল হাসান—তারপর আর দেখ্‌তে পায়নি—পূরা এক বরষ হয়ে গেল, তবু হদিশ মিল্‌লনা তার। যদি জানে বেঁচে থাকে গোলাম, তারও কি চোখ এম্নি ভিজে উঠ্‌বেনা বারবার? বেকসুর কোনো আদমিকে যদি সে খুন-জখম করে থাকে, আজ কি সে-আফ্‌শোষে চুপি-চুপি কাঁদছেনা গোলাম?

লাটসাহেবের কুঠির রাস্তা ছেড়ে এস্‌প্ল্যানেডের রাস্তায় বাঁক ঘুরছে গাড়ি। লরী বোঝাই, ট্যাক্সি বোঝাই, ট্র্যাম বোঝাই ঝাঁক-ঝাঁক মানুষ চেঁচিয়ে যাচ্ছে 'জয়হিন্দ্'। বাচ্চা-বাচ্চা সোয়ারীগুলোও চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। লরীর লোকরা হাসানের দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকেও জিগির তুল্‌তে চায়—কিন্তু এমন চেঁচাবার মতো গলা আছে না কি তার? কথাগুলো ঠিক ফোটেনা হাসানের মুখে—চেষ্টা করলে, গলায় একটা ঘড়্-ঘড়্ আওয়াজ হয়—তবু সে আওয়াজ নিয়েই জয়হিন্দ-ওয়ালাদের দিকে তাকায় হাসান—চাবুকটা উপরের দিকে তুলে ধরে—গর্ত্তে-ঢোকা ছোটছোট চোখগুলো চিক্‌চিক্ করে ওঠে। 'হিন্দুমুসলমান এক হো'—চেঁচায় লরীর লোকরা। গোঁফের ভেতর থেকে ঠোঁটের খানিকটা পালিশ উঁকি দেয় হাসনের—মাথা নাড়তে থাকে হাসান—মনে মনে আওড়ায়, এক হো—সাঁচ্চা বাত—হিন্দু মুসলমান এক হো।

তবু এ সাঁচ্চা বাত ভুলে গিয়েছিল সবাই—কোন্ শয়তানের সলায় যে ক্ষেপে উঠেছিল

মানুষ, হাসান তা ভেবে পায়না। যারা মরেছে তারা ত গেছেই কিন্তু যারা বেঁচে আছে কি তক্‌লিফ্ গেল তাদের! ঘোড়াটার দানাপানি জোটেনি কতো রোজ—ঘাস কেটে আন্‌তেও হাসান বেরোতে পারেনি—ভয় করত, রাস্তায় কখন কি হয়ে যায়—দৌড়ুদৌড়ি লেগে যায় কখন, বুড়োমানুষ সে, হয়ত ঘরে ফিরে আস্‌তে পারবেনা। এখন খোদার দোয়ায় হয়ত দানাপানি পেয়ে বাঁচবে ঘোড়াটা। পিঠের হাড়গুলো মজে যেতে সুরু করবে এখন। ঘোড়া যাক, নিজেরও বা কি হাল হয়েছে হাসানের—একটা বরষে যেন এক জমানা পাড়ি দিয়ে এসেছে সে! তবু সে জানে মরেনি—গোলাম রসুলের নসীবও হয়নি তার! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে হাসানের: আল্লাহু—।

জানে মরেনি। কিন্তু কাল এম্নি সময়ও কি ভাব্‌তে পেরেছিল হাসান যে আজ সে বাঁচ্‌তে পারবে? বস্তি ছেড়ে দিয়ে লোক পালিয়ে গেছে—আজ আর বাঁচতে পারবে না জেনে। কোথায় পালিয়েছে কে বল্‌বে? পালাবে ভাবলেও পালাতে পারেনি হাসান। ষাট বছর আজ—এই সহর, এই শড়ক দেখ্‌ছে—এই ত তার দাঁড়াবার জমিন, এই হবে তার গোরস্তান। তবে? কোথায় আর যাবে সে তবে? কোন্ জমিনের সঙ্গে চেনাশোনা আছে তার? যদি মরবারই বদ্‌নসীব থাকে, তাহলে মরবে সে এখানে দাঁড়িয়েই—পালাবে কোথায়? রাজাবাজার এলাকায় মুসলমান কেউ থাকবে না পনেরো তারিখে—সবার মুখে-মুখে শুনেছে হাসান এ জুলুমের কথা। শুধু শুনে গেছে—কিছু বলেনি। এমন কি এক্তিয়ার আছে তার, জুলুম হবে না বলে? পালিয়ে যদি ওরা বাঁচতে পারে বাঁচুক। বেগানা-বেচারাদের ঠেকাতে যাবে কেন হাসান? ওরা বাঁচুক—কিন্তু ঘোড়া আর গাড়ি নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে বাঁচব? আর ঘোড়া আর গাড়িই যদি না থাকে, গোলাম রসুলের মতো খানেখারাব হয়ে বেঁচে থেকে কি ফায়দা? অনেকদিন ত বাঁচল হাসান—সহরের এই শড়কে গাড়ি চালিয়ে ষাট বছর ত বেঁচে গেল—বুড়োমানুষ, না-হয় এবার মরবে। মরবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিল হাসান। হয়ত একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগ্‌বে কপালে—হয়ত হাত-বোমায় গাড়িটা পুড়তে সুরু করবে, তার গায়েও আতশ ধরে যাবে—তারপর হাসপাতাল—তারপরই গোরস্তান। দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবেই ত একদিন। আল্লাহু! হাসান চোখ বুঁজে ছিল খানিকক্ষণ।

কাল এ সময়টার কথা ভাবতে আজ এখনও হাসানের বুক বরফ বনে যায়।

"জয়হিন্দ্—জয়হিন্দ্—" মস্ত-মস্ত রেশমি ঝাণ্ডা উঁচিয়ে লরীর লাইন চলেছে দু'পাশে। সোরগোলে হাসানের কানের পর্দ্দায় সোঁ-সোঁ আওয়াজের আর কামাই নেই। হাসান কাৎ হয়ে একসময় আওয়াজ বাঁচাতে গিয়ে বাতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া নিজের

ঝাণ্ডাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মোটা কাপড়ের ঝাণ্ডা—রেশমি কাপড়ের নয়। রেশমি ঝাণ্ডা হলে জবর হ'ত, কিন্তু পয়সা কি ছিল তার কাছে? কাল বিকেলে ট্যাকের সব ক'টা পয়সা কুড়িয়ে কাচিয়ে এ-ঝাণ্ডা কিনে নিয়েছে হাসান। হোটেল-খরচাও রাখেনি, হঠাৎ করে একপয়সার বিড়ি কিন্‌তে গেলেও বেইজ্জৎ হয়ে যেতে হত। তবু পছন্দমাফিক হলনা ঝাণ্ডাটা। রেশমি ঝাণ্ডার জাফ্রাণ রং-টা চম্‌চম্ করছে—চাকার আসমানী রং-ও বহুৎ আচ্ছা। হাসানের ঝাণ্ডার চাকাটা কাল্‌সে মালুম হচ্ছে। বারবার চাকাটার দিকে তাকাতে থাকে হাসান।

ঝাণ্ডা উড়্‌ছে। লোভীর মতো ওটার দিকে ঘাড় ফেরাতে ইচ্ছা করে। ঝাণ্ডার উপর একবার হাতও বুলিয়ে আনে হাসান। ট্যাঁকের সব ক'টা পয়সা খসে গেলেও আখেরে তার লোকসান হয়নি। কাল বিকেল থেকেই হরদম সোয়ারী মিলে যাচ্ছে। হোটেলওয়ালা কাদেরও কাল বউবাজার হয়ে ময়দান তক্ চক্কর দিয়ে গেল—দু'রোজ আগেই যেন তার ঈদের ফূরতি সুরু হয়ে গেছে। বকশিস গুঁজে দিল হাসানের হাতে দু'টাকা, বল্‌লে, রুটিকাবাবের নাস্তা আজ তোমার ফ্রি হাসান মিঞা। 'নারায়া তক্‌বির আল্লাহু আকবর' আওয়াজ আর নেই কাদের মিঞার মুখে—বেশ রপ্ত হয়ে গেছে 'জয় হিন্দ্' বুলি। হাসান কিছুতেই ও-বুলিটা মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারছেনা—কেমন যেন জড়িয়ে যায় কথাগুলো—'জেইন্দ'-এর মতো একটা ছোট, কমজোরি কথা বেরোয়। খানিকক্ষণ আগে ময়দানের পাশে এ-বাঙালীবাবু যখন কেয়ারা করতে এসেছিল তার গাড়ি—বাচ্চাগুলো তার মুখের দিকে তাকিয়ে হরদম জয়হিন্দ চেঁচাচ্ছিল—হাসান যতবার জেইন্দ বলেছে তার চেয়ে বহুৎ বেশি মাথা নেড়ে এ খোশবাতে সায় দিয়ে গেছে। কাদেরের মতো বুলিটা রপ্ত করতে গেলে দম্ দরকার—ততটা দম্ হাসানের নেই। দম্ নেই বলেই হয়ত নারায়া তক্‌বিরও বল্‌তে পারেনি সে কোনোদিন।

ধরমতলা মস্‌জিদের বাঁক ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। ভীড়—ঈদের নমাজের মতো লোক জমায়ত হচ্ছে। লরী-ট্যাক্সি-প্রাইভেট জাম্ ধরে আছে, গাড়ি-বগি এগোবে কি? গাড়ি থামিয়ে গাড়ির লোকদের জয়হিন্দ বলিয়ে দিচ্ছে মস্‌জিদের পাশের লোকরা। পাঁচ-দশ মিনিট লাগ্‌ল হাসানের মোড় পার হয়ে আস্‌তে। রাস টেনে নাজেহাল হয়ে গেছে হাত। ঘোড়া লাফিয়ে উঠতে চায়—ভীড় দেখলে লাফিয়ে জোর কদম মারতে হবে, ইয়াদ আছে ব্যাটার। উবু হয়ে হাসান চাকাগুলো দেখে নিলে একবার—ঠিক আছে—ব্যাটা বেশি লাফাতে ঝাঁপাতে সুরু করলে ওগুলোর আর জান থাক্‌ত না। তার মতো গাড়িটাও বুড়ো হয়ে গেছে—টাল খায় চাকাগুলো—টাল খায় তবু চলে—আজ তক্ চল্‌ছে।

ডান পাশের গলিতে একটা নজর বুলিয়ে আবার সোজা হয়ে বসে হাসান। মনসুরের ফিটন আজ আর দেখা যাচ্ছে না গলিতে—ওরা কেউ নেই। মনসুরও তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে হয়ত জয়হিন্দের পরবে। আল্লা—আজকের পরবটা মঞ্জুর কর মনসুরকে! একটা রোজ ও ইল্লতি কারবার থেকে রেহাই পা'ক। আফ্রিকানরা এসেই ও'কে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে! বকশিসের লোভে রাতভর মেয়েমানুষ কুড়িয়ে বেড়াত গলিতে ঘুঁজিতে। ওয়েলেসলি—কর্পোরেশন ইষ্ট্রিটে, ধরমতলা, তালতলা, মৌলালিতে হররোজ দেখা হ'ত মনসুরের সঙ্গে হাসানের: আফ্রিকান সোয়ারী নিয়ে পাদানির কাঠে আওয়াজ তুলে বেদম ফুর্ত্তিতে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। কামাই করেছে বহুৎ। আবার ঠিক তেম্নি সরাবও ধরেছে। কি হবে টাকা কামিয়ে? ও-টাকা হারাম। হারাম! হারাম কথাটা দু'তিনবার মনে-মনে বল্‌তে থাকে হাসান। কথাটা যেন নিজেকেই শোনানো দরকার, মনসুরকে নয়। না হয় মনসুর বেমক্কা বেড়ে গেছে কিন্তু হাসান মিঞাও কি বল্‌তে পারে ফূর্ত্তিবাজ সায়েবমেম তাকে কোনোদিনই বকশিস্ দেয়নি? চামড়ার পর্দ্দায় আব্রু তৈরী করে দিয়ে সোয়ারীদের নিয়ে সে মাঠেময়দানে ঘুরে বেড়ায়নি রাত বারোটা-একটা তক্? দশ-বারো বরষ আগেও হাসান এ হারামির পয়সা হাতে নিয়েছে, তখন দাড়ি তার এমন সাদা হয়ে ওঠেনি—মনে হত তখন, দুনিয়ায় পয়সাটাই আসল! খানিকটা রাস্তা গাড়িটা জোর চালিয়ে নিয়ে এলো হাসান—মনসুরের আস্তানা যতো শীগ্‌গীর পেছনে ফেলে আসা যায়!

মিশনরো এক্সটেন্‌শনের মাথায় মস্ত গেট উঠেছে—ওদিকে মোড় ফিরবে ভাবছিল হাসান—বাবু হুকুম দিলেন, ডাহিনে। গণেশ এভিন্যুর মোড় ধরল গাড়ি—গোলতলা বাগানের বগলেও শাহীদরজা মাফিক গেট দেখা যাচ্ছে। চৌগোঁপপা দাড়িওয়ালা শিখের একটা লরী হাসানের গাড়ির গাঘেঁসে চলে গেল—ওদের জয়হিন্দের সঙ্গে এবার গলা মিলাতেই হ'ল হাসানকে—বেহুঁস্ হয়েই যেন চেঁচাতে সুরু করল হাসান্, জেইন্দ্-জেইন্দ্-জেইন্দ্। যখন হুঁস হ'ল তার, গাড়ি অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

মনে হ'ল হাসানের, শিরটা যেন পাক খেতে সুরু করেছে। গাড়ির চাকার মতোই ঘুরছে যেন সাম্‌নের রাস্তা, পাশের দালানকোঠা সব। ওম্নি বেআন্দাজ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল কেন সে? কপালের রগগুলো তাল ঠুক্‌তে লেগেছে তাই। হাসান কোচবাক্সের উপর একটু নড়েচড়ে বস্‌ল। তারপর বারবার দুধারে তাকাতে সুরু করল।

একই কিসিম সব। এক সন পর সবই ত এক কিসিম রয়ে গেছে। ঝাণ্ডার জৌলুষে খানিকটা খোলতাই মালুম হচ্ছে কোঠিগুলো, কিন্তু সব ক'টাকেই চেনা যায়। আমুদে হয়ে উঠ্‌ল হাসানের মন্, সবই সে চিন্‌তে পারছে—সাতভলা কোঠি, মিস্ত্রার আস্তানা, পিলা মস্‌জিদ

—ভাঙ্গা মস্‌জিদ—জেলেপাড়া ! জেলেপাড়া ! এই একবরষ অনেকবার এ-নাম শুনেছে হাসান, মনে পড়ল ! আবার যেন কপালের রগগুলো ঠক্কর দিচ্ছে। এক লহমার জন্যে আবার যেন বেহুঁস হয়ে গেল হাসান। চোখগুলো অন্ধকারে সাঁতরে এলো।

কিন্তু তারপর এ কি হ'ল তার ? যেন এপাশ-ওপাশ হবারও আর মুরোদ নেই—জব্দ হয়ে গেছে শরীর। বাবু হেঁকে হেঁকে যেদিক ফিরতে বল্‌ছেন হাসান গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে—যেন রাস্তাঘাট কিছুই চেনেনা—সোরগোল কিছুই শুন্‌ছেনা কানে। চাকা ঘুরে চলেছে তেম্নি ঢিলে-ঢিমে তালে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, অক্রূর দত্ত লেন, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট্—সোয়ারীরা নেমে গেল—দু'টাকা বক্‌শিস্—জেবে পুরে সেলামও ঠুক্‌ল হাসান—জয়হিন্দ চেঁচিয়ে বাচ্চাগুলো একটা গাড়িবারান্দার নিচে সরে গেল। কতো কিছু হয়ে চল্‌ল—হাত-পা নাড়ল হাসান, গাড়িটা অনেক দূর এলো, ঘোড়াটা হাঁচতে লাগ্‌ল, সবই হাসান বুঝ্‌তে পারছিল কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই ভুলে যাচ্ছিল সব। যেন ঘুমের মধ্যে চলাফেরা করে যাচ্ছে সে।

সোয়ারীরা নেমে যেতেই একটা বিজ্‌লির চাবুক খেয়ে জেগে উঠ্‌ল হাসান। তিড়বিড় করে কোচবাক্সে উঠে ঘোড়ার পিঠে ডাইনে-বাঁয়ে চাবুক হাঁকাতে লাগ্‌ল। নাক উঁচু করে বাজির ঘোড়ার মতো জানকবুল দৌড়ুচ্ছে ওর হাড় ক'খানা, জিন-বল্লায় আওয়াজ উঠ্‌ছে। গাড়িটা টাল খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে ভাবনা আর হাসানের নেই তখন। বৌবাজার ছাড়িয়ে সার্কুলার রোড—শিয়ালদ পেরিয়ে রাজাবাজারের এলাকায় এসে হাসানের মনে হ'ল এখন সে সব চিন্‌তে পারছে। কিন্তু ঘোড়াটা তেম্নি দৌড়ে চলেছে বেহুঁস হয়ে ! গোলাম রসুলের ঘোড়াটার মতোই কি ?

রাস টেনে ধরল হাসান—মাথা ঘুরছে। পাগ্‌ড়ির মতো জড়ানো গামছাটা খুলে হাসান সমস্ত মুখে বুলিয়ে আন্‌ল। তবু ঝিম্‌ঝিম্ করছে মাথা। এয়্ আল্লা, কি দৌড়ই না দৌড়নো হল ! মালুম হয় জখম হয়ে গেছে এবার চাকা। ডান দিকে মাথা হেলিয়ে চাকাগুলোর দিকে তাকাল হাসান। না, ঠিক ঘুরছে। বাঁয়ে মাথা হেলাতে গিয়ে ঝাণ্ডাটার উপর নজর পড়ল তার। উড়্‌ছে, ঢেউ খেল্‌ছে ঝাণ্ডাটায়। আর কি তাজ্জব; ওর চাকাটাও ঘুরছে মনে হ'ল হাসানের।

কবিতা

প্রেম

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তোমার সঞ্চয় থেকে কতটুকু দিতে পারো, রাত ?
কতটুকু দাম তার ?— যখন উল্লাসে থরোথরো
আমার বিশীর্ণ দেহ দলছুট্ মেঘের মতন
মেঘের আলোর প্রেমে কতটুকু ভরে ওঠে মন ?
শুধু এক অপলক রিম্‌ঝিম্‌ মধুর ব্যথায়
স্নায়ুরা অবশ হায় ! চেয়ে ছাখো একটি প্রহরও
ফুল হয়ে ফোটে নাই। মেঘভাঙা আলোর প্রপাত
স্নায়ুকে অবশ করে, শুধুই অবশ করে হায় !

শোনো রাত ! ম্লান মেঘ মুছে মুছে গিয়ে তারপর
এখন কঠোর রোদ—সেই রোদে কামনা ভিজিয়ে
উলঙ্গ প্রেমের স্রোতে থরোথরো হৃদয়ের সাধ।
হৃদয় আকাশ হয় কোন পথে কোনখানে গিয়ে
তোমাকে শোনাবো রাত, জ্যোৎস্নায় কোথায় পোড়ে ঘর
এখন ছুচোখ ভরে নিই কিছু আলোর প্রসাদ।

টেলিভিশান্

আরতি রায়

রতনবাইএর গান,
লক্ষ্ণৌ হতে ভাসিয়া আসিছে সুর,
মহানগরীর কাফেতে বসিয়া শুনি,
ধূমান্বিত কাপ ঠাণ্ডা হইয়া আসে।

চোখে ভাসে শুধু বিবর্ণ এক ছবি,
সে ছবি আমার, সে ছবি তোমার,
বিংশ শতকে সকলের ছবি সেই,
অতীত কালের কালো প্রচ্ছদপটে,
বর্ত্তমানের পাণ্ডু শ্বেতাভ রেখা,
চোখে দেখি, আর উর্দ্দু গজল শুনি,
গাহিতেছে কোথা অচেনা রতনবাই— ;
কণ্ঠে তাহার জীবনের সুর আছে,
গানে আছে তার পিয়াসী প্রাণের মিল।

মন

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

পারশূন্য ভাবনার নীলে
একটি বিরাট মন কতবার হারায়েছে আলো ;
আবার আর এক রাতে অনুভব পথ খুলে দিলে
বিস্তীর্ণ রাত্রির পরে ফের তার শয়ন বিছালো।
সে এক মরমী মন, অনুভব সুরভিত তার।

শতাব্দীর পদক্ষেপ পারশূন্য সময়ের জলে,
দ্বীপ জেগে ওঠে আর দ্বীপ যায় অতলে কখন,
মানুষের ইতিহাস ছোট এক গল্পের মতন,
রাজ্য রাজত্বের ছাপ জলের দাগের মত মুছে,
আবর্ত্তিত বসন্তের বৈশাখেতে হয় বিবর্ত্তন।

স্থূল উৎসবেতে ক্লান্ত দিন।
স্বাধীনতা-উৎসবের প্রমত্ত আসর শ্রান্ত হলে

ক্রমে নামে চোখে ঘুম নিচু স্বরে ছায়ার মতন।
সেই মন খুলে আজ সূক্ষ্ম আলোকের ঝাঁপি তার
দিবসের ভার লঘু করে।

কখন করুণ যেন মেঘনার মেঘলা বিরহে
কোমল জলের মত মন—
স্রোতের দমকে কাঁপে বড় নদী লতার মতন।
সে-মন বিদ্যুৎ-লতা পারশূন্য আকাশ দেখায়
সৃষ্টিরে যখন ছুঁয়ে যায়।

ঝরা পালক

চিত্ত ঘোষ

উতলা রাতের পাখী ধূসর পালক তার
ফেলে গেছে এইখানে সমুদ্রের হলুদ বালুতে :
অন্য কোন নদী হ্রদ সৈকতের জমির ঢালুতে
উড়ে গেছে খরোজ্জ্বল প্রত্যূষের দিকে,
তখন আকাশ ক্রমে হ'য়ে আসে ফিকে
নক্ষত্র-প্রদীপ নিভে যায়
সতভিষা, উত্তর-ফাল্গুনী
অরুন্ধতী আকাশে ঘুমায়।

অগ্রাণের মিহি কুয়াশায়
রাত্রির পৃথিবী থেকে প্রত্যূষের সমুদ্র বন্দর
দীপ্তদিন মধ্যাহ্নের নদী মাঠ অরণ্য প্রান্তর
সূর্য্য জ্বলে গাছের মাথায় ;
তবু ঝরে—তরল আকাশ ঝরে

ঘুমন্ত ঘাসের মাঠে, সুপ্ত বালুচরে
রাত্রি ঝরে বিন্দু বিন্দু শিশিরের উতলা হাওয়ায়।
নবারুণ দিগন্তের খরোজ্জ্বল প্রত্যূষের দিকে
তখন আকাশ ক্রমে হয়ে আসে ফিকে,
রাত্রির তিমির-মুক্ত বিচ্ছুরিত গান
রাত্রি অবসান :
কামনার যাদুমন্ত্রে আলোর কল্লোল বন্যা
দীপ্ত সূর্য্যস্নান।
সেই প্রাণ বহ্নি-সঞ্জীবন
মুঞ্জরিবে সূর্য্যমুখীবন,

জীবন বিহঙ্গ হয়ে উড়ে যায়
দিন থেকে রাত্রি আর
ফেলে রেখে যায় কোন সমুদ্রের হলুদ বালুতে
কিংবা কোন নদী হ্রদ সৈকতের জমির ঢালুতে
ব্যর্থ, ব্যর্থ অঙ্গীকার ;
আকাশে ঘনায় মেঘ—সমুদ্রের জলে
দিগন্তের অন্য পারে জোনাকিরা জ্বলে
ঝিঁঝিঁ ডাকে—রোমাঞ্চিত দীর্ঘতান ব্যর্থ হাহাকার,
সমুদ্র হ্রদের ধার নদীর কিনার,
ঝরা পলকের রাশি—মৃত্যুর পাহাড়।

পনেরোই আগষ্ট

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সবুজ ধানের ক্ষেতে সোনা হ'য়ে যেতো যেই প্রাণের ফসল
একদা সূর্য্যের প্রেমে ; বর্ষণের অবিশ্রান্ত চুম্বনে যে তৃপ্ত হয়ে যেতো,
সেই ধান, যেন কোনো বিধাতার আশীর্বাদ : ছিলো মানুষের।

অজস্র আয়ুর মতো মন ছিলো সেইসব সোনালী ধানের
সার্থক একটি মাত্র মৃত্যুর শপথে ; তাই কাস্তে হাতে চাষী
যদিও কাট্‌তো তাকে, তবু তাকে ভালোবেসে সেই চাষী হ'য়ে যেতো বুড়ো।

একদিন সোনায় সবুজে
সেই মাঠ ভরেছিলো, তাই দেখে শ্বেতদ্বীপে কুষ্ঠরোগী কয়েকটি শ্বাপদের চোখে
লোভে আর ঘুম ছিলো নাকো ; মাতাল ধানের গন্ধে সারারাত তারা জেগেছিলো।
তারপর একে একে ধানক্ষেতে এসে তারা চাষীকে বোঝালো,
মাঝামাঝি ধানক্ষেতে স্বার্থের প্রাচীর কোনোদিন যদি তোলা যায়
অনায়াস উপভোগে কোনো ভাই আরেকটি কাস্তেহাতে ভাগ বসাবেনা।—
সেদিন চাষীর মনে কোনো এক কালোমেঘ দেখে যেতে-যেতে
সূর্য শুধে গেল তার কর্তব্যের সর্বশেষ দেনা।

অন্ধকারে,—ধান নেই, সব ধান শেষ হ'য়ে গেছে, সেই মৃত্যুর প্রান্তরে
আরেক শ্রাবণে দেখি স্বর্ণহীন কোনো এক পাথরের বিবর্ণ প্রাচীর
তোলা হ'য়ে গেছে।
ধানের অঙ্কুর তবু প্রাণ দেয় প্রাচীরের নীচে তার মাথা কুটে কুটে।...
সূর্যহীন অন্ধকারে যে ফসল বাড়েনিকো, তারে কেটে নিতে
তারপর দ্বিপ্রহর গেছে কত, আসে নাই তবু কোনো চাষী।

এইভাবে ইতিহাসে বিবর্ণ বৃক্ষের মতো প্রেমহীন প্রাণের মিছিল
দেখে দেখে ক্লান্ত ছিলো মন ঃ
সবুজ না হ'তে হ'তে মৃত্যু যার, প্রাণহীন সেই ধান কাঁচা কেটে খেতে
অর্দ্ধনর—অর্দ্ধপশু প্রাচীরের নীচ দিয়ে বানিয়েছে ধানক্ষেতে সুরঙ্গের পথ,
সেই খায় ধান!
এইভাবে দিন যায় রাত্রি আসে, লেখা হয় নিষ্ঠুর নিয়তি-ইতিহাস।

তবু ধান বেঁচেছিলো প্রাচীরেরো নীচে
কাস্তেটাকে ভালোবেসে সে-ধান সোনালী হ'তে প্রাচীরকে ক'রেছে আঘাত
অন্ধকারে রাত্রিদিন মাথা খুঁড়ে ; কখনোবা সঙ্গীহীন দু'একটি, আত্মহত্যা করে।...

সে ধানের ইতিহাস প'ড়ে নিতে, কাস্তে হাতে চাষীরা মিলেছে আজ ভোরে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

প্রকাণ্ড বস্তী। সাধারণত বস্তী বলতে যা আমরা বুঝে থাকি বস্তীর আবহাওয়া বস্তীর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কল্পনা, আমাদের শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে একসঙ্গে ভয় ঘৃণা এবং রোমাঞ্চকর বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে—এ বস্তী সে বস্তী নয়। ছিটে বেড়ার এবং কাঠের ফ্রেমে গাঁথা টিনের দেওয়ালের উপর খাপরা বা টিনের চালওয়ালা বাড়ীর বসতিকে আমরা বস্তী বলে থাকি বটে, তবে এ বসতিটিকে বস্তী না বলে দারিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পল্লী বলাই উচিত। চল্লিশ পঞ্চাশটাকা মাইনের কেরাণীরা কিছু ভদ্রসন্তান ট্রাম কণ্ডাক্টর কিছু বাঙালী ড্রাইভার স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করেন। কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যবসা করে থাকেন, সাইকেল মেরামতি দোকান, পান সিগারেট বিড়ির সঙ্গে অল্পস্বল্প মনিহারীর দোকান, কেউ কেউ আছেন দালাল—ইনসিওরেন্স, মোটর, বাড়ী কেনা-বেচার জন্য উদয়াস্ত ঘুরে বেড়ান দিনের পর দিন, মাসে-দুমাসে একটা কারবারে সফল হলে আবার বুক বেঁধে মাস খানেক ঘুরে বেড়ান; দু চারজন আছেন ছোটখাটো প্লাম্বার—কর্পোরেশনে ঘুরে জলের কলের হুকুম বের করে ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বসে জলের পাইপ বসাবার তদ্বির করেন। কয়েকজন আছে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। দু একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন, একজন শালগ্রাম শিলা রেখেছেন, যজমানের ক্রিয়াকর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর সমেত যজ্ঞনির্ব্বাহ ক'রে দেওয়ার সুবিধা ক'রে দেন। একজন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কোষ্ঠীবিচার করেন—গ্রহশান্তি যাগ করেন—মাদুলীও দিয়ে থাকেন। কয়েকজন কম্পোজিটার আছেন। এর সঙ্গে ছোটখাটো সাইডবিজিনেস আছে অনেকের, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি চালায় বাড়ীর বেকার ছেলেরা। দু'চারজন অল্পবয়সী বাসীন্দা নিজেরাই করে থাকেন অবসর সময়। পিওর ঘি, খাঁটী সরষের তেল গৃহস্থবাড়ীতে বিক্রী করে আসেন। স্থানীয় সম্পন্ন রাজনীতিবিলাসীদের জন্য হরেকরকম খবরের কাগজ, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যফ্যাশনগ্রস্তদের জন্য বাংলা মাসিকপত্র, ক্রসওয়ার্ড পাজলর বিলাসীদের

জন্য ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি ওরিয়েন্ট নিয়ে কারবার করে কয়েকজনের ছেলে। বাতের দৈব তেল এবং ওষুধ বিক্রী করেন একজন। একজন দেশ থেকে ডিম এনে বাজারে পাইকিরি দরে ছেড়ে দেন—তার সঙ্গে গুড়ের সময় গুড়ও আমদানী করেন কিছু-কিছু। মেয়েরাও প্রাণপণে খেটে ঘরের কাজ করেও কিছু-কিছু অর্থকরী কাজ করে, সকলে না-হলে অনেকেই করে। পুরাণো খবরের কাগজ কিনে ঠোঙ্গা তৈরী করে মুদীর দোকানদারদের যোগান দেয়, কেউ-কেউ জামায় এমব্রয়ডারীর কাজ করেন, জনকয়েক আছেন—তাঁদের পুরুষেরা স্থানীয় বিড়িওয়ালাদের কাছ থেকে মশলা এবং পাতা আনেন—তাঁরা বিড়ি বেঁধে দেন—বিড়িওয়ালার লোক এসে মজুরী দিয়ে নিয়ে যায়। একজন মহিলা আছেন—তিনি সেলাইয়ের কলের ক্যানভাসিং করে বেড়ান। সগুসগু দেখা যাচ্ছে কয়েকটি বয়স্কা কুমারী মেয়ে—কয়েকটি কারখানার জিনিষ বিক্রির ক্যানভাসিং করে বেড়াচ্ছে। বাজারে দোকানে দোকানে গিয়ে তাদের জিনিষ দিয়ে আসে—সপ্তাহের শেষে গিয়ে জিনিষের দাম নিয়ে কারখানার হেড আপিসে জমা দেয়।

ছেলে মেয়েরা সকলেই প্রায় পড়ে। ছেলেরা কলেজ পর্য্যন্ত যায়, মেয়েরা ক্লাস এইট-নাইন পর্য্যন্ত তারপর কিছুদিন ঘরে পড়ার সঙ্গে গানের চর্চ্চা করে, এরও কিছুদিন পরে কেউ কেউ বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়—এক বস্তী থেকে অন্য বস্তীতে, বাকী অধিকাংশেরাই পড়া-গান শেখা বন্ধ করে কোমর বেঁধে ঘরের কাজে লেগে যায়, ক্ষোভে মা-বাপ তাকেই অভিশম্পাৎ দেন—সে কিন্তু হাসিমুখেই আরও খাটবার চেষ্টা করে, ঘরের কাজের সঙ্গে ঠোঙ্গা তৈরীর কাজ বা বিড়ি বাঁধার কাজ নেয়। কোন কোন ভাবপ্রবণ বাস্তবজ্ঞানহীনা অকস্মাৎ অপরূপ রূপলাবণ্যে এক নূতন মূর্ত্তি ধরে মা-বাপের সামনে লজ্জিত নত মুখে দাঁড়ায়, চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ে; মা বাপ মাথায় করাঘাত হানেন; তারপর অনেক গবেষণার পর মেয়েকে স্থানান্তরে পাঠান হয়—কয়েক মাস পরে কেউ ফেরে কঙ্কালসার দেহে, কেউ বা ফেরেই না, শোনা যায় সে মারা গেছে। কচিৎ কারও ঘরে দেখা যায়—মেয়েটির মা দিদিমা-ঠাকুমা হবার বয়সে—সলজ্জভাবে একটি শিশুর জননী হয়ে—এ বস্তী থেকে অন্য বস্তীতে বাসা বদল করে চলে যাচ্ছেন, কন্যাটির উদাস দৃষ্টি ওই শিশুটির উপরেই আবদ্ধ। আবার এরই মধ্যেই দুটি একটি মেয়ে পড়াশুনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে স্কুল থেকে—কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ার—থার্ড-ফোর্থ ইয়ার অতিক্রম করে চলেছে। এমনি একটি মেয়ে কিছুদিন আগে পার্কের পথে একটি তরুণের কলারে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল থানায়।

এই বসতিটির পূর্ব্বে রাস্তা, দক্ষিণে রাস্তা, পশ্চিমে রাস্তা, উত্তরে সঙ্কীর্ণ একটি বন্ধ গলির ব্যবধান রেখে বড় বড় পাকাবাড়ীর সারি আরম্ভ হয়েছে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে রাস্তার

সীমানার ওপার থেকেও পাকাবাড়ীর পল্লী—কেবল পশ্চিমের রাস্তাটার ওপারে বিস্তীর্ণ বিরাট বস্তী। যাকে বলি আমরা বস্তী সেই আসল বস্তী। এর মধ্যে সব আছে, মুটে মজুর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করে, উড়িয়া হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই বেশী; চোর জুয়াচোর গাঁটকাটা গুণ্ডা এরাও থাকে এর মধ্যে; একটা পুকুর এই বস্তীটির কেন্দ্রস্থল—পুকুরটির চারিপাশে দেহব্যবসায়িনীদের পল্লী, এদের সঙ্গে গুণ্ডাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ; গুণ্ডারাই এদের রক্ষাকর্ত্তা এবং গুণ্ডাদের কাজে এরাও সহায়তা করে; গোপনে মদ বিক্রী হয়, কখনও কখনও কোকেনের আমদানীও হয়। এসব ছাড়াও আছে হরেকরকম পেশার মানুষ, কেউ ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়, কেউ অল্পস্বল্প মনিহারীর ডালা বুকে বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, কেউ শিশি বোতল কিনে আনে; পুরাণো 'খবরের কাগজ বেচে; এর মধ্যে কেউ কেউ গোপনে থানায় যায়-আসে—এরা সি আই ডির স্পাই; অনেকের গোপন যোগাযোগ গুণ্ডাদের সঙ্গে। ওই তিন দিকে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর পাকা দালানের বেষ্টনীর মধ্যে এই অধমবিত্ত ভদ্রজনের বস্তী চেহারার এই বস্তীটির সঙ্গে ওই আসল বস্তীটির সম্বন্ধ যেন থেকেও নাই আবার না-থেকেও আছে। কখনও মনে হয়—এই অংশটি বস্তীটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দালান কোঠার গায়ে-গা দিয়ে এদের মধ্যেই মিশে যাবার চেষ্টা করছে; কখনও মনে হয় দালান কোঠার পাড়া থেকে আলাদা হয়ে ওই বস্তীর পাড়ার সঙ্গে যুক্ত হবার ভূমিকা করছে।

এরই মধ্যে হিরণবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিল অরুণা। এই পাড়াটার অবস্থার যেন প্রতীক হিরণবাবুর সংসারটি। হিরণবাবুর মা সংসারের কর্ত্রী। একদা স্বামীর সঙ্গে তিনি উত্তরের ওই বড় পাকাবাড়ীগুলির গোটা একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন। স্বামী ছিলেন কৃতী দালাল। বালীগঞ্জ অঞ্চল তখন সদ্য গড়ে উঠছে, শেয়ারের দালালীর সঙ্গে জমির দালালীতে সচ্ছল মধ্যবিত্ত হতে উত্তমবিত্ত হবার উদ্যম নিয়ে কাজ করবার জন্য এই দক্ষিণ প্রান্তে সদ্যনির্ম্মিত একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া করে এসে বসেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোক, মধ্যম শিক্ষিত হলেও প্রচণ্ড উৎসাহ এবং দক্ষতা ছিল তাঁর। স্ত্রী অর্থাৎ হিরণবাবুর মাও পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে, ক্লাস এইট-নাইন পর্য্যন্ত লেখাপড়াও করেছিলেন। তার উপর যেমন ছিলেন সপ্রতিভ তেমনি ছিলেন কর্ম্মক্ষমা। স্বামী এবং স্ত্রী মিলে—সে কালে সম্পূর্ণ একটি আধুনিক প্রগতিশীল সংসার গড়ে তুলেছিলেন, বালীগঞ্জের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে অনায়াসে স্বচ্ছন্দে তাঁদের সহজ স্থান করে নিয়েছিলেন। আচারে ব্যবহারে মনে কোনস্থানে এতটুকু জটীলতার বালাই ছিল না। সম্পদের মিথ্যা গল্প ছিল না, সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিও তাঁদের সামনে নিজেদের সম্পদের কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না; চারিপাশের সম্পদগুলিকে এই দম্পতিটি অতি সহজ ভাবেই গ্রহণ করত, তার কাছে দীনতাও প্রকাশ করত' না। স্বামী স্ত্রী

দু জনেই প্রাণখুলে হাসতেন। অতি সহজ ভাবে এই পরিবারগুলির কাজে কর্ম্মে সাহায্য করতেন। নিপুনতার জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি আগ্রহের মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতেন অকুণ্ঠ প্রশংসা ও প্রীতি দিয়ে। এঁরাও অকুণ্ঠিত মনে সে প্রশংসা এবং প্রীতি নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। ফলে কাজও পেতেন অনেক। হঠাৎ কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে হিরণের মা দালালগিন্নী বিধবা হলেন। বুদ্ধিমতী মেয়েটির বয়স তখন তিরিশের বেশী নয়। ছেলের বয়স দশ মেয়ের বয়স আট। স্বামী যে পুঁজি রেখে গিয়েছিলেন সে খুব বেশী নয় হাজার আষ্টেক টাকা। দেনা ছিল না, পাওনাই বরং ছিল, সে প্রায় হাজার তিনেক হবে। কিন্তু তার মধ্যে সাত আটশো টাকার বেশী আদায় হল না—তার জন্য দুঃখ করলেও—আদালতে গিয়ে আদায়ের চেষ্টায় ঘরের টাকা খরচ করলেন না। টাকাগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। গোটা বাড়ীটার একটা তলা রেখে একটা তলা ছেড়ে দিলেন। পরিচিত পরিবারগুলির মধ্যে যাওয়া আসার মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। ব্যবহারের মধ্যে দীনতা বা হীনতা না হলেও একটু বেশী পরিমাণেই বিনয় মিশিয়ে দিলেন। তাদের কাজ ক'রে দেবার জন্য আগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। বৎসর কয়েক পরে কয়েকটি বাড়ীতে মেয়েদের সেলাই শেখানোর কাজ নিলেন। তারপর দিলেন মেয়ের বিয়ে। যেবার মেয়ের বিয়ে হল সেইবারই এই বসতির প্লটগুলি একজন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কিনে খাজনায় বা ভাড়ায় বিলি করতে উদ্যত হলেন। দালালগিন্নী তখন মেয়ের বিয়ের খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকাগুলি নিয়ে হিসেব ক'রে ভাবীকালের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ছেলে হিরণ সবে আই-এস্-সি পাশ করে বি-এস-সি পড়ছে, চাকরীর বাজার অত্যন্ত মন্দা। ছেলেকে পড়া ছাড়িয়ে বসিয়ে রাখতেও তিনি চান না—আবার বি-এস-সি পড়ার খরচাটাকেও বাহুল্য বা সাধ্যাতীত বলে মনে হয় এমনি অবস্থা। ছেলে মধ্যে মধ্যে ব্যবসার কথা বলে। কিন্তু নিজে যা বুঝেন না তার জন্য তিনি টাকা দিতে চান না। ছেলের কথায় সম্মতিও দেন না, প্রতিবাদও করেন না শুধু নিজে ভাবেন, ভাবনার মধ্যে অনেক রাত্রি বিনিদ্র যাপন করেন এমনি অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ তিনি এই জায়গা ভাড়া দেওয়ার খবর পেলেন। দালালগিন্নীর কর্ম্মনিপুনতা এবং আগ্রহ আন্তরিকতার জন্য পরিচিত পরিবারগুলির মধ্যে তিনি অপরিহার্য্য হয়ে ছিলেন তখনও। একটি বাড়ীতে গিয়ে এই খবরটি পেলেন। সারারাত্রি চিন্তা করে সকালে উঠেই তিনি কাঠা তিনেক জমি মাসিক ত্রিশটাকায় ভাড়া নিলেন কয়েক বৎসরের জন্য। সর্ত্ত থাকল মেয়াদ শেষে নূতন মেয়াদী বন্দোবস্তের। তিনকাঠা জমির উপর তিনি মাঝখানে খানিকটা উঠোন রেখে চারিপাশে পরিচ্ছন্ন—মাঝারি আয়তনের ন' খানি ঘর তৈরী ক'রে তিন ভাগে ভাগ করলেন। মেঝে বাঁধালেন, কলের জলের ব্যবস্থা করলেন, আধুনিক ধরণের পায়খানা এবং স্নানের জায়গার ব্যবস্থা করলেন এবং ইলেকট্রিক আলোর জন্যও দরখাস্ত করে দিলেন। দু ভাগ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে একভাগে নিজে ছেলেকে নিয়ে

উঠে এলেন। তখন বাজার ছিল সস্তা, টিন এবং কাঠের ফ্রেমের বাড়ী বেশ মজবুত এবং নূতন উপকরণ দিয়ে তৈরী করাতেও দু হাজারের বেশী খরচ হল না।

তিন পাশের পাকা বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে তখন এখানে বস্তী পত্তনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন মাটীর নীচের এক মুঠো ছোলার মত চাপ বেঁধে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা ঠেলে উঠছিল। দালালগিন্নীর এই বাড়ীখানি দেখে সে আন্দোলনের মোড় ফিরে গেল। তাঁরা বললেন—এই ধরণের বসতি—যাকে বস্তী বলা যায় না—তা হতে দিতে আপত্তি নাই। জায়গাটির মালিকও ব্যবসায়ের মধ্যে নূতন পথ দেখলেন। খারাপ দিকটা অনেক ভেবে দেখলেন। দেখলেন, এই সব অসচ্ছল অবস্থার লোকগুলির কাছে ভাড়া আদায় করা কষ্টকর। বাকী পড়বার সম্ভাবনা বেশী। এরা আইন জানে এবং দেখায়। সমস্ত বিবেচনা করেও তিনি দালালগিন্নীর পন্থানুসরণ করলেন। কারণ এরা আইন জানলেও এবং দেখালেও এরা অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্ব্বল। থানায় এবং আদালতে যার পয়সা আছে তার বিরুদ্ধে আইন দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। আইন এবং বে-আইন এই দুইয়ের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে সেই পথে যাতায়াতে তিনি অভ্যস্ত। এবং তাঁর নিজের বাড়ীর সামনেই পড়বে এই বস্তী।

দালালগিন্নী হিরণ বাবুর মা—এই বস্তী বা বসতি স্থাপনের মূল। হিরণ এখন চাকরী পেয়েছে; একটা কেমিকেল ওয়ার্কসের কারখানায় কাজ করে। ষাট টাকা মাইনে। বিয়েও দিয়েছেন দালালগিন্নী। দুটি নাতিও হয়েছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে মেয়েটি তিন মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে এসে মা ও ভাইয়ের স্কন্ধেই পড়েছে। দালালগিন্নী এখন বাড়ীর ন খানা ঘরের চারখানা নিয়ে থাকেন। বাকী পাঁচখানা ভাড়া দিয়েছেন—এই আত্মীয়-স্বজনহীনা বিধবা মেয়ে ক' জনকে।

দালালগিন্নীর আজও সেই পূর্ব্বপরিচিত বড়লোকের বাড়ীগুলিতে যাতায়াত রয়েছে। তাঁর কর্ম্মক্ষমতা এবং দক্ষতা শেষ হয়ে যায় নি বরং অভিজ্ঞতায় হিসাবের পরিপক্কতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। কাজে কর্ম্মে তাঁকে ডাক পড়ে, সঙ্গে তিনি বিধবা মেয়েকে নিয়ে যান, মেয়ে আল্পনা দেয়—মেয়েদের করণীয় সাজানো গুছানোর কাজ করে, তিনি নিজে করেন শুভ কর্ম্মের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন। আবার ভাঁড়ারেও তাঁকে চাই-ই। এমন হিসেব করে এবং এমন হিসেব নিয়ে জিনিষ কেউ দিতে পারে না, অপচয় তো হয়ই না—প্রশংসার সঙ্গে সঙ্কুলান করে দিয়ে কিছু সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত তিনি ভাণ্ডারে রেখে যান। এইসব কারণে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বরং বেড়ে গেছে এই সব পরিবারে। এবং পরিবারের সংখ্যাও বেড়েছে। এ সব বাড়ীর মেয়েরা বর্ত্তমানে যে সব গৃহে গৃহিণী—সে সব বাড়ী থেকেও ডাক পড়ে। ডাক পড়ে নয়—গাড়ী এসে নিয়ে যায়। আবার নিজেও হেঁটে যান—এ বাড়ী ও বাড়ী

ঘুরে আসেন। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে তাঁর চোখে পড়ল একটি বিধবা মেয়ে। মেয়েটি পরিচ্ছন্ন পোষাকে স্যাণ্ডেল পায়ে ছাতা বগলে ঘুরে বেড়ায়—ঘুরে বেড়ানোর একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ আছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে একদিন আলাপ করলেন।

মেয়েটির নাম লাবণ্য। সন্তানহীনা—আত্মীয়হীনা—বিধবা হবার পর কলকাতায় এসেছিল—অবলা শিক্ষাশ্রমে শিক্ষার্থিণী হয়ে; বৎসর খানেক থাকার পর—সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্লাউস-সায়া-সেমিজ সেলাই করে গৃহস্থ বাড়ীর বরাত মত। দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টভাবেই বলেছিলেন—তাড়িয়ে দিলে কেন?

লাবণ্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্যের মুখের গঠনে দীপ্তি আছে, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ধারালো ঠোঁট, রাগ বা ক্ষোভের রক্তোচ্ছ্বাসে মনে হয় শিখার মত জ্বলে উঠছে। লাবণ্য খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—সে অনেক কথা।

দালালগিন্নী আর কোন প্রশ্ন করেন নি। তারপরও কয়েকদিন নিত্য দেখাশুনা হয়েছিল একই পথের এখানে বা ওখানে, দালালগিন্নী একই প্রশ্ন করেছেন—হেসে সস্নেহে প্রশ্ন করেছেন—কেমন সুবিধে হচ্ছে?

মেয়েটি কোনদিন বলত—হচ্ছে একরকম। কোনদিন চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠে বলত'—ও সব জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন তো? কি বলব?

কিন্তু এই রকম দিনেই সে বেশী কথা বলত। একটু চুপ করে থেকে বলত'—ভদ্রলোকের সমাজ হলে ভদ্রভাবে একজনের খেটে খুটে দিব্যি পেটের ভাত জোটে। কিন্তু অভদ্র সমাজে ভদ্রভাবে কাজ করে কি অন্নসংস্থান হয়?

আবার বলত—পথে বেরুলেই ভদ্রবেশী বদমাইসেরা পেছন নেবে। আমাকেও ভাবে ভদ্রবেশিনী মন্দ মেয়ে।

হঠাৎ একদিন এই কথা প্রসঙ্গে সে বলে ফেললে—আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কারণ। তাদের আশ্রমের পাশেই ছিল একটা বোর্ডিং হাউস। মাঝখানে ছিল একটা সংকীর্ণ গলি। তার ঘরের ঠিক সামনেই ছিল বোর্ডিংয়ের সিংগল সিটেড রুম, সেখানে থাকতেন একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক।

লাবণ্য বললে—সত্যিই ভদ্রলোক। কোন দিন কোন ইতরতা প্রকাশ করতে দেখিনি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোক অবিবাহিত। অত্যন্ত সৌখীন, চমৎকার দামী বেডকভারে বিছানাটি ঢেকে রাখতেন; হাল্কা সৌখীন খানকয়েক আসবাব। নিত্য ফুলের মালা—ফুলের গোছা নিয়ে আসতেন। ফুলদানীতে ফুল রাখতেন। মালা নিজেই পরতেন। মধ্যে মধ্যে দামী সেণ্টের গন্ধ পেতাম। অত্যন্ত নিঃশব্দ মানুষ

কৌতুকের বশেই আমরা আমাদের জানালার পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখতাম আর হাসতাম। হঠাৎ একদিন ভদ্রলোকের ধারণা হল—সে আমাকে ভালবাসে—এবং সম্ভবতঃ আমিও তাকে ভালবাসি। সেই ধারণায় ভদ্রলোক কাণ্ড করে বসলেন। আমার জানালায় চিঠি ছুঁড়তে সুরু করলেন। খান তিনেক চিঠির পর আমি আশ্রমের কর্ত্তাকে জানালাম। কর্ত্তা হোটেলের ম্যানেজারকে জানালেন। তার পর দুই দিকেই গোলমাল। ওদিকে হোটেলে ভদ্রলোক হাউমাউ করে কাঁদেন। নিরম্বু উপবাস। কেন? না তিনি অন্যায় করেছেন—পাপ করেছেন। এদিকে আশ্রমের কর্ত্তা, আমাদের মেট্রণ আমাকে নিয়ে সে জেরার পর জেরা; কটুকাটব্য লাঞ্ছনা—সে আমার অসহ্য হয়ে উঠল। তারপর অন্য মেয়েরা মুখটিপে হাসতে সুরু করলে। অসহ্য হল একদিন, সে দিন হোটেলের দিকের যে জানালাটা তিন দিন ধরে বন্ধ ছিল—সেটা খুলে ডাকলাম—শুনুন। দেখলাম হোটেলের ঘরের জানালাটাও বন্ধ। বার কয়েক ডাকতেও খুলল না। শেষে হোটেলেই গেলাম।

একটু চুপ করলে লাবণ্য—তারপর হেসে বললে—শুনলাম, ভদ্রলোক হোটেল ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ী গেছেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে তবে কলকাতায় ফিরবেন। সেই দিনই আশ্রমের কর্ত্তা আমাকে বিদেয় করলেন। হোটেলে যাওয়ার কথা তিনি শুনেছিলেন। আমারও থাকতে ইচ্ছে ছিল না। আমি চলে এলাম। এসে চার দিন ছিলাম কালীঘাটের ধর্ম্মশালায়। তারপর অনেক খুঁজেও একখানা ঘর কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভাড়া পেলাম না। একা বিধবা মেয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে চায় এ কথা শুনে কেউ ভাড়া দিতে চায় না। অবশেষে—।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে দালালগিন্নী প্রশ্ন করেছিলেন—কোথায় আছ আজকাল?

—প্রথম ওই কয়লার ডিপো করেন—চিত্তবাবু—উনিই আমাকে এখানে একটা বস্তিতে আধাভদ্র আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন। ওই যে ওদিকে গয়লাদের বস্তী রয়েছে ওই গয়লাদের বস্তীতে রয়েছি। একটি বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ঘর সংসার পাতিয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জামাই নিয়ে থাকে, তাদের বাড়ীতেই একখানা কুঠরী ভাড়া নিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, খুব মোটা, গলায় সোনার হার, পোষাকে বিধবা, সকালে পিতলের বালতীতে দুধ নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে কয়েকটা বড় লোমওয়ালা ছাগল। ছাগলের দুধ ও বেচে থাকে।

দুগ্ধব্যবসায়িনী সম্পর্কে কোন উৎসুক্য প্রকাশ না করে দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সময় ক'রে একদিন আমার বাড়ী এসো না কেন? আসবে?

—আসব না কেন? আপনার সময় হলে আজই যেতে পারি।

—কাজের ক্ষতি হবে না?

—কাজ? হাসলে লাবণ্য। বললে—ঘরে থাকতে পারি না বলেই বাইরে বেরিয়ে আসি, বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি বলে মরতে ইচ্ছে করে। ঘরে গোয়ালিনীর সংসারের ঝগড়া—অশ্লীল কথা থেকে ঝাঁটা পর্য্যন্ত। বাইরে অভদ্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে পাশ ঘেঁষে যাবার ছলে মৃদুস্বরে আহ্বান কখনও কখনও ইঙ্গিতময় স্পর্শ পর্য্যন্ত। কাজ পেলেও ঘরে থাকতে পারি না বলে কাজ শেষ হয় না, বাইরে ঘুরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি বলে কাজ যোগাড়ও হয় না। বলে না জলে কুমীর-ডাঙ্গায় বাঘ—আমার সেই অবস্থা।

দালালগিন্নী তখনই তাকে নিয়ে ফিরলেন। লাবণ্য সেই দিনই এ বাড়ীতে এসেছে। লাবণ্যের ভাগ্যক্রমে তখন বাড়ীতে দুখানা ঘরের চত্বরটা খালিই ছিল। তারই একখানা ঘর তাকে দিয়ে বলেছিলেন—আমার ঘর দুখানা তো পড়ে রয়েছে, তুমি থাক। সঙ্গতি হলে ভাড়া দিয়ো।

দালালগিন্নীর মমতা আন্তরিক, তিনি নিজে প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করেছেন—লোকচরিত্র তিনি জানেন এবং কথাবার্ত্তা চালচলন থেকে ভালমন্দ তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে তিনি অবিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু এই দুটি কারণেই তিনি লাবণ্যকে ঘরে স্থান দেন নাই। সম্প্রতি তিনি নিজের বিধবা কন্যাটি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রবধূটির নিজের অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁর অবর্ত্তমানে বধূ পূর্ণ গৃহিণীত্বে আসীন হলে মেয়ের অবস্থা কি হবে এই চিন্তা তিনি না-করে পারেন না। লাবণ্যকে তিনি নিয়ে এলেন, মেয়ে অমলাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য।

মাসখানেক যেতে-না-যেতে লাবণ্য আর একটি বিধবা তরুণীকে নিয়ে এল, আরও কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন; তখন দুখানা ঘরই তারা ভাড়া নিলে—তারপর কিস্তীবন্দীতে কিনলে একটা সেলাইয়ের কল। ক্রমশঃ পিক্টোগ্রাফের সরঞ্জাম, পশম বোনার কুরুশকাঁটা, ব্যাগ তৈরীর চামড়ার উপর কারুকার্য্য করবার সরঞ্জাম এনে, মাঝখানের ঘর ছেড়ে—রাস্তার দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিলে; এর জন্য প্রচলিত ভাড়ার উপর পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে নিজে থেকেই! ক্রমে তিনজনের সঙ্গে আরও একজন এসে দল পুষ্ট করলে; দালালগিন্নীর মেয়ে অমলা ও চত্বরে থাকলেও—সেও এখন একজন। অমলার বড় মেয়ে রাণী বড় হয়ে উঠেছে, সেও কাজকর্ম্মের অবসরে এখানে আসে, শেখে। কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ শব্দে সেলাইয়ের কল চলে—মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা চলে, কাজের কথাই বেশী, মধ্যে মধ্যে হাস্য পরিহাসও চলে। তার অধিকাংশই তাদের দৈনন্দিন কক্ষপথে আগন্তুক কোন বিভ্রান্ত পথিকের হুচোট খাওয়া বা পা-পিছলে-যাওয়া অথবা দুটি বিপরীত-মুখ বিভ্রান্তের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কাহিনীকে অবলম্বন করেই চলে। পরস্পরের প্রতি সরস

বাক্যবাণও বর্ষণ করে। কখনও কখনও মৃদুহাস্য অকস্মাৎ কলহাস্যে ভেঙে পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। ঝি দরজা খুলে দেয়, লাবণ্য উঠে যায়—সামনের ঘরে। সামনের ঘরখানিতে একখানি লম্বা টেবিলের উপর কিছু কিছু সব রকম কাজের নমুনা সাজানো থাকে। খান চারেক সস্তা দামের চেয়ারও আছে। আগন্তুক অধিকাংশই দোকানের লোক; দোকানদারেরাই এখন এদের কাছে জিনিষপত্র নিয়ে থাকে। লাবণ্যই বেশীর ভাগ সময় কথাবার্ত্তা বলে। মধ্যে মধ্যে আসে চিত্ত। কখনও কয়লার দাম, মুদীর দোকানের জিনিষের দাম নিয়ে যায়। কখনও নতুন অর্ডার আনে। কখনও এমনিই এসে বলে—একটু চা খাওয়াও লাবণ্যদিদি। কখন এসে বলে—একটা ছোকরা ঘুর ঘুর করছিল। ছোঁড়াটার কান মলে দিয়েছে মহাবীর। তার পার্স টাও কেড়ে নিয়েছে—সে কথাটা লাবণ্যকে অবশ্য বলে না। লাবণ্যও পুলকিত হয়। কখনও চিত্ত সংবাদ নিয়ে আসে চোরাই ছিটের থানের, নমুনাও বার করে দেয়।

কখনও কখনও আসে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দুজন ভদ্রলোক, একজন প্রৌঢ় একজন তরুণ। এঁরা দুজনেই শিল্পী। ডিজাইন নিয়ে আসেন। ব্লাউস, ফ্রক, সায়া, টেবিল ক্লথ, বালিসের ওয়াড়, বালিসের ঢাকা প্রভৃতির উপর কারুকার্য্যের নক্সার নমুনা।

অরুণা এদের মধ্যে এসে সমস্ত দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল। অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত কল চলল, গল্প চলল। আজকের গল্প সবই অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে প্রশ্ন করছিল ওরা। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলে তারা অসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলে অরুণার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। গল্প বলা এবং শোনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কাহিনী শোনা হয়ে গেল। লাবণ্যদের এই বেঁচে থাকার টিঁকে থাকার বিস্ময়কর অথচ অতি সহজ দ্বন্দ্বের কথা শুনে অরুণা প্রায় অভিভূত হয়ে গেল। সে বললে—আপনাকে দিদি বলব ভাই লাবণ্যদিদি।

লাবণ্য বললে—ইচ্ছে হলে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে ভাই সবাই সখী। প্রাণের কথা মনের কথা কারও কাছে কেউ গোপন করি না।

অরুণা হেসে বললে—তা হ'লে প্রাণের কথা বলি। আমি আপনাদের কাছেই থাকতে চাই।

লাবণ্য হাসলে।

অরুণা বললে—আপনার মনের কথা তো বললেন না?

লাবণ্য বললে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ ভাই। তুমি কি দর্জ্জির কাজ নিয়ে থাকতে পারবে? আর কেনই বা তা' থাকবে? লেখাপড়া জানলে আমিই কি এই নিয়ে থাকতাম?

অরুণা হেসে বললে—আই, এ পর্য্যন্ত পড়েছি এ কি আর লেখাপড়া জানা?

তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া ?

—তা ছাড়া— একটু দ্বিধা করেই বললে অরুণা—লাবণ্যদি আপনার রূপ আছে আপনি বুঝতে পারেন না—যাদের রূপ নেই তাদের লেখাপড়া জানলেও চাকরী পাওয়ার কত কষ্ট। কালো মেয়ের সঙ্গে লোকে প্রেম করতে চায় কিন্তু বিয়ে—ওরে বাপরে—কালো মেয়ে তখন কালনাগিনী হয়ে ওঠে তাদের চোখে। বলে ওরে বাব্বা! কি চক্রান্ত! নাগপাশে জড়িয়ে ফেলে দংশাতে চায়!

তিনটি মেয়েই হেসে উঠল। লাবণ্য কিন্তু হাসলে না।

অরুণা বললে—ও আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি লাবণ্যদি। তবে তাড়িয়ে দেন সে আলাদা কথা।

লাবণ্য বললে—ভেবে দেখ!

পরদিন সকালে উঠেছিল অরুণাই সকলের আগে। লেপের মধ্যে শুয়েই সে শিয়রের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ বোধ হয় বাদলা কাটবে। কুয়াশা জমে উঠছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আকাশে মেঘ কাটা কাটা হয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সে ভাবছিল গত রাত্রির কথা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের আবেগের ঘনত্ব অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। কয়েক দিন দুশ্চিন্তা এবং বিপদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল কাল। এখন ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা। লাবণ্যের গত রাত্রির কথাটাই তার সত্য বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন সে এই দর্জ্জির কাজ নিয়ে থাকবে কি করে? কেনই বা থাকবে?

ঠিক এই মুহূর্ত্তে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবণ্য। স্মিত হাসি মুখে সে বললে—উঠেছ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

হেসে অরুণা বললে—হয়েছিল! শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

লাবণ্য বললে—কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম অরুণা! এখানে থাকাই তোমার ভাল। হোকনা দর্জ্জির কাজ। চাকরীর চেয়ে অনেক ভাল। আর তোমাকে পেলে অনেক কাজ করতে পারব। বড় বড় সাহেবী দোকানে তুমি যদি আমাদের কাজ নিয়ে গিয়ে চালাতে পার—তবে দেখবে আমরাই উন্নতি করতে পারব।

অরুণা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কোন উত্তর দিলে না।

লাবণ্য বললে—মতের বদল করেছ না কি?

অরুণা বললে—বিমলবাবুর সঙ্গে আজ একবার পরামর্শ করব।

লাবণ্য বললে—ওকে আজ ওবেলায় এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ কর না! আমাদের এই সব দেখানোও হবে—পরামর্শ নেওয়াও হবে। ক্রমশঃ

মনের প্রস্তুতি

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি

মানবতার বর্ত্তমান সঙ্কটে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই এক নিখিল বিশ্ব-মণ্ডলী গড়ে তোলা। আজ অন্ততঃ এইটুকু আমরা উপলব্ধি করতে শিখেছি, কিন্তু তবু মনের মধ্যে কি তা গ্রহণ করতে পেরেছি? তা যদি পারতাম তাহলে দেশের সর্ব্বত্র এমন আতঙ্কের কালো ছায়া বিরাজ করত না—নিরীহ পথচারীর রক্তে রাজপথ কলঙ্কিত হত না। আসল কথা হল আমাদের মনই যে পেছিয়ে রয়েছে অনেক দূরে।

তাই আজকের দিনে চাই মনের প্রস্তুতি—ইংরেজিতে যাকে বলা চলে intellect rebirth.

আমরা আমাদের কথাবার্ত্তায় ও আলাপ-আলোচনায় যে ধরণের বাক্য এবং রূপক প্রয়োগ করে থাকি তার ফলে আমাদের চিন্তাধারা জটীল ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। আর এই জটীল চিন্তাধারার পরিণাম যে কতখানি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ তা সহজে বোঝা যায় না। আমরা আজও কথার কুয়াশাজালের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে দেখছি। কথা ও রূপকের মারপ্যাঁচেই মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে উচ্চতরস্তরে নিজেকে সন্নিবিষ্ট করেছে এবং এই পৃথিবীর উপরে তার প্রভুত্ব স্থাপনা করেছে। কিন্তু এতদিন ধরে যে সমস্ত কথা ও রূপক সে ব্যবহার করে এসেছে তার সদ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আজ তার মানসিক অধিরোহণের প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের জালে জড়িয়ে পড়েছে। যুক্তিহীন, অসংলগ্ন কথা ব্যবহারের ফলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ইন্টেলেকচুয়্যাল আচরণগুলি আজ ভীষণরকম দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

মধ্যযুগে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে কথা ও রূপকের ব্যবহার নিয়ে মতবিরোধ ঘটত। আজও মানুষ সেই একই ধারায় চিন্তা করার পক্ষপাতী অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। আমরা অনেক কিছু আমূল সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করি, কিন্তু সেজন্যে শ্রমস্বীকার করতে চাই না। বিদ্যালয়ে—যেখানে মন তৈরী করা হয় সেখানে—সেই পুরাপ্রচলিত নিয়মে শিক্ষাদান পদ্ধতি চলে আসছে।

মানুষকে আজ ভাবতে হবে—সরলভাবে চিন্তা করতে হবে। আজ আবার একটা ধুয়ো এসেছে—আগে কাজ পরে কথা। কিন্তু এলোমেলোভাবে কিছু করলে সেটা কাজের চেয়ে অকাজই হবে বেশী। তাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু পরিষ্কার এবং সঙ্গত চিন্তা

আপনা থেকে আসে না। সত্যান্বেষণ একটা 'আর্ট' বা কলা বিশেষ। কিন্তু আজকের দিনে এমন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সঙ্গতভাবে চিন্তা করার মত কোনপ্রকার মানসিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আমাদেরই এই আর্ট শিখতে হবে এবং আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের যাঁরা শিক্ষাদাতা তাঁরা নিজেরাই তো এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষা পান নি। ফলে আমাদের সংবাদপত্র এবং বর্ত্তমান আলোচনাগুলি বিচারবুদ্ধিপূর্ণ ভাবধারার আদান প্রদানের পরিবর্ত্তে বধির শ্রবণ এবং অন্ধ মন নিয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে।

যিনি আজ নিখিল বিশ্ব-মণ্ডলী সংগঠনের open conspiracy বা মুক্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চান তাঁর নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে—দেখতে হবে তাঁর মন স্বাস্থ্যপূর্ণ ঋজু পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কিনা—যে পথ উঠেছে সত্যের আলোয় ঝলমলিয়ে। শুধু তাই নয়, সেই মুক্ত ষড়যন্ত্রকারীকে দেখতে হবে তাঁর মন কোন যুক্তিসঙ্গত সাধারণ নিয়মে ধারণা করতে পারে কিনা যা থেকে দৈনন্দিন বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সত্য স্বরূপটি তৈরী করে নিতে পারা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মানুষ তার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মনের অপরিচ্ছন্নতা বুঝতে পেরেছিল—তবু ভার্সাই চুক্তিপত্র বন্ধ করতে পারে নি। কারণ তখন সংস্কারাচ্ছন্ন ভাবপ্রবণ মন নিয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারা যায় নি। ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরকালে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা আমাদের অনেকের মতই জানতেন না যুদ্ধটা কী, এবং তারই ফলে শান্তি কী হতে পারে তাও তাঁরা ভাবতে পারেন নি। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হতে বিশ বছরের অধিক সময় লাগল না। কিন্তু তাতেই কি মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে ; ইতিহাস একইভাবে পুনরাবৃত্ত হতে চলেছে।

সত্যি আমরা যে কতখানি অজ্ঞ সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নিজেদের জীবন সম্বন্ধেই আমাদের সম্যক জ্ঞান নেই। ফলে পৃথিবীর আর সকলের সঙ্গে আমরা কিভাবে কতখানি পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ—আমাদের অথবা তাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ডে একটু ব্যাঘাত ঘটলে তা কেমন করে সংঘর্ষের সূচনা করতে পারে—তা আমাদের জানা নেই। জাতিগত মৈত্রী, জন্ম-শাসন, জনস্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ প্রভৃতি কোন জনহিতকর কার্য্যেই আমরা অগ্রণী হই না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যে কিভাবে নির্ব্বাহ হচ্ছে তাও আমরা ইচ্ছা করে বুঝতে চাই না। আমাদের রান্নার জন্যে শ্রমিক খনি থেকে কয়লা তোলে, নিরাপত্তার জন্যে ধনাগার বা ব্যাঙ্ক্ আমাদের টাকা গচ্ছিত রাখে, অর্থের বিনিময়ে দোকানী আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে এবং পুলিস আমাদের চুরিডাকাতি ক্ষয় ক্ষতি নিবারণের জন্যে সতর্ক পাহারা দেয়। কিন্তু আমরা খালি ভোট দেওয়া ছাড়া তাদের জন্যে আর কিছু করবার চেষ্টা করেছি কি ? কী ই বা করতে পারি ?

আজকের দিনে শুধু ইকনমিক্স বা অর্থশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকলে চলবে না—জানা চাই ইকলজি (Ecology) বা আধুনিক ধনবিজ্ঞান, যা অন্ততঃ এক শতাব্দীর পুরাতন অর্থশাস্ত্র থেকে বহুলাংশে পৃথক এবং সেই সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগ চাই জীববিজ্ঞানের, যাকে বলা হয় Applied Biology.

আজ যুদ্ধাবসানের পর যে নতুন দিনের' সম্ভাবনা জাগল', ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টে যে স্বাধীন ভারতের নবোন্মেষ হল, তাতে চিরন্তনী শান্তি ও মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে অখণ্ড বিশ্ব-সম্মেলনী গঠনে আমরা আরো খানিকটা অগ্রসর হবার আশা করতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে মনের প্রস্তুতি চাই—চাই শিক্ষার বিপ্লব। আমাদের স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে এসম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। সেই পুরাতন ধারায় শিক্ষা দেওয়া চলতে থাকবে, তারই মধ্যে দু-একজন ছিটকে পড়ে সত্যিকারের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করবেন, আর বেশীর ভাগ লোক মনের খোরাক থেকে উপবাসী থাকবে অথবা বিকৃত খোরাক সংগ্রহ করবে—আজও আর এসবের প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। মাইনরিটি দিয়ে কি এতবড় বিপ্লবকে সঞ্জীবিত রাখা যায়? তাই এইচ. জি. ওয়েলসের ভাষায় বলি—A revolution in education is the most imperative and fundamental part of the adaptation of life to its new condtions.

কিন্তু এই বিপ্লবমূলক সংস্কারের জন্যে আমাদের দৈনন্দিন আচার আচরণগুলি কি কিছুসময়ের জন্যে বন্ধ থাকতে পারে? দিনের পর যেমন দিন আসে তেমনি জীবনের কাজকর্ম্মগুলিও অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। তাই চলমান পুরাতনের মধ্য থেকেই নতুন জগৎকে চালিয়ে দিতে হবে।

নতুন জগৎ বললাম,—কিন্তু সেটা কী? তা হল রাজনীতিক, সামজিক এবং অর্থনীতিক সূত্রে একত্রীভূত। আমাদের সকল প্রকার অগ্রগতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই হল একমাত্র কাঠামো।

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে একই প্রকার রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হবে একথা অনেকে ইচ্ছা করেই ভাবতে চান না। যে গবর্ণমেণ্ট মানুষের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে তাকেই তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান। আজ যা যেভাবে রয়েছে তাঁরা মনে করেন শুধু কাল নয় চিরকালই তা ঠিক ঐভাবেই থাকবে।

কিন্তু আমাদের এ লেখা হল সেই সব আধুনিকমনাদের জন্যে যাঁরা পৃথিবীকে সুন্দর এবং নিরাপদ বলে ভাবতে পারেন না যতক্ষণ না একটিমাত্র বিশ্বহিত-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হচ্ছে—সকলের জন্যে তৈরী সেই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ নিবারণ করবে, আর্থিক, নৈতিক ও

জৈবনিক শক্তিগুলি কেন্দ্রীভূত করবে এবং সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করবে। আর এই নিয়ন্ত্রণ চলবে বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নতুন গবর্ণমেণ্ট তাহলে কী ধরণের হবে? নতুন সাইকোলজি নিয়ে নতুন নির্দ্দেশে এর কাজ চলবে। এখানে রাজা অথবা প্রেসিডেণ্ট কেউ থাকবে না, কিংবা পৃথিবীর সকল দেশের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কোন পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রণা-সভা বসবে না—কারণ এতে গোলমালের সম্ভবনাই বেশী। লীগ অব নেশনস্ বা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের মত তাহলে তা ক্রমে প্রহসনে পর্য্যবসতি হবে। বিশ্ব গবর্ণমেণ্ট হবে ঠিক যেন কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন তাদের গবেষণা ও কাজকর্ম্মের বিবরণী প্রকাশ করে এবং পরে যে সমস্ত সমালোচনা হয় তাদের সবগুলি একত্রিত করে ও মন্তব্য প্রকাশ করে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করে থাকে, বিশ্ব-গবর্ণমেণ্টও তেম্নি আলোচনা, সমালোচনা ও প্রচারকার্য্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে।

আজও সামরিক ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগঠন হয়ে থাকে। বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কিন্তু সেভাবে চলতে পারেনা। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত বা শ্লোগানের উর্দ্ধে অধিরোহণ করতে হবে বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানকে। আমাদের সকলেরই এক লক্ষ্য হবে কি করে এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববাসীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারে। তাই জাতি ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী গুণী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের পরিচালনাধীনে রাখা হবে এই গবর্ণমেণ্টকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তার কাজের মুক্ত সমালোচনা করা হবে এবং কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা গেলে তা অবিলম্বে সংশোধনের জন্য উপযুক্ত শক্তিশালী সংগঠন থাকবে। সবসময়েই যে কঠোর আইনের সাহায্যে অপরাধীর শাস্তি বিধান হবে, তা নয়—দরদী মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার বিচার করতে হবে—অপরাধের মূল কারণ অনুসন্ধান করে ব্যক্তি-বিশেষের বা সমষ্টিবিশেষের সংস্কার করে নিতে হবে।

আমাদের কল্পিত গবর্ণমেণ্টের কাজ যতই বিস্তার লাভ করবে ততই একত্রীভূত কাজ ও সহযোগিতার কোন সাধারণ নীতি আবিষ্কার করা যাবে। প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই তা জটীল কার্য্যকলাপ সম্পাদন ও সাধারণ পরিচালনার কাজ আয়ত্ত করে নেবে। আর সবসময়েই চাই ভাবপ্রবণতাহীন ও উত্তেজনাহীন সহজ সরল ও স্পষ্ট সমালোচনা—যা বিশ্বসভ্যতার জীবনস্বরূপ।

আমরা আবার বলি, এই নতুন বিশ্ব-মানবের প্রতিষ্ঠানটি পুরাতন কোন

গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত পন্থানুযায়ী চলবে না—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্ববাসীর জাতিধর্ম্ম রাষ্ট্র নির্ব্বিশেষে সেবা করাই হবে তার একমাত্র ব্রত। আমরা সদিন কবির ভাষায় বলতে পারব—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু
সে জাতির নাম মানুষ জাতি"

তবে সেজন্যে চাই মনের প্রস্তুতি।

সামগ্রী

হিমাংশু রায়

পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে রতনলাল বলল, এ যে দেখছি শ্মশান ঘাট থেকে তুলে এনেছিস। যা নিয়ে যা।

জহ্লাদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। হঠাৎ পরিশ্রমের জন্যে নয়। ওটা তার মজ্জাগত দুর্ব্বলতা। রতনলালের কথা শুনে ওর চোখমুখের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্তের জন্যে জমাট বেঁধে গেল। কিষণের দিকে তাকিয়ে কি বলতে গেল, পারল না; কিছুটা থুথু উঠল শুধু।

চাকরী হবার নয়, কিষণ জানে। দুটো পয়সা পাবার কড়ারে সে জহ্লাদকে এনেছিল। বলল, নে চল। চল না, মুষড়ে পড়লে কি আর চাকরী হয়রে?

রাস্তায় এসে কিষণ বলল, চাকরী তোর হয়ে যাবে। তবে কি জানিস, এতো আর বাবুদের কলমপেশা নয়, মালটানার চাকরী। দানাপানি খেয়ে গায়গতরে একটু বেড়ে ওঠ দেখি। রতনলালের সাধ্যি কি তোকে আটকায়। ইষ্টিশন মাষ্টার রয়েছে না। সে আমার হাতের লোক। দে দেখি আমার পাওনাটা চুকিয়ে।

রেলের কুলির চাকরী সম্বন্ধে জহ্লাদ পাকাপাকি রকম অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল। এর পেছনে ছিল কিষণের নিশ্চিত আশ্বাস। রতনলাল তাকে হতবাক করে দিয়েছে। তার সটান এবং সংক্ষিপ্ত কথাগুলো তখনও তার মাথার উপর হাপড়ের আঘাতের মত ওঠানামা করছে।

একটু সময় চুপ থেকে কিষণ অসহিষ্ণুর মত জহ্লাদের দিকে তাকাল। কেমন যেন সন্দেহ হল। ওর ট্যাঁক ধরে নাড়া দিয়ে বললে, বের কর দেখি কি আছে।

আনা বারো ছিল, বেড়িয়ে পড়ে। কিষাণ চকিতে সিকি-আনিগুলো দেখে নিয়ে বলে, বেশ চকচকে তো! নে যা এবার।

জহ্লাদ বাঁধা দেয়না। বোকার মত তাকিয়ে থাকে। কিষণ উল্টো দিকে দুপা এগিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এল।

এই রইল তোর চার আনা। কিষণ কাউকে ঠকায় না। আট আনা কথা ছিল, ঠিকঠিক আট আনাই নিলাম। তার পর অল্প হেসে বলে, চাকরী তোর হবেই। এই আমিই করে দেব দেখে নিস।

চারটে আনা গুণেগুণে ফিরিয়ে দিল কিষণ। জহ্লাদ ওটা ট্যাঁকে গুঁজে কিছুটা এগিয়ে এসে রাস্তার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়ালেই সে হাঁপাতে থাকে। নিজেকে সে যতই সহজ করতে চায় বুকের ভেতর চাপটা ততই যেন তাকে কাবু করে তোলে। লম্ব দেহটা ক্রমেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। হাতপাগুলো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া করে যেন। বুকের হাড়কটা ঠেলে বেরিয়ে আসবার নির্লজ্জ চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

…জোড়া লে লও দুআনা, চারটা নিলে তিন আনা—

সুর-করে-বলা চীৎকারে জহ্লাদ হঠাৎ মনস্ক হয়ে উঠল। তাকাল। চেনা-চেনা মনে হয় মুখটি। একটু মোটাসোটা হয়েছে, তবে চোখের সেই তল্লাসী দৃষ্টি এখনও পষ্ট!

জহ্লাদ একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, মান্কে না?

মুখস্তের মত মান্কে বলতে যাচ্ছিল, এক নম্বর জিনিষ বাবু। কিন্তু জহ্লাদের লম্বা চেহারাটা ছায়ার মত তার মুখের উপর পড়তেই সে সচেতন হয়ে বলে, আরে তুই বেঁচে আছিস নাকি?

কথাটা আঘাত করল জহ্লাদকে। নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সে তক্ষুণি বলল, নিশ্চয়ই। রোগা পটকা দেখলে কি হবে, হাতদুটো এখনও মণকয়েক বোঝা টানতে পারে, তা জানিস।

মান্কে হোহো করে হেসে উঠে বলে, বটে!

হাসলি? ক্ষুণ্ণ হল জহ্লাদ। আচ্ছা, ওই সাঁই ইটটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে দেব দশহাত দূরে? দেব? বিশ্বাস হবে?

মান্কে আরেক চোট হেসে বলে, বুদ্ধিটা এখনও বোকা হয়ে আছে দেখছি। তা এদ্দিন ছিলি কোথায়? অমন লড়াই গেল, দুর্ভিক্ষ গেল, পাঁচচল্লিশে পুলিসের গুলিগোলা গেল, হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা গেল, তাও যখন তুই বেঁচে আছিস তখন জবরদস্ত জোয়ান বইকি!

জহ্লাদ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিষণ যদি এটা ঠিক মত বুঝে উঠতে পারত তবে তার চাকরীটা নির্ঘাত হয়ে যেত। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ মান্‌কের একটা হাত চেপে ধরে বলে, তুই ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবি।

কি ?

চাকরী। রতনলালকে চিনিস তো ? রেলের কুলির সর্দ্দার ?

তবেই হয়েছে। তুই টানবি মাল ?

কেন ? আহত অনুভূতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ছোট্ট চোখদুটোতে। দু-দশমণি বোঝা টানতে জহ্লাদের শিরদাঁড়া শির উঁচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর বলবার কায়দা দেখে মান্‌কে না হেসে পারে না। দশ বছর আগেও সে তাকে যেমনটি দেখেছে আজও তেমনি আছে। তেমনি নিরীহ, বোকা, রোগা। বয়সের সঙ্গে আরেকটু রোগা হয়েছে। লম্বা মুখটা তাতে বিশ্রীরকম লম্বা ঠেকছে।

বোকাই বলতে হবে জহ্লাদকে। অশক্ত দেহটার মত মনটাও তার অশক্ত। টাকা করবার ফিকিরগুলো কেউ বলে দিলেও তার মাথায় যাবার আগে গুলিয়ে যায়। দুটো পয়সা তাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেলেও সে সঠিক ধরে উঠতে পারে না।

মান্‌কে এটা জানে। বলল, চাকরী করবি তো বল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জহ্লাদ।

তোর মনমত চাকরী। মালটানা। করবি ?

জহ্লাদ আর বলবে কি, বর্ত্তে গেল।

মান্‌কে ওকে নিয়ে অল্প দূরে একটা চায়ের দোকানে এল। চন্দ্রমাধব একটা লোহার চেয়ারে বসে খুব মৌতে বিড়ি টানছিল। মান্‌কে নিঃশব্দে বিড়িটা তার হাত থেকে তুলে নিয়ে পরপর দুটো টান দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, নে শীকার এনেছি।

চন্দ্রমাধব গম্ভীরভাবে জহ্লাদকে দেখে নিয়ে বলল, খাসা চেহারাটিতো!

খাসা বলতে খাসা! তাহোক, আনাতে এক পয়সা। দু-কিস্তিতে দশটাকা কিন্তু।

হবে।

তা হলে জহ্লাদ লেগে যা আর কি। গঙ্গার গায়ে গুদাম দেখেছিস ? খাস সাহেব কোম্পানীর। মাল তুলবি আর নামাবি। তবে হাঁ, আনায় একপয়সা রফা করতে হবে।

জহ্লাদ ঘাড় নেড়ে জানাল, তার আপত্তি নেই।

সেদিনই চন্দ্রমাধব জহ্লাদকে নিয়ে গুদামে গেল। পাঁচ নম্বর গুদামের কুলির মালিক সে। দেখলেই সেটা পষ্ট বোঝা যায়। একহাতি একটা লাঠি নিয়ে সে মালবাবুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা কাগজটা এগিয়ে দেয়। মালবাবু চেয়ারে বসলে পর সে

টুলে বসে। প্রত্যেকটি কুলি তাকে ভয় করে। এবং সেই যে গোটা কোম্পানী সে বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন নেই।

চন্দ্রমাধব বলল, এর নামটা লিখে নিন মালবাবু।

মালবাবু নিবিষ্ট হয়ে কি লিখছিল। মুখ না তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, হবে-টবে না।

ছয়আনায় চালিয়ে দিতে পারবেন। দুআনা—একআনা।

ধীরে ধীরে কলমটা খাতার উপর রেখে মালবাবু তাকাল।

মাঝারি বয়স। অকালে সর্ব্বাঙ্গে পাক ধরেছে। গায়ে খাকি হাফসার্ট। ঘামে আর ধুলিবালিতে ওটা একটা বিকৃত রঙ নিয়েছে। অদ্ভুত রকম ছোট্ট মুখ। কাঁচাপাকা দাড়ি, সজারুর কাঁটার মত চোখ। আট হাতি ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়টা মালকোচা করে পরাতে হাঁটু থেকে পা অব্দি নগ্ন। পায়ে চটি। গোড়ালির অনেকটা খেয়ে গেছে।

চোখে আমেরিকান ফ্রেমের একজোড়া চশমা। সমস্ত অঙ্গে ওটাই তার কৌলিন্য রক্ষা করছিল। চশমাটা খুলে সে চোখদুটো মুছল। আবার এঁটেসেটে নিল। বলল, কি নাম?

নাম কি? চন্দ্রমাধব তাড়া দিল।

আজ্ঞে জহ্লাদ।

কি বললে?

জহ্লাদ।

সঙ্গে সঙ্গে জিরাফের মত সামনের দিকে গলাটা হাতখানেক বাড়িয়ে দিয়ে মালবাবু বলল, তা চেহারাখানা জহ্লাদের মতই তো! খুনটুন করবার হাত আছে?

আজ্ঞে না।

চুরিজোচ্চুরি? ঘুসটুস?

আজ্ঞে না।

তা ভালো। বলি এর আগে এ কাজে কোথাও হাত পাকিয়েছ?

আজ্ঞে না।

জহ্লাদ হলেও দেখছি তুমি লোক খারাপ নও। খারাপ লোক আমরা নিই না। জানই তো বাপু এ খাস বিলেতি কোম্পানী। চুরি করেছ বা ঘুষ খেয়েছ কি গ্যাক্ করে চন্দ্রমাধবের দুটো হাত সাঁড়াশীর মত গলা চেপে ধরবে!

হাজিরা খাতাতে নামটা তুলে নিল মালবাবু।

ছয় আনা রোজ, তা থেকে ছয় পয়সা বিয়োগ হিসেবে গিয়ে দাঁড়াল সাড়ে চার আনা। জহ্লাদ একটু মুসড়ে পড়ল। ভাবনার সময় নেই। চন্দ্রমাধব তাকে তার লাঠিটা দিয়ে স্পর্শ করে বললে, যা লেগে যা। বাইরে ঠেলা গাড়ী আছে। সাজিয়ে চালান দিবি।

দশবারো জন সমানে মাল টানছে। ক-মণ কে জানে। কোমর ভেঙ্গে পেছন করে বস্তার দু কোন ধরে পিঠটা ভেতর দিকে কিছুটা চালিয়ে দিয়ে বস্তাটা পিঠে নিয়ে মেরুদণ্ডহীন মানুষের মত হেঁটে যাচ্ছে।

চন্দ্রমাধব দেখছিল। জহ্লাদ প্রথমটায় এতটুকু হয়ে গেল। পরক্ষণে ভেতরের এক ভীষণ তাগিদে সে সোজা গিয়ে একটা বস্তা তুলে নিল। অনেকটা যন্ত্রের মত।

চন্দ্রমাধব সরে গেল।

আটঘণ্টা পুরোপুরি খাটল জহ্লাদ। একদিন নয়, দুদিন নয়—সাতদিন।

সপ্তাহান্তে মাইনে।

সাড়ে চার আনা রোজে জহ্লাদ পেল এক টাকা সাড়ে পনের আনা।

গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। সাতদিনে শরীরটা ভেঙ্গেচুরে একটা অদ্ভুত আকৃতি নিয়েছে। সোজা হয়ে চলতে গেলে পিঠে লাগে। প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা চামড়াকে অতিক্রম করে এসে গেছে প্রায়।

ঘরে ফিরে এল জহ্লাদ।

মালবাবু আজকের দিনটায় একটা সিগ্রেট ধরিয়ে একটু পায়চারী করে। কুলি ব্যারাকের কাছ দিয়ে বার দুই ঘুরে সবাইকে কুশলপ্রশ্ন করে। এবং মনেমনে হিসেব করে দেখে, সবার কাছ থেকে প্রাপ্যটা ঠিকঠিক আদায় হয়েছে কিনা।

হাঁটতে হাঁটতে সে ব্যারাকের শেষ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটা এতদিন খালিই ছিল। ভেতর দিক থেকে দোর দেওয়া দেখে বুঝল কে একজন আছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছেনা। মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে কড়া নাড়ল।

দোর খুলে গেল।

ছোট্ট ঘর। মাটির প্রদীপের স্বল্প আলো। আলো অন্ধকারের একটা কুৎসিত সংমিশ্রণ।

মালবাবু!

নয় আনায় দু আনা—সাতদিনে—। চট করে হিসেবটা করে নিয়ে মালবাবু বলে, আমাদের জহ্লাদ না? তা ভালো তো বাপু?

আজ্ঞে হাঁ।

হঠাৎ মালবাবু বড় বেশী সচেতন হয়ে ওঠে, বলে, মেয়েমানুষ না ?

আমার ইস্ত্রি।

তোর ইস্ত্রি কিরে। তুই বিয়ে করেছিস নাকি ?

ওই দুর্ভিক্ষের সনে। হাসে সে। আর ওটি আমার ছেলে।

মার কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে এল জহ্লাদ। ওর গালে ছোট্ট একটি টোকা দিয়ে বলল, ভারী দুষ্টু মালবাবু। বউতো একদণ্ড পেরে ওঠে না। আর কি বুদ্ধি, এক-বারটি যাকে দেখবে, একটু আদর পাবে, তাকে আর ভুলবে না। আমার পায়ের শব্দটি অবিকল মনে করে রেখেছে। পেলেই হল ; ঠিক মাকে গিয়ে সেটা জানিয়ে দেবে।

কথার ভেতর বেশ একটা গর্ব্ব অনুভব করে সে।

অল্পস্বল্প আলো, জহ্লাদের নুয়েপড়া কঙ্কালের মত দেহ, কোলে সলতের মত একফোঁটা ছেলে, সামনেই ক্ষীণ দেহে শাড়ী জড়ান পেছন করা এক এবং রাশীকৃত ভাপসা গন্ধ মালবাবুকে বিরক্ত বিব্রত করে তুলল। দু'পা পিছিয়ে এল সে।

দু'পা এগিয়ে এল জহ্লাদও।

দেখুন কাণ্ডটা একবার ! চেনা নয়, তবু কেমন হাত বাড়াচ্ছে যাবার জন্যে।

হাত ও বাড়ায়নি, বাড়াবার শক্তিও নেই, মালবাবু জানে ; কিছু বলল না।

জহ্লাদের বউ কথাটা শুনে কৌতূহলে ফিরে তাকাল। হাসিমুখে জহ্লাদ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, কাল থেকে ওভারটাইম খাটব মালবাবু। গতরে দেবে না ভাবছেন ? খুউব !

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আরো ঝুঁকে পড়ল।

মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেছে বুঝি !

হাপাচ্ছে সে।

কিন্তু মালবাবু পষ্ট দেখছে, সে হাপাচ্ছে না। সম্ভাবনায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অপ্রাসঙ্গিক

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান ও কাল বিচার না ক'রে এ' দৃশ্যের অবতারণা করবার জন্য আমি অতীব দুঃখিত, কল্যাণী দেবী। আমার এ' বিকলন আপনি স্বভাবসুলভ ক্ষমার চোখেই দেখ্‌বেন জানি, কিন্তু আমার এই অদ্ভুত দুর্বল চেহারাটা কিছুতেই আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না! আমার সমস্ত কাঠিন্য আর গাম্ভীর্যকে চুর্‌মার্ ক'রে অসুস্থতার একী নিদারুণ হিমস্রোত নাম্‌ল!

আজ কথা বল্‌তে গিয়ে বারংবার মনে হ'চ্ছে, অদৃশ্য নাট্যকার আমার মতো লোককে শুধু প্রমাদবশেই এই চমকপ্রদ সুকঠিন ভূমিকায় নামিয়ে দিয়েছেন অতি অকস্মাৎ। পার্‌ছি না আমি, তবু ঐ উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সাম্‌নে বিচিত্রবেশে অনুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'চ্ছে আমাকে!

আপনি জানেন, এতকাল কথা বলেছি মুখে নয়, কলমে। দেশবিদেশের ভাবুকদের মধ্যে সেকথা প'ড়েছে ছড়িয়ে,—এ' আমার গর্ব নয়, স্বীকৃতি মাত্র। সান্নিধ্যের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আস্‌তে পারি নি সাধারণের মধ্যে, তার জন্য বহু অনুযোগ সইতে হ'য়েছে,—কিন্তু আমি জান্‌তুম, আমার ধর্ম তা' নয়, আমার ধর্ম ছিল ব্যক্তি-বিকাশ এবং এই বিকাশ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ আমি স্বীকার করি, কিন্তু উপায় কী বলুন? গণসমষ্টির মধ্যে চিন্তার যে বিভিন্ন স্তর আছে, এ' কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। আমার ছিল এমনি একটি নিঃসঙ্গ স্তর। অবিচ্ছিন্ন চিন্তার রাজ্যই ছিল আমার অধিকারের লক্ষ্য, সেখানে সশস্ত্র সেনানায়কের মতো আমি সতর্ক অথচ সদর্প পদক্ষেপেই বিচরণ করেছি।

আমার অসুস্থতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাকে কথা বল্‌তে আপনি বারণ কর্‌ছেন? আমাকে অসাধারণ স্নেহ করেন ব'লেই এ' কথা বল্‌ছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু, আপনার কাছে আমার অনুরোধ কী, জানেন? আপনি আরও একটু কাছে আসুন, আরও একটু কাছ থেকে দেখুন আমাকে, তাহ'লে আমার মনে হয়, এ' তিরস্কার আপনি আমাকে আর কর্‌বেন না।

রাত কতো নিশুতি দেখেছেন? মনেই হয় না, মহানগরীর ক্রোড়ে নিশিযাপন কর্‌ছি! চোখে ঘুম নেই, এ' বেশ ভালই হ'য়েছে আমার পক্ষে। স্তব্ধ আকাশ। রাত্রির তপস্যা চ'লেছে। কতো আমার বিনিদ্র রাত এভাবে কেটেছে পদ্মার তীরে। সেই আমার স্তিমিত-প্রদীপ-জ্বালা ছোট্ট ঘর। একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন আমি এমনি

এক স্তব্ধ রাত্রির অবকাশে কোঁতের দৃষ্টিভংগীর ওপরে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ্‌ছি, হঠাৎ-ই কীর্তিনাশার বুকে এলো একটা আলোড়ন, আমার সেই ক্ষুদ্র ঘরটির কোণে ঝড়ের স্পর্শ লাগ্‌ল।

আমার ছোটভাই স্মরজিৎ-কে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। হঠাৎ-ই একদিন সে জানালো, সে বিয়ে কর্‌ছে, আমার অনুমতি চাই। আপনি জানেন, সে' অনুমতি আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক দিক থেকে দেওয়া কঠিন হ'লেও আমি দিতে পশ্চাৎপদ হই নি। তখন আপনি আমাদের গ্রামের মেয়েস্কুলেই শিক্ষকতা কর্‌ছিলেন। বেশ মনে আছে, সংবাদটা শুনে আপনি এক সন্ধ্যায় হঠাৎ-ই ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। প্রশ্ন ক'রেছিলেন,- "এ'বিয়েতে মত দিলেন আপনি ?"

"দিলুম।"

আরও প্রশ্ন ক'রেছিলেন, "অসবর্ণ বিবাহে আপনার আপত্তি না থাক্‌তে পারে, কিন্তু এ'নিয়ে আপনাদের পরিবারে যে বিক্ষোভ উঠেছে, তা-ও কি আপনি দেখ্‌বেন না ?"

"দেখার আবশ্যক নেই।"

"নেই।"—আপনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ ছিলেন মনে আছে। আপনি যে আমাদের পরিবারের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিনী, সে'কথা সেদিনই স্পষ্ট বুঝেছিলাম, আরও বুঝেছিলাম আমার বিধবা মায়ের আপনি ছিলেন অশেষ বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্রী। তাই, ব'লে উঠেছিলেন, "আপনার মায়ের দিকটা ভেবে দেখেছেন ?"

"দেখেছি। আরও দেখেছি আমার ভাইয়ের দিকটা। ওরা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে ক'রছে, ওরা মানে আমার ভাই স্মরজিৎ আর তার স্ত্রী রমলা, ওদের মাঝখানে আমাদের কি উচিৎ প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ানো ?"

বেশ মনে আছে, তার উত্তরে আপনি একটু চম্‌কেই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, আমার মুখে এ'কথা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। অনেকক্ষণ স্তব্ধ ছিলেন, কথা বলেন নি অথবা বল্‌তে পারেন নি। তারপরে হঠাৎ-ই স্ত্রীসুলভ কৌতূহলবশত, একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন আমাকে, বল্‌লেন, "আপনার আগে আপনার ছোট ভাইয়ের বিয়ে ?"

একটু হেসে বলেছিলাম, "তাতে কী হয়েছে ?"

"তা হয় না।"

আরও একটু হেসে ব'লেছিলাম, "কেন ?"

"আপনি আগে বিয়ে করুন, তারপরে আপনার ছোটভাই।"

একটু থেমে ব'লেছিলাম, "আমি বিয়ে করব না।"

নিরুত্তরে আর একবার আমার মুখে আপনার স্থির দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত নিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু একটা বাক্যও আর ব্যয় করেন নি, আস্তে আস্তে কাছ থেকে উঠে

চ'লে গিয়েছিলেন। তারপরে, কতো বিচিত্র দিন আর মাসগুলিই না কেটে গেল একে একে। একদিন শুন্‌লুম, স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে আপনি কলকাতা রওনা হচ্ছেন।

না-না, আপনি অতো ব্যস্ত হবেন না, টেমপারেচারও এখন হবে না নিতে, ও' ঠিকই আছে, আর ওঠে নি। কিন্তু, আপনাকে কতো কষ্ট দিচ্ছি বলুন ত ? সমানে সেবা ক'রে চ'লেছেন, ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই, রাতও জাগ্‌ছেন প্রচুর। আমি এই কথা বন্ধ করছি, আপনি যান্, একটু শুয়ে নিন্ গিয়ে। শোবেন না ? কিন্তু কেন ? অনেকটা ত ভালো আছি আমি ! ওঃ ! কী ঝড়ই না যাচ্ছে আপনার ওপর দিয়ে ! ক'লকাতার পথে এবার প্রথম পা ফেল্‌লুম জ্বর গায়ে নিয়ে, বিশ্রামের প্রয়োজন যখনই বোধ ক'রছি, তখনই আর কোথাও না গিয়ে আপনার কাছে চ'লে এলাম, হলাম আপনারই বোঝা। বোঝা আপনি অবলীলায় তুলে নিয়েছেন, কিন্তু কেমন ক'রে নিলেন ? না কল্যাণী দেবী, জরুরী প্রশ্ন অবশ্যই এ নয়, সামান্য কৌতূহল মাত্র। আচ্ছা থাক্, না-ই বা পেলুম উত্তর। পেতে যে হবেই, এর কী অর্থ আছে ?

কপালে হাত রেখে কী দেখছেন ? জ্বর ? আমি বল্‌ছি, অনেক ক'মেছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আপনার ঘরখানা কিন্তু বেশ। বাড়ীখানাও নিশ্চয় ভালো। বেশ শান্ত, বেশ নির্জন। একপাল ছেলেমেয়ে-কর্তাগিন্নী পরিকীর্ণ কোলাহল-মুখরতার চেয়ে এই ভীড়হীন স্তব্ধতা, অনেক ভালো, অনেক শান্তিপূর্ণ। বেশ আছেন আপনি। শিক্ষাকে নিয়েছেন জীবনের ব্রত ক'রে, মেয়ে হ'য়ে সিঁদুর নিলেন না সীমন্তে ! সত্যি কল্যাণীদেবী, আপনার এই শুচিশুভ্র জীবনটাকে ভারী ভালো লাগে !...

কলকাতায় এতদিন পরে হঠাৎ-ই এসে পড়লাম কেন, বলবার অবকাশ এতক্ষণে এসে পড়েছে। আমি একা আসিনি, সংগে বৌমা অর্থাৎ রমলাও ছিল। ব্যস্ত হবেন না, সে নির্বিঘ্নেই এতক্ষণে তার বাপের বাড়ী পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু তার কথা কিছু বলতে গেলে পূর্বেই স্মরজিতের কথা বলতে হয়। তিনবৎসর আগেকার কথা শুনুন। বিয়ে ওদের হলো, কিছুদিন কলকাতায় ওরা কাটালো, তারপর স্মরজিৎ সপরিবারে এসে উঠল বাড়ীতে। মা রাগ করে গেলেন কাশী, স্মরজিৎ কাছেই একটা নিমায়মান এয়ারো-ড্রোমের ঠিকাদারী সুরু করল, সংসারের ঝঞ্ঝাট সে-ই স্বেচ্ছায় নিলো মাথায় তুলে, আমি ক্রমাগত বইয়ের সমুদ্রে ডুবতে লাগলুম।

বিশ্বাস করুন, বেশ ছিলুম আমি। আমার জানালা দিয়ে দেখতুম পদ্মাকে, যখন আকাশ কালো করে উন্মত্ত বাতাস আসত তারই জলকণাকে নিয়ে তখন স্পর্শ পেতুম সেই উদ্দাম আর প্রমত্ত তরঙ্গময়ীর !

আমার চশমার 'পাওয়ার' বাড়ল। আরও পুরু আরও তীক্ষ্ণ কাঁচ দিয়ে বিপুল গ্রন্থ-সমুদ্রে সুরু হলো আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ।

খুঁজে চলেছি। কিন্তু তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি আমার খোঁজবার গতিবেগ নিয়ে আরও একজন খুঁজছে আমাকে।

বৌমা আমাকে যত্ন করত। আমার ঘর থেকে সমস্ত অবিন্যস্ততা একদিন দূর হলো, নিবিড় অপরিচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ-ই একদিন ঝলোমলো প্রভাতের মতো জেগে উঠলাম। ঘরে যখন থাকতুম না, তখনি সে পেতো অবসর, আমার ঘরে স্নেহ ও শ্রদ্ধার স্পর্শ লাগত। কলেজে-পড়া আধুনিকা মেয়ে বলে যারা একদা মুখ বেঁকিয়েছিলেন, তাদেরই কাছে অবগুণ্ঠনবতী শান্ত নম্র এই লক্ষ্মী মেয়েটীর পরিচয় দিতে মনটা উন্মুখ হয়ে উঠলেও তাদের গ্রহণ-ক্ষমতার কথা স্মরণ করে এ'কাজ থেকে বিরত হলাম।

সংসারের যে-দিকটা শ্রী-র দিক, কল্যাণের দিক, সেখানেই মেয়েটীর সমুজ্জ্বল আবির্ভাব কিছুদিনের মধ্যে আমারও চোখে পড়ল। পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, সীমন্তে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, প্রদীপ ও শঙ্খ হাতে নিয়ে সে যখন সন্ধ্যাবেলা তুলসীর মূলে গিয়ে দাঁড়াতো, তখন কে বলবে এই মেয়েই এসেছে সেই ট্রাম-বাস-মোটরের গতিমুখর পথিপার্শ্ব থেকে! আমাদের বাড়ীর প্রত্যেকটি কোণ মেয়েটীর সস্নেহ করস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠল বলতে পারি। কেবল একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্যে পড়ল। সমস্ত কাজই করত নিজে, না করে যেন সে তৃপ্তি পেতো না, শুধু রান্নার কাজে ছিল একটি ব্রাহ্মণ, সযত্নে নিজের স্পর্শকে গৃহকর্মের এই বিভাগ থেকে বাঁচিয়ে যতটুকু করা যায় ততটুকু সে প্রাণ ঢেলেই করত। একদিন ডাকলুম, "বৌমা?"

ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দিয়ে কবাটের আড়ালে এসে যেমন দাঁড়ায় আমার কথা শুনতে হলে, তেমনি দাঁড়ালো নতমুখী শান্ত স্তব্ধ হয়ে।

বললুম, "ঠাকুরের রান্না যে আর মুখে তোলা যায় না, বৌমা, একদিন তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াও, কেমন?"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে শেষে মাথাটা একটু হেলিয়ে সরে গেল। সে রাত্রে ওর হাতের রান্না খেলুম, লুচি এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন। আহার্য্য সম্বন্ধে কোনদিনই আমার সচেতনতা নেই, তবু সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, ওর রান্না বাস্তবিকই চমৎকার। বললুম, "বৌমা লুচি নয়, এবার অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন পরিবেশনের ভারটা নাও। একটার জায়গায় দুটো ঝি রাখো, কিন্তু রান্নার কাজ থেকে ঐ উৎকলবাসীকে ছুটী দাও; এমন সুন্দর তোমার রান্না, আর তুমি আমাদের তা'থেকে বঞ্চিত করে রাখবে?"

বেশ বুঝেছিলাম, আমার এ'কথায় মেয়েটী একটু চমকে উঠেছিল। ওরা আমার

গাম্ভীর্য আর কাঠিন্যকেই দেখেছিল স্পষ্ট করে, দেখেনি কোথায় আমার গ্রহণ-ক্ষমতা তার পূর্ণ বলিষ্ঠতা নিয়েই বিরাজ করছে। যে-মুহূর্তে স্মরজিৎকে দিয়েছিলুম বিবাহের অনুমতি, সেই মুহূর্ত থেকেই যে ওদের দুজনকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করেছি, আশীর্বাদ করেছি, সে সংবাদ ওরা জানে না!

কিন্তু শুধু আশীর্বচনই কিছু নয়, ওরা ঝড়ের যাত্রী, ওদের দেখাতে হবে পথের রেখা, ওদের কাছ থেকে সমস্ত কুণ্ঠার জাল দৃঢ় হস্তক্ষেপেই অপসারিত করে ফেলতে হবে। ক্রমশ সাফল্যলাভ আমার ভাগ্যে ঘটল। ওরা সহজ হয়ে এলো, বুঝল, আমি ওদের থেকে দূরে নই, কাছেই আছি।

লক্ষ্মী মেয়েটী কাজ করে একমনে, চপলতা নেই, অশোভনতা নেই, ওর উপস্থিতি সর্বশ্রীমণ্ডিত। ঘোমটা ওর খোলেনি, কিন্তু কাছে আসে; যখন কাজ থাকে, আস্তে আস্তে কথাও বলে, মধ্যবর্তী কাউকে আর দরকার হয়না কিছু প্রশ্ন করবার প্রাক্কালে। খাবার সময় অদূরে বসে হাতে পাখা নিয়ে, ঘোমটা ওঠায় না, পাছে শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

আমার লেখা এবং পড়ার প্রতি ওর বিস্ময়ভরা একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, সেটা অলক্ষ্য থেকেও বুঝতে কষ্ট হতো না। আমি না থাকলে ঘরে এসে পরিপাটি করে বই-আলমারী-টেবিল গুছিয়ে দেওয়া, টেবিলের একটা পাশে শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবক রেখে যাওয়া, এর মধ্য দিয়েই ওর শ্রদ্ধাকে আমি পেতাম। কোন কোনদিন তন্ময় হয়ে বই পড়ছে, আমি কখন এসেছি ঘরের মধ্যে, টের পায়নি।

"বৌমা?"

আমার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেই তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতো, আমি হয়ত ডাকতুম পিছন থেকে, খানিকক্ষণ পরে কবাটের আড়ালে এসে দাঁড়াতো, খুব নিম্নকণ্ঠে এমন কি প্রায় ফিসফিসিয়েই বলতো, "কী বল্‌ছেন?"

বই থেকে মুখ তুলে বল্‌তুম, "এক গ্লাশ জল যদি দিয়ে যাও।"

এমন দিনেই একদা ঝড় উঠল। যুদ্ধের সুযোগে স্মরজিৎ বহু ঠিকাদারীর কাজ পেয়েছে হাতে, বহু কাজ, বহু শ্রম। ভোরে বেরিয়ে যেতো একটা মোটর সাইকেলে করে, সাত মাইল দূরে ওর কাজ, কাজ সেরে আসত রাত দশটার কম নয়, কোন কোনও দিন আসতও না, কাজের চাপ ভয়ানক। সমস্ত বাড়ীটাতে সে রাত্রে দুটি কক্ষে মাত্র আমরা দুটি প্রাণী, ঝি রাত্রে থাকত না, কাজ সেরে বাড়ী ফিরে যেতো। পদ্মার বুকে উঠেছে ঢেউ, আকাশে প্রমত্ত দামামা বাজছে, শুধু ঝড় নয়, জলও। গভীর কল্লোলের সংগে মিশে ঝরোঝরো বর্ষণ, মাঝে মাঝে দিগ্বিদিক উঠছে চমকে। অকস্মাৎ একটা নিদারুণ বজ্রপাতের

শব্দে আমি শঙ্কিত হয়েই উঠে দাঁড়ালুম। প্রচণ্ড হাওয়ার বিপরীত ঘরের খিল টেনে খুলতে বেশ জোর লাগল। বারান্দাটা ধারায় সিক্ত, হু-হু-করা হাওয়ার বেগ এত বেশী, মনে হয় দৃঢ় পদক্ষেপ না ফেললে বোধহয় স্খলন ঘটবে। একটু এগিয়ে বন্ধ ঘরটায় ঘনঘন করাঘাত করলুম।

"বৌমা-বৌমা ?"

ক্ষুব্ধ ঝটিকার বুকে বসে এই আহ্বানেরই যেন প্রয়োজন ছিল ওর। খুলে ফেলল দরজা। চকিত বিদ্যুতের চমকে দেখলুম, থরথর করে মেয়েটী কাঁপছে। সেই মুহূর্তে যদি ওকে না ধরে ফেলতুম নিশ্চয়ই পড়ে যেতো। হাতটা শক্ত করে ধরে বললুম, "ভয় নেই, এসো আমার ঘরে।"

আবার বন্ধ করলুম খিল, একটা চেয়ারে দিলুম বসিয়ে, বললুম "বসো। এ' যা ঘটছে নতুন কিছু নয়, প্রায়ই ঘটে।"

ঘোমটাটা কপালের কাছে আরও একটু টেনে নতমুখী বসে রইল, কথা বলল না।

আমি টেনে নিলুম আমার সাম্‌নে ক্রোচের একটা সুবৃহৎ দুষ্প্রাপ্য বই, আর আমার খাতা আর কলম, ডানহাতে লাল পেন্সিলটা, কোথাও দাগ দেবার প্রয়োজন ঘট্‌তে পারে।

কতো সেকেণ্ড্, কতো মিনিট্, কতো ঘণ্টা পার হ'য়ে গেল মনে নেই, ঝড় যখন শ্রান্তক্লান্ত স্তিমিত হ'য়ে এলো, তখন দেয়ালের ঘড়িটা স্পষ্ট হ'য়েই সময়-সমুদ্রে দাঁড় ফেলছে, টিক্-টিক্-টিক্ টিক্ !

মুখ তুল্‌লুম, চোখ থেকে নামালুম চশ্‌মাটা। যেমন বসিয়ে দিয়েছিলুম, ঠিক তেম্‌নি ব'সে আছে রমলা, তেম্‌নি তন্দ্রাহীন, বাক্যহীন, শান্ত, স্তব্ধ। বল্‌লুম, "ভয় কর্‌ছে বৌমা ?" মাথাটা নাড়্‌লে, মুখ আরও নীচু ক'রে বল্‌লে, "না।"

বল্‌লুম, "যাও, এবার শোও গিয়ে।"

চশ্‌মাটা তুল্‌লুম চোখে। কিন্তু তখনো তেমনিভাবে ব'সে র'য়েছে। আবার বল্‌লুম, "রাত আর বেশী নেই, তুমি গিয়ে এখন শুয়ে পড়ো বৌমা।"

তবু উঠ্‌ল না, কেবল একটিবার তুল্‌ল মুখ, আমি চেয়ে আছি দেখে আবার নামালো। ঈষৎ অসহিষ্ণু হ'য়েই ডেকে উঠ্‌লুম, "বৌমা ?"

এবার উঠে পড়্‌ল। অদূরে খাটের ওপর আমার যে বিছানাটা গুটানো ছিল, অতি যত্নে ক্ষিপ্র হাতেই সেটা পেতে ফেল্‌ল। আমি ততক্ষণে চোখ থেকে চশ্‌মাটা নামিয়েছি, চেয়ে আছি ওর কর্ম্মচঞ্চল হাতদু'টির দিকে, ও কর্‌ছে কী ?

বিছানা শেষ ক'রে হঠাৎ-ই আমার দিকে একবার ফিরল, হয়ত অনবধানতাবশতই অতি

অকস্মাৎ ওর ঘোম্‌টাটা গেল খুলে। মুহূর্তমাত্র, তারপরেই ঘোম্‌টাটা আবার তুলে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের খিল খুলে চ'লে গেল, সম্ভবতঃ নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, ওর ঐ অতি যত্নের পাতা বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে পারি নি সে' রাত্রে, বারংবার মনে হয়েছে স্মরজিতের কথা।

কয়েকটা দিন পার হ'য়ে স্মরজিতের যে নতুন চেহারাটা দেখ্‌তে পেলুম, তা' সত্যিই বিস্ময়কর। সে'রাত্রে ও এসে আমার দরজার কাছে ট'লে পড়্‌ল, এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লুম, কবাট ধ'রে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু রীতিমত টল্‌ছে। একটা তীব্র গন্ধ ওর চতুষ্পার্শকে বিষের মতো আবিল ক'রে তুলেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে কী যে প্রলাপ ও বক্‌ছিল, তা স্পষ্ট মনে নেই, গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লুম, যে-কণ্ঠকে ওরা চিরদিন ভয় ক'রে এসেছে, সেই কণ্ঠেই বল্‌লুম, "এখানে নয়, তোমার ঘরে যাও!"

"ঘর আমার নেই!"

প্রচণ্ড ধমকে ওকে কাঁপিয়ে দিলাম, "চুপ্‌!"

কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, ঘৃণায় স'রে এলাম আমার টেবিলে। ধারালো গলায় আবার ডাক্‌লাম, "বৌমা?" কবাটের আড়ালে যেমন এসে দাঁড়ায়, তেম্‌নি দাঁড়ালো, "ওকে টেনে নিয়ে যাও এখান থেকে!"

বোকা মেয়ে একবারও মুখ ফুটে বল্‌ল না এ'কাজ ওর নয়, আমার আদেশ পেয়ে অবলীলায় ধর্‌তে গেল দুর্দান্ত স্বামীর হাত। সংগে সংগেই প্রচণ্ড পদবিক্ষেপ, রমলা ছিট্‌কে প'ড়ে গেল একটু দূরে। একখণ্ড বিস্ফোরকের মতই লাফিয়ে পড়্‌লাম স্মরজিতের ওপর, আঘাতের পর আঘাত ক'রে হাত-পা যখন আমার শ্রান্ত হ'য়ে এলো, তখন রুদ্ধ উচ্চারণে শুধু বল্‌লাম, "বেরিয়ে যাও।"

ঠোঁট কেটে রক্ত পড়্‌ছিল ওর, রমলা শিয়রে এসে বস্‌ল জল নিয়ে, মাতালটা তখন নিশ্চল কুঁক্‌ড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

এরপর কয়েকটা দিন আমার খাওয়ার সময় কেউই বস্‌ল না হাতে পাখা নিয়ে, কেউই আমার খাওয়ার প্রতি করল না তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ, শুধু একটা যন্ত্র আমাকে খাদ্য পরিবেশন ক'রে গেল, একটা যন্ত্র আমার প্রাত্যহিক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর হাত বুলিয়ে গেল।

কয়েকটা দিন পরপর রাত জাগ্‌লুম, অসীম শ্রান্তিতে দেহ যখন ভ'রে গেল, যখন নিজের বিছানাটা নিজেই অলস হাতে পেতে নিয়ে শুয়ে পড়লুম এক প্রভাতের প্রারম্ভে তখন লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, একটা লাইনও আমি লিখিনি, একটা লাল দাগও তারপর পড়েনি ক্রোচের সুবৃহৎ গ্রন্থে।

সে ছিল এক প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিন। একটানা ঘর্মসিক্ত ঘুমের পর যখন চোখের ঘোর ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ-ই ঝির্‌ঝির্‌ বাতাসের স্পর্শ পেলুম। আ!... চোখ খুলে দেখি বাতাস দিচ্ছে জানালার পাশের ঘন আমগাছটা নয়, আমার শিয়রে ব'সে রমলা। আমি জাগ্‌তেই পাখা নামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আমার ভাগ্যে সে'মুহূর্তে যা' রইল তা' আর বাতাস নয়, প্রখর প্রতপ্ত রিক্ত মধ্যাহ্ন।

আবার ডুব্‌লুম গ্রন্থের সমুদ্রে। হারিয়ে গেলুম। কয়েকটা দিন প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য। যেদিন জাগ্‌লুম, তীক্ষ্ণ তীরের আঘাত বুক পেতে নিয়েই জাগ্‌লুম। নক্ষত্র-জ্বালানো ঘন অন্ধকারের রাত সেটা, স্মরজিতের ঘর থেকে হঠাৎ-ই একটা চাপা কান্নার আভাষ পেলুম, আরও পেলুম কয়েকটা ঘন ঘন প্রহারের শব্দ। আতঙ্কিত এক টুক্‌রো ছায়ার মতো যখন ওদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন নির্যাতন আরও পৈশাচিক রূপ নিয়েছে বুঝ্‌তে পারলুম।

"স্মরজিৎ—স্মরজিৎ!"...

আমার করাঘাতে পরক্ষণেই খুলে গেল দরজা, আরক্ত চক্ষু, কঠিন মুখভঙ্গী, পরণে হ্যাট্‌-কোট্‌-প্যান্ট্‌ স্মরজিৎ উদ্যত একটা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল আমার সাম্‌নে দিয়ে, বল্‌তে পার্‌লুম না একটা কথাও, ওর মোটরসাইকেলটা পরক্ষণেই গভীর গর্জন তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল। ডাক্‌লুম, বহুদিন পরেই ডাক্‌লুম, "বৌমা?"

পরমুহূর্তেই আমার মুখের ওপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল, আমি ফিরে এলুম আমার কোটরে।

কয়েকটা দিন পরে আবার কানে এলো কান্না আঘাতের শব্দ মেশানো। একবার মুখ তুলেছিলুম, কিন্তু উঠিনি আসন ছেড়ে, শুধু লক্ষ্য কর্‌লুম আমার হাতের বইটা তখন রীতিমত কাঁপ্‌ছে। কিছুক্ষণ পরেই স্মরজিতের বুটের শব্দ, গতিমুখর মোটরসাইকেলের গর্জন।

এমন দিন এলো, স্মরজিৎ রাতের পর রাত রইল অনুপস্থিত। ক্রমে এমনও হ'লো স্মরজিৎ কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে চ'লে গেল হাসপাতালে। তবু লক্ষ্মী মেয়েটীর স্তব্ধতার বিরাম নেই, গৃহের প্রত্যেক কোণে সমান যত্নেই ওর মার্জনার স্পর্শ লাগ্‌ত।

এমন দিনেই আমার গল্প সুরু হ'লো, কল্যাণীদেবী। হাসপাতাল থেকে স্মরজিৎ ফিরে এলো বীভৎস রূপ নিয়ে, আমার সহোদর স্মরজিৎ এ'নয়, এমন কি রমলাকে যে হঠাৎ-ই একদিন বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো, এ সে' স্মরজিৎ-ও নয়।

কয়েকটা রাত্রি আবার ঝড় স্মরজিতের ঘরে। সেই ঝড় আমাকেও ছুঁয়েছিল। সেদিন স্মরজিতের তীব্র দৃষ্টি দেখ্‌লুম আমারই দিকে নিবদ্ধ।

ঝঞ্ঝনা যেদিন তীব্রতম, সেইদিন মধ্যরাত্রে স্মরজিৎ এলো আমার ঘরে। "দাদা?"

মুখ তুল্‌লুম। বন্য আর পৈশাচিক ওর দৃষ্টি, বল্‌লে, "ওকে নিয়ে কাল সকালেই কলকাতা চলে যাও। পরে আমিও যাচ্ছি সব ব্যবস্থা কর্‌তে।"

চশ্‌মাটা খুলে আমি কিছু বল্‌বার পূর্বেই দেখি, ঘর থেকে ও অন্তর্হিত। চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই ওর মোটরসাইকেল গর্জ্জন ক'রে উঠেছে। বৌমার কাছে গেলুম, সেখানে ওর বাক্স গুছানো চলছে।

পরদিন ভোরেই ট্রেনে রওনা হয়েছি। মাঝে মাঝে মেয়েদের গাড়ীতে সংবাদ নিয়েছি ওর, ঘোম্‌টার আড়াল থেকে মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে আমাকে উত্তর দিয়েছে।

শিয়ালদ'য় নেমে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ-ই একসময় লক্ষ্য কর্‌লুম, আমার পিছন পিছন ও এগিয়ে আস্‌ছে না, চুপ্‌ ক'রে রয়েছে দাঁড়িয়ে, কাছেই কুলিটা মোট্‌ মাথায়। ফিরে গেলুম কাছে, বল্‌লুম, "একী বৌমা?"

ঘোম্‌টাটা পুনর্বার খ'সে গেল, এই প্রথম ওঁর ঠোঁটের কোলে টুক্‌রো হাসি দেখ্‌লুম, বল্‌লে, "আমার নাম রমলা। রমলা বলেই আমাকে ডাক্‌বেন। জানেন বোধ হয়, আপনার ভাই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন? রেজেষ্ট্রী ক'রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল তো, তাই অতি সহজেই গ্রন্থি খুল্‌তে পারলুম।"

তারপরে বাইরে এসে নিজেই একটা ট্যাক্সী ডাক্‌ল, ডেকে আমাকে উঠ্‌তে বলবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল কিনা জানিনা, ভীড়ের মধ্যে মিশে আমি ততক্ষণে চ'লে গেছি অনেকটা দূরে।...

এরপর, হয়ত তীরস্কার কর্‌বেন আপনারা, কিম্বা হয়ত কর্‌বেন না।......কিন্তু, একী।...এতো কাছে। এতো কাছে তুমি কল্যাণী?

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

শশধর দত্ত

কবি রবীন্দ্রনাথ দুই হাজারেরও অধিক ছবি আঁকিয়াছেন। ছবি আঁকিয়া তিনি শুধু বিস্ময়ের সৃষ্টিই করেন নাই, তাঁহার শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। পশ্চিম তাঁহার ছবির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে তাহার নিজের বিচারে; কিন্তু কবির নিজের দেশে সেই ছবির সত্য সমাদর ও মূল্য নিরূপণ আজও হয় নাই। হয় নাই তাহার কারণ, শিল্পের বিচার দূরের কথা তাহার প্রতি সচেতন অনুরাগ দুই চারিজন ছাড়া এ দেশে আর কাহারও নাই। শিল্পের প্রাণ কোথায়, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি, পাশ্চাত্য শিল্পীমন কোন পথে সুন্দরের অভিব্যক্তি খুঁজিয়াছে—এই সকলের জ্ঞান না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সম্যক বিচার সম্ভব নহে। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ বহুবিচিত্র, ইহাকে অনুভব ও গ্রহণ করিবার প্রবেশপথও অসংখ্য। চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি বিশেষ দিক। শিল্পের ঐশ্বর্য্য যে দেশে ভাবসাধনায় আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে, সে দেশের শিক্ষিত মন এ বিষয়ে কত মূঢ় তাহা রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মতই এটা বিস্ময়ের বস্তু।

এ কথা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার পাঠ কোনো স্কুলে গিয়া শিক্ষা করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার ছবি টেক্‌নিকের বিচারে নির্ভুল নহে। কিন্তু এ কথা হয়ত অনেকে জানেন না, যে কবিতা রবীন্দ্রনাথের "বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" হইলেও চিত্রবিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ অল্পকালের নহে। চব্বিশ বৎসর বয়সে কবির ছবি আঁকার খাতা লইয়া তন্ময় থাকার কথা আমরা "জীবন স্মৃতি"-তে পাই। কবির বিভিন্ন বয়সের লেখা একাধিক চিঠিপত্রেও এই ছবি আঁকার কথা জানা যায়। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিলে চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি আকস্মিক ব্যাপার নহে। প্রতিভার একটি নিজস্ব ভাবাবেগ আছে। রবীন্দ্রপ্রতিভায় এই-ভাবাবেগ গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে উর্দ্ধমুখী অসংখ্যদল পদ্মের মত। নিখিল বিশ্বের আছে একটি মর্ম্মগত ছন্দ, তাহা নিয়ত রূপ হইতে অপরূপে উত্তীর্ণ হইতেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার উৎস নিখিলের সেই মর্ম্মগত ছন্দে; সেইজন্য সে প্রতিভা খণ্ডিত সীমান্তে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। সেইজন্যেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ তেমনি শাশ্বত ছন্দে প্রতিষ্ঠিত, যেমন প্রতিষ্ঠিত কবি রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু অন্যদিক দিয়া দেখিলে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একটি পরম বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের

চিত্রে রেখাবাহুল্য, বিরুদ্ধরীতির একত্র প্রয়োগ, আঙ্গিকের অসঙ্গতি প্রভৃতি বিবিধ দোষ বর্ত্তমান। তথাপি অনভিজ্ঞতার এই নানা ত্রুটি থাকিলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠচিত্রগুলি (এবং তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে) দেখিলে মনে হয় ইহারা শুধু শিক্ষিত চিত্রকরের আঁকা নহে, প্রতিভাবান শিল্পীর সৃষ্টি। এক একটি ছবি তাহার নিজস্ব পূর্ণতায় অপূর্ব্ব। এখানে বিশেষ রেখা আসিয়া তর্জ্জনি আস্ফালন করে নাই, বিশেষ রং মাথা তুলিয়া তাহার আভিজাত্য ঘোষণা করে নাই। রং ও রেখা আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ ছন্দসৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে। এই সকল চিত্র ভাবাবেগে প্রাণবন্ত ; ইহারা অপরিস্ফুট সাধারণ নহে, সুস্পষ্ট বিশেষ। এই বিশেষের দল শিল্পীর চিত্তলোক হইতে বাহিরের জগতে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহারা এই পৃথিবীরই। অরসিকের ইহাদিগকে চিনিতে পারিবার কথা নহে, কারণ ইহারা পৃথিবীর বস্তুসম্পদের জয়ধ্বনি নহে, তাহার ভাবসম্পদের ব্যক্ত মূর্ত্তি।

যাঁহারা শিল্পের মূল তত্ত্বটিকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই তাঁহাদের চোখে শুধু রবীন্দ্রনাথের ছবিই নহে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিত্রকলা এবং ভারতীয় অঙ্কনরীতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিল্পতত্ত্বের ক্রমিক পরিণতির কথা আলোচনা করিলে এই বিষয় বুঝিবার সুবিধা হইবে। সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত ধর্ম্ম। সেইজন্য শিল্পকলার ইতিহাসের এবং মানবজাতির ইতিহাসের জন্মের লগ্ন এক। বাহিরে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার মানুষের অন্তরে আনন্দ জাগাইতেছে, এবং ভাবচঞ্চল মানুষ এই আনন্দকে বিচিত্ররূপে ব্যক্ত করিতেছে তাহার অসংখ্য সৃষ্টিতে। সুতরাং প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই শিল্পের ইতিহাসের সূত্রপাত। ইহাই শিল্পীর realism বা বস্তুনিষ্ঠা। প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি রচনাই শিল্পের আরম্ভের যুগ।

কিন্তু মানুষের মন প্রকৃতির বস্তুসম্পদের মধ্যে নিজেকে তৃপ্ত রাখিতে পারিলনা। তাহার বৃহৎকে ধরিতে চাওয়ার আকুতি বস্তুর বন্ধনকে নিয়ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাবের মুক্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের সাধনা করিতে চলিল। বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই ভাব জন্মগ্রহণ করে সত্য, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্বকে অতিক্রম করিয়া ভাবের জয়যাত্রার ইতিহাসই হইল শিল্পতত্ত্বের ক্রমিক পরিণতির ইতিহাস।

পাশ্চাত্য শিল্পকলায় Impressionism-এ জয়যাত্রার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা দিল। দেশ-কালকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর যে স্থায়ী রূপ তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া শিল্পী মাত্র চোখের দেখার একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের রূপকে আশ্রয় করিলেন, এবং রং ব্যতীত বস্তুর নিজস্ব রেখানির্দ্দিষ্ট কোনো আকারকে স্বীকার করিলেন না। কিন্তু তথাপি প্রাকৃতিক বস্তুর নিজস্ব রূপটি বজায় রহিল শিল্পীর সৃষ্টিতে। গাছকে গাছ বলিয়া, মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে কোনো অসুবিধা রহিলনা। Impressionism-এর

পরের যুগে শিল্পী আরো অগ্রসর হইলেন। তিনি চোখের দেখার সহিত তাঁহার অন্তরের আবেগ মিলাইয়া ফেলিলেন। আমাদের দেখা বিশিষ্ট কয়েকটি স্থায়ী বর্ণকে ছাড়িয়া বর্ণের অসংখ্য স্তরের মধ্যে বস্তুর রূপনির্দ্দেশের চেষ্টা চলিল। Cezanne, Gauguin, Matisse প্রভৃতির আঁকা ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার পর আসিল প্রধানভাবে ফ্রান্সে-এ Cubism, ইটালিতে Futurism, এবং জার্ম্মানিতে Expressionism ও Abstractionism। কোনো বস্তুকে আমরা যখন দেখি তখন কোনো একটি দিক হইতে দেখি, এবং একটি বস্তুকেই বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে দেখা যাইতে পারে। Cubism এর মূল কথা হইল একটি বস্তুকে একই সময়ে সবদিক হইতে দেখিলে কেমন দেখায় তাহারই রূপ দিবার চেষ্টা। ইহাকে বলা হইয়াছে synthetic view বা principle of simultaneity। Picassoর আঁকা ছবি ইহারই দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে Futurism-এ চেষ্টা চলিল প্রকৃতির গতিশীলতাকে চিত্রে ধরিয়া রাখিবার। গতিমান বস্তুর চিত্র আঁকিয়া শিল্পী তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল গতিবেগকে চিত্রে রূপ দিবার। Balla অঙ্কিত "Moving Dog in Leash" ছবিটিকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। Severiniর "Cafe Scene" ইহার অপর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আরো একটি চেষ্টা ইহাতে চিত্রকর করেন, তাহা ছবির মধ্যেই ছবির দর্শকের স্থান কল্পনা। কিন্তু বিখ্যাত শিল্পী Cezanne, Matisse প্রভৃতি যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে রূপ দিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, Cubism বা Futurism প্রভৃতি ধারায় তাহার সার্থক পরিণতি সম্ভব হইল না। পথভ্রান্ত শিল্পীর আকুলতা ব্যর্থ হইল।

ইহার পর আসিল Expressionism। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত বিক্ষুব্ধ জার্ম্মানিতে শিল্পের এই নব জাগরণ কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা চিন্তার বিষয়। Expressionism শিল্পের মূলতত্ত্বকে নূতন পথে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। বস্তুর বস্তুত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শিল্পী এবার চাহিলেন তাঁহার আত্মগত ভাবাবেগকে বাহিরে রূপ দিতে। এই প্রকাশ হইল শিল্পী-মনের প্রকাশ। Expression মানে হইল 'soul-expression'। শিল্পীর কাছে বস্তুর বাহিরের বিশেষ আকৃতি তাহার সত্যরূপ নহে, বস্তুর মধ্যে যে একটি আভ্যন্তরীণ সত্তা বা শাশ্বত ছন্দ আছে তাহাই তাহার যথার্থ রূপ। সুতরাং এইবার শিল্পীর দৃষ্টির সঙ্গে সাধারণের দৃষ্টির যোগ একেবারে ছিন্ন হইল। সাধারণের চোখের দেখার সহিত শিল্পীর মনের দেখার কোনোই মিল রহিল না। এই Abstractionism-এর ফলে শিল্পীর কাছে যাহা সত্য, সাধারণের কাছে তাহা

হইল অর্থহীন অদ্ভুত। সাধারণে কহিল ইহা নূতন দৃষ্টি নহে, ইহা দৃষ্টিবিভ্রম। Kandinsky, Picasso, Braque, Jonson প্রভৃতির চিত্রের সেইজন্য নাম হইল Puzzle Pictures, এবং তাঁহাদের রীতিকে বলা হইল defective vision। ইহা শুধু শিল্পীর concrete-কে পরিহার করিয়া abstract-এ পলায়ন। কিন্তু শিল্পী বলিলেন—সাধারণ যাহাকে abstract বলিতেছে তাহা abstract নহে, তাহা Super-Concrete; অবাস্তব নহে, নিছক বস্তুসত্তা। শিল্পী বলিলেন যে তিনি রূপ দিতে চাহেন বস্তুর মধ্যে যে structural overvalue আছে তাহাকে। ইহাই হইল শিল্পে realism-এর পূর্ণ বিসর্জ্জন এবং idealism-কে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ। কিন্তু ইহা সত্য idealism নহে। পশ্চিমে শিল্পের স্বরূপকে, ইহার মূল তত্ত্বটিকে significant form, voluminous form, rhythmic vitality, formal complexes—ইত্যাদি বহুনামে পরিচিত করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যাহার অনুসন্ধান করা হইতেছে তাহাকে এ পথে পাওয়া যাইবেনা। অনেক বিষয়ের মত ইহার জন্যও ভারতের দিকে চাহিতে হইবে।

এইবার রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল সুরটি বুঝিবার সুবিধা হইবে। রবীন্দ্রনাথের নানা চিত্রের মধ্যে Impressionism Expressionism এই দুই ধারার লক্ষণই পাওয়া যাইবে। কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য চিত্রকলার কোনো ধারা এবং কোনো টেক্‌নিকের গণ্ডির মধ্যেই ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধরা যাইবে না। কবির অনেক চিত্রের সহিত Emil Nolde, Carl Hofer, Karl Schmidt-Rottluff, এমন কি Cezanne ও Matisse-এর অনেক ছবির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। কবির বহুচিত্রে যেমন বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্ণের উজ্জ্বলতায় এবং রেখার সবলতায়; অন্যদিকে কোনো কোনো চিত্রে আলঙ্কারিক ছন্দ-মাধুর্য্যও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ ইহা বলিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রে কখনও বিশেষভাবে continental, আবার কখনও বিশেষভাবে oriental। তাঁহার চিত্র পাশ্চাত্য কোনো ধারা বা রীতির সহিত মেলে না এজন্য, যে চিত্রকে বাহিরের রূপ দিবার পূর্ব্বে চিত্রকরের মনে কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকিত না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পের প্রত্যেক ধারাতেই শিল্পীর মনে এই প্রাথমিক পরিকল্পনা রহিয়াছে। অর্থাৎ শিল্পী শুধু হৃদয়ের ভাবাবেগকেই নহে, মনের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট একটি পরিকল্পনাকেও বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই; আছে শুধু অন্তরে অনুভূত ছন্দাবেগের বাহিরে রূপপরিগ্রহ করিবার আকুলতা। সেই জন্যই কবি তাঁহার ছবির নাম দিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন "ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয়

ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চল্‌তি কলমের মুখে খাড়া হ'য়ে ওঠে।" শিল্পীমানসের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক প্রকাশ যদি হয় Expressionism-এর লক্ষণ, তবে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাহার অভাব নাই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, তাহার অধিক নহে।

এখন প্রশ্ন হইবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যদি কোনো প্রচলিত ধারার মধ্যেই নিজেদের ধরা না দেয়, তবে তাহাদের চিনিয়া যাচাই করিব কিরূপে? ইহার উত্তর এই, যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা একটি নিজস্ব নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিল। এই ধারায় realism ও idealism-এর সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহাতে বস্তুর-বস্তুত্বকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, আবার তাহাকে অবাস্তব বলিয়া পরিহার করিয়া শুধু আত্মগত ভাবছন্দকেই আশ্রয় করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) নরনারীর মুখের ছবি, (২) জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, (৩) প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের রূপক চিত্র, (৪) মূলতঃ আলঙ্কারিক চিত্র, এবং (৫) প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নরনারীর মুখের ছবিতে আমরা শুধু মুখের আকৃতিই দেখিনা, দেখি কয়েকটি বিশিষ্ট মনের আকৃতি। ইহারা সচল মনের সচল স্বকীয়তা। মানুষের মধ্যে বিশেষ মানুষ। (চিত্রলিপি, চিত্র নং ২, ১১)। জীবজন্তুর প্রতিকৃতিতেও আমরা দেখিতে পাই তাহাদের প্রাকৃতিক আকার নহে, তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোথাও বা জন্তুর ছবির মধ্য দিয়া জড়চেতনের দ্বন্দ্ব-ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়াছে (চিত্রলিপি ৯নং চিত্র)। তৃতীয় শ্রেণীর ছবিতে একটি বৃহৎ ভাবকে রূপায়িত করা হইয়াছে। সে ভাব হয়ত একটি অনির্দ্দিষ্ট যাত্রাপথের ইঙ্গিত, হয়ত কোথাও বা চেনা-অচেনার বিরোধের আভাষ; আবার হয়ত কোথাও বা ব্যর্থ পরিণামের বেদনা। (চিত্রলিপি ১৩নং চিত্র; বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১, পৃঃ ৩৬৮, ৪০৯)। কবির আলঙ্কারিক চিত্রের সংখ্যাও অল্প নহে। এখানে রূপায়িত বস্তু রেখা ও বর্ণের ব্যঞ্জনায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সংখ্যায় অধিক নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে ও রূপলালিত্যে ইহারা অদ্বিতীয়। কোনো দেশের চিত্রকলার ইতিহাসেই ইহাদের সমকক্ষ মিলিবে না। এখানেও চিত্রকর প্রচলিত টেকনিককে পাশ কাটাইয়া নিজস্ব পথে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু নূতন হইলেও শিল্পের মূলছন্দে ইহারা চেতনালাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাদের ছন্দপতন ঘটে নাই। সেইজন্য বিভিন্ন বর্ণসমাবেশ ছন্দ সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্তলোকের নদী-গিরি-অরণ্য-আকাশ রূপলোকে

আকার পাইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। (চিত্রলিপি ৩নং চিত্র, বি-ভা পত্রিকা বৈশাখ আষাঢ় ১৩৫১, পৃঃ ৩৩৭, ৪০৮)।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে একটি মূল সুর পাওয়া যাইবে। অনেকে এই মূল সুরটির সাক্ষাৎলাভের জন্য কবির অবচেতন মনে অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা Dr. Oskar Pfister-এর সমালোচনায় এই Freud-তত্ত্বকে শিল্পের মাপকাটি হিসাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে libido-তত্ত্বই পরম ও চরম তত্ত্ব নহে। তবে এই আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল সুরটির কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় realism ও idealism-এর সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই সমন্বয় সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া শুদ্ধসৌন্দর্য্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। তথাপি যাহা ঘটিয়াছে তাহাও বিস্ময়ের বস্তু। রবীন্দ্র-চিত্রকলার মূল সুর হইল বস্তুর আকৃতিগত কঠিনতার মধ্য হইতে তাহার প্রকৃতিগত কোমলতাকে বাহিরে ব্যক্ত করার। অর্থাৎ কঠিনের মধ্যে কোমলতার সবল ব্যঞ্জনা—ইহাই কবির চিত্রের মূল সুর। কথাটা শুনিতে হয়ত কেমন লাগিল, কিন্তু ইহা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহাই হউক তাঁহার চিত্রকলায় অরূপকে সন্ধানের কোনো আকুলতা নাই; আছে শুধু রূপকে অপরূপ করিবার তন্ময়তা। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে রহস্য, তাহা অরূপের রহস্য নহে, তাহা অপরূপের রহস্য। রবীন্দ্র-কাব্যের mystecism এবং রবীন্দ্র-চিত্রকলার mystecism-এর পার্থক্য এইখানে। "কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়"—ইহা কবির নিজের উক্তি।

চিত্রকলা

বহিরঙ্গ উপাদান—জলরঙ

যামিনীকান্ত সেন

সমগ্র রসসৃষ্টির বিচারে রসজ্ঞদের দায়িত্ব অসামান্য। ভাল বা মন্দ এক কথায় এর বিচার হয়না। যদিও বিচারকের রুচির স্থান এতে আছে তবুও সে রুচি মার্জ্জিত, নিপুণ ও গভীর অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। প্রতিটি সৃষ্টির উপাদান প্রচুর। অন্তরঙ্গ দিক হতে চিত্রিত ব্যাপারের রস বিচার করতে হলে রসের নানা উৎস ফলিত হয়েছে কি না দেখতে হয়। সাহিত্যগত সৌন্দর্য্যবিচারের মূল তথ্যগুলিও এক্ষেত্রেও সন্ধান করা যেতে পারে। প্রতিটি চিত্রের "ধ্বনি" বা "বক্রোক্তি" লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ 'ধ্বনি' বা Suggestion না থাকলে চিত্র সুধু যে ভঙ্গুর ও সাময়িক হয় তা' নয়—এর ভিতরকার অফুরন্ত রসবস্তুই জন্মায়না। ভারতীয় সমজদারগণ এসব বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। নারায়ণের মতে "অদ্ভুতত্ব"ই রসবত্ত্বার উৎস—কথাটি আধুনিক ইউরোপীয় অন্তরঙ্গ কলার (Expressionistic art) প্রতিপাদ্য লক্ষ্যের মতই বলতে হয়।

অপর দিকে এই 'রস' জিনিষটারও লক্ষণ দেখতে হয়। রোমাঞ্চকর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation) রস নয়। সুধু ইন্দ্রিয়কে প্রলুব্ধ করে যথার্থ রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না। রসের ভিতর এমন কিছু থাকা চাই—যা সীমাকে অতিক্রম করে' অসীমের সিংহাসনে পৌঁছায়। এজন্য উচ্চশ্রেণীর রচনার আকর্ষণ সহজে ফুরিয়ে যায়না—তা বহুকাল এমনকি অসীম কাল চিত্তবিনোদন করে। সাময়িক উত্তেজনার ভিত্তিতে যা রচিত হয় তা ক্ষণস্থায়ী ঝরাফুলের মত সহজেই শুষ্ক হয়ে যায়। কিন্তু যথার্থ রসবস্তুর অফুরন্ত বিস্তৃতিশক্তি নির্ভর করে' অসীমের সহিত নিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্ক, 'রেখা', 'বর্ণ', 'লাবণ্যযোজন' ও 'বর্ত্তনা' প্রভৃতি দ্বারা দ্যোতিত করতে হয়। বস্তুতঃ মানব জীবন যেমন পরিচিত হয়েও দুর্জ্ঞেয় বা অফুরন্ত, তেমনি রসসৃষ্টিও সীমার সমগ্র উপকরণ নিয়ে এমন এক ইন্দ্রজাল উপস্থিত করে যা কিছুতেই সুধু বুদ্ধি দ্বারা কারও পক্ষে উপলব্ধি সম্ভব নয়। এদেশের বিশ্বনাথ এই রসসৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এর 'লোকোত্তরতা', 'অনির্ব্বচনীয়তা,' 'চমৎকারত্ব' এবং 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যত্ব' প্রভৃতি গুণ। সকল শ্রেণীর কলার ভিতর এ সমস্ত থাকা প্রয়োজন।

চিত্রকলা প্রসঙ্গে ভারতীয় রসজ্ঞগণ নানাভাবে এর উপলব্ধি ও বিচারের পথ নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছেন। সে সব দিক হতে বিচার না করলে ভারতীয় চিত্রের বা যে কোন চিত্রের যথার্থ বিচার বা পরীক্ষা হ'ল একথা কিছুতেই বলা যায় না। অন্তরঙ্গ দিক হ'তে বিচার ছাড়া তাই বহিরঙ্গ দিক হ'তেও বিচার প্রয়োজন এবং তা'ও করা হয়েছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হয়েছে :—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরেজনাঃ।"

চিত্রকলার ভিতর 'রেখা'প্রয়োগ, 'বর্ত্তনা', 'ভূষণ' ও 'বর্ণাঢ্য' লক্ষ্য করতে হবে। এই অনুশাসন একটা সার্ব্বজনীন মন্তব্য। সকল দেশের ও কালের রচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে। অপর দিকে যশোধর বলেছেন :—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকং।"

অর্থাৎ চিত্রকলায় চিত্রের ষড়ঙ্গ বিচার করতে হলে যথা 'সাদৃশ্য', 'বর্ণিকাভঙ্গ, 'রূপভেদ', 'প্রমাণ', 'ভাব', ও 'লাবণ্যযোজন', এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিচার না হ'লে চিত্রকলার যথার্থ বিচার হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এসব বিচার যথাযথভাবে হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মনস্তত্ত্ব, আদর্শ ও রুচি ভালরকম না জানলে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতার বিশিষ্ট রাগ না বুঝলে ভারতীয় চিত্রে এসব অঙ্গ বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য ইউরোপের Bachhofer প্রভৃতি আলোচকগণ কঙ্কনের লোভে সুদুস্তর পঙ্কে পড়েছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় চিত্রকলার বিচার হয়েছে অতি সামান্য ও লঘু স্তরে।—এ সম্পদের গভীর পরিমাপ মোটেই হয় নি। সকলেই ভারতীয় কলাকে অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ব্বরতা বলতে ইতস্তত করে নি।

প্রাচ্য অঞ্চলের চীন দেশের বিচারও ভারতীয় আদর্শের কতকটা অনুরূপ—যদিও একরকম নয়। Shieh-Ho কর্ত্তৃক উল্লিখিত চিত্রবিচারের ষড়ঙ্গ হচ্ছে, অধ্যাত্মসামঞ্জস্য, তুলিকাপ্রয়োগ, সাদৃশ্য, বর্ণ, প্রমাণ ও অনুকরণ। জাপানের বিচারও অনেকটা এরকম যদিও ওখানে শিল্পরসজ্ঞেরা একটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে (Subliminal Consciousness) এ প্রসঙ্গে প্রাধান্য দেয়।

বর্ত্তমান বিচারে অতি সংক্ষেপে চিত্রকলার পাথেয় ও উপাদানের কিছু বিচার করা হবে—যা' আধুনিক যুগে সকল দেশেই গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ উপাদানগুলির প্রত্যেকটির একটা স্বাধীন ব্যঞ্জনার ক্ষমতা আছে এবং সেগুলি নিপুণভাবে ব্যবহারের উপর শিল্পীর মর্য্যাদা ও ক্ষমতার বিচার হয়। চিত্রের বর্ত্তমান প্রথা হচ্ছে : জলরঙ, তেলরঙ, পাষ্টেল, ফ্রেস্কো, টেম্পেরা ও Encaustic প্রভৃতি উপায়ের প্রয়োগ। এতে চিত্রকলার আকর্ষণ ও পদ্ধতি বহুমুখী হয়েছে। চিত্রকলার বহিরঙ্গ দিক্ বিচারে এসব উপাদানের প্রসঙ্গ সহজেই উঠে। শিল্পীদেরও এসবের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হয়।

জলের রঙ ব্যবহার খুব প্রাচীনকাল হ'তেই চলে এসেছে সব জায়গায়। এর চাইতে অধিক প্রাচীন আর কোন উপাদান নেই বল্লেই চলে। দুনিয়ার সকল চিত্রপ্রসঙ্গের পূর্ব্বে tempera ও স্বচ্ছ ধোঁয়া

আকারে জলের রঙ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কুড়ি হাজার বছর আগেকার আলটিমাইরাগুহার উজ্জ্বল বর্ণকারুতাতেও আধুনিক যুগের জটিলতা নেই—তা জলীয় রঙেরই রূপান্তর। ইউরোপের মধ্যযুগের পাদরীরা সচিত্র পুঁথির ছবিগুলিতে জল-রঙ ব্যবহার করে এসেছেন—কাজেই পশ্চিমে এ-প্রথা অপরিচিত নয়। জলরঙকে অতি দ্রুত ভাবেই ফলিত করা যায় এবং তাতে অতি উজ্জ্বল বর্ণবিহার সম্ভব হয়। বস্তুতঃ জলরঙের বিচিত্র ইন্দ্রধনু মানুষের সমগ্র চিত্তকে ব্যাপ্ত করে' সহজেই ব্যঞ্জনার অফুরন্ত শ্রী ধারণ করে। তেল রঙে এই সূক্ষ্ম কৃতিত্ব নেই। ইউরোপে বহুকাল এ উপাদানটি উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। আধুনিক যুগে আবার এ রঙের এক নূতন ডাক এসেছে এবং দেশবিদেশের শিল্পীরা তা'তে আবার সকলেই অভিভূত হয়েছে। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই জলরঙের চিত্রকরদের বহু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত শিল্পী Sir Edward Burne Jones [১৮৩৩-৯৮], রসেটি [১৮২৮-১৮৮২] ও টার্ণার [১৭৭৫-১৮৫৩] জলরঙে বহু চিত্র আঁকেন। বস্তুতঃ টার্ণারের চিত্রে এর চরম প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ইউরোপে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় বহু শিল্পী জলরঙ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে জলরঙের প্রচলন অভুতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলরঙের সূক্ষতা, ও লীলা অসামান্য। তা'তে সম্ভব হয় "infinite tonal orchestration" বা অফুরন্ত সুরের গমক। মনের অতি পেলব স্বপ্নকে জলরঙের সুচিক্কণ ও সুনিপুণ জালে বন্দী করা যায়। বস্তুতঃ বর্ণের ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষের চিত্তধর্ম্ম (Condition) প্রতিফলন করা। এক একটি রঙের নিজস্ব শক্তি আছে এক একটা বিশিষ্ট ভাব উদ্দীপন করতে। সেদিকে নজর রেখে শিল্পীদের রঙের মান ঠিক রাখতে হয়। যেমন লাল রঙ, শৌর্য্য, যুদ্ধবিগ্রহ রক্তাক্ত বিরোধ ও প্রতিরোধের বাণী বহন করে। অসভ্য জাতিরা যখন যুদ্ধে যায় তখন লাল উষ্ণীষ ও বসনভূষণে নিজেদের সজ্জিত করে। এজন্য সংঘর্ষ, বিপদ ও বীরত্বের ব্যঞ্জনা হয় রক্তিম বর্ণে। অন্যান্য বর্ণেরও ধর্ম্ম আছে যেমন সে সব করুণ, শৃঙ্গার প্রভৃতি রস উদ্ঘাটন করে। এ গেল একটা দিক্।

অপরদিকে এক একটা বর্ণের এক একটা রূপকাত্মক (Symbolic) ব্যঞ্জনাও প্রাচীনরা স্বীকার করে এসেছেন। এমনকি ভারতবর্ষে এক একটি রঙের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হয়ে এসেছে। এর মানে হচ্ছে মানুষের মানস ও অধ্যাত্মরাজ্যের উপর বর্ণের প্রভাব হচ্ছে একটা ভাগবতী শক্তির ক্রীড়া—এর কোন ঐহিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রত্যেক দেবতাকে এদেশে বিশিষ্ট বর্ণে আঁকা হয়েছে। দুর্গাকে পীতবর্ণে, সরস্বতীকে শ্বেতবর্ণে, গণেশকে লোহিতবর্ণে ইত্যাদি।

বর্ণ ব্যবহারের তৃতীয় দিক্ উদ্ঘাটিত হয়েছে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে। এ যুগের Experimental Science of beauty পরীক্ষার দ্বারা দেখ্‌তে পেয়েছে যে মানুষের মনের উপর এক একটি বর্ণের বিশেষ বিশেষ প্রভাব আছে। এমনকি বর্ণের প্রয়োগ দ্বারা মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও এ যুগে হয়েছে। একটি প্রকোষ্ঠকে কোন বিশেষ বর্ণে ফলিত করে তার ভিতর কা'কেও বাস করতে দেওয়া হয়। তা'তে করে' ওর মনের উপর নানা রকম ক্রিয়া হয় এমনকি স্নায়ুর স্বাস্থ্যও ফিরে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বর্ণের ধর্ম্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার ব্যাপার। আধুনিক Poster Painting'এর চিত্রগুলিকে স্বাধীন, অপ্রাকৃত বর্ণ দিয়ে আঁকা হয়। মানুষের দেহে ও মুখে ভায়োলেট, হলদে ও সবুজ

রঙ ব্যবহার ইদানীং এক্ষেত্রে সহজ হয়েছে। এসব বিশিষ্ট Psychic effect উৎপন্ন করে এবং তা' পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাতে সফলতা প্রচুর হয়ে থাকে।

রঙের যাদু যারা আয়ত্ত করতে চায় তাদের রঙের এই ত্রিমূর্ত্তিকে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

অপরদিকে এক একটি রঙের গমকও প্রচুর। সুরের যেমন উঁচু নীচু পরদা আছে প্রত্যেক বর্ণেরও তা আছে। জলরঙ এ বিষয়ে অঙ্কুরস্তক্রমে পরিপূর্ণ। চীন দেশের মিঙ্গ যুগে কাব্যসুলভ ভাবোচ্ছাস প্রকাশ করতে বিচিত্র জলরঙের ব্যবহার করা হ'ত প্রচুর। মোটা তেল রঙে সূক্ষ্ম ও পেলব ঢেউ খেলান কঠিন হয় অথচ জলরঙের কুঞ্চিত উচ্ছাসের সীমা নেই। Sung যুগের শিল্পীরা এক রকমের amberএর জলরঙ ব্যবহার করেছে। তা একটা মিশ্র উপায়ে পাওয়া যেত। খচ্চরের চামড়া হ'তে চর্ব্বি নিয়ে বাতির কাল ধোঁয়ায় মিশিয়ে এ রঙটি তৈরী করা হত। রঙটির এক আশ্চর্য্য সুকুমারত্ব সকলের তাক্ লাগিয়ে দেয়। এ রঙটি শিল্পী তুঙ্গ-চি-চ্যাঙ্গ, উ-ঐ, ও ফু-স্যান ব্যবহার করেছেন বহুকাল। বর্ণের গভীরতারও একটা বিশিষ্ট প্রভাব আছে। মিঙ্গযুগের বর্ণ ব্যবস্থায় নিবিড় ও জমাটশ্রী কম।

বস্তুতঃ বর্ণসঙ্গমেও সঙ্গতি চাই—তাকে ইংরাজীতে এজন্য বলা হয় Orchestration of colour অর্থাৎ বর্ণের সমতান। এই সঙ্গতি জলরঙে যত সহজে সম্ভব অন্যত্র তা নয়। এদেশের সচরাচর ব্যবহৃত জলরঙের ভিতর সাদা, কালো, লাল, সিন্দুরে রঙ, নীল, হলদে, সবুজ রঙ ও এদের নানাভাবে মিশ্রণ একটা প্রশস্ত বর্ণ-গমক সৃষ্টি করে এসেছে। রাজপুত ও মোগল চিত্রের বর্ণকুহক অসাধারণ। রাজপুত চিত্রকলার দুই প্রধান রূপ—জয়পুরী ও কাংড়া। জয়পুরী চিত্রের বর্ণপ্রলেপ কৌল প্রথায় অপরাজেয়। কাংড়ায় আছে নূতন উপলব্ধির একটা নহবৎ ধ্বনি—বর্ণের একটা মত্ত কেলি! জয়পুরী প্রতিরূপ চিত্রে শিল্পী বর্ণের কার্পণ্য দেখিয়ে খুসী! অপরদিকে কাংড়ার রচনায় বর্ণের বৈচিত্র্য সমগ্র সীমান্তে নানা অবকাশ ও ফিকিরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব বর্ণসমারোহ নানাভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। জলরঙের ব্যবহার উপাদান হিসেবে মার্জ্জিত রুচি, উচ্চতর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় অপরিহার্য্য। এ রঙের সাধনাও হয়েছে অসীম কালব্যাপী। মোগল চিত্রকলার দিল্লীচক্র ক্ষুরধার রেখাজালে আত্মসমাহিত—বর্ণপুঞ্জ তাতে হিমালয় বক্ষে মেঘমালার মত উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মনে হয়। লক্ষ্ণৌ চক্র স্বচ্ছ জলরঙ ব্যবহার করেছে এবং পৃষ্ঠভূমিকে শ্বেত করতে ইতস্তত করেনি। দক্ষিণী চক্র বর্ণের বাহাদুরীতে মশগুল—সোনার রঙের ব্যবহার হয়েছে এক্ষেত্রে সংযম ত্যাগ করে'! পাটনাই চক্রে রেখার গোলোক ধাঁধাঁ আছে—বর্ণের কালোয়াতীতে এ চক্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

বস্তুতঃ জলরঙ উচ্চতর চিন্তা ও অধ্যাত্ম অনুভূতির উপযুক্ত বাহন। জলরঙের উপর অধিকার ততটা কঠিন যতটা উপাদান হিসেবে এর সহিত সহজ সামাজিকতা সুলভ। এর জন্য উপযুক্ত তূলিকা প্রয়োজন। জলরঙের তৈরী tenture এ যে মাদকতা সম্ভব—তেলরঙের তা' সম্ভব নয়। জলরঙের সাহায্যে space ও form রচনার বৈচিত্র্য, ঐক্য ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র সেতারের ঝঙ্কার মুখর ঐশ্বর্য্য লাভ করে। তাতে Semi tone ও Quarter-tone এর ঈথর-তরঙ্গ প্রতিফলন মোটেই কঠিন হয়না। বর্ণে শুধু হাফটোন নয়—তদপেক্ষাও সূক্ষ্মটোন প্রতিফলন সম্ভব। এজন্য জলরঙের যাদু আয়ত্ত করতে আধুনিক জগৎ আবার অগ্রসর হয়েছে।

সাময়িক সাহিত্য

প্রবোধকুমার সান্যালের—স্বাগতম, অঙ্গরাগ, পঞ্চতীর্থ, কল্লান্ত, জলকল্লোল, যত দূর যাই।

শরৎচন্দ্রের সমসময়ে তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন বোধ হয় প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং প্রবোধকুমার প্রায় একই সঙ্গে কলম ধরেছিলেন, এবং পাঠকমহলে তাঁরা সমানভাবেই তাঁদের রচনা পরিবেশন করে গেছেন, তথাপি তাঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার কেন যে আর সকলের চাইতে বেশী করে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের মনকে অভিভূত করতে পেরেছিলেন তার হিসাব করতে গেলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ ও সাহিত্যরসিকদের একই সঙ্গে বিচার করে দেখা দরকার।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় না হোক, বিক্ষিপ্তভাবে এ কথাটা বহুবার আলোচিত হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কালেই এই নবীন সাহিত্যিকের দল নতুন করে সাহিত্য ও সমাজকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তার ফলে সাহিত্যপথ গতানুগতিকতা ছেড়ে একটা আধুনিক মোড় নেয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা পুরাতন সমস্ত কিছু সংস্কারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু, আমরা যদি সে সময়কার পাঠকসম্প্রদায়ের দিকে তাকাই, তা হলে স্পষ্টই দেখতে পাবো, তখন পাঠকদের মন পুরোপুরিভাবেই আচ্ছন্ন করে আছেন একা শরৎচন্দ্র। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যায় যাঁরা নতুন করে একটা বিদ্রোহের সুর নিয়ে এলেন, খুব শীগ্‌গীরই পাঠকমহল তাঁদের অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করলেন না, বরং ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, সেদিন সাধারণ পাঠক অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁদের রচনা বিচার করে দেখেছেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রূপের কশাঘাতে পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন এঁদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা আন্তরিক কিনা। আজ আমরা জানি, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন তাঁরা।

সাধারণ পাঠকদের মনে এই নবতন সাহিত্যিক সম্প্রদায় যখন ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলছিলেন, তখন দেখতে পাই, এঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালই আর সকলের চাইতে দ্রুতগতিতে অভিনন্দন লাভ করলেন। এই ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব হলো তা বুঝতে

সহজ হবে, যদি আমরা প্রবোধকুমারের রচনাকে বিচার করবার আগে তৎকালীন পাঠকমনকে বিশ্লেষণ করে দেখি।

আগেই বলেছি, বাংলা কথাসাহিত্য তখন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একমাত্র শরৎচন্দ্রকে নিয়েই পরিপূর্ণ। এ-অবস্থায় শরৎচন্দ্রে বিমোহিত পাঠকমাত্রই নতুন কোনো লেখককে যে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখবে তাতে আর বিচিত্র কি! এই সংশয়ের পরদা পার হয়ে যদি কেউ এই-সব পাঠকদের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন, তা হলে, তিনি যতই কেন না বিদ্রোহী ও বিপ্লবী হোন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধারার ছাড়পত্র হাতে না নিয়ে তাঁর পক্ষে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সহজ নয়। নবীন যে-কয়জন সাহিত্যিকের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রবোধকুমারই শরৎচন্দ্রকে আশ্রয় করে সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছিলেন, তার ফলে, তাঁর পক্ষে শরৎ-সাহিত্যের পাঠকদের কাছে আপেক্ষিকভাবে অনেকটা আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব ছিলো। রচনাশৈলী বা ভাবনাধারণা বা বাচনভঙ্গিমায় প্রবোধকুমার একেবারে মন্ত্রলব্ধ শিষ্যের মতই শরৎচন্দ্রের অনুকরণ করে গিয়েছিলেন, এ কথা যদি কেউ মনে করে থাকেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে প্রবোধ সান্যালের প্রতি অবিচার করবেন। আমি যা বলতে চাই, তার সার কথা হলো এই যে, প্রবোধকুমার তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টার প্রথমিক পর্য্যায়ে প্রধানত শরৎচন্দ্রের পথকেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন,--একে প্রভাব বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এবং প্রভাবও যদি হয়, তা হলেও তা প্রবোধকুমারের পক্ষে লজ্জা বা দোষের কারণ কিছু নয়। কারণ, শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভা যেখানে বর্ত্তমানে সেখান তাকে অস্বীকার করা বা উপেক্ষা করা অসম্ভব। তা হলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয়, এ-কথাই যদি শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিতে হলো, তবে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিম্বা অচিন্ত্যকুমার আর শৈলজানন্দের সম্বন্ধে কি বলতে হবে। তাদের জন্য মাত্র দুইটি কথা উচ্চারণ করা চলে, হয় তাঁরা শরৎচন্দ্রের পথই গ্রহণ করেছিলেন, নয়তো তাঁকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নতুন উদ্যমে নতুন পথে সাহিত্যধারাকে প্রবাহিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কোনটা সত্যি! প্রবোধকুমারের সম্বন্ধে আমি যে কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, তা থেকে অত্যন্ত স্থূল-বিচারে এই কথাই ভাবা স্বাভাবিক যে, শৈলজানন্দ-বুদ্ধদেব প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ মনেপ্রাণে শরৎচন্দ্রকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সঙ্গে যাঁর সামান্যমাত্রও পরিচয় আছে তিনিই জানেন—এ কথাটা একান্তই মিথ্যা। আসলে তাঁরা কেউ শরৎচন্দ্রকে উপেক্ষাও করেননি, অস্বীকারও করেননি। যা তাঁরা করেছিলেন তা হলো প্রকৃতপক্ষে এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যপথপরিক্রমায় বাঙলাসমাজের যে-জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখান থেকেই যাত্রা সুরু করেছিলেন এই কয়জন নবীন রচনাকার। আর প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁদের পথে এগিয়ে আসার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের পন্থাকেই খানিকটা দূর থেকে অনুসরণ করে এসেছিলেন—ভাবেও বটে ভঙ্গিতেও বটে। তার ফলে আপাতভাবে সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁকে খানিকটা অনাধুনিক বা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মনে হলেও, তৎকালীন পাঠক-সাধারণের হৃদয় জয় করে নিতে পারলেন

তিনি অনেক শীগ্‌গীর। প্রবোধকুমারের প্রতিষ্ঠার মূলে এই কথাটাকে যদি আমরা ভালো করে বুঝে নিই, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে ধরা পরবে। তা হলো, সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে তাঁর তুলনাগত বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষভাবেই আবদ্ধ রাখলেন শহর-জীবনের মধ্যে—একজন আশ্রয় নিলেন উচ্চমধ্যবিত্তকে, আর একজন সাধারণমধ্যবিত্তকে। সমগ্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত-জীবনকেই তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে চললেন। শৈলজানন্দ তাঁর বিষয়বস্তু এবং নরনারীর সন্ধান করলেন আরো নীচের মহলে—বলতে গেলে একেবারে যথাতথা; শহরতলীর আবর্জ্জনাপঙ্কিল বস্তী থেকে অনুন্নত গ্রাম্য-পরিবেশ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন তিনি তাঁর কল্পনাকে। এঁদের তুলনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার পরিমাণ আজও যেমন প্রচুর নয়, তখনও তেমনি প্রচুর ছিলো না, তবু তখনকার রচনাতে তিনি মোটামুটিভাবে এই দুই দিকপ্রান্তকে একটি যোগসূত্রে বেঁধে সাময়িককালের বাংলা গদ্যসাহিত্যকে একটা অখণ্ড সমগ্রতা দেবারই চেষ্টা করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় প্রবোধকুমার প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই সমধর্মী, কারণ তৎকালীন রচনায় উভয়েই যেমন একই কালে শহর ও গ্রাম্যজীবনের পটভূমিতে সাধারণ শিক্ষিত নরনারীকে কেন্দ্র করে তাঁদের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উভয়েই তাঁদের মানসকল্পনার ক্ষেত্রকে বিশেষ একটা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন—শৈলজানন্দের সাহিত্যক্ষেত্রের সঙ্গে যার প্রকৃতি অনেকটা অভিন্ন হলেও বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যমণ্ডলের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, যতটুকু মিল তার চাইতে ঢের বেশী অমিল এই দুইজন লেখকের মধ্যে—একদিকে প্রবোধকুমার শুধুমাত্র কথাসাহিত্যিক, অন্যদিকে কথাসাহিত্যের তুলনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুনাম তাঁর কাব্য-রচনার দিক থেকেও কম নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হলো উভয়ের রচনার মধ্যেই একটি স্বধর্ম্মবিরোধিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি এবং তাঁর কবিতা যখনই পড়ি, তখনই স্বীকার করি তিনি সত্যিকারের কবিপ্রাণের অধিকারী, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাঁর গল্পগুলো এমনি সংহত সংযত, এমনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ যে, এক এক সময় মনে হতে পারে এ-হাত দিয়ে কবিতা রচনা করা কি করে সম্ভব! যা নিতান্তই না বললে নয়, তার বেশী একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও যেন তিনি রাজী নন। (বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর বিভেদটুকু অত্যন্ত সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একান্ত সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধদেব বাবুর রচনা অনেকখানি সংহতি পেলেও, সাধারণভাবে তাঁর গল্প উপন্যাস বা কবিতা সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে বলা যায়, কি গদ্যে কি কবিতায় উভয়ক্ষেত্রেই তিনি একই রকম উদ্বেল; বন্ধনহীন কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে একই ভাবে বিচরণ করেন তিনি তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে। বুদ্ধদেব বসুর রচনা আমার আলোচনার বিষয় না হলেও সমসাময়িক সাহিত্যস্রষ্টাদের সঙ্গে প্রবোধকুমারের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ এ-বক্তব্যটুকু উল্লেখ করতে হলো।) প্রবোধকুমার কিন্তু এ-ধারায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের একান্ত বিপরীত। তিনি কখনও কবিতা লেখেন না, কিন্তু সে ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেন তিনি তাঁর গদ্য রচনাতেই। এক একসময় তিনি এমন সচ্ছল প্রাঞ্জলতায় এবং স্বচ্ছন্দ ভাষায় পাতার পর পাতা কথা বলে যান যে, মাঝে মাঝে মনে হতে পারে এ-লেখক প্রকৃতপক্ষে কবি, অন্ততঃ কবিতা রচনা করাই তাঁর মতো

লেখকের পক্ষে উচিত। মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে তাঁর একটি উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কোন একজন সমালোচক এ-রকম একটা কথা বলেছিলেন, প্রবোধবাবুর এ বইটিকে যদি উপন্যাস বল্‌তে হয় তা' হলে এটি একটি চমৎকার কাহিনী, আর যদি কাব্য বল্‌তে হয় তা' হলে বল্‌বো এ' একটি অদ্ভুত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রায় সবগুলো বই সম্বন্ধেই এ-কথাটা বলা চলে। এ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাঞ্জলতা তাঁর রচনাকে কোথাও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠার অবসর দেয়নি স্বীকার করি, কিন্তু সে সঙ্গে এ-কথা বল্‌তেও কুণ্ঠিত নই যে, এই সহজ সাবলীল গতিধারার জন্যে কোনো কোনো সময় মূল কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এ-রকম দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই।

ভাষা ও রচনারীতির এই বৈশিষ্ট্যই প্রবোধকুমারকে সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এবং সেই সঙ্গে তাঁর রচনাকে শরৎসাহিত্যের আশ্রয়পুষ্টবলে চিহ্নিত করেও তুলেছে। শরৎচন্দ্রের ভাষাকেই বিশেষ করে গ্রহণ করেছিলেন বলে, এবং ভাষাগত অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে তাঁর পাশাপাশি অন্যান্য লেখদের মতো তেমন মনোযোগ দেন নি বলে শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে পিছিয়েই পড়ে রইলেন, এমন কথা বল্‌বার অবসর কিন্তু প্রবোধকুমার তাঁর পাঠকদের দেননি। আঙ্গিক বা রচনাশৈলী সাহিত্যের বাইরের ব্যাপার, দেহসজ্জাও বলা চলে, কিন্তু সাহিত্যের সত্যিকারের প্রাণ যেখানে সাহিত্যের সেই মর্ম্মমূলের সন্ধান করতে তিনি আর সকলের মতই পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই এগিয়ে এলেন। এই আন্তরিকতা এবং কল্যাণকর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যদি সাহিত্যিকের মধ্যে না পাওয়া যায়, তা' হলে শুধুমাত্র দেহগত রূপসজ্জার আবরণ দিয়ে পাঠকমনকে মুগ্ধ করে রাখা বেশীদিন সম্ভব নয়। (এখানে আঙ্গিকের প্রয়োজনকে আমি অস্বীকার করিনি, কিন্তু তার তুলনায় সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর মূল্য বেশী বলেই আমি মনে করি।) সে যাই হোক, কল্লোল-যুগের সকল লেখকের মতই প্রবোধকুমারও নতুনদৃষ্টিতে সমাজের দিকে তাকিয়েছিলেন, এবং গতানুগতিক জড়তাগ্রস্থ মন নিয়ে নয়, একান্ত সচেতন ও বৈপ্লবিক মন নিয়েই সমাজ ও জীবনের নতুন মানে খুঁজেছিলেন। তাই তাঁর গল্পে উপন্যাসে সহজ এবং সবল প্রাণেরই সন্ধান পাওয়া যায় বেশী; এমন কি প্রয়োজনবোধে অনেক জায়গায় তিনি সুস্থ ও সবল চরিত্রের নরনারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে মানুষের হৃদয়ের একটা নতুন রূপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'প্রিয়বান্ধবীর' নায়ক-নায়িকাই তার প্রমাণ।

চরিত্রচিত্রন প্রবোধকুমার সান্ন্যালের আর একটি বিশেষত্ব। বিশেষ করে উপন্যাসে তাঁর এই বিশেষত্বটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আগাগোড়া তিনি যেন কয়েকটি চরিত্রকেই প্রকাশ করেন, ঘটনাটা আনুসঙ্গিক মাত্র। আধুনিককালে মনস্তত্বমূলক উপন্যাস প্রচুর প্রকাশিত হচ্ছে এবং তাতে এই ধারাটিকেই সাধারণতঃ অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু এইসব উপন্যাসের সঙ্গে প্রবোধকুমারের রচনার কিছু প্রভেদ আছে। সোজাসুজি নরনারীর মন নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেননি; ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যকে অবলম্বন করেই তাঁর মানুষগুলো রূপ পেয়েছে। উপন্যাস-রচনায় আঙ্গিকের দিক থেকে এটা প্রচলিত নিয়ম হলেও প্রবোধকুমারের পক্ষে তা এই জন্যে উল্লেখযোগ্য যে, চরিত্র-উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে ঘটনার দায়িত্ব যতটুকু, ততটুকুই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি চরিত্র

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ঠিক এমনিভাবেই একক ঘটনার পরিমণ্ডলে তাকে বিচার করেছেন। এইজন্যেই সাধারণত দেখা যায়, তাঁর প্রায় সবগুলো উপন্যাসই যেমন ঘটনাবহুল নয়, তেমনি সেখানে অনেকগুলো মানুষেরও আনাগোনা নেই। কোনো কোনো রচনায় এই পদ্ধতি আরোপ করতে গিয়ে তিনি উপন্যাস-রচনায় পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি, সে-কথা বল্‌তে বাধা নেই। সেগুলোকে বরং বড় আকারের ছোটগল্প আখ্যা দেওয়া ভালো। 'সরলরেখা' কিংবা 'তরুণীসঙ্ঘে' এ-দোষটা ধরা পড়ে।

বোধ হয় এই কারণেই ছোটগল্পে প্রবোধকুমার অনেক বেশী সার্থক। প্রথম দিককার ছোট গল্পে তিনি মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিচক্ষণ পাঠক তা স্বীকার না করে পারবেন না। 'চেনা ও জানা' বইটি তাঁর সার্থক ছোটগল্পরচনার অন্যতম স্বাক্ষর। এমন সুসংবদ্ধ রচনা তিনি নিজেই কি আর লিখতে পেরেছেন? পরবর্ত্তীকালে তাঁর অঙ্গার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই যশোলাভের মূল কারণ কিন্তু একই। কয়েকটি মাত্র ঘটনার পটভূমিতে তিনি শুধু দেখালেন, কেমন করে একটা দুঃস্থ পরিবার—পরিবারের একটি মেয়ে—ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে আমূলভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। এখানে নরনারীর ভীড় আছে, কিন্তু তা অনুল্লেখ্য, সমাজ আছে কিন্তু তা শুধু পশ্চৎপট—এ গল্পে যা সব-চাইতে সত্য তা হলো দুঃস্থ পরিবারের একটি মেয়ে, তাকে রূপান্তরিত করে দিয়ে গেল যে কয়েকটি ঘটনা তারা, আর তার নীরব সাক্ষী লেখক নিজে। এখানে সাহিত্যসৃষ্টিটাই মুখ্য কথা নয়, সমাজচেতনাও একান্ত স্পষ্ট।

আমার হাতের কাছে প্রবোধকুমার সান্যালের যে কয়টি বই আছে, তারা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তাদের অধিকাংশই লেখকের প্রাচীন রচনা। কিন্তু লেখককে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে সমগ্রভাবে তাঁর রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টিধারাকে আলোচনা করা উচিত; বিভিন্নকালে প্রকাশিত মাত্র কয়েকটি বইকে অবলম্বন করে কোনো সাহিত্যিককে বুঝতে গেলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। এই জন্যেই কয়েকটি বই-কে মাত্র উপলক্ষ্য করে আমি প্রবোধকুমারের রচনাধারার সমগ্র গতিপ্রকৃতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছি।

প্রবোধকুমারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, 'স্বাগতম' তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম পরিচায়ক নয়। উপন্যাস রচনার ব্যাপারে কোনো কোনো জায়গায় যে সব ত্রুটি অবলীলায় তাঁর মধ্যে স্থান পায় এখানেও তা আছে। আমি উল্লেখ করেছি প্রবোধকুমারের দু' একটি উপন্যাসকে অনায়াসে বড় আকারের ছোটো গল্প বলা যায়। 'স্বাগতম' তার একটি বড় প্রমাণ। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলো একটির পর একটি এগিয়ে গেছে, কিন্তু কোনো অনিবার্য্য পরিণতিকে তারা প্রকাশ করেনা। শেষ পর্য্যন্ত একটা ইঙ্গিত আছে কিন্তু তা বিশেষ কোনো ধারণার বাহক নয়। বইটিতে আকৃতি ও প্রকৃতির ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু এখানে লেখকের বিদ্রোহী মনের পরিচয় এতটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিঃসন্তান সত্যবতী বিধবা হলেও মাতৃত্বের দাবী তার/স্বাভাবিক এবং এ-দাবী তার নারীত্বের মর্য্যাদাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনা। এই সমাজবিরোধী বৈপ্লবিক ধারণাকে

প্রকাশ করবার জন্যে লেখক কোথাও আবছায়ার সৃষ্টি করেননি, এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনকিল্পনাকে স্বাক্ষরিত করেছেন। এই দৃঢ়তাই স্বাগতমকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কিন্তু 'অনুরাগ' ও 'পঙ্কতীর্থ' তাঁর সার্থক ছোটগল্প সংগ্রহের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অসংযত মনের প্রকাশ এখানে কোথাও নেই—ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনার পরিবেশে নরনারীর বিচিত্র হৃদয় প্রকাশিত হয়েছে। 'তৃতীয়' গল্পের নায়ক মৃতদার প্রণবেশ অবশেষে যাকে বিয়ে করে ঘরে আনলো, সে তার প্রেয়সী হতে পারলো না, কিন্তু তারই রোগশয্যায় বসে ভগবানের কাছে সে কাতর প্রর্থনা জানালো, ভিক্ষা করলো সুললিতার প্রাণ। এ-তো প্রেমের তাগিদ নয়, এ হলো মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। নরেনের কাছে মিষ্টার চৌধুরীর পরাজয়টাও উল্লেখযোগ্য (সিংহাসন)। 'মনিব' গল্পের নায়ক নয়িকা দুটিতো অদ্ভুত চরিত্র। এরা স্বাভাবিক নয় কেউই কিন্তু তাদের চরিত্রের অস্বাভাবিকতাটাই গল্পটিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। কিম্বা 'ক্যামেরাম্যানে'র অতনু বা 'আচার্য্যিদের বউ' মল্লিকাই কি কম! এখানে শুধু চরিত্র বা ঘটনাই গল্পের বড় কথা নয়, তাদের ফাঁকে ফাঁকে যে লেখকের বলিষ্ঠ ও সচেতন মনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। 'কল্লান্ত' প্রবোধকুমারের আধুনিক গল্পগ্রন্থ। কল্লান্ত-রচনার পূর্ব্বেকার ও সমসাময়িক বাংলাদেশের রূপটি যদি আমরা ভুলে না যাই তা হলে এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্পের ট্র্যাজেডীকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবো। বিগত যুদ্ধে সাধারণ বাঙ্গালী জীবন যে কিভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে, কত ভাবে যে সমাজদেহ ক্ষয়িত বিকৃত হয়ে গেছে তা-ই একান্ত নির্ম্মমভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। এ কলুষ কালিমার রূপ দেখে আমরা আঁৎকে উঠতে পারি, কিন্তু চোখ বুজে সত্যকে যে অস্বীকার করবো তারও উপায় নেই। এর প্রত্যেকটি কাহিনীই মৃত্যুর মত সত্য। সাহিত্যে সমাজ-চেতনা কি এর চাইতেও প্রখর হতে পারে?

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল বাংলাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ রচনাকার হলেও, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বোধ হয় তাঁর সবচাইতে বড় পরিচয় তিনি 'মহাপ্রস্থানের পথের' রচয়িতা। এ কথা অবশ্যই সত্য, এবং আশা করি তিনি নিজেও স্বীকার করবেন যে, ইতিপূর্ব্বে বহু গল্প উপন্যাস রচনা করেও যে সম্মান তিনি পাননি, এই একটি মাত্র গ্রন্থই তাঁকে সে-সম্মানের অধিকারী করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'কে' বোধ হয় ভ্রমনকাহিনী আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। তাই যদি হয় তা হলে বলা যায় অন্নদাশঙ্করের 'পথেপ্রবাসে' এবং প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে'ই প্রথম ভ্রমনকাহিনীকে সত্যিকারের সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করেছে। ইতিপূর্ব্বে বাংলাসাহিত্যে যত ভ্রমণকাহিনী রচিত হয়েছে তা শুধু ভ্রমণ ও কাহিনীই, সাহিত্য নয়। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র বহুদিন পর অনেকটা সেই ধরণের আর একটা গ্রন্থ রচনা করলেন প্রবোধকুমার 'জলকল্লোল।' কিন্তু 'মহাপ্রস্থানের পথে' থেকে এ বইটির প্রভেদ এই যে, এটা শুধু তাঁর ভ্রমণকাহিনীই নয়, এ তার স্মৃতিমন্থন। স্বপ্নের চোখে ফিরে তাকিয়েছেন তিনি নিজেরই অতীত দিনগুলির দিকে। পেছনের সে দিনগুলি মোহময়, কি এক মমতায় ভরা; মরে-যাওয়া, জীবনের গতিপথে হারিয়ে-যাওয়া কত অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের

স্পর্শময় সে দিনগুলি! প্রবোধকুমারের ভাষায় যে উচ্ছলতার উল্লেখ আমি করেছি, তা যেন এখানে অবাধ গতিতে মুক্তি পেয়েছে—স্বপ্নাতুর দৃষ্টির সঙ্গে এসে মিশেছে হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগ, বহুদিনের মূক ভাষা যেন অবারিত হয়ে গেল তাই। 'যত দূর যাই' বইটিও এই একই হৃদয়ানুভূতির উৎসারিত সাহিত্যরূপ, তাই এখানেও সে-ভাষা সে-বর্ণনা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়ে যায়নি। কিন্তু এ-বই দুইটির বিচার এখানেই সম্পূর্ণ নয়। প্রসঙ্গত যে সব চরিত্রের উল্লেখ তিনি করেছেন, তাদের একান্তভাবে নিজস্ব রূপেই তিনি প্রকাশ করেছেন—নিজের জীবনের ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রবোধকুমার কল্পনা মিশিয়ে শুধু একটি কাহিনীই বর্ণনা করে যেতে চেষ্টা করেন নি। তাই রবিকে ভোলা যায় না, ভোলা যায় না স্বামীসোহাগবঞ্চিতা লাবণ্যর মর্ম্মন্তুদ কান্নাকে—মা আর দিদিমার স্নেহস্নিগ্ধ মুখদুটি তাই বারবার মনকে বিহ্বল করে তোলে। আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখলে মনে হয়, উত্তর জীবনে যে প্রবোধকুমার 'মহাপ্রস্থানের পথে' রচনা করেছিলেন, তার প্রস্তুতির বীজ যেন লুকিয়েছিলো এই 'জলকল্লোলে', আর তাঁর সাহিত্যের পথকেই যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে তাঁর কৈশোর ও-যৌবনের পথ 'যত দূর যাই'।

অনিল চক্রবর্ত্তী।

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত যাঁহাদের ষান্মাসিক চাঁদা শেষ হইয়া গেল, পুনরায় পূর্ব্বাশার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের চাঁদা ২০শে আশ্বিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। চাঁদা বা কোনোরূপ নির্দ্দেশ না পাইলে আমরা কার্ত্তিকসংখ্যা পূর্ব্বাশা যথারীতি ভি পি যোগে প্রেরণ করিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ
পূর্ব্বাশা

নব অভিযান

প্রবাসী—কার্তিক
১৩৩৮

তৈলচিত্র
শিল্পী : বাকু হালদার

সূচীপত্র

শারদীয়া পূর্ব্বাশা

কার্ত্তিক—১৩৫৪

দশম বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা

কার্ত্তিক • ১৩৫৪

বৌদ্ধ ও ভাগবত ধর্ম

প্রবোধচন্দ্র সেন

গৌতম বুদ্ধ যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি একথা সর্ববাদিস্বীকৃত। এ বিষয়ে পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেরই এক মত। এমন কি বুদ্ধভক্তদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে সমস্ত দুঃখের ত্রাণকর্তা বলে মনে করেন তাঁরাও তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকনামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধকে 'দেবাতিদেব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় নেই। যীশু এবং মুহম্মদের অনুগামীরাও তাঁদের ধর্মগুরুকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেই মনে করেন। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ভক্তগণ তাঁর মানবলীলার কথা স্বীকার করেন; তাঁর জন্ম, তাঁর পিতামাতা, তাঁর কীর্তিক্ষেত্র মথুরা প্রভৃতি স্থানের কথা শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেন। কিন্তু তথাপি তাঁরা তাঁকে ঠিক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করেন না এবং তাঁদের মতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁর জীবনচরিত ও ধর্মমতের আলোচনা নিরর্থক, কারণ তাঁদের বিশ্বাস 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন; বিষ্ণু, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এবং মহাভারতে তিনি ঈশ্বর বলেই স্বীকৃত হয়েছেন। এ সব কারণে ঐতিহাসিকগণ অনেকেই কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জনসাধারণের কল্পিত পুরুষ

বলেই মনে করতেন। কিন্তু অধিকতর গবেষণার ফলে অধুনা তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয়েছে। কৃষ্ণ যে একজন মানুষমাত্র ছিলেন এই বিশ্বাসের স্মৃতি মহাভারত থেকেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। দৈব ও পুরুষকার প্রসঙ্গে তিনি অর্জুনকে বলছেন,

অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।
দৈবন্তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন॥

—উদ্যোগপর্ব ৭৯.৫-৬

'পুরুষকারের দ্বারা যা সাধ্য আমি তাই করব, কিন্তু দৈব কর্ম করবার শক্তি আমার কিছুমাত্র নেই।' এই উক্তিটি সেই যুগেরই স্মৃতি বহন করছে যখন কৃষ্ণের উপরে দেবত্ব আরোপিত হয়নি। বৌদ্ধ ঘটজাতকে এবং জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে কৃষ্ণ মানুষরূপেই বর্ণিত হয়েছেন। উভয়ত্রই তাঁকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। আরও পূর্ববর্তী ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭।৬) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষির শিষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দেবকীপুত্র বাসুদেব এবং ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব কৃষ্ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তা পাতঞ্জল মহাভাষ্য এবং ঘটজাতকের সাক্ষ্য প্রভৃতি নানা যুক্তিতেই প্রমাণিত হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে খ্রী-পূ ৬০০ অব্দের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। সুতরাং দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যে গৌতম বুদ্ধের (খ্রী-পূ ৫৬৮-৪৮৫) পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ ঘটজাতক এবং জৈন সাহিত্যের সাক্ষ্যেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। জৈন মতে কৃষ্ণ ছিলেন দ্বাবিংশ তীর্থংকর অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের (খ্রী-পূ নবম শতক) সমকালীন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই দুই মহাপুরুষের প্রভাব অপরিসীম। তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের বিকাশ ও পরিণামের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য নিধৃত হয়ে আছে। কৃষ্ণপ্রবর্তিত ধর্ম প্রথমে সাত্বত, পরে ঐকান্তিক বা ভাগবত এবং সর্বশেষে বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে। এই ধর্মের আবির্ভাব হয় বুদ্ধের বেশ কিছু কাল পূর্বেই এবং আজও ভারতীয় জনসাধারণের উপরে এ ধর্মের প্রভাব অপরিমেয়। বস্তুত ভারতীয় চিন্তা- ও জীবন ধারার উপরে এ ধর্মের যে প্রভাব, তার সঙ্গে শৈব শাক্ত প্রভৃতি আর কোনো ধর্মেরই তুলনা হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে তার কিছুমাত্র প্রভাব নেই।[১] পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব কৃষ্ণের পরবর্তিকালীন হলেও তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম বর্তমান কালে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, অথচ ভারতবর্ষের বাইরে তার

প্রভাবের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। ভাগবত ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবগত এই পার্থক্যের কারণ ঐতিহাসিকগণের পক্ষে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীর চিন্তা ও জীবনাদর্শকে যুগ যুগ ধরে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এখনও করছে। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক সময়ে মৈত্রীর পতাকা নিয়ে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মই ছিল তার প্রধান সহায়, ধর্মবিজয়ী অশোক ছিলেন তার প্রধান সারথি এবং কাশ্যপ মাতঙ্গ, কুমারজীব, গুণবর্মা, দীপংকর প্রভৃতি ছিলেন তার মহানায়ক। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের সর্বজনীন মৈত্রীর আদর্শই ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বজগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের বিশ্ববিজয়-অভিযানের সর্বপ্রধান সহায় ছিল এবং যার প্রভাবে বহির্জগতে ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা, সেই পরম বন্ধুই তার স্বদেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে। কেন এরকম হল? এটা শুধু যে ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান সমস্যা তা নয়, এটা পৃথিবীর ইতিহাসেরও একটি পরম ঔৎসুক্যের বিষয়। এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা এখনও হয়নি, অথচ এই প্রশ্নের সংশয়াতীত মীমাংসা না হলে ভারতীয় ইতিহাসের একটা মুখ্য অংশই অনালোকিত থেকে যাবে। অথচ একথা সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম তার স্বদেশ থেকে বিলুপ্ত হবার ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য বর্তমান প্রবন্ধে এই বৃহৎ প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ বিষয়েব একটিমাত্র দিক্ দিয়ে সামান্য আলোচনা করাই এর উদ্দেশ্য।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মই যে সর্বপ্রধান তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বহির্জগতে ভারতীয় ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মই সব চেয়ে প্রভাবশালী, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের কোনো প্রতিপত্তিই নেই বলা চলে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবই সর্বাধিক, বৌদ্ধ ধর্মের স্থান অতি নগণ্য। এই তথ্যটি থেকেই এই দুই ধর্মের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণপ্রবর্তিত ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম উৎপত্তিকালের হিসাবে পূর্ববর্তী হলেও মৌর্যসম্রাট্ অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্মই সর্বপ্রথমে হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত সমস্ত দেশে বিস্তার লাভ করেছিল, ভাগবত ধর্ম তখনও মথুরা অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূভাগেই আবদ্ধ ছিল। অশোকের মতো পৃষ্ঠপোষকের অভাবেই ভাগবত ধর্ম আশু প্রসার লাভের সুযোগ পায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে পরমভাগবত গুপ্তসম্রাট্গণের আমল থেকেই এই ধর্ম দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ পায় এবং এই সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এই যুগেই চীন দেশ থেকে ফা হিয়ান, হিউএন্‌সাঙ্, ইৎসিঙ্-প্রমুখ বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক তীর্থপরিক্রমা উপলক্ষ্যে এদেশে আসেন। কিন্তু সে

সময়ে কাশ্যপ মাতঙ্গ, কুমারজীব, গুণবর্মা প্রমুখ বৌদ্ধ মহানায়কদের যুগ অবসিতপ্রায়, বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবও সে সময়ে মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে গিয়েছে। ফা হিয়ান (পঞ্চম শতক) হিউএনসাং (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) এবং ইৎসিঙের (সপ্তম শতকের শেষার্ধ) বিবরণের তুলনা করলেই সে যুগে ভারতীয় জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমক্ষীয়মাণ প্রভাবের ধারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। একই সময়ে এক ধর্মের প্রভাববৃদ্ধি ও অন্য ধর্মের প্রভাবহ্রাস, এর থেকেও ওই দুই ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুমান করা অসংগত নয়। বস্তুত ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ কি প্রথমেই সে বিষয়ে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন।

কৃষ্ণ ও বুদ্ধ উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁদের প্রবর্তিত ধর্ম দুটিও মূলত ছিল বেদ- ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরোধী। 'বেদবাদরত' ব্রাহ্মণগণ তাই এই দুই ধর্মের কোনোটির উপরেই প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবত অশোকের রাজত্বকালেই বৌদ্ধ ধর্মের চরম অভ্যুদয়ের যুগে ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। তখনই কৃষ্ণ বৈদিক দেবতা নারায়ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকৃত হন এবং তারই ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাগবত ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধিত হয়। তাই ভাগবত ধর্ম একদিকে বৌদ্ধ ও অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করে স্থায়িত্ব লাভের সুযোগ পেয়ে গেল। নতুবা ভাগবত ধর্মকেও সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মেরই মতো জন্মভূমি থেকে নির্বাসন দণ্ড লাভ করতে হত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জৈন ধর্মও মূলত বেদ- ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপস করার ফলে এই ধর্মটি আজও কোনো ক্রমে টিকে আছে। বৌদ্ধ, আজীবিক প্রভৃতি অন্যান্য যেসব ধর্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয়নি, ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের টিকে থাকাও সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম বেদের প্রামাণিকতা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ

'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার।'

এই হচ্ছে ওধর্মের মূলকথা। অন্যান্য যেসব ধর্ম এই দুটি বিষয় মেনে নিয়েছে সেগুলি বিলুপ্তি বা নির্বাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বহির্জগতের অধিবাসীদের পক্ষে বেদ ও ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকারের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপসরফা হবার পরে ভাগবত ধর্মের পক্ষে বহির্জগতে বিস্তারলাভের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে হাত মেলাতে সম্মত না হওয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষে

বহির্জগতের দ্বার উন্মুক্ত রইল বটে, কিন্তু জন্মভূমিতে বেঁচে থাকার ছাড়পত্রই মিলল না।

যাহোক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি লাভের ফলে ভাগবত ধর্মের ভাগ্যে শুধু যে স্থায়িত্বের সনদই মিলল তা নয়, তার ফলে নব রূপ লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাকে নূতন কর্তব্যের দায়িত্বও নিতে হল। এখন থেকে তার নূতন কর্তব্য হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্মাবৃত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'Henceforth Bhagavatism, or as it may now be called by its more popular form Vaishnavism, formed with Saivism, the main plank of the orthodox religion in its contest with Buddhism.'[১] অর্থাৎ, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়কর্তৃক বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলে স্বীকৃত হবার ফলে কৃষ্ণপ্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম নামে সুপরিচিত হয় এবং তার পর থেকেই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়ায় এই ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম তথা শৈব ধর্ম।

বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণস্বীকৃত ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের কার্যকলাপের সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমেই বলা উচিত, ভারতবর্ষে ধর্মসম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক বিরুদ্ধতা কখনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আকার ধারণ করেনি। কখনও কখনও তা সুস্পষ্ট নিন্দাবাদ বা যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষের মতখণ্ডনের রূপ নিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তা প্রতিদ্বন্দ্বীর পরোক্ষ শক্তিহরণেই নিয়োজিত হয়েছে। এই শক্তিহরণের কৌশল অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। বিরুদ্ধ মতবাদের শ্রেষ্ঠাংশগুলি আত্মসাৎ করা, নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা তার রূপান্তরসাধন, অনুবর্তীদের নিকট নিজ পন্থার আপেক্ষিক সহজসাধ্যতা প্রতিপাদন প্রভৃতি এই বিচিত্র কৌশলের অন্তর্গত। ভাগবত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের শক্তিহরণে যে সব উপায় অবলম্বন করেছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাতের চেষ্টা করা যাক। পূর্ববর্তী কোনো কোনো প্রবন্ধে এ বিষয়ে অল্পাধিক আলোচনা করেছি।[২] তাই বর্তমান প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই সমাপ্ত করব।

প্রতিপক্ষকে সংগ্রামে পরাভূত করবার একটা উপায় হচ্ছে সদৃশ শস্ত্রের প্রয়োগ। সকলেই জানে যে বুদ্ধকে সম্মান করে বলা হত 'ভগবান্', ভগবান্ মানে ঈশ্বর নয়। কৃষ্ণও ভগবান্; ক্রমশঃ একমাত্র তাঁকেই ভগবান্ বলে চালানো হয়, ফলে এই বিশেষণটির সঙ্গে কৃষ্ণ নামটির প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠল, যেমন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', ভাগবত ধর্ম মানে কৃষ্ণপ্রবর্তিত ধর্ম। কালক্রমে কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপণের ফলে ভগবান্

১ *Ancient Indian History and Civilisation* পৃ ২২৯।

২ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ও ভাগবত ধর্ম—বিচিত্রা ১৩৪৪ ভাদ্র; বাসুদেব কৃষ্ণ ও গীতা—পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ; ধর্মবিজয়ী অশোক গ্রন্থ ১৩৫৪ পৃ ৯২-৯৪।

কথাটি ঈশ্বরেরই প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়াল। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই কথাতেও ভগবান্ নামের উপরে কৃষ্ণের একচেটিয়া অধিকার এবং তাঁর ঈশ্বরত্ব এই দুইই সূচিত হয়। এই ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমাবৃদ্ধির আড়ালে ভগবান্ বুদ্ধের মানবিক চরিত্রগৌরব ম্লান হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্ম মুখ্যতঃ ভিক্ষুধর্ম অর্থাৎ সন্ন্যাসের ধর্ম, আর বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ হল পীতবর্ণ। ভাগবত ধর্ম সন্ন্যাসবিরোধী, অথচ ভগবান্ কৃষ্ণ যে কখন 'পীতাম্বর' হয়ে গেলেন তা কে জানে? ক্রমে পীতাম্বর বলতে কৃষ্ণকেই বোঝাতে লাগল, স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নয়। এটা একটু আশ্চর্য নয় কি? সারনাথে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' নামে পরিচিত। বস্তুত ধর্মচক্র কথাটি বুদ্ধের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে। অশোকনির্মিত সারনাথস্তম্ভে উৎকীর্ণ চক্রটি বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মেরই প্রতীক, অধুনা এই চক্রটিই আমাদের জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্থলে স্থান পেয়েছে। যাহোক, বুদ্ধের এই ধর্মচক্রের ন্যায় কৃষ্ণেরও একটি চক্র অবশ্যই চাই। সুতরাং অচিরেই কৃষ্ণ (তথা বিষ্ণুর) হাতেও একটি চক্র দেওয়া হল, তার নাম সুদর্শন চক্র এবং কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বহু নামের অন্যতম হল চক্রধর বা চক্রপাণি। ক্রমশঃ বুদ্ধচক্র বিস্মৃত হয়ে গেল এবং বিষ্ণুচক্রই জনচিত্তকে অধিকার করে বসল। লক্ষ্য করার বিষয়, এই চক্রের প্রধান কর্তব্যই ছিল প্রতিপক্ষের পরাভব-সাধন; এই পরাভব যে সব সময় অহিংস উপায়েই সাধিত হত তাও নয়, তার সাক্ষী শিশুপাল। ধর্মচক্রপ্রবর্তনের ভাবটিও ভাগবত সাহিত্যে দেখা যায়; কিন্তু ভাগবত ধর্মচক্রের রূপ বৌদ্ধ ধর্মচক্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমন কি তার বিরোধী। গীতায় এক স্থলে (৩।৯-১৫) মানুষের জীবনে যজ্ঞানুকূল কর্মের আবশ্যকতা দেখাবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ' এবং 'ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'—কর্ম থেকে যজ্ঞের উৎপত্তি এবং ব্রহ্ম নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। জীব, কর্ম, যজ্ঞ, বেদ ও ব্রহ্মের পর্যায়ক্রমিক সম্পর্কের কথা বুঝিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে—

> এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
> অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥
>
> —গীতা ৩।১৬

'এইভাবে প্রবর্তিত ধর্ম-চক্রকে যে অনুবর্তন করে না সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপাত্মা বৃথাই জীবন ধারণ করে।' অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞকর্মময় চক্রের অনুবর্তন না করে যারা অন্য ধর্মচক্রের অনুসরণ করে তাদের জীবনই বৃথা। বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মচক্র ছিল বেদ ও যজ্ঞকর্মের বিরোধী, কিন্তু কৃষ্ণপ্রবর্তিত ধর্মচক্র স্পষ্টতই বেদ ও যজ্ঞের অনুকূল। এস্থলে

বলা প্রয়োজন যে, গীতা বুদ্ধের, এমন কি অশোকেরও পরবর্তী কালের গ্রন্থ একথা মনে করবার হেতু আছে।

বুদ্ধের উপদেশসমূহ যে গ্রন্থে বিশেষভাবে সংকলিত হয়েছে তার নাম 'ধম্মপদ'। আর গীতার বাণী মূলতঃ কৃষ্ণেরই মুখনিঃসৃত এ বিশ্বাস সুপ্রচারিত। কিন্তু গীতার রচনা-কাল ধম্মপদের পরবর্তী এবিষয়ে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। যাহোক, ধম্মপদের উপদেশের সঙ্গে গীতার উপদেশের তুলনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। এস্থলে দুএকটি-মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; আশা করি তাতেই একথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। ত্রিপিটক থেকে জানা যায় ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর শেষ উপদেশে সকলকেই বলেছিলেন আত্মাশ্রয়ী ও ধর্মাশ্রয়ী হতে এবং অন্য কারও শরণভিক্ষা না করতে।

অত্তদীপা অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা বিহরথ,
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।

—দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বানসুত্তন্ত

অর্থাৎ, 'আত্মার (মানে নিজের) ও ধর্মের আলোতে পথ দেখে অগ্রসর হও, আত্মা ও ধর্ম ছাড়া আর কারও শরণ নিও না।' ধম্মপদেও ঠিক এই উপদেশই পাওয়া যায়।

অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং॥

—ধম্মপদ ১২।৪

'আপনিই আপনার আশ্রয়, তা ছাড়া অন্য আশ্রয় আর কে হতে পারে? আপনাকে সুসংযত করলেই দুর্লভ শরণলাভ হয়।' গীতাতেও অনুরূপ উক্তি আছে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

গীতা ৬।৫ ৬

অর্থাৎ, 'নিজেকে কখনও অবসন্ন করবে না, বরং নিজেই নিজের উদ্ধারসাধন করবে; কেননা প্রত্যেকে নিজেই নিজের বন্ধু তথা নিজেই নিজের শত্রু। যে নিজেকে জয় (অর্থাৎ সংযত) করতে পারে সে নিজেই নিজের বন্ধু হয়, কিন্তু যে তা পারে না সে নিজেরই শত্রুতা করে।' বলা বাহুল্য গীতার এই উক্তি ধম্মপদবাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যামাত্র।

ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর অনুবর্তীদের বলেছিলেন অন্য কারও শরণাপন্ন না হয়ে একমাত্র নিজের ও ধর্মের শরণ নিতে (অত্তসরণা ধম্মসরণা বিহরথ)। কিন্তু পরবর্তী কালের বৌদ্ধরা

তাতে তৃপ্ত হয়নি, তারা নিজেকেই নিজের শরণস্থল বলে মানতে ভরসা পায়নি। তাই উত্তরকালীন বৌদ্ধদের মন্ত্র হল—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

প্রতিযোগী ভাগবত সম্প্রদায় কিন্তু এই ত্রিশরণের পরিবর্তে একটিমাত্র শরণের আশ্বাস দিয়ে জনসাধারণের দুর্বল চিত্তকে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হল। ভগবান্ কৃষ্ণের মুখে তাই এই বিখ্যাত উক্তিটি বসানো হল—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
—গীতা ১৮।৬৬

'অন্য সব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও, আমিই তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব।' এই উক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে একমাত্র পরিত্রাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস সুস্পষ্ট।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হেলিওডোরাস নামে তক্ষশিলাবাসী একজন 'ভাগবত' যবন মহারাজ এনটিআলকিডাসের রাজদূতরূপে শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাগভদ্রের রাজধানী বিদিশানগরীতে আসেন। এই নগরীতে তিনি স্বীয় উপাস্য 'দেবদেব বাসুদেবে'র উদ্দেশ্যে একটি গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করান। এই ধ্বজস্তম্ভের গাত্রে তিনি তাঁর নবগৃহীত ধর্মের মূলমন্ত্রটিও উৎকীর্ণ করান। সেটি হচ্ছে এই—

তিনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ।

'দম ত্যাগ অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতপদ সুঅনুষ্ঠিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়।' ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি আছে।[৩] যথা—

দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ।
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো মানসে রথে।
ত্যক্তা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥
—স্ত্রীপর্ব ৭।২৩-২৪

'দম ত্যাগ অপ্রমাদ, এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব; যিনি শীলরূপ রশ্মি নিয়ে (এই তিন অশ্বযুক্ত) মানস রথে আরোহণ করেন তিনি মৃত্যুভয় ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) গমন করেন।' বলা বাহুল্য এটি হেলিওডোরাসের দীক্ষামন্ত্রের বিস্তৃত ভাষ্যমাত্র। গীতায় আছে—

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্॥ —গীতা ১৬।১-২

৩ *Studies in Indian Antiquities* পৃ ২০-২১।

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে ঘোর আঙ্গিরস দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল এই নীতিগুলি—

তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনম্।

—ছান্দোগ্য ৩।১৭।৪

বলা বাহুল্য মহাভারত ভাগবত সাহিত্য বলেই স্বীকৃত। মহাভারতের অন্তর্গত গীতা তো স্পষ্টতই কৃষ্ণের বাণী বলে কথিত। আর ছান্দোগ্য উপনিষদের এই নীতিগুলিও ভাগবত শিক্ষার মৌলিক অংশ বলেই স্বীকার্য। লক্ষ্য করার বিষয়, এই মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে হেলিওডোরাসের তিনটি অমৃতপদের একটিও নেই। গীতার উদ্ধৃত অংশে দম ও ত্যাগ আছে, কিন্তু অপ্রমাদ নেই; অবশ্য অন্যত্র (১৪।১৭) অপ্রমাদের পরোক্ষ উল্লেখমাত্র আছে। অথচ ধম্মপদ গ্রন্থের একটি অধ্যায়েরই নাম 'অপ্রমাদবর্গ'। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি হচ্ছে এই।—

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।

অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥

—ধম্মপদ ২।১

'অপ্রমাদ অমৃতলাভের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যারা অপ্রমত্ত তারা মরে না, যারা প্রমত্ত তারা মৃতেরই তুল্য।' এই অধ্যায়েরই পঞ্চম শ্লোকে অপ্রমাদের সঙ্গে দমও উল্লিখিত হয়েছে—'উট্‌ঠানেনপ্পমাদেন সংযমেন দমেন চ'; আর দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে অপ্রমাদরত ব্যক্তি নির্বাণের নিকটবর্তী হন। বিদিশালিপি ও স্ত্রীপর্বোক্ত নীতিগুলির সঙ্গে ধম্মপদের অপ্রমাদবর্গের তুলনা করলে মনে হয় বৌদ্ধ আদর্শই এস্থলে উত্তমর্ণ। বিদিশালিপি ও ধম্মপদ, উভয়ত্র একই 'অমৃতপদ' কথার ব্যবহারে এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে সমর্থিত হয়।

ভাগবত ধর্মোক্ত নীতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নীতির তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও গীতার উদ্ধৃত নীতিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে অহিংসা। ভাগবত ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই অহিংসানীতিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধদের দ্বারা এই নীতির যেমন ব্যাপক প্রচার হয়েছে, ভাগবতদের দ্বারা তা হয়নি। বরং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কালক্রমে এই অহিংসানীতির অত্যন্ত অবাঞ্ছিতরকম অর্থবিকার ঘটেছে। অন্যত্র[৪] এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। গীতোক্ত নীতিগুলির মধ্যে আর একটি হচ্ছে 'অক্রোধ'। ছান্দোগ্য উপনিষদে এটির স্থান

৪ 'ধর্মবিজয়ী অশোক' পৃ ২৬-২৭।

নেই, অথচ ধম্মপদের একটি অধ্যায়েরই নাম 'অক্রোধবর্গ'। তাই অনুমান হয় অক্রোধ নীতিটি মূলত একটি বৌদ্ধ নীতি। বস্তুত বৌদ্ধ আদর্শ মতে অহিংসা ও অপ্রমাদের পাশেই অক্রোধের স্থান।

লক্ষ্য করার বিষয় গীতোক্ত নীতিগুলির মধ্যে 'যজ্ঞ'ও একটি। বৌদ্ধ ধর্ম স্পষ্টতই যজ্ঞের বিরোধী। দ্বাদশ শতকেও জয়দেব বুদ্ধ সম্বন্ধে বলেছেন, 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্', অর্থাৎ তুমি বেদসম্মত যজ্ঞবিধির নিন্দা কর। ছান্দোগ্য উপনিষদেও কিন্তু যজ্ঞের রূপকার্থ স্বীকার করে বেদসম্মত সাধারণ যজ্ঞবিধির পরোক্ষ প্রতিবাদই করা হয়েছে। গীতাতে যজ্ঞ সম্বন্ধে একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্থলে বেদবাদরত ব্রাহ্মণ, ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদ এবং ক্রিয়াবিশেষবহুল যাগযজ্ঞের নিন্দাই করা হয়েছে (২।৪২-৪৫); কোনো কোনো স্থানে (চতুর্থ অধ্যায়) যজ্ঞের রূপকার্থ স্বীকার করে সাধারণ যজ্ঞের নিকৃষ্টতামাত্র জ্ঞাপিত হয়েছে। যথা—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ॥ ৪।৩৩

কিন্তু অন্য নানা স্থানে সাধারণ যাগযজ্ঞকে সুস্পষ্ট ভাবেই সমর্থন করা হয়েছে। গীতার পূর্বোদ্ধৃত নীতিতালিকায় দান এবং দমের পরেই যজ্ঞের স্থান দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে (৯-১৬ শ্লোক) যজ্ঞকে ধর্মসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক স্থলে বলা হয়েছে,

ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩।১৫

তাতেও নিরস্ত না হয়ে যজ্ঞবিরোধীদের সম্বন্ধে অতি রূঢ় ভাবেই বলা হয়েছে,

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্্ক্তে স্তেন এব সঃ॥

—গীতা ৩।১২

'দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ দান করবেন; এই দেবপ্রদত্ত বস্তু দেবগণকে না দিয়ে যে নিজে ভোগ করে সে তো চোর।' এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ভগবান্ বুদ্ধ যজ্ঞের, সুতরাং দেবগণের উদ্দেশ্যে ভোগ উৎসর্গেরও, বিরোধী ছিলেন। অতএব গীতার আদর্শ অনুসারে তিনি চোর বলে নিন্দিত হবার পাত্রই ছিলেন। তাই গীতার এই শ্লোকটি বুদ্ধ সম্বন্ধে রামায়ণের একটি কটূক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।—

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি॥

—অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯।৩৪

বৌদ্ধ ধর্ম মুখ্যত সন্ন্যাসের ধর্ম, তাই এ ধর্মে বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় এ ধর্মের উপরে প্রসন্ন ছিল না। বিশেষত সন্ন্যাস লোকস্থিতির সহায়ক নয়। তাই গীতায় সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বেশ প্রবলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অর্জুনকে নৈষ্কর্ম্য থেকে নিবৃত্ত করে কর্মে প্রেরণা দেওয়াই গীতার মূলকথা। আরও একটা কথা এস্থলে উল্লেখ করা যায়। বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় সম্রাট্ অশোক কলিঙ্গজয়ের পরে নিজে তো যুদ্ধ ত্যাগ করলেনই ভাবী বংশধরদের জন্যও একটা যুদ্ধবিরোধী আদর্শস্থাপনে চেষ্টিত হলেন। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ এটাকেও সমর্থন করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য সমাজকে চিরকালই সংগ্রামপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের আনুকূল্য করতেই দেখি। বৈদিক যুগের কথা ছেড়ে দিলেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহায়ক চাণক্যের ঐতিহ্যেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। বহু ব্রাহ্মণ নিজেও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। মহাভারত-পুরাণের ব্রাহ্মণযোদ্ধা দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম এবং ইতিহাসের ব্রাহ্মণসেনাপতি পুষ্যমিত্র-শাতকর্ণি-প্রমুখ বহু দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যায়। তাই ব্রাহ্মণসমাজে অশোকের যুদ্ধবিমুখ আদর্শের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। যুদ্ধবিমুখতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিই গীতায় মুখর হয়ে উঠেছে। কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের সূচনায় রণকুণ্ঠ অর্জুনকে যে যুদ্ধ তথা কর্মে প্রবৃত্তিদানের ভূমিকার উপরে গীতার আদর্শকে স্থাপন করা হয়েছে তা আকস্মিক বা নিরর্থক নয়।

গীতায় শুধু যে সন্ন্যাসবিরুদ্ধতা ও কর্মপ্রবৃত্তির আদর্শই স্থাপিত হয়েছে তা নয়, সন্ন্যাস ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াসও করা হয়েছে। এই সামঞ্জস্যসাধনের উপায় হচ্ছে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করা। 'কর্মণ্যেবাধিকারোস্তে মা ফলেষু কদাচন' প্রভৃতি গীতার বহু উক্তিতেই একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন নিষ্কাম কর্মের আদর্শ গীতাতেই যে প্রথম প্রচারিত হল তা নয়। তার সূচনা হয়েছিল আগেই। বৌদ্ধ ধর্ম যে কয়েকটি মূলনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার একটি হচ্ছে এই যে, তৃষ্ণাই সমস্ত দুঃখের উৎস এবং তৃষ্ণা ত্যাগেই দুঃখের অবসান ঘটে। এই তৃষ্ণা মানেই কামনা বা ফলাকাঙ্ক্ষা। প্রশ্ন উঠল তৃষ্ণা ত্যাগ করলে কর্মের প্রবৃত্তিই থাকবে না, তখন কর্তব্য কি? এক উত্তর এই যে, নির্বাণ বা মোক্ষ-লাভের জন্য কর্মও ত্যাগ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত সন্ন্যাসেরই অনুকূল। বৌদ্ধ ধর্মে এদিকে ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু তাও একান্ত সত্য নয়। বৌদ্ধ ধর্মের, বিশেষভাবে অশোকপ্রমুখ বৌদ্ধগণের কার্যকলাপের, ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম

একান্তভাবেই কর্মবিমুখ নয়। তা যদি হত তাহলে বৌদ্ধদের পক্ষে দেশে বিদেশে জনহিতসাধন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠান সম্ভব হত না। অশোকের অনুশাসনে দেখি তিনি নিজে তো একজন অক্লান্ত কর্মী ছিলেনই, প্রজাদেরও আলস্য ত্যাগ করে নিত্য কর্মরত হতেই উপদেশ দিতেন। তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় স্বার্থবুদ্ধির নামই তৃষ্ণা এবং স্বার্থবুদ্ধিহীন কল্যাণকর কর্ম করাই আসল বৌদ্ধ আদর্শ। ধম্মপদ গ্রন্থে বিশেষত তার 'তহ্বাবগ্‌গ' (মানে তৃষ্ণাবর্গ) অধ্যায়ে এই আদর্শই কার্যত বিবৃত হয়েছে। ধম্মপদের 'বীততহ্ব' এবং গীতার 'বীতরাগ' মূলতঃ একই। ধম্মপদে 'অনাসক্তি'র উপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ভোগতৃষ্ণা বর্জন করে অনাসক্তভাবে কর্মসাধনই আসল বৌদ্ধ আদর্শ। গীতায় এই আদর্শই আরও বিশদভাবে বিবৃত এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুকূলে ব্যাখ্যাত হয়েছে মাত্র।

বৌদ্ধ ও ভাগবত ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় অধিকতর অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি এই আলোচনাটুকু থেকেই বৌদ্ধদের সঙ্গে ভাগবত সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ বিরুদ্ধতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে। জানি এই প্রবন্ধে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিতর্ক উত্থাপনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা সত্ত্বেও আমার মূলবক্তব্যের সত্যতা স্বীকৃত হবে বলেই বিশ্বাস করি। এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক উত্থাপনের দ্বারা যদি সত্যনির্ণয়ের পথ উন্মুক্ত হয় তাহলে সেটাকেই পরম লাভ বলে মনে করব।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একত্রিশ

খবরটা সাংঘাতিক।

ট্রেন ছাড়লে পর আবার খবরটা পড়ল তামসী। আরো একবার। বহুবার।

শুধু সাংঘাতিক নয়, ঘৃণাকর। অথচ ঘৃণা-লজ্জার আগে প্রথমেই লাগল কষ্টের মত, আঘাতের মত। মনে হল সাংঘাতিক।

রণধীর ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে জেল থেকে। বেরিয়ে এসে নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারেনি একজায়গায়। আবার জেলে যাবার জন্যে ছটফট-ছটফট করেছে। কেউ তার ছিলনা যে আঁচলের হাওয়ায় তাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাখে। মুখটাকে এ-কাৎ থেকে ও-কাৎএ ফিরিয়ে দেয়।

অনেক রকম চুরি-জোচ্চুরির কথা শুনেছে তামসী। চেকে সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়া ব্যাঙ্ক থেকে, ফার্মের এজেন্ট সেজে ভুয়ো মালের ওজরে টাকা নিয়ে চম্পট দেয়া, সোনা বেচতে এসে পেতল গছিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া। আরো কত কি। ডাকাতির জুলুম আছে এমন কিছু-বা না-ই সে ভাবতে পারত। কিন্তু চুরির মধ্যেও তো চেহারার ইতরবিশেষ আছে। সেই যে প্রথমে একটা আস্তানা খুলে বসেছিল বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি জোগাড় করে দেবে, নাম-রেজিষ্টারির ফি বাবদ চাঁদা নিত দশ টাকা করে, সেই প্রবঞ্চনার মধ্যেও বা কিছু কৌলীন্য ছিল। কিন্তু এ কী অমিশ্র কদর্যতা !

রণধীর এক গণিকাকে মদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে তার গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে। কিন্তু নিসুপ্ত মধ্যরাত্রি হলেও পালাতে পারেনি। মেয়েটার কষ্টকর গোঙানির শব্দে চূড়ান্ত মুহূর্তে জেগে পড়ে আর-আর প্রতিবাসীরা। ধরে ফেলে রণধীরকে। প্রথমে হাজতে পোরে, শেষকালে এখন জেলে পুরেছে।

আবার জেল। পাষাণের চেয়েও পাষাণ সেই পাথরের দেয়াল! আবার সেই মুক্তির জন্যে দিন গোনা।

সেদিন সেই রাত্রে গা থেকে গয়নাগুলি যদি খুলে না রাখত তামসী, তা হলে কী হত? হয়ত অনেক আদর-আহ্বানের পরে তাকে মদ খেতে দিত রণধীর। রণধীর নিজের হাতে তুলে ধরলে হয়তো সে অমত-আপত্তি করত না। ছি-ছি, মদ পেত কোথায় রণধীর? মদ না পেত, বলত, চিনির সরবৎ করে দাও একটু। খাওয়া-দাওয়ার পরে হলে বলত, শাদা একটা সোডা আনিয়ে দাও, গরহজম হয়েছে। অগোচরে পানের মধ্যপথে কখন একসময় বিষ মিশিয়ে দিত। তারপর আদর-আহ্বানের অতিশয়তার এক ফাঁকে তাকে অনুরোধ করত—তুমি খাবেনা একটুও? দ্বিরুক্তি করত না তামসী, পীতাবশিষ্টটুকু খেয়ে ফেলত এক চুমুকে। খেয়েই ঢলে গলে পড়ত বিছানায়। রণধীর খুঁটে খুঁটে প্রত্যেকটি অঙ্গ বেছে-বেছে খুলে নিত গয়না। অব্যক্ত যন্ত্রণার এতটুকু একটা শব্দ বেরুত না তার মুখ থেকে চিররাত্রির অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ভাগ্যিস গা থেকে খুলে রেখেছিল গয়নাগুলো। ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভোর হয়ে। ভাগ্যিস তার চুরির পথটা প্রশস্ত করে রেখেছিল। নইলে—

সাপের মত একটা পিচ্ছিল আতঙ্ক তামসীর বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল। যতই কেননা লাঞ্ছনা-লজ্জা হোক, সে কি মরতে চায়?

অকপট অপমানের মত মনে হল তার শরীরটাকে। নির্মল নিরাভরণতায় সেদিন সে নিরাবরণের নিমন্ত্রণ রেখেছিল। ঘুমের সমর্পণের মাঝে বা আকস্মিক অভিঘাতের প্রত্যাশা! সেই প্রত্যাশাটা এখন মনে হতে লাগল মুখের উপরে কুৎসিত কশাঘাতের মত। একটা যদি কোথাও আয়না পেত তামসী, নিজের মুখটা একবার দেখত। ধিক্কার-বিকৃত কণ্ঠে জিগগেস করত নিজেকে, এখনো তোমার সাধ মিটল না? মদই খাবে, বিষ খাবেনা মদের সঙ্গে?

বিষ-নীল মুখটা একবার এখন দেখত সে দর্পণে।

কী দেখত?

দেখত, সে-ই সেই পথপ্রান্তের গণিকা। লুণ্ঠিতা, সর্বাপহৃতা। বিশ্বাস করে যাকে গৃহে, অন্তরে, সর্বভুবনে আশ্রয় দিয়েছিল সেই সর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে গেল এক নিমেষে। আর এ তোমার শুধু বিত্ত-ভূষণ চুরি করল না, চুরি করল তোমার আগত দিনের স্বপ্ন, আগামী দিনের আশা। চুরি করল তোমার আরোগ্য-আরামের সম্ভাবনা। তোমার জীবনের প্রত্যয়।

তবে তুমি আর কী! তুমি তুচ্ছ, তুমি অকিঞ্চন। তুমি ঐ পথপ্রান্তের পণ্যাঙ্গনা।

কিন্তু ভাবো একবার ঐ নারায়ণের স্পর্ধাটা। খবরটা সংগ্রহ করে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে। যাতে একদিন তাকে ধূলায় বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করে দিতে পারে চিরজন্মের মত ব্রতনাশ হয়ে গিয়েছে তার, সে জাতিচ্যুত, স্বর্গ-স্খলিত। জলচ্ছায়ার পিছনে না গিয়ে চলে আসুক সে যজ্ঞাগ্নি-উৎসবে। যে আগুনের আরেক নাম সর্বশুচি। তার মানে আর কিছুই নয়, চেয়ে দেখ, আমি কত বেশি বিশুদ্ধাত্মা, কত বেশি বরণীয়। আমি না শুই, বরং আমার কাজ, আমার আদর্শ। আর তোমার মন যার দুয়ারে বাঁধা পড়ে আছে? সে একটা কি! নরকের কীটের চেয়েও জঘন্য। ধর্ম ছেড়ে তার চিন্তার স্পর্শটা পর্যন্ত কলুষিত। দেখবে? এই দেখ, নীল পেন্সিলে মোটা করে দাগিয়ে রেখেছি খবরটা।

সেই স্পর্ধার উত্তরে নিষ্ঠুর একটা প্রতিশোধ নেবার দুর্দাম ইচ্ছা হল তামসীর। ইচ্ছা হল সেও একটা কিছু অপকীর্তি করে বসে। জাগ্রত অক্ষরে খবরের কাগজে বেরোয় সে খবরটা। লাল পেন্সিলে মোটা করে দাগিয়ে পাঠিয়ে দেয় তা নারায়ণের কাছে। জাগ্রত চক্ষু মেলে দেখে একবার সে সেই পাপের প্রদীপ্তি। সেই জয়োল্লাস।

কিন্তু কী করতে পারে তামসী? কী তার ক্ষমতা!

আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল, উঠে তাকাল একবার বাইরে। দুঃশ্ছেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ধাবমান ট্রেন ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

না, পেল দেখতে। একটা অজানা অধঃপতনের দিকে একটা উৎপলযাত্রা। দেখুক নারায়ণ। দেখুক রণধীর। দেখুক জগৎসংসার।

'কোথায় যাচ্ছেন? কত দূর?'

মাঝরাতে জংশন-ষ্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়েছে তামসীর। সাইডিংএ পড়ে ছিল গাড়ি, লোক্যাল ট্রেন হয়ে ছেড়েছে শেষরাত্রে। টিকোতে-টিকোতে চলেছে প্রত্যেকটি ষ্টেশন ধরে-ধরে। কখন উঠেছে এ প্রশ্নকারিণী, কে জানে।

প্রশ্ন শুনে তাকাল তামসী। একটি বিধবা স্ত্রীলোক, পায়ে জুতো, ঘুরন দিয়ে ফিনফিনে কাপড় পরা। হাতে লেডিজ ব্যাগ, চামড়ার ষ্ট্র্যাপটা ঝুলছে কাঁধের উপর। কাপড়ের মত ব্লাউজও শাদা, হাতে-গলায় শাদা লেশ-এর সূক্ষ্ম কাজ করা। হাবেভাবে হাসিখুশির ঢিলেমি। ভরপুর চেহারা, যৌবনটুকু যাই-যাই করেও যেন মায়া করে থেকে যাচ্ছে। ভাটার টানে জোয়ারের শেষ জল যেমন ছলছল করে।

'কলকাতা। আপনি?'

'আমি তো কলকাতাতেই কাজ করি। এখানে এসেছিলুম দেশের বাড়িতে। মার

অসুখ, মাকে দেখতে। টাকা-পয়সা দিয়ে যেতে, চিকিৎসা-পত্রের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কাজের এমন ঝঞ্ঝাট, দুটো দিন কামাই করবার সুযোগ নেই—'

কী কাজ, জিগগেস করবে নাকি তামসী? যদি মাষ্টারনী হয়, কোনো ইস্কুলে দিতে পারে নাকি ঢুকিয়ে? নিজেরো অলক্ষ্যে নিশ্বাস পড়ল তামসীর। জেলফেরৎ দাগীকে কে দেবে ইস্কুলের চাকরী? শুধু ইস্কুলের কেন, তার জন্যে নেই কোনোই সম্ভ্রান্ত জীবিকা। নেই বিশ্বাসের স্নিগ্ধছায়া। সুতরাং জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?

'সঙ্গে কে আছে?' গায়ে পড়ে সুহাসিনীই প্রশ্ন করল।

'কেউ না।'

'জিনিসপত্র?'

'কিছু না। না, আছে, এই খবরের কাগজটা শুধু আছে। যত পচা, পুরোনো, বাসি খবর—' কাগজটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিল তামসী।

বড় অদ্ভুত লাগছে সুহাসিনীর কাছে। রহস্য-রোমাঞ্চের কাছাকাছি। পায়ে সামান্য স্যাণ্ডেল নেই, হাতে-গলায় সোনা-রুপো দূরে থাক, কাঁচ-পুঁতি নেই, এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। নিশ্চয়ই বেরিয়ে এসেছে। দেখাচ্ছে তো কুমারীর মত। তবে সঙ্গে যদি লোক নেই তবে ও চলেছে কোন সর্বনাশের অতলে? বিপদে পড়ে খালাস হবার জন্যে চোরা-হাসপাতালে যাচ্ছে না তো? অভিজ্ঞ চোখে সুহাসিনী বিঁধতে লাগল তামসীকে।

'আপনার সাহস আছে বলতে হবে। ওয়েটিংরুমে না থেকে সারা রাত সাইডিং-এর গাড়িতে ঘুমিয়ে রইলেন। একে নির্জন, তায় অন্ধকার। যদি কিছু হত?' চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফোটাল সুহাসিনী।

'যদি কিছু হত!' তামসী হাসল। 'যদি কিছু হয় তারি জন্যেই তো বসে আছি।'

বড় ভাল লাগল কথাটা। অন্তরঙ্গতা মাখানো। বেঞ্চি বদলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল সুহাসিনী।

গাড়িতে যখন এঞ্জিন লাগল তখনই প্রথম আলো জ্বলল। আর তখুনি আমি উঠলাম। তখনো বেশ খানিক রাত আছে। দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, ধারে পারে সঙ্গী-সাথী কেউ নেই। ভাবলাম ডাকি, কিন্তু কত দুঃখের পর এই ঘুমটুকু না-জানি, তাই ভেবে ডাকলাম না। ভাবলাম গায়ে হাত দিয়ে ভয় পাইয়ে দিই। হোক মেয়ে-কামরা, কিন্তু একা-একা ঘুমন্ত মেয়েছেলে দেখলে অন্ধকারে তার গায়ে হাত দেবেনা এমন সবাইকে সাধুসজ্জন না পেলে নালিশ করতে পারেন কি?

'কিন্তু ভয় করেই বা লাভ হত কি বলুন? মাঝখান থেকে ঘুমটুকু মাটি হয়ে যেত। যে পথে বেরিয়েছে তার কি পথের কণ্টককে ভয় করলে চলে?'

কিন্তু কেন এ অভিমান? কেন ভোজের ঘরে ভাত নেই? হয়েছে কী? বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গোঁয়ারতুমি করে বেরিয়ে এসেছেন নাকি?

কেন, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারেনা? সিঁথিতে সিঁদুর নেই বলে? স্বামীকেই যদি অস্বীকার করতে পারি তবে তার দেওয়া এই দাসত্বের শীলমোহরটা উড়িয়ে দিতে পারব না? বিশ্বাস করছেন না স্বামী আছে বলে? বেশ, তবে মনে করুন, চলেছি একটি স্বামীর সন্ধানে। মনের মানুষের তালাসে।

মনে-মনে মনমালা বদল করবেন বুঝি? সুহাসিনী আরো কাছাকাছি সরে এল। আরো যেন অন্তরের কাছাকাছি। কিন্তু পাখি শুধু ধরলেই তো চলবে না, পোষ মানাতে হবে খাঁচায় পুরে। সেই খাঁচা কই? আখড়া-আস্তানা কই?

তাই তো ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন হাতে ধরে। পথের প্রথম সূচনায় একটু কাজ-টাজ কোথাও দিতে পারেন জুটিয়ে? একটু মাথা গোঁজবার আশ্রয়?

আশ্চর্য, এতক্ষণে জিগগেস করতে পারল তামসী। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সুহাসিনী জোগাড় করে দিতে পারবে তাতে শিষ্টতা-শালীনতার প্রশ্ন ওঠবার অবকাশ নেই। নেই অকারণ মনোভঙ্গের আশঙ্কা। আর সেই বা এমন কি অব্রণ-অক্ষত যে একটা খুব মর্যাদা-ওয়ালা চাকরি না হলে তার পোষাবে না? সমস্ত জেলজীবনের ব্যাধিবিকারগ্রস্ত বীভৎস ছবিটা মুহূর্তে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। সুতরাং তাকে শোভা পায়না এ নাক-বেঁকানো খুঁৎখুঁতুনি। সাময়িক আশ্রয় অন্তত তো পাবে। তাই বা কম কি। কঠিন-উদাসীন অচেষ্ট-অচেতন বিপুল কলকাতার কথা ভাবতে তার সর্বাঙ্গে ক্লান্তির জ্বর আসে—কোথায় সে ঘুরে বেড়াবে খালি পায়ে—কে দেবে তাকে বিশ্রাম, কে দেবে একটু বিস্মরণ? আর, তাই বা কত দিনে?

'আপনি কী কাজ করেন?' দীননয়নে জিগগেস করল তামসী।

'আমি? আমি তো নার্স। নাম সুহাসিনী, সবাই বলে হাসিনী নার্স। করবেন আপনি নার্সগিরি?'

'সে তো খুব ভাল কাজ। কিন্তু ট্রেনিং লাগবেনা?'

'হাসিনী-নার্স দুদিনেই ট্রেনিং দিয়ে দিতে পারবে। এ শুধু হাসির ট্রেনিং। টাইটেল কি আর অমনি পেয়েছি?' সুহাসিনী হেসে উঠল।

সে-হাসির দোহার হল তামসী। বললে, 'ট্রেনিংএর পিরিয়ডটা থাকতে পারব তো আপনার কাছে?'

'নিশ্চয়।' সুহাসিনী তামসীর দুহাত টেনে নিল তার হাতের মধ্যে। 'তুমি আমার

কলেজে-পড়া বিদেশিনী ছোট বোন। দিদির কাছে থাকবে না তো তোমাকে আমি পথে ভাসিয়ে দেব ?'

বেশ একটা কলেজী-কলেজী ভাব আছে মেয়েটার মধ্যে। দুদিন ঘসেমেজে চেকনাইটা আরো তুলতে পারবে ফুটিয়ে। নিজে যেমন মাথার চুলে পিন দিয়ে রুমাল আটকায়, তেমনি ওর হাতে কখানা না-হয় খাতা-বই তুলে দেবে। আর একটা না-হয় বেঁটে ছাতা। চশমা লাগবে চোখে ? দরকার নেই। চোখদুটো এমনিতেই বেশ বড়-বড় আছে।

কে জানে, কোনো খিটকেল না ঘটে। ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার না দশা হয়।

নিজের ইচ্ছেয় আসবে, হাসিনীর কি! এ তো আর আনাড়ী ছোট খুকি নয়, প্রকাণ্ড দিগধেড়েঙ্গা মেয়ে। ঢং-ঢাঙাতি শেখাতে হবেনা তাকে।

'দেখো ভাই, কোনো ভেজালে পরব না তো ?' কানে-কানে বলার মত করে ঝুঁকে পড়ে বলল সুহাসিনী।

'আমি যদি না জালে আটকা পড়ি, তুমিও ভেজালে পড়বেনা।' তামসী বললে বন্ধুনীর মত। 'তুমি দিদি, আমি বোন। আমি যেমন আমার কুটুম তেমন।'

দুজনে হাসতে লাগল।

ক্রমশঃ

...'গ্রহণ করতে পারো :
"মৃত্যুলগ্নে মানুষের মনের নিবিড়তা
তার সমস্ত সত্তায়ই ব্যাপ্ত হ'তে পারে"—এই একটি কাজ
(প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই ত মৃত্যুলগ্ন)
যা অন্যের জীবনে ফসল ফলিয়ে তোলে :
কাজের ফলের কথা ভেবোনা।
সামনে চলো।
নাবিকের দল, সমুদ্রযাত্রীর দল --
বন্দরে যারা তোমরা ফিরে এলে—
আর সমুদ্র-পরীক্ষা প্রতীক্ষা করে আছে যাদের শরীর—
এই-ত তোমাদের সত্যিকারের গন্তব্যস্থল !'
যুদ্ধক্ষেত্রে এ-বলেই অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করেছেন কৃষ্ণ।
পথ তোমার শুভ যে হবে তা নয়—
সামনে চলো, নাবিকের দল।

—টি, এস্‌, এলিয়ট

শৈব্যা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা যখন রাজঘাটে গঙ্গার পুলের ওপরে এসে উঠল, তখন নীরদা আর চোখের জল রোধ করতে পারল না। তার গালদুটি অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে গেল।

চারদিক মুখরিত করে জনতার জয়ধ্বনি উঠেছে। হর হর মহাদেব, জয় বাবা বিশ্বনাথ। যাত্রীরা মুঠো মুঠো করে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। বেণীমাধবের উদ্ধত ধ্বজাদুটো সকালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চিতার নীলাভ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে দুর্নিরীক্ষ্য মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে। অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার তীরে হিন্দুর তীর্থশ্রেষ্ঠ বরাণসী সবে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে।

রাধাকান্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। চাপা গলায় বললেন, চুপ কর, সবাই দেখতে পাচ্ছে যে।

আকুল কণ্ঠে নীরদা বললে, দেখুক গে।

—আঃ থাম থাম। কোনো ভয় নেই তোর, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে। এ কথা আগেও অনেক বার বলেছেন রাধাকান্ত। কিন্তু কিছুই ঠিক হয়েনি। জটিলতা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রন্থিমোচন করবার জন্যে রাধাকান্ত নীরদাকে সর্বংসহ পুণ্যভূমি কাশীধামে এনে হাজির করেছেন। তাঁরই বাড়িতে আশ্রিতা বালবিধবা জ্ঞাতির মেয়ের কাছ থেকে বংশধর তিনি কামনা করেননা। ধার্মিক এবং চরিত্রবান বলে তাঁর খ্যাতি আছে এবং পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসার আছে, সর্বোপরি সমাজ তো আছেই। আর যাই হোক তিনি সাধারণ মানুষ—দেবতা নন।

ক্যান্টনমেন্টে এসে ট্রেন থামল। চেনা পাণ্ডাকে আগেই চিঠি দেওয়া ছিল—টাঙ্গা করে সেই নিয়ে গেল কচুরিগলির বাসায়। তারপর যথানিয়মে বেনারসের পুলিস চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে কুড়িয়ে পেল আর একটি নামগোত্রহীন নবজাতকের মৃতদেহ।

ততদিনে রাধাকান্ত দেশে ফিরে গিয়েছেন। বৈঠকখানায় হুঁকো নিয়ে বসে আলোচনা করছেন নারীজাতির পাপপ্রবণতা সম্পর্কে। বাচস্পতির দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সেই যে হিতোপদেশে আছে না? গাভী যেরূপ নিত্য নব নব তৃণভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করে, সেই রূপ স্ত্রীলোকও—

কদর্য একটা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বাচস্পতি রাধাকন্তের বক্তব্যটাকে আরো প্রাঞ্জল করে দিলেন।

এদিকে পাণ্ডা মহাদেব তেওয়ারীর আর ধৈর্য থাকলনা।

একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, এবার বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

মড়ার চোখের মতো দুটো ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মহাদেবের মুখের ওপরে ফেলে নীরদা কথা বললে। এত আস্তে আস্তে বললে যে বহুযত্নে কান খাড়া করে কথাটা শুনতে হল মহাদেবকে।

গাঁজার নেশায় চড়া মেজাজ মুহূর্তের জন্যে নেমে এল মহাদেবের। ওই অদ্ভুত চোখ দুটো—ওই শবের মতো বিচিত্র শীতল দৃষ্টি তার কেমন অমানুষিক বলে মনে হয়, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় তার। যেন পাথরের ওপরে ঘা দিচ্ছে, পাথরের কিছুই হবেনা, প্রতিঘাতটা ফিরে আসবে তারই দিকে। ভয়, উৎকণ্ঠা, অপমান ও অপরাধ—সবকিছু জড়িয়ে কোন্ একটা নির্বেদলোকে পৌঁছে গেছে নীরদা।

মহাদেব কুঁকড়ে গিয়ে বললে, আজ চার মাহিনা হয়ে গেল টাকা পয়সা কিছু পাইনি। আমি তো আর দানছত্র খুলে বসিনি।

নীরদা তেমনি অস্পষ্ট গলায় বললে, আমি কী করব ?

আবার জ্বলে উঠল মহাদেব, বিশ্রী একটা অঙ্গভঙ্গি করে বললে, ডালমণ্ডি থেকে রোজগার করে আনো।—তোমার যৌবন আছে, কাশীতে রইস আদমিরও অভাব নেই।

কিন্তু কথাটা বলেই মহাদেব আবার লজ্জা পেলো। নীরদার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতে বললে, নইলে পথ দেখো।

পথই দেখতে হবে নীরদাকে। যে পঙ্ককুণ্ড আর গ্লানির ভেতরে তাকে নামিয়ে রেখে রাধাকান্ত সরে পড়েছে, তারপরে পথ ছাড়া কিছু আর দেখবার নেই। যাওয়ার আগে রাধাকান্ত তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন, কোন ভাবনা নেই, মাসে মাসে আমি খরচা পাঠাব। কিন্তু দু মাস পরেই সংসারী রাধাকান্ত, চরিত্রবান্ ভদ্র রাধাকান্ত এই চরিত্রহীনা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিটা অবলীলাক্রমে ভুলে যেতে পেরেছেন। না ভুলে যাওয়াটাই আশ্চর্য ছিল।

হিন্দুর পরমতম পুণ্যতীর্থ। ভিখারী বিশ্বনাথের ক্ষুধার্ত করপুটে অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন অন্নপূর্ণা। কিন্তু যুগের অভিশাপে অন্নপূর্ণাও ভিখারী। বিশ্বনাথের গলিতে, গঙ্গার

ঘাটে ঘাটে, দেবালয়ের আশে পাশে সহস্র অন্নপূর্ণার কান্না শোনা যায়ঃ একটা পয়সা দিয়ে যা বাবা, বিশ্বেশ্বর তোর ভালো করবেন—

বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকেনা।

কেউ হয়তো থাকেনা, কিন্তু দুদিন ধরে নীরদার খাওয়া জোটেনি। বোধ হয় বিশ্বনাথের আশ্রয় সে পায়নি, বোধ হয় নীরদার পাপে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ক্লান্ত দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল নীরদা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে আলো জ্বলেছে, আরতি দেখবার আশায় যাত্রীরা রওনা হয়েছে বিশ্বনাথের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কর্মব্যস্ত সহরের দোকানপাটে বিকিকিনি চলেছে, চায়ের দোকানে উঠছে হুল্লোড়, পথ দিয়ে সমানে চলেছে টাঙ্গা, এক্কা, মোটর আর রিকশার স্রোত। বাঙালিটোলা ছাড়িয়ে নীরদা এগিয়ে চলল।

খানিক এগিয়ে যেখানে আলো আর কোলাহল কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁ দিকে একটা বাঁক নিলে নীরদা। পথ প্রায় নির্জন। খোয়া ওঠা নোংরা রাস্তা—সোজা গিয়ে নেমেছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে। সমস্ত কাশীতে এই ঘাটটাই নীরদার ভালো লাগে, এখানে এসেই যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে।

আগে দু চারদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে, অহল্যাবাই ঘাটে গিয়ে সে বসেছে। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় তার—কেমন যেন মনে হয় ওসব জায়গাতে সে অনধিকারী। ঘাটের চত্বরে চত্বরে যেখানে কীর্তন শোনাবার জন্যে পুণ্যকামী নরনারীরা ভিড় জমিয়েছে, ছত্রের নীচে নীচে যেখানে বেদপাঠ আর কথকতা চলছে, সামনে গঙ্গার জলে ভাসছে আনন্দতরণী আর ঘাটের ওপরে পাথরের ভিত-গাঁথা প্রাসাদগুলো বিদ্যুতের আলোয় ইন্দ্রপুরীর মতো জ্বলছে—ওখানকার ওই পরিবেশ নীরদার জন্যে নয়। ওখানে যারা আসে ওরা সবাই শুদ্ধ, সবাই পবিত্র। তাদের জীবনে কখনো মলিনতার এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। ওরা সহজ ভাবে হাসে, সহজ ভাবে কথা বলে, নির্মল নিষ্কলঙ্ক মুখে গলায় আঁচল দিয়ে কথকতা শোনে, কীর্তনের আসরে ওদের চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে আসে। আর নীরদার চারপাশে কলঙ্কের কালো ছায়া, অশুচিতার স্পর্শ একটা বৃত্তের মতো বেষ্টন করে আছে, মনে হয় সকলের শান্ত পবিত্র দৃষ্টি মুহূর্তে ঘৃণায় কুটিল কুৎসিৎ হয়ে ওর অপরাধী মুখের ওপর এসে পড়বে।

অদ্ভুত ভাবে নির্জন, আশ্চর্যভাবে পরিত্যক্ত। পাশেই কেদারেশ্বর শিবের মন্দির থেকে নেমেছে ঝকঝকে চওড়া সিঁড়ির রাশি—ওখানে ভিড় জমিয়েছে দণ্ডীরা, কথকেরা, তীর্থকামীরা, স্বাস্থ্যলোভীরা এবং ভিক্ষুকেরা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে কেদারের মন্দিরে। ঘাটের

ওপরে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। কিন্তু তার থেকে দু পা সরে এলেই তরল অন্ধকারের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ঘাট নির্জনতায় তলিয়ে আছে।

দু তিনবছর আগে জোর বান ডেকেছিল গঙ্গায়। ফেঁপে উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল জল—পাহাড় প্রমাণ সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে সে জল ঢুকেছিল শহরের ভেতরে। তারই ফলে পুঞ্জিত বালি হরিশ্চন্দ্র ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সে বালি কেউ পরিষ্কার করেনি—করবার দরকারই হয়তো বোধ করেনি কেউ। শুধু যারা মড়া নিয়ে আসে তারাই বালির স্তূপ ভেঙে নীচে নেমে যায়, দু একজন দণ্ডী স্নান করে যায় সকালে সন্ধ্যায়। বুড়িরা ক্বচিৎ কখনো হয়তো এসে বসে, তারপর সন্ধ্যা এলেই চলে যায় কেদারঘাটের দিকে। দু একটা চিতার রাঙা আলোতে হরিশ্চন্দ্রের ছোট মন্দিরটা আলো হয়ে ওঠে—সেই রক্তশিখায় গঙ্গার জলে একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলে মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধা চণ্ডাল লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতা ঝাড়তে থাকে।

এইখানে এসে বসল নীরদা।

ঘাটে জনপ্রাণী নেই। শুধু গঙ্গার ধারে সদ্য নিভে যাওয়া একটা চিতায় যেন রাশি রাশি আগুনের ফুল ফুটে আছে। ওপারের অন্ধকার দিগন্তে চোখে পড়ছে রামনগরের দু একটা আলো। পেছনে ছিপিটোলার দিক থেকে আসছে উৎকট গানের হুল্লোড়, মদ খেয়েছে ওরা।

নীরদা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিভন্ত চিতাটার দিকে। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে তার স্থান হলনা। এই জনবিরল ঘাটে—নিঃসঙ্গ শ্মশানে বসে মনে হচ্ছিল একটা পথ ওর খোলা আছে এখনো। বিশ্বনাথ কৃপা করলেন না, কিন্তু শ্মশানে শ্মশানে জেগে আছেন ত্রিশূলপাণি ভয়ালমূর্তি কালভৈরব। চোখের ওপর থেকে যখন পৃথিবীর আলো নিবে যাবে, যখন এই দেহের অসহ্য বোঝাটা টানবার দায় থেকে মুক্তি পাবে সে, তখন চিতার ধোঁয়ার মতো বিশাল জটাজুট এলিয়ে দিয়ে মহাকায় কালভৈরব সামনে এসে দাঁড়াবেন, কানে দেবেন তারকব্রহ্ম নাম।

হঠাৎ মাথার ভেতরটা ঘুরে উঠল নীরদার। মরে যাওয়া স্বামীর মুখ, রাধাকান্তের মুখ আর মহাদেব তেওয়ারীর কদর্য বিকৃত মুখগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একটা নতুন মুখের সৃষ্টি করল—কালভৈরবের মুখ। সময় হয়েছে—কালভৈরব এসে দাঁড়িয়েছেন। সামনের অগ্নিময় চিতাশয্যা থেকে আগুনের পিণ্ডগুলো যেন ছটকে লাফিয়ে উঠল, তারপর শ্মশানপ্রেতের লক্ষ লক্ষ চোখের মতো সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘাটে, রাশি রাশি বালির ওপর, গঙ্গার কালোজলের উচ্ছল তরঙ্গে তরঙ্গে।

সেই সময় হরিশ্চন্দ্র মন্দিরের চাতালে বসে একপয়সা দামের একটা সিগারেট খাচ্ছিল জীউৎরাম।

জীউৎরাম চাঁড়ালের ছেলে। বংশানুক্রমিক ভাবে এই ঘাটে তারা মড়া পুড়িয়ে আসছে। কিন্তু জীউৎরামের যৌবনকাল এবং অল্প সল্প সখও আছে। মাঝে মাঝে রুমাল বেঁধে বিলিতী নেটের মিহি পাঞ্জাবী পরে পান চিবুতে চিবুতে সে বেরিয়ে পড়ে, একটুক্রো তুলোয় সস্তা আতর মেখে গুঁজে দেয় কানের পাশে, চোখের পাতায় হালকা করে আঁকে সুর্মার রেখা। এই হরিশ্চন্দ্র ঘাটে মড়া পোড়ানোর চাইতেও আর একটা বৃহত্তর জীবনের দাবী যে আছে সেইটেকেই সে অনুভব করতে চায় মাঝে মাঝে, ভুলে যেতে চায় নিজের ব্রাত্য পরিচয়।

আজ একটু রঙের মুখে ছিল জীউৎরাম। মুসম্মার রস দিয়ে বেশ কড়া করে লোটাখানিক সিদ্ধি টেনেছে, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কোনো অজানা অচেনা 'প্যারে'র উদ্দেশ্যে হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করছে, এমন সময় দেখতে পেলো সিঁড়ির মাথার ওপরে শাদামত কী একটা পড়ে রয়েছে।

প্রথম দু একবার দেখেও দেখেনি, তারপর কেমন সন্দেহ হল। জীউৎরাম আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা—মড়া নয়তো?

একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় পড়ে ছিল নীরদা। পাশের কেদার ঘাট থেকে এক ফালি বিদ্যুতের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দুলে যাচ্ছিল নীরদার মুখের ওপর। সেই আলোয় জীউৎ দেখল নিশ্বাস পড়ছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা। কাশীর ঘাটে এমন দৃশ্য বিরল নয়।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কিছু এখনি করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারা যায়?

আজ মাথার মধ্যে নেশা রন্‌রন্ করছিল জীউৎরামের—নইলে এমন সে কিছুতেই করতে পারত না। কিছুতেই ভুলতে পারতনা সে চণ্ডাল, তার ছোঁয়া লাগলে বাঙালি ঘরের মেয়েকে চান করতে হয়। কিন্তু আজ সে নেশা করেছিল, খেয়েছিল একমুখ জর্দা দেওয়া মিঠে পান, কানে গুঁজে নিয়েছিল গুলাবী আতর। মনটা অনেকখানি উড়ে চলে গিয়েছিল তার নিজের সীমানার বাইরে, তার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে ভেবে নিয়েছিল ভদ্রলোকদের সগোত্র বলে।

জীউৎরাম ঝুঁকে পড়ল, পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে নীরদাকে। চণ্ডালের কঠিন বুকের ভেতরে মিশে গেল নীরদার দুর্বল কোমল দেহ—। বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল জীউৎরামের, লোমকূপগুলো যেন ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল।

নীরদাকে এনে সে নামালো গঙ্গার ধারে। আঁজলা আঁজলা জল দিলে চোখেমুখে। গঙ্গার হাওয়ায় নীরদার জ্ঞান ফিরে এল ক্রমশ, বিহ্বলের মতো সে উঠে বসল।

—আমি কোথায় ?

—হরিশ্চন্দ্র ঘাটে, গঙ্গাজীর ধারে। কী হয়েছে তোমার ?

মুহূর্তে বর্তমানটা নীরদার ঝাপ্‌সা শাদা চেতনার ওপরে একটা কালো ছায়ার মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীউৎরাম আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কী হয়েছে ?

হঠাৎ নীরদা কেঁদে ফেলল। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে সে এই প্রথম শুনল বিশ্বনাথের এই কণ্ঠ—শুনল স্নেহের স্বর। দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠল সে।

—আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই—

জীউৎ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করা উচিত, কী বলা সঙ্গত কিছু বুঝতে পারছে না। নিভন্ত চিতাটার রাঙা আলোর আভায় নীরদার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা দেখে একটা কিছু সে অনুমান করে নিলে।

—তোমার আজ খাওয়া হয়নি, না ?

নীরদার আর সংশয় রইল না। সত্যি কোনো ভুল নেই। শ্মশানচারী বিশ্বেশ্বর ছদ্মবেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অশ্রুপ্লাবিত মুখে তেমনি করেই চেয়ে রইল সে।

জীউৎ বললে, তুমি বোসো, আমি আসছি।

দু'পা এগিয়েই কেদারের বাজার। জীউৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে একটা টাকা আর কয়েক আনা খুচরো রয়েছে। কিছু দই, মিষ্টি আর তরী-তরকারী কিনে জীউত ফিরে এল।

নীরদা তখনো সেখানে স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো বসে ছিল। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল সেই জানে। নীরদার সামনে এসে জীউৎ বললে, এই নাও।

মুখ দিয়ে কথা জোগাচ্ছেনা নীরদার। সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় যেন আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে গেছে সে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল কোনো বদমতলব নেই তো লোকটার ? কিন্তু চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। তরল অন্ধকারে ঘেরা হরিশ্চন্দ্র ঘাট, সামনে গঙ্গার কলোল্লাস, বাতাসে চিতার অস্ফুট গন্ধ আর চারদিকের একটা থমথমে নিঃসঙ্গতা নীরদার বাস্তব বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, বুকের ভেতর থেকে আকস্মিক একটা আবেগের জোয়ার ঠেলে ঠেলে উঠছে : বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকে না।

আর ভাঙের নেশাটা তখনো থিতিয়ে আছে জীউৎয়ের মগজে। সে যে কী করছে নিজেই জানেনা। এতবড় দুঃসাহস তার কোনোদিন যে হতে পারে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। অনুকম্পা নয়, দয়া নয়, পুরুষের চিরন্তন প্রেরণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার চেতনায়। কেমন যেন মনে হচ্ছে এই সন্ধ্যার শ্মশানের এই পরিবেশে এই মেয়েটি একান্ত তারই কাছে চলে এসেছে—তারই প্রতীক্ষার মধ্যে ধরা দেবার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে ঠোঙ্গাটা নিয়ে নীরদা বললে, বিশ্বনাথ তোমার ভালো করবেন। তুমি কে?

এক মুহূর্তে গলার ভেতরে কী একটা আটকে গেল জীউৎয়ের। একবার চেষ্টা করলে মিথ্যা কথা বলবার, চেষ্টা করলে নিজের তুচ্ছ কদর্য পরিচয়টা গোপন করবার। কিন্তু পরম সত্যাশ্রয়ী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র একদিন যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে নিজের ব্রত পালন করে গিয়েছিলেন, শিব চতুর্দশীর রাত্রে যে আদি মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ স্নান করতে আসেন, সেই পুণ্যতীর্থে মিথ্যা কথা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারল না।

অস্পষ্ট স্বরে জীউৎ বললে, আমি জীউৎরাম।

—তুমি পাণ্ডা? ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ—

যেন সাপে ছোবল মেরেছে এমনিভাবে জীউৎ পিছিয়ে গেল। চমকে উঠেছে চেতনা, তর্জন করে উঠেছে বংশানুক্রমিক ক্ষুদ্রতাবোধের সংস্কার। জিভ কেটে জীউৎ বলে ফেলল, না, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল!

জীউৎয়ের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কোনোক্রমে উচ্চারণ করতে পারল: হাঁ, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল! —বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠল নীরদা। কেদার ঘাট থেকে পিছলে পড়া আলোর ফালিতে দেখা গেল অপরিসীম ঘৃণায় নীরদার সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেছে। একটা নিষ্ঠুর আঘাতে মুছে গেছে বিশ্বেশ্বরের অলৌকিক মহিমার প্রভাব—সরে গেছে অভিভূত আচ্ছন্নতার জাল।

বিষাক্ত তীক্ষ্ণ গলায় নীরদা চেঁচিয়ে উঠল: চাঁড়াল হয়ে বামুনের বিধবাকে ছুঁলি তুই? মুখে জল দিলি?

সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জীউৎ।

নীরদা তেমনি চেঁচাতে লাগল: তোর প্রাণে ভয় নেই? এতবড় সাহস—আমাকে খাবার কিনে দিতে আসিস? তোর মতলব কী বল দেখি?

জীউৎয়ের পায়ের তলায় মাটি সরতে লাগল।

এক লাথি দিয়ে খাবারগুলো ছড়িয়ে দিলে নীরদা, উল্‌টে দিলে দইয়ের ভাঁড়। তারপর সোজা উঠে হন হন করে হাঁটতে সুরু করলে মদনপুরার রাস্তার দিকে। আর লজ্জায় অপমানে জীউৎ মাটির দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল—তার নেশা ছুটেছে এতক্ষণে। ভাঙা সিঁড়ির ওপর দিয়ে দইয়ের একটা শুভ্র রেখা গড়িয়ে গড়িয়ে বালির মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে নীরদার খেয়াল হল, চাঁড়ালে ছুঁয়েছে, গঙ্গাস্নান করে নেওয়া দরকার। কিন্তু ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা তার টলছে। বাড়িতে গিয়ে কলেই

স্নান করবে একেবারে, এখন আর অতগুলো সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়।

পথ চলতে চলতে ক্রমাগত মনে হচ্ছিল আজ ভারী রক্ষা পেয়েছে সে। লোকটার মনে কী ছিল কে জানে। নির্জন ঘাটে যা খুশি তাই করতে পারত, টেনে নিয়ে যেতে পারত যেখানে সেখানে। অন্নপূর্ণা রক্ষা করেছেন। উত্তেজনায় রক্ত জ্বল জ্বল করতে লাগল, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সঙ্গে দূরত্বটা বজায় রাখবার জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত বেগে সে চলতে সুরু করে দিলে।

বাড়িতে এসে যখন ঢুকল, সব নির্জন। শুধু তেতলার ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সমস্ত অন্ধকার। বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেছে সকলে। কলতলায় স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়েই মনে হল, দরজায় শিকল নেই কেন? ঘর খুললে কে?

কিন্তু অত কথা ভাববার আর সময় ছিলনা। আর দাঁড়াতে পারছেনা সে, সমস্ত শরীরটা অস্থির করছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরেছ মাথাটা। এক ঘটি জল খেয়ে আজ কোনো মতে গড়িয়ে পড়বে, তারপর উপায়ান্তর না দেখলে কাল থেকে না হয় বিশ্বনাথের গলিতেই বসবে হাত পেতে। কাশীতে ভিক্ষা করে খেলেও সুখ।

দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে পা দিতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল নীরদা।

যেমন করে জীউৎরাম তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তার চাইতে অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর পেষণে কে তাকে সাপটে ধরেছে। তার মুখে মদের গন্ধ, অন্ধকারে তার চোখ সাপের চোখের মতো জ্বলছে।

ফিস্ ফিস্ করে সে বললে, ডরো মৎ প্যারে, রূপেয়া মিল্ জায়েগা।

নীরদার দুর্বল হতচেতন দেহ বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করলে, আর অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে টাকাগুলো মুঠো করে ধরলে মহাদেব তেওয়ারী। রেইস্ আদমির প্রাণটা দরাজ আছে, আর পাওনা টাকাটাও তাকে উসুল করতেই হবে। বিশ্বনাথের কাশীতে নীরদাকে ঋণী রেখে সে পাপের ভাগী হতে পারবেনা, তা সে টাকা নীরদা ইচ্ছায় দিক আর অনিচ্ছায়ই দিক।

ঠিক সেই সময় বৈঠকখানার আসরে বসে জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণগুলো বাচস্পতিকে বোঝাচ্ছিলেন রাধাকান্ত। সামনে মহাভারতের পাতা খোলা, ব্যাসদেব বলছেন, হে ভীষ্ম, যে পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ে সক্ষম—

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে জীউৎরাম।

ফর্সা জামা পরেনা, কানে আতর মাখা তুলো গোঁজেনা, এক মুখ পান চিবিয়ে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করেনা। কোথা থেকে একটা কঠিন রূঢ় আঘাত এসে আকস্মিক ভাবে তাকে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছে।

জীউৎরাম মড়া পোড়ায়। একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে মড়ার মাথাটা ফটাস্ করে ফাটিয়ে দেয়, চিতার কয়লাগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। কেমন একটা অন্ধ আক্রোশ বোধ করে, বোধ করে একটা অশোভন উন্মাদনা। জীবন্তে যাদের তার স্পর্শ করবার অধিকার পর্যন্ত নেই, চিতার ওপরে তাদের আধপোড়া মৃতদেহগুলোর ওপরে যেন সে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাদের অপমান করতে চায়, লাঞ্ছিত করতে চায়।

মাঝে মাঝে যখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে, মনে পড়ে যায় নীরদাকে। ঘৃণা-বীভৎস মুখে বলছে: চণ্ডাল। তার পায়ের ধাক্কায় সিঁড়ির ওপরে উল্‌টে পড়েছে দইয়ের ভাঁড়, পরম অবহেলায় গড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ, তার প্রথম নিবেদন।

হঠাৎ জীউৎয়ের শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠতে চায়, হাতের মুঠিগুলো থাবার মতো কঠিন হয়ে ওঠে। কী হত যদি সেদিন সে তুলে আনত নীরদাকে, যদি জবরদস্তি করত তার ওপরে? কে জানতে পারত, কে কী করতে পারত তার? সেই ভালো হত—তাই করাই উচিত ছিল তার। ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় হয়ে গেছে তার।

লাফিয়ে উঠে পড়ে জীউৎ, হাতের বাঁশটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খোঁচা দেয় চিতার মড়াটাকে। কালো রবারের পুতুলের মতো শিরা-সংকুচিত দেহটা পোড়া কাঠের ভেতর থেকে খানিকটা লাফিয়ে ওঠে—একরাশ আগুন ঝুর ঝুর করে ছড়িয়ে যায় আশে পাশে। তারপর নির্মম ভাবে বাঁশ দিয়ে পিটতে সুরু করে, সাদা হাড়ের ওপর থেকে থেতলে থেতলে পোড়া মাংস খসে পড়তে থাকে—দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে টের পেলো জীউৎয়ের বন্ধু-বান্ধবেরা।

একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তার মাথার ভেতরে কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে। গাঁজার আসরে তারা জীউৎকে ঘিরে ধরল।

—কী হয়েছে তোর?

—কুছ্ নেহি।

—দিল খারাপ?

—হাঁ—

—তবে চল্, আজ মৌজ করে আসি—

—না—

কিন্তু বন্ধুরা ছাড়লেনা, সেদিন সন্ধ্যার পরেই সাজগোজ করিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল। দেশী মদের দোকানে এক এক পাঁইট্ করে টেনে সকলে যখন রাস্তায় বেরুল, তখন বহুদিন পরে জীউৎয়ের রক্তে আগুন ধরেছে আবার। জোর গলায় একটা অশ্রাব্য গান জুড়ে দিল সে।

ডালমণ্ডিতে ঘরে ঘরে তখন উৎসব চলছে। হার্মোনিয়ামের শব্দ, ঘুঙুরের আওয়াজ, বেতালা গান, বেসুরো চীৎকার। মাঝে মাঝে সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠছে তবলার উদ্দাম চাঁটির নির্ঘোষ। দরজায় দরজায় রাত্রির অপ্সরী। শিকার ধরবার জন্যে ওৎপেতে দাঁড়িয়ে।

টলতে টলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল জীউৎ। কেদারঘাটের এক ফালি আলোতে দেখেছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোতেও সে চিনতে পারল। আশ্চর্য নেশায় রাঙা চোখ নিয়েও চিনতে পারল জীউৎ।

মেয়েটার চোখেও নেশার ঘোর। জীউৎকে থেমে দাঁড়াতে দেখে সে এগিয়ে এল। জীউৎয়ের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, চলে এসো—

ঠাণ্ডা একটা সাপ হঠাৎ শরীরে জড়িয়ে গেলে যে অনুভূতি জাগে, তেমনি একটা ধিক্কারজনক ভয়ার্ত শিহরণে জীউৎ শিউরে উঠল। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললে, আমি চাঁড়াল।

উচ্চস্বরে মাতালের হাসি হেসে মেয়েটা বললে, আমি চাঁড়ালনী। ভয় কি, চলে এসো—

প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে জীউৎরাম—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিলে। পেছন থেকে মেয়েটার হাসি কানে আসছে, একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন পিতলের বাসনের গায়ে সশব্দে আঁচড় কাটছে কেউ।

শ্মশানে শ্মশানচণ্ডাল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে চিতার ওপর লক্‌লকে আগুন-গঙ্গার জলে নাচছে তার প্রেতচ্ছায়া। শ্মশান চণ্ডালের কালো শরীরে আগুনের আভা পিছলে যাচ্ছে।

আর রাগ নেই, অভিযোগ নেই, গ্লানি নেই। ব্যথা আর করুণায় মনের ভেতরটা টলমল করছে। চেতনার ভেতর থেকে কে যেন বলছে একদিন এই ঘাটেই আসবে নীরদা, এইখানে গঙ্গার জলে জীবনের সমস্ত জ্বালা তার জুড়িয়ে যাবে। সেদিন তার অহঙ্কার থাকবেনা, থাকবেনা আজকের এই অপমানের কালো কলঙ্কের ছাপ। সেদিন জীউৎ তাকে নিজের মতো করে পাবে, পাবে তাকে স্পর্শ করবার অধিকার, চণ্ডালের ছোঁয়ায় সেদিন তার কাশীপ্রাপ্তির সার্থক মর্যাদা ফিরে আসবে। সেই দিনের প্রতীক্ষা করবে জীউৎ— অপেক্ষা করে থাকবে সেইদিনের জন্যে।

রাধাকান্তের বাড়িতে তখন কথকতা হচ্ছিল। শ্মশানে মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শৈব্যার মিলন।

সমবায়ী যুগের শিল্প

অমিয় চক্রবর্তী

উপন্যাসের নানা বৈষয়িক উপাদান আসতে পারে গ্রাম থেকে কিন্তু ঔপন্যাসিক দেখা দেন সহরসৃষ্টির সঙ্গে। অর্থাৎ যে-সভ্যতায় বড়ো সহর জাগেনি সেখানে যাকে বলি নভেল তার পরিচয় মিলবে না। ছোটো গল্পও নয়। কেননা বিচিত্র ঘটনার স্বতন্ত্র ছবি ফুটিয়ে তোলবার পিছনে আছে নূতন কালের সংযোগী এবং বিবিধদর্শী মন। সংঘবদ্ধ জীবনের বৃহৎ সামাজিক কেন্দ্ররূপী আধুনিক সহরগুলিতেই ধীরে ধীরে এই বিশেষরকম মনোদৃষ্টি তৈরি হয়ে উঠল; সেই মন নিয়ে শিল্পী এখন গ্রামে গিয়েও উপন্যাস লিখতে পারেন কিন্তু সভ্যতার নূতন অধ্যায় তার সঙ্গে জড়িত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখতে পাই উপন্যাসের জন্মস্থান কলকাতা সহর, এবং এই সহরের পরিণতির পর্যায়ক্রমে নভেল ও ছোটো গল্পও পত্রপল্লবিত হয়ে উঠেছে।

কথাটা স্পষ্ট করে বলি। আখ্যায়িকা, উপাখ্যান ইত্যাদি গল্পের বহুধারা যুগে যুগে বিস্তৃত হয়ে কিম্বদন্তী এবং জনশ্রুতির সহযোগে নানা মনের ছাপ নিয়ে মুখে মুখে অথবা পুঁথির অক্ষরে সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ করে নি তা বলছি না। কবিতায় যেমন মহাকাব্য এসেছিল জনচিত্তের অস্পষ্ট আলোড়ন বহন করে, তাতে যেমন বিশেষ কোনো শিল্পীর সংহত বিশ্বদর্শনের চেয়ে বেশি করে পাই একই ছাঁচে ঢালা নানা মনোজাত কাহিনীর মহানতা এবং তারই সমবায়, তেমনি প্রাক্-আধুনিক কালের রূপকথা অথবা গল্পের জগতেও ব্যাপ্তি আছে কিন্তু তা বিশিষ্ট দৃষ্টির শিল্পে নির্ধারিত নয়। একই চোখে যুগ্মদৃষ্টি অর্থাৎ নিজের এবং অন্যান্যের দৃষ্টিতে সংসারকে দেখবার শিল্প নূতন কালে স্পষ্টতর প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্যে শুধু বহু জীবনী নয়, বহু জীবিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চাই; সহরেই তা সম্ভবপর। য়ুরোপে দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই ইংলণ্ডে উপন্যাসের প্রথম সূচনা, তখন লণ্ডন সহর তৈরি হয়ে উঠছে। যথার্থ নভেল এল আরো পরে; নাগরিক সভ্যতা লণ্ডনকে কেন্দ্র করে বিবিধবৃত্তির মানুষকে জনালয়ে একত্র গ্রন্থী বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উপন্যাস। সেই সময়ে

এলেন রিচার্ডসন, ফিল্ডিং। বিচিত্র ব্যবসায়ী বণিক শ্রমিক কর্মজীবি, ধনযাজক, মধ্যবিত্ত অর্ধবিত্তের দল তখন লণ্ডনের দোকানে বাজারে, আপিসে আদালতে, ডাক্তারখানায় বিদ্যালয়ে জাহাজ-ঘাটায় উপনীত। শুধু মানুষের সমষ্টি নয়, নানারকম মানুষের দাবিকে স্বীকার করে যে গল্প জমে ওঠে, যেখানে নানামন নানামতকে মিলিয়ে সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে একই মানবিক আদর্শে বিচিত্র করে দেখবার ঔৎসুক্য জাগে তাতেই ঔপন্যাসিকের পরিচয়।

বলা যেতে পারে গ্রাম্যজীবনেও নানা জীবিকার সমবায় আছে, পূর্বকালের ছোটো ছোটো সহরেও তাই ছিল—নভেল কেন দেখা দেয়নি। এইখানে একটি মূলগত তত্ত্বের বিচার প্রয়োজন। আমরা যাকে আধুনিক শিল্পদৃষ্টি বলতে চাই তাতে মানুষকে বাহিরের দিক থেকে নানাধর্মী বলে জানাই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম বিচিত্র সম্ভাব্যতার সত্যকে স্বীকার করতে হয়। গ্রামে যে-ভাবে তাঁতি, নাপিত, জমিদার ইত্যাদি আখ্যায় বন্দী করে মানুষকে এক একটি চিরস্থায়ী বৃত্তির ভিন্নতায় বদ্ধ করা হয় তাতে জাতিভেদ রক্ষা হতে পারে কিন্তু শিল্পের জাত যায়। নূতন যুগের শিল্পের কথা বলছি। সহরে অনেকটা পরিমাণে অমানবিক এই জাতিভেদ নষ্ট হয় বলেই শিল্পের ঔৎকর্ষ দেখা দিতে থাকে। যেখানে বহু জীবিকার মধ্যে রাস্তা খোলা, একই মানুষ নানা কর্মের এবং সূক্ষ্মতর জীবনীর জাল গেঁথে তোলে সেখানে পরিবর্তনশীল মানব-সম্বন্ধের বিবিধ যোগে উপন্যাসের শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ উপন্যাস হল সমাজবিন্যাসের প্রতিচ্ছবি, সামাজিকতার আদর্শ যেখানে অধিক পরিস্ফুট সেখানে ঔপন্যাসিকের বিশেষ শিল্পজাত দৃষ্টিও সার্থক রূপ লাভ করে। ইংলণ্ডে উচ্চনীচের প্রভেদ জাতিভেদের মতোই কঠিন ছিল কিন্তু লণ্ডনে এই ভেদের দেয়াল যতই ভাঙতে লাগল নভেলের আশ্চর্য উদ্ভব সেখানে দেখা দিল। মোটামুটি বলা যেতে পারে নভেলের মূল প্রবণতা বহু জনের জীবনীতে গাঁথা সমাজের দিকে। তাই নভেলের জগতে যে-কোনো ব্যক্তি নায়ক হতে পারে, রাজা অথবা সংহারকর্তা বা ধর্মপ্রতাপী বিশেষ বীরের স্থান সেখানে উচ্চাসনে বাঁধা নেই—সহরের সভ্যতা আজও যতই ভেদশীল হোক তার গতি ডেমক্রেসির অভিমুখে। প্রাণের বিচিত্রবিধ আবর্তে পড়ে কেউ আজ সহরে ধনী, কেউ দেউলে, ভাগ্যবিপর্যয়ের পালা চলেছে, ঘটনার দিক থেকেও ওঠা-পড়ার বিরাম নেই। এমনতর আবহে প্রবর্তিত শিল্পীর মন স্বভাবতই মানুষকে যথার্থ দেখতে চায়, কোনো সংজ্ঞায় বন্দী করে এবং বিশেষ কোনো সংস্কারের মধ্যবর্তিতায় মানবসংসারকে জানা তার ধর্মবিরুদ্ধ। নানা অবস্থায় ফেলে নিজেকেই সে দেখে এবং অন্যকেও চেনে, তার আত্মদৃষ্টি বাহিরের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গিয়ে যথার্থ ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টি তৈরি করে। তাই মহাকাব্যের গল্পে বা উপকথায় রাজা উজীর অথবা বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপী ছাপ-মারা পুরুষ যে-ভাবে আধিপত্য করত

আজকের কাব্যে গল্পে তা আর সম্ভব নয়। মহাকাব্যের স্থানে এসেছে কাব্যের বৈচিত্র্য ও গল্পের জায়গায় এসেছে নভেল ছোটো গল্প। এই নূতন শিল্পরূপগুলির মূলে আছে মানুষ সম্বন্ধে মুক্ত মনের আগ্রহ, নানা বৃত্তি নানা স্বভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত সৃজনীদৃষ্টি। কোথাও তা উজ্জ্বল কণিকা হয়ে লীরিকে ছোটো গল্পে নবতর সম্পূর্ণতা পেয়েছে, কোথাও তা মালায় গাঁথা দীর্ঘতর কাব্যে উপন্যাসে সংহত হল। যথার্থ শিল্পদৃষ্টি যাকে বলি তা যে মানবিক দৃষ্টিরই সঙ্গে এক তা ক্রমে আমরা বুঝতে পারছি। বিশেষ কোনো শিল্পীর দৃষ্টি পূর্বযুগেও কালের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে এমন বহু উদাহরণ আছে, বর্তমান কালেও শিল্পজগতে চক্ষুষ্মানের সংখ্যা কম, কিন্তু এটা হল শিল্পশক্তির তারতম্যের কথা। নূতন যুগের বিশেষ শিল্প যাকে বলছি সেই উপন্যাসের পরিচয় পেতে হলে শিল্পচৈতন্যের একটি প্রসার ধর্মকে মানতে হয়।

সাহিত্যের আরো একটি মহল, নাটকের রাজ্যেও এইরকম পরিণতি দেখা যায়। য়ুরোপে বহু পূর্বকালে নাটক ছিল মহাকাব্যের সমগোত্রীয়, তাতে গণ্যমান্যের প্রাদুর্ভাব, তাতে বহুর জন্মগত মানবিক অধিকার অস্বীকৃত। সাধারণের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সেখানে ক্ষীণপ্রভ, পারিবেশিক তথ্য লুপ্তপ্রায়। দুচারটি বৃহৎ ঘটনাকে বড়ো ব'লে মানা হয়েছে, প্রকৃতি বা সমাজের প্রচণ্ডতা যথারীতি সাহিত্যিক মর্য্যাদা হতে বঞ্চিত হয়নি। যাকে বলছি নাটিকা তা এল এলিজাবেথান্ যুগে, কিন্তু সেক্‌সপীয়রের অসামান্য প্রতিভাকে বাদ দিলে দেখা যাবে সেই যুগে নূতন অর্থে নাটিকা প্রায় ছিল না, পুরাতনী নাটকেরই নবমূর্তি ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে। সাহরিক সভ্যতা তখনো লণ্ডনে গড়ে ওঠেনি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন লণ্ডনের পূর্ণতর নিজস্ব বৈচিত্র্য ফুটে উঠল সেই সময়ে বহুজীবনের সমবায়ী দৃষ্টি হতে নভেল এবং নাটিকা দুয়েরই সৃষ্টি হতে থাকল। এলিজাবেথান্ রঙ্গমঞ্চেও দুর্ধর্ষ চরিত্র এবং সাংঘাতিক ঘটনার প্রাবল্যই ছিল নাট্যশক্তির পরিচয়; পরবর্তীকালে বেন্ জন্‌সনের নাটকে নায়ক নায়িকাদের আভিজাত্য ঘুচেছে কিন্তু তারাও ছাপ-মারা পদার্থ, তাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কারো তেমন ঔৎসুক্য নেই যদিও বিবিধ বর্ণনা ও চরিত্র চাতুরী আছে; শিল্পের যুগ্ম দৃষ্টির সূক্ষ্মতা কোথায়। জীবননাট্যে চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখানোই যথেষ্ট নয়, যে-দৃষ্টিতে প্রত্যেকের অসামান্যতা ধরা পড়ে এবং একই মনুষ্যত্বের মহিমায় তাদের মূল্যবিচার হয় তার অভাবে যথার্থ নাটিকা কোনো দেশেই শ্রেষ্ঠত্ব পায়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব বড়োদরের নাট্যপ্রতিভা অষ্টাদশ শতাব্দী ইংলণ্ডে উদিত হয়নি, কিন্তু নাটিকার চেহারা গেল বদ্‌লিয়ে। তার পর হতে বর্ণাড্ শ পর্যন্ত ইংরেজি নাটিকায় নবযুগের সেই দৃষ্টি সৃজনীশীল বহু রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, উদ্ভাবনার অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে এখনো দুর্গতির পালা চলেছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউই নাটিকা লেখেন নি এটা আশ্চর্য। অথচ উপন্যাস ছোটো গল্পের আসরে আমরা বিশ্বের যে-কোনো

সাহিত্যের সমান আসন দাবি করতে পারি। মাইকেল মধসূদন দত্ত নূতন নাটিকায় তাঁর প্রতিভ সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তি অন্যত্র প্রয়োগ করায় দুচারটি অসম্পূর্ণ প্রতীক ভিন্ন যথার্থ নাটিকা তিনি রেখে যেতে পারেননি। নামোল্লেখ করা যায় এমন সৃষ্টি বাংলার রঙ্গমঞ্চে নেই। রবীন্দ্রনাথের নাম পূর্বেই বাদ দিয়েছি, তা ছাড়া সাধারণ রঙ্গালয়ে চণ্ডালিকা, রক্তকরবী অথবা মুক্তধারা কে কবে দেখেছেন? বিসর্জন এবং চিরকুমার সভা ক্বচিৎ দেখা দিয়ে সারা বছর বা দীর্ঘতর কাল অদৃশ্য। বাংলার নাট্যসাহিত্যে এবং নাট্যমঞ্চে একই ঘনান্ধকার।

সমবায়ী যুগের দৃষ্টি যেখানে শিল্পে পৌঁচেছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা নভেলের কথা পুনর্বার স্মরণ করতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নূতন শিল্পের সৃষ্টি, তার পিছনে রয়েছে কলকাতা সহর। শুধু কমলাকান্তের দপ্তর নয়, রাজসিংহ, ইন্দিরা বা দেবী চৌধুরাণী যিনি রচনা করেছেন তাঁর মনের উপর নূতন যুগের প্রভাব পড়েছে; শরৎচন্দ্রের রচনায় এ-শিল্পচেতনার ব্যাপকতর উজ্জ্বলতর পর্ব প্রকাশিত। শ্রীকান্ত যেখানেই পরিভ্রমণ করুক বনে জঙ্গলেও তার মনের সমালোচনা আধুনিক বিচারশীল, মানুষের স্বতন্ত্র অধিকার সম্বন্ধে নিরন্তু উৎসাহী। "পল্লীসমাজ" যে-দৃষ্টিতে দেখা হল তা কেবলমাত্র পল্লীবাসীর নয়, সহরবাসীর দৃষ্টি সেখানে প্রত্যক্ষতর। কলকাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, হয়তো সব দিক বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গোরা, এই বহু সূক্ষ্মদৃষ্টির শিল্প; তারই সঙ্গে নাম করা যায় চতুরঙ্গ এবং ঘরে-বাইরে এই উপন্যাস দুটির। এই গল্পগুলিতে যিনি দেখছেন তিনি আপন স্বভাবের বহির্বর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানুষের জীবনীকে এবং সমাজের বিশেষ পরিবেশকে অস্তিত্বের চরম মূল্য দিয়েই জেনেছেন। কোনো গল্প ঘটনা-বিরল, কোথাও বহুজীবনগ্রথিত সাহরিক ভূমিকা স্পষ্ট দেখা দিয়েছে, কিন্তু ঘটনার মূল্য মানুষেরই, এবং ভূমিকা সার্বভৌম। কোনো মন-গড়া ছাঁচ, বা জাতিভেদ বা বৃত্তিপূজা শিল্পকে খণ্ডিত করেনি; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সার্বজনীন। সেদিন তারাশঙ্করবাবুর "কবি" নামক উপন্যাস প'ড়ে মনে হচ্ছিল এ ধরণের বিচিত্র গল্প-সাহিত্য এর পূর্বে বাংলা দেশে রচিত হতে পারত না। একভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের কালেও নয়। এর পিছনে যে মননের ভূমিকা আছে তা বহুজীবনীমিশ্রিত নূতনতর নাগরিক, যদিও এই বিশেষ গল্পটিতে গ্রাম্য ছবি উৎসুক মনকে অধিকার করে নেয়। বহুধা বিচিত্র জীবন ও জীবিকার হাজার সুতোয় গাঁথা যে বুনোনি তারই শিল্প বিভূতিবাবুর "পথের পাঁচালি"কে মিশিয়েছে "আরণ্যকে"র বৃহত্তর ক্ষেত্রে, দুয়ের মধ্যে সেতু সুস্পষ্ট যদিও গল্প দুটির লক্ষ্য স্বতন্ত্র। "পদ্মানদীর মাঝি", "পুতুল ও প্রতিমা", "জননী জন্মভূমিশ্চ" প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট শিল্পরচয়িতার ভিন্ন মাননিক সৃষ্টি কিন্তু উপন্যাসের ধর্ম অর্থাৎ বিবিধ ঐক্যসম্ভাত শিল্পের ক্ষেত্রে তারা একই যুগের। "মহানির্বানের পথে" এই নব যুগশিল্পেরই

প্রকৃষ্ট উদাহরণ ; যে-মন তীর্থে বেরিয়েছে তার কাছে মানুষের বৃহৎ জীবনই তীর্থ। ছোটো গল্পের বিস্তৃত প্রসঙ্গ এখানে তুলবনা কিন্তু নূতন বিশ্বসাহিত্যের পরম আশ্চর্য দুটি গল্প, প্রমথ চৌধুরীর "আহুতি" এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের "দুই কান কাটা" শুধু কারুদক্ষতায় নয়, নিগূঢ় একাত্মক মননশিল্পের পরিচয়ে যথার্থ আধুনিক। চিত্তের সমভাবিতা এবং অকুণ্ঠিত জীবনদর্শন ঐ সংহত শিল্পসৃষ্টির ক্ষুদ্রায়তনে মানব চরিত্রের বৃহৎ একটি অবকাশ রচনা করেছে ; যেটুকুই দেখাচ্ছ সব মিলিয়ে দেখি, মনের মানদণ্ড গ্রামে সহরে একই শুভ্রতায় বিচারশীল। গভীর ভাবনা এবং বিচিত্র দৃষ্টির সহযোগে যে-মমত্বরস এই জাতীয় শিল্পে সঞ্জাত হয় তার আভিজাত্য কোনো সামাজিক সংবিধানে নির্ধারিত নয়, তা দরদী নূতন কালের অনুভূতির সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ এক জাতীয় শিল্পের কথাই এখানে আলোচনা করেছি ; বলা বাহুল্য অন্যবিধ উৎকর্ষ শিল্প আধুনিক কালেও গল্পে কবিতায় দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই যুগের শিল্পমানসের বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

"যে পথে আমাদের সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত বা ব্যাহত হয় তা দিয়েই আমাদের জীবন সত্যি করে নিয়ন্ত্রিত। যথাযথভাবে রচিত হ'লে এখানেই উপন্যাসের বিরাট প্রয়োজনীয়তা। তখন উপন্যাস আমাদের পরিবেদনশীল চেতনার ধারাকে অবহিত করে' নূতন স্থানে চালিত করে নিয়ে যায় এবং অতীত মৃতের স্তূপ থেকে আমাদের সহানুভূতিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করে। কাজেই যথাযথ রচনাকৌশলে উপন্যাস জীবনের গুপ্ততম স্থান উদ্ঘাটিত করতে পারে……" ডি, এইচ্, লরেন্স।

কবিতা

চীনা তর্জ্জমা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই
জল নেই আর জ্বালাও নেইক
বুকে তার আর বাজ নেই
শাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মঠের চূড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা
মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে থেকে মনে পড়ে।

মেঘের মতন শাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,

মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেণাই বুঝি বা হবে।
পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জারকে জরে' জরে' যেন
মনে আর কোনো ঝাঁঝ নেই।
ঢিলে কোঁচকান মুখখানি তার,
মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ হাসি কোথায় পেলে ?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি, হৃদয়
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে।
যে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে'
কালো হয়ে' নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় করে ঢেলে সে-ই
শাদা হাসি হ'য়ে ভাসে।

দেন্‌দার

অজিত দত্ত

যা পেয়েছি তাই যদি রোজ বাঁচাই,
কিছুই যদি না চাই,
হয়তো তবে সেই ছোটো সঞ্চয়ে
ঋণের বোঝার এই গুরুভার মিলায় লঘু হয়ে।

কেমন করে', কী সৌভাগ্যে জানি
সবারই দান, সবারই ঋণ পেলাম অনেকখানি ;
হৃদয়-ভরা সে-ঐশ্চর্য মুহূর্তে ফুৎকারে
বিলিয়ে দিলাম সবার দ্বারে দ্বারে।
দেনার স্মৃতি থাকলো শুধু, এক নিমেষের মতো
দীন্‌-দুনিয়ার বাদ্‌শা সেজে খেলাম থতোমতো ;
নিলাম যা তা হোলো না আর শোধ,
দিলাম যা তার হিসেব রাখেন প্রাণের মালিক খোদ

সবার কাছেই তাইতো অপরাধী,
দেনার খতের মাম্‌লাতে আজ দীন্‌-দুনিয়া বাদী।
তবুও এই প্রাণের স্বভাব যায় না কোনো কালে,
দিল-দরিয়ায় উজান এলে ফুর্তি লাগাই পালে।
নতুন দেনায় খাতক হয়ে ফের
দুনিয়াদারির নতুন খোঁজে বেড়াই মুসাফের ॥

ভাঙাঘরের গান

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমরা অনেকদিন অনেক প্রহর
বলেছি এক-ই কথা, শুনেছি এক-ই কণ্ঠস্বর
হাসিতে, কান্নায়, প্রেমে, বিরহে, ব্যথায়।
এখনো হৃদয়ে যেন হঠাৎ কোথায়
সেই স্বর স্মৃতির মতন
আনাগোনা করে,
এখনো—যখন আর আমরা বলিনে এক কথা !—
এখনো যায়নি মরে মনের মমতা
তাই মনে পড়ে
একদিন,—বহুদিন আমরা ছিলাম একই ঘরে !

আমাদের ভাঙা ঘরে, ভাঙা মাঠে, আকাশের আনাচে-কানাচে
মনের অনেক ছায়া
ছায়ার মতন বেঁচে আছে।
জীবনের ছোট ছোট রোদ নিয়ে ছবি আঁকে এখনো সময়,
চকিতে চোখের মায়া
হৃদয়ের আশেপাশে বুঝি জেগে রয়।

আমরা বলিনে এক কথা।
তবু সে-জীবন এক—এক-ই সময়।
হৃদয়ের একই ব্যাকুলতা
দিয়ে যায় বিছায়ে বিছায়ে
ভাঙা ঘরে, ভাঙা মাঠে, ভাঙাচোরা আকাশের গায়ে
পুরোনো দিনের রঙ, পুরোনো দিনের পরিচয়॥

অজানার সন্ধান

নীরজ দাশগুপ্ত

অজানাকে জানবার কৌতূহল মানুষের চিরকালের, অথচ তার বাধা প্রতিপদে। যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচয়, তাদের দৌড় বড় বেশি নয়। কতটুকুই বা আমরা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি! ঘ্রাণ, স্পর্শ বা স্বাদবোধের সীমানা ত আরো ছোট। অনুভূতির পুরু পর্দা ঠেলে বাইরের যেটুকু খবর আমাদের কাছে পৌঁছায় তারই বৈচিত্র্যের সীমা নেই, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যে অজানা অনন্ত জগৎ পড়ে আছে তার আকর্ষণ আরো কত বেশি! মানুষের প্রতিভা অনুভূতির এই বিরাট বাধা মানতে কিছুতেই রাজি নয়, অনুভূতির ছেলেভুলানো গল্পেও সে সন্তুষ্ট নয়। অজানা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের রহস্য তাকে ব্যাকুল করে তোলে। এই অজানার সন্ধানেই সুরু হল বিজ্ঞানের সাধনা।

চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয় চোখ। এই বিশ্বজগৎ জুড়ে শক্তির (বা বিদ্যুতের) ঢেউ চলেছে। এর অতি সামান্যই চোখে পড়ে, অধিকাংশই পড়ে না। সূর্য্যের সাদা আলোয় সাত রঙের ঢেউ মিলিয়ে আছে; যাদের আলাদা করে দেখা যায় রামধনুর সাত রঙের খেলায়। এদের মধ্যে সব চাইতে ছোট ঢেউ বেগুনি রঙের, তাদের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ঢেউর এক চুড়া থেকে পরবর্ত্তী চূড়ার দূরত্ব ইঞ্চির লক্ষভাগের দেড় ভাগ মাত্র। আর সব চাইতে লম্বা আলোর ঢেউ যা আমরা দেখতে পাই, লালরঙের, দৈর্ঘ্যে মোটামুটি ইঞ্চির লক্ষভাগের তিন ভাগ। এই দুই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে—ইঞ্চির লক্ষ ভাগের দেড় ভাগ থেকে তিন ভাগ পর্য্যন্ত যে ক'টি ঢেউ চলে আমাদের চোখ কেবল সেই কটিকেই আলো বলে চিনতে পারে। আর এই পরিধির বাইরে যে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ঢেউর নিত্য আনাগোনা চলেছে আমাদের চারদিকে, তারা আমাদের দৃষ্টির অতীত।

সূর্য্য থেকে অদৃশ্য আলো ছাড়া তাপও পাই। তাপের ঢেউ লালরঙের চাইতে দীর্ঘতর। এদের আমরা স্পর্শ দিয়ে অনুভব করি, দেখতে পাইনা। এদের নাম দেওয়া যায় অতিলাল তরঙ্গ (Infrared Rays)। আবার বেগুনী রঙের চাইতে আরো সূক্ষ্ম বিদ্যুত-তরঙ্গও সূর্য্য থেকে আসে, যাদের কি রঙ জানবার কোন উপায় নেই কেন না এরা আমাদের চোখে কোন অনুভূতিই জাগায় না। এদের নাম দেওয়া হয়েছে অতি বেগুনী ঢেউ (Ultraviolet

Rays)। আমরা দেখতে না পেলেও ফটোগ্রাফিতে এরা ধরা পড়ে এবং রিকেটস্, একজিমা প্রভৃতি নানা রকমের ব্যারামে এই তরঙ্গ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়।

তাপের ঢেউর সীমানা ছাড়িয়ে আরো বড় যে বিদ্যুতের ঢেউ তাদের নাম হার্টস্ তরঙ্গ। আরো বড় বিদ্যুতের ঢেউ আছে যারা চল্লিশ পঞ্চাশ ইঞ্চি থেকে দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এরা বয়ে আনে রেডিওর বার্ত্তা, গানবাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি। আমাদের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীয় বলে এদের আমরা দেখতে পাইনা, শব্দ বা স্পর্শ দিয়েও বুঝতে পারি না। এই সমস্ত শক্তির ঢেউকে আমরা অনুভব করিনা কারণ এদের দৈর্ঘ্য খুব বেশী। অন্যদিকে অতি-বেগুনী বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির চাইতেও অনেক ছোট ছোট ঢেউ আছে, যারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় খুব ছোট বলে! এই দলে আছে এক্স তরঙ্গ, গামা তরঙ্গ, কস্মিক তরঙ্গ ইত্যাদি। দৈর্ঘ্যে এরা ইঞ্চির কোটি ভাগের একভাগের চাইতেও ছোট। তবে সূক্ষ্ম হলেও এরা প্রচণ্ড শক্তির বাহন। কস্মিক তরঙ্গের শক্তি এত বেশী যে এরা অনায়াসে আমাদের শরীর ভেদ করে, এই পৃথিবীর মাটির বুক চিরে তার অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রতি মিনিটে আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রায় একশটী কস্মিক তরঙ্গ নানা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে চলে যায়; তবুও আমরা কিছুই অনুভব করি না। দ্বিতীয় চিত্রে আমাদের জানা সব রকমের বৈদ্যুতিক ঢেউকে দৈর্ঘ্য হিসাবে সাজানো হয়েছে। কেবল মাত্র চিহ্নিত অংশের মধ্যে যে তরঙ্গগুলো আছে তাদেরই আমরা আলোরূপে দেখি। আর যে সমস্ত ঢেউ এই অংশের বাইরে আছে তাদের বলা চলে অদৃশ্য আলো বা বিদ্যুতের ঢেউ।

আমাদের দৃষ্টির এই সীমাবদ্ধতার দরুণ আমরা আলোক তরঙ্গের চেয়ে ছোট কোন জিনিষ দেখতে পাই না। কেন দেখতে পাই না তা ১নং ছবি থেকে ভালো করে বুঝা যাবে। সাগরের মধ্যে ছোট বড় কতগুলি পাথর ঢেউএর পথে বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় পাথরগুলির চারপাশে খানিকটা অংশে কোন ঢেউ নেই, কারণ ঐ সমস্তপাথরে বাধা পাওয়ার দরুণ

১নং ছবি

ঢেউর গতি অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু পাথরগুলি যদি ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে তাহলে পাথরের আকার অনুযায়ী নিস্তরঙ্গ জলের পরিমাণও ক্রমেই কমতে থাকবে। অবশেষে বাধা যখন

ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের সমান বা আরো ছোট হবে, তখন ঢেউগুলি বাধার চারিদিক দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে—তাদের অবিরাম গতিও বজায় থাকবে। এই অবস্থায় ঢেউয়ের রূপ থেকে তাদের পথবর্ত্তী কোন বাধার অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাবে না। আলোর ঢেউ সম্বন্ধেও এই নিয়মটি প্রয়োগ করা চলে। যে সব জিনিষ আলোর ঢেউয়ের চেয়ে ছোট তারা আলোর ঢেউয়ের পথে কোনও বাধা দেয় না এবং আলোও আমাদের কাছে তাদের সম্বন্ধে কোনও খবর পৌঁছায় না।

মাইক্রোস্কোপের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং সম্ভবতঃ আরো হবে। কিন্তু যে যন্ত্র বা চোখ আলো ব্যবহার করবে তার সাহায্যে আলোর চাইতে ছোট কোন জিনিষ দেখা কখনো সম্ভব হবে না। আলোর ধর্ম্মই ওই। এ নিষ্ঠুর সত্যটা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝেছেন প্রায় ৫০ বৎসর আগে। তখন থেকেই নানা ভাবে চেষ্টা চলছে প্রকৃতির এই বাধা কি ভাবে অতিক্রম করা যায়, কি করে দৃষ্টির সীমা আরো বাড়ানো যায়। আমাদের চোখের ক্ষমতা এত কম হওয়াতে কতো যে অসুবিধা ২নং চিত্রে তা ভালো করে দেখানো হয়েছে।

২নং ছবি

দৃষ্টির সীমা

মনে করুন পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ একটি বড় আলমারির থাকে-থাকে সাজানো আছে। প্রতিটি থাকের ব্যবধান পূর্ব্বের থাকের চাইতে দশগুণ বেশী। মাপের একক (unit) এক সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। চোখের ঠিক সামনের থাকে এক সেন্টিমিটার থেকে দশ সেন্টিমিটারের (২/৫ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি) মধ্যবর্ত্তী মাপের নানা জিনিষ আছে। মোটামুটি এই রকমের অনেক জিনিষ আমাদের আশপাশে সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায়; যেমন একটি দেশলাইয়ের বাক্স, একটি পয়সা, পেন্সিলকাটা, দোয়াত

৩নং ছবি

চৌম্বক লেন্স

৪নং ছবি

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ

৫নং ছবি

ফাজ

৬নং ছবি

ব্যাক্টিরিয়ার উপর ফাজের ক্রিয়া
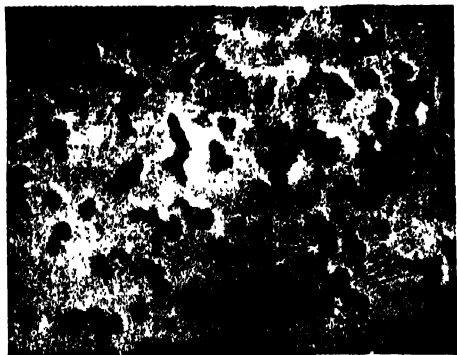
৭নং ছবি

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস্‌

৮নং ছবি

টোবাকো মোজেইক

৯নং ছবি

মিশ্রধাতুর ত্বক

১০নং ছবি

সিমেণ্ট

ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিষের প্রতীক স্বরূপ একটি পয়সা এই থাকে দেখানো হয়েছে। এর উপরের থাকে আছে এর দশগুণ বড় অর্থাৎ দশ সেন্টিমিটার (চার ইঞ্চি) থেকে একশ সেন্টিমিটার (চল্লিশ ইঞ্চি) মাপের সমস্ত জিনিষ এই মাপের জিনিষের মধ্যে বই, স্যুটকেস, চেয়ার ইত্যাদি পড়বে। এই সমস্ত জিনিষের নমুনাস্বরূপ একখানি বই ১নং সেল্‌ফে রাখা হয়েছে। তার উপরের থাকে (২নং) আরো দশগুণ বড় জিনিষ অর্থাৎ ১০০ থেকে ১০০০ সেন্টিমিটার (৪০ ইঞ্চি থেকে ৪০০ ইঞ্চি) মাপের সমস্ত জিনিষের নমুনা একটি মানুষ রাখা হয়েছে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে আরো দশগুণ বড় বড় জিনিষের নমুনাস্বরূপ ৩, ৪ ও ৫নং থাকে তিমি মাছ, হাওড়া পুল, হিমালয় প্রভৃতি রাখা যায়। এই ভাবে ৮ম থাকে চন্দ্র (ব্যাস ২১৬০ মাইল), ৯ম থাকে পৃথিবী (ব্যাস ৮০০০ মাইল), ১১শ থাকে সূর্য্য (ব্যাস ৮৬ লক্ষ মাইল) এবং সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ সমেত সৌরজগৎকে (ব্যাস ৪৩০ কোটী মাইল) ১৪ নম্বর থাকে অনায়াসে তুলে সাজিয়ে রাখা যায়। বিশ্বজগতের যে পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী (২০০ ইঞ্চি লেনস্) দুরবীণের দ্বারা দেখতে পেয়েছি তাকেও ২৭নং থাকের মধ্যে তুলে রাখা যায়।

এখন আমরা ক্রমশঃ নীচের থাকের জিনিষগুলির সন্ধান নেবো। নীচের দিকের প্রথম থাকে আছে এক সেন্টিমিটার থেকে এক সেন্টিমিটারের ১/১০ মাপের সমস্ত জিনিষ। এদের প্রতীক একটি আলপিনের মাথা। তার নীচের থাকে এক সেন্টিমিটারের ১/১০ ভাগ থেকে সেন্টিমিটারের ১/১০০ মাপের সমস্ত জিনিষ আছে। এখানে একখানি চুল রাখা হয়েছে যার বিস্তার মোটামুটী এক সেন্টিমিটারের ১/১০০। একে ভালো করে দেখতে হলে আমাদের চোখের বেশ পরিশ্রম করতে হয়, অর্থাৎ আমরা খালি চোখের দৃষ্টিসীমার খুব কাছে এসে পড়েছি। এর আরো নীচে অর্থাৎ ৩নং থাকে আছে ফুলের রেণু—সেগুলি সমষ্টিগতভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু কোন একটি কণিকাকে বিশেষ করে দেখতে হলে আমাদের রিডিংলেন্স-এর সাহায্য নিতে হয়। এই থাকে বা এর নীচে যে সব জিনিষ আছে—সেগুলি আর খালি চোখে দেখা যায় না। খালি চোখের দৃষ্টি এই পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বাধায় দমে যাবার পাত্র নয়; তার দৃষ্টির পরিধি বাড়াবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টায় আবিষ্কার করেছে মাইক্রোস্কোপ। এই যন্ত্র মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে আরো দুই থাক নীচ পর্য্যন্ত। আমরা ৪ ও ৫নং থাকের অধিবাসীদেরও পরিচয় পেলাম। ৪নং থাকে আছে সেন্টিমিটারের ১/১০০০ ভাগ থেকে ১/১০০০০ ভাগ মাপের সমস্ত জিনিষ। এদের নমুনা জীবকোষ (cell) এবং লালরক্তকণিকা। ৫নং থাকে আছে রোগের বীজাণু বা ব্যাক্টিরিয়া। নানা আকারের ব্যাক্টিরিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে ছোটগুলির আয়তন এক সেন্টিমিটারের লক্ষভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত হয়।

উন্নত ধরণের মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করে এই সমস্ত অতিক্ষুদ্র রোগ বীজাণুর ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। ২নং ছবির বাম দিকে স্কেল থেকে দেখা যাবে যে এখন আমরা আলোর ঢেউর ছোট সীমানায় এসে পৌঁছে গেছি। পঞ্চম থাকের নীচে যারা আছে তারা আলোর ঢেউর চাইতেও ছোট ; কাজেই তাদের সন্ধানের জন্য আলোক ব্যবহার করা মশা মারতে কামান দাগার মতই নিস্ফল। মাইক্রোস্কোপের যতই উন্নতি হোক না কেন, পঞ্চম শ্রেণীরও নীচে যারা আছে তাদের কখনও আলোর সাহায্যে আমরা দেখতে পাবো না। যে আলোর ঢেউকে সম্বল করে আমরা বিশ্বজগতে অজানার আবিষ্কারে যাত্রা করেছিলাম তাদের দৌড় এই পর্য্যন্তই।

৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরের অধিবাসীদের জানতে হ'লে আলোর চেয়ে আরো সূক্ষ্মতর ঢেউর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এক্স্‌-রে, গামা রশ্মি প্রভৃতি যে সমস্ত অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ আমাদের জানা ছিল (২নং চিত্র), একে একে সমস্তই এ কাজের অনুপযোগী বলে প্রামাণিত হয়েছে। এই তরঙ্গগুলি এত শক্তিমান্ যে তারা কোনো পদার্থের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা দূরে থাক, সেই পদার্থ ভেদ করে চলে যায়, এবং চলে সোজাপথে। লেন্স (Lens) যেমন আলোক তরঙ্গকে বাঁকিয়ে প্রতিবিম্ব (Image) সৃষ্টি করে, এমন কোন লেন্স নাই যা এক্স্‌রে বা গামা তরঙ্গকে সংহত করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে এক্স্‌ বা গামা রশ্মি আলোক তরঙ্গের চেয়ে আরো সূক্ষ্ম হ'লেও তাদের দ্বারা এ ব্যাপারে বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি।

অথচ ষষ্ঠ ও সপ্তম থাকের অধিবাসীদের দেখার আকর্ষণ সব চাইতে বেশী। জীবিত ও মৃতের সীমারেখা এই দুই থাকের মধ্যেই কোথাও আছে। পঞ্চম থাক পর্য্যন্ত যতদূর ভালো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দৃষ্টি চলে দেখা যায় ব্যাক্টিরিয়া বা জীবন্ত প্রাণী। আর পদার্থ-বিজ্ঞানের নানারকন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অষ্টম থাকে অর্থাৎ $১০^{৮}$ থেকে $\overline{১০}^{৭}$ সেন্টিমিটারের মধ্যে আছে পদার্থের অণু ও পরমাণুর দল (molecules and atoms)। এই সমস্ত অণু ও পরমাণুতে প্রাণের কোন ধর্ম্ম দেখা যায় না, তারা নির্জ্জীব পদার্থের প্রাণহীন-সূক্ষ্মতম কণামাত্র। এবং এটাও নিশ্চিত যে অষ্টম থাকে অবস্থিত প্রাণহীন অণুর কোন এক বিশেষ যোগাযোগের ফলে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। সেই যোগাযোগ কি রকম এবং কি ভাবে প্রাণহীন অণু পরমাণুর দল সংঘবদ্ধ হ'য়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে তা আমরা আজও জানি না ; কিন্তু এটা বুঝতে পারি সেই আদিম সহজতম জীবন (most elementary) আছে পঞ্চম ও অষ্টম থাকের কোন জায়গায়। এই জীবনসীমার নীচে আছে নির্জ্জীব অণু ও পরমাণুর দল এবং উপরে আছে আরো জটীলতর (Complex) প্রাণী।

জীবনের এই সূক্ষ্মতম অবস্থা কি রকম জানতে হ'লে দৃষ্টির পরিধি বাড়ানো ছাড়া উপায়

নেই। দৃশ্যমান আলো আমাদের চারদিকে যে গণ্ডী এঁকে রেখেছে তাকেও অতিক্রম করে যেতে হ'বে; কোন অদৃশ্য আলোর সাহায্য নিতে হ'বে। অবশ্য চাক্ষুষ দেখা না গেলেও বৈজ্ঞানিকেরা ষষ্ঠ ও সপ্তম থাকের অধিবাসীদের সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে অনেক খবর জানতে পেরেছেন,—যেমন মঙ্গলগ্রহে আমরা যেতে না পারলেও এবং সেখানকার প্রাণীজগতের কোন সাক্ষাৎ খবর না পেলেও বেতার বার্ত্তার সাহায্যে সেখানকার খবর নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চাক্ষুষ দেখতে না পেলে মানুষের মন যেন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তাই বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত গবেষণায় আজ এমন একটি যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে আমাদের দৃষ্টির পরিধি আরো একশগুণ বেড়ে গেছে। এই পঞ্চাশ বৎসরের একান্ত সাধনায় ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরের অধিবাসীদের আমরা দেখতে পেয়েছি—যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে বহুদিনের রুদ্ধদ্বার আজ আমাদের চোখের সামনে খুলে গেছে। যে যন্ত্রের দ্বারা এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তার নাম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ। আলোর ঢেউর বদলে এই যন্ত্রে ইলেক্ট্রনের ঢেউ ব্যবহৃত হয়। ২নং চিত্রে দেখা যায় ইলেক্ট্রন তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের প্রায় লক্ষভাগের এক ভাগ। কাজেই যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম জিনিষ আলোক তরঙ্গকে ফাঁকি দেয় তারাও এই অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গের কাছে ধরা পড়ে। এই অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ বা তাদের দ্বারা সৃষ্ট কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব সরাসরি আমরা দেখতে পাই না। কি ভাবে এই তরঙ্গকে কাজে লাগানো হয়েছে তা জানতে হলে আর একটু খুলে বলা দরকার।

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার

১৮৯৭ সালে জে জে টমসন প্রথম ইলেক্ট্রনকে পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হন। তিনি দেখান যে ইলেক্ট্রন সকল জিনিষেই আছে। বায়ুশূন্য স্থানে কোন ধাতুকে গরম করলে ঐ ধাতুর-ইলেক্ট্রনগুলি কাঁপতে থাকে। গরম যত বাড়ে ইলেক্ট্রনের কাঁপুনিও তত বাড়ে। অতিরিক্ত গরমে ধাতু থেকে ইলেক্ট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ইলেক্ট্রন বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। জে জে টমসনের পরীক্ষা থেকে মনে হয় ইলেক্ট্রনগুলো খুব ছোট গুলির মত। এরা এত ছোট যে প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি ইলেক্ট্রনকে পাশাপাশি রাখলে এক ইঞ্চি আন্দাজ জায়গা জুড়ে থাকবে। জে জে টমসনের আবিষ্কারের অনেকদিন পরে ১৯২৭ সালে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডেভিসন এবং গার্মার, এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জি, পি, টমসন নানা রকমের পরীক্ষা দ্বারা দেখান যে ইলেক্ট্রনগুলি সময় সময় ছিটেগুলির মত ব্যবহার করলেও অন্যসময় ওরা ঢেউর মত চলে। আধুনিক বিজ্ঞানের হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সব জিনিষই এইভাবে কখনও ঢেউর মত কখনও শক্ত নিরেট গুলির মত পরস্পর উল্টো ব্যবহার করে। এই বৈজ্ঞানিকেরা আরো বলেন যে ইলেক্ট্রনের ঢেউর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে তাদের গতির বেগের উপর। যে ইলেক্ট্রন যত বেগে চলে তার ঢেউর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক চুড়া থেকে ঢেউর অন্য চুড়ার দূরত্ব—তত কম হয়।

এঁদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে যে-কোন ইলেক্ট্রন প্রবাহকে ৬০,০০০ ভোল্ট (বা তড়িচ্চালক শক্তি) দ্বারা চালিত করলে সেই ইলেক্ট্রনের ঢেউর দৈর্ঘ্য প্রায় ইঞ্চির হাজার কোটিভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ আলোর ঢেউর ঠিক লক্ষভাগের একভাগ হয়। আমাদের ঘরে যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে তার শক্তি মাত্র ২২০ ভোল্ট। এই হিসাবে যে শক্তি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালায় সেটা আরো ৩০০০ গুণ শক্তিমান্। এই অতিসূক্ষ্ম ইলেক্ট্রন ঢেউগুলি কাজে লাগাতে পারলে, সাধারণ আলোকের সাহায্যে যা দেখা যায় না তা দেখা সম্ভব হ'তে পারে। অবশ্য চোখের সাহায্যে ইলেক্ট্রনের ঢেউ দেখা যাবে না, তবে এরা ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে।

১৯২৬ সালে বুশ নামে একজন অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে একখানি আতশী-কাঁচ সূর্য্যের আলোতে ধরলে যেমন সূর্য্যের আলো এক জায়গায় কেন্দ্রিত (Focussed) হয়—, সেই রকম নানাদিকে ছড়ানো ইলেক্টনের ঢেউও চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রিত করা যায়। ৩নং চিত্রে তিনটি চৌম্বক লেন্সের ছবি দেখানো হয়েছে। তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে যখন বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালানো হয় তখন লেন্সের সরু ছিদ্রপথে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এবং এই পথ দিয়ে যাবার সময় চৌম্বক শক্তিতে ইতস্ততঃ ধাবমান ইলেক্ট্রনগুলি সংহত হয়।

এই প্রকারের ম্যাগ্নেটিক বা চৌম্বক লেন্স ব্যবহার করে ১৯৩২ সালে নোল এবং রুস্কা নামক দুজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক প্রথম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারী করেন। ১৯৩৪ সালে মার্টন নামক বেলজিয়ান বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়ার ছবি তুলেন। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের শৈশব এখনও কাটেনি কিন্তু এর মধ্যেই এর সাহায্যে নানা বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হয়েছে।

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োগ

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের সুযোগ দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র এর দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত।

রোগ মানুষের নিত্যসঙ্গী। আদিকাল হ'তে মানুষ এই রোগের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও কোন রোগের বীজাণু কেমন তা না জেনেই চিকিৎসকদের কাজ করতে হ'ত। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারে চিকিৎসা-বিদ্যায় এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। চিকিৎসকগণ তাঁদের অদৃশ্য শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখে তাদের ধ্বংস করার নূতন উপায় খুঁজে পেয়েছেন। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা অনেক

ব্যাক্টিরিয়া অবশ্য সাধারণ মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় কিন্তু এই নূতন যন্ত্রে ব্যাক্টিরিয়ার গঠন প্রণালী এবং তাদের ভিতরকার সূক্ষ্মতম অংশগুলির আরো বিশেষভাবে পরীক্ষা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যাক্টিরিয়ার উপর নানা রকমের ঔষধ ফাজ বা সিরাম প্রয়োগের ফলও পরীক্ষা করা যায়।

আজকাল অনেক ব্যারামে যেমন টাইফয়েড ডিসেন্ট্রি ইত্যাদিতে আমাদের দেশের ডাক্তারেরা ফাজ (phage) ব্যবহার করেন। কিন্তু ফাজ কি রকম এবং তারা কিভাবে ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস করে সে সম্বন্ধে কারো সঠিক ধারণা ছিল না। কেবল এইটুকু মাত্র জানা ছিল যে ফাজ ব্যাক্টিরিয়ার মারাত্মক শত্রু এবং এক একটি ফাজ কেবল মাত্র এক রকমের ব্যাক্টিরিয়াই বিনাশ করে। ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপে ফাজ দেখা সম্ভব হয়েছে এবং ব্যাক্টিরিয়ার উপর ফাজের প্রতিক্রিয়ার ছবিও তোলা হয়েছে। ব্যাক্টিরিয়া কালচারের উপর ফাজ দিলে, দেখা যায় অল্পক্ষণ পরেই ব্যাক্টিরিয়ার খোলসটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ভিতরকার সমস্ত (প্রোটোপ্লাজম) জৈবপদার্থ বার হ'য়ে আসে। কেবল ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াস (কেন্দ্রবস্তু) দানা বেঁধে পড়ে থাকে। ঠিক এই ভাবেই এই নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়ার উপর সিরামের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল দেখা গেছে। (৫ ও ৬ নং ছবি)

ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কিছুদিন থেকে সচেতন, এবং ভাইরাসজনিত রোগ যেমন বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি যে মানুষের এবং ফসলের বহুলপরিমাণে ক্ষতি করে চলেছে তাও তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু মানুষের এই দুর্দ্দান্ত শত্রু এত ছোট যে তাকে দেখবার সুযোগ এতদিন মানুষ পায়নি। সাধারণ মাইক্রোস্কোপে এই ভাইরাস দেখা যায় না। কিন্তু ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের অসামান্য শক্তির কাছে ভাইরাসও হার মেনেছে। ভাইরাসের আকার, দেহের গঠন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাইরাসগুলি সাধারণতঃ '২৫ মাইক্রণ লম্বা এবং '০১ মাইক্রণ প্রশস্ত (১ মাইক্রণ ১ মিলিমিটারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ)। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে ভাইরাসগুলি এক একটি স্বতন্ত্র প্রোটিন মলিকিউল কিন্তু এরা জীবিত কি মৃত তা আজও ঠিক করা যায়নি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রামকতার কারণ অতিঅল্প কয়েক বৎসর আগেও জানা ছিল না। ১৯৩২—১৯৪০ সালের মধ্যে তিন রকম ফ্লু ভাইরাস (৭নং ছবি) প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা প্রথম এই ছবি তোলা এবং এই ভাইরাসের উপর সিরামের প্রভাব পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদজগৎও ভাইরাসের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত। আলু, টমাটো প্রভৃতি মানুষের অপরিহার্য্য খাদ্যশস্যের প্রভূত ক্ষতির কারণ এই ভাইরাস। তামাকের গাছও এই ভাইরাসের হাত থেকে রেহাই পায়না। প্রতিবছর ভাইরাসের আক্রমণে

টোবাকো মোজেইক (Tobacco mosaic) নামক এক প্রকার রোগে বহু তামাকের ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু আলোকমাইক্রোস্কোপে ধরা পড়েনা বলে এতদিন এর কোন প্রতিকার সম্ভব হয়নি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই ভাইরাস সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করা হয়েছে এবং এ'দের নির্ম্মূল করার ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে।

জীবতত্ত্বের আলোচনায় খুব শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নিতান্ত প্রয়োজন। উন্নততর প্রাণীর জীবকোষের অন্তর্গত অনেক অংশ সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ভালো করে পরীক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ জীবকোষের অন্তর্গত ক্রোমোসোম (chromosome) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। এই ক্রোমোসোমগুলি এত ছোট যে আলোকমাইক্রোস্কোপের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে তবে তাদের একটু পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। কোনও জীবিত পদার্থের আকার এবং গঠন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই নির্ভর করে এদের ব্যবহারের উপর। প্রতিটি জীবকোষ সৃষ্টি হ'বার সময় এরা বিভক্ত হয়ে সেই নূতন কোষের অঙ্গীভূত হয়। এদের এই ভাগাভাগির সামান্য ব্যতিক্রমে নবজাতকের সম্পূর্ণ নূতনরূপ দেখা যায়। নানারকমের পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই ক্রোমোসোমের মধ্যে এক সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকণা (gene) আছে। এই জীবকণার মধ্যে পিতামাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দোষ ও গুণের বীজ সুপ্ত থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদ, জীবন্ত সব কিছুই এই ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এই জীবকণা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকলে এই দুই ক্ষেত্রেই উন্নততর বংশজের (species) সৃষ্টি করা সম্ভব এবং সহজ হবে। আলোকমাইক্রোস্কোপে এই জীবকণা দেখা অসম্ভব কিন্তু ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপের অনুগ্রহে এদের গবেষণার অনেক সাহায্য হবে

বিজ্ঞানের আরেকটি নূতন শাখা ধাতুবিদ্যা।

এই মাইক্রোস্কোপের বিশ্লেষণ ক্ষমতা যখন প্রচারিত হ'ল, তখন ধাতুবিজ্ঞানের কর্ম্মীরা তাঁদের কতগুলি জটিল প্রশ্নের মীমাংসার উপায় খুঁজে পেলেন। সে সময় কোনও ধাতুর উপরিভাগ প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না— কিন্তু অতি শীঘ্রই পরোক্ষভাবে ঐ পরীক্ষা পরিচালনা করবার কৌশল উদ্ভাবিত হয়। প্রথমে ধাতুক্ষয়কর কোনও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতুর উপর রেখাপাত করা হয়, তারপর সেই ধাতু তরল কলোডিয়নে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই কলোডিয়ন একটা পাৎলা পর্দ্দার মত ঐ ধাতুর উপর লাগে এবং তার গায়ে ধাতুর অসমান ত্বকের একটা বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়—যার সূক্ষ্মত্ব নির্ভর করে ধাতুর ত্বকের ক্ষমতার উপর। এখন এই পর্দ্দাটি ধাতুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ নিয়মে মাইক্রোস্কোপের মধ্যে রেখে ছবি তুললে সে ছবি ঐ ধাতুর অসমান ত্বকেরই নির্ভুল প্রতীক হয়। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ধাতুর (alloy) শক্তি ও স্থায়িত্ব

সম্বন্ধীয় গবেষণায় ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ যথেষ্ট সহায়তা করছে। ৯নং ছবিতে ম্যাগ্নিসিয়াম ও এলুমিনিয়াম মিশে যে ধাতুর উৎপত্তি হয়েছে তার ত্বকের ছবি দেখা যাচ্ছে—।

রসায়নের গবেষণায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। কারণ পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণা নিয়েই রসায়নের সমস্ত কারবার।

এই সভ্যজগতে ধূলা এবং ধোঁয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে মানুষমাত্রেই সচেতন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই ধূলা এবং ধোঁয়া ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করে নানা দুরন্ত রোগের সৃষ্টি করে—যেমন যক্ষ্মা, সিলিকোশিশ, কাশি প্রভৃতি। এই ধূলার কণা এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ আলোক-মাইক্রোস্কোপে তার আকার ধরা পড়ে না। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এদের আকার ও পরিমাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষের ফুসফুসের ভিতর যে পদার্থকণা পাওয়া যায় তার ব্যাস মাত্র ·২ মিক্রোণ (অর্থাৎ এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। ধোঁয়ার স্বাস্থ্যহানিকর রূপটাই মানুষের সুপরিচিত। কিন্তু কীটনাশক হিসাবেও ধোঁয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে ধোঁয়ার কণাগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতিও বিশেষভাবে জানা দরকার। দুই রকম লেড আর্সেনেট দেখা যায়। একটির কীট পতঙ্গ নষ্ট করার ক্ষমতা খুব অথচ অন্যটির ব্যবহারে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। এর কারণ কি? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা এর কারণ বোঝা গেল। প্রথম ধরণেরটি অতি পাতলা প্লেট ভর্ত্তি আর দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত মোটা দানা দানা কণার সমষ্টি। এই প্রথম ধরণের লেড আর্সেনেট অনেকখানি যায়গা জুড়ে সমস্ত কীট পতঙ্গ ধ্বংস করতে পারে।

অনেক ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ঔষধেরও প্রধান ধর্ম্ম পদার্থকণার বিস্তার এবং তাদের বিভাজনের সূক্ষ্মতা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানারকম পাউডারের ব্যবহার প্রচলিত হচ্ছে। প্রসাধনের উপকরণ ছাড়াও কীটনাশক এবং প্রতিষেধক ঔষধও পাউডারের আকারে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি পাউডারের বিশেষ গুণ নির্ভর করে পাউডার কণার আকৃতির উপর। এক রকম মুখে মাখবার পাউডার অত্যন্ত জনপ্রিয় কারণ একবার ব্যবহার করলে সহজে মুছে যায় না। মাইক্রোস্কোপের নীচে এই পাউডারের কণা অত্যন্ত কৌণিক বলে প্রমাণিত হ'ল এবং এই সকল কোণের সাহায্যেই যে ঐ কণাগুলি বঁড়শীর মত চামড়ার উপর লেগে থাকে তা স্পষ্টই বোঝা গেল। মোটরের টায়ার যে রবারের তৈরী তার সঙ্গে কার্ব্বণের পাউডার মিশানো থাকে। এই কার্ব্বণ পাউডারের উপরেই রাবারের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু কি উপায়ে কার্ব্বণ পাউডার রাবারের গুণের তারতম্য ঘটায় তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছিল না। ইলেক্ট্রন মাইক্রোগ্রাফে দেখা যায় কার্ব্বণ পাউডারগুলি রাবারের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক আছে তার মধ্যে ঢুকে যায় এবং তাতে রাবারের স্থায়িত্ব

শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। এইভাবে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ সাহায্যে কোন্ কার্ব্বণ পাউডার রাবারের পক্ষে উপযোগী হবে তা আগে থেকেই ঠিক করার সুবিধা হয়েছে।

শুকনো সিমেণ্টের (cement) এর গুঁড়ো হাতে নিলে অত্যন্ত মিহি বলে মনে হয়। এই সূক্ষ্ম দানা জমে কি ভাবে অতি শক্তিশালী কন্‌ক্রিট্ (concrete) তৈয়ারী হয় তা ধারণা করা কঠিন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচে কিন্তু দেখা যায় যে এই সিমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে নানারকম সূক্ষ্ম আঁশ এবং দানার সমষ্টি। নির্দিষ্ট সময় ভিজবার পর ঐ আঁশ এবং অন্যান্য সব অতিসূক্ষ্ম কণাগুলি পরস্পর জড়িয়ে যায় এবং শুকিয়ে গেলে অত্যন্ত শক্ত কন্‌ক্রিটে (concrete) পরিণত হয়। ১০নং ছবিতে সিমেণ্টের আঁশ এবং বিভিন্ন প্রকারের কণাগুলি দেখানো হয়েছে।

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্‌কোপ

অণু এবং পরমাণু সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা মানুষ করে আসছে উপনিষদের কাল থেকে। সমস্ত রসায়নশাস্ত্র অণু-পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অণু ও পরমাণু পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পৌঁছাবে একথা একসময় আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। অনেকদিনের অক্লান্ত সাধনার ফলে যখন ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হ'ল, তখন বৈজ্ঞানিকেরা আশা করলেন যে এবার এই অতি সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু দেখা যাবে। এই আশা হওয়া অতি স্বাভাবিক। ২য় নম্বর চিত্র থেকে দেখা যাবে যে ইলেক্‌ট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অণু পরমাণুর চাইতে ছোট। অতএব এই অতিসূক্ষ্ম ঢেউর কাছে অণু পরমাণুও ধরা পড়বে এই আশায় বৈজ্ঞানিকেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাধা এল অতর্কিতে, সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

আলোর ঢেউর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় দেখা গেছে যে কোন তরঙ্গের সাহায্যে সেই তরঙ্গের চাইতে ছোট কোন জিনিষ দেখা সম্ভব নয়; সেই হিসাবে আলোক মাইক্রোস্কোপে আলোর ঢেউর সমান মাপের ব্যাক্‌টিরিয়া যখন দেখা গেল তখনই বোঝা গেল যে এই মাইক্রোস্কোপের চূড়ান্ত পরিণতি হয়ে গেছে। গত দুইশত বৎসরের * চেষ্টার ফলে কাচের লেন্স সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হয়েছে--তাই সাধারণ মাইক্রোস্কোপেরও চূড়ান্ত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ আলোক তরঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে আমাদের কোনও বাধা নেই। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের ঢেউর দৈর্ঘ্য হিসাবে আমাদের দশম থাক পর্য্যন্ত দেখা উচিত। কিন্তু

* ডেনিশ বৈজ্ঞানিক লীভেনহোক্ ১৬১০ সালে প্রথম মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন। এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দাঁতের ময়লা পরীক্ষা করার সময় তার মধ্যে জীবিত পোকা দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেন।

আজ পর্য্যন্ত এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সপ্তম থাকের নীচে এখনও যেতে পারিনি। এর প্রধান কারণ, যে চৌম্বক লেন্স দিয়ে এই মাইক্রোস্কোপ তৈরী তাদের এখনও অনেক ত্রুটি বর্ত্তমান। এই সকল খুঁতের জন্য মাইক্রোস্কোপের সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষমতা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। এই চৌম্বক লেন্সের নানা রকমের দোষের জন্য আমরা এখন পর্য্যন্ত ইলেকট্রনের ঢেউর সমান কোন সূক্ষ্ম জিনিষ পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, ওই সীমার এক হাজারগুণ দূরে থাকতেই আমাদের থেমে যেতে হয়েছে।

দশ বৎসর আগেকার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের চাইতে আজকের মাইক্রোস্কোপ অনেক অংশে উন্নত হলেও পরমাণু দেখতে ঠিক যতখানি শক্তির প্রয়োজন এই মাইক্রোস্কোপের ঠিক ততখানি শক্তি এখনও হয় নি। তবে এই যন্ত্রের শৈশব এখনও কাটেনি। আরো উন্নত ধরণের যন্ত্র শীঘ্রই আবিষ্কৃত হবে আশা করা যায়।

অত্যন্ত ছোট পরমাণু এবং অণুগুলি এখন দেখা না গেলেও যে অণুগুলি বড় সে পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি আজই পৌঁছে গেছে। এই মাইক্রোস্কোপে সম্প্রতি শামুকের রক্তের হেমোশিয়ানিন নামক অণুর ছবি নেওয়া হয়েছে। এই অণুগুলি বেশ বড় অণু। এক একটিতে হাজার হাজার পরমাণু আছে। এর চাইতে ছোট অণু দেখার প্রধান বাধা এই যে অণুগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। যে অণু যত ছোট তার বেগ তত বেশী। ছোট ছোট অণু দেখতে হলে প্রথমে তাদের স্থির রাখার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সেই ক্ষেত্রে যার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হ'বে—সেই পদার্থের অণু পরীক্ষণীয় অণুর তুলনায় অনেক হাল্কা হওয়া দরকার। যেমন কলোডিয়নের উপর সোণার অণু রেখে দেখার ব্যবস্থা করা। কলোডিয়নের অণু সোণার অণুর চাইতে কম ভারী। তাই ঐ অণু থেকে যে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হ'বে সেগুলি সোণার অণুর থেকে যে ইলেকট্রন বর্ষিত হ'বে তাদের ঢাকতে পারবে না। অতএব সোণার অণুটি পরীক্ষা করতে কোনও অসুবিধাই হ'বে না। আবার অণু যদি খুব ছোট হয়—তাহ'লে যে ইলেকট্রন তরঙ্গদ্বারা আমরা অণুকে দেখবার চেষ্টা করছি—সেই তরঙ্গের ধাক্কায় অণু তার স্থানচ্যুত হবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে তাকে দেখা অসম্ভব। অথচ এর চাইতে কম শক্তিশালী তরঙ্গ ব্যবহার করলে সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হবে বেশী এবং আমরা অণুকে মোটেই দেখতে পাবো না।

আবার আমরা প্রকৃতির আর এক বাধার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আবার আমাদের হেরে যাবার সম্ভাবনা এসেছে। আমরা কি কখনও সপ্তম থাকের নীচে অবস্থিত জিনিষগুলি দেখতে পাবো? সূক্ষ্মতম অণু, পরমাণু, অণুর কেন্দ্রবস্তু (Nucleus)—যারা অতিসূক্ষ্ম হ'লেও হিরোসিমার মত সহরকে মুহূর্ত্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার স্পর্দ্ধা রাখে—তারা কি চিরদিনই অদৃশ্য থেকে যাবে? কিন্তু প্রকৃতির কোন বাধাইত মানুষকে

বেশীদিন দমিয়ে রাখতে পারে নি। মানুষের-বুদ্ধি ও প্রতিভা চিরদিন সেই বাধা অতিক্রমের পথ দেখিয়েছে। এবারেও হয়ত ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সহায়ে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা বিফল হবে না।

এই ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রথম আবিষ্কৃত হয় জার্ম্মাণীতে। যুদ্ধের ফলে যখন জার্ম্মাণীর স্বাভাবিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সকল বৈজ্ঞানিককে যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণায় লিপ্ত হ'তে বাধ্য করা হয়—তখন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকা চলে যান। তাঁদের চেষ্টায় আমেরিকার আর, সি, এ, কোম্পানী প্রথম এই যন্ত্র সাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য বাজারে বার করেন। এরূপ একটি যন্ত্রের বর্ত্তমান দাম আমেরিকাতে তেরো হাজার ডলার। অর্থাৎ কাষ্টমশুল্ক এবং এদেশে আনার খরচ সমস্ত নিয়ে প্রায় ৬৫,০০০ টাকা। অপেক্ষাকৃত কম দামী একটী ছোট মডেল আছে, যার দাম প্রায় এর অর্দ্ধেক—তবে তাতে সব রকমের গবেষণার কাজে সুবিধা হয় না।

যে যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে তার কতগুলি অংশ আমেরিকা থেকে আনা; বাকি সমস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় তৈরী। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান কলেজের তৈয়ারী এই প্রথম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ। এর নির্ম্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে আশা করা যায় আগামী বৎসর থেকেই এর সাহায্যে নানারকম গবেষণার কাজ আরম্ভ করা হ'বে।

আমাদের মাইক্রোস্কোপের খরচ ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় দিয়েছেন। তাঁর দানে এবং অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উৎসাহে বর্ত্তমান লেখকের এক বৎসর ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মাইক্রোস্কোপের একজন আবিষ্কারক ডাঃ মার্টনের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল।

আমাদের দেশে রোগের অন্ত নাই। রোগের এবং আহার্য্যের অভাবে অকালমৃত্যুর এবং অপমৃত্যুর হার সব চাইতে বেশী। এতবড় দেশে একটি কেন, অনেকগুলি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দরকার। বর্ত্তমানে এই যন্ত্রের দাম এত বেশী যে আমাদের দেশের অনেক গবেষণা-কেন্দ্রের পক্ষে এটা কেনা সম্ভবপর নয়। তবুও একটি জ্বলন্ত দীপ থেকে আর একটি দীপ জ্বালানো কঠিন নয়। আমাদের মাইক্রোস্কোপ তৈরী সম্পূর্ণ হ'লে, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এদেশে আরো অনেক যন্ত্র তৈরী হ'তে পারবে। প্রত্যেকটি বড় হাসপাতালে এবং গবেষণাগারে তখন এই যন্ত্র স্থাপনা করা সহজ হ'বে।

জীবনী

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

—বাবার কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। বাবাকে দেখবার ফুরসুৎ আর আমি পাই নি। কেবল শুনেছি বাবা ঢাকার এস্, পিকে গুলি করার পর ধরা পড়েছিলেন।

কথাটা শুনে জীতেনবাবু এ ঘরে চম্‌কে উঠ্‌লেন। কার সাথে কথা বল্‌ছে নীলা? যে বইখানা পড়ছিলেন নামিয়ে রাখ্‌লেন কোলের ওপর। কেমন অজান্তে অলক্ষ্যেই কান চলে গেলো ও ঘরে। কিন্তু আর কোন শব্দ পেলেন না। চুপ্‌চাপ্। বাইরে নীল আকাশ, ভোরের কাঁচা রোদ। ঠিক দু'শো বছর পরে মুক্তির ডাক। প্রথমকার জীবন, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর গান্ধীজী। আর আজকে স্বাধীনতার প্রথম সকাল, প্রথম বাতাস, প্রথম স্বাদ। বইটা আবার তুলে নিলেন, কয়েকটা পাতা উল্টালেন।

—তারপর একটা জীবনী লিখে দিন না। ওঘরে কার মেয়েলী অপরিচিত স্বর শুনলেন আবার।

—কার? বাবার? নীলার গলা।

নীতিশের জীবনী লিখ্‌বে? কে লিখ্‌বে? টান হোয়ে বস্‌লেন জীতেনবাবু। নীতিশের জীবনী, নীতিশের জীবন কে লিখ্‌বে?

—হ্যাঃ, যদি পারেন।

আবার কান পাত্‌লেন জীতেনবাবু ঔৎসুক্যে সজাগ হোয়ে উঠ্‌লেন যেন।

—যদি পারেন আমরা ছাপ্‌বো।

এবার আলোচনার ইসারাটা বুঝ্‌লেন। নীতিশের জীবনী ছাপ্‌বে। নীতিশের জীবন, নিজেরও কি সব মনে আছে। কিন্তু কেমন খুসীও হোলেন যেন, বেশ পরিপূর্ণ আনন্দের আমেজ। নীতিশের জীবন আর তার পরিচর্যা! বেশ মনে আছে মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যা। কোর্ট থেকে ফিরেছিলেন, হুলুধ্বনি শুনেছিলেন, তারপর সংবাদ পেলেন। ঠিক সব যখন চুপ্‌চাপ্, ঘরের কাছে গিয়ে দেখ্‌লেন, অমু সাদা ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে, একেবারে বুকের কাছে একগুচ্ছ গোলাপের মত এক্‌তাল মাংসপিণ্ড, কিন্তু কি চমৎকার! আশা, জীবনের আশা, পিতৃত্বের গৌরব! বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন সেদিন, আশায় ভরসায়। অমুর হাস্যময় মুখ, চোখ, —খুসী হোলে? হেসেছিলেন সেদিন অমুর একথায়।

—বাবার ছোটকালের কথা শুনেছি শুধু। আবার ও ঘর থেকে স্বর ভেসে এলো। নীলার গলা। —কিন্তু সবতো জানি না।

—আপনাদের থেকে যেটুকু পাবো সেটুকুই যথেষ্ট।

জীতেনবাবু কেমন উস্‌খুস্‌ করেন।

—অন্ততঃ সত্য কাহিনী, সত্য পরিচয় এটাই সবচেয়ে বেশী করে দরকার।

এটুকু শুনে আবার ইজিচেয়ারে কাৎ হোলেন। কিরকম আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে, এ্যাদ্দিনকার জীবন-পরিচিতির ভিতর আজকার সকালটা আশ্চর্য লাগ্‌ছে। নিজেরও মনে আছে। সেই গোলদীঘির পারে ওকে নিয়ে বেড়াতেন, সেই গংগার ধারে বেড়াবার সময় ওর কলোচ্ছ্বাস, চপলতা। এটুকু বেশ মনে আছে। তারপর উত্তরবংগে বেড়িয়েছেন অনেকদিন, উত্তরবংগের ধানক্ষেত, দার্জিলিংএর শৈলশিখর। খুব ঘুরেছিলেন, বাংলা বিহার ছোটনাগপুর। পরিচিতি ঘটুক পরিপার্শ্বিকের সমাজের মানুষের। বেশ মনে আছে দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে একখানা ইংরেজী দৈনিক পড়ছিলেন একদিন হঠাৎ কথাটা শুন্‌লেন—বাবা লেখাপড়া শিখে আমি মানুষের মতো মানুষ হ'বো।

হেসে উঠেছিলেন কথাটা শুনে।

—পড়েছো বাবা এ বই।

সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের ইতিহাস। ম্যাকস্যুইনীর ছবিটা খোলা।...

—বাবার যখন ফাঁসী হয় আমার তখন দু'বছর তাই দেখ্‌বার সৌভাগ্যও হয়নি। ও ঘরে কথা হচ্ছে আবার।

কথাটা শুনে টান্‌ হোয়ে বস্‌লেন। নীলার গলায় যে কম্পনটা ছিলো সেটায় আন্তরিক বেদনা পেলেন। নীলা তখন দু'বছরের ছিলো? কে বল্লে? নীতিশের ফাঁসী যখন হয় তখন নীলিমার দু'বছর? চোখের উপর থেকে বইটা নামিয়ে রাখ্‌লেন। রোদের ঝলক আস্‌ছে জানালা দিয়ে। কে জানতো, নীতিশের মনে আগুন জ্বল্‌ছে। কি ভাবে এই আগুনের ছোঁয়াচ পেয়েছিলেন তাও জানেন না। ভিতরে ভিতরে ওদের শিখা কেঁপেছে নতুন কিছু করার প্রেরণায়। মুক্তিপাগলদের কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে নি। রুশো ভল্টেয়ার মার্ক্স—সত্য বলেছে, করেছে, জানিয়েছে। জীবনের সত্য মানুষকে জানাতে হ'বেই। সেই জীবনের সত্যই ওরা খুঁজতে চেয়েছিলো। কিন্তু ভুল করেছিলেন তিনি, হয়তো ভুলও না— না হয় কি নিয়ে থাকতেন এ্যাদ্দিন। খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, খেয়ালে খেয়ালে কাজটা করে ফেলেছিলেন। বৌমাকে যেদিন ঘরে এনে উঠালেন নিজেও খুসী হয়েছিলেন। আর খুসী বোধ হয় নীতিশও হোয়েছিলো। কিন্তু···কিন্তু তখনও বোধ হয় ওর মনে এই বৈপ্লবিক

জীবনের প্রতিক্রিয়া আসেনি, পরবর্তী জীবনের ধারা তখনও বোধ হয় ওর মনে এসে পৌঁছোয় নি।

ও ঘরের দিকে কান পেতে দেখ্‌লেন চুপ্‌চাপ্‌। কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

—আবার আস্‌বেন, নীলা বিদায়সূচক শেষ কথা বল্লে বোধ হয়—আর যদি কিছু লিখ্‌তে পারি আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

—খুব খুসী হ'বো তাহ'লে। ও-পক্ষের উত্তর—দেখুন যদি পারেন। আমরা ঠিক করেছি এসব শহীদের জীবনী ধারাবাহিকরূপে বের করবো। আর উচিৎও।

জীতেনবাবু একথাটায় কেমন খুসী হ'লেন। বইখানার দিকে চোখ বুলোতে গিয়ে শুনলেন ওঘরে শ্লিপারের শব্দ। বোধ হয় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা উঠ্‌লেন। খস্‌খস্‌ শব্দ পেলেন, বোধ হয় শাড়ীর কিম্বা হাল্কা চলার।

বেশ হাল্কা হাল্কা লাগ্‌ছে নিজেকে—যেন ভারমুক্ত। বেশ চমৎকার। শরৎকালের নীল আকাশ, চক্‌চকে রোদ। তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। যেন প্রথম প্রভাত, নতুন আগমনীর নতুন বার্ত্তার।

সন্ধ্যের দিকে গরম দুধ নিয়ে এসে দাঁড়ালো নির্ম্মলা।

—এখনই সময় হোয়ে গেলো। জীতেনবাবু হাসলেন।

—ছ'টা তো বেজে গেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেই হেসে উঠ্‌লেন আবার—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, খেয়াল আর রাখ্‌তে পারি না।

নির্ম্মলাও হেসে ফেল্লে।

—কাল্‌কের রেশনের কি করা যায়।

—ও, ভুলুর কালকে অফিস বুঝি।

—হাঁ। ঠাকুরপোর ছুটী নেই কাল।

—আমিই যাবো।

—এ সপ্তাহে না হয় না-ই গেলেন!

—খাবো কি। জীতেনবাবু কথাটা বলে হাস্‌লেন।

নির্ম্মলা চুপ্‌ কোরে রইলো।

মিনিট খানেকের নিথরতা। দুধটা চুমুক দিয়ে শেষ করে বাটিটা হাতে দিলেন নির্ম্মলার।

—আচ্ছা বৌমা। চোখ উঠালে নির্ম্মলা—নীলুর বয়স কত?

—বোধ হয় সতের।

—সত্তের।

জীতেনবাবুকে চুপ্‌চাপ্ দেখে নির্ম্মলা জিগ্যেস করলে—হঠাৎ একথা জিগ্যেস করলেন।

—এম্‌নি। নীলু আসেনি বোধ হয় এখনো।

—না আসে নি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো নির্ম্মলা আর যদি কিছু বলেন।

—বৌমা, চলো কোথায়ও ঘুরে আসি। আল্‌গোছে যেন কথাকটি বল্লেন—অনেকদিন থেকে এক যায়গায় রয়েছো। সেই রান্না আর ঘরসংসার। একটু বৈচিত্র্যও পাওয়া যাবে। আর পাওয়া দরকারও।

—কেন বেশতো আছি বাবা। নির্ম্মলা বল্লে—আর রান্না, ঘর-সংসার দেখাতো মেয়েদেরও কর্তব্য।

—বেশ আছো! ম্লানভাবে হাসলেন একটু জীতেনবাবু—তোমরা বড় অল্পে খুসী।

কথাটায় হেসে ফেল্লে নির্ম্মলা।

—চাওয়ার তাগিদটাও মস্ত বড়, সেই চাওয়াটাও চাইতে পারো না।

—যখন দরকার তখন চাইবো।

আবার হাস্‌লে নির্ম্মলা। এক ঝলক সাদা স্বচ্ছ হাসি।

—তুমি বড্ড ঠাণ্ডা, চোখ জুড়ানো শান্ততা।

নির্ম্মলা টেবিলটা গুছাতে থাকে, অয়েলক্লথটা টান করে দিলো।

—নীচে যে বইখানা আছে সেটা একটু দিয়ে যেয়ো তো।

নির্ম্মলার চলে যাবার পর মনে হয় বড্ড মুখচোরা ও। আর বড্ড ঠাণ্ডা। ঘর জুড়োনো লক্ষ্মী। কোন অনুযোগ নেই, কোন আকুতি নেই—যেন নিজের স্বরূপে নিজেই ভরপূর। ওর এই পরিপূর্ণতায় নিজেও খুসী। মনে পড়ে সেই ফাঁসীর দুপুর। বৌমাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গেটের সাম্‌নে।

—কি ভাব্‌ছো বাবা।

—কিছু না।

—তবে চুপ কোরে আছে কেন?

—এম্‌নি।

—আমি চার পাউণ্ড বেড়ে গেছি।

বলেছিলো নীতিশ, প্রস্ফুটিত সদাপ্রসন্ন হাসি দিয়ে। আর বৌমাকে বলেছিলো—কিছু ভেবো না, খুব সুখে আছি। তোমার আশ্চর্য সান্নিধ্যে আমি বেঁচে উঠেছি। কিছু ভেবো না। কিন্তু বাসায় এসে ছট্‌ফট্ করেছিলেন, ঘুমুতে পারেন নি। কেবল মনে হয় জেলের সামনে

দাঁড়ানো নীতিশের কথা। বৌমার পরবর্তী জীবনের কথা। কিন্তু বৌমা হাহুতাস করেনি একদিনের জন্যেও। একদিনের জন্যে চোখের জল ফেলতে দেখেননি। কিন্তু···কিন্তু ভিতরের কথা তিনি জানেন—জীবনের এই একাকীত্ব কেউ সইতে পারে না, তিনি বোঝেন, যেন অনুভব করতে পারেন।···

—দাদু! তুমি আমায় ডেকেছিলে।

হঠাৎ ডাক শুনে চমকে মুখ তুললে কিন্তু নাত্‌নীর মুখের দিকে চেয়ে নিজের মনটাও কেমন বিস্ফারিত হোয়ে উঠ্‌লো।

—কে বল্লে। জীতেনবাবু হাসলেন—বোস এখানে। কোথায় থাকিস, কোথায় ঘুরিস। দাদুর কথা এখন মনে থাকে না বোধ হয়।

নীলা হেসে ফেল্লে—হঠাৎ একথা বলে ফেল্লে।

—আজকাল তো খোঁজ খবর নিস্ না।

—যখন আসি তখনি দেখি পড়াশুনা করছো।

চুপ্‌চাপ্‌ রইলেন কিছুক্ষণ। নীলা জীতেনবাবুর কোলের বইটা টেনে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টালে।

—আজকে সকালে কারা এসেছিলো।

—তুমি জান্‌লে কি করে।

—আমি এখানে বসেই শুনেছি কিছু কিছু। হেসে ফেল্লেন জীতেনবাবু—লুকিয়ে কাজ করার উপায় নেই।

কথাটায় নীলাও হেসে ফেল্লে—আমি তো সে কথা বলি নি। ওঁরা বাবার জীবনী প্রকাশ করতে চান। গতযুগে যাঁরা বিপ্লবী ছিলেন, তাঁদের জীবনী ওঁদের মাসিকে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন।

শুন্‌লেন জীতেনবাবু, কি ভাবলেন একটু তারপর বল্লেন—কি বল্লি?

—আমি কিছু বলি নি আর বাবার কথা তো আমি সব জানি না। কথাটা ধ্বক করে লাগ্‌লো যেন জীতেনবাবুর বুকে। তবু হেসে বল্লেন—তোর তো জান্‌বার কথা নয়, তুই ছোট তখন। কি সবচেয়ে তুই ভালবাসিস্। কি ভেবে কথাটা যেন জিগ্যেস করলেন তিনি।

নীলা কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো দাদুর দিকে, তারপর হেসে বল্লে—ভেবে বলতে হয়।

—কেন।

—অত বুঝেসুঝে তো কিছু করি না।

—কিন্তু তোর বাবা, থেমে থেমে বলতে থাকেন—তোর বাবার ছোটকাল থেকেই বইএর

দিকে ঝোঁক ছিলো। কেবল আমার বইগুলো নেড়েছে, দেখেছে আর আমায় জিগ্যেস করেছে।

নীলা কানপেতে শোনে, ওর জীবনের মস্ত বড় মণি, মস্ত বড় প্রাপ্তি।

—একদিন, জীতেনবাবু বলেন—হকি খেলতে গিয়ে পাটা ভেংগে গেলো। কিচ্ছু জানায় নি, যখন শুনলাম দেখি চুপ চাপ্ শুয়ে আছে। জিগ্যেস করলুম, কোথায় লাগলো। ও হেসে ফেল্লে—ও কিচ্ছু না বাবা। কিন্তু পুরো দু'মাস ভুগেছে। তখনি দেখেছি ওর সহ্যের সীমা। একদিনও হা-হুতাস করে নি।

—আচ্ছা দাদু, তুমি জানতে, বাবা যখন এসব কাজ করতেন, বৈপ্লবিক কার্যকলাপের তুমি কিছু টের পেয়েছিলে।

হেসে উঠলেন জীতেনবাবু—কিচ্ছু না। মোটেই বুঝি নি। কলেজে যেতো আসতো। তখন নন-কোঅপারেশন চলছে, কিন্তু ভিতরে যে ও এ নিয়ে ব্যস্ত তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। একদিনের জন্যেও বুঝি নি ও এভাবে জীবন তৈরী করছে। তোর ঠাকুমা বোধ হয় বুঝেছিলেন কিছু, সন্দেহ করেছিলেন ওর চলাফেরা নিয়ে। একদিন বলেছিলেনও আমায়—ওকে একটু দেখো, কোথায় থাকে এত রাত অবধি। আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, ছেলেপেলে না হয় একটু রাত করেই এলো, খেলাধূলার পর দু'একদিন গল্পগুজব করার পর একটু রাত-ই হ'লো। কিন্তু বাড়ী থেকে উধাও হোয়ে গেলো একদিন। সন্ধ্যেয় চলে যাবার পর দিন চারপাঁচ বাড়ী এলো না আর। তারপর খবরের কাগজে দেখলুম, ঢাকার এস্, পি-কে গুলি করার পর ধরা পড়েছে। শুনে আশ্চর্য হলুম। এটা অচিন্ত্যনীয়, এ ভাবি নি কোনদিন। এরপর সমস্ত বাড়ীটা পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে গেলো। তারপর সময় কাটাতে লাগলুম নিস্পৃহভাবে, ওকে নিয়ে যেমন ছোটবেলায় পার্কে বেড়াতে যেতুম, তোকে কোলে করে বেড়াতে লাগলুম তেমনি। কিন্তু তুই তোর বাবার মত হ'তে পারলি না, বড্ড ঠাণ্ডা। ছোটকাল থেকেই তোকে দেখছি বড্ড শান্ত। তোর বাবার চাঞ্চল্য তোর ভিতর যেন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে নীলা মৃদু একটু হাসলো।

জীতেনবাবু ইজিচেয়ারের ওপর কেমন চুপ চাপ্। কেমন অন্যমনস্ক, কি যেন ভাবছেন।

—দাদু, কি ভাবছো।

—কিচ্ছু না।

—আমার বেশ লাগে এসব শুনতে

—তুই-ও এসব করতে চাস।

হেসে উঠ্‌লো নীলা—এখন তো দরকার নেই, আমরা স্বাধীন হোয়ে গেছি।

—স্বাধীন আর হ'লাম কই, জীতেনবাবু উঠে বস্‌লেন, কিসের যাতনায় সিধে হোয়ে বসলেন—শান্তি এলো কই, জীবনের শান্তি। সেই অনটন, সেই বিভেদ, প্রাদেশিকতা—যে সাহচর্য এখন দরকার সেই সাহচর্য কই। কর্তব্য ফুরোয় নি এখনো, এ্যাদ্দিন যুদ্ধ করেছি কাজ পাবার জন্যে, এখন যুদ্ধ করতে হ'বে সেই কাজ স্পষ্ট হোয়ে উঠুক। এখন দেখবার দৃষ্টি দরকার, ভাববার দৃষ্টি, কাজ করার প্রেরণা—সব, জীবন তৈরীর সব।

নীলা একসময় উঠে এসে জীতেনবাবুর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বুঝেছে দাদু চিন্তান্বিত, চিন্তাগ্রস্ত। কিছুটা সময় যাবার পর অতি আস্তে জিগ্যেস করলে—কি খাবে রাতে!

—ভাত।

—রুটি খাবে না?

—আটাতো ফুরিয়ে গেছে। হাস্‌লেন জীতেনবাবু।

ব্যথা পেলো নীলা, এই কথাটায় ব্যথা পেলো—আজকার জীবনের বাস্তব সত্য আর কোনদিন এত প্রকট হোয়ে গায়ে লাগে নি যেন,।

কিন্তু—

রাত জেগে লেখাটা শেষ করলেন। শেষ করে কেমন মনে আশ্চর্য প্রশান্তি এলো। চুপ্‌চাপ্ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। বাইরে অফুরন্ত চাঁদের আলো, নিঃঝুম নিশ্চিন্ত সব কিছু। নিজের ছেলের জীবনচরিত নিজেই লিখছেন, নীতিশ তাঁকে ওর জীবনের কথাগুলো দিয়ে গেছে, সেগুলো আজকে দান করে যেতে পারলেন। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বেশ ঝিরঝিরে বাতাস, মেঘমুক্ত নীল আকাশ। বাইরে উৎসব, মুক্তির বাতাসের আনন্দ। আলোকোজ্জ্বল কলকাতা। বেশ লাগছে, চারিদিক বেশ লাগছে। নতুন প্রাণবান।

হঠাৎ চোখে পড়লো, যেন কিছু অনিয়ম দেখ্‌লেন। নীলার ঘরে আলো জ্বল্‌ছে এখনো, এত রাত অবধি। ঘরের পরদাটা সরালেন, সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু চম্‌কে উঠ্‌লেন যেন, যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা—গালের নীচে স্পষ্ট জলধারার দাগ দেখ্‌লেন, টেবিলের ওপর শোয়ানো মাথাটার নীচে নীতিশের ফটো একখানা। নিজের বুকটা কেঁপে ওঠে যেন। এ কান্না কেন ওর। স্মৃতি? আত্মার বেদনা? দেখ্‌লেন, ফটোর নীচে নীতিশের নিজ হাতে লেখা 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'। দেখ্‌লেন কয়েক মিনিট, তারপর আল্‌গোছে হাত রাখ্‌লেন নাত্‌নীর মাথার ওপর—যেন প্রার্থনা করলেন, যেন বল্লেন—কান্না নয় আজকে, নীতিশের গান নীতিশের প্রাণ তোমার অন্তরে ধ্বনিত হোক, রণিত হোক। দৃঢ় হও, দৃঢ়। পৃথিবী বাঁচুক।

কিন্তু, কিন্তু অতি অলক্ষ্যে তাঁর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এলো।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চার

মহানগরীর প্রভাত। আজকের সকালটি কুয়াসায় ঢাকা এবং তীক্ষ্ণ শীতকাতর।

বিমল এরই মধ্যে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল; এটি তার অভ্যাস। মহানগরীর এই নূতন অঞ্চলটিতে সমাজের নবোদিত অভিজাত বা আভিজাত্যের কোঠায় নূতন প্রমোশন প্রাপ্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। বনিয়াদী অভিজাত যাঁরা তাঁরা অনেক আগেই পুরাতন মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে বহুকাল আগেই এসে বাস করছেন। নূতন কালে ব্যবসায়ে, চাকরীতে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তার সঙ্গে নূতন কালের বাঙালী জনোচিত সাহেবীয়ানা অর্থাৎ সস্তা মডার্ণ কালচার আয়ত্ত করে পুরাণো কলকাতা থেকে সরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করছেন। উপনিবেশ স্থাপন কর্ত্তারা অধিকাংশই প্রৌঢ়—অনেকেই খেতাবধারী; রাজা, সার প্রভৃতি উপাধির সংখ্যা কম—রায়বাহাদুর অনেক। ডেপুটি, ডি-এস-পি, সাবজজেরা—খেতাব এবং পেনসন নিয়ে এই উপনিবেশে সমাজপতি হয়ে রয়েছেন। বাত, ডিসপেপসিয়া, এ দুটো রোগও তাঁদের মধ্যে খেতাব এবং পেনসনের মত সাধারণ। এর প্রতিকারের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, হন হন করে—একলা এবং দল বেঁধে লেক থেকে আরম্ভ করে পার্ক পর্য্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণকারীর ভিড় জমে যায়। এঁদের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ নবীনেরা পার্কে পার্কে টেনিস্ ক্লাব করেছেন; নিখুঁত পরিচ্ছদে তাঁরাও শীতের ভোরে একদফা টেনিস খেলেন। একটু রোদ চাড়া দিলে—খাওয়া দাওয়া সেরে পার্কে আসে অন্য দল, তাঁরা খেলেন ক্রিকেট। থলে হাতে বাজারযাত্রী গৃহস্বামীদের সংখ্যা এখানে কম। যাঁরা আছেন তাঁরা বড় রাস্তা ধরে হাঁটেন না, গলিপথে হাঁটেন; দারিদ্র্যগত মানসিক জটিলতা ব্যাধিতে অধিকাংশই এরা ব্যাধিগ্রস্ত। অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই বাজার করান চাকর দিয়ে; ভোজন বিলাস এবং কঠোর হিসাবীরা বাজারে যান চাকর সঙ্গে নিয়ে। কেউ কেউ যান মোটরে, তাঁরা লেকমার্কেট ছেড়ে জগুবাবুর বাজারেই যান।

যাক এত সব কথা। আজ কুয়াসা এবং শীতের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক কম কুয়াসার মধ্যে বিমলের কিন্তু ঘুরবার পথটা বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত সে ওঠে মহানগরীর ঘুম ভেঙে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রি অবসানে মহানগরীতে জীবনের জাগরণ-সঙ্গীত পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও শোনা যায় না, মহানগরীর নিজের ধ্বনি আছে। ধর্ম্মজগতের সভ্যতায় হিন্দুরা বেদগান করতেন, ইসলাম জগতে আজান আজও ওঠে, মহানগরীর কালে—একসঙ্গে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎচালিত বাঁশী বাজতে থাকে। গঙ্গার বুকে, খিদিরপুর ডকে, গঙ্গার কূলে কূলে এপারে ওপারে মিলে, মহানগরীর বুকের মধ্যে ছড়ানো ছোট বড় ফ্যাক্টরীতে বাঁশী বাজে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীর চাকার লোহার হালের শব্দ ওঠে, ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি জেগে ওঠে, বড় বড় মোটর ট্রাক, এবং মোটর বাসগুলির ষ্টার্ট নেওয়ার শব্দ ওঠে। মানুষের মধ্যে হোস পাইপ এবং মই কাঁধে ছুটতে থাকে কর্পোরেশনের উড়িয়া কর্ম্মীর-দল। রাস্তায় জল দেয়, আলো নিভিয়ে ফেরে। এ অঞ্চলে পথে গ্যাস লাইট নাই বললেই হয়; মই কাঁধে আলো নেভানো বড় একটা দেখা যায় না।

বেড়াতে বেরিয়ে সে নিত্য এসে দাঁড়ায় একটা রুটির কারখানার ধারে। কারখানার শব্দ তখন ওঠে না, ওঠে সেতারের শব্দ। কারখানার মালিকের মেয়ে ভোর বেলায় সেতার অভ্যাস করে। অতি চমৎকার বাজায়। এরই মধ্যে মেয়েটি সেতার বাজনায় নাম করেছে খুব। বিমল নিত্য সেতার বাজানো শোনে। এই মেয়েটির বাজনা শুনে সে আনন্দে এই অঞ্চলের বিবাহ পরীক্ষার্থিনী শতশত মেয়ের সা-রে-গা-মা সাধা থেকে আরম্ভ করে বেসুরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার তিক্ততা অনায়াসে ক্ষমা করতে পারে। এই বাজনা শোনার আনন্দের মধ্যে একটি গভীর বেদনা—আনন্দটিকে একটি অপরূপ মহিমা প্রদান করে। মেয়েটি বালবিধবা।

মেয়েটির বাপ হিন্দুসমাজের জল অচল শ্রেণীর লোক। লেখাপড়া শিখেছিলেন, খাঁটি এ যুগের শিক্ষা—বি-এস-সি পাশ করে মাষ্টারী নিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেও অল্পবয়সে বিবাহ করে অল্পবয়সেই সন্তানের পিতা হয়েছিলেন; তার ফলে শিক্ষা তাঁর সামাজিক প্রভাবকে অতিক্রম করে তাঁর জীবনে বিকাশ লাভ করবার পূর্ব্বেই মেয়ের বিবাহ এবং বৈধব্য দুই-ই ঘটে গিয়েছে। মেয়ের বৈধব্যই তাঁর জীবনে নূতন চেতনা এনে দিয়েছে। মফস্বলের শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি মহানগরীতে এলেন তাঁর শিক্ষাজীবনের উপলব্ধিগত সঙ্কল্প নিয়ে। এখানে এসে তিনি রুটির কারখানা করে সন্তানসন্ততিদের নিয়ে এখানে এসে—মেয়ের জীবনে শিক্ষার অবলম্বন জুটিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে ইচ্ছা মেয়ের আবার বিবাহ দেন। কিন্তু স্ত্রী সে পথে কঠিন বাধা। অদ্ভুত শক্তি এই মেয়েটির; প্রভাবও অদ্ভুত। মেয়ে শ্যামাদাসী সে প্রভাবে অভিভূত বললেই হয়। এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সেতারেও

দক্ষতা লাভ করেছে। কিন্তু পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলে সে কাঁদতে সুরু করে। মেয়েটির বাপের সঙ্গে বিমলের আলাপ আছে। মেয়েটিকেও সে জানে-চেনে। সে-ই এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বাপের অনুরোধে শ্যামাদাসী নাম পালটে নাম রেখে দিয়েছে তটিনী। ছোট নদীর জলস্রোতের ধ্বনি মাধুর্য্য অবিকল যেন রূপ পায় ওর হাতের সেতারের জোয়ারীর তারের ঝঙ্কারে—সেই জন্য ওই তটিনী নামটাই বলেছিল, বাপেরও পছন্দ হয়েছিল; শ্যামাদাসী চুপ করেই ছিল।

আজ কুয়াসার রহস্য তাকে এমন টেনেছিল যে—সেতার শুনতেও তার ইচ্ছা হয় নি। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই আবার চলতে সুরু করেছিল। সময় সম্বন্ধে খেয়াল হল—কুয়াসা কেটে সূর্য্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ার পর। ফিরবার পথে 'দাদার দোকান', রাসবেহারী এ্যাভিন্যুর উপরেই। এটি তার চা খাওয়ার আড্ডা। দাদা এ অঞ্চলে—দোকানদার হিসাবে সর্ব্বজন পরিচিত; ষ্টেশনারীর সঙ্গে চা ও খাবারের দোকান, ষ্টেশনারী জিনিষের দাম যত বেশী, চা ও খাবার তেমনি অখাদ্য কিন্তু তবু দাদাকে অবহেলা করবার উপায় নাই, কারণ দু দিকে দু শো গজের মধ্যে আর কোন দোকান নাই।

দাদা বিমলকে চেনে লেখক বলে, যথাযোগ্য সমাদরও করে, নমস্কার জানিয়ে সম্মান জানায় ভাল দেখে চেয়ারখানা এগিয়ে দেয়, দোকানের ছোকরাদের বলে—দেখিস নিম্‌কী বেছে দিস, চা যেন ভাল হয়। নইলে—। হাসতে সুরু করে দাদা—হেসে বলে—নইলে দেবেন কোন লেখার মধ্যে এইসা ঢুকিয়ে—বাপস্! তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে—এ—মানে কে যেন বলছিল, এই···বাবুকে নিয়ে কি একটা লিখেছেন।

—কই না তো! বিমল নিস্পৃহ ভাবেই বললে, সে জানে এই অন্তরঙ্গতার হেতু। এইবার এই অন্তরঙ্গতার সুযোগে মৃদুস্বরে সে বলবে—চা নিমকীর দামটা দিন তো দাদা.... রুটিওয়ালাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—টাকা কিছু শর্ট আছে।

বাংলাদেশে সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের খ্যাতি দাদার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। রাসবেহারী এ্যাভিন্যুর উত্তরদিকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের মস্তবড় বাড়ী, তাঁর মোটরখানাকেও দাদা চেনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র হিসেবভুল বলেই সকলে বিশ্বাস করে। ও কি রকম হয়ে গিয়েছে, নইলে লিখে টাকা হয়? দাদা এগুলি শিখেছে এ অঞ্চলে অভিজাত বাড়ীর ছেলেদের কাছে। যারা নাকি শরৎচন্দ্রের দর্জ্জিপাড়ার দাদার বালীগঞ্জী সংস্করণ। সাহিত্যসভা করে এরা সাহিত্যিকদের সভাপতি করে সম্মান দেয়, আবেগভরে আবৃত্তিও করে—'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান', আবার দরিদ্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বলে ভ্যাগাবণ্ডস্ লোফারস। মধ্যে মধ্যে দু চারটে মিথ্যে গল্পও বানিয়ে ফেলে। বলে—আমাদের বাড়ী গিয়েছিল বাবার কাছে, টাকা ধার করতে। ফাদার সিম্পলি

বলে দিলেন—এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি ধার নয় একেবারে। কারণ ধার দিলে আপনি শোধ দেবেন না এবং আপনার সঙ্গ সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব। এমনি অনেক গল্প। দাদা সেই গুলি শুনেছে; এবং সুকৌশলে দামটি আগে আদায় করে নেবার এই চতুর পন্থা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে শেষ করে যদি লেখক মশাই বলেই বসেন—দামটা আজ রইল—তবে জামা টেনে ধরাটা সম্ভবপর হবে না। ধরলে যে ছেলেরা ঐ সব গল্প করে তারাই দাদার উপর চড়াও হয়ে উঠবে। বিমল খাবারের দামটি—একটি সিকি—টেবিলের উপর রেখে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। ছোকরাটাও এনে নামিয়ে দিলে নিমকীর ডিসটা।

রাস্তা দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছেন বিখ্যাত প্রফেসার—একখানা বই বগলে নিয়েই প্রাতর্ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন। লেকের ধারে খুব মন্থর পদক্ষেপে বই পড়তে-পড়তেও তাঁকে বেড়াতে দেখেছে বিমল। পড়াটা তাঁর কৃত্রিম নয়—লোক দেখানোও নয়—সে কথা বিমল জানে।

বাসায় ফিরে দেখলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটি গল্প লিখতে সুরু করেছে, ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, বিমলের ভক্ত। একটি ছেলের বাপ কোন জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—কলকাতায় বাড়ী আছে, অপরটি মেসে থেকে পড়ে। প্রথম ছেলেটি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত হবার জন্যে সাধ্য সাধনা ক'রে সাহিত্যিকদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসে—চায়ে খাবারে—আদরে আপ্যায়িত করেন তার মা। ছেলের চেয়েও মা অনেক বেশী সাহিত্যানুরাগিণী, রোমাঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়েন—কবিতা গল্প উপন্যাস- নাটক- সব—সব। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাও পড়েন। তাঁরও অনেক অনুরোধ আজ পর্য্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু বিমল আজও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ছেলে দুটিকে দেখে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুষ্ককণ্ঠে বললে—কি খবর?

ছেলেটি হেসে বললে—আজ ওবেলা নির্ম্মল রায় আসছেন—মহাদের চাটুজ্জে আসছেন—আপনাকে আজ যেতেই হবে, মা বলেছেন।

সঙ্গী ছেলেটি বললে—সুনীল একটা গল্প লিখেছে—পড়বে।

বিমল বললে—তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো পড়ে দেখব কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টেনে নিলে একটা ফাইবারের সুটকেস। এইটাই তার লেখার ডেস্ক। একসারসাইজ বুক তার উপরে রাখাই ছিল, পাশে ছিল দোয়াত এবং কলম। আজও ফাউন্টেন পেন কেনে নাই বিমল। এ দিক দিয়ে সে গান্ধীপন্থী; বিলাসের পর্য্যায়ে ফেলে সে ফাউন্টেন পেনকে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল লাবণ্য এবং অরুণা। স্মিতহাসিমুখে

লাবণ্য বললে—লিখছেন ?

বিমল মুখ তুলে তাকালে।

—একটু বিরক্ত করবো।

বাধ্য হয়ে বিমলকে আহ্বান জানাতে হ'ল—আসুন।

সমস্ত ঘরটাই প্রায় খালি। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট—দুজন বসবার মত—পুরানো আমলের ভেলভেট মোড়া কৌচ। এখানা চিত্ত জোর কারে তাকে কিনে দিয়েছে—আলিপুরের নীলামী মালের আড়ৎদারদের কাছ থেকে ওই কৌচখানা আর একখানা ডেক চেয়ার।

ঘরের একদিকে তার সুটকেস আর ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরেই থাকে তার বিছানা। মেঝেতে বিছানো থাকে একখানা মাদুর, তার উপরে বসে সে লেখে।

লাবণ্য বললে—আপনি নীচে বসবেন—আমরা কৌচে বসব এ কি হয়।

বিমল হেসে বললে—নিশ্চয় হয়—আপনারা অতিথি।

—না। আমরা ভক্ত।

বিমল উঠে কোনে ঠেসানো ডেক চেয়ার টেনে পেড়ে নিয়ে বসে বললে—এইবার বসুন। বলুন কি খবর।

—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

গোড়া থেকেই বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তার অস্বস্তি ঘন হয়ে উঠল। বললে—হঠাৎ নিমন্ত্রণ কেন—বলুন তো ?

অরুণা বললে—আমার নিজের কিছু বলবার আছে আপনাকে, লাবণ্য দিদিদেরও অনেক কথা আছে। তা-ছাড়া আপনাকে কিছুক্ষণ পেতেও চান নিজেদের মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কথা যা আছে সে এখনই বলুন না। তার জন্য নিমন্ত্রণ কেন ?

লাবণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ বললে—আমাদের ওখানে যেতে আপনার কি সংকোচ বা আপত্তি আছে ?

বিমল বললে—আপত্তি নেই কিন্তু সংকোচ থাকলেও কি আপনি রাগ করবেন। ওটা যে বুদ্ধিমানের ভূতের ভয়ের মত। যুক্তিবাদী বুদ্ধি বলে—ভূত নেই যখন তখন ভূতের ভয় কেন ? মন বলে আমি নিরুপায় ভয়টা যে মূলোর মত দাঁত মেলে কুলোর মত কান নেড়ে—তালগাছের মত লম্বা হয়ে খোনা গলায় হুঁ-হুঁ করে হাসছে বুদ্ধি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে।

অরুণা হেসে উঠল। লাবণ্যও না-হেসে পারলে না।

বিমল বললে—আচ্ছা যাব। নিমন্ত্রণ নিলাম আপনাদের। কিন্তু কথাটা কি বলে রাখলে সুবিধা হ'ত না? ভেবে রাখতে পারতাম।

—বল অরুণা। তোমার কথাতেই সমস্যা আছে। আমাদের কথায় সমস্যা নাই। আমরা আমাদের সুখ দুঃখের কথা বলব। সুখ নাই—দুঃখ। তবে দুঃখের মধ্যেও অনেক হাসির কথা আছে। সেটা চায়ের আসরেই হবে।

অরুণা বললে তার সমস্যার কথা।—কাল রাত্রে ওঁদের কথা শুনে—ওঁদের কাজকর্ম্ম দেখে বলেছিলাম—লাবণ্যদি আমি আপনাদের মধ্যেই থাকব। লাবণ্যদি বলেছিলেন তুমি লেখাপড়া শিখেছ—গান গাইতে পার—তুমি এ দর্জ্জির কাজ নিয়ে কেন থাকবে? আজ সকালে লাবণ্যদি বললেন—রাত্রে ভেবে দেখেছি তোমার এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু সকালে উঠে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে লাবণ্যদি যা বলেছিলেন তাই ঠিক। এ কাজ নিয়ে থেকে কি করব?

বিমল খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল রাত্রে লাবণ্য দেবী যা বলেছিলেন, আজ সকালে তোমার মনে যা হয়েছে সেইটাই আমার মতে ঠিক।

লাবণ্যের চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্বাভাবিক দীপ্তি তার মধ্যে। অরুণা তার দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কার সঙ্গেই ডাকলে—লাবণ্য দি!

লাবণ্য উত্তর দিলে না।

বিমল বুঝতে পারলে লাবণ্যকে। সে বললে—এই মহানগরীর জীবন—আমাদের সে কালের স্বপ্নে তুষ্টির জীবন নয়। মন্থর গতির জীবন নয়, দ্রুতগতির জীবন। কেরোসিন ল্যাম্পের জীবন নয়, ইলেকট্রিক লাইটের জীবন।

তারপর বললে—জান এককালে আমি গান্ধীজীর আদর্শে অনুরাগী ছিলাম। ভাবতাম—গ্রামই একমাত্র সত্য, মহানগরীকে ভয় করতাম, মনে করতাম এই মহানগরেই হবে মানুষের সমাধি। আজ মনে হয়—এই মহানগরেই হবে মানুষের সাধনার সার্থকতা। সে কালে শ্মশানে যেমন হ'ত সাধকের শক্তিসাধনার সিদ্ধি।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকলা

বহিরঙ্গ উপাদান—জলরঙ

যামিনীকান্ত সেন

বর্ণ-বিচার ও বর্ণ-নির্ব্বাচনে শিল্পীরা কোন আদর্শ গ্রহণ করবে? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যেমন তরুণদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার পর কোন ব্যবসা গ্রহণ বা কোন পথে অগ্রগমন করা উচিত এই ব্যাপারটি স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে—আধুনিক শিল্পীদের পক্ষেও তাই! এযুগে সকল শ্রেণীর শিল্পীই নানাভাবে রচনা করে' সকলের তৃপ্তিসাধন করতে অগ্রসর হচ্ছে। বাদকদের যেমন সেতার, এস্‌রাজ, বীন্ প্রভৃতি বহু যন্ত্র হ'তে একটিকে নিজেদের সাধনার জন্য নির্ব্বাচন করে নিতে হয়—চিত্রকরদেরও আধুনিক উপাদানের অরণ্যে প্রবেশ করে' তার ভিতরকার বহুর মধ্যে এককে বেছে নিতে হয় নিজের জীবনের বিশিষ্ট সঙ্গী করতে। এ দেশের সুপরিচিত শিল্পী যামিনী রায় এক সময় তেলরঙে ছবি এঁকে প্রশংসা লাভ করেন—কিন্তু কিছুকাল পরে সে পথ বর্জ্জন করে' শিল্পী অন্য পথে যান। নিজের ধর্ম্ম চিন্‌তে পারলে পরধর্ম্ম ভয়াবহ মনে হয়—অন্ততঃ ভ্রান্তিমূলক মনে হয়। এ প্রবীন শিল্পীর জীবনেও এ রকম একটা কঠিন মুহূর্ত্ত এসেছিল।

তেলরঙের প্রভাব ইদানীং সারা জগৎ জুড়ে বিস্তৃত। কা'র না এর প্রতি প্রলোভন হয়? শিল্পীরা প্রতিকৃতি রচনা করে' আর্থিক উন্নতির কামনা করলে তেলরঙের ব্যবহারের কথা না ভেবে পারেনা। এ উপাপানটি যেন সদ্যফলপ্রদ মনে হয়!

অথচ তেলরঙের প্রভাবের ইতিহাস বেশীদিনের কথা নয়। সকল রঙের যাদুর খবর ওস্তাদ শিল্পীর হাতের মুঠির ভিতর থাকে। নিজের প্রতিভা, কল্পনা ও পরীক্ষা দ্বারা শিল্পী রঙের মায়া সৃষ্টি করে। বিস্তর রঙ আছে যা' নানা চেষ্টাতেও অনুকরণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য টেক্‌নিক্ হিসেবে কোন রঙের প্রয়োগের কায়দা কারও জন্য কেউ সৃষ্টি করে দিতে পারে না। এ ব্যাপারে সকলকেই সাধনা করতে হয়। লিওনার্দ-দা-ভিন্‌চী (Leonardo-Da-Vinci) একবার বলেছিলেন, "Thou, oh God, dost sell unto us all good things at the price of labour"—অর্থাৎ, "হে পরমেশ্বর, তুমি শ্রমের মূল্যেই আমাদের সব উৎকৃষ্ট জিনিষ বিক্রী কর।" বিখ্যাত-শিল্পী Rodin বলেছেন, "Nothing will take the place of persevering study, to it alone the secrat of life reveals itself." অর্থাৎ অধ্যবসায় ও শিক্ষা ছাড়া জীবনের ভিতর কোন গূঢ় বার্ত্তাই প্রকাশ পায় না। ইংরাজ শিল্পী Turner অতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "I have no secret but hard work" অর্থাৎ কঠোর কাজ করা ছাড়া আমার আর গোপনীয় কোন উপাদান নেই। বস্তুতঃ এক একটি টেক্‌নিক্ এক এক শিল্পীর জীবনেরই বর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়। বহু আয়াসে সে তা' আয়ত্ত করে। সে রহস্য

সাধারণের নিকট দান করাও সব সময় সম্ভব নয়। কোন দু'জন শিল্পীর বর্ণব্যবহারের কায়দা এক রকম নয়।

তেলরঙের এক একজন শিল্পী এক এক রকমের কায়দায় ছবি আঁকে—অনেক সময় তা অনুকরণ করাও সম্ভব হয়না। বিখ্যাত শিল্পী Paul Veronese ছবির (ব্যাকগ্রাউণ্ডে) পৃষ্ঠভূমিতে সবুজ (Veronese green) ও নীলরঙ (ultramarine) ব্যবহার করে' এক অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে। Rubens অবলীলাক্রমে এ ক্ষেত্রে ধূসর, সবুজ, শ্বেত ও ময়লা লাল রঙ দিয়ে এক নূতন বর্ণসঙ্গতি ঘনিয়ে তুলেছে। Bouchre-এর পৃষ্ঠভূমি গোলাপী রঙের। এর ভিতর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শিল্পীর বর্ণজ্ঞান থাকলে সে সহজেই বর্ণসুষমাকে সুসঙ্গত করে একটি অপরূপ রূপশ্রী দান করতে পারে।

তেলরঙের নাটকীয় বৈচিত্র্য উৎপাদনের ক্ষমতা প্রচুর। সম্প্রতি বৃহৎ mural painting রচনায় তেলরঙ ব্যবহৃত হচ্ছে—পূর্ব্বতন আমলের tempera, encaustic ও fresco প্রথার রচনা ইদানিং বর্জ্জিত হয়েছে বলতে হয়। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস শিল্পী Jan Van Eyck ও শিল্পী H. V. Eych তেলরঙের প্রচলন করেন। কিন্তু বাস্তবিক তা' ঠিক নয়। Eastlake নিজের গ্রন্থে বলেছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে Aeti'us নামক একজন চিকিৎসাবিষয়ক লেখক তেলের সহিত রঙ মেশাবার কথা বলে গেছেন। তাছাড়া শিল্পী Cenino Cennini (গিয়তোর শিষ্য) ও তেলরঙের কথা নিজের একখানি বইতে উল্লেখ করেছেন। গিয়তোর কাল হচ্ছে ১২৭৬-১৩৩৬। Jan Van Eyck এবং Hubert Vanyack এ বিষয়ে একটা ধারণা লাভ করে Pliny-রচিত Historia Naturalis বই পড়ে।

তেলরঙের দোষের দিকও আছে। ক্রমশঃ রঙটির হলদেভাব প্রকাশ পায় এবং পুরাণ হলে রঙটি ময়লাও হয়ে পড়ে। প্রভূত বৈজ্ঞানিক উপায়ে যত্ন করলেও কালের প্রভাবে রঙের বিবর্ণতা ঘটে, সোলাজায়গায় রাখলে, ধোঁয়া বা গ্যাসের সংস্রবে এলে তেলরঙ খারাপ হয়ে যায়। তা ছাড়া এর উপর ভার্নিস দিয়ে রঙকে উজ্জল বা জীবন্ত করলে কিছুকাল পরে রঙ ভেঙ্গে বা ফেটে যায় (Crack)। আধুনিক ফরাসী বহু চিত্রকরের ছবি এমনিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। শিল্পী Munckacsy-র কয়েকটি চিত্রের রঙে bitumen ব্যবহার করা হয়, ফলে সে সব রঙ ফেটে গেছে। হলদেভাব যাতে না আসে সেজন্য তেলরঙের সঙ্গে তার্পিন তেল বা পরিশ্রুত কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন ইতালীয় চিত্রকর এর ভিতর একটা মিশ্র পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিল। Perugino, Pollainolo ও Verrocchio একটা মিশ্র রঙ তৈরী করে' তেলরঙের সহিত একরকমের tempera মিশিয়ে। আবার লিওনার্দো-দা-ভিনসীর "শেষ ভোজন" (The last Supper) চিত্রখানিতে plaster করা দেয়ালের উপর তেলরঙ ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে তা' একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অপরদিকে শিল্পী Nontofarno-র "Crucifixion" ছবিখানি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হলেও এখনও বেশ ভাল আছে।

আবার Van Eyck-এর আদিম ছবিগুলিকেও এখনও ভাল অবস্থায় দেখা যায়। কাজেই

তেলরঙ ব্যবহারে বিপদও আছে যথেষ্ট। গোড়াতে H. V. Eyck যে পদ্ধতি (technique) প্রবর্ত্তন করেন তা হচ্ছে এই—একখানি পরিষ্কার সমতল Oak কাঠকে gesso, gypsum বা plaster of Paris দিয়ে ঢাকা হত। তা'তে করে' এরকমের ভূমিতে রঙ চুপসে (absorb) যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। এ আস্তরে শিল্পী এর উপর কালো কালিতে বা কাঠ খড়িতে একটা ড্রইং করে নিত। এর পর ভূমিটিকে তৈরী করা হ'ত তার্পিণে মাখা এক রকমের খুব হাল্কা রঙে, যা'তে করে ড্রইংটি বজায় থাকে এবং বেশ দেখা যায়। যখন এ স্তরটি শুকিয়ে যেত তখন ছবির ছায়াগুলিকে স্বচ্ছ ব্রাউন রঙে আঁকা হ'ত। পরে এর উপর নানাবর্ণের সাহায্যে ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হ'ত। এটা ছিল গোড়াকার প্রথা। ক্রমশঃ শিল্পী এক রঙে তৈরী ভূমির উপরই আঁকার কাজ সুসম্পন্ন করতে সুরু করে। এই প্রথা প্রাথমিক Flemish ও Dutch Painterরা গ্রহণ করে। বিখ্যাত শিল্পী Rubens, Teniers ও Ruysdal এ-রকমের প্রথাতেই ছবি আঁকে।

রেমব্রাঁদ (Rembrandt) 'rough surface' ভালবাসত। তা' ছাড়া এ শিল্পীর প্রিয় ছিল "Glazing" অর্থাৎ ভূমির উপর অপেক্ষাকৃত লঘুভাবে স্বচ্ছ (Undertone) একটি বর্ণ প্রলেপের উপর সাদা রঙ না মিশিয়ে আস্ত স্বচ্ছ রঙ দেওয়া। Frans Hans এক রঙা প্রলেপ না দিয়েই ছবি আঁকত এবং হাল্কাভাবে ছায়াকে ফুটিয়ে তুলত। তা' ছাড়া মাঝারি রঙগুলিকে বেশ পুষ্টভাবেই ব্যবহার করত এবং পাতলা রঙগুলিও বেশ জোরাল ভাবে প্রয়োগ করত।

টিশিয়ানের (Titian) প্রথা ছিল অন্য রকম। বেশী মেশান (Mixed) রঙ না দিয়ে সাধারণ রঙগুলিকে পুষ্টভাবে দেওয়ার প্রথাই এ শিল্পী পছন্দ করত। রঙগুলি হচ্ছে 'হলদে', 'ব্রাউন-লাল,' 'হালকা লাল' ও 'কাল'। কয়েকমাস ছবিটিকে শুকিয়ে তারপর সমগ্র ক্যানভাসকে উজ্জলবর্ণে সুন্দর করা হ'ত এমন কি বিশিষ্টভাবে আলোকিত অংশগুলও বাদ যেতনা। এর উপর তিনি আবার রঙ দিতেন যাতে করে' তাতে তার ছবির জলজ্বলে ভাব ফুটে উঠত। রেমব্রাঁদও অনেকটা এ প্রথায় আঁকতেন তবে তিনি Glazing-এর উপর ঝোঁক দিতেন বেশী।

আধুনিক শিল্পীগণ চৌদ্দ পনেরটি রঙ ব্যবহার করে' থাকে যদিও রসায়নশাস্ত্র প্রায় ২১৫ রকমের শুদ্ধ ও মিশ্র রঙ তৈরী করেছে। প্রচলিত তেলরঙগুলি ইংরাজী নামেই চলে। সেগুলি হচ্ছে Zinc white, Ivory black, Yellow ochre, Strontian yellow, Cadmium yellow, Cadmium orange, Vermilion, Role madder, Madder lake deep, Burnt Sienna, Cobalt blue, French ultramarine, Emerald oxide of Chromium, Viridian, Burnt amber.

আধুনিক যুগের জাগ্রত কর্ম্মকোলাহলের ভিতরে জলরঙের সংযত, শ্রী তীক্ষ্ণ ও দূরগামী হলেও তেলরঙের ব্যাপক জৌলুসের নিকট তা' হার মানে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সমগ্র সম্পদকে একটা অত্যুজ্জ্বল, সাময়িক জীবনসত্তার ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত করতে তেলরঙের তুলনা নেই। নানা অসুবিধা সত্বেও তেলরঙ নিজের প্রতিভাসিক সম্পদে এ যুগের অনেকেরই চিত্তহরণ করেছে। একেবারে আস্ত জগতের জাগ্রত প্রতিকৃতি দান করতে হলে এ উপাদান কাজে আসে। তবে এর ভিতর অতিসূক্ষ্ম রেখাভঙ্গী, মৃদু ঝঙ্কার, বা অব্যক্ত গুঞ্জন বেশী নেই। সবকিছুই এর ভিতর

অতি স্পষ্ট, অতিবাস্তব ও অত্যধিক সীমাবদ্ধ! বীণার ঝঙ্কারের কোমলতা, ও অবগুণ্ঠিত কারুতা পিয়ানোর মত কাকলিতে পাওয়া যায়না। কাব্য ও কলাক্ষেত্রে শিল্পী যতটা ব্যক্ত করে থাকে তদপেক্ষা অব্যক্ত থাকে অনেক বেশী কিছু! তেলরঙের অতি স্পষ্ট ও স্থূল উপাদান প্রত্যক্ষকে যতটা ফুটিয়ে তোলে অপ্রত্যক্ষকে ততটা চোখের সামনে নিয়ে আসেনা, যদিও এর ভেতর কারিগরি বা ভেল্কী দুর্লভ নয়। প্রত্যেক উপাদানেরই একটা স্বধর্ম্মগত সীমা আছে—তাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রাচ্য চিত্রকলায় সমর্থিত জলরঙ ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। এমনকি এযুগে জলরঙের একটা বিরাট সমুত্থানের সূত্রপাত বহু কাল হতেই আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপ বলছে: 'Oil is used because it can better represent or suggest the material aspects of nature and of both animate and inanimate objects real or imaginary." প্রকৃতির material অর্থাৎ জড়ত্বের দিক শেষকথা নয়—প্রকৃতির অধ্যাত্ম দিক খুব বড় ব্যাপার! তাকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা সম্ভব নয়। তেলরঙের ভেতর দিয়ে এই গূঢ়দিক ফুটিয়ে তোলা কঠিন। প্রাচ্যদেশেও যে তেল-রঙ ব্যবহৃত হয়নি তা' নয়। জাপানের নানা অঞ্চলে তামামুসি মন্দিরের দ্বারের ছবি তেলরঙে আঁকা।

বস্তুত প্রত্যেক শিল্পীর শিক্ষাদীক্ষা, দেশ কাল, আবহাওয়া, মেজাজ ও অধিকার বুঝে জলরঙ বা তেলরঙ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অসীম ও অফুরন্ত—একদিকে তা সীমাবদ্ধ হলেও অন্যদিকে তার পরিধি পাওয়া যাবে অসামান্য। লিওনার্দ প্রবর্ত্তিত Chiaroscuro মুখশ্রীর অতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যে ভাবে ফলিত করে—তা তেলরঙ ব্যবহারেও ব্যাহত হয়নি এটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

সাময়িক সাহিত্য

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। দাম ৫

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' আর একবার নতুন করে পরিচয় দিলো তারাশঙ্করের ক্রমবর্দ্ধমান রচনাক্ষমতার। এই নতুন উপন্যাসটি যে সমস্ত বাংলাসাহিত্যের পক্ষেই একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম তা-ই নয়, তারাশঙ্করেরই প্রাক্তন রচনাগুলোর তুলনায়ও এর আবির্ভাব একটা আশ্চর্য্যজনক রূপান্তরলাভের পরিচয়। আজ পর্য্যন্ত তারাশঙ্কর যে কয়টি উপন্যাস রচনা করেছেন, পর্য্যায়ক্রমে বিচার করলে অত্যন্ত সাধারণভাবেই তাদের স্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম 'রাইকমল' থেকে তিনি সাহিত্যের যে রূপটি গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্ত্তী কয়েকটি উপন্যাসে সেই মোহময় রোমান্টিক মনোভাবই ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়ে আসছিলো। তারপর দ্বিতীয় স্তরে এসে যখন তিনি পৌছলেন, তখন এই রোমান্টিক মনই আর এক রূপ নিয়ে তাঁর সাহিত্যধারাকে পরিচালিত করতে সুরু করেছে। এখানে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ও সংস্কারের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েছেন হৃদয়ানুভূতির সেই একই প্রকৃতি নিয়ে। তাই, পতনশীল জমিদারকুলের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর সহানুভূতি একই রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তিনি ইতিহাসের

প্রকৃত ধারাকে কল্পনার অবরোধে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন নি। 'কালিন্দী' বা 'ধাত্রীদেবতার' সত্যিকার ট্র্যাজিডি শুধুমাত্র ঘটনার পরিণতিতেই নয়, সংবেদনশীল লেখকের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে তা আরও বেশী স্পষ্ট। মানবসমাজ ও তার জীবন সম্পর্কে উপন্যাসকারের এই সহ-অনুভূতি থেকেই তাঁর সাহিত্যিক মনের প্রকৃত পরিচয় মেলে। কিন্তু বিংশশতাব্দীর মনের অধিকারী তারাশঙ্কর, তাই অতীত ঐতিহ্যের গান গেয়েই তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারেন নি, নিজেরই পারিপার্শ্বিকতাকে তাঁর গ্রহণ করতে হয়েছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। এই প্রগতিশীল মনোভাবের ফলেই তাঁকে এসে দাঁড়াতে হলো সাহিত্যধারার তৃতীয় বাঁকে। 'গণদেবতায়' তার ইঙ্গিত মেলে, 'মন্বন্তর' কে পার হয়ে এই সুর নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'সন্দীপন পাঠশালায়'। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' পর্য্যন্ত এই সাহিত্যধারায়ই চলে এসেছেন তারাশঙ্কর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই উপন্যাসেই তিনি যেন আবার এক নতুনতর দৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষমতার ইঙ্গিত দিলেন।

অনুভূতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তারাশঙ্কর যেমন একেকবার নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে গেছেন, ভাষা ও রচনাশৈলীকেও তেমনি বিষয়বস্তুর উপযোগী অঙ্গাবরণের মত তিনি বিভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রথম পর্য্যায়ে মানবমনের সুকোমল বৃত্তিই ছিলো তাঁর রচনার উপজীব্য, সুতরাং ভাষাও ছিলো কোমল, মধুর, অনেকটা কাব্যধর্ম্মী। এরকম হওয়ার বিশেষ একটি কারণ বোধ হয় এই যে, তখন একদিকে কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র, আর একদিকে কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদের ছিলেন সর্ব্বদিকেই পথপ্রদর্শক, সুতরাং তরুণ লেখকদের প্রথম প্রথম বাধ্য হয়েই তাঁদের হাত ধরে পথ চলতে হয়েছিলো। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসে তারাশঙ্কর বিশেষ করে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় দিলেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সেখানে আর পূর্ব্বতন ভাষাকে বাহন করা সম্ভব নয়, তাই ভাষায় এলো স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, কিন্তু সে তার প্রকৃত রূপটিকে হারালো না। অবশেষে শেষ পর্য্যায়ে এসে তাঁর সে ভাষা আশ্চর্য্যরকম রূপান্তর লাভ করলো 'সন্দীপন পাঠশালায়'। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় সেই ভাষাই যেন আরো খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

এই উপন্যাসটিকে বাংলাসাহিত্যের পক্ষে তথা তারাশঙ্করের নিজেরই রচনার তুলনায় আশ্চর্য্য-রকম ব্যতিক্রম বলছিলাম এই কয়টি কারণেই,—বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষা ও রচনাশৈলীর লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তনসাধনে। প্রাক-রবীন্দ্রনাথের কথা উঠতেই পারে না, এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকেও বাদ দিই এইজন্যে যে, এখানে যে পটভূমি ও মানুষ নিয়ে তারাশঙ্কর নাড়াচাড়া করেছেন, তারা বা তাদের সমশ্রেণীর সমাজ ও মানুষেরা বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনেক পরে। এই পটভূমি ও মানুষের জীবনধারা যে সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, বাংলাসাহিত্যে তা প্রথম ঘোষণা করেন শৈলজানন্দ, পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং তাঁদের রচনার সঙ্গে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র একটা তুলনাগত আলোচনা করলে অসঙ্গত কিছু হবে না। শৈলজানন্দ যেমন তাঁর পটভূমি ও সমাজ নির্ব্বাচন করেছিলেন বাংলাদেশের কোনো এক বিশেষ অঞ্চল থেকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমনি তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝির' কর্ম্মক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের কোনো এক অংশ থেকে; আর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' দেখতে পাই, তারাশঙ্কর তাঁর গণ্ডীকে আরো অনেকখানি সঙ্কীর্ণ করে নিয়েছেন —হাঁসুলীবাঁকের কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া আর শহরের কাঠামোয় গড়া চন্দনপুর নামক এক অখ্যাত

স্থানের মধ্যে। শৈলজানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষগুলি তবু অনেকটা আধুনিক—তাদের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যে একটা বৃহৎ জগৎ আছে, সেই জগতের সঙ্গে যে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে তাদের একটা সম্পর্কও আছে তা তারা জানে, অনুভব করে প্রতিদিনের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে; কিন্তু হাঁসুলীবাঁকের মানুষগুলির কাছে চন্দনপুরের পরে আর কিছু নাই, এমন কি সেই চন্দনপুরও যদি না থাকে তবে আরো ভালো, কারণ, সেখানে কল এসেছে—অধর্ম্মের বাহন। ধর্ম্ম ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না, আর কিছু বোঝে না। এমনি সংস্কারে জর্জ্জরিত তাদের মন যে, আকাশ-বাতাস-প্রকৃতির প্রত্যেকটি অবস্থাকেই তারা বাবাঠাকুর ও রুদ্রদেবের ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তাই, একটা চন্দ্রবোড়া সাপকে তারা নির্ব্বিবাদে ভাবতে পারে তাদের জাগ্রত-দেবতার বাহন বলে, আর যদি কেউ সেই সাপটাকে হত্যা করে তা' হলে তারা শঙ্কিতচিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে কোনো দৈব দুর্ঘটনার। এবং পৃথিবীর অনিবার্য্য নিয়মে সত্যিই যদি কোনো অঘটন ঘটে পাড়ার মধ্যে তা হ'লে আর কারো মনে সন্দেহ থাকে না যে, এ ওই সর্পহত্যাপাপেরই অনিবার্য্য ফল। আর একদিকে এই ধর্ম্মশঙ্কিত লোকগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবমানবীর দল। তাদের অন্তরের আদিম প্রবৃত্তি যেন সভ্যতার স্পর্শও কখনো পায় নাই। তাই, নিঃসঙ্কোচে, প্রায় প্রকাশ্যে এখানকার নরনারীরা প্রণয়লীলা করে। শুধু তাই নয়, অবৈধপ্রণয়জাত সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করতেও তারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। সুতরাং দেখা যায়, শৈলজানন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঞ্চল বিশেষকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করে যে সমাজ ও মানবজীবনের ছবি এঁকেছেন তাঁদের সাহিত্যে তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁক আর তার অধিবাসীরা তার চাইতেও ঢের পেছনে পড়ে আছে। এদিক থেকে বিচার করলে, আশা করি এমন কথা বলা যেতে পারে যে, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এ বইটি একটি আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। তা'ছাড়া, ভাষার দিক থেকেও বিচার করলে দেখা যায়, তারাশঙ্কর--শৈলজানন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাইতে এখানে কম সাহসের পরিচয় দেননি। শৈলজানন্দ তাঁর রচনায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বটে নরনারীর কথোপকথনের মধ্যে, কিন্তু তাকে তিনি অনেকখানি মার্জ্জিত করেই নিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিক থেকে মানিকবাবুর সাহস অপরিসীম, তিনি নরনারীকে দিয়ে যে-ভাষায় কথা বলিয়েছেন তা অ-মার্জ্জিত অঞ্চলবিশেষের ভাষাই। আর তারাশঙ্কর এতটা দুঃসাহস না দেখালেও আর একটা ব্যাপার যা করেছেন তা আর দুইজন সাহিত্যিকও কখনও করতে পারেন নি। শুধু কথোপকথনেই নয়, রচনার বিবৃতির মধ্যেও তারাশঙ্কর অঞ্চলের ভাষাকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। এ-প্রচেষ্টা প্রসংশার্হ কিংবা নিন্দনীয়, সে-প্রশ্ন সম্প্রতি মুলতুবী থাক, তা প্রমাণ হবে পাঠকমহলের গ্রহণেচ্ছার পরিমাণ অনুযায়ী।

তারাশঙ্করের নিজেরই পূর্ব্বতন রচনাগুলির সঙ্গেও যদি 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র তুলনা করে দেখি তা হলেও বলতে বাধা থাকে না, এখানে তিনি শুধু নতুন বিষয়বস্তুরই আমদানী করেন নি, কেবল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেন নি, সেইসঙ্গে এক অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য জাতির সামাজিক জীবনের ইতিহাস আমাদের কাছে এনে দিয়েছন, যার কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে সামান্যতম ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' সম্পর্কে এ-কথাটাই বড় নয়, সাহিত্যের পক্ষে এর চাইতেও যা আসল কথা—মানবমন ও সমজজীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির যে অনিবার্য্য

পরিণতি—তা তিনি এখানে যেমনভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন এর আগে তেমন করে আর কখনও তা প্রকাশ করেন নাই। মূলগত অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, 'কালিন্দী' 'অভিযান' এবং 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একই—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে প্রাচীন যা কিছু তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে নূতনের জন্য পথ ছেড়ে দেবেই। কিন্তু 'কালিন্দী' বা 'অভিযানে' দেখেছি, এ-সত্যটি তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন, কিন্তু অতীতের প্রতি, প্রাচীনের প্রতি তাঁর যে মমত্ব, যে বেদনাবোধ তাকে তিনি গোপন করতে পারেননি; 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়ও' সে মমতা, সে বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে, কিন্তু নূতনের মধ্যে যে আশার বীজ লুকিয়ে আছে তা যেন এই প্রথম তিনি নির্ব্বিবাদে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে নিলেন। তার ফলে, পূর্ব্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে লেখকের যে অস্তিত্বকে অনুভব করা গেছে—এখানে তা একেবারেই অনুপস্থিত।

সংস্কারজর্জ্জর বনওয়ারী গ্রামের মাতব্বর, করালী অসীম শক্তিশালী নাস্তিক যুবক। বনওয়ারী প্রতিপদে গ্রামের জাগ্রত দেবতা বাবাঠাকুরের নির্দ্দেশ মেনে চলে, কারণে অকারণে তাঁর 'থানে' মানৎ করে বসে—অর্থাৎ চিরাচলিত প্রথাকে অস্বীকার করবার সাহস তার নাই, আর করালী বাবাঠাকুরকে ঠাট্টা করে, তার বাহনকে পুড়িয়ে মারে, অধর্ম্মের কলে কাজ করতে যেতে ভয় পায়না, সঙ্গে দু পাঁচটা ছেলেকেও জুটিয়ে নেয়। প্রাচীন ও নবীনের এই দ্বন্দ্ব থেকেই গড়ে উঠেছে 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'। উভয়পক্ষের কলহ ও বিসম্বাদ যেমন এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি জড়িয়ে গেছে কাহারপাড়ার সমাজ আর সামাজিক জীবগুলি। শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হতে হয় বনওয়ারীকেই—কিন্তু এ-পরাজয় মর্ম্মান্তিক। করালী তার বাবাঠাকুরকেই উড়িয়ে দেয়নি, তার ঘরের বউকেও নিয়ে গেছে ঘর থেকে বের করে, নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে তাকে—মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সে নিঃস্বতা।

বনওয়ারীর জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই আগাগোড়া কাহিনী এগিয়ে গেছে। তাই তার চরিত্রটিই লেখক একান্ত স্পষ্ট করে এঁকেছেন, কিন্তু যে-মানুষগুলি তার জীবনকে ঘিরে দিনরাত কালাতিপাত করেছে তারাও সমান স্পষ্টতায়ই ফুটে উঠেছে—সুচাঁদ, নয়ানের মা, পানু, রতন, পাখী আর কালোবৌ—কালোশশী। কালোশশী আর বনওয়ারীর ভালোবাসা স্বাভাবিক ভালোবাসা। উভয়েই বিবাহিত—সুতরাং অবৈধ প্রণয়। কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীটুকুও লেখক এমন দরদ দিয়ে বলে গেছেন যে, সেখানে পাঠকের মন একটুও সঙ্কোচ অনুভব করার অবসর পায় না। এমনকি এই ভালোবাসার পরিণামেই যখন কালোশশীকে দহের জলে ডুবে মরতে হলো, আর সদ্যরোগমুক্ত বনওয়ারীর হৃদয় কালোশশীর শোকে লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ হতে না পেরে আকুলিবিকুলি করে উঠলো তখন খানিকক্ষণের জন্যে হলেও, পাঠক একটু অভিভূত না হয়ে পারেন না।

প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা মনে পড়ছে। 'রাইকমল' ও তার পরবর্ত্তী দু' একটি বই-এ তারাশঙ্কর চমৎকার প্রেমোপাখ্যানের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন, রচনা করলেন 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা' তখন দেখা গেলো, তিনি নরনারীর প্রেম-সম্পর্ককে যেন আর প্রশ্রয় দিতে চাননি। এবং এমন কি, প্রেমোপাখ্যান সৃষ্টি করতে গিয়েও তেমন ভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেননি। 'কালিন্দী' যাঁর পড়া আছে, তিনি জানেন, রামেশ্বর-সুনীতির ব্যর্থ জীবনের কাহিনী, ইন্দ্ররায়-রামেশ্বরের বিরোধের কাহিনী যেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, অহীন্দ্র-উমার প্রেম তেমন

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি, বরং অন্যান্য চরিত্রের কাছে এই দুটি মানব মানবী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, অথচ এই দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে চমৎকার এক টুক্‌রো প্রেমোপাখ্যান সৃষ্টি করার মত সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিলো। তারপর 'সন্দীপন পাঠশালায়' দেখি নতুন মাষ্টারণীর প্রতি পণ্ডিত সীতারামের মনে একটু দুর্ব্বলতা জেগেছে মাত্র, প্রেম হয়ে তা ফুটে উঠতে পারেনি,'—হয়তো তা সম্ভবও ছিলো না। 'অভিযানে' নরসিং নীলিমাকে মনে মনেই ভালব সলো—কিন্তু তা প্রেম নয়, আর ফটকীকে সে ভালও বাসলো না—দেহ-লালসাকে শুধু পরিতৃপ্ত করতে চাইলো সেখানে। এ-লালসা শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের রূপে প্রকাশ পেলো বটে কিন্তু ততক্ষণে কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। নরনারীর মনের মধ্যে প্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে বারবার তাকে এড়িয়ে গেছেন লেখক। পাঠকের পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক, হয় তারাশঙ্কর আর প্রেমোপাখ্যান রচনা করতে চান না, নয় তো তা রচনা করবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন কিন্তু তার কোনটাই যে সত্য নয় তা প্রমাণ করলেন তিনি 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' বনওয়ারী-কালোশশীর প্রেমে, করালী-পাখীর প্রেমে।

মাটির প্রতি বনওয়ারীর প্রীতি অসীম বলে নয়, পারিবারিক জীবনেও যেন বনওয়ারীর সঙ্গে Good Earth-এর ওয়াংলাং-এর অনেকটা মিল আছে। উভয়ের জীবনের পরিণতি প্রায় একই—আবার চরিত্রের দিক থেকে মিল খুঁজে পাওয়া যায় গোপালীবালা আর 'ওলানের' মধ্যে, সুবাসী আর 'লোটাসের' মধ্যে। উভয়ের সাদৃশ্য থেকে এ কথাটাই যেন বিশেষ করে মনে হয়, ঘটনাবৈচিত্র্যে মানুষের জীবন যে ভাবেই চালিত হোক না কেন, অবস্থা ও প্রকৃতির সাদৃশ্য থাকলে পরিণতি একই রকম হতে বাধ্য। স্থান কাল ও পাত্র ভেদে বিশেষ কোনো পরিবেশেরই শুধু পরিচয় মেলে, মানবচরিত্রের যে প্রকৃত স্বরূপ তা এই পরিবেশের অতীত। এবং যে সাহিত্য সেই চরিত্র এবং জীবনবোধের ইঙ্গিত দেয়, সে-সাহিত্যই সার্ব্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' তারাশঙ্কর সেই মানব-হৃদয়ের সার্ব্বজনীনতাকেই স্পর্শ করেছেন। 'Good Earth' -এর সঙ্গে এ-গ্রন্থের সাদৃশ্য এখানেই।

সমগ্র বইটি পড়তে পড়তে কোথাও আটকে যাওয়ার কথা নয়, ভাষাও বর্ণনা স্রোতোধারায় কোথাও বাধা পড়ে না সত্য, তথাপি একটা বাধা মাঝে মাঝে আসে অন্যভাবে। সুচাঁদ যখন হাঁসুলীবাঁকের পুরাতন স্মৃতি মন্থন করে, তখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে সে বারবার। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো এটা স্বাভাবিক, কিন্তু পাঠকের কাছে একই কথার পুনরাবৃত্তি কি বাধার সৃষ্টি করে না? অন্য কোনো প্রকারে কি সুচাঁদের ভাব কে অক্ষত রেখে এই পুনরাবৃত্তি রোধ করা যেত না?

সর্ব্বশেষ বক্তব্য হলো বাংলাসাহিত্যের সেইসব নীতিবাগীশ পাঠকদের প্রতি যাঁরা মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস কুপ্রিণ কিংবা লরেন্সকে নিরুদ্বেগে ক্ষমা করতে পারেন, অথচ বুদ্ধদেব অচিন্ত্যকুমারের নামে পনেরো বৎসর আগেকার মতোই নাক সিঁটকিয়ে বলেন, অশ্লীল। এইজাতীয় শুচিবায়ুগ্রস্থ পাঠকের অভাব আজও বাংলাদেশে নেই জানি, তাই তাঁদের আগে জানিয়ে রাখতে চাই, অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে যদি তাঁরা মলাট মুড়ে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বন্ধ করে রাখতে চান, তাহলে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবেন। তারাশঙ্কর কাহিনীস্থলে অশ্লীলতার অবতারণা করেন নি এক অশিক্ষিত অস্পৃশ্য জাতির ইতিকথা বলতে গিয়ে তাদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকেও প্রসঙ্গত প্রকাশ করেছেন মাত্র।

অনিল চক্রবর্ত্তী

কল্লোল—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। দাম—৫৲

রসিদ আলী দিবসের ছাত্রবিক্ষোভ থেকে শুরু করে ১৯৪৬-এর সর্বাত্মক ধর্মঘট পর্যন্ত এই উপন্যাসের পরিক্রমা। একটি বিশেষ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা সচেতনা যেখানে গণ-কল্লোলে আগামী পরিপূর্ণতাকে ব্যঞ্জিত করেছে সেখানে এসেই লেখক তাঁর কাহিনী সমাপ্ত করেছেন।

কিন্তু একে কি কাহিনী সমাপ্ত করা বলব না লেখনী সংবৃত করা বলব? বস্তুত, 'কল্লোল' কোনো কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাভিগ দ্বন্দ্বের বৃত্তাকার পরিণতি নয়। এ উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু তা চলিষ্ণু রাষ্ট্রভাবনার কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে চলেছে দ্রুত-পরিবর্তনশীল ভারতবর্ষ আর সে পরিবর্তনের প্রতিটি অঙ্কই কল্লোলের এক একটি নতুন সংযোজন হতে বাধ্য। তবু ঔপন্যাসিককে এক জায়গায় থামতেই হবে, তাই সঞ্জয়বাবুও থেমেছেন। গর্জিত মহাসাগরের কয়েকটি তরঙ্গের সঙ্গেই সঞ্জয়বাবু আমাদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন, তার সমগ্রতাকে ধরতে চেষ্টা করেননি। চেষ্টা সম্ভবও ছিলনা।

সমস্ত বইটি বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনায় আর আলোচনায় আলোকিত—তার পটভূমিতে ভারতবর্ষের থমথমে আকাশ। কখনো মেঘ, কখনো বিদ্যুতের আগ্নেয় ঝলক। তাই 'কল্লোল' ঘটনামুখ্য কাহিনী নয়—যদিও বিভিন্ন আন্দোলনের চমক-লাগানো বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ এবং অবকাশ লেখকের ছিল। আন্দোলনের পশ্চাৎপটে কতগুলি সময়-সচেতন মানুষের মানসচিত্র আঁকবার চেষ্টাই তিনি করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সঞ্চারক্ষেত্র কয়েকটি মধ্যবিত্ত মন এবং এ মনগুলি প্রধানত ইণ্টেলেকচুয়াল—যারা সময়ের উন্মাদনার চাইতে তার নেপথ্যস্থিত ভাবসত্যটিকেই জানতে ও বিচার করতে চেয়েছে বেশি।

আর এই কারণেই তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রগুলোকে এক একটা cross-current-এর প্রতীক বলে মনে করে নেওয়া যায়। ছাত্র-আন্দোলনের প্রতিভূ প্রদীপ, দেশকর্মীর তিক্ত-নৈরাশ্য ও পরাভূত মানসিকতার অপূর্ব প্রতিচ্ছবি অবনী। সুজাতা সেই জাতের মেয়ে—চতুর্দিকের কল্লোল-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও যে ঠিক তার ভেতরে নেমে আসতে পারেনা প্রত্যক্ষভাবে এবং এই কারণেই কোনো বিশেষ দলীয়তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে খানিকটা স্ত্রী থিকারের মতো তার ভূমিকা। সাংবাদিক সন্তোষ পারিবারিক জীবনে পূর্ণ পরিতৃপ্ত, অথচ মিছিলে এগিয়ে যাওয়ার ডাক যখন আসে তখন সে এগিয়ে যায় শান্ত ও নিরাসক্ত মনে—টমিগান আর বুলেটের ভয় তাকে মণিমালা-কেন্দ্রিক শান্ত-চরিতার্থতার দিকে ঠেলে পিছিয়ে দেয় না।

কাহিনীর কেন্দ্রচরিত্র প্রতীপ। মূলত সে গান্ধীবাদী—আগষ্ট আন্দোলনের পরে কারামুক্ত হয়ে সংপ্রতি রাজনীতি থেকে বিশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন তার না থাকলেও তার মনের বিশ্রাম নেই—সে মন সারাক্ষণ কাজ করে চলেছে। চারদিকের ঘাত-সংঘাত একটা বিড়ম্বিত অতৃপ্তিতে তাকে বিষণ্ণ করে তুলছে, প্রতিমুহূর্তেই নিজের কাছে তার আত্মজিজ্ঞাসা স্ফুরিত হচ্ছে: কর্মে দেবার? কাহিনীর পরিণতিতে যে সর্বব্যাপী প্রস্তুতির উল্লেখ আছে তাতে তার মন সে জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো পেয়েছে, হয়তো বা পায়নি। এই জটিল চরিত্রের মধ্যে বেদনাময় একটা নিরাসক্তি আছে—একটু অসুস্থতাও যেন আছে। আত্মকেন্দ্রিক প্রতীপ হয়তো কর্মী প্রতীপরূপে আবার একদিন জেগে উঠবে,

কিন্তু সে কবে এবং কী উপায়ে লেখক তার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি। নেতাশ্রেষ্ঠ গান্ধীজীর ব্যক্তিক সাধনা ও আত্মশুদ্ধির সঙ্গে মার্ক্সের সমাজ-সাধনার একটা সামঞ্জস্য নির্ধারণের প্রয়াস প্রতীপের মধ্যে দেখতে পাই, কিন্তু সেও ভাবগত—তার কর্মগত কোনো নির্দেশ অন্তত 'কল্লোলে'র এই কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্যে নেই।

এই একান্ত অন্তর্মুখী মানুষটির নিভৃত জগতে এসে দোলা দিয়েছে সুজাতা। লীলা, সাবিত্রী, নীলিমা যে জটিল মানুষটির কাছে এসে ঠিক ভেতরে ঢোকবার পথ খুঁজে পেলনা—সুজাতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলনা—লীলা, সাবিত্রী, নীলিমার সঙ্গে একদিন মানসিকতার নেপথ্যে সঞ্চিত হবে তারও কঙ্কাল। এই নিরুত্তেজিত স্তব্ধতার কাছে এসে বৃথা অভিমান জানিয়েছে সুজাতা, দাবী করতে পারেনি ; আর এই নিরাসক্তির জন্যেই শেষ মুহূর্তেও প্রতীপ সুজাতাকে একান্ত করে পেলনা নিজের কাছে, মনে হল, আজকের দিনই শুধু শেষ দিন নয়—"কাল বলে সত্যি একটা সময় আসবে, যখন সব আগেকার মতো।" তার চাইতে প্রতীপের মনের কাছে সত্য হয়ে রইল নীলিমা—কলকাতার ইট-পাথরের বেষ্টনীতে বসে দূর-বনান্তের কোনো নীলিম স্বপ্ন দেখবার মতো।

একটা চলন্ত গতিশীলতার ভেতরে এইটুকুই উপন্যাসের একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু বাইরের থমথমে আকাশকে লেখক ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেননি তার ঝড়ের ঝাপটাকে। ওই রক্তাক্ত বিদ্যুৎঝলক তার বাতাসের মাতামাতি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্ত ছিন্ন করে দিয়েছে মনের ভেতরে নীলিমার নীলিম-স্বপ্নকে, সুজাতার ছন্দোগম্ভীর পদসঞ্চারকে। বাইরের বিপুল কল্লোলে যদি ভেতরের গুঞ্জন হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে সে স্বতঃসিদ্ধতার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। লেখক তা মেনে নিয়েছেন, পাঠকও মেনে নিতে বাধ্য।

মধ্যবিত্তজীবনে রাজনৈতিক আলোড়নগুলির প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'কল্লোল' বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এর সমগ্র গঠনের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ কঠিনতা আছে—স্থির দৃঢ়তা আছে এর ভাষায়। তবে বিভিন্ন মানুষের বাচনের ভেতরে যেন একটা well-conceived সচেতন ভাব আছে—যা আর একটু স্বাভাবিকতা দাবী করতে পারত।

শেষ কথা এই—নানা চরিত্রের মুখে ও ভাবনায় যে রাজনীতির বিশ্লেষণ আছে বহুক্ষেত্রেই আমি তার সঙ্গে এক মত নই এবং অনেকক্ষেত্রেই আমার প্রতিবাদ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প-সার্থকতার দিক থেকে 'কল্লোলে'র রস-গ্রহণ করতে আমার বাধেনি, কারো বাধবে বলেও মনে হয় না। লেখকের কতগুলো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের সঙ্গে পাঠকের ব্যক্তিগত মতবাদের পার্থক্য ঘটলেও উপন্যাস উপন্যাসই,—তার ধর্ম আলাদা, তার স্বাদ-গ্রহণের পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি আর উনি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড। দাম ৩৲

ইংরেজ আমলের দয়ায় আমাদের দেশে একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তৈরী হয়েছে—যাদের তুলনা দেওয়া যেতে পারে সেই হিতোপদেশের ময়ূরপুচ্ছ বায়সের সঙ্গে। এঁরা সরকারী দপ্তর-অফিসের চাকুরিয়ারা। নিজেরা নিজেদের নিয়েই সম্পূর্ণ তাঁরা। চাকরীর বোঝাটা ঘাড়ে নিয়ে এঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন মফঃস্বলের শহর থেকে শহরান্তরে। এ টানাপোড়েনের অন্ত নেই যে পর্যন্ত না

কর্ম্মজীবনের শেষ পর্য্যায়ে এসে একটা আইন-অনুযায়ী ছেদ পড়ে। তখন তাঁদের একটা গালভরা নাম হয় 'রিটায়ার্ড অফিসার'। সমাজের প্রতি কোনো টান নেই এঁদের যতদিন তাঁরা তাঁদের কাজে বহাল আছেন, কিংবা এমনও বলা যায়, এঁরাই একটা সমাজ যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনো যোগ নেই। সাধারণ মানুষের দিকে তাকাবারই বা সময় কোথায় তাঁদের, আপন আপন আভিজাত্যের খাঁচায়ই বন্দী হয়ে আছেন তাঁরা নিরন্তর।

এ-জাতটাকে নিয়েই অচিন্ত্যকুমার 'ইনি আর উনি'র গল্পগুলোকে তৈরী করেছেন। বলে রাখা ভালো, অচিন্ত্যকুমারের অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এ-বইটির তুলনা করতে যাওয়া বৃথা। কারণ, এখানে ইনি আর উনিদের তিনি যে-দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং যে-রূপে তাদের পরিচয় দিয়েছেন তা একেবারে আলাদা। বলা যেতে পারে, চাটনীর আস্বাদনের মতো এ-গল্পগুলিতে যেন একটু স্বাদ বদল করতে চেয়েছেন লেখক। ঘটনাগুলির পরিবেশ ব্যঙ্গাত্মক, বর্ণনার ঢং হাল্কা—সব মিলিয়ে পাঠকের মনে একটু কৌতুক রস পরিবেশন করবারই ইচ্ছা লেখকের। কিন্তু আসল কথা হলো, গল্পগুলোর মধ্যেকার হাসিটাই সব নয়, বিদ্রূপটাও প্রচুর।

উপরালাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নিম্নতরদের সে কি প্রাণপণ চেষ্টা আর প্রতিযোগিতা, কন্যাদায়গ্রস্থ উপরালার কি করুণ প্রয়াস অবিবাহিত অধঃস্তন কর্ম্মচারীকে আয়ত্ত করার জন্য, স্বার্থ ও সম্মান বজায় রাখবার জন্য কি নোংরা ছ্যাচরামি, আর লোক-দেখানো ভালোমানুষীর কি হাস্যকর ভণ্ডামী!—এই নিয়েই কেটে যায় এই তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীটির দৈনন্দিন জীবন। বাইরেটা যেমন ভেতরটাও তেমনি। ইনির চেয়ে উনিও কিছু কম যান না। স্বামী যদি উকীল হন তো স্ত্রী বলেন, 'এদিকটাই আমাদের লাইন। শত হলেও তো আমরা আইন-আদালত নিয়েই আছি—উকীল আর হাকিম।...আমাদের সবাইর এক জায়গায় তাই একই হওয়া উচিত—আমরা যারা গাউন পরি।' ডিপুটি-গিন্নীর মুখে তাই শোনা যায়, 'একদম সময় নেই, not a tick, তিনটের সময়ই আবার টুরে বেরোতে হবে। তাই বললুম, ভদ্রলোকের এত মারাত্মক অসুখ, চলো দেখে আসি।' ভাবটা এই, যেন স্বামীরা শুধু চাকরী নামক বস্তুটিকে ধরে আছেন, সমস্ত দায়-দায়িত্ব আসলে স্ত্রীদেরই।

বস্তুতঃ, অটুট এক একটি গল্প বলার জন্য লেখক এ-গল্পগুলোকে তৈরী করেননি। কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ভণ্ডামী-সর্ব্বস্ব সমাজ থেকে বেছে বেছে কয়েকটি টাইপ চরিত্র উদঘাটন করেছেন মাত্র। শুধু প্রণালীটা বিদ্রূপাত্মক। কিন্তু চরিত্রগুলো যেমন খাঁটি, বিদ্রূপটাও তেমনি অনর্থক নয়। তবে অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব এই যে, হাস্যরস তৈরী করতে গিয়ে তিনি ভাঁড়ামি করেন নি, বা বিদ্রূপ করার নামে গায়ের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করেন নি। ফলে হাস্যরসও বজায় রয়েছে, বিদ্রূপের আস্বাদটাও কটু হয়ে যায়নি। এই রসসৃষ্টির ব্যাপারে 'ইনি আর উনি' কিন্তু সার্থকভাবেই উৎরেছে। বিদ্রূপের তিক্ততা আছে তবে অচিন্ত্যকুমারের পাকপ্রণালীটাই এমন নিখুৎ যে তার কটুস্বাদটা একেবারেই ঢাকা পড়ে গিয়ে বেশ একটা অম্লমধুর রসের সৃষ্টি করেছে। আগাগোড়া একটা ঝকঝকে সুরুচি বজায় ছিলো বলেই গল্পগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারেনি।

মনে-প্রাণে 'ইনি আর উনি'র বহুল-প্রচার কামনা করি; কামনা করি বইটি তাঁদেরই ঘরে ঘরে বিশেষ করে প্রচারিত হোক, যাঁরা এর উপজীব্য। ঝকঝকে আয়নায় মুখ দেখার মত এখানে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ দেখতে পাবেন, চিনতে পারবেন নিজেদের।

অনিল চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

পূর্ব্বাশা
অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

বাউল

শিল্পী
শ্রীরমেন চক্রবর্ত্তী

দশম বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ • ১৩৫৪

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক

বুদ্ধদেব বসু

সাহিত্য বাংলাদেশের গর্ব, রঙ্গমঞ্চ তার বৈশিষ্ট্য। এত বড়ো ভারতবর্ষে এক কলকাতায় ছাড়া স্থায়ী, সাংবাৎসরিক, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আর কোথাও নেই; নগরবহুল যুক্তপ্রদেশে না, নৃত্যপীঠ দাক্ষিণাত্যে না, আর বাণিজ্যবিলাসী বম্বাই যদিও চলচ্চিত্রে হাতি-মার্কার প্রতিদ্বন্দ্বী, শুধু রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে হাতিবাগান এখনো তার কল্পনার বহির্ভূত। আমাদের নাটক যা-ই হোক, যেমনই হোক, কলকাতার শহরে বাঙালির অন্তত চারটি রঙ্গালয় তো নিয়মিত সক্রিয়। এটা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে কলকাতা যদিও বাংলার রাজধানী, আর সংখ্যায় অবশ্যত বাঙালি সর্বাধিক, তবু অর্থবলে বাঙালিই হীনতম। ধনী ইংরেজের, পয়মন্ত পার্শির একটি ক'রে রঙ্গালয় ছিলো এখানে, কিন্তু চললো না, সিনেমা তাদের গ্রাস ক'রে নিলো; বিশেষভাবে নাট্যাভিনয়ের জন্যই নির্মিত অর্ধ-বর্তুল নিউ এম্পায়ারের মঞ্চকেন্দ্রে ঘোমটা পরিয়ে দিলো দ্বিরায়তনিক ছায়া-ছবির শাদা পর্দা। কথা-বলা বাংলা ছবির আঘাতের পর আঘাতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ যে ভাঙলো না, বরং প্রথম হকচকানির পর দিব্যি টাল সামলে উঠলো, বাঙালির দুর্মর নাট্যপ্রিয়তাই এতে প্রমাণ হয়।

আমাদের আধুনিক সাহিত্য আর আমাদের রঙ্গমঞ্চ যাত্রা করেছিলো একই সময়ে, প্রায় হাতে হাত ধ'রে। ইংরেজ আসার পরে বাঙালির পুনরুজ্জীবনের স্বর্ণ-যুগ তখন। ইংরেজ ভদ্রলোক, ঠাকুরবাড়ি, পাইকপাড়া, সর্বোপরি তৎকালীন সাহিত্য-সূরীগণ, এঁদের সকলের পরস্পর-সমর্থক প্রচেষ্টায় কী ক'রে বাংলা ভাষায় নাটক আর বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চের

জন্ম হ'লো, সে-ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্য আর রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধ এতদূর অঙ্গাঙ্গী ছিলো যে আত্মসম্মানী লেখকরা নাট্যকলার দিকে অন্তত এক চোখ খোলা রাখতেন সর্বদাই; মধুসূদনের উচ্চাশা দেদিকে আর নাটকে সমভাবেই পরিস্ফুট, আর রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর কৈশোরক আবেগোচ্ছ্বাসই কাব্য-নাট্যের আকারে উচ্ছ্রিত ক'রে ক্ষান্ত হননি, ব্যস্ততর উত্তরকালেও নাটককে নিত্য নব রূপ দিয়েছেন আপন প্রতিভায় অন্বিত ক'রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে, আর রবীন্দ্রনাথেরই ফলে, বাংলা সাহিত্য দেখতে-দেখতে সূক্ষ্ম জটিল দুঃসাহসী দূরাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে উঠলো, আর রঙ্গমঞ্চ প'ড়ে রইলো তার উনিশ-শতকী শৈশবেই; ফলত, এই দুই সহযাত্রীর মধ্য অচিরে সম্ভবপরতার সীমা ছাড়ালো, আর আমাদের কাল আসতে-আসতে দেখা গেলো এ-দুয়ে অসেতুসম্ভব ব্যবধান। বর্তমানে বাংলা রঙ্গমঞ্চ দর্শক আকর্ষণ করে পটে, নটে, সজ্জায়, সংগীতে, কিন্তু নাটক বা নাট্যকার দিয়ে কখনোই নয়; প্রাচীরপত্রে বারো ইঞ্চি অক্ষরে প্রধান অভিনেত্রীর নামের নিচে শরৎচন্দ্র উল্লিখিত হন সবিনয়ে: নাটকটা যেন অভিনয়শিল্পের অপরিহার্য ন্যূনতম উপকরণ মাত্র। আমাদের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনীত হয়েছেন মাত্রই বার কয়েক; পুরোনো স্টারে 'চিরকুমার সভা'র অসামান্য সার্বিক সাফল্য যে-আশা জ্বালিয়েছিলো, করুণ মধুর 'গৃহপ্রবেশে'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তা হয়তো ম্লান হ'তো না, যদি না সে-আশা নিবিয়ে নিতেন স্বয়ং শিশিরকুমার তাঁর শোচনীয় 'শেষ রক্ষা'য় আর অসহ্য 'যোগাযোগে'। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য আমাদের রঙ্গমঞ্চের অস্পৃশ্য; অর্থাৎ, নাট্যলোকে যেখানে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় স্বকীয়তা, সেখানে রঙ্গমঞ্চ অদ্যাবধি তাঁকে স্বীকারই করে না: আর এই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে শরৎচন্দ্র যদিও আমাদের থিয়েটর-সিনেমার নিত্য-আরাধ্য দেবতা, তবু জীবনে তিনি একখানা সোজাসুজি নাটক লেখেননি; শুধু তা-ই নয়, নিজের গল্প-উপন্যাসের নাট্যীকরণের পরিশ্রমও অব্যতীতরূপে চাপিয়েছেন অন্যদের উপর। ভাষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ আজীবন নাট্যকার হ'য়েও রঙ্গমঞ্চে পাত্তা পেলেন না, আর শরৎচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের অধীশ্বর হলেন একেবারেই নাট্যকার না-হ'য়ে। এই প্রতিতুলনা অর্থপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে কারো-কারো স্পষ্ট ঝোঁক ছিলো নাটকের দিকে; তরুণ বয়সে যে-সব একাঙ্কিকা তাঁরা লিখেছিলেন, সেগুলি উপেক্ষণীয় নয়—কেউ-কেউ রঙ্গ-মহলে হাজিরাও দিচ্ছিলেন মাঝে-মাঝে, কিন্তু তাঁদের আরজি নিঃসংশয়ে নামঞ্জুর বুঝে সে-পাড়া ছেড়ে দ্বিগুণ মন দিলেন স্বয়ংবশ গল্প-উপন্যাসে। কেননা অভিনীত না-হ'লে, কিংবা অদূর ভবিষ্যতে অভিনীত হবার আশা না-থাকলে, কোনো মানুষই নাটক লিখতে, অন্তত লিখে যেতে পারে না; কৈশোরক্রান্ত রবীন্দ্রনাথেরও নাট্যোৎসাহ নিশ্চয়ই নির্বাপিত হ'তো, যদি-না

স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজনার সুযোগ থাকতো তাঁর, থাকতো অনুরাগী অভিনেতৃমণ্ডল, প্রথমে জোড়াসাঁকোর গুণীগণ—তার অন্যতম তিনি নিজেই—পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী। সর্বতোভাবে উপায়ের অধিকারী হ'য়েও রবীন্দ্রনাথ যে রাজধানীতে তাঁর নিজস্ব রঙ্গালয় স্থাপন করেননি, এ-আক্ষেপের সান্ত্বনা খুঁজে পাই না; কেননা কলকাতায় একটি স্থায়ী, সংবাৎসরিক রবীন্দ্র-রঙ্গমঞ্চ ডবলিনের অ্যাবি থিয়েটরের মতো সাহিত্য আর রঙ্গমঞ্চের মিলন ঘটাতে পারতো নতুন ক'রে, এতদিনে হয়তো নাট্যকলায় নতুন একটি ঐতিহ্যেরই আশ্রয় আমরা পেতাম। অভিনয়বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে শেষ পর্যন্ত তাঁর 'শৌখিন' পদমর্যাদা ছাড়েননি, তার ফলে তাঁর নিজের নাট্যাবলীর ভাগ্যও আজ অনিশ্চিত; যত দিন যাবে, ততই-যে তাঁর নাটক হেলাফেলায় অভিনীত হবে না, কিংবা শান্তিনিকেতনের বাইরে অভিনীতই হবে, এমন-কোনো আশ্বাস সর্বত্রই অবর্তমান।

আজকের দিনে এমন হয়েছে যে কোনো নবীন লেখক নাট্যরচনার কল্পনা করেন কদাচ, কেননা তিনি জানেন যে নাট্যশ্রম মানেই পণ্ডশ্রম, বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত প্রয়োজন লেখক দিয়ে নয়, দিনমজুর কলমচি দিয়ে। বলতেই হয় যে এ-ধারণার উপশমের কোনো কারণ আজ পর্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ দেয়নি; আজ পর্যন্ত সেখানে বালচিত্তই সাধারণত বিলোল; আজ পর্যন্ত সেখানে রসের স্থূলতা আর রুচির বিকৃতি সাধারণত এমন অবারিত যে সুসংস্কৃত ব্যক্তির পক্ষে শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকাই ক্লেশকর—আর যখন কালোকোর্তা-পরা মাইকেল মধুসূদনের সামনে হঠাৎ একদল বন্য বালিকা গাজিয়ে উঠে নৃত্যগীতে ব্যাপৃত হয়, তখন তো কানে আঙুল দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সেও সমস্ত বাংলাদেশের জন্য লজ্জায় মরতে ইচ্ছে করে। অনিবার্যরূপে, আধুনিক বাঙালি লেখকদের মধ্যে কেউ-কেউ সিনেমারচনায় রাজি হ'লেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বলতে গেলে সকলেই নিঃসম্পর্ক; তারাশঙ্করের দু'একটি কাহিনীর নাট্যরূপ আর প্রমথনাথ বিশীর একখানা নাটক পাদপ্রদীপের আলো পেলেও 'বনফুল' অব্যবহৃত, যদিও তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মাইকেল নাটকের ধুমধাম লাগলো একই সঙ্গে কলকাতার দু-দুটো থিয়েটরে। নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী' অভিনয়ের কয়েক বছর আগেই শিবরাম চক্রবর্তী 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ প্রকাশ করেছিলেন 'ভারতী'তে; সেই রচনার প্রতি শিশিরকুমার কি দৃষ্টিপাত করেননি? না করেছিলেন? আমার 'রাবণ' নাটক পনেরো বছর আগে নাট্যনিকেতনে গৃহীত ও বিজ্ঞাপিত হ'য়েও শেষ পর্যন্ত অভিনীত হ'লো না, যদিও তারই অনতিপরে 'স্বর্ণলঙ্কা' নামে একটি নাটক উদ্‌গত হ'লো সেই নাট্যনিকেতনেই। এ-সব দেখে-শুনে এ-বিশ্বাসই আমাদের দৃঢ় হয় যে বর্তমান বাংলায় সাহিত্যিকের ক্রিয়াকর্ম রঙ্গমঞ্চে অপাংক্তেয় আর রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ-ভঙ্গ সাহিত্যিকের অনধিগম্য।

এর মধ্যে দু জন সুযোগ্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর মন্মথ রায়, একান্তরূপে আত্মনিয়োগ করেছেন রঙ্গমঞ্চে। তাঁরা মেনে নিয়েছেন রঙ্গমঞ্চের সব শর্ত, তার স্থূলতা, আতিশয্য, অবাস্তবতা; কিন্তু মার্লো বা শেক্সপিঅরের তুল্য প্রতিভাবান নন ব'লে ঐ-সব শর্তের মধ্যেই মুক্তিকে অর্জন করতে পারেননি, বন্দী হয়েছেন নিজেরাই, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন তার নির্মম নিরন্তর নিপীড়নে। যদি আমাদের রঙ্গমঞ্চ আরো উদার হ'তো তাহ'লে এ-দুজন আরো ভালো নাটক লিখতেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথা যে এঁরা এর চেয়ে ভালো নাটক লিখতে গেলে অনভিনয়ের বন্ধ্যাত্বে নাট্যকারই হ'তে পারতেন না।

শেক্সপিঅর ছোটো দরের অভিনেতা ছিলেন, হ্যামলেট-পিতার প্রেতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন মাঝে-মাঝে; কিংবদন্তী অনুসারে গ্লোব থিয়েটরের পরিচারক থেকে পরিচালক পর্যন্ত উঠেছিলেন। অভিনেতা হোন বা না-ই হোন, নাট্যকারের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের, অভিনয়-শিল্পের সক্রিয় সম্বন্ধ অপরিহার্য ব'লেই বর্নার্ড শ বলেছেন যে নাটকের জগৎটাই স্বতন্ত্র, রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে সর্বজনের পরিচিত জগতের সঙ্গে কিছুই মেলে না তার। প্রসঙ্গত প্রস্তাব করি যে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর অভ্যুদয়ের পর থেকে, আর তারই ফলে, এই স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হয়েছে কিনা, এ-প্রশ্নটি চিন্তনীয়; কেননা শেক্সপিঅরের ইংলণ্ডে নাট্যলোকের এই স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পাই না, বাংলাদেশেও ততদিন না, যতদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নটী সাজতেন বা ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ কৃষ্ণকুমারী। আজকের দিনে স্ত্রীবেশী পুরুষের কল্পনাও আমাদের অসহ্য, কিন্তু বাস্তবসদৃশতার এই দাবি মেটাতে গিয়ে আমরা মেয়েদের মধ্যে এমন-একটা শ্রেণী তৈরি করেছি, আমাদের আমোদনের বিনিময়ে যাদের গ্রহণ করতে হয় সমাজ থেকে নির্বাসনের দণ্ড। সাধারণ, সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন অভিনয়ব্যবসায়িনীর পক্ষে কোনো দেশেই সম্ভব নয়, আর এইজন্যই বোধহয় বর্তমান সময়ে নাট্যজগৎ বাধ্য হ'য়েই ভিন্ন জগৎ হয়েছে। নাটক অভিনয়নির্ভর, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অভিনেতানির্ভর ব'লে এই জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাঁর নেই, নাট্যরচনা তাঁর অনন্য বা প্রধান জীবনকর্ম হ'তেই পারে না। নাট্যকারের পক্ষে স্বয়ং অভিনেতা, অন্তত অভিনয়পারদর্শী হবার বাঞ্ছনীয়তা তাই স্বতঃসিদ্ধ।

তবু বোধহয় একজনও এমন নেই যাঁকে দেখিয়ে ইতিহাস বলতে পারে যে ইনি যত বড়ো অভিনেতা তত বড়োই নাট্যকার। আমাদের গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলালের স্মরণীয়তার সমর্থন তাঁদের নাট্যাবলীতে ততটা মুদ্রিত নেই, যতটা আছে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে; কেননা দেহপট হারিয়েও নট সব হারায় না, তবু স্মৃতি থাকে, নাম থাকে; আর যেহেতু দেহপটের তিরোধানের কিছুকালের মধ্যেই অভিনয়ের উৎকর্ষ যাচাই করার আর উপায় থাকে না; অতীতের শ্রেষ্ঠ নটের সঙ্গে বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নটের তুলনা যেহেতু অসম্ভব, সে-নাম, সে-স্মৃতি কালক্রমে ম্লান না-হ'য়ে বরং প্রবচনের সাহায্যে আরো উজ্জ্বল হয় দিনে-দিনে।

গিরিশ-নাট্য যদিও মুখ্যত পাঠ্যবস্তু নয়, তবু তাঁর কাছে এ-শিক্ষা আমরা পাই যে বড়ো অভিনেতা যদি মাধ্যমিক নাট্যকার হ'য়েও নাট্যরচনা আর নাট্যাভিনয় দুটোকে দুই হাতে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাতে ক্রিয়াকলাপে সমতারক্ষার সম্ভাবনা অন্তত থাকে ; কিন্তু অভিনেতারূপে দিগ্বিজয়ী এবং রঙ্গমঞ্চের সর্বেশ্বর হ'য়ে যদি সেই সঙ্গে নাট্যরচনার শক্তি বা নাট্যনির্বাচনের রুচি কোনোটাই না থাকে, তাহ'লে ভালো-মন্দ যে অনেকাংশেই দৈবের বশবর্তী হ'য়ে পড়ে, তার তর্কাতীত প্রমাণ তো শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরকুমার অনেক বেশি সুখী হতেন, অনেক বেশি সার্থকও, যদি গিরিশচন্দ্রের মতো নিজের অভিনয়ের জন্য নাটক লিখতে পারতেন নিজেই ; মনের ইচ্ছাটা তাঁর তা-ই ; আর ইচ্ছার সঙ্গে শক্তির বিরোধভঞ্জনের চেষ্টা তিনি করেছেন অন্যের হাতে নিজের কলম চালিয়ে। অর্থাৎ, কোনো মৌলিক নাট্যকারের বাণীকে মূর্ত করবার আকাঙ্ক্ষা কখনো স্থান পায়নি তাঁর মনে, তিনি চেয়েছেন নাটকের কাঠামো, মাপ-মতো বানানো, যাকে রক্তে মাংসে প্রাণে গানে উজ্জীবিত ক'রে তুলবে তাঁর অভিনয়। তাঁর প্রতিভার পরম স্ফূর্তি সেখানেই, যেখানে শিশিরকুমারই সর্বস্ব, নাটকটির লেখক কে এ-প্রশ্নও যেখানে দর্শকের মনে অবান্তর। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই ; আর শিশিরকুমারের পক্ষে শিশিরকুমারের অনুগামী যতটা হওয়া সম্ভব, ততটা কোনো শ্রেণীর কোনো লেখকের পক্ষেই নিরন্তর সম্ভব নয় ব'লে তাঁর 'সীতা' 'ষোড়শী' 'দিগ্বিজয়ী'র জয়ধ্বনি যেমন আর থামলো না, তেমনি এমন নাটকেও তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে যা নিকৃষ্টতার দৃষ্টান্তস্থল। যদি তিনি নিজে লিখতে পারতেন, তাহ'লে এই অসমতার দুঃখ তাঁকে দিতে হ'তো না—পেতে হ'তো না। ভাগ্যে শরৎচন্দ্র শিশির-প্রতিভার যোগ্য আধার জুটিয়েছিলেন, ভাগ্যে শিশিরকুমার আবিষ্কার করেছিলেন শরৎচন্দ্রের নাটকীয় সম্ভাবনা। রঙ্গমঞ্চে শিশির-শরৎ সমবায়ের সার্থকতার প্রথম কারণ শরৎচন্দ্রের মনোলোকের প্রতি শিশিরকুমারের আন্তরিক অনুকম্পা ; দ্বিতীয় কারণ অভিনেতার প্রতি গ্রন্থকারের বশ্যতা। অর্থাৎ, শরৎচন্দ্র মৌলিক নাট্যকার ছিলেন না, নিজে নাটক লেখেননি, নাট্যরূপও দেননি, তাঁর কাহিনীকে 'অভিনয়োপযোগী' করার জন্য মঞ্চাধিপতির পরামর্শকেই চরম মেনেছিলেন। অথচ শরৎচন্দ্রের মধ্যে এমন কিছুই ছিলো—মানে, আছে—যা রঙ্গমঞ্চ বা সিনেমার নিষ্ঠুরতম যন্ত্রপেষণেও মরে না ; সম্প্রতি এমন নাটক বা ফিল্মও আমরা দেখছি যাতে শরৎচন্দ্র নামে মাত্র এবং নামমাত্র আছেন, অথচ তাতেও, তার গীতবাদ্য আর চীৎকার অতিক্রম ক'রেও একটি দুটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত সাধারণত আসেই। শরৎ-নামাঙ্কিত যে-কোনো নাটক বা ফিল্ম সম্বন্ধেই যখন এই কথা, তখন শিশির-সংযোগে তার সাফল্যের সম্ভাবনা তো দ্বিগুণ ; আর বস্তুত, শরৎচন্দ্রের যে-গল্পই শিশিরকুমার ছুঁয়েছেন তাতেই মন কেড়েছেন আমাদের ; ব্যতিক্রম শুধু 'দত্তা'।

কিন্তু কথাসাহিত্যের নির্বাধ নাট্যরূপে অভিনেতার যে-স্বাধীনতা, নাট্যরূপী রচনায় তা বর্তায় না; আবার নাটকের মৌলিকতার সঙ্গে অভিনয়ের কৌলীন্য যুক্ত হ'লে রূপে-রসে যে-অখণ্ডতার সৃষ্টি করে, অবস্থান্তরে তা সুদুর্লভ। 'সধবার একাদশী'তে নাটকের আর অভিনয়ের একাত্মীকরণে যে-সৌন্দর্য জন্মেছিলো, শিশিরকুমার যদি একান্তভাবে তারই উপাসক হতেন, তাহ'লে তাঁর প্রভাবে নবীন নাট্যকারেরও আবির্ভাব হ'তো, তাহ'লে শুধু রঙ্গমঞ্চের বিদ্যুৎ-বিকাশেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, বাংলা নাট্যসাহিত্যকেও উদ্বুদ্ধ করতেন। যে-কারণে এমন-কোনো নাটকে তিনি উৎসাহিত হ'তে পারেননি যেখানে কোনো-একটি চরিত্রের, অর্থাৎ তাঁর নিজের ভূমিকার একাধিপত্য নেই, সেই কারণেই রসজ্ঞ হ'য়েও, বিদ্বান হ'য়েও, বাঙালি লেখকসমাজের অসীম মুগ্ধতা অর্জন ক'রেও আমাদের সাহিত্য আর রঙ্গমঞ্চের বিচ্ছেদ তিনি ঘোচাতে পারলেন না। তাঁর উত্থান আর সাহিত্যে 'কল্লোলে'র আন্দোলন প্রায় একই সময়ে; অথচ তৎকালীন অধীরচিত্ত নবীন লেখকদের মধ্যে একজনও-যে তাঁর প্রেরণায় নাট্যকার হ'য়ে উঠলেন না, কবিতা বা উপন্যাসের মতো নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে প্রাণের স্পন্দনে ছন্দ-বদল হ'লো না, শিশিরকুমারের ব্যর্থতার এটাই সর্বশেষ পরিমাপ। এতদিনে নিশ্চয়ই এ-কথা বলবার সময় হয়েছে যে শিশিরকুমার শক্তিধর পুরুষ, কিন্তু সাধক নন; রঙ্গমঞ্চের বিস্ময়কর বিদ্যাধর, কিন্তু সিদ্ধিদাতা নন, মুক্তিদাতা নন।

সৌভাগ্যত, অন্তত একজন নাট্যকারকে তিনি পেয়েছিলেন হাতের কাছে, আপন অভিনেতা-সম্প্রদায়েরই মধ্যে। যে-'সীতা' নাটক শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরকে অচিন্ত্যকুমারের কবিতার বিষয়ীভূত করেছিলো, তার লেখকের নাম-যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আর তিনি-যে ঐ নাটকেই একটি ছোটো ভূমিকায় অবতীর্ণ, আমরা অনেকেই অনেকদিন পর্যন্ত তা জানতুম না। সে সময়ে নাট্যকারের নাম কোনো বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বা আলোচনায় উল্লিখিত হ'তো না; কিন্তু 'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয়ের পরে আর সম্ভব রইলো না যোগেশচন্দ্রের নামের নেপথ্যবাস। তার পর থেকে তাঁর ক্রমিক যশোবিস্তারের উপর মৃত্যুর যবনিকা অকস্মাৎ যখন নামলো, সেই রসভঙ্গে একটু রূঢ় মনে হয়েছিলো মৃত্যুকে, একটু মূঢ়।

মৃত্যুর হাতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের রত্নহরণ সম্প্রতি মাত্রা ছাড়িয়েছে। যোগেশচন্দ্র, দুর্গাদাস, শৈলেন্দ্র চৌধুরী, আর শিশিরানুজ বিশ্বনাথ—প্রাক্-বার্ধক্যেই চারজন সমকর্মী সহকর্মীর কালান্ত মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সচরাচর ঘটে না। উপরন্তু, চারজনের মধ্যে তিনজনই ছিলেন শিশিরনিষ্ঠ। এ-কথা উল্লেখ করছি এইজন্য যে শিশিরকুমারের আমরা জয়ধ্বনি করেছি শুধু তাঁর নিজের অভিনৈপুণ্যের জন্যই নয়, তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যও তাঁকেই ধন্য বলেছি: প্রভা, চারুশীলা, কঙ্কাবতী; যোগেশচন্দ্র, মনোরঞ্জন,

শৈলেন্দ্র—এঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে আমাদের অভিনন্দন কেড়েছেন, এবং শেষোক্ত তিনজনকে আর প্রথমোক্তদের একজনকে শিশির-সঙ্গে 'সধবার একাদশী'তে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এঁদের সহযোগের উপভোগ্যতার পরিমাপ। যোগেশচন্দ্র এঁদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য দুটি কারণে। প্রথমত, ইনি নাট্যকারও; এবং রুচিভ্রষ্ট রঙ্গমঞ্চের শর্তপূরণ যদিও তাঁকে অবশ্যতই করতে হয়েছে, তবু একাধারে অভিনেতা আর নাট্যকার হবার সুযোগের সদ্ব্যবহারই জ্ঞানত তিনি করেছেন। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতা থেকে চ্যুত হ'য়ে পাঠভবনের প্রদীপের পরীক্ষা তাঁর নাট্যাবলীর সহ্য হবে কিনা সে-কথা যদি ওঠে, তবে এ-প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে গিরিশ-গ্রন্থাবলীরই বা সে-পরীক্ষা কতটা সহ্য হবে। আমাদের মঞ্চ-সাহিত্য সাধারণত স্বভাবানুগতির জন্য প্রসিদ্ধ নয়, ভাষাব্যবহারে কৃত্রিমতাই সেখানে প্রথা; এ-কথা তাই বলতেই হয় যে যোগেশচন্দ্র অপ্রাকৃতকে স্থান দিলেও অপ্রকৃতিস্থকে দেননি, আর শেষদিককার গদ্যনাটকে সাংলাপিক স্বাভাবিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন অন্যান্য সমসাময়িক নাট্যকারদের চেয়ে বেশি। দ্বিতীয়ত, শিশির-শিবিরে বাসা নিয়েও অভিনয়ে তিনি শিশিরপন্থী ছিলেন না; অভিনয়ে তাঁর চারিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিলো স্পষ্ট; অর্থাৎ, যে-বাস্তবিকতার পথে নাট্যরচনায় তিনি যাত্রারম্ভ শুধু করেছিলেন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই আয়ত্ত করেছিলেন তাকে। তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিলো শোচনীয় থেকে হসনীয় পর্যন্ত, যে-কোনো ভূমিকাতেই সমভাবে তিনি একাত্ম, যে-কোনো ভূমিকাতেই পরিকীর্ণ তাঁর চমকহীন, বাহবালিপ্সামুক্ত গম্ভীরতা। যোগেশচন্দ্রের অভিনয় যখনই দেখেছি তখনই আমার অন্তরের সাধুবাদ উচ্ছ্বসিত হয়েছে তার দুর্লভ সুমিতি লক্ষ্য ক'রে; গলা চড়ে না, মুখের বিকৃতি নেই, শুধু চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে সুখ দুঃখ ক্রোধ কৌতুক ক্ষমা। মৃদুভাষী মন্থরগামী সেকেলে প্রৌঢ়ের রূপায়ণে জুড়ি ছিলো না তাঁর, কেননা ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সেই অনতিদূর অতীতেরই প্রতিভূ: ধীর, নধর, নম্র, সহাস্য, অধৈর্যহীন। থিয়েটরের সাজ-ঘরে তাঁর কাছে এসেছি কয়েকবার, পরের দৃশ্যের পরদা ওঠার আগে মাত্রই ক'মিনিটের দেখাশোনা; তবু ওরই মধ্যে পেয়েছি পুরাতন্ত্রের অবসরের আবহাওয়া, সৌজন্যের সৌরভ, অনুভব করেছি শৃঙ্খলার শ্রী। স্বভাবে, সংস্কারে, শিক্ষায় কোনো-এক সুনিশ্চিত বিশ্বাসের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন ব'লেই নট-জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রলোভন তিনি এড়াতে পেরেছিলেন সহজে; যে-রঙ্গমঞ্চ জীবিকার উপায়, সেটাকেই জীবনসাধনা ব'লে শ্রদ্ধা করবার শক্তিও পেয়েছিলেন সেইজন্য। যোগেশচন্দ্রের কাছে এই আত্ম-শ্রদ্ধা শিক্ষা করতে পারেন গুণীজনের মধ্যে এমনও অনেকে, যাঁরা তাঁর তুলনায় অনেক বেশি বিখ্যাত, লোকচক্ষে অনেক বেশি দীপ্যমান।

নয়া জমানা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা করছিল বুলাকির। পুরা ঘুম হয়নি, তার জন্যেই কি ? তা-ই হবে। কিন্তু উহুঁ। ব্যথা-ব্যথাটা যেন ঠিক নয়। এক্ষুনি উঠে পড়তে হ'বে বলেই শরীরটা নারাজ হচ্ছে। ফুটপাথের ঠাণ্ডা শান একটু মৌজ ধরিয়ে দিয়েছে—মৌজ ভেঙ্গে দিতে কঁকিয়ে উঠ্ছে তাই শরীর। শরীরের মতলব বুঝ্তে পেরে বুলাকিলাল মনে-মনে একটু হাস্‌ল আর তারপরই হাত-পা ঝেড়ে নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল ফুটপাথের উপর। ময়লা গামছাটা তুলে কাঁধের উপর রাখ্‌ল বুলাকি—নজরে এলো, কয়েকঘণ্টা শিয়রে থেকে কেড্‌স্‌গুলো চেপ্টে চিঁড়ে হয়ে গেছে।

কেডস্‌গুলো পায়ে গলাতে-গলাতে বুলাকিলাল ভাব্‌ছিল এতে হয়ত আর সাতদিনও চল্‌বেনা। আর কতোই বা টিঁক্‌বে—অনেকদিনত হ'ল। চৌমাথার ওই বড় বাড়িটার চীনা সাহেব দেশে যাবার আগে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল কেড্‌স্‌জোড়া—বুলাকি তকে-তকে ছিল, জান্‌ত সাহেব দেশে চলে যাবে—তাই যেম্নি রাস্তায় পড়া, ওম্নি সে ছোঁ মেরে খাব্‌লে তুলে নিয়ে এলো জুতোগুলো। তখন দেখতে একরকম নয়াই ছিল—সাদা-সফেদ রং-টা মজে গিয়ে এম্নি বদখত হয়ে যায়নি। অনেকদিন আগের কথা—পাঁচ-ছ' মাহিনা হবে। চীনা সায়েব দেশে চলে গেল, আম্রিকান্ সিপাইরা দেশে চলে গেল—কামাই কমে এলো—বুলাকিলাল এক-এক করে ভেবে চল্‌ল কথাগুলো। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুল্‌তে লাগ্‌ল তার—আর মাথা দুলনির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজে ভেসে এলো গানের সুর—'সুরতিয়া রে—'। রিক্সমালিকের জুলুম নিয়ে ধর্ম্মঘট হয়েছিল—গানের সঙ্গেই আবার মনে পড়ল বুলাকির। 'লাল ঝাণ্ডা কি জে'—চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছিল সে, মনে পড়ছে। তারপর দাঙ্গা—মিঞালোকদের সঙ্গে দাঙ্গা! রুজি বন্ধ—দেশে পালিয়ে গেল বুলাকি—সেখানেও এই!

হট্—বুলাকি মন থেকে ভাবনাগুলোকে হটিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কালত সে সিদ্ধির সরবত খায়নি, বহুৎ বহুৎ কথা কেন মনে পড়ছে তবে ? এম্নি রকমারি কথা মনে পড়েছিল তার জেহিন্দ পরবের রাত্তিরে। বড় বাড়ির দরোয়ান তেওয়ারিজি তাকে সিদ্ধির সরবত খেতে দিয়েছিল—ফূর্ত্তির তোড়ে খেয়েওছিল বুলাকি পুরা এক লোটা

সরবত—আর কতো যে কথা পেট থেকে ভস্‌ভস্‌ করে জিভের ডগায় এসে জড় হ'তে লাগ্‌ল, ভাব্‌তে গেলে এখন হাসিই পায় তার।

টিকিতে পাক জড়াতে জড়াতে মনে মনে সত্যি হাস্‌তে সুরু করে বুলাকি। একদিন যে সে সিদ্ধির লোটা তুলে মুখে ঢেলেছিল সে-ছবিটা মনে পড়তেই না হেসে যেন আর সে থাক্‌তে পারলনা। কিন্তু সে আর এমন কি হাসির ব্যাপার? আসলে মেজাজই তার শরিফ হয়ে আসছে বোঝা গেল। হাল্কা হয়ে আস্‌ছে শরীর। রিক্সা টান্‌বার জন্যে তৈয়ারী হয়ে উঠ্‌ছে হাত-পা।

কালতক্‌ ভাড়া চুকানো আছে—হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বুলাকির মনে পড়ল। তবু গুজরাতী বুড্ঢা খিট্‌খিট্‌ করতে ছাড়বেনা—কবেকার না কি তার দেড়টাকা ভাড়া বাকি--খাতার কোন্‌ কোণাকাম্‌ছি খুঁজে রোজ কতগুলো আঁকাবাঁকা দাগ তার বুলাকিকে দেখানোই চাই। হবেও বা। দাঙ্গার সময় হয়ত বাকি পড়ে গিয়েছিল। বুলাকির ঠিক মনে নেই। কিন্তু বুড্‌ঢা মিছে কথা বলেনা—কাছাকোঁচা টেনে ভাড়া আদায় করে কিন্তু গঙ্গা মাইজির ধারে বসে মিছে কথা বল্‌বেনা বুড্‌ঢা। সাঁচ বাত হলেই কি আর ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারে নাকি সে এখন? সওয়ারী কই? দু'-তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থাক্‌লে যদি একআধজন সওয়ারী মেলে। সেই চীনা সায়েব আর নেই! রোজ সবিরে নয়া-বাজারে যানা-আনায় রূপেয়া বকশিস্‌ মিলে যেতো। দেশে চলে গেছে চীনা সায়েব। দেশে লড়াই বলেই পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়—লড়াই থেমে গেছে কে আর বসে থাকে এখানে?

কোঁচার খুঁটে পয়সার পুটলিটা আল্‌গা করে আঙুল চালিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল বুলাকি কত আছে। দু'টো আনি আর ক্ষুদে তিনটে ডবল পয়সা। ছাতুর জন্যে দশটা পয়সা রেখে চারপয়সার চুড়া-চানাভাজা চল্‌তে পারে এখন। একটা হাইড্রেণ্টের ধারে উবু হয়ে দু'-আঙুলে খানিকটা গঙ্গার কাঁচা মাটি তুলে দাঁতে ঘস্‌তে সুরু করল বুলাকি। ভুরভুর করে জল উঠ্‌ছে যেখানটায়—রাস্তার ধারের খাটাল-ওয়ালা হরকিষেণের কৃপায় যা অবিরাম প্রস্রবণে পরিণত হয়েছে, সেখান থেকে আঁজলাভরে জল নিয়ে মুখ ধোওয়া শেষ করতে আর কতক্ষণ? তারপর খাটালের বগলেই ভাজার দোকান। রাস্তায় আর রাস্তার কাছেই সব—সব হাতের কাছাকাছি। চুড়া-ওয়ালা সাধুজির নিজের হাতে বাক্সের বেসাইজ লক্‌ড়িতে তৈরী টুলের উপর বসে ঠোঙা থেকে হাতের তেলোয়—হাত থেকে মুখের ভেতর চুড়াচানা ঢেলে ঢেলে চিবোনো কি কম আরাম! এধারে বুলাকি চুড়াচানা চিবোয়, রাস্তার ওধারে খাটালের গরুমোষগুলো জাব্‌না মুখে নিয়ে

চিবোতে-চিবোতে মুখের দু'পাশে ফেনা জড় করে তোলে। বুলাকি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে—ওরাও বুলাকির দিকে তাকায় কি না কে বল্‌বে!

এক লোটা জল খেয়ে বুলাকি একদম ফিট্। টাট্টু্কা মাফিক চল্‌বে এবার পা। লম্বা পা ফেলে সে রিক্সামালিকের কোঠির দিকে এগোয়।

একটা সাততলা বাড়ির নীচে বুলাকি রিক্সা পেতে বসে। পা-দানিতে বসে পায়ের উপর পা তুলে হাতের ঘুন্টিতে টুং-টুং আওয়াজ করতে থাকে। সওয়ারীর খোঁজে ডানে-বাঁয়ে, উপরের দিকে তাকায়। বাড়িটার খোপে-খোপে পঞ্জাবী-গুজরাতী-নেপালী লোকরা থাকে—চীনা সায়েবও আছে দু'চারজন কিন্তু সেই চীনা সায়েবের মতো কেউ নয়। এরা গাড়ি চড়ে নইলে হাঁটে, ঘড়িঘড়ি রিক্সা ডাকে না। তবু বড় রাস্তার মোড় এখানটায়—সওয়ারী এক-আধজন মিলে যায়—তাই এখানে বসা।

নজর খাড়া রাখ্‌তে রাখ্‌তে চোখে জ্বালা ধরে যায়। একটু অন্যমনস্ক হতে চায় বুলাকি। খাটালওয়ালারা ব্যেলের পায়ে হাল বেঁধায়—তাকিয়ে তাকিয়ে তা-ই দেখে সে খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ায়, বুড্‌ঢা খাটালওয়ালা খৈনি টিপ্‌ছে—খৈনি মাঙ্‌তেই উঠে দাঁড়ায় বুলাকি।

সবিরের খৈনিতে বেশ ঝাঁজ—চড়াক্ করে মৌজ এসে যায়। বুলাকি রিক্সায় ফিরে এসে পা নাচাতে সুরু করে। মনের উপর দিয়ে আবার হররকম কথা গড়াতে থাকে। হাল বেঁধাতে কি জখমই না হয়েছে ব্যেলটার পা—রক্ত ঝরে ঝরে দহিকা মাফিক জমে আছে রাস্তার উপর। তবু হাল বেঁধানো চাই। নইলে কল্‌কত্তার রাস্তায় গাড়ি-টানা চল্‌বেনা, খুর ক্ষয়ে-ক্ষয়ে ঠুঁটো হয়ে থাক্‌বে বিল্‌কুল ব্যেল। বলদগুলোর পা হাঁটুতক ক্ষয়ে গেছে—এম্নি একটা অদ্ভুত ছবি-চোখের উপর তুলে ধরে বুলাকি হাস্‌তে লাগ্‌ল। হাতের ঘুন্টিটাও দু'বার বেজে উঠল। কলকত্তার রাস্তায় ওম্নি চলা যায়না—আপনা মুলুকের মাটির সড়ক নয় এ! বুলাকি নিজের পায়ের দিকে তাকায়—জুতোর গোড়ালি একদম ক্ষয়ে গেছে। এ-কোঠির চীনা সায়েবরা কি দেশে যাবেনা—আরেক জোড়া জুতো পেলে জাড়ের দিনগুলো কেটে যেত!

কিন্তু কি তাজ্জব—রাস্তার উপর থলোথলো রক্তটা বারবারই বুলাকির নজর টেনে নিচ্ছে। নিজের কপালের বাঁপাশটাতে বুলাকি হাত বুলোতে থাকে। বেদম চোট লেগেছিল একবার ওখানে। এখনো দাগটা হাতে মালুম হয়। গোলতলার মোড়ে এক মিলিটারী লরী ধাক্কা লাগিয়ে গেল রিক্সায়—রিক্সার ডাণ্ডা ছেড়ে দিলেই সওয়ারী জখম হয়ে

যেত—কিন্তু বুলাকি ডাণ্ডা ছাড়েনি। আর তাই একটা বাতির থামে ছিটকে পড়ল সে—কপাল জখম হয়ে গেল। কতোটা রক্ত পড়েছিল এখন তা মনে করতে পারবেনা বুলাকি, শুধু মনে আছে গামছাটাতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ পড়তে সুরু করেছিল। তবু এতটা রক্ত নয়—ব্যেলের পা থেকে কমসেকম এক পোয়া রক্তত ঝরেছে!

"বাবু—" হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে বুলাকি। কি এক যাদুমন্ত্রে নজরটা তার রাস্তার একটি লোকের উপর চলে যায়। একটা বস্তামার্কা ব্যাগ আর টিনের সুটকেস নিয়ে লোকটি ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আস্‌ছিল। টুং-টুং করে ঘুন্টির আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে গেল বুলাকি।

"বাবু—"

বাবু ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল। রিক্সা নেবে না। হেঁটেই যাবে। বুলাকি রিক্সায় বসে পা দোলাতে লাগল আবার। সওয়ারী মিল্‌বে। এক আধজন জুটে যাবে ন'দশ বাজার অন্দরেই—তারজন্যে বুলাকির পরোয়া নেই। কিন্তু রুজি কমে আস্‌ছে রোজ-রোজ। শক্ত হয়ে গেছে বাবুলোগদের হাত। রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দুবেলা ছাতু খেতে হলে এখন এক-আধ রূপেয়াও তার বাঁচেনা। বুড়িয়া মা আর বাচ্চা ভাইকে দেশে ক' রূপেয়াই বা আর পাঠাবে সে? হিঙ্গুলাল ওদের ত বরষ-ভর খাওয়াবে না। চানাছোলাগহুঁর বোঝা টানে বাচ্চা ভাইটা—মা যাঁতা পেষে—তাতে আর ক'দিন রুটি মেলে ওদের, ক'-টা বা পয়সা পায়? তাইত বুলাকির রিক্সা টান্‌তে হয়। মেহনৎ করতে সে নারাজ নয় যদি পয়সা মেলে। মেহনৎ করে পয়সা কামাই করতেইত এসেছে সে কলকত্তা। পয়সা বেশী পাওয়া যায় এখানে। হিঙ্গুলালের জমিতে কাজ করে যা সে রুজি করেছে—তার দশগুণও এখানে পেয়েছে বুলাকি। এখন আর সে-রুজি নেই!

দু'হাতে কোমর ধরে বুলাকি উঠে দাঁড়ায়। আড়মোড়া ভাঙে। তারপর রিক্সার হাতল দু'টো দু'হাতে জড়িয়ে উপর দিকে তুলে ধরে—আর তারপর মিছিমিছি রিক্সাটাকে একটু ডানে-বাঁয়ে ঠেলে-ঠুলে সোজা করে বসিয়ে দেয়। দূর থেকে সামনে সমস্ত রাস্তাটার উপর বুলাকি তার ঝিমোনো চোখ বুলিয়ে আনে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সাততলা বাড়ির গেটেও আয়া-বেয়ারা-দরোয়ানের ভীড়—চীনা মেমসায়েব নেমে আসেনি এখনো। নেমে এলেও মেমসায়েব টেরিটিবাজার যাবে—ওখানে যেতে বুলাকির পা রাজি হয়না—তবে আজ সে তৈয়ারী, ডর না ভাঙলে চল্‌বেনা।

রোজ ঘুম ভেঙে গা-টা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করে—বুলাকি ঠিক সময়ে উঠ্‌তে

পারছিলনা, কেন। বোঝার আসবে কি? কিন্তু শিরে ত দরদ নেই—পেটে, পায়ে কোথাও দরদ নেই। শুধু পাথরকা মাফিক ভারি-ভারি ঠেক্‌ছে গা। আর মেজাজেও হরদম একটা কথা তাড়া দিয়ে চলেছে। জেহিন্দ্‌ পরবের একটা বুলি: নয়া জমানা ইয়ে হ্যায়। নয়া জমানা। নয়া জমানা সুরু হয়ে গেছে কি? কোথায় সুরু হ'ল? বংলা মুলুকে ত নয়—কোথায়? দিল্লী-ইলাহাবাদে? বুলাকির দেশ ছাপরায়? না কি গান্ধীবাবার দেশে? নয়া জমানা, মনে-মনে আওড়ে যায় বুলাকি—হঠাৎ যেন কোথায় খুঁজে পেয়েছে কথাটা আর কিছুতেই তা ভুলতে পারছেনা। পরবের দিনে এম্নি একটা শুনেছিল মনে পড়ছে বুলাকির কিন্তু সে ত' তা বুলির মতো বলেওনি, ভুলেও গিয়েছিল। এ-ক'দিন ধরে আপনা থেকেই যেন জিভ কথাটা আওড়াতে সুরু করেছে। উহুঁ কিছুতেই এ সাঁচ বাত নয়—কোথাও সে নয়া জমানার হদিশ পাচ্ছেনা—সেই পুরানা আমল, লড়াই-এর আমলের চেয়েও মুস্কিলের দিন এখন—আর মন কি না তার টেঁকুর তুলছে নয়া জমানার বুলি! কিন্তু কি করবে বুলাকি? এ বুলি ভুল্‌তে কিছুতেই রাজি হচ্ছেনা মন।

সারাদিন আজকাল চুপ করে থাকে বুলাকি—'সুরতিয়া—' গানটাও মনে পড়েনা এক আধবার। রিক্সা টানে—নয়াবাজার, টেরিটিবাজার, মল্লিকবাজার কোথাও যেতে আর তার পরোয়া নেই। কেরায়া চড়া হলেই হ'ল। গামছাটা মেরাপের মতো জড়িয়ে নেয় মাথায়, টিকি ঢেকে যায়, তারপর কে আর বলবে সে হিন্দু কি মুসলমান! তাছাড়া, আর লড়াই হবেনা—মনে হয় বুলাকির। এইত নয়া জমানা—লড়াই আর হবেনা। কিন্তু নয়া জমানার এক-দো বরষ আগেওত লড়াই ছিলনা। নেহি—নেহি—মাথা নাড়তে সুরু করে বুলাকি—এ নয়া জমানা নয়। ট্যাঁক থেকে ছোট একটা থলে বার করে সে হাতের উপর কতগুলো রেজগি-টাকা ঢেলে দেয়। পান্‌-ছে রূপেয়া জমা হয়েছে কিন্তু এর চাইতে ঢের বেশি জমেছে তার আগে, এই থলেতেই। নয়া জমানা কি করে এলো তবে? বুলাকি গায়ের ছেঁড়া-নোংরা মেরজাইটা টেনে-টেনে দেখ্‌তে সুরু করে। আবার শেলাই করাতে হবে—পিঠের লম্বা তালিটার জন্যে দর্জ্জি চার আনা পয়সা নিয়েছিল—এখন আবার কতো চেয়ে বস্‌বে কে জানে? জানবাজার থেকে মুলকে একটা ফতুয়া আনা যায় কিন্তু তাতে কমসেকম 'চাইরূপেয়াত লাগবে—একদম খালি হয়ে যাবে থলে!

রিক্সা নিতে সেদিন আর মর্জ্জি ছিলনা বুলাকির। সাধুর চানাচুড়ার দোকানে বসে সে একমনে ছোলাভাজা চিবিয়ে চলছিল। ছুটি। ছুটি চায় মেজাজটা—মনে হচ্ছিল তার। ছুটিতে খারাপ লাগছিলনা একটুও। হাইড্রেন্টের জলে এক-এক করে

বলদগুলোকে স্নান করাচ্ছে হরকিষেণ—কি জোয়ান লোকটা, কালো, ভঁইসকা মাফিক গর্দ্দান—কিন্তু সারাদিন চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ি চড়ে সারা সহর টহল দেয়! জমি-জমা আছে মুলুকে—তবু এ-কাম করতে এসেছে। মুলুকের ছবিটা বুলাকির চোখের উপর উঠে আসে। হিঙ্গুলালের ক্ষেতে হয়ত মকাই উঠেছে এখন—ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাথার পাগড়ি জড়িয়ে হিঙ্গুলাল হয়ত এখন হাটে যায়—এগাঁও-ওগাঁও বেড়ায়। হিঙ্গুলালের দাওয়ায় বসে বুড়িয়া মা তার হয়ত যাঁতা পেষে! হিঙ্গুলালের 'ড়হর ক্ষেতে চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইও হয়ত কাজ সুরু করে দিয়েছে এখন। হরকিষেণের এ-ব্যেলগুলোর মতোই দশ-জোড়া ব্যেল আছে হিঙ্গুলালের—দেখতে আরো তাজা—আর পায়ে হাল নেই—হাল বেঁধায়না হিঙ্গুলাল!

হিঙ্গুলালের বাবার যখন জমি ছিলনা বুলাকির বাবা ব্রিজলালের তখন জমি ছিল—মা বলেছে তাকে। ঘোড়ায় চড়ে হাটে যেত ব্রিজলাল—তার ঘোড়াও ছিল। জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, তারপর ত মরেই গেল। ঘোড়াটার কথা মনে আছে বুলাকির—বারো বরষ হয়ে গেছে—তবু মনে আছে। মনে আছে বাবার সঙ্গে সে-ও ক্ষেতে গেছে হররোজ—বাবার হুকুমে ছুটে-ছুটে একাজ-ওকাজ করেছে। বুলাকি ক্ষেতের মেহনৎ করতে জানে। কুয়া থেকে ঘড়া-ঘড়া জল তুলে ক্ষেতের নালায় ঢেলে দিতে পারে—এম্নি ভোরের রোদে বিঘেটাক্ জমি চষে আস্‌তে পারে সে। আর ব্যেলগুলোকে বশে আনা? হরকিষেণ তার কি জানে—ওত কথায় কথায় চাবুকই জানে, গা-ধোয়াতে গিয়ে তিন-তিনবার চাঁটি মারল ব্যেলটাকে! বুলাকির হাতে কখনো এমন হবে না। আরামে গলা উঁচু করে থাকবে ব্যেলগুলো!

দুদিন পরও বুলাকি ট্রেনের একটা থার্ডক্লাশ কামরার জানালার ধারে বসে হয়ত চোখে মুলুকের ছবিই দেখে চল্‌ছিল। হাওড়ার বাতির মালা ছাড়িয়ে ট্রেন খোলা মাঠের অন্ধকারে এসে চলার ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। ঠোঁটে এক টিপ খৈনি নিয়ে বুলাকি জানালার কাঠে থুতনি চেপে তাকিয়েছিল হাওড়ারই দিকে—ট্রেনের দোলায় সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি উঠছিল তার হরদম। মুলুকে চলে যাচ্ছে বুলাকি—কথাটাকে যেন অন্ধকার হাওয়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল তার মন। কলকত্তার কানে গিয়ে পৌঁছুক তার এ কথা। কিন্তু পৌঁছুলেও বা কি? পারেখজির রিক্সাগুলো ওম্নি পড়ে থাকবেনা—কেরায়া নিতে আদমী জুটে যাবে। বুলাকিই ত শুধু চলে এলো, আর ত কেউ এলোনা। ওরা সবাই আছে। আচ্ছা, ওরা সবাই যদি

চলে আসত কি হত কলকত্তার ? রিক্সা আর চলত্ না। কিন্তু তাতেও বা কি হত ? ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ফিটন বহুৎ-বহুৎ আছে ওখানে—রিক্সা না থাকলেও বা কি ! খাটালে-খাটালে হরকিষেণরাও বা আছে কি করতে—যখন লরী আছে—পাহাড়ের মতো বোঝা টেনে নিতে পারে এমন সব লরী !

ট্রেনের চাকা তাল ঠুকছে। এতক্ষণ মন দেয়নি বুলাকি। পিক ফেলতে গিয়ে কানে এলো আওয়াজটা। আরে ! ঢোলের তালের মতো এত ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে কথাগুলোর সঙ্গে : নয়া জমানা ইয়ে হ্যায়—নয়া জমানা ইয়ে হ্যায় ! কুছুকুছু তাল কেটে যায়—তবু আবার গিয়ে মিল ধরে। বুলাকি মনে-মনে হাস্‌তে স্থুরু করে। সাঁচ বাত— সাঁচ বাত—নয়া জমানা স্থুরু হো গিয়া !

কিন্তু—হাসিটা হঠাৎ মিলিয়ে যায় বুলাকির ঠোঁটে—হিঙ্গুলাল দেবেত তাকে জমি ? কেন দেবে না ! কতো জমিইত চাষ করতে পারে না হিঙ্গুলাল—সেখান থেকে মাঙতে গেলে দো-চার বিঘে দেবেনা তাকে ? জরুর দেবে—ওত পড়েই আছে। কিন্তু হাল-ব্যেল ? ও কি উধার দেবে কেউ তাকে ? কারো তা বাড়তি পড়ে নেই ! তবে নয়া জমানা ইয়ে হ্যায়—জুটে যাবে। জুটে যাবে হয়ত। মনে-মনে চুপ করে থাকে বুলাকি।

পেছনের দিকে তালতাল অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। বিলকুল আন্ধির মতো মালুম হচ্ছে বুলাকির। আর এ কি তাজ্জব ব্যাপার ! সেই আন্ধিতে যেন কতগুলো চোখ দেখতে পাচ্ছে বুলাকি—চকচক করে উঠছে নীলচে-নীলচে চোখ—বুলাকির দিকেই তাকিয়ে আছে এক নজরে। বুলাকি চিনতে পারছে কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারছেনা হরকিষেণের ব্যেলগুলো তার দিকে ওম্নিভাবে তাকিয়ে আছে কেন।

কবিতা

প্রেম

সুধীরকুমার গুপ্ত

পুরানো দিনের ক্লান্তি কত না ব্যথায় হয় ক্ষয় ;
আমাদের নানা আশা, ব্যাকুলতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়
এত যে বিরোধে ওঠে জ্বলে
প্রাণের মহৎ মূল্যে শেষে কি উত্তীর্ণ হবে বলে ?
যে পণে বেঁধেছি বুক, আকাশ ভরেছি যত গানে
আঘাতের মুখোমুখি যদি তা আবার ভেঙে পড়ে
আরো বড়ো নির্ভরের জোড় খুঁজে পাবো কি সেখানে ?

রক্তঝরা সময়ের সোনা
জানিনা কুড়ায়ে গেছে কারা।
সারা হলে দিনরাত সীমান্তের কঠিন পাহারা
চোখে পড়ে যেদিকে তাকাই
কত হাড়, ধুলো আর ছাই।
যে আগুন জ্বলে জ্বলে পরে নিবে গিয়েছে সেখানে
যা ছিল উত্তাপ তার কি কাজে লেগেছে কোনখানে ?
তখন হয়েছে মনে যত কিছু ছাই হোলো পুড়ে
তারা যে হৃদয় ছিল জুড়ে।

সেই হাড়, ধুলো আর ছাই
কোন আকাশ গড়বার কাজে তাকে তখন লাগাই ?

এত সব ইমারতে, ছোট, বড়ো হাজার খিলানে
যে হাসিকান্নাতে, সাধে, কাজে ও অকাজে, অভিমানে
এ হৃদয় চেয়েছে আশ্রয়,
আবার কখন তাকে বঞ্চনার মত মনে হয়।
যে আশা কেঁপেছে রক্তে, যাদের ডেকেছি আরো কাছে
আগে তো বুঝিনি তারা এ মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে।

তবু সেই সব ক্ষতি, দেনা
কাকে ধনী করে তা জানেনা।
সে নিষ্ঠুর বঞ্চনায় কাদের ঐশ্বর্য্য হয় জড়ো
আমার মৃত্যুতে কারা বড়ো ?
তবুও জেতেনি তারা, হঠাৎ দেখেছি তারপরে
আবার সে অন্ধকারে আলোর স্ফুলিঙ্গ কাজ করে ;
কাস্তেতে পড়েছে শান, লাঙল প্রান্তরে নেমে আসে,
প্রাণের মিলিত ডাক বেজে ওঠে সকল আকাশে।
সে ডাকে ভেঙেছে ভয়, পুরানো ধারণা গেছে টলে,
পেয়েছি অনেক বেশী হারিয়েছি যা তার বদলে।

তাই যেন মনে হয় আজ
পুনরায় হৃদয়ের কাজ
আর এক সীমান্তে গেছে থেমে ;
সৃষ্টির নতুন ক্ষেত্রে উত্তরণ হবে কার প্রেমে
কে পথ দেখাবে তারপর
নিজেদের পরে যদি নিজেরাই না করি নির্ভর ?
তাইতো সাহস পাই, মনে ডেকে নিয়েছি সে আশা,
আমাকে ক্ষমতা দিক আমার অদম্য ভালোবাসা।

প্রাক্তন

প্রভাকর সেন

সোনালি রোদের ঝড়ে অঘ্রানের ব্রঞ্জরঙা মাঠে
আমন ধানের গুচ্ছ বেঁধে বেঁধে ঈষৎ তামাটে
এই দেশে মানুষেরা, তারপর শান্তছায়া গ্রামে
ফিরে আসবার পথে ঝিকিমিকি ঝর্ণাতে নামে,—
তখন হয়তো কোন দূর দেশে সন্ধ্যার আঁধারে
কুটিল বিদ্যুদ্দীপ্তি জ্বলে ওঠে খোলা তলোয়ারে,—
তখনো তামাটে এই মানুষেরা শান্তছায়া গ্রামে
ফিরে যেতে ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি ঝর্ণাতে নামে।

তখন সেদেশে কোন সীসারঙ সহরের ধারে
মাটির শরীর নিয়ে ম্লান নারী সন্ধ্যার আঁধারে
বিমর্ষ মৃত্যুর কথা ভেবে নিয়ে অপেক্ষায় থাকে
কোন শ্রান্ত পুরুষের, কোনদিন চেয়েছিল যাকে—
তখন নিশ্চয় জানি এই দেশে দুরত্যয় নদী
তমসার গান হয়ে বয়ে যায় অরণ্য অবধি,—
শুধু সেই দেশে নারী অনিচ্ছুক অপেক্ষায় থাকে
শ্রান্ত কোন পুরুষের, একদিন চেয়েছিল যাকে।

সেই ম্লান মহাদেশে ধূমল আগুন লক্ষকণা
নীলাকাশে বিষ ঢালে, অকরুণ আগুনের কণা
সহস্র খড়ের চালে অপরূপ ফুলঝুরি জ্বালে,
নির্বোধ মুখেব ছায়া নগরের দেয়ালে দেয়ালে,—
ত্রস্ত পাখী পাখা মেলে কোন শ্বেত পাহাড়ের পানে,
প্রান্তরে সোনালি শস্য ধূলি হয় মৃত্যুর বিধানে,—
আগুন স্ফুলিঙ্গ কাটে উদ্যত, তৃষ্ণার্ত্ত তরোয়ালে,
নির্ব্বোধ মুখের ছায়া ইতস্ততঃ দেয়ালে দেয়ালে।

তারপর সুদুর্গম পাহাড়ের নীরবতা নামে
ম্রিয়মান সেই দেশে, গতির পুতুল যত থামে
অলঙ্ঘ্য আদেশে কোন, তারপর ধীরে চাপা পড়ে
নগর, কান্তার, নদী ধুসর, হিংস্র হিম-ঝড়ে,—
কোন ক্লিষ্ট গোধূলির কৃশ আভা শুধু জেগে থাকে
মৃত্যুর স্মারক হয়ে ; জীবনের ভীরু আকাঙ্ক্ষাকে
অন্য কোন নীলাকাশ ডেকে নেয়।
ধীরে চাপা পড়ে
নগর, কান্তার, নদী ধুসর, হিংস্র হিম-ঝড়ে।

রাতের কবিতা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো বা মনে হয় উপহার দিয়ে দিই তোমাকে হৃদয়—
সমস্ত তোমাকে।
হৃদয়ের ভালবাসা—এ জ্যোৎস্নাকে
অনুভূতিময়।
অনেক নক্ষত্র দেখে বুঝি এই তুমি ভিন্ন অন্য কেউ নয়
শুধুই আমার।
অশ্রু, মাটি, তারকার
সবুজ বিস্ময় কথা ভরে নিয়ে ফসলের ঘ্রাণ আর
দিতে চাই সমস্ত তোমাকে।
হৃদয়ের ভালবাসা—এ জ্যোৎস্নাকে।

উত্তর ঝড়ের কাছে এলে মনে হয়
হয়ত নেবে না তুমি থর থর শিশিরের মত এ হৃদয়
তোমার হৃদয়ে !

তরুণ ধানের শীষ কি মূর্ছনা নিয়ে আসে জ্যোতনায়, ভয়ে
শূন্যে মাথা নেড়ে নেড়ে নতুন বিস্ময়ে
কভু জানিবে না ?—
শুধু কি মিলাবে মরে' এ ব্যঞ্জনা—সমুদ্রের ফেনা
অবশেষে ?
দিগন্তে আশ্চর্য রঙ ঝড়-মেঘে নিভে' যাবে কেঁসে ?
তবু দিই এই গান, কবিতা তোমাকে।
হৃদয়ের ভালবাসা—এ জ্যোৎস্নাকে।

আমাকে কখনো তুমি চেয়েছিলে কি না—
হয়ত বা কোনো এক শুক্লরাতে চুপি চুপি এসে
চুমে গেছ এই গাল—মনে নেই, ধূসরাভ অথবা জানি না।
সে এক অদ্ভুত কথা মনে হলে থর থর কেঁপে ওঠে হৃদয়ের বীণা
তবু জেনো, ঠিক কথা কিছুমাত্র আশ্চর্য তা নয়
তোমাকে যে ভালবেসে ফেলিয়াছে আমার হৃদয়।
একেকটি সিঁড়ি নেমে চলে গেলে মনের ভিতর
দেখিবে তোমার মুখ ফুটে আছে সবখানে—
সবখানে বেজে ওঠে তোমার যে স্বর।
ভালবাসা রাখিয়াছে সেখানে স্বাক্ষর।
শূন্য হাত, সব দিয়ে দিয়েছি তোমাকে।
হৃদয়ের ভালবাসা—এ জ্যোৎস্নাকে।

হৃদয়ের সমস্ত দিয়েও
কি যে শেষে থেকে যায় বাকী।
তাহার অস্পষ্ট ব্যথা সারারাত শুধু অনুভব—
ঘুরে ফেরে নীলশূন্যে লক্ষ্যহারা পাখি।
কখনো শিশির ঝরে—সব দীপ মুছে ফেলে পাথায় জোনাকী
আমারো সজল হয় আঁখি।

এই ভালবাসা
মনে হয়, কোনো এক নীড়-গড়া আশা,
তাই পাখি ঠোঁটে করে আনে খড়—হৃদয়ে পিপাসা
তবু শেষে নীড়
ফেঁসে যায়, করে থাকে আকাঙ্ক্ষারা ভিড়
নক্ষত্রের মত সুনিবিড়।
—সে এক দুর্দ্ধর্ষ জয়
যদি নীড় বিচূর্ণ না হয়,
দ্রুত পায়ে না মরে সময়
দিতে পারি কখনো তোমাকে
হৃদয়ের ভালবাসা—এ জ্যোৎস্নাকে।

বাপুজী

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে)

সমুদ্রের কিছু ঢেউ উঠে এসে রাতের মতন
মানুষের বহু চোখে সূর্য্য-ছবি মুছে দিয়ে গেলে
তবু এক ছবি তুমি দূর থেকে দেখে নিতে পার ;
অনাগত কোন এক জ্যোতিষ্কের স্থির-রশ্মিরূপ
পৃথিবী ও আকাশের নীল ও সবুজ ফ্রেমে বাঁধা,
ক্রমে আঁকা সেই এক অতীতের ছবির মতন।
দেখে তবু অন্ধকারে আরো একবার
তোমার প্রেমের কথা পৃথিবীর কানে কানে
বলে যেতে পার।

যে যা-ই বলুক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বত্রিশ

হাসিনী-নার্সের ডেরা গৃহস্থ-পাড়ায়। যেমন তার পোষাকের শুভ্রতা তেমনি এই ভদ্রতার পরিবেশটাও তার মোহবর্ধক। বাড়ির মধ্যে এতটুকু তার বেচাল নেই। গম্ভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে স্নিগ্ধ সুরুচির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চলা-ফেরা করে।' আর-আর বাসিন্দেরা বুঝেও বুঝে উঠতে পারে না। আত্মীয়তার আঙিনার মধ্যে এসেই আবার নির্লিপ্ততার খিড়কি দিয়ে চলে যায়। সন্ধের সময় কোন-এক ডাক্তারের ক্লিনিকে গিয়ে বসে বলে— কিন্তু ফিরতে কোনো দিন রাত করে না। বাড়িতে বাইরের লোকের যাতায়াত নেই, দরজায় নেই টোকা-টুসকি। আলেখা শ্লেটের মত বেদাগ। কালেভদ্রে যদি কেউ আসে, দেশের থেকে ছোট-ছোট ভাই-ভাগ্নেরা আসে। আজ যেমন ছোট বোন এসেছে একজন।

'আমার মামাতো বোন হয়। পশ্চিমে থাকত। কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছে।' পরিচয়টা চালু করে দিলে সুহাসিনী।

ঘরে ঢুকে গলা খাটো করে তামসী বললে, 'সাক্ষাৎ না বলে মামাতো বোন বললে কেন?'

'মুখে এসে গেল। এখন মনে হচ্ছে মাসতুতো বোন বললেই পারতাম।' ততোধিক গলা নামালো সুহাসিনী।

তামসী হেসে উঠল। ত্বরিত ভ্রূভঙ্গির নিচে স্মিতহাস্যের সমর্থন।

হাসবে না তো কি। অযাচ্য আশ্রয় মিলে গিয়েছে। অনাত্মীয় শহরে প্রথম আতপচ্ছদ। ষ্টেশন থেকে আসতেই পথে জুতো কিনে দিয়েছে, পদোচ্চতার প্রথম

নিদর্শন। বাড়িতে এসে বাক্স থেকে খুলে দিয়েছে শাড়ি-ব্লাউজ, যত নাগরীপনার সজ্জা-দ্রব্য। স্নানের জন্যে ঢাকা-ঘেরা বাথরুম, সরকারী কলতলা নয়। স্নানের শেষে খোস-খোরাক। খাওয়ার পরে গা-ঢালা বিছানা। তন্দ্রাবিজড়িত বিশ্রান্তি।

কে দিত তামসীকে? এত সহজে? ষ্টেশনের বাইরে প্রথম পা ফেলতেই? কে আছে তার স্বজনবান্ধব?

আশ্চর্য, যখন সে নারায়ণের দিকে বিপরীত মুখ করে কলকাতা যাবার জন্যে পথ স্থির করলে, তখন সে কী ভেবেছিল, কোথায় গিয়ে উঠবে? দাঁড়াবে গিয়ে কোন গাড়ি-বারান্দার নিচে, কোন গ্যাসপোষ্টের গা ঘেঁসে? আশ্চর্য, কিছুই সে ভাবেনি। ভেবেছিল কলকাতা গিয়ে পৌঁছুতে-না-পেঁছুতেই কী না-জানি অঘটন ঘটে যাবে। জেলের দরজায় দেখতে পায়নি, হয়তো দেখতে পাবে ষ্টেশনের ফটকের সামনে। কে জানে, হয়তো বা প্রথম রাস্তার মোড় ঘুরতেই। তখনো যে মনে আশা ছিল, সাহস ছিল, বিশ্বাস ছিল। কলকাতাকে তখনো তাই মনে হয়নি নিরুদ্ধ-নিরুত্তর। একজন কেউ আছে এই অনুভবই তার রিক্ততার রৌদ্রে ছিল শ্যামল মেঘচ্ছায়ার মত।

কিন্তু এখন সে একেবারে বিশ হাত জলের তলে পড়েছে। কোথাও কোনো অবলম্বন নেই, নেই অস্ফুট তীররেখা। হাতের কাছে একটা খরকুটো পেয়ে তাকেই তামসী আঁকড়ে ধরেছে। অগ্রটাই আগে ভাবা দরকার—একটুকু আশ্রয়, একমুঠো আহার—পশ্চাতের কথা ভাবা যাবে পশ্চাতে। এর মধ্যে পাওয়া যাবে হয়ত একটু অবকাশের রন্ধ্র, যেদিক দিয়ে পাওয়া যাবে বা পালিয়ে যাবার আকাশ, উঠে দাঁড়াবার জায়গা।

সন্ধেবেলা তামসী সাজগোজ করলে। হাসিনী-নার্সের অধ্যক্ষতায়। সাদাসিধে পোষাকেও এমন প্রখর পারিপাট্য আনা যায় জানত না তামসী। হাতে বই-খাতা না থাকলেও ঠিক কলেজ-মেয়ে বলেই মনে হবে—থোকা-থোকা খাটো চুলগুলো চমৎকার কাজে লেগেছে।

হাসিনী আঁটলে তার রুমাল-টুপি। নির্ভাঁজ শুভ্রতায় নিষ্কলঙ্কতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে দাঁড়াল। দুশ্ছেদ্য গাম্ভীর্য্যের বর্ম তার শরীরে, সাধ্য নেই কেউ তাকে চক্ষু দিয়ে বা ছুঁয়ে যায়।

বেরুবার সময় একটু রসিকতা করল তামসী। বললে, 'আমার কলেজটা কি রাত্রে?'

'হ্যাঁ।' গলার স্বরটা এতটুকু দুর্বল হলনা হাসিনীর। বাড়ির সবাইকে প্রায় শুনিয়ে বললে, 'রাত্রে ষ্টেনোটাইপিঙের কলেজ বসে, সেখানেই তোকে ভর্তি করে দেব। যাতে তাড়াতড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস, ভদ্র রোজগার করতে পারিস দুদিনেই।' অনুপস্থিত জনতার অশ্রুত সমর্থন নিয়ে তামসীর হাত ধরে রাস্তায় নেমে পড়ল।

গাড়ি নিল না। মৃদুগম্ভীর পায়ে জনাকীর্ণ ফুটপাথ ধরে দুজনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। একই নীরব বন্ধুতায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে। একই চিহ্নধারিনী হয়ে। তামসী হাসিনীর লোক, হাসিনী তামসীর পৃষ্ঠপোষক—পরস্পরের প্রস্ফুট বিজ্ঞাপন হয়ে। চমকিত জনতা স্ফুরিত চোখে সরে যাচ্ছে সমুখ থেকে, কেউ-কেউ বা বিদ্ধ করছে ধারালো চোখে। দুজনের মুখভাবে কঠিন উপেক্ষা, প্রায় সংসারবিরক্তি। যেন কোন মহৎ কর্তব্যের আহ্বানে অপ্রকম্প পায়ে এগিয়ে চলেছে। এতটুকু চঞ্চল হবার, বিচ্যুত-বিচ্ছিন্ন হবার সময় নেই।

আসছে কি কেউ পিছনে? নিঃশব্দ পদচারে?

তামসীর মনে হল যেন সমস্ত শহর-বাজার শ্মশান হয়ে গেছে, আলোর প্রসন্নতা মুছে গিয়ে নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে একা-একা হেঁটে চলেছে কঙ্কালাকীর্ণ মাঠের উপর দিয়ে, আর তাকে অনুসরণ করছে এক নিরবয়ব কৃষ্ণচ্ছায়া। চিনতে পেরেছে সে সেই প্রেতমূর্তিকে। সে এক আত্মীয়ের প্রেতাত্মা। তার নাম—

তার নাম পাপ। দুরিত-দুরাচার।

আত্মীয়ের প্রেতকেই কি বেশি ভয়?

তামসী তাকালো একবার হাসিনীর মুখের দিকে। মৃদুরেখায় হাস্য করল হাসিনী। উৎসাহ-ব্যঞ্জক হাসি। তামসী কেমন চমৎকার পথোত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। স্মিতস্নিগ্ধমুখে তামসী সে হাসির মান রাখলে। মানে হল এই, আরো কত দুরূহ পরীক্ষা অনায়াসে পার হয়ে যাব দেখো।

'এই আমার সেই ডাক্তারের ক্লিনিক। এসো। বোসো এইখানটায়।'

চার দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল তামসী। একটা হোটেল সন্দেহ নেই। চেয়ারে-টেবিলে আলাদা-আলাদা দল পাকিয়ে খাচ্ছে—অনেকে। অদূরে পর্দা-ফেলা আলাদা কামরা আছে দু-সারে। ওগুলো বুঝি নেপথ্যচারিনীদের জন্যে। কিন্তু সেদিকে এগুলো না হাসিনী। বিশেষ একটি নির্জন কোণে রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। তামসীকেও বসালো পাশে, তেমনি রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে। যাতে পাপের জ্যোতি স্পষ্ট করে মুখে পড়ে। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে।

পরিচিত বয় এসে হাসিনীর থেকে অর্ডার নিয়ে গেল।

মদ আনতে বললে বোধ হয়। একদিন এমনি এক হোটেলে চন্দ্রমা মদ খেতে দিয়েছিল তামসীকে। তামসী তা খায়নি। কিন্তু আজ যদি হাসিনী তাকে মদ দেয়, সে অনায়াসে তা খেতে পারবে। অন্তত খেয়ে দেখতে পারবে মদটা খেতে কেমন। সেদিন

সে এত শ্রান্ত, এত শূন্য ছিল না। ছিল না এত নিঃসঙ্গ, এত নিরর্থক। ছিল না এই পাপের আবৃত্তির মধ্যে।

বয় এসে দু কাপ চা দিয়ে গেল।

'এখানে মদ পাওয়া যায় না?' আশাভঙ্গ হয়েছে এমনিভাবে প্রশ্ন করল তামসী।

'না। এটা শুধু চায়ের রেস্তরাঁ। কেন, এ সব চলে নাকি তোমার?'

'এ পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা অপূর্ব স্বাদ, অপূর্ব সংসর্গ থেকে অনর্থক বঞ্চিত করে রাখছি নিজেকে।' তামসীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

ওসব চালাতে গেলে বন্ধ ঘরে গিয়ে বাসা নিতে হয়। চলে যেতে হয় হেঁজিপেঁজির দলে। এমনি শালীনতা বজায় রেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যবসা করা যায়না। এই যে একটা অভিজাত আবহাওয়া তৈরী করেছি, মেনে চলছি গার্হস্থ্য সংযম, এটাই তো আসল আকর্ষণ, এরই জন্যেই তো মাননীয় মূল্য পাবার সুবিধে। তা ছাড়া, শারীরিক-আধ্যাত্মিক, সব দিক দিয়েই এটা নির্বিঘ্ন। মদ খেয়েছ কি, রাস্তা থেকে কখন ছিটকে পড়েছ গিয়ে আঁস্তাকুড়ে।

একটা বদ্ধবায়ু দূষিত পঙ্ককুণ্ডের মাঝে বসে আছে তামসী। দু-দু কাপ করে চা খাওয়া হয়ে গেল—আর কতক্ষণ বসে থাকবে শূন্যচোখে?

যতক্ষণ কেননা বসো, রেস্তরাঁওয়ালা আপত্তি করবে না। হাসিনীর দৌলতে তার বেড়ে গিয়েছে আমদানি। কাছে থেকে ব্যাপারটায় রস পাবার জন্যে অনেকেই তৃষার্ত হয়ে ঢুকেছে তার দোকানে। অন্তত এক পেয়ালা চায়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করেছে।

কার জন্যে এমনি বসে আছে তামসী? সে কে? কার জন্যে তার এ আরম্ভ-উদ্যোগ? এ অনুধাবন? সে কোথায়?

মাত্র একটা ক্লিন্ন-কদর্য পাপকে স্পর্শ করেই কি তাকে স্পর্শ করা যাবে?

একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ এসে বসল হাসিনীর মুখোমুখি। চকিতে একবার চোখ চাইল তামসী—না, অধিপ নয়। গালের উচ্চচূড়ে দলিত কতগুলি ব্রণ—সমস্ত মুখে লোলুপতার অবলেপ। নিচু গলায় কি কতক্ষণ আলাপ করলে হাসিনীর সঙ্গে, বাঁকা চোখের খোঁচা দিতে লাগল তামসীকে। কিছুক্ষণ পরেই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

'একটা গাড়ি আনতে গেল—' হাসিনী বললে।

'এবার আমাদের গাড়ি চড়ে ঘুরতে হবে নাকি?' তামসীর দৃষ্টিতে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক।

'এ যাত্রায় তুমি নও, আমি একলা। একলা মানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। তোমাকে দিয়ে আমার দরটা শুধু বাড়িয়ে নিলাম।' হাসিনী সুহৃদ-সুজনের মত হাসল।

'তার মানে ?'

'তার মানে তোমাকে পেতে হলে আগে আমার সাধন-ভজন কর। আমি যদি প্রসন্ন হই তবেই না বর পাবে। ঘোড়া ডিঙিয়ে কি ঘাস খাওয়া চলে ?'

রসিকতার রেশটা বজায় রাখল তামসী। বললে, 'তবে বলতে চাও, যত দিন আছি তোমার গাধাবোট হয়েই থাকব, স্বাধীন প্রতিযোগিতা করতে পারব না ?'

'পারবে কি গোড়াতেই ? আড় ভাঙতে সময় লাগবে না ? তত দিন একটু ভাঙিয়ে খাই তোমাকে। এমনিতে তো আর ঘরভাড়া বা খাওয়া-খরচ নেবনা, তোমার দয়ায় দরদামটা একটু তেজালো করি।'

লোকটা একটা ফণা-তোলা ফিটন নিয়ে এল। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে লোকটাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে তামসীকে উপদেশ দিলে হাসিনী। 'ট্রামে করে সোজা বাড়ি চলে যাও। নতুন লোক, বেশিক্ষণ বাইরে থেকোনা। কি, পারবে তো বাড়ি যেতে ?' ব্যাগ থেকে হাসিনী মনিব্যাগ বার করলে।

পয়সা কটা হাত পেতে নিতে-নিতে চোখে গ্রাম্য নম্রতা এনে তামসী বললে, 'পারব।'

হাসিনী নার্স ও তার সঙ্গীকে নিয়ে ফিটন চলে গেল।

মুহূর্তে একটা কুটিল কুজ্ঝটিকা উড়ে চলে গেল সামনা থেকে। তামসী নিজেকে একবার দেখলে নিজের মধ্যে। শরীরের দৃঢ়তায়ও মনের প্রজ্বলিত প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অনুভব করলে নতুন করে। খানিকটা পথ জোরে-জোরে হেঁটে নিল। ভাবল, চলে যাই অন্য দিকে, উড়ে পালাই।

এসপ্ল্যানেডে এসে সে দক্ষিণী ট্র্যাম নিলে। প্রমথেশবাবুর বাড়ির ঠিকানা তার জানা। সেখানে গেলেই কোনো সূত্রে সে ধরতে পারবে অধিপকে।

রক্তিম বাসনার মত নয়, লাগল অন্তরঙ্গ বেদনার মত। কী মুখ নিয়ে সে দাঁড়াবে অধিপের কাছে ? জয়ীর মত হাসতে পারবে তার মুখের দিকে চেয়ে ? কেন পারবে না ? জীবনকে যে সে বহুরাগিনীতে বাজিয়ে চলেছে—আশায় আর অপমানে, স্বপ্নে আর সর্বনাশে—সেই তো তার জয়। বাসনা নয়, বেদনা নয়, শুধু জীবনসাধন, জীবনের উদ্বোধন।

আমি যে বাঁচছি, যুদ্ধ করছি, এগিয়ে যাচ্ছি এতেই আমি অপরাজেয়।

কোন এক স্খলিত মুহূর্তে অধিপ তার পায়ের গোড়ালির উপরে—ঠিক কতখানি উপরে কে জানে—সামান্য একটু হাত রেখেছিল একদিন। সত্যি স্পষ্ট হাতে রেখেছিল কিনা তা মনে পড়ছে না। হয়তো হাত রাখবার একটা ইচ্ছা ফুটে উঠেছিল তার ভঙ্গিতে।

ধমক দিতেই হাত সে সংযত করেছিল। কিন্তু সেদিন তামসীকে আশ্রয় দেবার প্রয়োজনে যখন সে ব্যস্ত হাতে গৃহসংস্কার করছিল তখন তার দশ আঙুলে ছিল এই স্পর্শেরই সম্পৃহতা। অসুখের সময়টা সে ধরছে না। তখনকার ব্যাকুলতায় হয়তো বা সাময়িক ভাবাবেশ ছিল, সেই অস্থিরতা মনের মধ্যে স্থায়ী হতে পারছে না। একটি গূঢ়-গোপন বলিষ্ঠ স্পর্শেচ্ছা তাকে যেন এখন অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করছে। শরীরের উত্তপ্ত অনাবৃতিতে লাগছে তা এখন পুলকোদ্গমের মত।

এই সেই বাড়ি। কিন্তু ঘর-দরজা বন্ধ, অন্ধকার মনে হচ্ছে কেন?

শুধু কোণের একটা দিকে, হয়তো বা চাকর-দারোয়ানের এলেকায়, আলো জ্বলছে। সাহস করে সেই দিকেই পা বাড়াল তামসী।

খবর যেটুকু পেল তা কোনো কাজের নয়। প্রমথেশবাবুর খুব অসুখ, সপরিবারে চেঞ্জে আছেন। সেই যে পূজোর সময় গেছেন এখনো ফেরেননি। তবে খবর পাওয়া গেছে অসুখটা নাকি বাড়াবাড়ি যাচ্ছে ক'দিন থেকে। তাই এখন আর ওখানে পড়ে থাকবার কোনো মানে হয় না।

আর অধিপ? অধিপবাবুর কোনো খবর জানেন?

তার খবর কে জানে? সে কি একটা মানুষ?

তবে আর কি। ফিরে যাও সেই হাসিনী-হার্সের আস্তানায়। তার শাদা কাপড়ের গোপন পাড় হয়ে থাকো। থাকো জমকালো অক্ষরে তার সাইনবোর্ড হয়ে। যাতে তোমাকে দেখিয়ে তার মান-মুনফা বাড়িয়ে নিতে পারে। তোমার ভাড়া-খাজনার বিনিময়ে। যাতে তুমি নিষ্ক্রিয় লোভের জিনিস হয়ে থেকে ব্যবহৃত হতে পারো তার লাভের পসরায়।

তবু নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে হল না তামসীর। কেন, সে স্বাধীন হতে পারেনা? স্বাধীন প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করতে পারবে না হাসিনীকে?

(ক্রমশঃ)

ঢং

পুলকেশ দে সরকার

হিংসায় সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়ে চম্পাবালা বল্‌লে, ঢং।

বলুক চম্পাবালা। আপনিই বলুন, এই ঢং ছাড়া মানুষের আর কি আছে বলুন। চম্পাবালা বস্তির মেয়ে। অমার্জিত তার ভাষা। নইলে সে এই কথাটাকেই আর একটু ভদ্রস্থ ক'রে বল্‌তে পার্‌ত ভঙ্গি।

আর সত্যি ভঙ্গি ছাড়া কীই বা আছে মানুষের? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, য়্যাটমের অস্তিত্ব তো ধরা-ছোঁয়া যায় না, ওর পরিণতি বা প্রকাশটাই মাত্র ইন্দ্রিয়ের আওতায় বন্দী হয়।

মানুষেরও তাই। আপনি তো সনাতন কাল থেকে একটা অবাস্তব মনকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, হদিস্ পেলেন কিছু? পান নি। অথচ এই অগণিত অসংখ্য মানুষের সব্বাই নাকি এক একটা মনের অধিকারী। যে একেবারেই অবাস্তব হ'য়ে রইল তাকে নিয়ে ব্যবহারিক কারবার চলে কেমন ক'রে, বলুন তো আপনি?

এর সবটাই কি কূটনীতি, মানে অভিনয়? আসল বস্তুটি কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না?

এমন উপসংহার নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

নইলে দেখুন একবার তাকিয়ে ঐ সুজাতা নন্দীর দিকে। হ্যাঁ, তিনিই সৌভ্রাত্র সম্মেলনের উদ্‌গাতা, উদ্যোক্তা, প্রাণস্বরূপা।

জানি সুজাতা নন্দীর যৌবন একদিন ছিল, সেই যৌবনের জোরে একটা তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ঝুলেও পড়েছিলেন। বিদেশী মাটীর রেঁদেভু সনাতনী না হোক আদলতী পাণিপীড়নে পাকাও হ'য়েছিল। তারপরই তেম্‌নি অকস্মাৎ তিনি একদিন তাঁর যৌবনের তরণীখানি একটা টাকার কুমীরকে তলিয়ে নিতে দিলেন। তারও পর একদিন যখন ভেসে উঠ্‌লেন তখন কি একটা সেবায়তনে নিজেকে ভেড়ালেন। মধুকরেরা অবশ্যই আবার গুঞ্জন তুল্‌ল এবং একদিন মহাসমারোহে সুজাতা নন্দী নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন সৌভ্রাত্র সম্মেলনে।

আজ এই অসমাপ্ত-বিক্ষিপ্ত কাহিনীর এক একটা ভঙ্গি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাব্‌তে কত কৌতুক জাগে।

সুজাতা নন্দী উর্বশীর মতোই একেবারে যৌবন নিয়ে দেখা দিলেন। তিনি অবোধ

শিশুর মতো কখনো মূক ছিলেন, নগ্নদেহে ছিন্নকন্থায় পুরীষ কলুষিত হ'য়ে কোনদিন কঁকিয়েছেন, অথবা ফ্রক পরে তেতাল্লিশ টাকা কেরানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকের মিউকাস মুছে নিয়েছেন একথা কারও মনে জাগেনি, জাগ্‌তে পারেনি। অথবা সুজাতা নন্দী কখনো·········না, কোন প্রশ্নই জাগেনি, সুজাতা নন্দী সরাসরি যৌবনের ভঙ্গি নিয়েই আশুতোষ বিল্ডিংয়ে আনাগোনা করেছেন।

এই ভঙ্গি তাঁর সর্বাঙ্গে। ব্লাউজের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো কমলা রঙের শাড়ীখানা কাঁধের যেখান থেকে ঘুরে আলতোভাবে বুকের একটা পাশে আধা অনাবৃতির কৌতূহল সঞ্চারিত করেছে সেখান থেকে পায়ে প্রণতির পর হাউইবাজীর মতো নিতম্বকে রেখায়িত করে আবার যেখানে ঊর্ধমুখী গোলকধাঁধায় মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সেখান পর্যন্ত যে ভঙ্গির বিদ্যুৎপ্রবাহ তা এক ঐ সুজাতা নন্দীরই নিজস্ব। তিনি জানেন, এই শাড়ীখানা আর এই ব্লাউজখানাই তাঁকে আজ মানাবে, তিনি একদিন এই যমজ কাপড়ের টুকরো অত্যন্ত যত্নে পাট করে চল্লিশ ইঞ্চি শক্ত সুটকেশের ভেতরে রেখেছিলেন, এমন একটা উপলক্ষে অঙ্গাবরণ করবেন বলে, কেবল ন্যাপ্‌থিলিনের বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েই হোক্ বা সুজাতা নন্দীর কুড়িবছরে ক্ষয়ে-যাওয়া যৌবনের মতোই হোক্, পোকায় কাটা শাড়ীর বা ব্লাউজের মেপাক্রিন-পরিমাপের ফুটো দুটো তাঁর চোখে পড়েনি, পড়লে গ্রাহ্য করেন নি বা জেনেশুনেই ওদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঐটিই তাঁর ভঙ্গি। ঘরের দেয়ালে টাঙানো আয়নার সম্মুখে এতটুকু একটা র‍্যাকের ওপর ক্রীম, ভেসেলিন আর পাউডার নাড়াচাড়া করার ভেতর সুজাতা নন্দীর প্রত্যেকটা ভঙ্গি উচ্চারিত হয়। প্যাঁচ কষা কৌটোটা খুলতে গিয়ে সুজাতার ডান হাতের বহু অতিক্রান্ত বছরের কর্কশ কয়েকটি আঙুলের যে গতি খেলে যায় সুজাতার ব্যক্তিত্বে তার দান অসামান্য। তারপর আল্‌তো তর্জনীর একটা ছোঁয়াচে, এই এতবড় একটা আদেখলে খাব্‌লা নয়, একটু ভ্যানিসিং ক্রীম, একেবারে হিসেব করা এই এতটুকু, তাঁর কুচকে-আসা লম্বা গালে কপালে নাকে, ঠোঁটের ঠিক আশে পাশে কর্ণলতি পর্য্যন্ত গিয়ে যখন চর্চা করেন তখন বোঝা যায় সুজাতা নন্দী কি? সুজাতার পরিচয় তো তখনই ফুটে উঠ্‌তে থাকে যখন তিনি সমস্ত মুখটা একটা বিশেষ ছন্দে মুছে আনেন, আর তিন সেকেণ্ডের জন্য একটা লালচে হোরি খেলে যায় তাঁর লম্বা ঝুলে-পড়া মুখে, সুজাতা তেমনি অনায়াসে আটবছর আগেকার মুর তোয়ালেখানা একহাতল চেয়ারের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। সুজাতা নন্দীর পরিচয় সেখানে যেখানে তিনি অকস্মাৎ পুরী থেকে আনানো সিঁদুরের কৌটো থেকে একটা রক্তবিন্দু তাঁর দুই ভুরুর মাঝামাঝি সিকি ইঞ্চি উঁচুতে এঁকে তোলেন, বিভক্ত কেশদামের সোজা সরু পথে চুলের মতো সরু সসীম লালরেখা লেখেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর হেমাঙ্গিনীর মতো নাকছবি দিয়ে নাসিকা কলঙ্কিত করেন না কিন্তু স্বস্তিকা-মার্কা দুল যে

ঝুলতে থাকে তাঁর দুই কর্ণলতিতে সুজাতা নন্দীকে যদি চিনতে হয় তবে সেদিকে তাকাতেই হবে। শেষ বয়সে উঠে যাওয়া চুলের পরিপূরক কালো সুতোর লেছি মাথার পেছনটার আলগোছে গুছিয়ে রেখে সুমুখের বিবর্ণ চুলে চিরুণী না চালানো দেখলে সুজাতা নন্দীকে দেখা অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। তারপর হেলেদুলে লেপটানো শাড়ী দেখা, একটু এদিকে একটু ওদিকে টেনে দেয়া আর বার বার আয়নায় মুগ্ধচোখে নিজের চেহারা দেখার মধ্যে একটি কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—সুজাতা, সুজাতা। সেকালের পায়ের আলতা সুজাতা কখনো ঠোঁটে তোলেন নি বটে কিন্তু সুজাতার পায়ে লাল রঙের "শ্রীচরণেষু"র কথা যার মনে নেই সে সুজাতাকে দেখেনি। সুজাতা আয়নার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসেন, উপহারে পাওয়া আন্তির ছোট্ট রুমালটা মাঝে মাঝে প্রবল আবেগের সঙ্গে নিষ্পেষণ করেন। পরক্ষণেই শিথিল করে দেন, মুক্তি, পৌনে এক ফুটের বেশী নয় এমন করে একটা একটা করে পা বাড়ান, সর্বাঙ্গে মুদ্রার সৃষ্টি করে স্প্রীংয়ের মতো সিঁড়ি দিয়ে অবতরণকে নৃত্যময় করে তোলেন সুজাতা, যৌবনের কুকুলালিত্য আজ ক্যারিকেচারে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বেঁচে আছেন সুজাতা তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়ে। সুজাতা যদি কর্পূরের মতোও উবে যান তবু এই ভঙ্গিমালা দেখেই লোকে বলে উঠতে পারবে সুজাতা নন্দী। কোথায় সুজাতা, যদি এই ভঙ্গির কাঠামোটা নিঃশেষ হয়, সুজাতা নন্দীর অস্তিত্ব কোথায়, কে চেনে তাকে এই ভঙ্গি যদি অনুপস্থিত থাকে ?

সুজাতা নন্দীকে চেনা যাবে তাঁর কালো কাপড়ের থোঁতামুখো ছাতার বাঁট ধরা দেখে। ট্রামে ওঠার ঋজু গতি দেখে, ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে আদ্ধেক শরীরটা ভেঙে দুমড়েবেকারে উঠতে দেখে, পিয়ানোতে সুর বাঁধা "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসায়, "চলি তবে" বলার করুণ বিদায় সঙ্গীতে, আর বিতর্কের আসরে অতি সাধারণ কথা সুজাতীয় পুনরাবৃত্তিতে অথবা হারীন চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজী কবিতা পাঠকালে অহেতুক কোমর দোলানিতে, সুজাতার অস্থির অতীতকে যা মনে না করিয়েই পারে না। সুজাতা যেদিন প্রথম ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ঝুলে পড়লেন বা যেবার টাকার কুমীরের টানে নিজের নৌকো ভলাতে দিলেন, প্রত্যেকবারই মিস্ নন্দী সুজাতীয় প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, পাণিপীড়নের পরও যে তিনি মিস্ নন্দী রয়ে গেলেন, এইটুকু বাদ দিলে চিনবেন কি করে সুজাতা নন্দীকে বলুন ?

সুজাতা নন্দী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, অভ্যর্থনার ভার তাঁর ওপর—তিনিই নিয়েছেন। তিনি জানেন, রাস্তার ওপারে পানদোকানের দু'হাত দূরে যে যুবকটি অনবরত সিগারেট টেনে অনর্গল ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে,—তার নিস্পৃহ-মুখবিকৃতির লক্ষ্য যে তিনি তা তিনি জানেন, অভ্যাগতকে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, আসুন, সর্বাঙ্গ হেসে ওঠে

সুজাতা নন্দীর, মিথ্যা হাসি। অপেক্ষমান যুবকটি অপেক্ষা করতে জানে, জানে হাতের সিগারেটটা কি ভাবে চেপে ধরে টোকা দিয়ে ছাই ফেলতে হয়, আর প্রকৃতির দেয়া সহজ মুখটাকে কি ভাবে নানা রকমে উরুস্তম্ভের বেদনায় বিকৃত করতে হয়, জানে, একটা চোখ নন্দীর দিকে রেখে এক লহমায় দেশলাইয়ের কাঁপানো আগুন ক্যাপষ্টানের সাদা মাথায় ছুঁয়ে দিতে হয়। যুবকটির নাম যে সসীম, তার সঙ্গে তার ভঙ্গির কোন সামঞ্জস্যই হয়তো নেই, আর তাই নিয়েই সসীমের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সে পারে, সে পারে সাইকেলে হেলান দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চারদিকে সমান সতর্ক দৃষ্টি রেখে অথবা একই জায়গায় অর্জ্জুনের মতো লক্ষ্য ভেদ করে সিগারেট টেনে যেতে। অনর্গল। ভোরে টেক্ ব্রাশের মাথায় ফরহান্স টুথপেষ্ট তুলে নিয়ে বিলোম অনুলোম ভঙ্গিতে দন্তরাজি সমুজ্জ্বল করতে সে জানে, জানে পানের রসে, চূণের ক্যালসিয়ামে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে পারে, কিন্তু খয়ের সুপুরির পদচিহ্নে দাঁতকে কৌমুদী ক'রে রাখা দুঃসাধ্য। আর সেই দাঁত নিয়ে "আসুন" বলে ঘেন্নার উদ্রেক করতে—আর যেই পারুক সসীম পারে না, সসীমের অসমান দাঁতের পাটিতে সূর্য্যের আলো। বাঁ পাশের ক্যানাইন (কুক্কুরী) দাঁতটা একটু বড় আর পাশের দাঁতটার ওপর-পড়া, এই কষ্টে সে বহু রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে, বহুবার ভেবেছে যতীন মুখুটির মতো সুমুখের বের করা উঁচু দুপাটি দাঁত নিদেন চীনা ডেন্টিষ্টকে দিয়ে একেবারে উপ্‌ড়ে ফেলে নূতন করে মানানসই করে নেয়। কিন্তু পারেনি, পিছিয়ে গেছে, দাঁত ওপড়ানোর কথায় তার বড় ভয়। এই ভয়ই তো সসীমের বৈশিষ্ট্য। সে ভয় পায় পুলিশকে, ভয় পায় অন্ধকারকে, ভয় পায় বিরাট সমুদ্রের কথা ভেবে কিন্তু ভয় পায়না পুলিশের চোখ এড়িয়ে অন্ধকারে ঘন্টার পর ঘন্টা সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সসীম জানে মল্‌মলের চুড়িদার পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো হাতা জালি গেঞ্জি কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় আর তার পাশে খানিকটা পৌরুষের পেশী। সসীমকে যারা সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করতে দেখেছে, সসীমকে যারা হ্যাঙ্গারে জামা তুলে রাখতে দেখেছে, সসীমকে যারা টেবিলে প্লাষ্টিকব্যাণ্ডে আঁটা সাইমা ঘড়ি রাখতে দেখেছে অথবা যারা ফুটপাথে ভীড়করা ব্রেক্কাওলাদের কাঠের পৈঠায় কালো নিউকাটাবৃত একটার পর একটা পা বাড়িয়ে দিতে দেখেছে তারা জানে সসীম কি? সসীম কখনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে পিতৃব্যসম বালকের দিকে অথবা টেবিলে কাঁচের নীচে চাপা মেন্নু দেখে তার চাহিদা জানায়নি, রুমালের নামে ছয় ইঞ্চি-ছয় ইঞ্চি তোয়ালে দিয়ে ঘাড় রগড়াতে রগড়াতে বলে: ফাউল কাটলেট, একপিস পুডিং। 'বালক' চায়ের কথা জিগগেস করলে বলে, স্রেফ এক গেলাস জল। তিনবার সসীমের সাইকেল চুরি গেছে এই স্কোয়্যার কেবিনের সম্মুখে, তবু সে তালাচাবি দেবেনা সাইকেলে, তার এই (ষ্টইক ইন্‌ডিফারেন্স) বিগতস্পৃহ-

তাব স্কোয়্যার কেবিনের প্রত্যেকটা মক্কেল জানে, জানে বালকেরা, জানে মালিক। সৌভ্রাত্র সম্মেলনের সম্মুখে গোল্ড মেডালিষ্ট ইয়াসিন কোম্পানীর সৌজন্যে সাজানো দারুপত্রাচ্ছাদিত বাঁশের গেটের নীচে স্বাগত সম্ভাষিণী সুজাতা নন্দীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে সাইকেলে ঠেস দিয়ে অবিরাম ক্যাপষ্টানের ধোঁয়া ছাড়তে পারে কে এক সসীম ছাড়া ?

সুজাতা তো জানেনই, সসীমও জানে এই সৌভ্রাত্র সম্মেলনকে আশীর্বাদ করতে আসবেন গান্ধীজী। দক্ষিণ আফ্রিকার নয়, চম্পারণের নয়, ডাণ্ডি মার্চের নয়, পোর বন্দরের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কেবল সুজাতা কেন, সসীম কেন, লক্ষকোটী ভীড়ের মধ্যেও লক্ষকোটী লোক ওঁকে চিনে ফেলবে।

গান্ধীজী এত সুপরিচিত যে লোকে তাঁর বৈশিষ্ট্য ভুলে গেছে, সম্ভবত ভুলতে বসেছে ওঁর চেহারার বৈশিষ্ট্য, ভুলতে বসেছে ওঁর চলা-বসার ভঙ্গি। চরকা গান্ধীজীর কতটুকু কিন্তু চরকা বাদ দিয়েই বা তিনি কতটুকু। গান্ধীজী যদি দশফুট লম্বা হতেন, ধরুন গান্ধীজী যদি কৃপালনী হতেন, গান্ধীজী যদি খালি গায়ে না থেকে লংক্লথের পাঞ্জাবী, নতুবা একটা কোট গায়ে দিতেন, সাদা চাদরের বদলে একটা রঙিন সুজনী জড়াতেন; কাপড়টাকে হাঁটুর ওপরে না রেখে, ঐ মালকোচাটাই আরও নীচে পা পর্যন্ত ছেড়ে দিতেন, ঘড়িটা ট্যাকে না ঝুলিয়ে পাঞ্জাবীর ঘড়ি-পকেটে অথবা মনিবন্ধে রাখতেন, পায়ে ডারবি অথবা পম্প পর্‌তেন, কামানো মাথায় যদি একগোছা চুলের চাষ কর্‌তেন আর তাই ধানের ক্ষেতের মতো দুদিকে হেলে পড়্‌ত বলুন তো হলফ করে চিনতেন গান্ধীজীকে, না, গান্ধীজীর কিছু থাক্‌ত ?

গান্ধীজী বাজার চলেছেন, হাতে চটের একটা নোংরা থলি নিয়ে, বাজার করবেন। আলুর দোকানে পচা ছোট জখম আলু বাদ দিয়ে একটা ছোট ভাঙা চুপ্‌ড়িতে গোটা কয়েক আলু তুলে দিয়ে বল্‌লেন, দেড়পো। মাছের দোকানে কাটা মাছে আঙুল লাগিয়ে একবার নাকের কাছে আন্‌তে আন্‌তে বল্‌লেন, ভালো তো ?...ভাব্‌তে পারেন ? না, অনায়াসেই ভাব্‌তে পারেন, গান্ধীজী বাঁ হাতখানা মনু গান্ধীর আর ডান হাতখানা আভা গান্ধীর কাঁধে রেখে টক্‌টক্‌ এগিয়ে আসছেন প্রার্থনা সভায় ? আরও অনায়াসে ভাব্‌তে পারেন গান্ধীজী বাংলাভাষায় তো দূরস্থান মাথা কুট্‌লেও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দেবেন না, দেবেন হিন্দুস্থানীতে, উর্দুতে নয়, হিন্দীতে নয়। হিন্দুস্থানীর দান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শূন্য হোক্‌, তাকেই গান্ধীজী লিঙোয়া ফ্রাঙ্কা বা হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রভাষা কর্‌বেন, এই তাঁর জেদ, এবং এখানেই গান্ধীজী—গান্ধীজী। চেঁচিয়ে সত্য গুপ্তের মতো গলা-কাটা বক্তৃতা তিনি দেবেন না, লক্ষ লোকের সাম্‌নে অতি মৃদুকণ্ঠে বিশ্বকে সম্বোধন কর্‌বেন।

এলেন গান্ধীজী, সুজাতার সর্বাঙ্গ উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌ল, সসীমেরও, সুজাতা এগিয়ে

যেভেই গান্ধীজী একটা হাত সুজাতার কাঁধে রাখলেন (এই কাঁধে ঠিক এইখানটায়ই সেই ইঞ্জিনিয়ার ; সেই টাকায় কুমীর তাদের হাত রেখেছিল ?) সুজাতা সঙ্কোচে গলে গিয়ে সাত বছরের মেয়ের মতো আতুরে হয়ে উঠ্‌লেন। গান্ধীজীর ট্যান-করা চামড়ায় তাঁর দীর্ঘস্থায়ী গাত্রমার্জনার কথা মনে করিয়ে দেয়, গাত্রমার্জনার সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ নৈকট্য। এ বাদ দিলে কি গান্ধীজী ? সঙ্গে এলেন মিঃ সুরাবর্দী। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী। গান্ধীজীর সঙ্গে ছাগলের কার্টুনটা ভুল ; ওতে গান্ধীজীকে কিছুই বোঝা যায় না। গান্ধীজীর সঙ্গে সুরাবর্দী। তাতেই গান্ধীজীকে বোঝা যায়। প্রধান মন্ত্রীত্ব হারিয়ে, লীগসভায় মন্ত্রীত্ব হারিয়ে সুরাবর্দীর হিন্দু-পশ্চিমবঙ্গে অকস্মাৎ শান্তির পারাবত হয়ে গান্ধীজীর পাশে পাখাগুটিয়ে বসার ভঙ্গিটি ভাবুন আর ভাবুন পাখাগুটোনো পারাবতের ওপর গান্ধীজীর হাত বুলোনোর ভঙ্গিটি। যেন এইচ-টু-ও ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। দুইয়ের ব্যক্তিত্বই এই ঘটনাকে বাদ দিয়ে একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে। সর্বপ্রকার বিপরীত প্রকাশরূপে সুরাবর্দী এত সুবিদিত যে গান্ধীজীর পাশে এইভাবে হঠাৎ তপস্বীর মতো এসে না দাঁড়ালে গান্ধীজী অসম্পূর্ণ থেকে যেতেন। অসম্পূর্ণ থেকে যেতেন সুরাবর্দী। বাস্তবিক, কি অনায়াসে তিনি ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লেন তাঁর ১৯৪৩-এর সুরাবর্দীঘন্ট; দীর্ঘকালের সুস্পষ্ট কংগ্রেস বিরোধ, অনাবৃত হিন্দুবিদ্বেষ, প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের সরকারী পরিকল্পনা। শ্রমিকসংহতিতে সুরাবর্দীর ফাটল ধরানোর কূটকৌশল যে প্রত্যক্ষ করেনি সে চেনে না সুরাবর্দীকে ; সুরাবর্দী ফজলুল হক নয়, ভালুক আর সাপের প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য তার মধ্যেই তাদের বৈশিষ্ট্য। সুরাবর্দীকে যাঁরা বায়ুরুদ্ধ লীগসভায় বক্তৃতা দিতে দেখেছেন বা শুনেছেন, সুরাবর্দীকে যাঁরা পরিষদের স্কুল-ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা বা স্পীকারকে মন্ত্রণা দেয়ার জন্য বেরুছে ঢংয়ে দাঁড়াতে দেখেছেন তাঁরা জানেন সুরাবর্দী যদি পায়জামা পাঞ্জাবী গায়ে গান্ধীজীর পাশে একমাত্র অনুরক্ত বিশুদ্ধ শিষ্যের মতো ব্যঞ্জনী না চালাতেন তবে সুরাবর্দীর স্বরূপ একেবারেই ধরা পড়ত না। সুরাবর্দীর স্বরূপ একেবারেই ধরা পড়্‌ত না যদি তিনি গান্ধীজীর আশ্রয়ে গান্ধীজীর সাংবাদিক সম্মেলনে বলার সুযোগ নিয়ে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ওপর আর এক দফা ঝাল না ঝাড়্‌তেন এবং নির্বাক অসহায় স্তম্ভিত সাংবাদিকদের হাত থেকে অনায়াসে নিস্কৃতি না পেতেন। ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই জিনিসটিই যদি না ফুটে ওঠে যে, এ ব্যক্তি চোখে চোখে তাকিয়ে প্রেমের অভিনয় কর্‌তে পারে, চোখে চোখে তাকিয়ে সহজে সোজা অপ্রিয় কথা বল্‌তে পারে, চোখে চোখে তাকিয়ে হাতের ধারালো ছুরি অনায়াসে প্রিয়ার বুকে নামিয়ে আনতে পারে—তবে কি সে ব্যক্তিত্ব। চোখে চোখে তাকানোর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সুরাবর্দীর। তিনি গান্ধীজী ও নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন সৌভ্রাত্র সম্মেলনে এসে।

এই সুরাবর্দীকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজী এলেন, চেয়ারে নয়, টেবিলের কাছে নয়, ফরাসে, ফুল, তাকিয়া, মাইক্রোফোন পুঞ্জের মাঝে এসে দাঁড়ালেন, হঠাৎ আকাশফাটা গান্ধীজী কি—সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর পুরু ঠোঁটে তর্জনী রাখ্লেন, চীৎকার বন্ধের জন্য নিজের দুই কানে দুই তর্জনী ঢুকিয়ে দিলেন। এই ভঙ্গি কার? শ্যামাপ্রসাদের নয়, জওহরলালের নয়, ছাত্রনেতা নিরঞ্জনের নয়।

নিরঞ্জনের কথায় মনে পড়ে গেল। নিরঞ্জনও এসেছে। শুনতেই এসেছে। বসে আছে। কখ্খনো সোজা হয়ে মুখোমুখি বস্তে পারে না নিরঞ্জন, কাণ্যি মেরে বস্বে। চেয়ারে থেব্ড়ে সে বস্তে পারে না কখনো, ঐ কেমন একপেশে বসার ভঙ্গি; চেয়ারের পেছনটায় বা ঘাড়টায় একটা হাত জড়িয়ে রাখে; ট্রামের গদীআঁটা দ্বিবচনী আসনেও সে কোনা মেরে বস্বে, কারো সাধ্য নেই পাশে বসে। পাশে বস্লেও বারবার অস্বোয়াস্তিতে নিরঞ্জনের দিকে তাকাতে হবে, সামান্য একটু একটু ঠেলা, কিন্তু নিরঞ্জন নির্বিকার, নিরঞ্জন এমনই উপেক্ষাভরে বসে থাকে যে, পাশের লোকটি নিতান্ত বিরক্ত হ'য়েও কিছু বল্তে পারে না। নিরঞ্জন মনুষ্য সভ্যতার দুর্বল বৃত্তি বা প্রকৃতিগুলো জানে। তাই সে অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যেও একটা টাট্কা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামে বাসে ওঠে, রেশনের দিনে অনেকের নূতন জামা পুড়িয়ে "সরি" বলে, ধোঁয়া ছাড়্তে ছাড়্তেই তর্ক করে। কিন্তু কাণ্যি মেরে আসনে বসার সময় যদি কেউ তার ডাইং-ক্লিনিংয়ে আর্জেন্টে কাচা পাঞ্জাবীর কোনায় না দেখে চেপে বসে ছাত্রনেতা নিরঞ্জন ভেতরের অদম্য হিংসা দমন করে মুখে হাসি টেনে বলে; "একটু"—অর্থাৎ, একটু সড়ে বসুন, জামাটা টেনে নি। লোকটা স্বভাবতই অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ে লজ্জিত হয়ে বলে, ও; নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বলে, না না, বসুন, বলেই আবার এমন হাত-পা ছড়িয়ে বসে যে, অপরাধী বেচারার আগে যেটুকু জায়গাও বা ছিল তা সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসে। নিরঞ্জন জানে, লোকটা আর তাকে কিছু বল্বে না।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। একখানা চেয়ারে এমনভাবে বসেছে যে, উত্তর দিকে বক্তৃতামঞ্চে কি হ'চ্ছে অথবা পশ্চিম দিককার রাস্তায় কি ঘট্ছে এ দুয়ের কোন্টি সম্বন্ধে নিরঞ্জনের কৌতূহল তা স্থির করা মুস্কিল। যারা বসে আছে নিরঞ্জন তাদের মধ্যে অসাধারণ—ছাত্রনেতা হিসাবে নয়, বসার ভঙ্গিতে। নিরঞ্জনের ঐতো ধরণ; সে কখ্খনো কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। আপনি যদি উত্তর দিক থেকে তাকে অভিবাদন জানান, নিরঞ্জন পশ্চিমদিকে তাকিয়ে বল্বে, নমস্কার। তারপর একঘণ্টা ধরে কথা হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নিরঞ্জন তখনো আপনার মুখের দিকে তাকাবে না। তাইতেই তো চেনে না সে কাউকে, প্রায় কাউকেই না। এমনও হ'য়েছে নিরঞ্জনের জীবনে যে সে, তার খুড়তুত ভাই প্রিয়রঞ্জনকে হঠাৎ চিন্তে পারেনি। কলেজ স্কোয়ারে

কে সেজদা ব'লে ডাকল। এক মুহূর্তে আচমকা তাকিয়ে নিরঞ্জন বলল, ঠিক……(অর্থাৎ চিনলাম না তো!) পরিচয় যখন পাওয়া গেল, তখন সে বলল, ষ্ট্রেঞ্জ (অদ্ভুত!)।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। ছাত্রনেতা নিরঞ্জন প্রায় সব সভাতেই আসে এবং একখানি চিরকুটে তার নাম লিখে কারও হাত দিয়ে সভাপতির কাছে পৌঁছে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধও যে, ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সেন কিছু বলতে চায়। ছোট সভাতে প্রায়ই সহজে অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু উঠে সে নির্ঘাত বলবে, সভাপতি মশায়ের অনুরোধে সে দু'টো কথা বলতে চায়। সে একটা "প্রথমত" দিয়ে সুরু করে কিন্তু দ্বিতীয়ত কি হবে তা জানতে হলে যুগান্ত অপেক্ষা করতে হবে। যে সভাপতি তাকে অনুরোধ করেছিলেন ব'লে শোনা গেছল তিনিই শেষ পর্যন্ত ওকে একরকম টেনে বসিয়ে দেন, নইলে যাদের নিয়ে সভা সেই মুষ্টিমেয় শ্রোতার মধ্যেও ভাঙন ধরে। নিরঞ্জন গ্রাহ্য করে না। বর্ষা হোক, কাদা হোক, রোদ হোক, নিরঞ্জন শ্রোতাদের সায়েস্তা করতে জানে। সে মাইকটাকে শক্ত হাতে ধরে তিনবার ইনকিলাব আর জয় হিন্দের ধমকে শ্রোতাদের তাতিয়ে তুলে ঘোষণা করে, আপনারা বসে পড়ুন; দুর্ভাগা শ্রোতারা যদি কাদামাটীতে বসতে ইতস্তত করে তবে সে ইম্ফল রণাঙ্গনে যারা ঘাসমাটী খেয়ে লড়াই করেছিল তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে নিরঞ্জন শ্রোতাদের পলায়ন গ্রাহ্য করবে কেন? কত কথা বলার আছে, কত কথা লোকে জানে না, নিরঞ্জনকে সে কথা বলতে হবে, লোককে সে কথা শুনতে হবে; ধর্মতলার পিচ্‌ঢালা পথে নওজোয়ানেরা কলিজার রক্ত ঢালতে পারে আর লোকে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে নিরঞ্জনের মুখে পরাধীন জাতির সংগ্রামের ইতিহাস শুনতে পারবে না? শুনতেই হবে। লোকে শুনেছে স্বাধীনতালাভের প্রথম চেষ্টা সিপাহীবিদ্রোহ? লোকে জানে কংগ্রেস আগে কেবল আবেদন নিবেদনই করত? লোকে জানে নরম-পন্থী গরম-পন্থীর কথা? লোকে জানে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীকে? জানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে, তাঁর অহিংসাকে, তাঁর অসহযোগটাকে, তাঁর হিমালয়প্রমাণ বুদ্ধিবিভ্রাটকে? জানে ১৯৩০? ইত্যাদি ইত্যাদি? জানে আগষ্ট বিপ্লবকে? জানে না।

নিরঞ্জন জানে। নিরঞ্জন জানে, কোথায় করতালির ঝড় তুলতে হয়; যেখানে শ্রোতা বরফ-দেয়া মা'ছের মতো ঠাণ্ডা সেখানে গংগা ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে নিরঞ্জন এও জানে, কিভাবে যোগসাজসে করতালির ঝড় তুলতে হয়। সভাপতির অনুরোধে যেমন সে বক্তৃতা দেয়, শ্রোতাদের মধ্যেও তেমনি সে ভক্ত অনুরক্তের সৃষ্টি করতে জানে। নিরঞ্জন জানে, সংসারে বালখিল্যের অভাব নেই।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। পশ্চিমদিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন রেলিংয়ে একটা

বেদনা বোধ করে ; গান্ধীজীর নীরব বক্তৃতার সোচ্চার বঙ্গানুবাদ শুনতে শুনতে বেদনাটা মাঝে মাঝে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে, নিরঞ্জন অনুভব করে, এর চাইতে সে ভাল বলতে পারত। এ হে হে হে, মাটী করে দিলে, এই জায়গাটা মাটী করে দিলে, এই জায়গাটায় চমৎকার একটা অহিংস হুঙ্কার দেওয়া যেত।

গগল্‌স পরে এসেছে নীলিমা, নিরঞ্জন লক্ষ্য করল। কালো গগল্‌স। দশজনের কোন অনুষ্ঠানে আর কাউকে না হোক্ নীলিমাকে পাওয়া যেত ; এমন অনেকদিন হ'য়েছে যখন বক্তাদের শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করতে গিয়ে একমাত্র নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতে হয়েছে "—এবং ভদ্রমহিলাগণ!" নীলিমাকে পাওয়া যাবেই প্রগতিশীল অনুষ্ঠানে। নীলিমার গগল্‌সের আড়ালে আঁখি দুটিকে নিরঞ্জন জানে ; নীলিমার দৃষ্টিভঙ্গী বাঁকা, চোখ ট্যারা। অসম্ভব তৎপর, অসম্ভব হাস্‌তে পারে, অসম্ভব কথা বল্‌তে পারে, বোধ হয় অসম্ভব মানিয়েও চল্‌তে পারে। বহুবার নিরঞ্জন এড়িয়ে চল্‌তে চেয়েছে, শক্ত কথা বল্‌তে চেয়েছে, নীলিমা কিছু গায়ে মাখেনি। জওহরলালের "ডিস্‌কাভারি অব্ ইণ্ডিয়া" বইখানি তুলোতে তুলোতে ঠিক হাজির হবে নীলিমা, ট্যারা চোখে বাঁকা দৃষ্টি খেলে যাবে আর উথ্‌লে উঠ্‌বে হাসির ঝলক। নিজেই বেছে নেবে তৎপরতার কাজ, যেমন আজ বেছে নিয়েছে সৌভ্রাত্র সম্মেলনে সমাগত অতিথিদের মধ্যে কর্ম্মসূচী বিতরণের কাজ। কী সহজ গতিতে হলদে রঙের ওপর লাল হরফে ছাপার কর্ম্মসূচীগুলো বাগিয়ে ধরে নরনারীর ভীড়ে আনাগোনা করছে নীলিমা আর ওরই অবসয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক নির্ম্মলের কাছে গিয়ে কোন অজুহাতে একবার আ-মরি ভঙ্গিতে "আহা-হা আমি যেন তাই বল্‌ছি," উচ্চারণ করে ক্ষিপ্র গতিতে কর্ম্মসূচীর তৎপরতায় ফিরে এসেচে।

অথচ অধ্যাপক নির্ম্মল শক্ত কৌপীন আঁটা লোক। লোকে বলে পাঁকালো মাছ। বয়সের সঙ্গে শত্রুতা করে মাথায় যে টাক দেখা দিয়েছে তাতে এই কৌপীনের ছায়া দেখা যায়, সত্যি, কি দুর্মদ শক্তি দেড়ফুটী দু'টুক্‌রো দু ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের। অধ্যাপক নির্ম্মল অবশ্য গৈরিক পরে অধ্যাপনা করতে আসেন না ; বাগেরহাটী গেরুয়া খদ্দরের জামা তাঁর একটা চাই, পরণের খদ্দরটাও অবশ্য কাছা দিয়েই পরেন। কিন্তু বাঘা চোখের নীচে দুই পাশের উঁচু চোয়ালে বোঝা যায় তাঁর কৌপীনের কঠোরতা। কামানো গোঁফের নীচে সাধারণ দুখানি ঠোঁটের ফাঁক এমন উচিত কথা অত সোজা করে কেউ বল্‌তে পারে না অধ্যাপক নির্ম্মলের মতো। ক্লাশে এমন অনেক পরিস্থিতিতে নীলিমার বাঁকা চোখ যখন ছলছলিয়ে এসেছে পাশের ছেলেরা তখন খলখলিয়ে হেসেছে! ভয়ানক কঠোর অধ্যাপক নির্ম্মল, ক্লাশে মেয়েদেরই বকেন কিন্তু ছাত্রী ছাড়া তিনি গৃহশিক্ষকতা করেন না। অধ্যাপক নির্ম্মল সম্ভবত অবিবাহিত কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে একা আস্‌তে দেখেনি।

তাঁরই পাশে বসে আছেন গাম্ভীর্যের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী। ওরে বাপ্‌রে, এ গাম্ভীর্যের পরিচয় একবার পেয়েছে ছাত্রনেতা নিরঞ্জন আর নীলিমা। কি একটা ষড়যন্ত্র মামলা দেখতে গেছল ওরা। গাউন, উইগ নানা সাজপোষাকে একটা দম্-আট্‌কানো আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, এরই মধ্যে নীলিমা কি একটা অবান্তর কথা নিরঞ্জনকে বলতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ টেবিলের ওপর হাতুড়ির ঘা আর "অর্ডার-অর্ডার" ঘরটায় গম্‌গম্ করে উঠ্‌ল। চম্‌কে উঠেছিল নিরঞ্জন, তেম্‌নি নীলিমা। অনেকদিন মনে পড়েছে নিরঞ্জনের আর নীলিমার, আরও কত লোকের কে জানে? বিচারকের মতো বিচারক। সেই শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে সৌভ্রাত্র সম্মেলনে সুজাতা নন্দী আন্‌তে পেরেছেন; শ্রীযুক্ত চৌধুরীও এসেছেন নিতান্ত বাঙালীর মতো গিলেকরা ধুতি আর পাঞ্জাবীর ওপর একখানা মিহি ঘি-রঙের ভাঁজ করা চাদর কাঁধে ফেলে কিন্তু কালো লাঠিটার ওপর ভরকরা আগুম্ফ মুখখানায় তেমনি বজায় আছে জজিয়তী গাম্ভীর্য। যেন মুখ থেকে কেবল একটা শব্দই বেরোয় "হুঁ"। তারপরই নির্বিকার ফাঁসীর হুকুম।

সৌভ্রাত্র সম্মেলনের উপসংহার হ'ল। শ্রীযুক্ত চৌধুরীও নিজেকে গুটোলেন। গাম্ভীর্যের ভয়াবহ রূপ এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে রাস্তায় নাম্‌লেন, গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ানো আর্দালিকে দেখে দেহভঙ্গিকে আরও কঠিন করে তুললেন, স্প্রীংএর গদী আঁটা পেছনের মস্ত আসনে নিজেকে একান্ত একক করে তুললেন—ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বারোটি সন্তানের পিতা বিচারপতি—শ্রীযুক্ত চৌধুরী। স্রষ্টার বেদীমূলে পঁচিশ বছরের গম্ভীর জীবনের নীরব শ্রদ্ধার্ঘ। বিচারপতির মুখের দিকে তাকিয়ে এই অঙ্ক সমর্থন করবে বা বিচারপতিকে গোপন সৃষ্টিকার্যের নিমিত্তভাগী মনে করবে এমন স্পর্ধা কারো নেই।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ডি সোটো এসে থাম্‌ল বাড়ীর গেটে। নাম্‌তে গিয়ে দেহটা কাঁপল না পা-টা কাঁপল বোঝা গেল না, কিন্তু বাঁ পা-টা টান্‌তে গিয়ে শ্রীযুক্ত চৌধুরী যেন একবার নেংচে উঠলেন। একবার তাকালেন নাকি ওপরের দিকে। ড্রয়িংরুমে বাড়ীর চাকর হাতের লাঠিটা আগ্‌বাড়িয়ে সংগ্রহ করল। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগ্‌লেন, দুর্বল ফাঁসীর আসামী যেমন ক'রে ফাঁসীমঞ্চে ওঠে। চওড়া সিঁড়ি, একেবারে খাড়া ওঠেনি, যেখানটায় ঘুরে গেছে সেখানেও একটা বিশ্রামের চত্বর, তারপর আবার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে।

এদিককার ছুটো সিঁড়ি বাইতেই বজ্রপাত হয়ে গেল। বিচারপতি মুহূর্তের জন্য থামলেন, তারপর আবার তেমনি সিঁড়ি বাইতে লাগলেন ধীরে ধীরে। গম্ভীর নিষ্করুণ অবিচল বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী।

মিনুষের আসার সময় হল? কিন্তু আসার আগে ঐ হারামজাদাকে বিদেয় করা

হয়েছে কিনা জানতে চাই। পঞ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন বারো সন্তানের মা উর্বসী ওরফে ঘোতনের মা।

গম্ভীর অবিচল বিচারপতি তেমনি ধীরে ধীরে বললেন, কেন, কি হ'ল আবার ?

এই—এই—এই এলেন বিচারক আমার বিচার করতে; আমি জানতে চাই, ও চাকর তোমার না আমার ?

তোমার।

তবে, ও নচ্ছার এখনও বিদেয় হ'ল না কেন ?

নিশ্চয়ই বিদেয় হবে। বিচারপতি কাপড় বদ্‌লাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

বিচারপতি-গিন্নী বারোটি সন্তানের মেদবহুল মা ছুটে সেইদিকে গেলেন, কি, কি বললে ?

শ্রীযুক্ত চৌধুরী কোন মতে হাত বাড়িয়ে লুঙ্গিটা টেনে নিলেন, জামাটা টেনে ফেলতেই প্রকাশ হয়ে পড়ল বনেদী কালের বেনিয়ান। বিচারপতি তাঁর বিরাট উইগ আর গাউন পরা অয়েল পেন্টিংটার নীচে এসে দাঁড়ালেন কাঠগড়ার আসামীর মতো। বললেন, বললাম, ও হারামজাদা যাবে।

যাবে নয়, যায়নি কেন এখনো ?

তাত জানিনে।

তবে কি আমি জানব ? হতচ্ছাড়া বাড়ীর চৌকাঠ পার না হয়ে রয়ে গেল কি তোমার লাঠি ধরতে ?

আচ্ছা ওকে এক্ষুনি তাড়াচ্ছি আমি।

নাঃ, ও আর ওপরে আস্‌তে পারবেনা।

বেশ।

বেশ মানে ? তবে সংসারের যাবতীয় কাজ কি আমি করব ?

তা কেন ? অসহায় বিচারপতি বললেন, একটা লোক দেখতে হবে।

দেখতে হবে মানে ? ও বেটা মজা করে নীচে বসে থাকবে, আর যতক্ষণ লোক না ঠিক হয় ততক্ষণ আমি সংসারের দাসীবৃত্তি করি। ওরে আমার বিচারক রে !

তাহলে ততক্ষণ ও হারামজাদাই কাজ করুক। বিচারক করলেন বিচার।

ফেটে পড়লেন বিচারক-গিন্নী। তার মানে আবার ঐ চোরকে ঘরে ঢোকাবে ? না, তা হবে না।

তাহলে লোক খুঁজতে বেরোই— বলে শ্রীযুক্ত চৌধুরী নীচের দিকে পা বাড়ালেন।

গিন্নী বললেন, তোমার মতলব আর আমি বুঝি না, ঐ বদ্‌মাসটার ওপর মায়া দেখাতে যাচ্ছ নীচে; নীচে কোথায় চাকর পাচ্ছ? ন্যাকা বোঝাও আমাকে?

তাহলে বল আমিই ওর কাজ করি—বেপরোয়া গাম্ভীর্যের প্রতীক বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী বললেন।

খবরদার!.........

পাশের ঘরে, বিচারপতির তৃতীয় পুত্রের ঘরে, ডাকাত পড়েছে। পুত্রবধূ জানালার গরাদে ধরে কোনদিকে তাকিয়ে ছিলেন; এমন সময়ে দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়ল বিচারপতির তৃতীয় পুত্রের ঘরে। মুখোসপরা বীভৎসাকৃতি ডাকাত রিভলভার উঁচিয়ে বলল, খবরদার!

হুঙ্কারের শব্দে অকস্মাৎ ফিরে পুত্রবধূ চমকে চীৎকার করে ওঠার উপক্রম করতেই ডাকাত ত্রস্তে মুখোস খুলে ফেললে; ডাকাতের ময়লা দাঁত হাসতে লাগল।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরীর তৃতীয় পুত্রবধূ কটাক্ষ হেনে বললেন, ঢং!

ইতিহাস

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বস্তুত গুহগিন্নীর এ রকম মনোভাব বহুদিন পরে ধরা পড়ল। বড় ছেলেটা হারিয়ে যাবার পর পর স্বামীর মৃত্যুতে নিশ্চয় তিনি বিচলিত হ'য়েছিলেন, কিন্তু সে ঘটনা তাঁর বাড়ীভরা লোকজনের কেউই নিজের চোখে দেখেনি। এমন কি মেজ ছেলে পুলিনও (এখন সেই বড় ছেলে) না ভেবে বলতে পারে না কবে তার মা এতটা বিচলিত হ'য়েছিলেন।

বলতে পারা যায় গুহ-বাড়ীতে এখন যে যুগটা চলছে সেটা ও গুহগিন্নীর পূর্ব-জীবনের যুগটা এক নয়। কথাটা অশ্রদ্ধেয় শোনালেও সত্য যে গুহগিন্নীর বাড়ীতেও যুগ বদলেছে বউদের হাতে হাতে। একটি করে বেটা-বউ এসেছে আর তার সাথে একটা অদৃশ্য অথচ বোধগ্রাহ্য দ্বন্দ্ব হ'য়েছে গুহগিন্নীর। গুহগিন্নী হার মেনেছেন কিম্বা স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেই পরিত্যক্ত স্থানটুকু দখল করে বেটা-বউরা নিজেদের যুগের মিনার স্তম্ভ প্রভৃতি তুলেছে।

বড় ছেলে পুলিনের বিয়ে দিয়ে রাঙাবরণ ছোট একটা বউ ঘরে এনেছিলেন গুহগিন্নী।

তখন পর্য্যন্ত পুলিনের রুমালের ভাঁজটুকু পর্য্যন্ত গুহগিন্নীকে নিজের হাতে করে দিতে হ'ত। ছেলে কি ভালোবাসে, ছেলের কোন বিষয়ে অরুচি রান্না ঘর থেকে আরম্ভ ক'রে শোবার ঘর পর্য্যন্ত বউকে সাথে ক'রে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছেলের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে স্নেহসিক্ত করে রাখার গুরু দায়িত্বটা বউ বুঝুক। বউকে ডেকে বলতেন,—ঐ যে লোহার কবাটের মতো বুক দেখছ, বড় স্নিগ্ধ জিনিস দিয়ে ওগুলি তৈরী। তুমি কি ভেবেছ বেটা ছেলে ঘা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়? তা হয় না। মা, বউ, মেয়ে এদের স্নেহ-ভালোবাসার এতটা পায় ব'লেই বেটা ছেলেদের এতবড় বুক। তিরস্কৃত হ'য়ে পুলিনের বউ পুলিনের কামিজের ইস্ত্রি, ধুতির পার গিলে করায় বেশী করে মন দিত। রাত্রিতে খাবার জল ঠাণ্ডা রাখবার জন্য বরফ আনতে আর ভুল হ'ত না। কিন্তু পুলিনের বউ চারুশীলা জলের মতো ঠাণ্ডা মেয়ে, জলের মতোই তার নিঃশব্দ আত্মবিস্তারের ক্ষমতা ছিল। সেটা টের পেলেন গুহগিন্নী অনেক পরে।

তখন চারুশীলা ষোল বছরের হাল্কা গড়ন ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি আর নয়, ত্রিশ বছরের স্থিত:যৌবনা মেদমতী। চোখে সোনার চশমা উঠেছে, কথার সুরে গম্ভীরতা এসেছে। পুলিনের ছোট ছেলের জ্বর বাড়াবাড়ি করছে এ খবর পেয়ে উঠোনটা পার হ'য়ে পুলিনের শোবার ঘরের পাশে তার ছেলেদের শোবার ঘরে গিয়েছিলেন গুহগিন্নী, ফিরতি পথে পুলিনের ঘরে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিন কেমন থাকে এ খোঁজ করতে যেয়ে তাঁর অভ্যস্ত চোখ ঘরের দেয়াল থেকে শয্যা, জল ও পান রাখবার ছোট টেবিল, তা থেকে চারুশীলার দেহে যেয়ে পড়ল।

—দেয়ালের ফটোখানা কোথায়, চারু?

—বিবেকানন্দের ছবিটার কথা বলছেন? বোধ হয় বসবার ঘরে—

—ছবি নয়, মা, ফটো। বাইরের ঘরে গেছে!

নিজেই অপ্রিয় আলোচনা পালটে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন গুহগিন্নী, দৌড়-বারান্দার উপর দিয়ে চারুশীলা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ সুর নীচু ক'রে বললেন,—বিকেল পার হ'ল এখন একটু চুলটুল বাঁধলেও তো পার। পুলিন কি আর ঝোলান বেণী পছন্দ করে না?

বিব্রত হ'য়ে চারুশীলা অভ্যস্ত কৈফিয়ৎটি দিয়ে ফেলল—এই তো এবার গা ধুয়েই—

দৌড়-বারান্দার যেখান থেকে চারুশীলা ফিরে গেল সেখান থেকে আরম্ভ হ'য়েছে মেজবউ বিনতার ঘরগুলি। ছেলেদের বসবার ঘর, বিনতার ঘর, মেজ ছেলে বিপিনের ঘর, তাদের বসবার ঘর, লাইব্রেরী; ঘর বেড়েই যাচ্ছে এ দিকটায় বাগানের আয়তন চুরি ক'রে ক'রে; তা হ'ক ওরাই থাকবে।

নাতির অসুখের সংবাদে যেমন পুলিনের ঘরে যেতে হ'য়েছিল, তেমনি নাতির কান্নার শব্দেই গুহগিন্নী বিপিনের মহলে ঢুকলেন। গুহগিন্নী নাতিকে কোলে ক'রে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখলেন না অথচ গল্প শুন্‌তে পেলেন বিপিনের, তার বউএর। একবার গুহগিন্নী ভাবলেন, ডেকে পাঠাবেন বিনতাকে; নাতিকে কোলে করে ভারি পর্দ্দাটা ঠেলে তিনি ঘরের মাঝখানে যেয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলের সম্মুখে বিপিনের মারাঠি বন্ধু, বিপিন, তার বউ। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুহগিন্নী বললেন,—ছেলে কাঁদছে, মেজ বউ, মনে করে দেখ কোন কোন মা বুকে করে ছেলে মানুষ করে না দিলে আই. সি. এস স্বামী পাওয়া যায় না। কথা কয়টি একটু অতিরিক্ত স্পষ্ট উচ্চারণ করে গুহগিন্নী নাতিকে কোলে করেই ঘর ছেড়ে গেলেন। বিনতা ভেবেছিল মারাঠি বন্ধু এমন অভব্য ব্যবহারের পর রাগ করবে। কিন্তু কিছু সে মনে করেনি, এটা বোঝাবার জন্যই যেন বিপিনের কাছে ঘনিষ্ট হয়ে সে বরং অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশী বসে রইল। বিপিন ভেবেছিল এইবার সে ক্লাবে পালাবে, রাত অনেকটা গড়িয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত ফিরবে না। কিন্তু তাকেও বসে থাকতে হল। বিনতা ভেবেছিল একটু কাঁদবে, বলবে, এমন অপমান না হ'লে কি তার চলছিল না, যে বিপিন তাকে বিয়ে করেছিল। বলবার সুযোগ সুবিধা হল না। সারা বাড়ীটা যখন রাত বারোটায় থম থম করছে নিজেকে যেয়ে শাশুড়ীর ঘর থেকে ছেলে কোলে করে আনতে হল বিনতার। ছেলে রাখবার ঝিকে ছাড়িয়ে নেপালি আয়া রাখবার কথাও ভেবেছিল বিনতা: আভাসে জানতে পারল ঝিকে ছাড়ান যাবে, বাড়ী থেকে তাড়ান যাবে না।

কিন্তু এক একদিন এক একটা ঘটনা নিজের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়ে দিয়ে গুহগিন্নী তাঁর মহলের গভীরে ডুবে থাকেন। সেখান থেকে তিনি বহু নোতুন আয়োজনের আমদানি, পুরাতন প্রথার পরিবর্জ্জন সংবাদ জানতে পারেন। ক্ষোভ করবার মতো মেয়ে নন তিনি। বরং একটা আনন্দও বোধ হয় তাঁর কোন কোন দিন, যেমন হয়েছিল নোতুন কেনা পিয়ানোর ঝংকারের সাথে সাথে বিনতা শিউরে শিউরে গান করে উঠতে। বাড়ীর শুভ বউদের হাতে হাতে—তারা যেখানে যাবে শুভটাও সেখানে যাবে এইটুকু শুধু প্রত্যাশা করেন তিনি।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিল পাঁচসাত বছর আগে। '৪২ খৃষ্টাব্দে এসে মাত্র একবারই একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল। সেটার চারিদিকে সস্নেহ পরিহাস ছিল বলে বরং সেটা সকলে উপভোগই করেছিল, এমনকি বিনতাও হেসে বলেছিল,—কি যে বলেন, মা। ব্যাপারটা সূত্রপাত করেছিল পুলিনের বড় ছেলে। নোতুন টেনিস র‍্যাকেটের জন্য দুদিন বাবা মাকে বলে ফল না পাওয়ায় রাগ করে আছাড় দিয়ে টেনিস র‍্যাকেট ভাঙতে যেয়ে

পড়বার ঘরের আলমারির দু একটা শার্সি ও একটা টাইমপিস চূর্ণ করে ঠাকুমার ঘরে এসে তাঁর বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নিয়ে যেতে এসে পুলিনের বউ বলেছিল,—এমন করে আস্কারা দিলে কি করে মানুষ হবে বলো, মা।

—হবে না? বলতে যাচ্ছিলেন গুহগিন্নী,—যার কাছ থেকে ছেলে পালিয়ে আসে কেন বল, চারু।

বলতে যেয়ে থামলেন, মেঘটার একপাশে ডুবন্ত সূর্য্যের আলো ঝিকিয়ে উঠল, একটু হেসে বললেন,—ওর দাদুর মতো যদি হয়, আমরা কি করব। পুলিশের ডাকাতধরা চাকরী করে দিও।

ঠিক তখন তখনই টের না পেলেও কিছুদিন পর থেকেই লোকে আন্দাজ করেছিল গুহগিন্নীর মস্তিষ্কটা নরম হয়ে আসছে বৃদ্ধত্বের দরুণ। অবশ্য দেহের দিক থেকে এ পরিবর্ত্তনটা আগেই সূচিত হয়েছিল: গালের দুপাশের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে যাওয়ায় কথা বলবার সময়ে একটু বেশী নড়ত চিবুকটা; চোখের উপরের পাতাটা একটু ফুলো ফুলো, চোখের কোলেও মাংসল ছোট ছোট ভাঁজ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ, যখন প্রয়োজন হত, তখন শিথিলতার উপর দিয়ে তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পর্দ্দাটাই চোখে পড়ত। বড়ছেলে পুলিন, মেঝবৌ বিনতা, সরকার মাধব সেন এরা কেউ কেউ কোন না কোন সময়ে সেটা অনুভব করেছে।

মস্তিষ্ক নরম হওয়ার সব চাইতে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিল অনভ্যস্ত সংবেদনশীলতায়। আজকাল এক এক সময়ে মনে হয় তিনি যেন সকলের মনের কথা জানবার অপেক্ষা করেন কোন বিষয়ে নিজের হুকুম ধার্য্য করবার আগে। সরকার মাধব সেনের চোখে সর্ব্বাগ্রে পড়েছিল বিষয়টা। দু'চারজন প্রজা দুর্ভিক্ষের অজুহাতে ঝি চাকর মারফৎ আর্জ্জি পাঠিয়ে প্রায় দু বছর করে খাজনা মাপ আদায় করে নিল। সেদিন রাত্রিতে মাধব সেন অনেক রাত অবধি স্ত্রীর সাথে আলাপ করল বিষয়টা, বলল—কি হবে আর গুহবাড়ীর সরকারী করে, আর কে সম্মান করবে বলো। মাধব সেন ভাবল, ঝি চাকর যাতে আর্জ্জি পৌঁছে না দেয় তার ব্যবস্থা একটা করা দরকার। কিন্তু ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে যেয়ে মাধব সেনের মনে হল—গুহগিন্নী সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে তাকে গোপন করে ব্যবস্থা! রাতে ফিরে এসে অনুভবটি স্ত্রীকে বলল, ওরে একি গায়ের জোরে চলে, চলে শীলমোহরের ছাপে।

বস্তুত ব্যাপারটা আজকাল দাঁড়িয়েছে তাই। কলেজদিনের মতো হাতা কাটা ব্লাউজ পরে সিনেমা যাবার প্রস্তাব করেছিল বিনতা, মোটরের হুড মাথার উপরে রাখতেও তার অনিচ্ছা ছিল। শুনে চারুশীলা বলল, ভালো কী?

বিনতা প্রবল কতগুলি যুক্তি দিল, সেগুলিতে মোহগ্রস্ত হ'য়ে চারুশীলা বলেছিল, যাও। এমন কি বিপিন শুনে একটা ব্লাউজ পছন্দই ক'রে দিল। শাশুড়ী তার যাওয়া বা ফেরা কোনটাই দেখতে এলেন না, তবু দেখা গেল বিনতা পুরো-হাতার একটা ব্লাউজ পরেছে, স্বামীর হাল্কাগড়নের নোতুন মডেলের পরিবর্ত্তে পুলিনের পুরানো কালো এবং পর্দ্দাআঁটা বড় গাড়ীটায় করে ফিরে এসেছে।

কথাটা প্রথমে শুনেছিল চারুশীলা। তার খাস ঝি এসে বাসি জল ও রাতের ছাড়া কাপড় বার ক'রে নিয়ে যেতে যেতে বলল,—কাল সারা রাত দিদিমার ঘরে আলো জ্বলেছে, তারপর স্বর নিচু ক'রে বলল,—আজকাল বোধ হয় ভুলটুল হ'চ্ছে একটু।

কিন্তু বাইরের ঝির চাইতে ঘরের বউ শাশুড়ীকে বেশী চিনবে বলা বাহুল্য; চারুশীলার আশঙ্কা হ'ল, ঘর থেকে বেরিয়ে শাশুড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বললে,—অসুখ ক'রে নিতো, মা?

খুব বেশী সর্দ্দি হ'লে যেমন চোখ মুখ ছল ছল করে এমন মুখ তুলে গৃহগিন্নী বললেন, —কে, চারু? না অসুখ করেনি বোধ হয়।

—রাতে ঘুম ভালো হয়নি?

—বোধ হয় তাই।

তারপর বিনতা এল।

—চোখ মুখ ছল ছল করছে সর্দ্দি হ'য়েছে খুব?

—না তেমন কিছু হয়নি।

—না হ'লেই ভালো। আজকাল যা ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে ঘরে ঘরে।

পুলিন এল, বিপিন এল পুলিন চলে যাবার আগেই। বিপিন ও পুলিন মার খাটের উপর বসল জোরা আসন ক'রে। বিপিন পুলিনের চা জলখাবার এল মার ঘরে। রান্না-ঘরে দাঁড়িয়ে এক ট্রেতে দুই কর্ত্তার খাবার কি ক'রে নেয়া যাবে, কে নিয়ে যাবে, অনভ্যস্ত বলে সাব্যস্ত করবার মতো বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। শেষ পর্য্যন্ত চারু বড়বউ হিসাবে ট্রে নিয়ে গেল শাশুড়ীর ঘরে। ট্রেটা নামিয়ে দিতে হাতটা কেঁপেছিল চারুশীলার। বিনতা জানালার আড়াল থেকে দেখেছিল খাটের উপর থেকেই দু ভাই খাচ্ছেন ট্রে থেকে খাবার নিয়ে; হঠাৎ মনে হ'ল তার, এবার কি ওরা দু'ভাই বই গুছিয়ে পড়তে বসবে। বিনতা মনের কল্পনায় নিজে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বাইরে মাধব সরকারের কানে খবরটা পৌঁচেছিল। সুমার ও জমার খাতাগুলির আড়ালে অধস্তনদের কৌতূহল চাপা দিয়ে মাধব বাইরে এসে দাঁড়াল তামাক খাবার অজুহাতে। অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবল, হা হা, বাঁচবেন না তা হ'লে? সময় হ'য়েছে বটে, তা হ'লেও।

বস্তুত এমন বিচলিত গুহগিন্নীকে এরা কেউ দেখেনি। রাতে তাঁর ঘুম হয়নি, চোখ ছুটো ফুলো ফুলো দেখাচ্ছে যেন কান্নার পরে।

বাড়ীর আবহাওয়া যখন স্তম্ভিত হ'য়ে আসছে তখন অবশ্য গুহগিন্নী নিজেও টের পেলেন তিনি বিচলিত হ'য়েছেন। এর পরে তিনি লজ্জিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন। বামুন মেয়ে নিরামিষ ঘরে রান্নার যোগারে গেল ; ক্ষীরো ঝির বদলে চারুশীলা নিজেই এল শাশুড়ীর মাথায় তেল দিতে।

বেলা দশটার মুখে হাতে থান ও গামছা নিয়ে স্নানের ঘরে যাবার জন্য যখন গুহগিন্নী উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন রোদে মুখ লাল করে ঘামে চিটমিটে গা নিয়ে পুলিনের সেই ডাকাত-ধরা ছেলেটা ফিরে এল। বলল,—সব মিছে কথা, বুড়িয়া, ওরা হাসল শুধু।

এমন অশ্রদ্ধেয় কথাবার্ত্তা বলার অধিকার নাতিকে দিয়েছেন যে এটা চারুশীলার সম্মুখে প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় খানিকটা এবং কোন বিষয়ে কৌতূহলের কাছে তাঁর স্থৈর্য্য হার মেনেছে এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হ'ল বলেও আর খানিকটা লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন গুহগিন্নী। একটু অপ্রতিভ হ'য়ে চেয়ে রইলেন।

ডাকাতে ছেলেটি কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দিদিমার খাটে বসে জুতার ফিতে খুলতে লাগল। গুহগিন্নী সিঁড়ি দিয়ে প্রায় উঠোন পর্য্যন্ত নেমে গেলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে এক নজর যেন দেখলেন কেউ আসছে কিনা, তারপর আবার ফিরে এলেন নাতির সম্মুখে,—কাকে তুই জিজ্ঞাসা করলি।

—কেন, গণেনদাকে, বুঝতে পারনি বোধ হয়, চিটাগং আরমরি রেইডে ছিল।

—কি জিজ্ঞাসা করলি ?

—আমি বললাম, বলুন তো গণেনদা, আমার দাদু অমুক গুহকে গুলি করবার ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল কিনা আপনাদের। গণেনদা—হো হো করে হেসে উঠে বলল,—তিনি বোধ হয় অনেকদিন আগেকার লোক। গণেনদার হাসি দেখে ওরা ভাবল আমি মিছে দাম বাড়াতে গিয়েছিলাম।

গুহগিন্নী বললেন, তা তো বলবেই, তুই যাস কেন ?

—বাঃ, যাব না। মুখুজ্যে, রায়, চৌধুরী, সকলে বোমা বানাতে পারে রিভলবার ছুঁড়তে পারে আর গুহরা বুঝি চিরকাল বোকা হয়ে ছিল। আমি ওদের বললাম—তোমরা বড় বড় ওস্তাদী জানতে আর আমার দাদু তোমাদের উপরের ওস্তাদী জানতেন। গণেনদা আবার হেসে বললেন,—কিন্তু বোমা বানাতে জানতেন না দাদু। আমি বললাম, দাদু না হয় না জানতেন আর কোন গুহ হয়তো জানত। তোমার চাইতে পুরানো রিভলবার-ওয়ালা কাউকে পেলে জেনে নি। মন্তিরা মুখুজ্যে কি না তাই সে বলল গণেনদাকে যে

বাঘা যতীন তাদের কে যেন হত। মন্তি একটা চালিয়াৎ। আমি বললাম মন্তিকে—যোগেন চাটুজ্যে আস্‌ছেন কোলকাতায়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঠিকই বলতে পারবেন গুহরা ছিল কি না তাদের সময়ে।

মন্তির কাছে হার মানবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে নাতি বলল, দেখো তুমি আমি খুঁজে বার করবই। পুলিশের গোপন কাগজপত্তর সব লোককে দেখানোর জন্মে যাদুঘরে রাখা হয়েছে, সেগুলি না হয় পড়ে ফেলব।

নাতি এমন উত্তেজিত হবে সেটা দোষের কিছু নয়। কাল রাত্রিতে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নাতির সাথে গল্প আরম্ভ হয়েছিল। ডাকাতে নাতি হাত পা ছুঁড়ে জিভ্‌ দিয়ে টাক্‌রা আঘাত ক'রে রিভলবারের গর্জন অনুকরণ করে বাংলার অগ্নিযুগের গল্প বলছিল, তখন তিনি অতীতকালের দু একটা কথা বলেছিলেন। তখন উঠেছিল অমুক গুহ পুলিশের জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনারের কথা। উত্তেজিত নাতি একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাঁর ঘুম হ'ল না, অনেক দিনের কথা মনে হয়ে চোখ জ্বালা করল, চোখের কোণগুলিও ভিজে উঠল। সকালে উঠে কাল রাত্রির ঘটনাগুলি ও চিন্তাগুলি একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হ'চ্ছিল, আচ্ছন্নের মতো হয়েছিলেন তিনি; অনেকক্ষণ বুঝতেই পারেন নি তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বাড়ীটা কৌতূহলী ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কল দিয়ে ছল ছল ক'রে জল পড়ছে, গুহগিন্নী ভাবলেন,—

১৫ খৃষ্টাব্দে কিম্বা ১৬তে হবে, তখন গুহ ইউ পি তে। কুম্ভমেলাও নয়, হরিহর ছত্রও নয়, সাধারণ একটা সহরের একটা ছোটখাট উৎসবের মেলায় হারিয়ে গেল ছেলেটা। ঝক্‌ঝকে হাসিমুখে আঠার বছরের ঠাসা ঠাসা ভরে-ওঠা বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, খিচুরিটা নামিয়ে নাও, দেখে আসি কিমা পাওয়া যায় কি না। খোঁজা হয়েছিল, পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের ছেলে, চোখ লাল করে সারা রাতের পরে ফিরে এসে ছোট একটা ছেলের মতো কেঁদেছিল ডেপুটি কমিশনার। দুদিনের মধ্যে জেলাটার বনজঙ্গলের মধ্যে মানুষের পায়ের দাগ পড়ে গেল, বহুদিনের ফেরার চার পাঁচটা রাক্ষুসে ডাকাত ধরা পড়ল, ছেলে পাওয়া গেল না।

মলিন বস্ত্রে রুক্ষ চুলে গুহজায়া দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন। দেশের বাড়ীতে ফিরে শোকটা কিন্তু সহজে নিবারিত হ'ল। ফলন্ত গাছগুলি দেখেই বোধ করি গুহজায়া নিজের মনকে বোঝালেন একটি ফল অকালে খসে গেল বলে গাছটাই যদি শুকিয়ে ওঠে অন্য ফলগুলিও যে শুকিয়ে যাবে। সে হয়তো হিমালয়ে আছে। ভারতবর্ষে এমন কত হয়। কত লোকের ছেলে মার কথা মনে রাখতে পারে না, উর্ধী মঠ স্থাপন করে তারা। তাদের জন্য শোক করতে নেই, আত্মার অধোগতি হয়।

কিন্তু তারপর গাঁয়ে এল সেই সন্ন্যাসীর ছেলেটা।

গুহগিন্নী গায়ে জল ঢালতে যেয়ে থামলেন।

একদিন বিকেলে ডেপুটি কমিশনার বাড়ী ফিরে এসে বললেন,—গুহজায়া, একটা সন্ন্যাসীকে স্থান দেবে তোমার বাড়ীতে ?

গুহজায়া (এখনকার গুহগিন্নী) হাসিমুখে কি একটা বলতে যেয়ে ডেপুটি কমিশনারের শুকনো মুখ দেখে বলেছিলেন—কি ব্যাপার বলো তো।

কিছু নয়, বলে ডেপুটি উঠে যেয়ে বৈঠকখানায় বসে অনেকক্ষণ তামাক টেনেছিলেন কিন্তু নিজের অন্তর যখন বুদ্ধিবৃত্তির পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে তখন স্ত্রী ছাড়া পুরুষের চলেনা, কাজেই ফিরে এসে বললেন—বউ সন্ন্যাসী ঠিক নয়, উস্‌কোখুস্‌কো চুল—মুখে অল্প অল্প দাড়ি, ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা কাপড়, একটি অল্পবয়সী ছেলে।

গুহগিন্নীর হৃৎপিণ্ডটা ছলকে উঠে খালি হয়ে গেল যেন, গুহগিন্নীর মনে আছে তিনি কান্নাকাতর হয়ে বলেছিলেন,—কার ছেলে, কে সে, বলো।

ডেপুটি কমিশনার বলেছিলেন, কেমন যেন দেখতে, যেন কি কি মিল আছে।

টেবিলের কোণটা চেপে ধরে গুহগিন্নী সামলে নিয়েছিলেন।

গায়ে কতগুলি ঘা বিষিয়ে উঠেছে।

—বিষাক্ত ঘা, খারাপ লোকদের যা হয় ; না না ও ছেলে আমার নয়।

পুলিন কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুহগিন্নী বললেন,—বিষাক্ত ঘা কি আমার ছেলের গায়ে হয় ?

চলে যেয়েও গুহগিন্নী আবার ফিরে এসেছিলেন, বিষাক্ত ঘা যার গায়ে সেই লোকটির কথা শুনবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলেন।

—কোথায় আছে সন্ন্যাসী ?

—গ্রামের পাশে, কাশের জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে ছিল, গ্রামের কয়েকজনে একটা চালা তুলে দিয়েছে।

—আহা কার বা ছেলে। ওর মা কী কখন ভেবেছিল এমন বিপথে যাবে ছেলে !

সন্ধ্যার আলো দিতে এসে গুহগিন্নী দেখলেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে গুহ একটু একটু মদ খাচ্ছে।

কাছে সরে এসে গুহের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন গুহগিন্নী, এত মনমরা হ'য়ে আছ কেন ? কি ভাবছ বলো ?

—না, কই। চুরুট ধরিয়ে গুহ উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা, ছেলেটার ঘাগুলি কি সত্যি বিষাক্ত ?

—মনে হয়। গ্যাংগ্রিনের মতো বাঁ হাতটা পচতে আরম্ভ করেছে, একটু পরে বলেছিলেন, তুমি যাবে নাকি একবার ?

—আমি, কেন ? ও রকম করে বলো না। আশঙ্কায় অন্তরটা ধক্ করে উঠল গুহগিন্নীর।

পরদিন সকাল গড়িয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল বেলায় আর থাকতে না পেরে গুহগিন্নী স্বামীর কাছে যেয়ে বললেন,—যদি সন্ন্যাসীকে কেউ দেখতে যায় নিন্দা হয় নাকি ?

মুখ থেকে কড়া চুরুট, চোখের সম্মুখ থেকে কড়া ক্রাইমনভেল সরিয়ে ডেপুটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—কোথায় ? ও, সে বেঁচে নেই। কাল রাত্রির অন্ধকারে শেয়ালরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু (বলতে যেয়ে গলাটা কাঁপল) দুধ খেয়েছিল বটে মায়ের। রোগশীর্ণ গায়ে কি শক্তি, একটা জানোয়ারও পাশে পড়েছিল, কে যেন পাঁচ আঙুল দিয়ে সেটার গলার শিরাগুলি চুপসে দিয়েছে।

—আহা, কে সে মা গো।

গুহগিন্নী মাথায় জল ঢালতে লাগলেন।

এর বহুদিন পরে স্বামীর পুরানো চিঠি ঘাঁটতে যেয়ে একটা চিঠি পেয়ে কেমন লেগেছিল গুহগিন্নীর। পোষ্টমর্টেম করতে যেয়ে সেই সন্ন্যাসীটার গ্যাংগ্রিন হওয়া হাতের মধ্যে থেকে বেরিয়েছিল শিসের কয়েকটা টুক্‌রো, যা রিভলবারের গুলিও হ'তে পারে। চিঠিটা লিখেছিল সদরের সিভিল সার্জ্জন। খবরটা জানিয়ে লিখেছিল,—আপনার অনুরোধে খবরটা গোপন রাখা হ'ল। অনাহার, গ্যাংগ্রিন সর্ব্বোপরি বন্যজন্তু বলে সার্টিফিকেট দেয়া হ'ল। কিন্তু গোপন করতে বলছেন কেন কৌতূহল হ'চ্ছে, দেখা হ'লে আলোচনা হবে।

স্বামী বেঁচেছিলেন না তখন, কাজেই গুহগিন্নীর কৌতূহল মনের মধ্যে থিতিয়ে গিয়েছিল। হয় তো কোন ফেরারী ডাকাত, কাজ বেড়ে উঠবার ভয়ে স্বামী গোপন করেছিলেন। কিন্তু কোন বা সে মা, যার বুক জুড়ে মাণিক হয়েছিল এই ছেলে।

একবার একটা অদ্ভুত কল্পনা মনে এসেছিল, শিউরে উঠে পুলিনের ও বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, তা কি করে হবে, তাঁর ছেলে ডাকাত হবে। মানুষ মারবে! ছি-ছি। এর পরে কয়েকদিন ধরে গুহগিন্নীর মনটা করুণায় কোমল হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ কি হল কাল রাত্রিতে, এইসব পুরানো অনুভূতি মনে হতে লাগল। স্বামীর পুরানো চিঠি বার করতে যেয়ে সিভিল সার্জ্জনের চিঠিটাও চোখে পড়ল। হাতের গ্যাংগ্রিনের মধ্যে বেরিয়েছে রিভলবারের গুলির টুক্‌রো আর একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, মনে হয় দেশী মতে অশিক্ষিত হাতে চিকিৎসা করতে যেয়ে, উণ্ড্ সারেনি, পচন ধরেছে।

না, স্বামী তাঁকে কিছুই বলেন নি। ছেলে হারাবার পর কড়া চুরুট, কড়া মদ ও কড়া ক্রাইমনভেলে ডুবে থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন অত বড় বুকের ভেতরে হার্টটা থেমে গেল।

খবরের কাগজে কাল রাত্রিতে গুহগিন্নী পড়ছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের কথা। বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়দের কথা পড়ে বেদনাবোধ হচ্ছিল। খবরের কাগজে তাদের মা'দের মনের কথা একটাও নেই। কত না নীরব জল পড়েছে তাঁদের চোখে অন্ধকার রাত্রির গোপনে।

মনে হ'ল বুকের কাছে তুলে ধ'রে মানুষ-করা ছেলেটির দেহ যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায় তখন। মনে হল তাঁর সেই ছেলেও হারিয়ে গেছে। ভাবতে যেয়ে হু হু করে চোখ ছাপিয়ে এল গভীর রাত্রির আড়ালে। মার মন সহজেই ছেলেদের অশুভ কল্পনা করে বসে, রাত জাগলে আরও বেশী হয়। একবার তাঁর মনে হ'ল, তাঁর ছেলেও কি ওদেরই একজন। বুকটা তোলপাড় করে উঠল গুহগিন্নীর, ডেপুটির বন্ধু সেই সাহেবটি যে সন্ন্যাসীর সাথেই প্রায় গ্রামে এসেছিল সঙ্গে অনেক লোক, অনেক গুলি বন্দুক নিয়ে সে কি এসেছিল ঐ মানুষের ছেলেটিকে শীকার করতে ? শীকারকে আহত ভূমিশায়ী দেখে ঝানু শীকারী যেমন বিশ্রাম নেয় তেমনি বিরাম ভোগ করছিলেন গুহবাড়ীর প্রাচুর্য্যের মধ্যে। জানালার বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে মনে হল,—যেন সেই সন্ন্যাসীটি তাঁর ছেলে। বিপ্লবী হয়েছিল, আহত হ'য়ে হয়তো সারা ভারতের তৃষ্ণার্ত্ত গোপন পথে রাত্রির কাঁটাগুলির উপর দিয়ে গ্রামে এসেছিল, মার কোলের কাছে আসবার জন্যে, মার হাতখানা কপালের উপর পাবার জন্যে। কি অসহ্য বেদনা হয়েছিল হাতের, কি দুঃসহ তৃষ্ণা। লোককে লুকিয়ে বেড়াতে হ'ত বলে হয়তো অনাহারে দিন কেটেছে। ভেবেছিল, যে মার ছেলে হারিয়ে গেছে তার সদাজাগ্রত অন্বেষী দৃষ্টি কাশের জঙ্গল থেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাবে। দেখা হয়েছিল পুলিশের ডেপুটি-কমিশনারের বর্ম্ম চড়ানো বাবার সঙ্গে। হয়তো ভূমিতে শায়িত অবস্থায় ভীত পাংশুমুখে সে প্রার্থনা করেছিল, হে ভগবান, হে দেশজননী, উনি যেন আমাকে চিনতে না পারেন। কালই আমি চলে যাব। তারপর যখন রাত অন্ধকার হ'ল তখন হয়তো মাকে পাবার লোভ বড় হ'য়ে উঠেছিল, চলে যেতে পারে নি। হয়তো বা অনুচ্চস্বরে কেঁদেছিল, মা, মাগো।

ঢোক গিলে চোখের জল মুছে গুহগিন্নী ভাবলেন—বহুদিন আগে ছুরি দিয়ে হাত কেটে ফেলে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কেঁদেছিল—মা, মাগো।

চাপা চাপা ছেলে চিরদিনের। হয়তো মা বকবেন এই ভয়ই হয়েছিল তার—গ্রামে এসেও সামনে আসতে পারে নি।

কিন্তু স্নান সেরে গুহগিন্নী ঘরে ফিরে এলেন, কালকের অনিদ্রার গ্লানি অনেকটা দূর হয়েছে।

আসন পেতে পুজা করতে বসে মনে হ'ল—তাই কি হয়, সে হয়তো হিমালয়ের কোথায় নিজের আত্মার কথা ভাবছে। এখন কি মার কথা মনে পড়ে তার? অনেক বড় মা পেয়েছে সে।

তবু আর একবার মনে হ'ল—তখনকার দিনে এতটা অগ্রসর ছিল না সমাজের অবস্থা। কেলেঙ্কারির ভয়েই কি তাঁর স্বামী নিজের ছেলেকে বুকে তুলে নেন নি, তিনিও যান নি একবার চোখের দেখা দেখতে। তাই যদি হয়ে থাকে কি তার প্রতিকার? কি করেই বা জানা যাবে আদৌ সত্য কিনা তাঁর কল্পনা। নাম বললেই বা কে চিনবে। বাপ মার দেয়া নাম তো ওরা দলের খাতায় লেখে না। বরং পুলিনের ছেলেটার মত হাস্যাস্পদ হ'তে হবে হয়তো।

বম্ বম্ করে গাল বাজিয়ে শিবের মাথায় বেলপাতাটা দিতে দিতে আবার তাঁর মনে হল,—সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমার কাছে এলে না, আমার চোখের জল পড়ছে, সে জলে যেন তোমার অমঙ্গল না হয়।

চারুশীলা নিজে ভাত নিয়ে এল। বিনতার হাতে জলের গেলাস, আসন।

হাসিমুখে গুহগিন্নী বললেন,—কি বাড়াবাড়ি কর, চারু, কি সুরু করলে, বিনতা।

খুসিও হলেন গুহগিন্নী।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত-প্রতিষ্ঠান

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

লীগ অব নেশনস্-এর মতই সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানও প্রহসনে পর্য্যবসিত হতে চলেছে এবং এর শেষ পরিণতি যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধেরই ইঙ্গিত সেকথাও আজ আর কারো অজানা নেই। কিছুদিন আগে জওহরলাল যখন এশিয়ার অধিবাসীদের নিয়ে এক সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলেন তখন আশা করা গিয়েছিল হয়ত ভারতবর্ষই বিশ্ব-শান্তির দীপ-বর্ত্তিকাটি জ্বালিয়ে রাখতে এবং তুলে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। আমরা আশা করেছিলাম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ক্রমে বিশ্ব-মানবতাকে একত্রীভূত করতে সক্ষম হয়ে বিশ্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু যেদিন কংগ্রেস খণ্ডিত ভারতকে স্বীকার করে নিল সেদিন থেকে আমাদের আশা হয়ে উঠল সুদূর-পরাহত—অখণ্ড ভারতবর্ষকেই যদি দ্বিধাবিভক্ত করতে হয় তা হলে শত সহস্র জাতি দেশ ও রাষ্ট্রকে নিয়ে কেমন করে এক অখণ্ড পৃথিবী সংগঠন করা সম্ভব হবে? অথচ আজকের দিনে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে এমন একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানেরই গড়ে ওঠার প্রয়োজন যা সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে বৈজ্ঞানিক পন্থানুযায়ী একত্রীভূত ও কেন্দ্রীভূত করে যথাযথভাবে যথোপযুক্ত প্রদেশে সরবরাহ ও উৎসারিত করতে পারবে। আমাদের পরিকল্পিত এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠান বা Scientific World Commonweal পৃথিবীর সকল দেশেরই স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করবে এবং নিয়মগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

পৃথিবীর সকল দেশকে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কঠিন বা অবাস্তব পরিকল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ের কথা তেমন মনে লাগে না। আর তা ছাড়া এই একত্রীকরণের উদ্দেশ্য তো সেই জার-আমলের পৃথিবী-শাসনের মত নয়—আমরা এটা চাই শুধু এই জন্যে যে নিখিল বিশ্ব-রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সৃজনী শক্তি অবাধ প্রসার লাভ করবে, যা মানুষের স্থায়ী শান্তি, সুখ ও নিরাপত্তার প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশে সক্ষম হবে। হিটলার যে ভাবে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর পদানত রাখতে চেয়েছিলেন সেভাবে বিশ্বজয় করা বা সেই ধরণের একত্রীকরণ আমাদের অভিপ্রেত নয়। শুধু একতার জন্যেও আমরা এই

একত্রীকরণ চাইনা। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের অধীনে গেলে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে অথবা আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক দ্বন্দ্বজনিত অপচয় নিবারিত হবে—সেটাও খুব বড় কথা নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানে সকল দেশ, সকল জাতি, সকল রাষ্ট্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যোগ দেবে এবং পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে শুধু এই আশা ও ভরসা নিয়ে যে উক্ত পক্ষপাতশূন্য প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র মানবজাতির সুখ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম হবে।

মানুষ আজও পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারে নি—অন্ধকারে তাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে না। নৈতিক এবং ইণ্টেলেক্চুয়াল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সে যে আজও মুক্ত হতে পারছে না একথা আমরা নিজেদেরই বুকে হাত দিয়ে অনুভব করতে পারি। যৌবনকে যাঁরা নির্ম্মল রেখে সুস্থভাবে অতিক্রম করে এসেছেন তাঁদের অনেকেই হয়ত স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবেন—ভাগ্যে সামাজিক বিধি-নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং গুরুজনের সতর্ক দৃষ্টি তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল!

বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়েও তাই কতকগুলি আইন-কানুন প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সে আইন-কানুন এমন ধরণের হবে যে লোকে বাধ্যতামূলক বলে ভাববে না—স্বেচ্ছায় আগ্রহসহকারে মেনে চলবে। প্রত্যেকটি লোককে যত্ন করে বুঝিয়ে দিতে হবে তার উপকারিতা, আবশ্যকতা ও প্রভাব। নিখিল বিশ্বকে একত্রীকরণের প্রচেষ্টায় প্রতিটি পদ অগ্রসর হতে হবে দীপ্ত খরোজ্জ্বল দিনের আলোয়—সে-প্রচেষ্টায় যত বেশী লোকের সহযোগিতা লাভ করা যায়, যত বেশী লোকের আগ্রহ উৎপাদন করা যায়, ততই তা সার্থক হয়ে উঠবে। অন্যথায় যে একতা গড়ে উঠবে তার স্থিতিশীলতার কোনই নিশ্চয়তা থাকতে পারে না।

সমগ্র বিশ্বকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তাধীনে আনরে এই প্রচেষ্টা—আমাদের এই মুক্ত ষড়যন্ত্র বা এইচ. জি. ওয়েলস্-বর্ণিত Open Conspiracy—আমরা চালিয়ে যাব বিজ্ঞানের নামে নূতন সার্থক সৃষ্টির জন্যে। মুক্ত ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান ও সৃজনী প্রতিভার উপযুক্ত প্রয়োগ ও উদার ব্যবহার, আর এই অভিযানের প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে প্রত্যেকের সতর্ক দৃষ্টি ও গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করা হবে যাতে কারো ত্যাগস্বীকারই না ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। হ্যাঁ, ত্যাগ স্বীকার বৈকি। স্বাধীন দেশগুলি যদি স্বায়ত্তশাসনাধিকারের মোহ পরিত্যাগ করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন একটিমাত্র বিশ্ব-সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় তা' হলে পরিণাম যাই হোক্ না কেন তাদের আপাততঃ ত্যাগস্বীকারকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলতে পারে না।

সৃষ্টিমূলক অগ্রগতির এবং সৃজনী-শক্তির-বিকাশ ও উৎকর্ষের প্রথম সর্ত্তই হল

নিরাপত্তা বা সিকিউরিটি। সমষ্টিগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে এই নিরাপত্তা বজায় থাকে।

প্রত্যেকের জন্যেই খাদ্য, আশ্রয় এবং অবসরের একান্ত প্রয়োজন। মনুষ্য-জীবন স্বচ্ছন্দে বিকশিত হওয়ার পূর্ব্বে পাশব-জীবনের অপরিহার্য্য চাহিদাগুলি প্রথমে মেটানো চাই। মানুষ শুধু খাবার জন্যে বেঁচে নেই—উদর-পূর্ত্তিটাই তার বড় কথা নয়। সে খায় শুধু এইজন্যে যাতে নানা বিষয় সে জানতে ও শিখতে পারে এবং তার অ্যাড্‌ভেঞ্চার চালিয়ে যেতে পারে প্রকৃতির বুকে—কারণ ক্ষুধা-নিবৃত্তি না হলে তো আর অ্যাড্‌ভেঞ্চার সম্ভব নয়।

প্রাণিগণ যেখানে কঠোর জীবনসংগ্রাম থেকে কোনক্রমেই মুক্ত হতে পারে না মানুষ সেখানে স্বীয় বুদ্ধিবলে জীবনসংগ্রামের তীব্রতাকে এড়িয়ে যেতে পারে। অবশ্য বাঁচবার জন্যে মানুষকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু যদি সে বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে সে কতকাংশে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে। আমরা এখানে বলতে চাইছি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা। যেখানে খাদ্যাভাব, যেখানে স্থানাভাব, সেখানে সন্তানের রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুষ্ঠুভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হলে দেশ যে আগাছায় ভরে যাবে! তবে এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শুধু বিজিত দেশ অথবা কোন রাষ্ট্রবিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হবে না—সমগ্র বিশ্বের সকল প্রদেশের জনসংখ্যা, জন্মমৃত্যুর হার, খাদ্যের উৎপাদন, স্থানের সঙ্কুলান প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় বিবেচনা করে বাঞ্ছিত সন্তানের আবির্ভাব কামনা করতে হবে। আমাদের পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ক্রমে এই ধরণের directed breeding বা বাঞ্ছিত প্রজনন সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি। তবে সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্বসম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্যে প্রথমেই এই ধরণের সমষ্টিগত সংখ্যানিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। অনেকেরই একপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে যে নারীর সন্তানধারণ প্রবৃত্তি সহজাত—সন্তান উৎপাদনের জন্যই নারীজাতির সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্ত্তব্যই হবে জনসাধারণের মন থেকে এই ভ্রান্তি দূর করা। শুধু কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রকৃতি জনসংখ্যাকে বর্দ্ধিত করে থাকে। যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সংযম, অবাঞ্ছিত জনাগম বন্ধ করতে পারবে—মানুষের মনে কামবৃত্তি ঘন ঘন জাগ্রত হবে না অথবা জাগ্রত হলেও তা চরিতার্থ করবার জন্যে সন্তান ধারণের প্রয়োজন হবে না। মানুষের নিজেকে গড়ে তুলতে হবে জীবন-বিজ্ঞানের নূতনতর ছাঁচে। যতদিন সে অজ্ঞানের অন্ধকারে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে লালসা, কামনা ও পাশববৃত্তির দাস হয়ে থাকবে ততদিন পশুর মতই তাকে কঠোর জীবন

সংগ্রাম করে যেতে হবে, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে উন্নত চিন্তা করবার অবসরটুকুও সে খুঁজে পাবে না।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের দু'নম্বর কাজ হবে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি ও যথোপযুক্ত বণ্টনব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপাদনবৃদ্ধি ও অপচয়নিবারণ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আবার বর্ত্তমানে দূরত্বের অবলোপ ঘটায় ও বিভিন্ন দেশের অন্তরাল-প্রাচীর ধ্বংস পড়ায় দ্রুতগামী যানের সাহায্যে উন্নত দেশ থেকে ঘাটতি দেশে অনতিবিলম্বে সরবরাহ ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে। সমস্যা যা কিছু তা হল পুঁজি-বাদীদের নিয়ে। আইন তাঁদের অনুকূলে থাকায় তাঁরা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কেই উত্তরোত্তর বাড়িয়ে গেছেন—দুঃস্থ নিরন্নের কথা তাঁদের মনে স্থান পায় নি। অবশ্য অতীতে এর ফলে পরোক্ষভাবে এমন একটা উপকার সাধিত হয়েছে যা তৎকালীন জীব-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কোন সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেত না। কথাটা আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি। তখন যদি দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে উৎপন্ন দ্রব্য সকলের ভাগেই সমানভাবে বাঁটোয়ারা হত। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞান না থাকায় জনসংখ্যা বেড়েই চলত এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হত। অথচ সমান ভাগ-ব্যবস্থার ফলে কারো ভাগ্যেই দু'বেলা পেট-ভরা আহার জুটত না। এইভাবে দেশের প্রত্যেকটি পরিবার দুর্ব্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ত ও সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে অপারগ হত। কিন্তু তাই বলে এখনকার দিনে পুঁজিপতিকে আর কোনমতেই ডিফেণ্ড করা যাবে না। আজ জন-সংখ্যা বৃদ্ধিকে সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব. এবং তারই ফলে সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে সম্পূর্ণ নূতনতর কতকগুলি সম্ভাবনা জাগ্রত হয়েছে।

এর পরেই আসে বেতন, মূল্য, এবং অধিকারের প্রশ্ন। এইচ্ জি. ওয়েলস্ বলেছেন, "The primary issues of human association are biological and psychological, and the essentials of economics are problems in applied physics and chemistry." প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এবং ভাবতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি নিয়ে আমরা কী করতে চাই, তারপর যা করতে হবে তার জন্যে লোক নিযুক্ত করা চাই, এবং সেই লোকেরা যাতে সন্তোষ এবং আনন্দের সঙ্গে কাজ করে আরব্ধ কাজকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। পরিশেষে আমাদের এমন একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মানদণ্ড থাকা চাই যার সঙ্গে দৈনন্দিন উৎপাদনের ভালমন্দ তুলনা করা চলতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে এবং জনকয়েক মার্ক্স-পন্থী তাঁদের অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সময়ে সময়ে দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকেন।

বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁরা ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ধার ধারেন না তাঁরা শুধু বর্ত্তমানটাই দেখেন এবং আর সমস্তই কাল্পনিক এবং বুর্জ্জোয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। প্রায় একশ' বছর ধরে তাঁরা 'খাজনা' 'উদ্বৃত্ত দাম' প্রভৃতি নিয়ে বিতর্ক করে এসেছেন, এবং বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন—অথচ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কোন বালাই ছিল না। অর্থনৈতিক সহযোগিতার মনস্তত্ত্ব বা সাইকোলজি সদ্য বিকশিত হচ্ছে বলা চলে। বিজ্ঞান তথা যন্ত্রের কল্যাণে উৎপাদনকে কত উন্নততর করতে পারা যায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে কি ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় সেদিকে আজ সকলের দৃষ্টি পড়েছে। কাজ ভাল না হলে টাকা ভাল হবে কেমন করে? বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই ধরণের সাইকোলজি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং এর ফলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এক 'তথ্য ও পরামর্শ সরবরাহ বিভাগ' থাকবে যার কাজ হবে মানুষের জটিল অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপগুলি সংহত ও সুসংবদ্ধ করা। কোথায় কী পাওয়া যায়, কার কোন্ জিনিষ কোন্ সময়ে কতখানি প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যের সাধারণ চাহিদা কি রকম, কি হারে উৎপাদন হচ্ছে, কি ভাবে বন্টনের প্রয়োজন—এ সবের পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যাবে উক্ত 'তথ্য ও পরামর্শ সরবরাহ বিভাগ' থেকে। এই ভাবে সহজেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কোন জাতির সম্মতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। এর নির্দ্দেশ হবে ঠিক মানচিত্রের মতন। মূক জড় মানচিত্র কাকেও কোন আদেশ করে না, তবু সবাই তাকে মেনে চলে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানকেও ঠিক এম্নিভাবেই সবাই স্বীকার করে নেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাধ্যবাধকতা যেটুকু থাকবে সেটুকু বাঁধাবাঁধি কারো গায়ে লাগবে না। কোন রাষ্ট্র শুধু তখনই আদর্শ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হতে পারে যখন কারো সঙ্গে কারো বিবাদ থাকে না অথবা কেউ মনের মধ্যে অসন্তোষ পোষণ করে না—অন্ততঃ মনের গ্লানি যাদের থাকে সেরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম।

কিন্তু মানুষ কি সত্যই পারবে এতখানি উদার হতে অথবা এতখানি সংযমী হতে? প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অপচয় যেন তার মজ্জাগত। আশাবাদী এইচ. জি ওয়েলসও এইখানে একটুখানি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। "Man is still but half-born out of the blind struggle for existence, and his nature still partakes of the infinite wastefulness of his mother Nature. He has still to learn how to price the commodities he covets in terms of human life....He wastes will and human possibility extravagantly in his current economic methods."

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) এবং সাধারণতন্ত্রবাদ (socialism) এতদুভয়ের

মধ্যে আজও যথেষ্ট মনকষাকষি রয়েছে। অথচ কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে এবং কি ভবিষ্যতে সর্ব্বসময়েই মনুষ্যসমাজ এমন এক জটিল সংহতিমূলক প্রণালীতে গড়ে উঠেছে ও গড়ে উঠে থাকে যাতে মুক্তির মধ্যে বন্ধন এবং বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে সামাজিকভাবে কোন গ্যারাণ্টি না থাকলেও তাকে যেমন খুসিমত অসম্ভবরকম ফাঁপিয়ে তোলায় প্রতিবন্ধক আছে তেম্নি কোন চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীর খেয়ালে যে সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে তারও কোন মানে নেই। সম্পত্তি করা ডাকাতির মত দোষের নয় বরং অপচয় থেকে সংরক্ষণ বলা চলে। কিন্তু তাই বলে সব সম্পত্তিই যে ব্যক্তিগত হবে, সমাজের যে তা ব্যবহার করবার অধিকার থাকবে না, তাও নয়। পক্ষপাতশূন্যভাবে ন্যায় বিচার করতে গেলে অধিকারের মাত্রা অনুযায়ী এবং ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী গুরুত্ব হিসাবে প্রত্যেক সম্পত্তির শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন।

কতকগুলি জিনিষ যেমন সমুদ্র, বাতাস, দুষ্প্রাপ্য বন্যজন্তু, প্রভৃতি কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন জাতিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি বলে পরিগণিত হতে পারবে না—সমষ্টিগত-ভাবে দেশ জাতি ও রাষ্ট্রনির্ব্বিশেষে সকলেই তার কল্যাণ বা উপস্বত্ব ভোগ করবে। এই সঙ্গে পৃথিবীর কাঁচামালকেও ধরতে হবে। যেহেতু পূর্ব্ববঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন হয় এবং যেহেতু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মাটিতে থোরিয়াম নামে পরমাণবিক শক্তির উৎসস্বরূপ উপাদানটি পাওয়া যায় সেজন্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও ত্রিবাঙ্কুর যথাক্রমে পাট ও থোরিয়াম একচেটে করে রাখবে এবং অন্যদেশের কাছে তা সরবরাহ করে লাভের অঙ্ক স্ফীত করে তুলবে--এ হতে পারে না। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই হবে এই ধরণের মুনাফা রোধ করা। সত্যি, কোন বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিই ভাবতে পারেন না যে, কোন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কোন একটা বিশেষ জাতি অথবা রাষ্ট্র কেবল একাকী শুধু তার খেয়াল-মাফিক কোন অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় বা সরবরাহ চালাতে থাকবে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠান কাজ করবে ঠিক এই ধরণের মনোবৃত্তি নিয়ে।

পৃথিবীর পোষ্ট্যাল ইউনিয়ন কেমন সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমেরিকার কোন বিখ্যাত সহর থেকে ভারতের কোন অখ্যাত গ্রামে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই চিঠি বিলি হয়। ডাক বিভাগ কাজ করে যায়, লোকে তার সমালোচনা করে, সেও সে-সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করে নেয় কারণ তাতে কোন ঝাঁঝ বা ঈর্ষার হুল থাকে না। যে শক্তি ডাক-বিভাগকে এমন সুন্দরভাবে চালু রেখেছে তা হল মানুষের চেতনশীল সাধারণ বোধশক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা। এই পোষ্ট্যাল ইউনিয়ন যখন চলতে পারে তখন বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানেরও না চলবার কোন কারণ আমরা দেখতে পাই না।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন ব্যক্তি-স্বত্ব (individual ownership) যদি লোপ পায় তা হলে কাজ কি ভাল হবে? বাড়ী যদি আমার নিজের না হয় তাহলে সে-বাড়ীকে যত্ন করে সাজাতে কি মন চাইবে? কৃষক যদি জানে যে সে উৎপাদন করছে শুধু গভর্ণমেণ্টের জন্যে—সে উৎপাদনে তার কোন লাভক্ষতি নেই—তাহলে উৎপাদন আশানুরূপ হবে কেমন করে? তাঁদের এ আশঙ্কা অমূলক বলা চলে না—এ হল সত্যিই একটা সমস্যা। আজকাল অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে profit sharing business চলছে বা শ্রমিককে লাভের একটা নগণ্য অংশ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সমগ্র বিশ্ব নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে প্রত্যেকের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব হতে পারে না।

তবে আশা করা যায়, মানুষ যখন জনসংখ্যার চাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, যখন পৃথিবীতে যুদ্ধজনিত বিরাট অপচয় থাকবে না, যখন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বা পৃথিবীর ধন-সম্পদ কারো একার অধিকারে থাকবে না, তখন মানুষের উদ্ধত তেজ ও ইচ্ছাশক্তি এমন প্রভাব বিস্তার করবে যার ফলে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য হবে জীবনের নিয়ম; প্রতিটি প্রভাত নূতনতর রূপে নব মাধুর্য্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; প্রতিটি দিন অনুলিপ্ত হবে বহু বিচিত্র কর্ম্মোত্তেজনার সমাবেশে। তখন, এইচ, জি, ওয়েলসের ভাষায় বলি,—Life which was once routine, endurance and mischance will become adventure and discovery. It will no longer be "the old, old story." বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিত প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সেদিন মানুষ দেবত্বে উন্নীত হতে পারবে।

পাঁচ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমন্ত্রণটা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হ'ল বটে কিন্তু মনে মনে বিমল অপ্রসন্নই হ'ল। এই মেয়ে দুটি'র সঙ্গে এমন ভাবে চা মিষ্টান্ন সহযোগে আলাপ করতে মন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছে। বাঙালী জীবনেরই এটা একটা জটীলতা। এই জটীলতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজে অত্যন্ত বেশী। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত সহজ মেলামেশা প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু এই সমাজের লেখকদের লেখাতে দেখা যায় একটি তরুণ ও একটি তরুণী কোন একটি ঘটনার সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়; আলাপ হবার অপেক্ষা! অর্থাৎ তাঁদের সমাজেও 'ঘি এবং আগুণে'র প্রবাদটা আজও সত্য! স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্ককে বাদ দিয়ে বান্ধব ও বান্ধবী সম্পর্ক গড়ে তোলবার মত শিক্ষা ও রুচিকে মন দিয়ে আজ গ্রহণ করতে বাঙালী পারে নি। অথচ যে যুগে যে সভ্যতার ভিত্তিতে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে তাতে স্ত্রী এবং পুরুষকে জীবনে চলতে হবে কর্ম্মপথে সহযাত্রিনীর মত, হাঁটতে হবে এই ফুটপাথে, মিলতে হবে একই কর্ম্মক্ষেত্রে। যুক্তির দিক দিয়ে বিমল ঐ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু মানতে পারে না। শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বন্দ্বে আজও তার সংস্কার এ ক্ষেত্রে প্রবলতর।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে এটা। যে সংসারে তার জন্ম সেটি একটি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বাড়ী। সেখানে আহারে-ব্যবহারে চরিত্রগঠনে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন মানুষের প্রকৃতি—শিক্ষা প্রভৃতি বিবেচনা ক'রে মনু যে অনুশাসন রচনা করেছিলেন —সেই শাসন প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞান পড়েও সে বাড়ীর ছেলেকে বিশ্বাস করতে হত'— পৃথিবীতে দিন রাত্রি ঘটে, সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে আপন পুরীর পশ্চিম তোরণের দ্বার খুলে বেরিয়ে পৃথিবীকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে প্রদক্ষিণ ক'রে পশ্চিমের অস্তাচলে গিয়ে আপনার পুরীর পূর্ব্ব তোরণ দিয়ে প্রবেশ করেন ব'লে। ঋতুর বিবর্ত্তন ঘটে দেবতাদের ইচ্ছায়। মেয়েদের

সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারের দিক দিয়ে সেখানে কন্যা যুবতী হলে বাপের সঙ্গে এক তক্তাপোষে উপবেশন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।

এমন একটি রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে বিমলই এনেছিল প্রথম বিপ্লব। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে দরিদ্রকে নারায়ণ এবং মুচী মেথর চণ্ডালকে ভাই বলবার সাহস করেছিল। দ্বন্দ্ব অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু সে দ্বন্দ্বে বিমলেরই জয় হয়েছিল তবে সন্ধিসূত্রে বাড়ী ঢুকে নিত্য তাকে কাপড় ছাড়তে হ'ত এবং গঙ্গাজলের ছিটেও নিতে হ'ত। তাতেও এ দিক দিয়ে অর্থাৎ মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে মনোভাবের কোন উদার পরিবর্ত্তন ঘটে নি, বরং উল্টোই হয়েছিল। কারণ স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শটা খুবই বড়।

এরপরই বিমলের যৌবনের প্রারম্ভে লেগেছিল সহিংস বিপ্লবী দলের ছোঁয়াচ। সেখানেও সেই একই ধারা। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শই বিপ্লবী দলের জীবনদর্শনের প্রাথমিক শিক্ষা, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানদলের আদর্শ দ্বিতীয় শিক্ষা—তার মধ্যেও মেয়েদের সম্পর্ক একরকম বর্জ্জিত। তারপর গীতা। ইউরোপীয় বিপ্লববাদীদের ইতিহাস থেকে এঁরা কর্ম্মপদ্ধতি হিসেবে হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি অনেক কিছুকেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি খুঁজেছেন গীতার অধ্যাত্মবাদের মধ্যে। জীবন দর্শনের দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। এই কারণেই মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁরা মনকে করতে চাইতেন পাথরের মত নিস্পন্দ। বাংলাদেশের বিপ্লববাদীদের নারীসংশ্রব বর্জ্জনের মানসিকতা, ব্রহ্মচর্য্য পালনের দৃঢ়তার ঐতিহ্য ঐতিহাসিক সত্য। মেয়েদের দলেও নেওয়া হ'ত না। যখন হ'ল, উনিশশো তিরিশ সাল নাগাদ ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবকে হত্যার চেষ্টার মধ্যে—চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দলে—কুমিল্লায় ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার কাজে—কলকাতায় কনভোকেশনে লাট সাহেবকে হত্যার চেষ্টায়, দার্জ্জিলিংয়ে লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিপ্লবীদলের কাজে মেয়েরা যখন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে—যখন প্রমাণিত হল—বাংলাদেশের আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর মন নারী ও পুরুষের সম্পর্কে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, সহজ হয়েছে—দৃঢ় হয়েছে—তখন বিমল বিপ্লবীদল থেকে সরে এসেছে, পুরোপুরি তখন সে গান্ধীবাদী। উনিশশো তিরিশ সালে—মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেও—সেখানে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। অর্থাৎ একটি শুচিবাতিক যে তার মধ্যে ছিল—এ সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। অন্ততঃ মেয়ে পুরুষের যাত্রাপথে ট্রেনের ব্যবস্থার মত ভিন্ন কামরায় যাত্রার নিয়ম পদ্ধতি খুব দূর ছিল।

বত্রিশ সালের পর বিমল রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যকে গ্রহণ করলে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণের বি-পি-সি-সির আপিসকে পাশে রেখে উত্তর কলকাতায়

মাসিক পত্রিকার আপিসে যাওয়া আসা সুরু করে দিলে। মনের মধ্যে তখন তার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে সে-গুলি সে বুঝলেও সংস্কারকে জয় করা সহজ হ'ল না। একটা কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আজ পাঁচ বৎসর তার জীবনের নূতন সাধনা চলেছে। অনেক কিছুকেই সে নূতন দৃষ্টিতে দেখে নব উপলব্ধিতে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে তার সংস্কারকে জয় ক'রে সে স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে নি। এ দিক দিয়ে জীবনে তার জটীলতা থেকেই গেছে।

মনে মনে সে যুক্তিতর্ক দিয়ে এ জটীলতার জটকে খুলবার চেষ্টা করে। নূতন উদার উপলব্ধিতে সুখ এবং আনন্দ সন্ধানের নিভৃত ভাবনায় অকপটে স্বীকার করে যে, একটি রক্তমাংসের গঠিত মানবীর মনোরঞ্জন করে তার চিত্তকে জয় করার মধ্যেই আছে পুরুষ-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তার স্তবগান করে তার চোখে মুখে মুগ্ধ প্রসন্নতা আনতে পারার মধ্যেই আছে কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ প্রশংসা, অদম্য কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সম্পদ আহরণ করে এনে ওই মানবীটিকে সাজিয়ে তুলতে পারার মধ্যেই আছে পৌরুষের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। দেওয়ানা কবি হাফেজ তাঁর মানসীপ্রিয়ার গণ্ডের একটি তিলের মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন—ওই তিলটির বিনিময়ে তিনি বোখারা সমরখন্দ দান করতে পারেন। চিন্তা করতে করতে এতদূর উঠেই সে যেন ঘুমের ঘোরে ধপ করে পড়ে গিয়ে জেগে ওঠে। মনে পড়ে যায় মহানগরীর জমির কাঠার দামের হার। সাধারণ জমির কাঠা সতের শো পঞ্চাশ; দুই রাস্তার মোড়ে হলে বাইশ শো। মনে মনে সে এক আই-সি-এস কবির রচিত একটা গানের প্রথম কলিটা আউড়ে ফেলে—'জয় ভগবান হে—জয় খোদাতালা হে'! সামনের ওই দরিদ্র গৃহস্থ বস্তীটির দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিজের জীবনের আয় ব্যয়ের হিসেবটাও ভেসে ওঠে। একটা গল্পের দাম দশটাকা, উপন্যাসের কপিরাইট একশো টাকায় বিক্রী করতে হয়। ভাবপ্রবণ বাঙালী কবি তবু আশা ছাড়তে পারেন না, প্রত্যাশা করেন মরতে পারলে অন্তত চিতার উপর মঠ তৈরী করে দেবে দেশের লোক। বিমল জানে তাও হয় না, হয় শোক সভা, বক্তৃতা, বড় জোর খবরের কাগজওয়ালারা ব্লক করে একটা ছবি ছাপে। বিংশশতাব্দীতে এই মহানগরীকে কেন্দ্র করে যে নূতন সভ্যতা যে নূতন জীবনধারা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে তার ফলে অবিবাহিত নর-নারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেকে বলেন—এ যুগে যৌবন হয়েছে ভীরু কিন্তু বিমল তা স্বীকার করে না, সে মনে করে দারিদ্র্যের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রেরণায় মহানগরীর যৌবন কৃচ্ছ্রসাধন করে এক বৈপ্লবিক সাধনার তপস্যা করছে। সেই তপস্যায় সেও একজন তপস্বী।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। এসে উপস্থিত হল বন্ধু নীরেন। শ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এরই মধ্যে তার স্নান আহার সব সারা হয়ে গেছে, আপিস

চলেছে। কাগজ বের হবে, আর মাত্র কয়েকদিন আছে। কাজের চাপ এখন বেশী। বিমল তাকে দেখে খুসী হল। মনে মনে সে যেন তাকেই কামনা করছিল।

নীরেন ধপ করে সেই ভাঙা সোফাটায় বসে পড়ে বললে—লেখা আছে কিছু? ভাল গল্প—খুব ভাল গল্প?

—গল্প কি হবে?

—চাই। খুব ভাল গল্প।

—কেন? এ মাসে তো রমেন বসুর গল্প দেবার কথা।

একটু চুপ করে থেকে নীরেন বললে—রমেনকে তো জানিস নে। লেখা শেষ করতে পারবে না জানিয়েছে। দিতে পারবি?

একটু ভেবে বিমল বললে—গল্প একটা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখতে পারি। রমেনবাবুর একটা গল্প পড়েই লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। অভিজাত বংশ নিয়ে রমেনবাবু গল্প লিখেছেন। আমার ভাল লাগেনি। এদেশের অভিজাতের জাতকে রমেনবাবু জানেন না।

আবার একটু হেসে বললে—নীলরক্ত শব্দটা বারবার ব্যবহার করেছেন। Blue blood হয়তো ওদেশের অভিজাতদের শিরায় বয়ে থাকে, আমাদের দেশে কিন্তু নীলরক্ত চলে না।

—তবে বসে যা লিখতে। আমি রাত্রে আসব। উঠলাম।

নীরেন উঠল। বিমল খাতা কলম টেনে বসল। কিন্তু কয়েকমিনিট পরেই নীরেন আবার ফিরল। বললে—তোকে সত্যি কথাটা বলে যাই। রমেন গল্প দিয়েছে কিন্তু সে গল্প পছন্দ হয়নি সুরেশবাবুর। আমি বললাম—বিমলকে বলে দেখতে পারি যদি বলেন। খানিকটা ভাবলেন—ভেবে সুরেশবাবু বললেন, দেখতে পার। ও পারতে পারে। ওর ষ্টাইল ভাল নয় কিন্তু ওর বলবার কথা অনেক আছে। ভরসা সেইখানে।

মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড় শো বছরের পুরানো বাড়ী। নূতন কালের রাস্তা এবং আশপাশের জমি বাড়ীর উঠান থেকে হাত দুয়েক উঁচু হয়ে উঠেছে। চকমিলানো বাড়ী। দোতালার বারান্দায় কাঠের রেলিং। পরপর তিনটি মহল। বড় হলে পুরানো আমলের ভারী আসবাব। মেঝেতে পাতা কার্পেটের পশম উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতোর দড়ির বুনুনী, তাও মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। কড়ি বর্গায় দীর্ঘকাল রঙ পড়েনি, বহুকালের ক্ষয়ে দু চারখানা কড়ি ফেটে নুয়ে পড়েছে। কতক গুলো টালি ভেঙে খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাদের জমানো খোয়ার দৃষ্টিকটু চেহারা। পলেস্তারা খসে গিয়েছে বহুস্থানেই। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে; জানালা দরজাগুলোর খড়খড়ি ভেঙেছে, কব্জা খসেছে। ওই দেওয়ালের ফাটল এবং জানালার ভাঙা খড়খড়ির

ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু-হু করে। বর্ষার রাত্রি, বাইরে মৃদু বর্ষণের সঙ্গে উতলা বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সেই বাতাস ঢুকছে ঘরে—শিসের মত শব্দ করে। কড়িতে বাঁধা লোহার শিকল এবং হুকে ঝুলানো পুরানো কালের কয়েকটা ঝাড় লণ্ঠন সেই বাতাসে দুলছে, কলসে কলসে আঘাত খেয়ে টুং টাং শব্দ উঠছে। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে শব্দ শুনে মনে হবে কে যেন গুণ গুণ করে এক অতি করুণ বিষণ্ণ সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

ঘরে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প, চিমনীর মাথাটা ভাঙা এবং কালো হয়ে উঠেছে শিখার কালিতে; পুরানো আলো—কলের দোষে—পলতের জীর্ণতা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্য—শিখায় কালি উঠছে। এত বড় হলে—ওই একটা দশ বাতির জোরের লালচে আলো– অপর্য্যাপ্ত এবং অস্পষ্টতার জন্য কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘরখানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ মানুষ; খাঁড়ার মত নাক, আয়তচোখে বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি ঘুরছেন; দেহের বর্ণ পাংশু পীতাভ; কবরের পাথরের আবেষ্টনীর তলার যে ঘাস—তার রঙের সঙ্গে এ রঙের তুলনা দেওয়া যায়। লালচে দশবাতির আলো তাঁর মুখ এবং অনাবৃত হাত দুখানির উপর পড়ে ম্লান মনে হচ্ছে। মাথায় চুল নাই টাক পড়েছে; পিছনে পাশে স্বল্প-খুঁটিয়ে ছাঁটা সাদা চুল—মূর্ত্তিটির উপর সব চেয়ে বড় মহিমা আরোপ করেছে।

বহু বিভক্ত এই বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ইনি। আজই এটর্ণির আপিসে গিয়ে এই বাড়ীর বিক্রী কোবালায় সই করে এসেছেন। কিনেছেন এক মিলওয়ালা। জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি ভাঙা লোহার টুকরো কুড়িয়ে। এই বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী করবেন তিনি। ফ্ল্যাট সিষ্টেমে ভাগ করে পাঁচতলা বাড়ী।

না বিক্রী ক'রে উপায় ছিল না। কয়েকজন অংশীদার অনেক আগেই তাদের অংশ এঁকেই বিক্রী করেছে। অন্যদিকে তাঁদের দেনাও হয়ে উঠেছে আকণ্ঠ, চিন্তায়—তাগাদার অপমানে শ্বাসরোধ হ'য়ে আসছে।

আর কিসের জন্য—কার জন্য এই ভগ্ন প্রাসাদকে ধরে রাখবেন? ছোট ভাই ব্যারিষ্টার হয়ে এসে—মেম বিয়ে করে—রেস এবং মদের দেনায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বড় ছেলে জোচ্চোর, সে তার বংশের দান দেহমহিমা এবং রূপকে মূলধন করে দেশে দেশে জাল রাজা সেজে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। মেজছেলে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে বাস করছে, ধনী পিতার একমাত্র কুরূপা কন্যাকে বিবাহ ক'রে আত্মরক্ষা করেছে। ছোট ছেলেটার ভরসা তিনি করেছিলেন। বংশোচিত দীর্ঘ অগ্নিশিখার বুমত চেহারা, প্রদীপ্ত দ্ধি, উজ্জ্বল ছাত্র জীবন—মিহিরকে দেখে তাঁর ভরসা হয়েছিল মনে।

কিন্তু মিহির নেমেছে পথের ধুলোয়, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে—চীৎকার করে হেঁটে চলে ধর্ম্মঘটী মজুরদের শোভাযাত্রার পুরোভাগে। পূর্ব্বপুরুষদের গাল দেয়। বলে—"ইংরেজ রাজত্ব যারা কায়েম করেছিল, বিদেশী বানিয়াদের বেনিয়ানি করে, তাদের অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ, ভাঙা জাহাজের মত পুরোনো—পড়োপড়ো বড় বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে দেখ; তারা মরছে। তাদের জায়গা নিয়ে উঠছে—নতুন বানিয়ার দল।"

তিনি হাসেন—বিষণ্ণ হাসি।

অক্ষম উচ্চাভিলাষীর ক্রোধ! কিন্তু মিহিরের লজ্জা হয় না—ওই হতভাগ্য নোংরা ছোট লোকদের সঙ্গে এক সঙ্গে দাঁড়াতে?

মধ্যে মধ্যে পুলিশ আসে। প্রথম যে দিন পুলিশ আসে মিহিরের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সে দিনের কথা তাঁর মনে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। চার বছর আগে। দিল্লী থেকে এসেছিল এক ভারত-বিখ্যাত বাইজী। প্রৌঢ়া বাইজী, স্থূলতায় মেদবাহুল্যে তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি চোখ বুজে বসে এই ঘরেই গান শুনছিলেন। অল্প কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন নিমন্ত্রিত। ঝাড়ে লণ্ঠনে সেদিনও জ্বলছিল বিজলী বাতি। এক একটা ঝাড়ে প্রায় দুশো আড়াইশো বাতির প্রভা, তিনটে ঝাড়ে জ্বলছিল। বেহাগ আলাপ চলছিল। অপূর্ব্ব সে রাগিনীর আলাপ; প্রৌঢ়া বাইয়ের কণ্ঠে কিশোরীর কণ্ঠের স্বরমাধুর্য্য, সেই মাধুর্য্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনার অপরূপ কারুকৌশল। হঠাৎ এল চাকর। কানে কানে এসে বললে—ডাকছেন জ্ঞাতি ভাই, পুলিশ এসেছে নীচে। চমকে উঠলেন। ইচ্ছে হল চাকরটাকে গুলী করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন—বসতে বলো, গান শেষ হোক, যাচ্ছি।

হঠাৎ দমকা বর্ষার বাতাসের একটা ঝটকায় সশব্দে একটা জানালার একখানা ভাঙা কাঠ ছেড়ে ছটকে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলোটা। তিনি বিরক্ত হয়ে সুইচবোর্ডের স্থানটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তিনমাস আগে অর্থাভাবে ইলেক্‌ট্রিক কনেকশন কেটে দিয়েছে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নীচে একটা ঘোড়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠছে। বুড়ো ঘোড়াটা আজও রেখেছেন তিনি। আর আছে ভাঙা ব্রুহাম একখানা। আস্তাবলের দরজায় তেরপলের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে, নতুন কেনার সামর্থ্য নাই; জলের ছাটে বাতাসের দমকায় ঘোড়াটার কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। বাড়ীতে বন্দুক একটা আজও আছে। কার্টিজ নাই। থাকলে আজ ওটাকে গুলী করে মেরে নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। আজ এই মুহূর্ত্তে তিনি নিশ্চয় মারতে পারতেন।

বাইরে শব্দ উঠছে সিঁড়িতে। বেশ জোয়ান মানুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শব্দ। কাঠের সিঁড়ি কাঁপছে। বুঝেছেন তিনি কে এল এই দুর্য্যোগের মধ্যে। হ্যাঁ সেই। বাইরের বারান্দায় মৃদু কম্পন উঠছে। তিনি ডাকলেন—মিহির।

—বাবা! এ কি—আলো নিভে গেছে? ফস করে দেশলাই জ্বাললে মিহির।

তাঁর ইচ্ছা হল চীৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নয়, মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করে মৃদুস্বরে বললেন—না।

—আলো জ্বালব না?

—থাক।

* * * *

বিমলের লেখায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে বিমল চমকে উঠল। তার গল্পের মিহির—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মিহির তার কল্পনার মানুষ নয়। সত্যকারের মানুষ। তাদের বাড়ী তাদের ইতিবৃত্ত তার বাপ সে বাস্তব সংসারের জীবন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তার মামার বাড়ীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে যে দলের সঙ্গে একদা জড়িত ছিল মিহির আজ সেই দলের সভ্য। পুরাতন দলের আদর্শবাদে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নেতাদের একজন ছাড়া অন্যেরা আজ নানা দলে মিশে গেছেন।

মিহির বললে—গোপেন দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।

—আমার আছে?

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কেউ ডাকলে—বিমলবাবু। সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়াল—লাবণ্য।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো কম হয়েছে। মিহির সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে।

আরও কেউ আসছে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রতীক্ষা করে রইল। লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

—বিমলদা। কাকে এনেছি দেখুন। চিত্তরঞ্জন এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এসে দাঁড়াল তারই গ্রামবাসী প্রায় সমবয়সীও, কালীনাথ—কলকাতার আই-বি অফিসার।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকলা

উপাদান—পাস্তেল বা নির্জ্জল রঙ

যামিনীকান্ত সেন

শুষ্ক রঙের চক্ হাতে নিয়ে অতি সহজে ছবি আঁকা যায়। চা-খড়ি বা কাঠ কয়লা দিয়ে যেমন black and white বা সাদা কালো রঙের ছবি আঁকা সম্ভব, জলের বা তেলের রঙ ব্যবহার না করেও তেমনি রঙীন কাঠি বা crayon এর সাহায্যেও চমৎকার ছবি আঁকা চলে। এত সহজে এবং দ্রুতভাবে আর কোন উপাদানের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেই এর প্রবর্ত্তন হয়েছে। পাস্তেল কথাটি ইতালীয় 'Pastello' শব্দ হ'তে এসেছে। Pastello ও Paste অনেকটা এক রকমের কথা! এ ক্ষেত্রে দুটি জর্ম্মান চিত্রকরের নামই সকলের আগে করতে হয়। এঁরা হলেন I. A. Thiele (১৬৮৫-১৭৫২) এবং V. R. Carierra (১৬৭৫-১৭৫৭)। এঁরা দুজনই পাস্তেল চিত্রপদ্ধতিকে সফলতার চরম অঙ্কে উপস্থিত করেন। এ শিল্প শুধু জর্ম্মনীতেই আবদ্ধ ছিল না—পাস্তেলের প্রভাব ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রপীঠেও বিস্তৃত হয়। ফ্রান্সের শিল্পীগণও এর ব্যবহার সুরু করে।

পাস্তেলচিত্রে উপকরণের বিপুলতা নেই। কতগুলো রঙীন crayon এর প্রয়োজন, তা ছাড়া কিছু রঙীন কাগজ, ক্যানভাস বা mill board হলেই কাজের পক্ষে যথেষ্ট।

বিস্ময়ের বিষয় তেল-রঙ বা জল রঙে যা' সম্ভব নয় পাস্তেল রচনা তা' সম্ভব করেছে। তেল-রঙ ব্যবহারের তুলনায় পাস্তেল রচনা অনেক সোজা। বার বার রঙ দেওয়া বা সব মুছে রঙ বদ্‌লান এক্ষেত্রে সম্ভব। এরূপ সুযোগ অন্য পথে শিল্পীরা পায় না। কাজেই প্রতিভাবান প্রত্যেক শিল্পীর হাতে এই technique টা অনেকটা রঙের তাসের মত। তা ছাড়া রঙের নানা gradation – হালকা বা গভীর সবই Crayon এ পাওয়া যায়—সেজন্য বিন্দুমাত্র ভাবতে হয় না। এক একটি Crayon-এর বাক্সে প্রায় পঞ্চাশটি রঙের কাঠি থাকে। সেগুলি প্রত্যেক রঙেরই (hard, medium ও soft) গভীর, মধ্য ও হালকা অবস্থার তারতম্য হিসেব করে' তৈরী করা হয়। আবার এজন্য আঁকবার কাগজ কাঠ ও ক্যানভাসও নানারঙের পাওয়া যায়। ধূসর, গেরুয়া, ফিকে হলদে, ও সবুজ রঙের কাগজ সব সময় তৈরী থাকে।

তেল রঙের তুলনায় এর সুবিধে হচ্ছে যে যখন তখন এর যে কোন একটি রঙ তুলে অন্য রঙ দেওয়া চলে এবং এমনি করে' রঙ মেশানও সহজ হয়। তা ছাড়া হাতে pastel নিয়ে চিত্রাঙ্কন অতিদ্রুত সম্পন্ন করা যায়। একবারের sitting-এ একটা ছবি নিপুণ শিল্পীর হাতে অনায়াসে সম্পন্ন হয়। আর একটি সুবিধা হচ্ছে যখন তখন এর কাজ সুরু করা যায় বা বন্ধ করা সম্ভব; যে কোন অবস্থায় এ কাজে হাত দেওয়া যায়। চট্ করে একটি জিনিষের রঙীন প্রতিরূপ নিতে হলে pastel প্রথাই একমাত্র উপায়। কোন রসিক লোক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "It is easy to copy nature where it is necessary to seize fugitive effects of light and shade" অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্যের চলন্ত ও চঞ্চল অবস্থায় নানা পলাতক আলো ও ছায়ার আলঙ্কারিক শ্রীকে সহজে ও দ্রুত চিত্রার্পিত করা শুধু pastel প্রথাই সম্ভব করে।

অথচ দ্রুত কার্য্যসিদ্ধিই এর একমাত্র আকর্ষণ নয়। জল রঙ অপেক্ষা এর সাহায্যে সূক্ষ্ম, নিপুণ ও পেলবতর বর্ণসুষমা ফলিত করা যায়। ফ্রান্সে Boucher, Watteau Greuze প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের পাস্তেল চিত্র অতি চমৎকার। এগুলি যেন রঙের অরুদ্ধ স্বপ্ন! তিনটি শিল্পীকে এ প্রথার শীর্ষস্থানীয় বলা হয়—তাদের নাম হচ্ছে Nattier (1685-1766), Chardin (1699-1779) ও Q. Tour (1704-88)। বস্তুতঃ ফ্রান্সেই পাস্তেল চিত্রের চরম শ্রী উদ্ঘাটিত হয়েছে। ফরাসী ভাবুকতা ও উচ্ছ্বাস কল্পনার কুহককে পাস্তেলের সাহায্যে অমর করেছে। পাস্তেলের রঙ অতি সূক্ষ্ম এবং বর্ণের মিশ্রণে একত্রে এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় শ্রী উদ্ঘাটিত হয়। রঙগুলি পরস্পরের সান্নিধ্যে সহজে নানা বৈচিত্র্যেও ফলিত করা চলে। যে কোন বর্ণ স্তরের বিচিত্র গমকে তুলিকা প্রয়োগ চলে, বর্ণের সীমারুদ্ধ গতি এ চিত্রাঙ্কনে শিল্পীকে ব্যাহত করে না। তুলিকাকে যেখানে তীক্ষ্ণতায় অপরাজেয় মনে করা হয় সেখানেই তার নমনীয়তা ও ছন্দগত আলুলায়িত ঊর্ম্মিভঙ্গ আড়ষ্ট হ'তে সুরু করে। পাস্তেলে রেখার বন্ধনও নেই যাদুও নেই অথচ তাতে আছে আরব্যরজনীর স্বপ্ন। রেখার সহিত সম্পর্ক 'রূপভেদের', 'গতিবেগের' ও 'বর্ত্তনার' (depth)। এর প্রতিটি আবর্ত্তে শিল্পী নিজেকে শৃঙ্খলিত করে অকুতোভয়ে ও আনন্দে। কারণ প্রত্যেকটিই যা নেই এবং দু' dimension এ যা সম্ভব নয় তাই প্রতিফলিত করে জয়ী হয়। কিন্তু রেখার এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সব সময় নিরাপদ নয় কারণ রেখাকে যে তালে চল্‌তে হয় তার শাসন সামান্য নয়। জাপানের চিত্রকলা তুলিকা প্রয়োগের অফুরন্ত হেরফেরে আটকে গেছে—চীনেও তুলিকাপ্রাধান্য রেখা প্রাধান্যে পরিণত হয়েছে। ইদানীং ইউরোপে রেখা ছাড়াও বর্ণের সাহায্যে চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা হয়েছে! তাতে রেখার অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছে। Pastel-এ রেখার প্রতিভাস আছে—অথচ তাকে খুঁজে মুখ্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না—তা' যেন একটা মানসী আলেয়ার মত হয়ে পড়ে। সে যা হোক ছায়াপন্থীদের (Impressionists) 'আবছায়া' রচনার কোন অত্যুক্তির প্রশ্ন Pastel রচনায় উঠে না। পাস্তেলে আছে একটা বর্ণ সুষমার পরীরাজ্য! সীমাহীন বর্ণের কারিগরী pastel রচনায় সম্ভব এবং প্রতিভাবান শিল্পীরা নিরঙ্কুশভাবে তা' দেখিয়েছেন। তাই একজন ইউরোপীয় রসিক বলেছেন "It has qualities of charm, delicacy, refinements and brilliancy of colour!"

এ শ্রেণীর চিত্রের গলদ হচ্ছে সহজেই এসব রচনা ভিজে হাওয়া বা ধোঁয়া প্রভৃতির স্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য pastel রঙকে স্থায়ী করতে হলে Lacaze নামক fixative ব্যবহার করতে হয় এবং ছবিটিকে সুকুমার সৃষ্টির মত স্বচ্ছ কাঁচের আবরণে ঢাকা রাখ্‌তে হয়।

এদেশে প্রধান চিত্রকরদের ভিতর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও pastel-এর সহায়তায় বহু চিত্র এঁকেছেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রাদর্শে রচনার পক্ষপাতী হলেও সার্ব্বভৌম চিত্রপ্রসঙ্গে অজ্ঞ নহেন। তাঁর প্রতিরূপ রচনা হৃদয়গ্রাহী—এ সম্বন্ধে 'বঙ্গবাণী' নামক একখানি পত্রে তাঁর অনুরোধে আমার এক আলোচনা প্রকাশিত হয়। ঠাকুর মহাশয় লেখকের একটি প্রতিকৃতি রচনা করেন pastel-এ। ঘণ্টা দু'তিনের ভিতর রচনাটি সুসম্পন্ন হয়। চিত্রখানির বর্ণসুষমা লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিল। চিত্র রচনার সময় বিখ্যাত চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জোড়াসাঁকোর ভবনে। অবনীন্দ্রনাথকে তুলিকা ও জল রঙের সাহায্যে ছবি আঁকা দেখ্‌বার বহু অবকাশ লেখকের ঘটেছে। সে তুলনায় pastel-এর রচনার সহজ গতিবেগ চিত্তাকর্ষক। এরূপ দ্রুত সম্পাদন ব্যাপারটিকে যেন instinctual করে তোলে। মনের ছন্দ বর্ণে রূপান্তরিত হ'তে এক্ষেত্রে শিল্পীদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

বস্তুতঃ প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে সকল উপাদানই সহজ কারুতার পথে অগ্রসর হতে পারে। একান্তভাবে তেলরঙ বা জলরঙ ছাড়াও ছবি আঁকা চলে। শুধু 'black and white' এ ছবি রচিত হচ্ছে—তা ছাড়া Linocut, etching প্রভৃতিও এ যুগে চিত্রশিল্পের বহু বাতায়ন উদ্‌ঘাটিত করেছে।

শিল্পীদের হাতে উপাদান নানাভাবে মহিমা লাভ করে—কিন্তু তাদের প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। অস্ত্র হিসেবে কোন বিশিষ্ট অস্ত্র প্রয়োগের যেমন অনেক অন্ধিসন্ধি আছে তেমনি প্রত্যেক উপাদানের যথাযথ প্রয়োগের প্রচুর কায়দা আছে। শিল্পী রোদ্যাঁ বলেছে সাধনাতেই সিদ্ধি হয়—বিনা শ্রমে কোন কাজই হয় না। কোন অবলম্বনই তুচ্ছ নয়। সব উপলক্ষ্যের ভিতর দিয়ে অসীমের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য চয়ন করা যেতে পারে! তবে শিল্পীকে নিজের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও সংস্কারের দিক হতে নিজের অস্ত্রশস্ত্র-নির্ব্বাচন করতে হবে।

গত সংখ্যার আলোচনার শিরোনামা ভ্রমবশতঃ 'বহিরঙ্গ উপাদান—জলরঙ' ছাপা হইয়াছে। তাহা 'বহিরঙ্গ উপাদান—তেলরঙ' হইবে।

সাময়িক সাহিত্য

শিশুসাহিত্য

"লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে
ঘিলু যায় ভেসতিয়ে বুদ্ধি গজায় না—"

ছেলেবেলায় ছেলেদের কাগজ 'সন্দেশে' কথাগুলো পড়ে রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে। আলুর সঙ্গে ঘিলুর যে এতোটা সম্পর্ক সুকুমার রায় জানিয়ে না দিলে কিছুতেই তা জানতে পারতাম না আর তা-ও বা কি করে জানতাম যে আলু-ঘিলুর এ সম্পর্কের দরুণই বস্তিরা আলু-ভাতে খায় না! বস্তির সঙ্গে বুদ্ধির ঘোরতর সম্পর্কের কথাটাও সুকুমার রায়ই আমাদের ছোটবেলায় ধ্বনির মিলে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের চার লাইনের এই কবিতাটি বাইশ-তেইশ বছর আগে পড়েছিলাম, এখনো মনে আছে। কেন মনে আছে, যদি নিজেকে প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর পাই—আলুভক্ষণসম্পর্কিত অদ্ভুত নিষেধের দরুণ খানিকটা আর খানিকটা ধ্বনির মিলের দরুণ। ছেলেবেলায় যতটুকু উৎসাহে আমি এ চারটি লাইন আবৃত্তি করেছি আমার মন আজ পর্য্যন্ত ঠিক ততটুকু উৎসাহেই হয়ত কথাগুলো আবৃত্তি করে চলেছে—কাজেই তা ভোলা সম্ভব হয়নি। বয়সের সঙ্গে মন নামক বস্তুটির বিবর্ত্তন হয় সত্যি কিন্তু তার বুনিয়াদটা পাল্টায় না। মনের শৈশব বা শিশুর মন যাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে বিবর্ত্তিত মন তাকে অদ্ভুত বলে বিবেচনা করে কিন্তু এই অদ্ভুতকে গ্রহণ করবার স্বভাব পরিণত অবস্থায়ও মন সহজে দূর করতে পারে না। মনের ঠিক এই অবস্থাটার উপরই সুকুমার রায়ের কারবার—মনের বুনিয়াদী চেহারায় তাঁর রচনাগুলো স্বাভাবিক আর বিচার-বুদ্ধির প্রলেপ নিয়েও মন তাদের স্বাদ গ্রহণ করতে কসুর করবে না। বয়স্ক সচেতন মন তাদের উদ্ভট, অদ্ভুত, ব্যঙ্গপূর্ণ বলে যে আখ্যাই দিক না তারা অবলীলাক্রমে মনের এক পাশে আসর জমিয়ে বসতে পারে। তার মানে আর কিছুই নয়—আমরা যে বয়স্ক হলেও বেঁচে থাকি এ হচ্ছে তারি প্রমাণ কারণ Brancusi-র ভাষায় বলতে গেলে, When we are no longer children we are already dead. তাই মনে হয় মনের কি আশ্চর্য্য পুষ্টিকর খাদ্যই না আবিষ্কার করেছিলেন সুকুমার রায়।

বুদ্ধিবিচারের নিকষে ঘসে যাকে ফালতো মনে হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক বলাই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তাই সুকুমার রায়কে নিয়ে অনেকসময় আমরা অবাক হই—ভেবে পাইনে তাঁর মতো একজন বিজ্ঞান-সেবী কি করে এতো সব আজগুবি কল্পনা করলেন। বিজ্ঞান অন্বয় করে, ব্যাখ্যা দেয়, অর্থ খুঁজে আনে—সত্যি কথা, কিন্তু তার চেয়েও সত্যি কথা এই যে বিজ্ঞানীদের মতো অর্থহীন জগতের সঙ্গে পরিচয় আর কারো বড় একটা হয় না। সেই বাস্তব অথচ অর্থহীন জগতের পরিচয়ে এসে বিজ্ঞানীরা হয়ত বুদ্ধিবিচারকেই ফালতো ভাবতে বাধ্য হন। সাধারণ একটি প্রশ্ন—মনের কোন্ অবস্থাকে আমরা সত্য বলব?—মনের শৈশবকে না কি শিক্ষিত মনকে? মানুষের মনের কাছে যার আবেদন, সেই আর্টের এলাকায় মনের শৈশব আজ অনেকখানি মর্য্যাদা নিয়ে বসেছে। আমার ত মনে হয় বিজ্ঞানসেবী

ছিলেন বলেই সুকুমার রায় মনের শৈশবকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, কেননা বুদ্ধিবিচারে তাকে উপেক্ষা করলেও দেখা যায় তার আসন টলে ওঠেনা, বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দিয়ে তা থেকে যায়, আমরা যাকে অদ্ভুত বলি তাকে গ্রহণও করি—গ্রহণ না করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। একটা বিশেষ অবস্থাই যে ঠিক—তার বিপরীতটা ঠিক নয়, এ ধারণা আর যার মনেই বদ্ধমূল হোক—বিজ্ঞানীর তা হ'তে পারে না। তাই বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব 'আবোল তাবোল' বা 'হযবরল'র জগৎ তৈরী করা। অবৈজ্ঞানিকের জগৎ সীমাবদ্ধ, বৈজ্ঞানিকের জগৎ প্রসৃয়মান। কাজেই বৈজ্ঞানিককে কে থামায়, কে ঠেকায়?

এ কথা আরো কেউ কেউ হয়ত বলে থাকবেন এবং আমিও বলব যে সুকুমার রায়ের রচনাগুলো যদি না থাকত তাহলে মনের একটি স্তরকে উপোসী না রেখে বাংলাসাহিত্যের আর উপায় ছিল না। অথচ এ-সাহিত্যের প্রতিও আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব ঘটেছিল। কয়েক বছর আগেও সুকুমার রায়ের সাহিত্য উপভোগ করবার সহজ সুযোগ বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা পায়নি। ইদানীং যদি সিগ্‌নেট প্রেস তাঁর কয়েকটি বই ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয় করে না তুল্‌তেন—তাহলে আরো কতোদিন যে তিনি সেক্সপীয়রের মতো বিস্মৃত হয়ে থাক্‌তেন তা কে বল্‌বে?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ

রুশো: নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পূর্বাশা লিমিটেড। দাম—এক টাকা দু' আনা।

ইংলণ্ডের চিন্তানায়ক লক্‌-এর মতবাদই অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে তা যে কোনও নির্দিষ্ট রূপ পেতে সক্ষম হয়েছিলো একথা মনে করলে ভুল করা হবে। তার আগের শতকে রাজশক্তির তুমুল পাহারার মধ্যে যে ভাবধারার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো এইবারে তা অবিন্যস্তভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তাই এই সময়কার ফরাসী চিন্তাধারার মধ্যে নানাজাতীয় ভাবের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যাবে। জিন জ্যাক্‌স্ রুশোই সর্বপ্রথম এই বিশৃঙ্খল চিন্তাধারাকে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে বেঁধে দিলেন। সেই যুগের সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে একটি সুস্পষ্ট পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন তিনি, তাঁর মতবাদ বিপ্লবযুগের এবং বিপ্লবোত্তর চিন্তাধারাকে একটি সঙ্গতিপূর্ণ পথে পরিচালিত করেছে।

ইতিপূর্ব্বে ইংরেজী ভাষার মাধ্যম ছাড়া রুশোর মতবাদের সম্যক পরিচয় লাভের কোনো পথই আমাদের ছিলনা, বর্তমান গ্রন্থে লেখক আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করলেন। এ কথা সর্বক্ষণই তাঁর মনে ছিলো যে, বিশেষ কোনও যুগে মানুষের চিন্তাধারার পিছনে যে ঐতিহাসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাজ করে যায় সে সম্পর্কে অবহিত না হলে সে যুগের কোনও চিন্তাধারারই স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এইজন্যেই রুশোর জীবনী এবং মতবাদকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সেইসঙ্গে তখনকার কালের ইউরোপের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিক চিন্তাধারার আলোচনাও তিনি করেছেন। পাঠক-সমাজ আশ্বস্ত থাকতে পারেন—এতে তাঁরা অশেষভাবে উপকৃত হবেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভারতের বনৌষধি—অসীমা চট্টোপাধ্যায়—
নভোরশ্মি—শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার—।০ } বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা

বাংলা ভাষায় তথ্যপূর্ণ বিজ্ঞানের বই খুব বেশী নেই। অথচ আধুনিক সভ্য জগতে যেখানে প্রায় প্রত্যেকটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয় সেখানে বিজ্ঞানের বই যদি পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কী? কিন্তু কারণ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হয় না—অভিজ্ঞ লেখক, সাহসী প্রকাশক এবং আগ্রহশীল পাঠক এই তিনেরই অভাব অতি সহজেই আমাদের নজরে পড়ে। শুধু বিজ্ঞানের বই বলে নয়, তথ্যপূর্ণ যে-কোন বিষয়ের পুস্তক সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। কয়েকজন শিক্ষাব্রতীকে জানি যাঁরা বাংলায় তথ্য পরিবেষণ করাকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা এই যে, ইংরেজিতে যখন কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনা হয়ে গেছে তখন পুনরায় বাংলায় তার মর্ম্মানুবাদ ক'রে মিছামিছি পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটবার কোনই সার্থকতা নেই। কথাটা অবশ্য আংশিক সত্য হলেও সে-কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা চলে না এইজন্য যে, তাহলে শুধু মুষ্টিমেয় জনকয়েক শিক্ষাজীবী ও আগ্রহশীল ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণ সেই কল্যাণকর চমকপ্রদ তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যাবে। কারণ এই দরিদ্র দেশের সাধারণ লোকের ইচ্ছা থাকলেও এমন সুযোগ এবং সঙ্গতি নেই যে অন্ন-সংস্থান-চিন্তার পরে মোটা টাকা খরচ করে বিদেশী ভাষায় লেখা দামী দামী বই কিনে মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে। আর তাছাড়া যদি সহজপ্রাপ্য ও সহজ বোধগম্য না হয় তাহলে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে এবং তার ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তার যেটুকু জানবার আগ্রহ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত জ্বলছিল তা-ও যাবে একেবারে নিভে। জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি তাই এমন ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের মত পরিবেষণ করতে হবে যাতে সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে এবং সহজেই বেশ বোঝা যেতে পারে। সেই সঙ্গে মূল্যও যাতে সাধারণের সামর্থ্যানুরূপ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশকে নতুন করে গড়তে হলে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং কাব্য মানুষের অন্তর্লোকে যেমন নীল আকাশের উদার পুলক প্রবাহ এনে দেবে, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানও তেম্নি তাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করবে। এই ধরণের সাহিত্যই আজ একান্ত প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার দায়িত্ব মুখ্যতঃ প্রাদেশিক সরকারের হলেও আসলে বলিষ্ঠ সাহিত্যিক, দরদী প্রকাশকের উপরেই তা অনেকখানি নির্ভর করে। সম্প্রতি প্রাদেশিক সরকার বাংলাভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকপ্রণয়নের জন্যে যত্নবান হয়েছেন এবং জনকয়েক শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছেন শোনা যায়। আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু পাণ্ডিত্য থাকলেই চলবে না—সত্যিকারের সাহিত্যিককে দিয়ে একাজ করাতে হবে। পূর্ব্বেই বলেছি, নীরসভাবে আলোচনা একেবারে নিরর্থক। মন যাঁর কাব্যধর্ম্মী নয়, লেখনী যাঁর স্বচ্ছন্দ গতিশীল নয়, যিনি সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করতে অথবা বিজ্ঞানকে সাহিত্যমুখী করে তুলতে অপারগ, তিনি পণ্ডিত হলেও এবং তাঁর পরিভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেও, আজকের দিনে জনশিক্ষার কাজে তিনি যে কতখানি সাহায্য করতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বিশ্বভারতী অভিজ্ঞ লেখকের প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়ন করে জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অসীমা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারতের বনৌষধি এবং সুকুমারচন্দ্র সরকার-প্রণীত 'নভোরশ্মি' বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত আট আনা সিরিজের এই রকম দুখানি বই।

★তিমিরবরণ
ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
প্রথম থেকেই তিনি সরোদ
শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র
১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে
অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি
ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন
খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে
উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান
করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা,
বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ
করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী
মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা
করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের
একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমির-
বরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-
সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা
প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতা
সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।
চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের
অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের
তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের
ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে
অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 289

সহজ সাবলীল গতিতে লেখা অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের বনৌষধি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমি প্রয়োজনীয়—প্রত্যেক ঘরে রেখে দেবার মতন বই। বিভিন্ন ওষধি-বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম, দেশীয় নাম ও চিত্রপরিচিতি প্রদত্ত হওয়ায় এবং তাদের সংস্থিতি ও ব্যবহার-প্রকরণ লিপিবদ্ধ থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইখানি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হবে। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি কিভাবে বনৌষধির আবিষ্কার-প্রচেষ্টা ও গবেষণা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে-সম্বন্ধে লেখিকা-প্রদত্ত বিবরণীটি সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে তোলে।

মাত্র ৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে সুকুমারচন্দ্র সরকারের নভোরশ্মি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি পরিবেষণের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করতে হলে ফলিত বিজ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাই এমন পারস্পরিক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটিরই প্রভাব এমন গভীর ও ব্যাপক—যে, আজকের দিনে এ দেশের পাঠক সাধারণ এসব বিষয়ে সম্যকরূপে অবহিত না হলে অন্যান্য স্বাধীনদেশের নরনারীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারবে না। আজ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে কেবল গবেষণাগারের মধ্যে নিবদ্ধ রাখলে চলবে না—সাধারণের গোচরীভূত ও সহজলভ্য করতে হবে। নভোরশ্মির উৎপত্তি-প্রণালী সম্বন্ধে যদিও আজও সঠিক কিছু জানা যায়নি, তথাপি নভোরশ্মি কী, কিভাবে দেশান্তরভেদে তার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে, পরমাণু বিস্ফোরণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কতখানি, কেমন করে নভোরশ্মির আবিষ্কার ঘটেছে, কোন দেশে কে কতখানি গবেষণা করেছেন, এইসবের সচিত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ অতি সুন্দরভাবে বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্থানে স্থানে পরিভাষার আতিশয্যে সাধারণ পাঠকের বোঝবার পক্ষে হয়ত কিছুটা বিভ্রম বা ব্যাঘাত ঘটতে পারে, কিন্তু মুখবন্ধে লেখক বলেই রেখেছেন যে যাঁদের পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সামান্যকিছু জ্ঞান আছে অথচ নভোরশ্মির বিষয়ে জানবার সুযোগ ঘটেনি, বইখানি মুখ্যতঃ তাঁদেরই জন্যে লেখা। মনে হয় লেখক যদি অ্যাল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিনপ্রকার রশ্মি সম্বন্ধে প্রথমে আরো খানিকটা বিস্তৃততর আলোচনা করবার পরিসর পেতেন এবং nuclear transformation বা পরমাণুর বিস্ফোরণ সম্বন্ধে গোড়ায় আর একটু গুছিয়ে আলোচনা করতেন তাহলে নভোরশ্মির স্বরূপ বোঝা আরো সহজ হত।

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

পতাকা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র : পূর্বাশা লিঃ : দাম—দুই টাকা।

"পতাকা" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগ্রন্থ। ইতিপূর্বে পূর্বাশাতেই তাঁর অন্য দু-তিন খানা পুস্তকের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্লটের দৃঢ়সংবদ্ধতা, সংলাপ রচনার কৌশল এবং সর্বোপরি তাঁর লেখক-মনের স্বাভাবিক ঝোঁকটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা হয়েছিলো। তাতে একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়েছে যে, যে মানসিকতা নিয়ে নরেনবাবু জীবনকে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁর ঐ প্রতিফলন-শক্তির অমোঘতা সম্পর্কে তাঁরা একমত।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি। নরেনবাবু আসলে সেই গোষ্ঠীভুক্ত লেখক যাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর সার্থকতা সম্পর্কে পাঠকের মনে মূলগত একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। তবু রচনার সর্বত্র শিল্পনৈপুণ্যের আমেজ থাকার ফলে রসগ্রহণে সামান্যতমও বাধা আসেনা। আমাদের রক্তস্রোতের মধ্যে কোথায় কোন ফাঁকী আত্মগোপন করে রয়েছে, কতো দৃঢ় অঙ্গীকার ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছে

আমাদের মধ্যে, বল্‌লে ভুল হয়না, নরেনবাবু মুখ্যত: তারই কাহিনীকার। ফাঁকীর কাহিনী, –তবু তারই বর্ণনার মধ্যে নরেনবাবুর আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

"পতাকা"র মধ্যেও নরেনবাবুকে যদি শুধুমাত্র সেই দক্ষ-বর্ণনাকার হিসেবেই পেতাম আপত্তি করবার কিছুই থাক্‌তোনা। তাঁর বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আপত্তি থাক্‌লেও তিনি যে এত মনোহর করে বল্‌তে পারছেন তাতেই খুশী থাক্‌তাম। কিন্তু "পতাকা" গল্পগ্রন্থে, বোধ হয় এই সর্বপ্রথম, অন্যতর পটভূমিকায় তাঁকে এক বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখা গেল। এখানে তিনি এক মমতানিষিক্ত শিল্পী। এই নতুন পরিচয়ে পাঠকসাধারণ আরো একান্তভাবে তাঁকে চিনে নিতে পারবেন।

"পতাকা"র সমস্তগুলি গল্পই আমার সমস্ত দিক থেকে ভালো লেগেছে, তার মধ্যে "নাম" গল্পটিকে সকলের থেকে ভালো লাগ্‌লো। রসো থেকে রসমঞ্জরী—নিছক নামান্তরমাত্র নয়, রসো-ঝির মনের নিভৃত কোণটিকে নরেনবাবু মমতাপূর্ণ একটি অব্যর্থ মোচড়ে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

শুধুমাত্র কুশলী শিল্পীহিসাবেই নরেনবাবুকে জান্‌তাম—"পতাকায়" তাঁকে সার্থক শিল্পী হিসেবে জানবার সুযোগ হলো।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সংকলন

দিগন্ত : সম্পাদক—অজিত দত্ত : দাম—২৲ টাকা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎকালটা বাংলাদেশে একটা অনুকূল মরশুম। নতুন নতুন সাময়িক পত্রিকা আর সংকলনে চোখের সামনে ভরে উঠ্‌তে থাকে বইয়ের ষ্টলগুলি; বই কেনা যাদের ধাতে নেই, এই সময়টাতে তাঁরাও ঝোঁকের মাথায়, আর কিছু না হোক্, দু চারখানা দৈনিকপত্রের শারদীয়া সংখ্যা কিনে ফেলেন।

শরৎকালীন সাহিত্য বল্‌তে তাই শারদীয়া সংখ্যা আর সংকলনকেই বোঝায়। মুখ্যত: বোঝায়। এগুলির মাধ্যমে খুব যে একটা কিছু উঁচু মানের সাহিত্য পরিবেশন করা হয় তা নয়, প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো ভালো লেখকের খারাপ খারাপ লেখা মোটাহাতে পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

"দিগন্ত"ও একটি শারদীয় সংকলন, তবু তার ব্যতিক্রম। অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত কয়েকজন লেখকের কয়েকটি পরিচ্ছন্ন রচনাকে যে নিপুণ হাতে এখানে একত্রিত করা হয়েছে তাতে সম্পাদকের মর্যাদাসম্পন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে। "দিগন্তে" প্রবোধ সান্যালের "পুতুল", অচিন্ত্যকুমারের "বিড়ি" এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "এপিঠ ওপিঠ" কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প। বহুদিন পরে এখানে সন্তোষকুমার ঘোষেরও একটি গল্প পাওয়া গেল। এবং গল্পটি ভালো। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের "পুরোনো পরিচয়" কবিতাটিতে একটি দৃঢ়, তবু যেন বেদনাম্লান, মনের পরিচয় রয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ-কবিতাটিই ভালো লাগ্‌লো। প্রবন্ধাংশে ধূর্জটিপ্রসাদের "সঙ্গীত ও ভাব", অন্নদাশঙ্করের "রস আর রূপ", সঞ্জয় ভট্টাচার্যের "নজরুল ইস্‌লাম" ও নারায়ণ চৌধুরীর "বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা" পড়ে সকলেই তৃপ্ত হবেন। শৈলজানন্দ সম্পর্কে অনিল চক্রবর্তীর আলোচনাটি উল্লেখ করবার মতো। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্য যাঁদের হাতে নতুন নতুন পথে মোড় নিয়েছে তাঁদের নিয়ে এরকম আরো আলোচনা হওয়া দরকার।

কিন্তু সংকলনটিতে অজিতবাবুর নিজের রচনাই কেন অনুপস্থিত তার জন্য তাঁর কৈফিয়ৎ কি?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

পৌষ—১৩৫৪

পূর্ব্বাশা, পৌষ ১৩৫৪

নর্ত্তকী
(টেম্পেরা)

শিল্পী :
উমারঞ্জন দত্তগুপ্ত

দশম বর্ষ ● নবম সংখ্যা

পৌষ ● ১৩৫৪

লেনিন আমল থেকে ষ্টালিন আমল

ভিক্টর সার্জ্

মার্চ—১৯১৭

নেতৃত্বহীন বিপ্লব

আজ আমার মনে হয় রুশ-বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরটা সম্পূর্ণতই লেনিন আর তাঁর দলের নির্জলা সততায় ভরপুর ছিল। তাই হয়ত সবাই আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি—কেউ জাতিগত পার্থক্যের বা মতানৈক্যের বালাই রাখিনি। ১৯১৭-তে স্পেনে একটি সশস্ত্র দলের সঙ্গে আমি রুশবিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম—সেদিনেই তারা বার্সিলোনা দখল করে একটি নূতন কম্যুন স্থাপন করবার কথা বলছিল--(জুলাই মাসে একদিন আমরা দেয়ালে-দেয়ালে তার প্রোগ্রামও এঁটে দিয়েছিলাম)। সলভেডর সেগুই—সি-এন্-টির (C.N.T.) একজন প্রতিষ্ঠাতা আমাকে বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন বলশেভিকবাদ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে আশঙ্কার আর আশার বস্তু। আমার উপন্যাস 'নেস্ত্ঁ ড নোতর কোস'-এ আমি সেগুইকে যথাশক্তি আঁকতে চেষ্টা করেছি। (আমাদের এ আলাপের দুবছর পর তাঁকে হত্যা করা হয়।) আমরা মার্ক্সবাদী ছিলাম না। কিন্তু লেনিনের কথায় যে ভাঙাচোরা ধ্বনি এসে আমাদের কাছে পৌঁছত তার সঙ্গেই নিজেদের মনের আশ্চর্য্য মিল খুঁজে পেতাম।

"বলশেভিকবাদ—" আমি বলেছিলাম : "মানে কথার আর কাজের মিল। লেনিনের ওটাই গুণ যে তিনি প্রোগ্রাম মাফিক কাজ করেছেন ··চাষীকে জমি দেওয়া, মজুরশ্রেণীকে

কারখানা দেওয়া—যারা শ্রমজীবী তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এসব কথা কতইত বলা হয়েছে কিন্তু কথাটাকে যে কাজে পরিণত করতে হবে তা কেউ সত্যি করে ভাবেনি। মনে হয় লেনিন ভাবছেন—"

সেগুই ঠাট্টার আর অবিশ্বাসের সুরে বললেন: "তুমি কি বলতে চাও সমাজতান্ত্রিকরা প্রোগ্রাম মাফিক কাজ করতে চলেছে? কোনোদিন তা দেখা যায়নি—"

আমি বুঝিয়ে বললাম ঠিক এ-ব্যাপারটাই রাশিয়ায় হতে চলেছে। পশ্চিমী সংবাদপত্র-গুলো প্রচণ্ড অজ্ঞতায় আর খেলোমিতে ভেবে চলেছিল যে রুশবিপ্লব আধা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হবে কিন্তু রুশ জনসাধারণের ব্যাপক দুর্দ্দশা পাশবিক নির্য্যাতনে এমনি তীব্র হয়ে উঠ্‌ল যে তাদের সাম্‌নে সমস্ত মৌলিক সমস্যা এসে উপস্থিত হল—জমি, শান্তি এবং ক্ষমতা—এ তিনটি বস্তুর মুখোমুখি এসে তারা দাঁড়াল। একটা আপোষহীন যুক্তি হাজার হাজার মানুষকে কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, অবশ্য পদ্ধতি বা লক্ষ্যস্থল সম্বন্ধে তাদের কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিলনা। তারা কি পারবে? প্রশ্ন ছিল তা-ই। সঙ্কটের মুহূর্ত্তে জনসাধারণ এমন নেতা পায়না যাঁরা অবিচলিত চিত্তে তাদের স্বার্থ, আশাআকাঙ্ক্ষা বা শক্তিসামর্থ্যের কথা বলতে পারে। যাঁরা সংস্কৃতিবান্ মানে বিত্তশালী শ্রেণী তাঁদের জন্যে প্রতিনিধি, বিবেকবান পথপ্রদর্শক, সুপরিচারক যথেষ্ট পরিমাণে জুটে যায়—দরকার মতো জনসাধারণ থেকে লোক টেনে নিয়ে তাঁরা এসব কাজে ভর্ত্তি করিয়ে দেন। দরিদ্রশ্রেণী লোকসম্পদে দরিদ্র—তাদের একটা বড় ট্রাজিডি তা-ই। ১৮৭১-এর পারী কম্যুন অযোগ্য নেতৃত্বে সংঘর্ষ চালাতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়িয়েছে—বিপ্লবীদের একমাত্র যিনি পথ দেখাতে পারতেন সেই ব্ল্যাঙ্কি তখন 'তরু'-র অন্ধকারায় অবরুদ্ধ। ১৯৩২-এ যদি জার্ম্মাণ শ্রমিকশ্রেণীর পাশে রোজা লুক্সেমবার্গের তীক্ষ্ণধী আর কার্ল লাইবনেক্টের বিপ্লবী আবেগ এসে দাঁড়াতে পারত তাহলে তারা নাৎসীঅভ্যুত্থানের সাম্‌নে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করত না। তাহলে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অজস্র পশ্চাদপসরণ আর কম্যুনিষ্টদের শোচনীয় পায়তাড়া কষাও আমাদের দেখতে হতনা।

এমন সময় আসে যখন জনসাধারণের একটি লোক পাওয়া দরকার—হয়ত দরকার কয়েকজন লোকেরই। 'একটি এবং কয়েকজন' দু'টো কথাই আমি বল্‌লাম কারণ একটি লোকের পেছনে যদি এমন কয়েকজন কর্ম্মঠ লোক না থাকে যারা বিশ্বস্ত এবং সে-ও যাদের বিশ্বাসভাজন—মোটের উপর যদি একটি দল গড়ে না ওঠে তাহলে সে লোকটি বল্‌তে গেলে শক্তিহীন। একটি দল, একজন ধীসম্পন্ন ব্যক্তি, আর একটি ইচ্ছা—এই তিনে মিলে ইতিহাস তৈরী করতে পারে। কিন্তু সমাজে যদি এভাবে জমে উঠ্‌বার উপাদানগুলো না থাকে তাহলে পাওয়ার ঘরে শূন্য পড়ে যায়; সংস্কারবাদ এসে বিপ্লবকে অন্ধগলিতে ঢুকিয়ে

দেয়—অনর্থক রক্তপাত হয়। ১৮৪৮-এর বিপ্লব য়ুরোপের কোথাও ফলপ্রসূ হয়নি। সম্প্রতি (একটা কেতাদুরস্ত অর্থহীন কথা বল্‌তে গেলে) খানিকটা বীরত্বব্যঞ্জক রহস্যের উদ্ভব হয়েছে—একদিকে পরিকল্পনার রহস্য—অপর দিকে নেতৃত্বের এবং হিংসাত্মকতার রহস্য। পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যায়, নেতা যান চুপসে আর বহুবিঘোষিত হিংসাত্মকতা কাকের উচ্চ কোলাহলে পর্য্যবসিত হয়।

গোড়ার দিকে রুশবিপ্লব আন্তরিক প্রয়োজনে চমকপ্রদ হলেও বাইরের দিক থেকে শোচনীয়ভাবে অসহায় হয়ে পড়েছিল। পেট্রোগ্রাডের সুতাকলের শ্রমিকরা যেদিন ধর্ম্মঘট করে—এবং সে ধর্ম্মঘট একমাসের কম সময়ের মধ্যে রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটায়—সেদিন রাজধানীস্থ বলশেভিকদলের জেলাসমিতি ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ জারী করেছিল। যেইমাত্র সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছিল—এই সেনাদ্রোহই সাম্রাজ্যের অবসান করে—সেই বিপ্লবীদল দুরুদুরু বুকে ভেবে দেখ্‌তে সুরু করল, ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া যায় কি না। বিভিন্ন দলভুক্ত বিপ্লবীরা সারাজীবন বিপ্লবের জন্যে তৈরী হয়েও তখন বুঝতে পারছিলেন না যে বিপ্লব আসন্ন—তার জয়যাত্রা সুরু হয়ে গেছে। ঘটনাস্রোতে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা সময়ের মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে জনতায় গা ভাসিয়ে দিলেন। হঠাৎ দেখা গেল—সাম্রাজ্য নেই, মন্ত্রীসভা নেই, জার আর নেই। আভ্যন্তরীণ-সচিব, কম্পিতাধর এক অশীতিপর বৃদ্ধ, টোরাইড প্রাসাদে একজন লোককে সমাজতন্ত্রী মনে করে তার সার্টের হাতা টেনে ধরলেন। সমাজতন্ত্রী জিজ্ঞেস করল: "আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, বলুন?" "আমি প্রোটোপোপোভ্‌। তোমায় অনুরোধ করছি—আমাকে গ্রেফ্‌তার কর..."

রাশিয়ায় বুর্জ্জোয়া ছিল অল্পসংখ্যক, তাছাড়া অর্থনৈতিক পদস্থতার দরুণ জনসাধারণ থেকে তারা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—তাদের আর রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা বেঁচে রইলনা। সেসময় (পুরানো রুশদিনপঞ্জী মতে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমী দিনপঞ্জী মতে মার্চ্চ) যদি শ্রমিক-সৈন্যের প্রথম পরিষদে—প্রথম সোভিয়েটগঠনের বিশৃঙ্খলতায় লেনিন বা ট্রট্‌স্কির মতো কেউ থাক্‌তেন—একটি পরিচ্ছন্ন মন—এ বিরাট আলোড়নেও যার দৃষ্টির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় না, কিংকর্ত্তব্যজ্ঞান সজাগ থাকে, স্পর্দ্ধায় উদ্ধত এমন কোনো অসাধারণ মন যদি সেখানে থাকত সেসময়, রাশিয়া হয়ত একটি বিপ্লবের ভেতর দিয়েই তার কর্ম্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে আনতে পারত। সব কিছুরই কেন্দ্রভূমি ছিল সেদিন সোভিয়েটগুলোর শক্তি। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ ছিলনা। দেড়শ হাজার সশস্ত্র মানুষ—মানে সমগ্র সৈন্যশিবির—আর পাঁচ লক্ষ শ্রমিক সেদিন সোভিয়েট-ডিপুটিদের কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনেনি। কিন্তু তাদের বক্তা ছিল তিনটি প্রতিপত্তিশালী দলের সমাজতন্ত্রীরা—সোশ্যাল রিভলিউশনারী, মেনশেভিক সোশ্যাল ডেমোক্রাট, আর বলশেভিক সোশ্যাল ডেমোক্রাট তিনটি দলেরই সুর ছিল নরম, মানে

ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত করবার মতো কারো বুদ্ধির শক্তি ছিলনা, সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

কতো ঐশ্বর্য্য সে-মুহূর্ত্তগুলোর—তবু ক্ষমতাহস্তান্তরের সমস্যা নিয়ে কি রকম হাস্যকর কথাবার্ত্তাই না চলছিল। সব সমাজতন্ত্রীই ক্ষমতাত্যাগ ব্যাপারে অভিন্ন হয়ে উঠ্ল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকেল দুটোয় যখন পুরোনো শাসনব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে তখন উদার বুর্জ্জোয়া দলের দক্ষ রাজনীতিবিদ মিলিউকভ্ ভাবলেন, কি যে হবে কেউ বলতে পারেনা কাজেই অস্থায়ী সরকার তৈরী করা বড় বেশি তাড়াতাড়ির কাজ হবে। অপেক্ষা করে লক্ষ্য করা যাক্। ঝড়ের মুখে বুর্জ্জোয়ারা ক্ষমতা ত্যাগ করল। মার্চ্চের পয়লা তারিখ সোভিয়েটের নবজাত কার্য্যকরী সমিতি কোনো কর্ম্মসূচীর নির্দ্দেশ না দিয়ে বুর্জ্জোয়াদের একটি শাসনতন্ত্র গঠন করতে অনুরোধ জানালেন। আসলে ক্ষমতাগ্রহণে বীতস্পৃহ বলেই সমাজ-তন্ত্রীরা প্রচারের স্বাধীনতা ছাড়া নিজেদের জন্যে আর কিছু চাইলেন না। প্রচারের স্বাধীনতা সত্য বলতে রাশিয়ায় আর সাইবেরিয়ায় একটি নতুন বস্তুই ছিল।

সমস্ত যুগের সমস্ত মানুষের পক্ষে বীতস্পৃহার চমৎকার উদাহরণ! সমাজতন্ত্রীদের নিজের হাতেই সব ক্ষমতা রয়ে গেছে, আন্দোলন চালাবার স্বাধীনতা কাকে দেওয়া হবে না-হবে সবই নির্ভর করছে তাদের উপর আর তারাই কি না নিজেদের 'শ্রেণীশত্রু'র হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতির সর্ত্ত করল যে আন্দোলন চালাবার স্বাধীনতাটুকুমাত্র তাদের দেওয়া হোক! রোড্জিয়াঙ্কো টেলিগ্রাফ অফিসে যেতে ভয় পেয়ে খেইড্জি এবং সুখানভকে বল্ল: "তোমাদের হাতেই ক্ষমতা—তোমরা আমাদের গ্রেফ্তার করতে পার।" ওঁরা উত্তর দিলেন: "ক্ষমতা নিয়ে যাও কিন্তু প্রচারের জন্যে আমাদের গ্রেফ্তার করোনা।" পাছে বুর্জ্জোয়াদল তাদের এই সর্ত্তে ক্ষমতা গ্রহণ করতে রাজী না হয় সে ভয়ে সুখানভ একটি চরমপত্রে শাসানি পাঠালেন: "প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা ছাড়া আর কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না···একটিমাত্র পথ আছে—আমাদের দাবী মেনে নাও।" অন্য কথায়—কর্ম্মসূচী গ্রহণ করো, যা তোমাদেরই কর্ম্মসূচী; তার জন্যে তোমাদের হয়ে জনসাধারণকে দমন করবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি—যে-জনসাধারণ আমাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। হায় প্রাকৃতিক শক্তির দময়িতা! (ট্রট্স্কি-কৃত 'রুশবিপ্লবের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ড—১৭১-২ পৃঃ)

উদারপন্থীরা এই মৃদু জবরদস্তিতে কাৎ হলেন—তাঁরা অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। তখনও তাঁরা রাজতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা-অর্পণের আশা করছিলেন, ভাবছিলেন তা-ই আইনসম্মত কাজ হবে; রাজবংশটিকে বাঁচাবার চেষ্টা ছিল তাঁদের। ক্ষমতা-ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। দ্বিতীয় নিকোলাস গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন—গ্র্যাণ্ড ডিউক ক্ষমতা অর্পণ করলেন সমস্যামূলক শাসনপরিষদের হাতে। (ক্রমশঃ)

কবিতা

ধানশীষ

অজিত সেন

আকাশগংগায় স্নান করে নেবে চল
ধানশীষ ঢেউ-এ ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান—।
মাটির গন্ধে ঠাণ্ডা সবুজ ঢেউ।
মনেকি রেখেছ কেউ
এই ধানশীষে ধুকে ধুকে কত নিবেছে ক্ষুধার প্রাণ ?
এই ধানশীষে অজুত উপোসী প্রেত।
হায়রে সোনার ক্ষেত !
শত শতকের দস্যু যাহারা
ইতিহাসে গেছে মিশে,
তারা এই ধানশীষে।

আকাশগংগায় স্নান করে নেবে চল
ধানশীষ ঢেউ-এ ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান।
এখানে ফলেছে অযুত লক্ষ প্রাণ—
গণদেবতার প্রাণ।
কালের কঠোর বিদ্রূপ ক্ষুরধারে
পংগপালের পক্ষ ছেদন করে
কানায় কানায় ভরে ওঠে আজ প্রাণসূর্যের আশিস—
এই সব ধানশীষ।

আকাশগংগায় স্নান করে নেবে চল
ধানশীষ ঢেউ-এ ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান।

রাতের শিশিরে এখানে ফুটেছে
আগামী দিনের প্রাণ—
লক্ষ ভরাট প্রাণ।
এই সব ধানশীষ।

নিঃশব্দ

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আলো হয় মেঘ, সূর্য আকাশে বোনে
মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলোর কুসুম। মনে
কাঁপে থরথর মেঘের মতন কথা,—
মেঘ ছোঁওয়া দিলে আমরা প্রেমের কথা
মনে মনে বলি নিঃশব্দে অনাবিল।

কী আশ্চর্য বিকেলের মেঘ নীল!
মেঘের ছায়ায় কী কথা এসেছে মনে
বলা নাহি যায়, বলা নাহি যায়, হায়!
কতো না রঙের মেঘে মেঘে বেলা যায়,
আকাশে আকাশে শেষ হয়ে আসে দিন।

রঙের রেখায় সন্ধ্যার সৌখীন
আঁধারে আলোর কালোর মূর্ছনায়
বেলা যায়, বেলা যায়।
কালো হয় মেঘ, মেঘের ছায়ায় নীল
আলো আর রঙ তারায় তারায় ঝরে।
মনের আকাশে কথার শ্রাবণ ঝরে
নিঃশব্দে অনাবিল।

সঙ্কেত

চিত্ত ঘোষ

এক একটি দিন—
খসে যায়, ঝরে যায়
অন্ধকারে মুছে যায়—পরিচয়হীন।

কৃপণ সূর্য্যের দান পৃথিবী গ্রহণ করে তবু :
বেদনার বাষ্পমেঘে বারিবিন্দু ঝরে না ত কভু—
দ্বিধাহীন
তার পরদিন,
অবাধ রোদের বান মুঠো মুঠো আবীর ছড়ায়
দিনের আলোর স্বপ্নে অরণ্য পাহাড় ডুবে যায়।
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জমাট বরফ গলে, শ্যাম সমতলে,
গান বাজে ঝরণার জলে,
নীলিম আকাশে ভাসে শুভ্র লঘু মেঘ
বাষ্পহীন, উদাসীন, শান্ত নিরুদ্বেগ
দক্ষিণের মন্থর হাওয়ায়,
স্থবির দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে যায়।

কতটুকু দিন।
তারপর রাত :
তারার আকাশে ওঠে চাঁদ
নিয়ে আসে একরাশ রাত্রির বিষাদ।

লাল নীল প্রজাপতি—বিচিত্র রঙিন
অতীতের সেই সব রোমাঞ্চিত দিন,
স্মৃতির আতর মেখে গায়
মনের দুয়ারে তবু আনাগোনা করে লঘু পায়।

মূক তারা গড়েছিল জীবনের দীর্ঘ পিরামিড :
তারা যেন এক একটি পাথরের ইঁট—
জীবনকে গড়ে তোলে

জীবনকে ভয়ে ভোলে
জীবনের সব ভোলে
তবু সৌধ নির্ম্মাণের সোপানে সোপানে উঠে যায়
তারপর অন্ধকারে কোথায় হারায়।
সূর্য্যের মৃত্যুর শেষে দিনগুলো কোথায় হারায়!
যেখানে অনেক দিন জমা হয়ে আছে,
সমুদ্রে, পাহাড়ে, বনে পত্রহীন গাছে
স্মৃতির ফসিল আর অগণিত নিশ্চল কঙ্কাল—
তারা যেন রূপান্তর—বনে বনে শাল, শিশু, তাল।
মাঝে মাঝে মর্ম্মর নিঃশ্বাসে,
শব্দহীন মধ্যরাতে নির্জ্জন বাতাসে
অপমৃত সেদিনের প্রেত
তারা যেন দিয়ে যায়
অন্ধকার ভবিষ্যের কোন সূক্ষ্ম দুরূহ সঙ্কেত।

স্বর্ণায়ু সূর্যের ঘর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সোনা দিয়ে মন গড়ি, সোনা দিয়ে প্রেম,
খনি থেকে সোনা তুলে আশা বানালেম।

ছিলো এক যাযাবর বুকের ভেতর,
বল্‌লো সে, "বানাও তো সোনা গুড়িয়ে
আকাশে উড়িয়ে দেওয়া রাঙা আলো-ঝড়।"—
সে ঝড় বানাতে দেখি সব সোনা গেল ফুরিয়ে।

তবু সোনা ফুরোয় নি, তবু সোনা আছে,—
আকাশের সূর্য তো তাই নিয়ে বাঁচে।...
থেমে গেলে ঝড়
চুপি চুপি সেই দেখি সোনা কুড়িয়ে
রাতারাতি গ'ড়ে তোলে প্রেমের বাসর :
আকাশে আমার মন, আকাশে আমার আশা দিলো তার প্রাণ-জুড়িয়ে।

আর্ট ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মানুষের ইতিহাস ঘেঁটে যেমন প্রমাণ করা যায়, আর্ট চিরকালই সামাজিক আবার ইতিহাসেই এমন প্রমাণের অভাব নেই যে অনেকসময়ই আর্ট সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলেছে। এই বিরোধাত্মক ব্যাপারে আঁৎকে ওঠবার কারণ নেই, কেননা মানুষের ইতিহাস কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা সুরু করেনি—ইতিহাসের যাত্রার পেছনে কোনো মহামনের বা মহামতির ইঙ্গিত আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। মহামন বা মহামতিরা তাঁদের প্রয়োজন-অনুসারে ইতিহাসের মহাসমুদ্র থেকে তত্ত্বরত্নাবলী এনে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন—এবং আমরাও একেক সময় একেকটি ঐতিহাসিক তত্ত্বকে মানুষের ইতিহাস বলে নির্ব্বিবাদে মেনে নিই। ইতিহাসে অনেকবার আর্ট সমাজের এবং ধর্ম্মের সংস্পর্শে এসেছে—আবার অনেকবারই নিজেকে পরধর্ম্মের কবল মুক্ত করে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই আর্টকে সামাজিক প্রতিপন্ন করতে ইতিহাসের সাক্ষ্য খুব জোরালো নয়। কিন্তু হাল আমলের সমাজবাদীরা সমাজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এতোই ব্যস্ত যে মানুষের এই ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপটিকেও সমাজের অন্তরঙ্গ বলে প্রচার না করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁদের প্রচারের এলাকায় পৌঁছুবার আগে শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে দেখা দরকার।

শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক রুথ্ বেনিডিক্টের 'প্যাটার্নস্ অব্ কালচার'-বইটি আমাদের অনেকখানি সত্যের সন্ধান দেয়। তিনি বলেন, কোনো সচেতন চেষ্টায় কোনো দেশের বা যুগের শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না—কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি তৈরী হয়না। ছোট একটা বীজ থেকে যেমন বনস্পতির বিকাশ ঠিক তেম্নি স্থানীয় কোনো একটা ধরণকে ধারণ করেই সে-স্থানের শিল্প ক্রমে পুষ্টতর হবার চেষ্টা করে—চারদিকে শিকড় মেলে দিয়ে শুধু নিজ দেহের উপযোগী উপাদানই সংগ্রহ করে নেয়। আর্টের ইতিহাসের প্রতি ঔৎসুক্য থাকলে আমাদের এ ধারণাই হবে যে আর্ট স্বায়ত্তশাসনে শাসিত। সামাজিক গতির স্রোত বা ধর্ম্মপ্রবণতা তার অন্তর্গত হতে পারে একমাত্র তার নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে চিত্রশিল্পে উদ্যোগী দেখে আমাদের একথা মনে করবার যথে

কারণ আছে যে মানুষের মনের শৈশবের সঙ্গেই আর্টের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মনের খানিকটা পরিণত বয়সে সমাজ-বোধের জন্ম হয়েছিল। কাজেই আর্ট নিঃসন্দেহে সমাজ-বোধের অগ্রজ। যে-প্রাগৈতিহাসিক মনে কল্পনার বিচিত্র রূপ আর দৃশ্যমান বাস্তব একাত্ম---সে-মনের সন্তান আর্ট তার রক্তের ঋণ কিছুতেই ভুলতে চায় না। মন পরিণত হয়েছে---চিন্তা, বিচার, যুক্তি, বুদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তার কলেবর—পরিণত মন জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের---আর্টকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে মননের স্পর্শ লাগিয়ে কিন্তু আর্ট তার জন্মপত্রিকা বদল করতে রাজী হয়নি। বিদেহী কল্পনার রাজ্য থেকে গাত্রোত্থান করে মন বাস্তবের সঙ্গে মিতালি করে নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে অনুভব করেছে কিন্তু তখনও আর্ট খুঁজে নিয়েছে মনের সেই অন্ধকার এলাকা যেখানে অবাস্তব বাস্তবের মতোই সত্য। তাই সক্রেটিস্ বলেছেন—'Lyric poets are not in their right mind when they are composing their beautiful strains..."

বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেলে মন অস্বাভাবিক আখ্যা পায়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মনের অধিকারী হয়েও কবি বা শিল্পী অস্বাভাবিক মানুষ নন—তাঁদের সৃষ্টি স্বাভাবিক মনে, সক্রেটিসেরই স্বীকৃতিতেই, সৌন্দর্য্যানুভূতি এনে দেয়। এ থেকে শিল্পীর ক্রিয়াকলাপের খানিকটা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। বিশ্লেষণের ভূমিকায় কয়েকটি প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়। আমাদের জানা দরকার শিল্পীমন অবাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেও বাস্তববাদীর স্বাভাবিক মনের সৌন্দর্য্যলিপ্সা কোন্ উপায়ে চরিতার্থ করতে পারে। স্বাভাবিক মন বলে আমরা যাকে জানি তাতেও কি খানিকটা অস্বাভাবিকতার এলাকা আছে? না কি শিল্পীই এমন শক্তির অধিকারী যে অবাস্তবকে তিনি বাস্তবের এলাকায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন? এসব প্রশ্নের কোনো নির্ভরযোগ্য উত্তর বহুদিন কেউ দিতে পারেন নি—সক্রেটিস্ বা সেক্সপীয়র, দাভিঞ্চি বা রেঁব্রাঁ, সেণ্ট বা যোগী কেউ আমাদের মনের চেহারা সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা পরিবেশন করে যাননি। মানসলোকের বাসিন্দারা মানসলোকের খবর দিলেও তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানসলোকের খানিকটা পরিচয় পেয়েছি আমরা খুব সম্প্রতি—সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের কাছে।

ফ্রয়েড মনের যে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন তা থেকে আর কিছু না হোক শিল্পীমন সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মে। ইদ্, ইগো আর সুপার ইগোর এলাকা নিয়েই, ফ্রয়েডের মতে, মনের সম্পূর্ণ চেহারা তৈরী। ইদ আর সুপারইগো দুটি দুই বিপরীত প্রান্ত জুড়ে আছে—মনের গভীরতম প্রদেশে ইদের রাজ্য, সেখান থেকে বিধিনিষেধ-স্থানকালহীন সংপ্লবী প্রাণশক্তি উচ্ছৃত; আর সুপার ইগোর আসন পাতা মনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রদেশে আত্মদর্শন, বিবেকবোধ, আদর্শবাদের শুভ্র উচ্চতায়। ইদের প্রদেশ বহির্জগত থেকে

আলাদা হয়ে আছে ইগো-শাসিত অঞ্চলের ব্যবধানে—অসূর্য্যম্পশ্যা ইদ তাই ইগোর মারফৎই বহির্জগতের সঙ্গে কারবার চালায়। ইদ আর ইগোই মনের সহজাত এলাকা—সুপার ইগো তার সঞ্চিত সম্পদ। ইদ আনন্দতত্ত্বের বাত্যায় তাড়িত আর ইগো বাস্তবতত্ত্বের বীজনে প্রশান্ত। আনন্দ থেকেই যে সৃষ্টি উৎসারিত ভারতীয় দার্শনিকের এই উক্তি অস্বীকার করলেও আমরা মানতে বাধ্য যে আনন্দতত্ত্বাবেষ্টিত ইদের এলাকা বিচিত্র রূপের জন্ম দেয়। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিচিত্র রূপের জন্ম দেবার মতো প্রচুর প্রাণবানতা ইদের আছে বলেই শিল্পের জন্ম সম্ভব হয়েছে—শিল্প, যা অনুকৃতি নয়, মৌলিক সৃষ্টি। শিল্পী একজন এমনই অসাধারণ মানুষ, ইদ আর ইগোর এলাকায় যাঁর গতিবিধি অবাধ। ইদের রাজ্যের অলীক রূপরাশি তিনি ইগোর বাস্তব রাজ্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। ফ্রয়েড তাই বলেন: There is, in fact, a path from phantasy back again to reality, and that is—art." কিন্তু অবাস্তব বাস্তবে রূপ নিলেই তার অবাস্তবতার স্মৃতি লোপ পায়না, তাকে বাস্তব বলে যে-মন গ্রহণ করবে তারও খানিকটা অবাস্তববোধ সজাগ থাকা চাই। কাজেই কোনো কালেই সর্ব্বজনবোধ্য রূপসৃষ্টি (অনুকৃতি-সৃষ্টি নয়) সম্ভব হয়নি—আর্ট সমাজের 'এলিটে'র জন্যেই তৈরী, কোনো যুগের আর্ট সমাজের জনসাধারণ লুফে নেয়নি, লুফে নিয়েছে মুষ্টিমেয় মনোবান মানুষ। অবশ্য সব যুগেই গণশিল্প বলে একটা বস্তু থাকে—কিন্তু যুগশিল্প বলতে তাকে বোঝায়না, এমন কি তাকে শিল্প বলেও সমসাময়িক যুগ স্বীকার করে না।

এতো কথা বলেও একটি কথা বলা হলনা। শুধু কি অলীক রূপের সন্ধানেই শিল্পী ইদের শরণাপন্ন হন? না কি ইদের আনন্দ-বাত্যার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ আছে? শুধু আকর্ষণ নয়, শিল্পীর মন অবিরতই সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতির মূলাধার হয়ত আদিবৃত্তি যৌনতারই আনন্দ এবং হয়ত এই আনন্দানুভূতি লাভ করবার জন্যেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রতি শিল্পী মনোযোগী (যেহেতু সৌন্দর্য্যানুভূতি মনকে আনন্দপ্লুত করে) কিন্তু তবু বলতে হয় যৌনতা সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন হতে সুরু করলে সৌন্দর্য্যানুভূতির অনুরূপ আনন্দ পরিবেশন করতে পারেন না।—পুরীর বা খাজুরাহের মন্দিরগাত্রের মূর্ত্তিগুলো যৌনআবেদনপূর্ণ হলেও মুহূর্ত্তের জন্যেও দর্শকের মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি এনে দেয়না। সৌন্দর্য্যানুভূতির আনন্দ এতো মৃদু আর যৌনতার আনন্দ এতোই তীব্র ও চাঞ্চল্যপ্রদ যে আমাদের মনে এই দুই আনন্দরূপ দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়—যৌনাবেগকে প্রচ্ছন্ন রেখে যদি যৌনআবেদনজাত আনন্দের ধারাকে মৃদু খাতে বইয়ে দেওয়া যায় তাহলেই হয়ত আমরা সৌন্দর্য্যানুভূতির অনুরূপ আনন্দ পেতে পারি। যৌনতার নগ্ন প্রকাশ তাই সৌন্দর্য্য নয়, সৌন্দর্য্য হচ্ছে তা-ই যার মূল প্রচ্ছন্ন যৌনতায়। এখানেও আমরা বলব ইগোর আড়ালে ইদের ঝিলিমিলিই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারে, সৌন্দর্য্যানুভূতি

বিতরণ করে। প্রেমকে কাব্যশিল্পের একটি অন্তরঙ্গ বিষয় করে তোলার মর্ম্মও এ থেকেই বোঝা যায়। কামের পঙ্ক থেকে জন্ম নিলেও প্রেমানুভূতি পঙ্কজ। যৌনতাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি আছে বলেই প্রেম শিল্পীর কাছে প্রেমাস্পদ। প্রেম নিয়ে তাই যতো ভালো কবিতা রচিত হয়েছে (তার মানে প্রেমাত্মক শিল্প যতোটা আনন্দ দান করেছে) নিসর্গ বা আদর্শের আলেখ্য নিয়ে তার অর্দ্ধেক ভালো কবিতাও তৈরী হয়নি। ইগো বা সুপার ইগোর জারক রসে যে কাব্যের অবয়ব জারিত তাতে ইদ্‌সুলভ আনন্দ রসের অভাব থাকবেই। নিসর্গের বা ভাববস্তুর সৌন্দর্য্য যদি কোনো উপায়ে প্রচ্ছন্ন যৌনানুভূতির আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই তা ভালো প্রেমের কবিতার পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। আনন্দলোককে উদ্ভাসিত করতে পারে বলেই সৌন্দর্য্যের প্রতি শিল্পীমনের সহজাত আকর্ষণ—তারি জন্যে তাঁর সৌন্দর্য্যলিপ্সা, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস।

সৌন্দর্য্যলিপ্সা মনের একটি আদিবৃত্তি আর তা না হবার কারণও নেই। আদিবৃত্তি যৌনতার সঙ্গে সৌন্দর্য্য যখন পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত তখন সৌন্দর্য্যলিপ্সাকে মনের একটি পুরোনো ধর্ম্ম বলে মেনে নিতে কি বাধা আছে? উচ্চারিত বা অনুচ্চারিতই থাকুক এ-লিপ্সা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালীন। যে-বিশেষত্বগুলো দিয়ে মানুষের আসল পরিচয় সৌন্দর্য্যলিপ্সা তাদের অন্যতম। শুধু অন্যতম বললে ঠিক হবেনা, বলা উচিত প্রথম। কারণ সুপার ইগোর জন্মের আগে ইদের কারখানায় তা তৈরী হয়ে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মনে মনুষ্যত্বের প্রথম আবির্ভাব বলেও একে আখ্যা দেওয়া যায়। আর এ-আবির্ভাব মনের বিচিত্র বিবর্ত্তন সত্ত্বেও তিরোহিত হয়নি। তাই মার্ক্স যখন বলেন, 'But the difficulty is not in grasping the idea that Greek art and epos are bound up with certain forms of social development. It rather lies in understanding why they still constitute with us a source of aesthetic enjoyment—" তখন আমরা বলব মানুষের মনের স্থান-কালহীন সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাই একটি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রতি মনকে চিরকাল উৎসুক করে তোলে। তখন মার্ক্সকে তাঁর গুরুবাক্যই শোনাতে হয়ঃ "What is demanded for artistic interest as also for artistic creation is, speaking in general terms, a vital energy, in which the universal is not present as law and maxim, but is operative in union with the soul and emotions." (Hegel.)। হেগেলের বর্ণনা থেকে শিল্পভোক্তার মনোগঠন সম্পর্কে আজ আমরা এ-কথাই উদ্ধার করে নিতে পারি যে গহন মনের অমর সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা একটা অ-বিশেষ সৌন্দর্য্যরস খুঁজতে চায়। কোনো শিল্পীর অত্যন্ত সচেতন প্রচেষ্টায় আর্টে একটা বিপুল

পরিবর্ত্তন না হয়ে গেলে কিম্বা কোনো শিল্পভোক্তা সাফল্যের সঙ্গে ইদকে নিষ্পেষিত না করতে পারলে যুগনামাঙ্কিত প্রত্যেক আর্টেই এই অ-বিশেষ সৌন্দর্য্যের সন্ধান মেলে।

অবশ্য গ্রীক আর্টের বুদ্ধিশাসিত বাস্তবতার দরুণই যদি তা মার্ক্সের মনোরঞ্জন করে থাকে তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে আর্টের এই দিকটা আর্টের মর্ম্মকথা বলে. কোনো কালেই স্বীকৃত হয়নি এবং বিশেষ করে আজকের দিনে ত স্বীকৃত হবেই না। আর্ট অবাস্তবকে বাস্তবের সীমায় পৌঁছে দিতে চাইলেও বাস্তব নিয়ে কাজ করতে স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু সমাজ একটি বাস্তব ব্যাপার এবং তার স্বাভাবিক কারবার বাস্তবকে নিয়ে—তাই অনেকসময়ই আর্টের সঙ্গে তার বনিবনাও হওয়া কঠিন। রুথ বেনিডিক্টের ভাষায় যে-'কোনো একটা ধরণ' আর্টের কেন্দ্রশক্তি, তার সঙ্গে সামাজিক ভাবধারার মিল আবিষ্কার করা সবসময় সম্ভবপর নয়। কোনো এক শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনাই সেই 'কোনো একটা ধরণে'র জন্ম দিয়ে থাকে।

তবু এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই. অ-সাধারণ মনের অধিকারী হলেও মানুষ হিসেবে শিল্পীকে সামাজিক হতেই হয়। মনের অতলে প্রবেশ করবার যতো ক্ষমতাই শিল্পীর থাকুক বাস্তব আবেষ্টনীতে বসবাস করে বাস্তবকে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি তাঁর নেই। আর কিছুর জন্যে না হোক অন্তত জৈবিক দাবী মেটাবার জন্যেই তাঁকে সমাজের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু সে-দাবী সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে কোনোদিনই এমন বৃহদায়তন হয়না যে সমাজের বৃহত্তম অংশকে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ—যাকে সংস্কৃতিসম্পন্ন বা 'এলিট' বলে আখ্যা দেওয়া যায়—যদি শিল্পীকে তাঁদের সমর্থন ও শুভানুধ্যায় জ্ঞাপন করেন, শিল্পী তাতেই তাঁর শরীরের ও মনের দাবী মিটিয়ে যেতে পারেন। সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যতটুকু ঘনিষ্ঠতা তা এই 'এলিটের'ই মারফৎ, সমগ্র সমাজকে জড়িয়ে নয়। শিল্পী যদি শিল্পকে পণ্যে পরিণত করে পুরোপুরি বৈষয়িক হয়ে যান তাহলে সে কথা আলাদা—তখন সমগ্র সমাজই তাঁর বাজার হয়ে উঠতে পারে এবং তিনিও শিল্পী উপাধি ছেড়ে ব্যবসায়িক উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। তখন ইগো-ইদের কারিকুরি তাঁর কাছে অবাস্তর, বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের তাড়া খেয়েই তিনি চলতে সুরু করেন। শিল্পের ইতিহাসে এ-ধরণের রূপান্তরিত শিল্পীর সংখ্যাই বেশি, কাজেই আর্টের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠতার কথা আমাদের খুব বেশি মনে পড়ে।

সমাজের কাজে শিল্পীর আত্মবিক্রয়ের কাহিনীকে আর্ট ও সমাজের সত্যিকারের সম্পর্ক বলে যাঁরা মনে করেন সেই অতিবাস্তববাদীদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যার কাছে এখনও জীবন তার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে দেয়নি। বিজ্ঞান একের পর এক প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে চলেছে—কিন্তু রহস্যের প্রান্তে পৌঁছনো দূরে

থাক, যাত্রার বিশাল পথে আজ মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ গোণা যায়। এই সামান্য প্রচেষ্টাতেই সব কিছু হস্তামলকবৎ হয়েছে বলে যদি আমাদের গর্ব্ব থাকে তাহলে তা মুর্খতারই নামান্তর। এ-মুর্খতা বিজ্ঞানের যাত্রাকেই পঙ্গু করে—প্রকৃতি রহস্যমুক্ত হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না। মনের অন্ধকারকে যদি আজ আমরা স্বীকার করে নিই তাহলে সেখানে একদিন সম্পূর্ণ আলোকপাত করবার চেষ্টাও আমাদের থাকবে—কিন্তু স্বল্পালোকিত মন যদি আমাদের নিকট পূর্ণ প্রভাময় বলে প্রতিপন্ন হয় তাহলে ব্যাপারটাকে শোচনীয় না বলে গত্যন্তর নেই। মনকে ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে বুঝতে চেষ্টা না করে আর যে পথেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করিনে কেন এ সত্য আমাদের অস্বীকার করবার উপায় নেই—বুদ্ধি, যুক্তি, চৈতন্য যেমন মানসিক গুণাবলী আবার ঠিক তেম্নি অনুভূতি, আবেগ, অচৈতন্যও মনোধর্ম্মেরই অন্তর্গত; এদের বৈপরীত্য নিয়েই মনের সম্পূর্ণতা তৈরী। বুখারিনের ভাষায় 'They are dialectical magnitudes composing a unity'. প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানের মূলধন—আর্টের মূলধন অনুভূতির অভিজ্ঞতা। অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এলাকায় এনে দেওয়াই শিল্পীর কাজ। বাস্তবের সঙ্গে শিল্পীর মাত্র এটুকুই সম্পর্ক—শিল্পী বাস্তববাদী হয়ে সমাজের দাসত্ব করলে শিল্পেরই জাত যায়, সমাজের কিছু এগোয় না।

এ শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্প আন্দোলন 'সুররিয়্যালিজম্'-এর জন্ম মনের এই সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেবার প্রচেষ্টা থেকেই হয়েছিল। এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয় করে বাস্তবের একটি নিখুঁত সত্তা উদ্ঘাটিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। সুররিয়্যালিজম মন্ত্রের উদ্গাতা আঁদ্রে ব্রেতোঁর ম্যানিফেষ্টোতে শোনা যায়: "We have attempted to present interior reality and exterior reality as two elements in process of unification". ১৯৩৪-এ বুখারিন সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘে মানসিক গুণাবলীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা ব্রেতোঁর এই উক্তিকেই সমর্থন করে। দ্বন্দ্ববাদের সমগ্রতার পরিকল্পনা নিয়েই সুররিয়্যালিজমের উৎপত্তি। বলাবাহুল্য যে সুররিয়্যালিজমের আওতায় যে-শিল্পসৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য অথচ সুররিয়্যালিষ্টরা নিজেদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্রধর বলেই ঘোষণা করেছেন।

তবু আমরা সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ প্রবণতা থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারিনে: বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে আমরা আর্টকে বুঝতে চাই। প্রাকৃতিক দুর্জ্ঞেয়তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিজ্ঞান আমাদের মনের খানিকটা কুয়াশা অপসারণ করেছে বলেই হয়ত আমরা বিজ্ঞানকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে উন্মুখ। বিজ্ঞানকে প্রকৃতির ব্যাখ্যাতা বলতে আপত্তি নেই কিন্তু তা বলে তাকে আর্টের ব্যাখ্যাকার করে তোলা যায় না। আর্ট

বিজ্ঞানের বিচরণভূমি থেকে পালিয়ে বেড়ায়—বিজ্ঞানের আলো যেখানটায় গিয়ে পড়ে সেখানে আর আর্ট আসর জমাতে রাজি হয় না। বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে যার অধিষ্ঠান বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে তাকে বুঝতে যাওয়া তাই ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। বিজ্ঞানের গণ্ডী যত বেড়ে যাবে আর্টের গণ্ডী ততই কমতে থাকে—কিন্তু কোণঠাসা হয়েও আর্ট বিজ্ঞানের হাতে ধরা দেবেনা। তারপর যদি এমন অবস্থা একদিন আসেই যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে সেদিন আর্টকে বাস্তুত্যাগী হয়ে নিশ্চয়ই নূতন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেদিন আর্ট বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক যে ভূমিকাই গ্রহণ করুক তাতে কারো কিছু বলবার থাকবে না। কিন্তু সেই দূর ভবিষ্যতের অনেক পেছনে পরে থেকে আজ যদি আমরা আর্টকে দিয়ে সমাজের প্রত্যক্ষ সেবা করাতে চাই তাহলে তা অনুচিতকর্ম্মারম্ভ ছাড়া আর কিছু হবে না। সমাজবাদীরা মার্ক্সের এ কথাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করুন ঃ "All mythology masters and dominates and shapes the forces of nature in and through the imagination ; hence it disappears *as soon as* man gains mastery over the forces of nature." (ইটালিক্স আমার) মানুষ যতো ত্বরান্বিতই হোক প্রকৃতিজয়ের মুহূর্তগুলো তার ব্রহ্মার মুহূর্তের মতোই হয়।

"সৌন্দর্য্যবোধ আদিম মানুষের মধ্যে যেমি সভ্য মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমি দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি হারিয়ে গেলেও এ-বোধ হারায় না। নির্ব্বোধ বা উন্মাদও চারুশিল্পে দক্ষ হতে পারে। সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাবার জন্যে রূপসৃষ্টি বা সুরসৃষ্টি আমাদের প্রকৃতির একটি মৌলিক প্রয়োজন। - - - -

সৌন্দর্য্যবোধ আপনা থেকে জন্মায় না। আমাদের চেতনায় সুপ্ত থাকে। কোনো কোনো যুগে—কোনো ঘটনাস্রোতে তা প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। আবার কোনো কোনো জাতির জীবনে তা লুপ্ত হয়ে যেতে পারে—এমন জাতির জীবনেও তা লুপ্ত হয় যারা অতীতে তাদের মহৎ শিল্পীর ও শিল্পের জন্য গৌরব বোধ করত। - - - একটি সভ্যতার ইতিহাসে নীতিবোধের মতো সৌন্দর্য্যবোধও জন্মায়, চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে, পতনোন্মুখ হয় তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

—ডক্টর এলিক্সিস্ ক্যারেল্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খাস বিলাতী পদ্ধতিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুকরণে তৈরী—সার চার্লস টেগার্টের হাতে গড়া—বাংলাদেশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ বাহিনী। অদ্ভুত শক্তিশালী এবং তেমনি কার্য্যদক্ষ। কর্ম্মচারীগুলির মন এবং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। কালীনাথ কেন্দ্রীয় আই বি তে পূর্ব্ববঙ্গের একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইনসপেক্টর। ওই জেলাটির আই বি আপিসের সঙ্গে এখানকার যোগসূত্র রাখাই তার কাজ—এবং ওই জিলার যে সমস্ত বিপ্লববাদী কলকাতায় থাকে বা আসে-যায় তাদের কার্য্যকলাপের সন্ধান রাখাই তার ডিউটি। ওই জেলার সঙ্গে সংশ্রবহীন কলকাতার দলের কর্ম্মীদের চেনা বা জানার কথা তার নয়। মিহির যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলের কর্ম্মক্ষেত্র পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। দলটি ভেঙে-ভেঙে এখন অত্যন্ত একটি ছোট দলে দাঁড়িয়েছে, কর্ম্মী হিসাবে মিহিরও নূতন, বাঙলাদেশের পুলিশেরা যাকে বলে পুরনো পাপী—সে গৌরবজনক আখ্যা লাভ করতে এখনও পারে নি। মিহিরকে দেখে তবু কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বিমল মিহিরকে বললে—বলবেন আমি দেখা করব।

মিহির কালীনাথকে সন্দেহ করে নাই—সে বললে—আমাকে কিন্তু বলেছেন—সঙ্গে নিয়ে যেতে।

—কিন্তু—। বিমল একটু দ্বিধা করলে, লেখাটা শেষ করতে হবে, কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে—লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে; সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে যেখানে লাবণ্য দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালীনাথ হঠাৎ মিহিরকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম মিহির বোস্ না? দর্জ্জিপাড়ার কার্ত্তিক বোসের ছেলে?

মিহির একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর দিলে—আজ্ঞে,হ্যাঁ।

কালীনাথ এবার প্রশ্ন করলে—ও মেয়েটি কে? উনিও বুঝি—

বিমল মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বললে—থামো কালীদা'—। এ ছাড়া আর কথা সে খুঁজে পেলে না।

চিত্ত তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমাদের পাড়ারই মেয়ে, এখানে একটি সমিতি করেছেন, কয়েকজনে মিলে। তাই দেখাবার জন্য বিমলদাকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছেন। ডাকতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। লাবণ্য এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে সকলের সামনাসামনি দাঁড়াল; বললে—আমি যাই। উনি তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

কালীনাথ না থাকলে বিমল এতে নিষ্কৃতি পেলে বোধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো অনুভব করতো এই মাত্র। কিন্তু কালীনাথের সন্দিগ্ধ হাসির রেখা তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুললে, সে বললে—দাঁড়ান, আমি যাব আপনার সঙ্গে। ফিরে সে মিহিরকে বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যেতে পারি যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন। মানে এঁদের এখানে চা খেয়ে যাব আমি। আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন—চা খাবেন।

মিহির একটু হেসে বললে—চলুন।

বিমল কালীনাথকে বললে—আমায় যেতে হবে কালীদা'।

কালীনাথ কিছু বলবার পূর্বেই চিত্ত বললে—আপনি যান, আমি ঘরে তালা দিয়ে যাব। কালীদা' একটু বসবে এখানে। আমার ওখানটা তো খোলা মাঠ। এরপর খুব কাছে সরে এসে—ফিস-ফিস করে বললে—কালীদা'কে একটু বিয়ার খাওয়াব।

বিমল কোন উত্তর দিল না, প্যাসেজটা অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লাবণ্য এবং মিহির তার অনুসরণ করলে।

আহারের পরিচর্য্যার পারিপাট্য হোটেলেও থাকে, বরং হোটেলে যে পারিপাট্য সম্ভবপর সে পারিপাট্য অন্তত কোন সাধারণ বাড়ীতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে নিষ্ঠা এবং মমতার স্পষ্ট পরিচয় মেয়েদের হাতে বাড়ীর আয়োজনে পাওয়া যায়—পারিপাট্য সত্ত্বেও হোটেলে তা পাওয়া অসম্ভব। বিমল বিস্মিত হয়ে গেল—এখানে যেন দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। টেবিলের উপরে ধবধবে সাদা চাদর, জানালাগুলিতে সাদা পর্দা, দেওয়াল ঘেঁষে তক্তাপোষ একখানি,

তার উপরেও ধবধবে সাদা চাদর বিছানো, টেবিলের উপরে কাচের গ্লাসে টকটকে লাল সাটিনের তৈরী ফুল, ফুলগুলির চারিপাশে সবুজ সাটিনের পাতা; দেওয়ালের কোনখানে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নাই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি শুভ্র শুচিতা যেন ঝলমল করছে ঘরখানির মধ্যে। ঘরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিমল বললে—বাঃ!

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যের মুখে।

মিহিরও বললে—সুন্দর!

লাবণ্য বললে—আধঘণ্টা সময় দিতে হবে অন্তত। খাবার তৈরী করতে পনের মিনিট, আপনারা বসুন।

—আমি বসলে তো চলবে না। খাবারগুলো ভেজে নিই। আমি বরং অরুণাকে পাঠিয়ে দি। লাবণ্য চলে গেল ভিতরে। বিমল তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল এই শুভ্রশুচি ঘরখানির একটা অংশ যেন ঘরখানাকে অঙ্গহীন করে দিয়ে চলে গেল! লাবণ্যের পরিচ্ছদের মধ্যেও এই শুভ্রতার দীপ্তি, গায়ে তার ফুলহাতা সাদা লংক্লথের ব্লাউস, পরণে ধোয়া থান কাপড়, সে যেন এই ঘরখানির মর্ম্মকথার মত ঘরখানিকে মুখর করে সজীব করে রেখেছিল। বিমল প্রসন্ন পরিতৃপ্ত চিত্ত নিয়ে বসল। মিহিরও বসল। মিহির বললে—ইনি কে? চমৎকার রুচি।

বিমল উত্তর দেবার পূর্ব্বেই অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। বিমল তাকে সম্বর্দ্ধনা করে বললে, আসুন।

অরুণা একটু হেসে নমস্কার করে বললে—লাবণ্যদি বললেন, আপনি চলে যাবেন এখুনি।

—হ্যাঁ। জরুরী তাগিদ রয়েছে। ইনি এসেছেন তাগিদ নিয়ে। এঁর সঙ্গেই যেতে হবে। বসুন আপনি।

অরুণা বসল না। টেবিলের প্রান্তভাগটি ধরে দাঁড়িয়েই রইল। সে যেন কিছু চিন্তা করছে, অথবা কিছু বলতে চাচ্ছে। বিমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করেই, সঙ্কোচ কাটাতে সাহায্য করবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কি ঠিক করলেন।

অরুণা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। মিহির বললে—কোন কথা যদি থাকে বিমলবাবু, আমি একটু না হয় বাইরে যাই।

বিমল সঙ্কোচ অনুভব করলেও অরুণা সঙ্কুচিত হল না, তার মুখে চোখে বরং উৎসাহের একটি চকিত দীপ্তিই ফুটে উঠল; তারপরই সে বললে—পাঁচ মিনিট! মিহির বাইরে যেতেই

সে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—সারাদিন আমি ভেবে দেখলাম বিমলবাবু, এখানে এইভাবে আমি—। বক্তব্যের শেষ অংশটুকু সে অসম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—না—। না সে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কিন্তু কি করবেন ?

অরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না ? ফিল্মে কি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গান দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?

—না। বিমল ঘাড় নেড়ে কায়মনোবাক্যে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললে—না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—ফিল্মে যদি ঢুকতে চান—তবে সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিলেন কেন ? রতনবাবুর মত নাম-করা ফিল্ম এক্টরের সঙ্গে আলাপ রাখলে—যে কোন মুহূর্ত্তে আপন কণ্ট্রাক্ট পেতে পারতেন।

অরুণা চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেলে বিমল—চমকানির সঙ্গে মেয়েটির সর্ব্বশরীর শিউরে উঠল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে গলার সাড়া জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিহির। বললে—বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম আপনাদের কথায়। বাইরে একটি লোক ঘুরছে—উঁকি মেরে আপনাদের দেখলে কয়েকবার। অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হল।

বিমলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কালীনাথের কথা মনে হল। সে কি এরই মধ্যে স্পাই লাগিয়ে দিলে তার উপর ? কিন্তু তাই বা কেমন করে' হবে ? এই মুহূর্ত্তে স্পাই—? সে উঠে দাঁড়াল—বললে—কোথায় ?

বেরিয়ে এসে সে দরজায় দাঁড়াল। একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের লোক—কিম্বা তার চেয়েও কমবয়স হতে পারে কিন্তু যুবক বলা চলে না, দাঁড়িয়ে আছে। কোল কুঁজো-শীর্ণ দেহ, পরণে ময়লা কাপড়, ময়লা একটা গরম জামা, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া একমাথা রুখু চুল, মুখে গোঁফ দাড়ী অল্প কিন্তু তাও খোঁচা খোঁচা হয়ে বড় হয়ে শ্রীহীন লোকটিকে আরও বিশ্রী করে তুলেছে, চোখে পুরু লেন্সের একটা চশমা,—লোকটিকে দেখলেই মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভীরু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমি লাবণ্য-দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কি নাম আপনার ? কি দরকার আপনার ?

—কে ? পিছনে ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে লাবণ্য।

বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাবণ্য এরই মধ্যে খাবারের থালা হাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সে বললে—একটি লোক আপনাকে খুঁজছে। দরজার মুখটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বিমল। খোলা দরজার পথে ওই কুৎসিৎ অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটিকে দেখে লাবণ্যের মুখ প্রসন্ন

হাসিতে সস্মিত হয়ে উঠল—কয়েক পা এগিয়ে এসে সে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—পিনাকী? এস—এস।

অপ্রতিভের মত হেসে পিনাকী বললে—হ্যাঁ। নমস্কার করলে সে।

লাবণ্য তাকে প্রতিনমস্কার করলে না। আবার বললে—এস। ভেতরে এস।

—যাব? এঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে যাক।

—না-না। কথাবার্ত্তা নয়, খাওয়া দাওয়া। এঁদের চায়ে নেমতন্ন করেছি। এস তুমিও এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন সাহিত্যিক বিমলবাবু। ইনি এঁর বন্ধু। আর ইনি হলেন পিনাকী ঘোষ, শিল্পী একজন। আমাদের খুব উপকারী বন্ধু। আমাদের ফ্রক ব্লাউস বেডশীট, বালিশের ওয়াড়ের ওপর ডিজাইন এঁকে দেন। ভারী চমৎকার ডিজাইন করেন। ছবিও আঁকেন খুব সুন্দর।

অপরাধীর মত পিনাকী বললে—আমার একখানা ছবি 'বঙ্গভূমি' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কিন্তু নতুন আর্টিষ্টের অসুবিধে তো জানেন। মানে নতুন কিছুকে সহজে তো লোকে নেয় না। তারপর অপ্রতিভের মত হেসে বললে—খুব গরীব আমি। বেঁচে থাকতে হবে তো। তাই কমার্শিয়াল আর্ট করছি সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা কিছু কিছু ডিজাইন নেন—

লাবণ্য বাধা দিয়ে বললে—সব ডিজাইনই তো তোমার। এবার মেঘ-বিদ্যুৎ ডিজাইনটা খুব ভাল হয়েছে, খুব আদর করে নিয়েছে দোকানদারেরা।

হাসতে লাগল পিনাকী।

—বস'—খাও। বসুন বিমলবাবু, আপনিও বসুন। বড় একটা থালা থেকে গরম নিমকী সে কাচের প্লেটে পরিবেশন করতে লাগল। বিমল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল পিনাকীকে। পুরু লেন্সের ভিতরে চোখদুটিকে ঠিক ঠাওর করা যায় না, তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে পীড়িত অপরিচ্ছন্ন মলিন অবয়ব এবং বেশভূষার মধ্যে একটি উদাসী অথবা উপবাসী মানবাত্মা যেন উঁকি মারছে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। বাহিরের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভঙ্গির এই দীনতার জন্য লোকটির উপর ঘৃণা বা বিরক্তি অর্থাৎ একটা বিরুদ্ধভাব মানুষের মনে জাগবেই—তবুও লোকটির জন্য অন্তর করুণায় ভরে উঠবে।

লাবণ্য বললে—খান।

পিনাকী চোখ বন্ধ করে গর গর করে খাচ্ছে। বিমল হেসে একখানা নিমকী মুখে তুললে। লাবণ্যের একজন সহকর্ম্মিণী একটা থালায় গরম সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এল।

লাবণ্য বললে—এ আমাদের মলিনা। বানে ভেসে চারটি কুটো আমরা চরে এসে একসঙ্গেই ঠেকেছি, মলিনা—আমাদের এক কুটো। তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে

বললে—পঞ্চম কুটো আমাদের অরুণা ; কিন্তু ও এখনও দুলছে, একটা মাথা চরের কুটোর সঙ্গে আটকেছে, অন্য মাথাটা স্রোতের টানে ছুটতে চাচ্ছে। কি হ'ল ?

এতক্ষণে পিনাকী চোখ খুলে অরুণার দিকে তাকালে—বললে—এঁর কথা বলছেন বুঝি ? ঘাড় ঝুঁকে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে।

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। লাবণ্য বললে—পিনাকী তোমার সহজ বুদ্ধি কখনও হবে না। এমন করে কি দেখছ তুমি ?

পিনাকী বললে—দেখছিলাম, বলে সে থেমে গেল, তারপর অপ্রতিভের মত বললে—মানে, মনে হল ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আবার একটু থেমে আবার বললে—জানেন, আমার আঁকা বিজ্ঞাপনের একটা ছবি আছে, খুব বিষণ্ণ মেয়ের মুখের ছবি, বন্ধ্যা মেয়ে আর কি ; সেই ছবির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের খুব মিল আছে। তাই মনে হচ্ছিল—চেনা মুখ। আবার একটু ভেবে বললে—ছেলে বেলা আমার এক দিদি মারা গেছেন, বিজ্ঞাপনে এসেছিল দিদির মুখ। দিদির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের মিল রয়েছে আর কি। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মত খানিকটা হাসলে সে।

এবার চা নিয়ে এল চরে ভেসে এসে লাগা আর দুটি কুটো। তাদের পিছনে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল বাড়ীর মালিক দালাল গিন্নী এবং তাঁর মেয়ে। লাবণ্য পরিচয় করিয়ে দিলে। বিমল কিন্তু কথা বাড়াল না। বললে—আজকে কথাবার্ত্তার সুবিধে হল না। আমায় জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হবে। কথার শেষে সে হাত জোড় করলে।

লাবণ্য হেসে বললে—আমাদের আর কথা কি ? আপনারা মানী লোক, অনেক বড়-লোকেরা আপনাদের কথা শোনে। একটু বলে দেবেন আমাদের এখানকার কথা। একটু বিজ্ঞাপন আর কি। কথা ছিল অরুণার। ওর কথা শেষ হয়েছে ?

বিমল বললে—হ্যাঁ। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা আসি। চলুন মিহির বাবু।

* * *

সত্যই তো, আর কি বলতে পারতো বিমল। করুণার্দ্র হয়ে অরুণাকে নিয়ে ফিল্মওয়ালা বা গ্রামোফোন কোম্পানীর দোরেদোরে ঘুরতে পারতো। নিজেকে বিপন্ন করে নিজের উপার্জ্জন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারতো যতদিন না সে নিজে উপার্জ্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে সে নিজেকে জড়াতে পারতো অরুণার সঙ্গে। নিজের জীবনের

যাত্রাপথে গতিকে মন্থর করতে হত বা সাময়িকভাবে পথের ধারে অরুণার সঙ্গে ভাগে গাছতলায় মুসাফেরখানা বানাতে হত। সে তা পারে না। মানুষকে চলতে হবে একা। এতকাল পর্য্যন্ত মেয়েরা পুরুষকে আশ্রয় করে চলে এসেছে। সে এককাল ছিল, কৃষিপ্রধান গ্রাম, পুরুষে করেছে চাষ। মেয়েরা রচেছে ঘর, পুরুষে কেটেছে ধান—মেয়েরা ভেঙেছে চাল রেঁধেছে ভাত, মেয়েরা কেটেছে সুতো—পুরুষে বুনেছে কাপড়। আজ মহানগরীতে সে ধারা অচল হয়ে উঠেছে। সে ধারা ধরে চলতে গেলে মর্ম্মান্তিক কেরাণী জীবনকে অবলম্বন করতে হবে। অন্ধকূপের মত আশ্রয়ে—পাততে হবে সংসার, আলো নাই, বাতাস নাই, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল গাঁথনীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষয় রোগের বীজাণু বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তাদের; উঠানে মাটীর তলবাহী নর্দ্দমার মুখের বদ্ধ ঝাঁঝরিটায় কলেরা টাইফয়েডের বীজ; মরবে তোমার শিশু। এ পৃথিবীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে হবে নরনারীর মিলিত জীবনের সাধের মাশুল হিসেবে। না—সে তা পারে না—পারবে না। সে অধিকারই নেই তার। হঠাৎ পায়ে একটা হুঁচোট খেলে বিমল।

মিহির বললে—দেখবেন, রাস্তা বড় খারাপ।

রাস্তা খারাপই বটে। বালীগঞ্জের দক্ষিণে ঢাকুরিয়ার দিকে চলেছে তারা। দুপাশে জঙ্গল, নারকেল বাগান, পুরনো বাড়ী, বজবজে জলেভর্ত্তি ড্রেন—কোথাও পাকা কোথাও কাঁচা। রাস্তার আলো অপর্য্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে দু চারটে ছোট খাটো দোকান, কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। নেহাত ছোট দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপী। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালা বা ধোবাদের জটলা হচ্ছে; উড়িয়ারা ঢোলক বাজিয়ে গান করছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।

বিমল লজ্জিত হয়েছিল, নিজের কাছেই সে নিজে লজ্জা পেয়েছিল। কেন সে অরুণাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে গিয়ে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার কল্পনা করলে? ছি! জীবনে পথে চলতে কত পুরুষ কত নারীর সঙ্গে দেখা হবে, হয় তো খানিকটা পথ পাশাপাশি চলতেও হবে; সে তো অনিবার্য্য! কথাও বলতে হবে, কথা বলতে গিয়ে সঙ্গীতের রেশও বাজতে পারে কানে, তার ফলে মিতালীও হতে পারে। তাতে কি? আবার যে দিন সে যাবে একপথে—ও যাবে অন্য পথে—সে দিন হাসিমুখেই চলবে বিপরীত পথে। চোখে দু এক কোঁটা জল আসে—পড়বে ঝ'রে।

—দাঁড়ান। মিহির পাশে একটু এগিয়েই চলছিল নীরবে, সবল সুস্থ দীর্ঘাকৃতি তরুণ ছেলেটির পদক্ষেপে কঠিন শব্দ বেজে উঠছিল নির্জ্জন অন্ধকার সহরতলীর পথে। সে হঠাৎ বললে—দাঁড়ান।

—কেন ?

মৃদুস্বরে বললে মিহির—একখানা মোটর টর্চ ফেলে কি যেন দেখছে।

অদূরেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল, পিছনের লাল আলোটাও জ্বলছেনা—সুতরাং অন্যমনস্ক বিমলের চোখে পড়ে নাই। গাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ ফেলে পাশে কিছু যেন দেখছে আরোহীরা। গাড়ীর দরজা খুলে কয়েকজন নামলেন। বিমল মিহিরকে বললে—আমি আপনাকে বলি নি, আমি একটু অন্যায় করেছি।

—কি ?

—আমার বাসায় ওই যে লোকটি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করলে—ও হচ্ছে আমার গ্রামের লোক কিন্তু আই বি ইন্সপেক্টার।

—আই বি ইন্সপেক্টার ? একটু চমকে উঠল মিহির।

হ্যাঁ। আমার বোধ হয় আজ আপনার সঙ্গে আসা উচিত ছিল না। আপনাকে বিদায় করে দিয়ে, ওকে আটকে রাখলেই ভাল করতাম আমি।

মিহির বললে—না—না। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। গোপেনদা' তো লুকিয়ে নেই যে পুলিশ ফলো করলে কোন ক্ষতি হবে। এ তো কোন গোপন ব্যাপার নয়।

—তবে মোটর দেখে দাঁড়ালেন কেন ?

মিহির হেসে বললে—প্রথমটা দাঁড়িয়েছিলাম অভ্যাসে। তারপর দাঁড়িয়েছি যারা নেমেছে তাদের একজন আমার কাকা।

—আপনার কাকা ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে। আপনি তো সে জানেন। একবছর টাইম দিয়েছে খরিদ্দার বাড়ী তৈরী করে নেবার জন্যে। সম্ভবত কাকা এসেছেন জমি দেখতে। এখানকার জমি বিক্রী হবে। ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে ল্যাণ্ড ফর সেল। একটু থেমে বললে—কাকার চোখে ঠিক পড়তে চাই না।

টর্চটা এগিয়ে গেল—রাস্তার পাশের পতিত জায়গাটার মধ্যে। মস্ত একটা নারকেল বাগান, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছিটে-বেড়ার বাড়ী।

মিহির বললে—এইবার আসুন। গাড়ীটার এদিক দিয়ে আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।

গাড়ীটাকে পাশে রেখে একটা বাঁক ঘুরে একটা পুরনো একতলা বাড়ীর মধ্যে মিহির

তাকে নিয়ে গেল। বিমলের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। গোপেন মুখার্জ্জী প্রাচীন কালের বিপ্লবী নেতা। এককালে বিমল তাকে গুরু বলে পূজা করেছে। তাঁর দেখা পাবার জন্য কত ব্যগ্রতা ছিল। বাঙলা দেশের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগীদের মধ্যে এমন বিরাট সাহস মাত্র কয়েকজনের ছাড়া আর কারও ছিল না। সিংহের মত সবল দেহ, খালি গায়ে—সে বিরাট বুকের পাটা—সে ক্ষীণ কটি—বাঘের থাবার মত হাতের পাঞ্জা—চশমায় ঢাকা—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, মাথায় বড় বড় চুল—তাঁর সেকালের মূর্ত্তি স্পষ্ট মনে পড়ছে তার। একা একটা ঘরের মধ্যে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন তিনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে কখনও পারে নি বিমল, কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট কিন্তু কথা বলতেন মৃদুস্বরে। শেষবার সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার গ্রামে তার বাড়ীতে যাবার জন্য। তখন তিনি এ্যাবস্কণ্ড্ করে ফিরছিলেন। তার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না। কলকাতা ছেড়ে গেলে কাজ চলবে না।

মহানগরী কলকাতা ইংরেজের শক্তির কেন্দ্রস্থল; মহানগরী কলকাতা ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্মস্থল। মহানগরীর অন্তর জগতে লক্ষ-লক্ষ পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সংঘাতে কলরোল উঠছে অবিশ্রান্ত—বিপুল শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে দ্বন্দ্ব, তার আঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তে।

আজও ঠিক সেইভাবে—সেই এক কোণে অভ্যস্তভঙ্গিতে বসে আছেন গোপেনদা'। বিমলকে দেখে একটু হেসে নীরবে হাতখানি তুলে রাখলেন নিজের সামনে—অর্থাৎ বস এইখানে।

(ক্রমশঃ)

পেরাণটা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'বঁধুর লেগে পেরাণটা যে কাঁদে, আহা কাঁদে।'

তেপান্তরের মাথা-ভাঙ্গা মাঠে গলা ছেড়ে দিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গাওয়ার কি যে আরাম। গতি তার মন্থর হয়ে আসে। অবেলায় অঘ্রাণের পরন্ত রোদ, শান্ত ফাঁকা মাঠে একা একা বোধ করছিল সাধু সেখ। তাই গুণ গুণ করে গান ধরে ফেলেছিল নিজেরই অজ্ঞান্তে। দেখতে দেখতে গলা খুলে সুর চড়েছে। তা, মদ্দ মানুষের কি গুণগুণিয়ে গাওয়া পোষায় মেয়েলোকের প্যানপ্যানির মত ?

শক্ত মাটি মাঠের, লাঙল দিলে ফলা ঢুকবে না, তবু এ মাটি আঁকড়ে কামড়ে দুর্ব্বা ঘাস ছেয়ে আছে চারিদিক, যদিও তারা রুক্ষ জীর্ণ কমতেজী। এ মাটিতে বুঝি শিশির শোষে না। বৃষ্টির জলও ভেতরে পশে না, ওপর ওপর মাটি ভিজিয়ে পশ্চিম দিকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে কাঁসাই নদীতে বন্যা ডাকায়। এমনিভাবে যদি ধান গজাত, এই দুর্ব্বা ঘাসের মত, যেখানে মাটি সেইখানেই ! সরেশ মাটিতে তেজী সবুজ ঘন হয়ে, শক্ত পতিত্ জমিতেও না হোক যা হোক এই মাঠের ঘাসের মত ! কোনো শালার তা হলে আর শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে চাষতে হত না পাজী বজ্জাত নিমকহারাম পরের ক্ষেত, হাজতখানায় বসবাস হত না ফসল নিয়ে কামড়াকামড়ি করে ! মাঠে ঘাটে ক্ষেতে আলে বন বাদাড়ে আপনি গজানো অজস্র ধান গাছে থই থই করত চারিদিক ! কাটো, মাড়াও, ঢেঁকিতে নয় কলে ছাঁটাও, দু'বেলা পেট ভরে যার যত খুসী ভাত খাও সারাবছর, গরুছাগলকে খাওয়াও !

গলা তার আরও চড়ে যায়, আরও কাঁপে।—বঁধুর লেগে পেরাণটা মোর কাঁদে, পরাণ বঁধুরে !

এ গান সে জানে একলাইন, সুর জানে একলাইনের। অন্য গানও জানে, এমনি এক-লাইন দু'লাইন। একা না হলে তাই সে গান গায় না, এমনি ফাঁকা মাঠ না পেলে গলা ছাড়তে পারে না। ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেল খেটে গাঁয়ে ফেরার পথে এই মাথা-ভাঙা মাঠে তার দরকার ছিল গলা ছেড়ে গান ধরার।

দূরে দূরে গাছ-ঢাকা গাঁ। মাঠে এখানে ওখানে থোকা থোকা নীচু ঝোপ, বুনো কুল, কুকুরশোঁকা, ঝাঁকাটি গাছের। দক্ষিণে নদীর ওপারে ঘন শালবন। শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ওদিকে হাতে মুখে খসখসে ছোঁয়াচ লাগিয়ে। নদী শুকিয়ে গেছে এর মধ্যেই,

চওড়া বালির বুকে এখন ঝিরঝির বইছে আধমরা ক্ষীণ ঝরণা।

আল্লা, আজ নমাজ পড়ার সময় নাই। ধূলায় ধুসর গা হাত পা, নদীতে গিয়ে অজু করে নমাজ পড়তে গেলে এই জনহীন ফাঁকা মাঠে তাকে ঘিরে আঁধার রাত নেমে আসবে, চারিদিকে তাকে ঘিরে সুরু হবে বিপথের ইসারা আর হাতছানি, তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথের দিশা সে হারিয়ে ফেলবে বেমালুম।

আঁধারকে সে ভয় করে না। একবছর আগে যখন দিনান্তের নমাজ পড়ার জন্য আল্লার এই জগতটাকে বরবাদ করে দিতে পারত, তখন ভয় করত এই জগতের আঁধারকে। বন-বাদাড়ে কত আঁধার রাত কাটিয়েছে ফসলের লড়ায়ে নেমে, কত নমাজ পড়া তার বাদ গেছে তারপর। আঁধারের ভয় কেটে গেছে। তবে ওই সূর্য্য অস্ত গেলে এ মাঠে সে দিক হারিয়ে ফেলবে, চেনা চেনা চিহ্নগুলি দেখতে পাবে না, কোনদিকে এগোলে তার গাঁ ঠাহর পাবে না। দিনের আলোয় পথ চিনে তাকে পৌঁছতে হবেই গাঁয়ের কাছাকাছি।

গানের অজুহাতে ক্লান্ত ব্যথিত পায়ে ঢিল পড়েছিল। বেলার দিকে চেয়ে আবার সে জোরে চলা সুরু করে। সূর্য্য শালবনে ডুবু ডুবু। যেখানে তারার আলোতেও তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথ খুঁজে নেওয়া যায় সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কি সময় মত?

আঘ্রাণের সন্ধ্যায় গা ঘেমে যায় সাধু সেখের, তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে ভারি মনে হয় দেহটা। আজ গাঁয়ে ঘরে পৌঁছতে না পারলে গাঁয়ে ফেরা হয় তো তার মিছেই হবে, একটা রাত ঘরে থাকতে পারবে না, গাঁয়ের লোকের সাথে আলাপ করতে পারবে না, ওয়ারেন্ট এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতেই সময় যাবে।

হাজতবাসের দিনগুলিতে কি ঘটেছে গাঁয়ে, কেমন আছে তার গাঁয়ের লোক আপন জন, কি করছে তার ফুলবানু, দেখে শুনে জেনে বুঝে না নিলে তো চলবে না তার!

চলতে চলতে রাত ঘনিয়ে আসে, অস্পষ্ট হয়ে আসে দিবা আর দিক্‌চিহ্ন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সাধু সেখ। দূরে, অনেক দূরে, ও কিসের আলো? তারার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে আকাশে ঝুলে আছে?

আল্লা, রাজবাড়ীর স্বাধীনতা উৎসবের ফানুষ বাতিটাই শেষে তাকে গাঁয়ের পথ দেখালো! আজও ওরা ওই বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছে?

ওরা পারে। রাজবাড়ীতে স্বাধীনতা উৎসবের ফানুষ বাতি দু'তিন মাস জ্বালিয়ে যেতে পারে। গাঁয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে সাধু দেখতে চায় ডিবরি পিদিম জ্বলছে কিনা তাদের ঘরে।

কুয়াশা ঘুঁটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গন্ধময় ঘন রাত নেমেছে হাতিয়াদলে। সবার

আশায় ভরা উৎসুক দিনটা শেষ হয়েছে হতাশায়। আজ আর তবে এল না মহীন শ্রীপতি সাধু সেখ। এস্তেআলি মিছেই তাদের ফাঁকা খবর দিয়ে ভুলিয়েছে যে ওরা তিনজনেই ছাড়া পেয়েছে, গাঁয়ে ফিরছে। সকালে ওদের নিয়ে সদর সহরে সভা শোভাযাত্রার পালা, তারপর রওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ তিনজনে গাঁয়ে পৌছবে। বিকেল ফুরিয়ে এলে মাথা নেড়েছে হাতিয়াদলের মানুষ। এত সহজেই যেন হাজত থেকে মানুষ খালাস পায় ডাকাতির দায়ে কয়েদ হয়ে। ডাকাতি করেছে না করে নি, মানুষ ওরা ভাল কি মন্দ সে তো আইনের প্যাঁচ বাবা, দায়ে তো ফেলেছে ডাকাতির। বিষ্টু সাধুখাঁর আড়ত লুটে জেলে গিয়েছিল সুদাস ঘোষেরা। আজ ছ'সাত সাল কাটল তারা ফিরেছে কি? এমন আজগুবি খবর দেয় কেন এস্তেআলি? ঘরে বাইরে এস্তেআলির মুসকিল।

সে যত বলে কোন কারণে হয় তো তারা আটকে গেছে কাল নিশ্চয় ফিরবে, গাঁয়ের লোক বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে।

বলে, খপর দিত। তোমার মত মোদের অত হেলাছদ্দা করে না এস্তেআলি, না এলে খপর দিত আজ এলো নি, কাল এসবে।

কিছুদিন আগেও সচ্ছল অবস্থা ছিল এস্তেআলির, ধানের সচ্ছলতা। তখন যা ছিল মানুষটার কঠিন একগুঁয়ে স্বভাব, আজ সবার কাছে তা হয়েছে হেলাছদ্দা, অবজ্ঞা। মানুষটা সব কিছুতে যুক্তি খোঁজে, সোজাসুজি বিশ্বাস করা অবিশ্বাস করার চেষ্টা তার কাছে বিরক্তিকর বাধার মত। অথচ তাকে আজ আগের চেয়ে সমান মনে হয়, আপন মনে হয়। নিজেদের নতুন চিন্তাচেতনার মত তাকে নিয়ে তাই বিব্রত বোধ করে হাতিয়াদলের চাষী সমাজ।

তার নিকা বৌয়ের তোতলামি আজ বেড়ে গেছে। ধৈর্য্য ধরে তার কথা শোনা আর মানে বোঝা হয়েছে কঠিন ব্যাপার। তবে দু'চারবার বোঝার পর টের পাওয়া গেছে জিজ্ঞাস্য তার একটাই। সাধু সেখের সম্বন্ধে। উত্তেজনা আর তোতলামি বাড়ার কারণটাও তাই।

সাধু সেখের সে ভাতিজা, মেয়ের মত তাকে মানুষ করেছে লোকটা। নিকার পরেও তোতলা ফুলবানু মসগুল হয়ে আছে মানুষটার বাপের বাড়ীর দরদে। অনেক ভেবে চিন্তে এস্তেআলির সাথে মেয়েটার নিকে বিয়েই বরদাস্ত করেছিল সাধু সেখ। বেশ কিছু বোকা হাবা তোতলা মেয়ে ফুলবানু. এস্তেআলির সাথেই তার বনবে ভাল। রূপযৈবনের কাঙাল এস্তেআলি, একদম পাগল বলা চলে। সাদি বৌটা তার চালাক চতুর কাজে কর্ম্মে পটু, কিন্তু দেখতে মোটে তেমন নয়। অনেক বছর এস্তেআলিকে মজিয়ে রাখবে ফুলবানু।

ততদিনে ছেলে হবে মেয়ে হবে, ঘরসংসার জমাট বেঁধে উঠবে। পাগলামিও কমে যাবে এস্তেআলির।

ফুলবান্নু ঘর করতে এসেছিল কেঁদেকেটে সর্দ্দিভরা নাকের নোলক ছিঁড়ে রক্তপাত করে। তার আহ্লাদ আবদার সমানই বজায় আছে। চোত ফাল্গুনে তার বাচ্চা হবে।

সাথে করে না এলে কিসের জন্য?—এই হল মোট জিজ্ঞাসা ফুলবান্নুর। তার পেরাণের আসল জিজ্ঞাসাটা বুঝতে সাঁঝ পেরিয়ে গেছে এস্তেআলির। আগে একা না চলে এসে এস্তেআলি যদি সাধু সেখকে ফুলবান্নুর দোহাই দিয়ে সাথে নিয়ে আসত, ফের কিছু একটা কাণ্ড করে বসার সুযোগ পেতনা সাধু সেখ। নিশ্চয় সে ফের হাজতে গেছে, নয় গুলি খেয়ে জখম হয়েছে নইলে এল না কেন? এত দূর থেকে প্রাণের টানে ফুলবান্নু টের পেয়েছে। সাধু সেখের জন্য মুর্গী যে রেঁধেছে ফুলবান্নু, এখন তা খাবে কে?

এটা আন্দাজ করে ভড়কে যায় এস্তেআলি। কলকের গুলপোড়া তামাকের ধোঁয়া টেনে নিয়ম মাফিক ছাড়তে ভুলে একচোট সে কাসে। বড়বিবিকে শুধোয় কাসি সামলে, কোন মুর্গী?

—ছোট মোরগটা।

কলকের আগুনে ফুলবান্নুর গোবরমেশানো রাঙামাটি লেপা ঘরের ভিতের মত মসৃণ চামড়ায় ছেঁকা দিয়ে ফোস্‌কা পেড়ে প্রায় ফেলেছিল এস্তেআলি, পেটের মধ্যে উদ্ভূত একটা খিদের আগুণ চাড়া দিয়ে ওঠায় দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ক্ষান্ত হয়। মুর্গি! মুর্গির ঝোল আর ভাত! বাড়ী ফিরতে ফিরতে তেপান্তরের মাথা ভাঙ্গা সারা মাঠটা সে হিসাব করতে করতে এসেছিল, বড় মোরগটা বেচে দেবে পাঁচসিকে দেড়টাকায়। তাছাড়া আর দিন চলার, একটা দিন চলার উপায় নেই। সদর বাজারে ওটার দাম ন'সিকে আড়াই টাকা, গগন ভট্টচার্য্যি বাবু নিত্য ওর চেয়ে বেশী দরে সায়েব পাড়ায়, ইষ্টিসনের সাহেবী খানাপিনার হোটেলে, বাজারের ধারে মাগীপাড়ায় কত মুর্গি বেচেছে। হাতিয়াদলে রাজবাড়ী আছে, ইস্কুল আছে, থানা আছে, চাখানা, রেস্তঁরখানা আছে, সবই রাজবাড়ীর কাছে পাকা রাস্তায়। পুলিশের লোকের তাঁবু পড়েছে রাজবাড়ীর দীঘির পাশে মাঠ জুড়ে। ওখানে হয়তো বা বড় মোরগটার দাম সাতসিকে দু'টাকা মিলে যেতে পারে!

তবে সে সাহস না করাই উচিত হবে। হয় তো কেড়েই নেবে চুরি করা মুর্গি বলে, তার চেয়ে—

বড় মোরগটা গেলে, ছোট মোরগ আর দুটো মুর্গি থাকবে। ছোট মোরগটা থেকে মুর্গি দুটো আর ডিম পাড়বে কিনা জানা নেই।

এত জটিল হিসাব ছিল এস্তেআলির। গাঁটে একটা আধলা নেই, সদর ইষ্টিসানে

মুটেগিরি আর বিনা টিকিটে রেলগাড়ীর সিঁড়িতে বসে ভোলাঘাট ইষ্টিসন তক চোরা চাল পাঁচ দশসের চাল পৌঁছে দিয়ে দৈনিক টাকা খানেক রোজগারের ফিকিরে কাল সদরে গিয়েছিল। সাধু সেখের পাল্লায় পড়ে আজকেই গাঁয়ে ফিরল!

—মুর্গি আন, ভান আন, হারামজাদির!

একা নয়, দুই বিবির সাথে বসে মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত খায় এস্তেআলি, তার ভাঙ্গা ফতুর কুঁড়েতে যেন ভোজবাজির ভোজ! বড়বিবির দিকে আড় চোখে চেয়ে চোখ টিপে সে মুরগীর একটা ঠ্যাং ফুলবানুর ভাঙ্গা তোবড়ানো এল্যুমিনিয়ামের থালায় তুলে দেয়। বাসনকোসন প্রায় গেছে।

ফুলবানু মুষড়ে গেছে। খেয়ে উঠে তামুক না পেয়ে মুষড়ে যায় এস্তেআলি।

পেরাণটা কেমন করে বাপটার লেগে, বোঝোনা তুমি? বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করে ফুলবানু।

বড়বিবি ধোয়ামোছা করছিল, কয়েক লহমা ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁদন শুনল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ফুলবানুর গালে। মা যেমন মেয়েকে মারে।

এস্তেআলি ধীরে ধীরে মাথা দোলায়, মেয়ের ভালর জন্য মা তাকে শাসন করলে স্নেহশীল বাপ যেমন সায় দেয়। বলে, একটুক্ তামুক খাওয়াতে পারিস কাল্লুর মা? পারিস যদি তো তোতে মোতে আজ হুঁ হুঁ।

দিই তামুক, দিই।

ফোঁস করে ওঠে ফুলবানু বড়বিবি কিছু বলার আগেই। বলে সে বেরিয়ে যায় তামাক চেয়ে আনতে বাপের বাড়ী থেকে। কাছাকাছিই বাড়ী সাধু সেখের তবু সাঁঝের পর কমবয়সী পোয়াতি বৌয়ের পক্ষে সেটাও অনেক দূর বৈকি।

হারামজাদির সাথে পারি না। এস্তেআলি বলে।

সেই যে যায় ফুলবানু আর তার দেখা নাই।

হারামজাদির সাথে পারি না।—ফের বলে এস্তেআলি উঠে লাঠিটা বাগায় বেরোবার জন্য। বহুদিন পরে মাংস ভাত খেয়ে তার ঘুম আসছিল। যদিও পেট ভরে নি, ভাত ছিল কম।

কোথায় আর খুঁজতে যাবে বৌকে তার বাপের বাড়ী ছাড়া? কোথায় গেছে জেনেও মনটা বশ মানে না। দিন চারেক ঘরবাড়ী খালি করে বনবাদাড়ে লুকিয়ে কাটাতে হয়েছিল, তারপর থেকে যখন তখন এদিক ওদিক চলাফেরা সড়গড় হয় মেয়েছেলেদের। পরে নাকি আরেক দফায় আরেক রাত্রি বনবাদাড়ে কেটেছিল, এস্তেআলি সে রাত্রে বাড়ী ছিল না।

সাধু সেখের বাড়ীতে বেশ ভিড় জমেছে।

সাধু বলে, বেটি বলল, খবর দি,' ডেকে আনি? মোর মজা লাগল গরজ দেখে। রোস না তুই, বসে থাক চুপ মেরে। এন্তেআলি হাজির হবে ঠিক।

সবার মুখে হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়।

গজেন বলে, মেয়ার নালিশের কথাটা বল, এত যে কাঁদলে? তোমার তরে মুর্গী র্াঁধলে, সাত তাড়াতাড়ি সেরে দিয়ে বসে আছে।

এ তামাসা নয়, যদিও বলা হয় তামাসা করার ঢং ও সুরে। এ স্রেফ খোঁচা দেওয়া, নিন্দা করা। হারু গলা খাঁকরি দেয়, সেটাও গলা খাঁকরি দেওয়া নয়, গজেনের খোঁচায় সায় দেওয়া।

পাঁচীর পিসী বলেই বসে, নোলা বটে বাবা!

অপমানের গরমে গোমড়া হয়ে উঠেছে এন্তেআলির মুখ। সে ঝেঁঝে বলে, রাত হয়ে গেল তুমি এলে নাকো, খাব না ত করব কি? র্াঁধা জিনিষটা ফেলে দেব!

ধপ করে সে বসে। আবার বলে, যত শালার ঝকমারি। আর মুর্গী নাই? কাল রেঁধে খাওয়াতে মানা কার? কাঁদাকাটি নালিশ বজ্জাতি, হাঃ!

চাল কুথা পাব কাল? আড়াল থেকে ফুলবানু শোনায়, চাচা কাল রইবে নি!

রইবে নি? এন্তেআলি অবাক হয়ে শুধায় সাধু সেখকে।

সবার এত বদমেজাজের, ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুঁতটা এত বড় করার কারণটা তখন সে টের পায়। ছেড়ে দেবার দু'ঘণ্টা পরে শ্রীপতি আর মহীনকে ফের ধরেছে নতুন দায়ে নতুন ওয়ারেন্টে। সাধুকেও ধরত, সে চালাক মানুষ, ব্যাপার আঁচ করে আগেই কেটে পড়েছে।

পেরাণ চাইল না বাবা আর আটক রইতে। কিছুকাল ফেরার থাকি, গা ঢাকা দিয়ে। ও সরকারী শ্বশুর ঘরে মোটে মন বসে না।—দাড়ির ফাঁকে সাধু সেখ হাসে, ইংরেজ ভেগে গেছে কবে, আইনকানুন পালটে যাবে সব আজ না তো কাল। না যাবে না? জমিদার জোতদার রইবে না, দারোগা পুলিশ মোদের পিটতে এসবে না ওদের হয়ে। দেশের মানুষ রাজা হয়েছে চাষী পেরজা মোদের কথা মানবে না? কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কি? তবু গোড়ায় পেরাণটা কেমন করল।

শ্রীপতির ভাই ভূপতি বলে, ওরা কলা দেখিয়ে সরে পড়তে পারল না?

ছেড়ে দিয়ে আবার ওদের ধরার বিবরণ দেয় সাধু। জেলের দরজাতেই ফের নাকি ধরত তাদের, পরোয়ানা এসে পৌঁছতে দু'ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল কি গোলমালে, সাধু পরে শুনেছে। এদিকে তাদের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই ছুটোছুটি করছে তাড়াতাড়ি শোভাযাত্রা বার করে দিতে, তারা তিনজনে বসে ফুঁকছে বিড়ি। আল্লার কি মর্জ্জি, বিড়ি ফুঁকতে সুখ

পেল না, তাদের ইচ্ছে হল তামুক খাবে। একবাবু পয়সা দিল, আর সাধু গেল দোকান থেকে তামুক আনতে, বাবুদের ঘরের মিঠে তামুক তো মুখে রুচবে না। দোকান আর কদ্দূর, এই সাধুর বাড়ী থেকে শিবমন্দির যতটা ততটা হয় কি না, যেতে আসতে কতটুকু বা সময়। তারি মধ্যে ঝপ করে পুলিশ এসে খপ করে ফের ওদের দু'জনকে ধরে ফেলল। দূর থেকে লালপাগড়ী দেখে—

পেরাণটা খানিক যে কি ওলটপালট করল কি বলি তুমাদের। ভাবলাম কি যে দুস্তোরি মোর মন্দ মতি, একলাটি পেলিয়ে যাব, একসাথে হাজত থেকে বেরুলাম তিনজনায়? বেচে যাই, ধরা পড়ি, একসাথে ফের হাজত যাব। তা মোদের ওই নকুল মাইতি, ইস্কুলে পড়ছে ক্লাশ্টো কেলাশে, ঘরে একটি পাশে সে মস্ত মস্ত হরফে লিখতে ছিল শোভাযাত্রার নুটিশ। দু'পা এগিয়েছি ধরা দেব বলে, দেখি সে নকুল এসছে এদিক উদিক চাইতে চাইতে। সেই মোকে ভাগিয়ে দিলে। বললে সে, ডুব মেরে থাকবে যাও, সবার সাথে উপোস করবে যাও, জেলের ভাত খায় না।

পেরাণটা, ভূপতি বলে, জানো সাধু, পুড়তিছে ভাইটার লেগে। নিরেট কথা বলি, মন করে কি, জেলের ভাত খাক। ঘরে ফিরে ভাত পাবে না, জেলের ভাত খাক। জানো সাধু, ওর বৌটা মরেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। খপরটা চেপে গেছি।

ভূপতির চেহারাটাই জ্বর আর উপোসের চরম প্রমাণ। অত প্রকট না হোক প্রমাণের ছাপটা আছে সবার চেহারাতেই। একই মনেও। কেউ তাই কথা কয় না!

•

লোক বেড়েই চলে সাধু সেখের দাওয়ায়। দেখা যায় গাঁয়ের লোক শুধু নয়, আশে-পাশের গাঁয়ের লোকও আসছে। মন্দ চাষী নয় সবাই। অনেক মেয়েলোক, নানা বয়সের।

এসো মোরা দীঘির পাড়ে বসি।

অশোক রাজার আমলের দীঘি শুকিয়ে বুজে পুকুর হয়ে গেছে। তারও পাড়ে দুর্ব্বা ঘাসের আসন। অঘ্রানের শীতের রাত্রে নিরুপায় হয়ে তারা সেইখানে গিয়ে বসে। কি ঘন আঁধার রাত, কি ঘন কুয়াশা। তার মধ্যে রাজবাড়ীর ফানুষ আকাশ-প্রদীপ ঝাপসা দেখা যায়।

সাধু সেখ বলে, ওই ফানুষটা ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আসতে পার তোমরা কেউ?

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী ভারতীয় সমাজে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মশিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং বৈদিক হিন্দুধর্ম্মকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম আন্দোলনের মূলে কি কি কারণ নিহিত ছিল এবং সেই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল হিসাবে বিচার করা হয়। মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রিয় পুত্র সিদ্ধার্থ রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক দুঃখশোক হইতে মুক্তিলাভের পন্থা সন্ধান করিয়া অবশেষে সফলকাম হইলেন এবং অশান্তিক্লিষ্ট মানব সমাজকে নূতন পথের সন্ধান দিলেন—ইহাই হইল বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব যে বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা অনস্বীকার্য্য, তাঁহার স্থান পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম-প্রচারক হইতেই নিম্নে নহে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই কি চরম সত্য? আমরা জানি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে শুধু বুদ্ধদেবই নহেন, বর্দ্ধমান মহাবীরও প্রতিবাদের সুর উত্থিত করিয়াছিলেন, এবং ইহাও সত্য যে বুদ্ধদেবের ও মহাবীরের ধর্ম্ম দ্রুতগতিতে ভারতীয় সমাজে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের কি কোন সামাজিক কারণ ছিলনা? তাহা কি সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর উপযোগী ছিল না? বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে কি কোন সামাজিক প্রয়োজন সাধিত হয় নাই? এই সকল প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা না করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হইতে পারে না।

ইতিহাসের ক্রমবিকাশে মহাপুরুষদের কৃতিত্ব কতখানি তাহা লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা বর্ত্তমান আলোচনায় অগ্রসর হইব তাহার সহিত এই বিতর্কের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার প্রত্যক্ষ সামাজিক কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব, কিন্তু যে সকল ভাব সামাজজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের সামাজিক মূল খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব নয়। ইতিহাসকে যদি সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে যে সামাজিক প্রেরণা থাকে তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি না থাকিলে ইতিহাস পাঠ বিফল হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম, কনফুসিয়সের শিক্ষা, মহম্মদের ধর্ম্ম, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কার—ইহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে

নিছক ব্যক্তিগত প্রতিভা ব্যতীত সমগ্র সামাজিক জীবনের আবেগ ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম শুধু ধর্ম্মবিপ্লব ছিল না, তাহা ছিল সামাজিক বিপ্লব। কনফুসিয়সের শিক্ষা তাঁহার সমসাময়িক চীনা সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজনে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইসলামকে কেন্দ্র করিয়া আরবীয় বণিকদের বাণিজ্যপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছিল। ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কারের সামাজিক পটভূমিতে ছিল ধ্বংসপ্রায় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান পুঁজিবাদী স্বার্থের বিদ্রোহ। সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিতে হইবে, দেখিতে হইবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের কোন স্তরে বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হইয়া বুদ্ধদেবের শক্তিশালী প্রতিভার ভিতর দিয়া রূপ পাইয়াছে কিনা।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে অন্যান্য ধর্ম্মবিপ্লবের মত বৌদ্ধধর্ম্মেরও দুইটি দিক আছে। নিছক ধর্ম্ম বা তত্ত্বকথার দিক এবং সামাজিক দিক। তত্ত্বকথার সঙ্গে সামাজিক আদর্শের যে সংযোগ থাকে না এমন নয়, তবে সেই সংযোগ অনেক সময় স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে না। তাহা ছাড়া প্রত্যেক ধর্ম্মশিক্ষাতেই কিছু অংশ থাকে যাহা চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করে, যদিও প্রকাশের রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। সেজন্য আমরা বর্ত্তমান আলোচনায় বৌদ্ধধর্ম্মের সামাজিক রূপের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিব। আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মবিপ্লব বলিতে আমরা যে কেবল ধর্ম্মপ্রচারকেই বুঝিব তাহা নয়, ধর্ম্মবিপ্লব বলিতে ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী, সমাজের যে অংশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রসার লাভ করে সেই অংশের আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, সমসাময়িক জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ—এই সমস্তই বুঝিব। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সমাজের চারিদিকে প্রসারিত ছিল, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিস্তৃত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমগ্র রূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

একথা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে বৈদিক সমাজের প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। বৈদিক যুগের শেষের দিকে উপনিষদেও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে এই দিক হইতে বিচার করিলে উপনিষদের মন্ত্র-বাহক বলা যায়। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপে তাহার জন্ম বলিয়াই কি বৌদ্ধধর্ম্মকে গণতান্ত্রিক ধর্ম্ম বলা যায়? বৈদিক ধর্ম্মের যে বিশেষ অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছিল তাহা হইতেছে ধর্ম্মের নামে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য। এই ক্রিয়াকলাপের একটা সামাজিক দিক আছে। ইহাদের সম্পাদনের জন্য একশ্রেণী অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন, এবং এই শ্রেণী হইতেছে ব্রাহ্মণ শ্রেণী। সুতরাং ধর্ম্ম হইতে ক্রিয়াকলাপ বর্জ্জন করিয়া তাহাকে পবিত্র করার যে

প্রচেষ্টা তাহার ভিতর ব্রাহ্মণদের প্রতি আক্রমণ নিহিত ছিল। যাগযজ্ঞ লোপ পাইলে ব্রাহ্মণদের সামাজিক উপকারিতা লোপ পায়, তাঁহাদের প্রভুত্বের ভিত্তি নষ্ট হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য যে বিপন্ন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের পরিপন্থী ছিল বলিয়াই কি বৌদ্ধধর্ম্মকে গণ-তান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া কি ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লব মূর্ত্ত হইয়াছিল? এই নব ধর্ম্ম কি জনগণের সম্মুখে এক শ্রেণীহীন, প্রভুত্বহীন, সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিল?

ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্নের পরস্পরবিরোধী উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম গণতান্ত্রিক ধর্ম্ম, জাতিভেদের শত্রু সাম্যবাদের প্রচারক। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আপাতঃদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ যতই গণতান্ত্রিক হউক না কেন, কার্য্যতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ লোপ করে নাই, সাম্যের বাণী প্রচার করে নাই। বিখ্যাত পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ তাঁহার রচিত বুদ্ধ-জীবনীতে অতি স্পষ্টভাবে এই মত প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সারাংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—"If anyone speaks of a democratic element in Buddhism, he must bear in mind that the conception of any reformation of national life, every notion in any way based on the foundation of an ideal earthly kingdom, of a religious Utopia, was quite foreign to this fraternity. There was nothing resembling a social upheaval in India."[১] সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, aristocratic religion।[২] কোন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার উপায় কি? প্রত্যেক ধর্ম্মবিপ্লবই সার্ব্বজনীন আবেদন লইয়া জন্মলাভ করে, সকল মানুষের জন্যই সেই ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন আবেদনের মূল্য কতখানি তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। আবেদনের সার্ব্বজনীনতা সত্ত্বেও সমাজের কোন বিশেষ বিশেষ অংশে তাহা প্রচারলাভ করে, সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ধর্ম্মের এই সামাজিক রূপ বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে ঐতিহাসিকের মন মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের সামাজিক রূপ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে এই সত্যে উপনীত হইব যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে জন্মলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু, এই বিদ্রোহ তাহাকে গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী সামাজিক বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করে নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের সামাজিক রূপ বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমাদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে কাহারা এই ধর্ম্মের প্রভাবে

আসিয়াছিল ? অর্থাৎ সমাজের কোন শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধদেবের বাণী সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ নাই। ওল্ডেনবার্গ ও রিচার্ড ফিক—এই দুই জার্মাণ পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে সামাজের দুইটি উচ্চতর—ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠী হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মমতের সমধিক সমর্থন পাইয়াছিলেন। পালি সাহিত্য পাঠ করিলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, যেমন আনন্দ, রাহুল, অনুরুদ্ধ, প্রভৃতি তাহাদের অধিকাংশই এই দুই শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। শূদ্র এবং চণ্ডালের নাম পাওয়া যায় না।[৩] ব্রাহ্মণ শিষ্যের নাম অবশ্য পাওয়া যায়, যেমন সারিপুত্ত, কিন্তু ইহা সত্য যে মোটের উপর ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভিতর বুদ্ধদেবের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই। এই শ্রেণীর সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক কি ছিল তাহা এখন আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের অনুকূল ছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিতর ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের প্রতি আঘাত নিহিত ছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল একথা বলা যায়। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার স্বরূপ কি ? বুদ্ধদেবের শিষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ অনেকে ছিলেন, অনেক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বুদ্ধদেবের সহায়তা করিয়াছিলেন পালি সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণী বৌদ্ধধর্ম্মকে শত্রু বলিয়া মনে করে নাই। অথচ ইহাও ঠিক যে সমসাময়িক পালি ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে প্রবল রেষারেষি ছিল তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণদের স্থান সমাজের শীর্ষে, আবার পালি সাহিত্যে শীর্ষ স্থান দেওয়া হইয়াছে ক্ষত্রিয়কে। এই ক্ষত্রীয়শ্রেণীই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে অগ্রণী হয়, এবং পালি সাহিত্যে তাহাদেরই জয়গান দেখা যায়। মহারাজ বিম্বিসার হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট অশোক পর্য্যন্ত রাজন্যশ্রেণীই বৌদ্ধধর্ম্মকে শক্তিশালী করে এবং শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় উহাতে অর্থপুষ্ট করে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণশ্রেণী মিত্রভাবেও গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই সমস্যার সমাধান হয় যদি আমরা ব্রাহ্মণশ্রেণী বলিতে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। ডাঃ রিচার্ড ফিক বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে নামে ব্রাহ্মণ হইলেও সকল ব্রাহ্মণই এক স্তরের বা এক সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও স্তরভেদ ছিল।[৪] মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুইভাগ ছিল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—যাঁহারা শাস্ত্রীয় মতে জীবন যাপন করিতেন, আর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যাঁহারা অনেক সময় অব্রাহ্মণীয় উপায়ে—যেমন কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পেশা হিসাবে বৈশ্য হইতে পৃথক ছিলেন না, এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের একটু হেয় মনে করিতেন। এই গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণই বৌদ্ধধর্ম্মকে সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে বিরোধিতার আভাষ পাওয়া যায় তাহার মূল কি? প্রাচীন ভারতে শ্রেণীসংগ্রাম ছিল কিনা তাহা লইয়া আজকাল কিছু আলোচনা হইতেছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার Studies in Indian Social Polity গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল caste বা বর্ণভেদ নহে, class বা শ্রেণীভেদ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের লক্ষ্য ছিল সামাজিক প্রভুত্ব। বুদ্ধদেবের যুগে এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রাচীন ভারতে শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সেই মতবাদ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের বিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একথা বলা যায় যে ব্রাহ্মণের সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি একটি প্রধান ঘটনা। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ক্ষত্রীয়শ্রেণীই করে নাই, বৈশ্য সম্প্রদায়ের এক অংশ বণিক সম্প্রদায়ও করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসুর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—"...the ideal of Buddhist republicanism was the replacement of the Brāhmaṇa priesthood by the Seṭṭhis and gahapatis and their royal alliese... The economic background of Buddhist heresy is the combination and revolt of the two powerful class interests—the military and the mercantile—against the old manopoly interests af Brāhmaṇa priesthood."[৫] এই সাধারণ সত্যটি মনে রাখিয়া আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের সামাজিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয় পূর্ব্ব ভারতে, এবং পূর্ব্ব ভারতীয় সমাজ অনেক বিষয়ে পশ্চিম ভারত হইতে পৃথক ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল পশ্চিম ভারতে, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশে। পূর্ব্ব ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণভাবে আর্য্যসমাজের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ফলে পূর্ব্ব ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব শিকড় বসাইতে পারে নাই। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণেরা যে সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন সেই মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত শক্তি তাঁহাদের ছিল না। জাতক সাহিত্যে যে তথ্য আমরা পাই তাহাতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সমধিক বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। শিল্পের উন্নতির ফলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, শ্রেণী বা guild-এর উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহারা সমাজে নিজেদের উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বতঃই তাহাদের মন উত্তেজিত হইয়া ওঠে। শিল্পের উন্নতির

সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার হয় এবং সমাজে অর্থবানের প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয়। এই যুগে শ্রেষ্ঠীরা ছিল রাজার সহচর ও বন্ধু। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে এই সময় ভারতের রাজনৈতিক বিকাশ হয়। এই সময় হইতেই পূর্ব্ব ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিতে থাকে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না, উত্তর ভারত তখন ষোড়শ মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সময় হইতে মগধকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় এবং নন্দ সাম্রাজ্যে এবং পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্যে তাহা পরিণতি লাভ করে। ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ যে আলেকজাণ্ডারের দান নহে, ভারতের বিরাট অংশ ব্যাপিয়া যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে এখন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে দুই ধারা আমরা দেখি, ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবিষয়ে বিশদ আলোচনা না করিলে সমসাময়িক ইতিহাস ভাল করিয়া বোধগম্য হইবে না। কিন্তু এই আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করা যাইতে পারে না। রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কি সংযোগ তাহাই আমরা এখানে দেখাইব। রাষ্ট্রীয় বিকাশের অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধি। রাজ্য আয়তনে যতই বড় হয়, রাজা ও তাঁহার অমাত্যদের ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পায়। রাজন্যশ্রেণীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে আঘাত পড়ে। ধর্ম্ম অপেক্ষা রাষ্ট্রের দাবী জনসাধারণের নিকট বড় মনে হয়, এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রাজা ও অমাত্যবর্গ লোকচক্ষুতে উচ্চস্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব ভারতীয় সমাজে তাহাই হইয়াছিল। একদিকে রাজন্যশ্রেণী, অপরদিকে ব্যবসায়ী ও বণিক এই দুইএর আক্রমণে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিপন্ন হইল।

বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সহিত তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দৃঢ় সংযোগ ছিল, এবং এই সংযুক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণদের স্থানে ক্ষত্রিয় ও ধনিকশ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করা। ক্ষত্রিয় ও বণিক সম্প্রদায়ের শক্তি যে অঞ্চলে বেশী সেই পূর্ব্ব ভারতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম, এবং পূর্ব্ব ভারতই সম্রাট অশোকের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে প্রচার লাভ করা সহজ হইয়াছিল। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে এই যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইয়াছিল। মহাবীরের প্রচারিত ধর্ম্মও এই দিক হইতে বিচার করিলে এই সামাজিক

আলোড়নের একটি অঙ্গ। বৈদিক যুগের শেষের দিকে উপনিষদে এক পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। চিন্তাজগতে এই যে বিপ্লব তাহা এক অনুকূল পটভূমি থাকার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। উপনিষদের চিন্তাধারা শুধু যে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি এমন মনে করিবার কারণ নাই। এই যুগে ক্ষত্রিয়গণ অধ্যাত্মশক্তিতে ব্রাহ্মণদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এবং জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া বৈদিক ধর্ম্মের সহিত নিজেদের বিচ্ছেদ ঘোষিত করে।[৬]

কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধিতা অস্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধের জীবনী-রচয়িতা ওল্ডেনবার্গ একদিকে যেমন বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম গণতান্ত্রিক ছিল না, তেমনি অপরদিকে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে শত্রুজ্ঞান করিত না। তাঁহার যুক্তি হইতেছে এই যে, ব্রাহ্মণদের সহিত বৌদ্ধদের সংঘর্ষের কোন চিত্র আমরা পাই না এবং বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করিয়া একথা মনে হয় না যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি বৌদ্ধদের নিকট শত্রু বিবেচিত হইত। এই যুক্তির বিপক্ষে একথা বলা যায় যে, সমসাময়িক ইতিহাসের উপকরণ কম বলিয়া সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ আমরা আশা করিতে পারি না। তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে রেষারেষি ছিল তাহা সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্য পড়িলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, এবং জাতকে শ্রেষ্ঠসম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয়ের মিত্ররূপে দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরা যে বৌদ্ধদের বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে এই সংঘর্ষ কখনও প্রবল আকার ধারণ করে নাই। পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয় ও বণিক সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এই সংঘর্ষ নূতন রূপ পাইয়াছিল মাত্র। সমগ্র সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণী শূদ্র এবং বৈশ্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ যে কোন বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইহাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে কোন সামাজিক শ্রেণীই চিন্তাবিপ্লবে অংশগ্রহণ করিতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব না, কারণ তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরে করা যাইতে পারে না। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সমাজের চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় তবে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই নূতন করিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বিরোধিতার যদি সত্যিই কোন সামাজিক ভিত্তি ছিল, তবে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পতনের সামাজিক কারণ

কি এবং তার ফলাফল কি ছিল এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃতির কি কারণ ছিল, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে লুপ্তপ্রায় হইল কেন, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তসম্রাটদের আমল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার সহিত এই সময়ের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের কি কার্য্যকারণ সম্পর্ক দেখান যাইতে পারে? প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জড় ও নিশ্চল ছিল না, গতি ও পরিবর্ত্তনের স্পন্দন তাহাতে ছিল। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিককে সেই পরিবর্ত্তনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে, তাহা না করিলে পরস্পর সম্পর্ক বিহীন তথ্যের চাপে ইতিহাস নিষ্প্রাণ হইয়া যাইবে।

১ ওল্ডেনবার্গ রচিত বুদ্ধ-জীবনীর ইংরেজী অনুবাদ, ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ "We cannot say that Buddha abolished caste, for the religion of Buddha is an aristocratic one...we cannot say that Buddha effected any social revolution." রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy vol. I, ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

৩ ওল্ডেনবার্গ-রচিত বুদ্ধজীবনী, ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪ রিচার্ড ফিক প্রণীত Social Organisation in North-East India দ্রষ্টব্য।

৫ ডাঃ অতীন্দ্র নাথ বসু প্রণীত Social and Rural Economy of Northern India গ্রন্থের ৪১৮ ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬ রিচার্ড ফিকের Social Organisation গ্রন্থের ৯০-৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তেত্রিশ

কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেইটে দেখবার কথা নয়, কোন দিকে চলেছি সেইটেই দেখবার কথা। যে যাই বলুক, পিছু হটা নয়, যেতে হবে এগিয়ে। সতর্কতার মরুভূমি থেকে অভিজ্ঞতার কণ্টককুঞ্জও ভাল।

রাত্রে ঘুম আসে না তামসীর।

'একটা খুব সুন্দর সুখস্মৃতির কথা ভাবো—দেখবে ভাবতে ভাবতে ঠিক কখন ঘুম এসে গেছে।' পাশ ফিরতে ফিরতে বললে হাসিনী।

সুখস্মৃতি। তামসী অন্তরের সুদূর অন্ধকারে অন্বেষণ করতে লাগল। রাত্রির প্রথম যাম থেকে শেষ যাম পর্যন্ত। যেন অন্তহীন এক কণ্টকারণ্যের মধ্য দিয়ে সে হাঁটছে। বৃন্ত ধরছে কিন্তু ফুল খুঁজে পাচ্ছে না। বিকাশে সৌরভে, আপনার উদ্ঘাটনে, আপনি সম্পূর্ণ যে ফুল। খুঁজে পাচ্ছে না একটি নিটোল-নিবিড় নিচ্ছিদ্র মুহূর্ত্ত। আপনার রঙে রসে সমুজ্জ্বল।

'গায়ের জামা-কাপড় সব খুলে ফেল। আমার কাছে লজ্জা কি।' ঘুমে-জড়ানো গলায় হাসিনী বললে, 'দেহে-মনে সমস্ত বাঁধন-আটন আলগা করতে না পারলে ঘুম আসে না।'

হাসিনীর সেই শ্লথ-মুক্ত স্থূলচর্ম ঘুম তামসীর অসহ্য লাগতে লাগল। এই কি পরিতৃপ্তির চেহারা? এই কি সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত?

মাঝরাতে হাসিনীর একবার ঘুম ভাঙল বুঝি। বললে, 'কি, তোমার এখনো ঘুম এলো না? এসো গল্প করি তোমার সঙ্গে। গল্প করে ঘুম পাড়িয়ে দি।'

তামসী জানে, কি এই গল্প। যত বিকারাচ্ছন্ন যৌনলীলার বর্ণনা। নিরবয়ব নিষিদ্ধ কৌতূহলে তাকে ক্লিন্ন ও ক্লান্ত করা। বললে, 'না, ভগবানের নাম করছি।'

ছেলেবেলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত মনে আছে। বিশেষত, পরীক্ষার হলে ঢোকবার সময় বেড়ে যেত সেই আকুতি। ভগবান আছে কি নেই, ডাকলে ফল হয় কি না হয়, কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি। ডাকতে ডাকতে মনে একটা স্নিগ্ধতা আসত, অনেকক্ষণ কাঁদার পর যেমন আসে। বাবা মারা যাবার পর আর সে কাঁদেনি বুক ভরে। অনিদ্রাক্রান্ত অন্ধকারে এখন সে সেই স্নিগ্ধতার কামনায় অধীর হয়ে উঠল। কাঁদবে? কিসের জন্য কাঁদবে? তার চেয়ে যাকে দেখা যায় না, যাকে পাওয়া যায় না সেই অগোচরবাসীকে সে স্মরণ করুক। ভাবুক আত্মস্থ হয়ে।

সকালে উঠে ছিমছাম হয়ে তামসী বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করলে। হাসিনী আপত্তি করলে না। সকালে দুপুরে বিজ্ঞাপন দিয়ে না রাখলে নৈশ প্রদর্শনী জমবে কি করে? শুধু বললে, 'ফুরফুর কোরো শুধু, উড়ে পালিও না।'

তামসী রাস্তায়-রাস্তায় এ-বাড়ি ও-বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগল। কোথাও যদি একটা চাকরী পায়, একটু মার্জিত আশ্রয়। হদ্দ হল সে ঘুরে-ঘুরে। কোথাও এতটুকু প্রশ্রয় বিনয় মিলল না। যারা বা দুয়ার থেকেই প্রত্যাখ্যান করলেনা, তারা সবাই তার অতীত সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসু, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নয়। কুটিলগামিনী নদীর অতীত অপরিচ্ছন্ন বলে কি ভবিষ্যতে তার সিন্ধুসংযোগ হবে না? দেখুন আমার বর্ত্তমান, কাজ আর ব্যবহার, দেখুন আমার ভবিষ্যৎ, একটা ভদ্র চাকরী না পেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, অতীত আলোড়ন করে লাভ কি?

কে শোনে এই সব শূন্য কথা? উপার্জনের পথ না পেয়ে রণধীর চোর হয়েছিল, সে হয়তো গণিকা হবে।

বারে-বারে বাইরে বেরোয়, বারে-বারেই আবার ফিরে আসে তামসী। হাসিমুখে বলে, 'ভগবানের ইচ্ছে নয় আপনার থেকে মুক্ত হই।'

'হ্যাঁ, ভগবানের ইচ্ছেটা অন্য রকম।' কড়ায়ের ভাজা মাছ খুন্তি দিয়ে একে একে উলটিয়ে দিতে লাগল হাসিনী।

'কি রকম?'

'আমাকেই এবার তিনি মুক্তি দেবেন। ভাজা মাছ ওলটাতে শিখে গেছ এতদিনে, তাই এবার রান্নাঘরে তোমার পালা।'

ব্যাপারটা বিশদ করল হাসিনী। একটা রাঘববোয়াল জালে পড়েছে। তামসীকে সে রাখতে চায় একটা উল্লেখ্য টাকার বিনিময়ে। এই খোলা-বস্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে কেতা-দুরস্ত আধুনিক ফ্ল্যাটে, শালীনতার পরিবেশে। হাসিনী হবে তার পাচিকা-পরিচারিকা, মাইনে যা মিলবে তাতে পোষাবে এই পদভ্রংশ। বয়স আর বপু বাড়ছে বই কমছে না, তাই যদি

বেলাবেলি পাকাপাকি হিল্লে হয়ে যায় সেইটেই বঞ্ছনীয়। তামসীকেও তো থিতু হয়ে বসতে হবে এক জায়গায়। দিন থাকতে আল বাঁধতে পারলেই তো সোনার থাল মিলবে। আর, বড়লোক ছোটবোন থাকতে কে অমন ছুটোছুটি করে!

তামসী এত দিন কুলীন পাড়ায় চাকরী খুঁজেছিল, এবারে নেমে এল নীচোস্তবের এলেকায়। যে করে হোক, চাকরী একটা জোটাতেই হবে, পালাতে হবে হাসিনীর পাপাবর্ত থেকে। পিশুন পৃথিবীর সঙ্গে তার স্নেহহীন, সমাপ্তিহীন যুদ্ধ চলেছে। তবু, এই যুদ্ধে, সে নিজেও যে সেই পৃথিবীর পক্ষে, পৃথিবীর দলে। তার নিজের বিরুদ্ধেই তো তার যুদ্ধ। ঠিকই হচ্ছে, এমনি করে পৃথিবী তাকে লাঞ্ছিত করুক, বিপর্যস্ত করুক, তবু পৃথিবীকেই সে সমর্থন করবে! এই তো তার পরীক্ষা, তার শুদ্ধীকরণ। এই যুদ্ধে যদি সে হারেও তবু তার অভিযোগ থাকবে না। তার পৃথিবীর জয়ে তারও জয় থাকবে অনুচ্চারিত। কেননা সে তার নিজের নয়, সে পৃথিবীর।

একটা কাঠের আসবাবের দোকানে সে চাকরি পেল। কাজ আর কিছু নয়, বিকেলের দিকে কয়েক ঘণ্টা চুপ করে এসে বসে থাকা। তার মানে, বিজ্ঞাপনপাত্রী হয়ে খরিদ্দার আকর্ষণ করা। সম্প্রতি দোকানের মালিককে যে আকর্ষণ করতে পেরেছে তাতে সন্দেহ কি। বাসা বদলাল তামসী, তার মানে হাসিনীর ডেরায় সে আর ফিরে গেল না। মালিকই তার এক ভাড়া-খাটা বাড়ির মধ্যে একটা পরিত্যক্ত ঘরে তাকে স্থান দিলে। বললে, 'কাজ ভাল হয়, প্রমোশন দেব। মাইনেতে তো বটেই, বাড়িতেও।'

তাকে শেষ পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে দেবেনা, স্পষ্টাক্ষরে তা জানে তামসী। একদিন নিশ্চিত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দেবে স্থূল হাত। সেদিনের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। নিজেকে অস্পষ্ট করে রাখবে, রাখবে কুহকবেষ্টিত করে। ছলনাময়ীর ছদ্মধারণ করে ব্যবধানটা লোভনীয় করে তুলবে। তাতেও ছাড়া না পায়, আঘাত হানবার সুযোগ না ঘটে, পরিষ্কার পালিয়ে যাবে। তখনকার কথা তখন। এখন তো একটু অন্তরাল, একটু আবরণ পাওয়া গেল। হাসিনীর উদ্যত মসীলেপন থেকে বাঁচাতে পারল মুখটা।

একদিন এই আসবাবের দোকানে এক নবদম্পতির আবির্ভাব হল। দরজার কাছেই চেয়ারের হাতলের উপর দুই হাত তুলে দিয়ে সচেতন ভঙ্গিতে চিত্রলিখিত হয়ে বসে ছিল তামসী, শুনলে, মোটর থেকে নেমে স্বামী স্ত্রীকে জনান্তিকে বলছে: 'এ কি, মিস পাবলিসিটি এখানে এসে জুটেছে দেখছি।'

নবপরিণীতা স্ত্রীর নম্র নেত্রও আকৃষ্ট হল। সেও চমকে উঠল একটু। বললে প্রায় আত্মগতের মত: 'আরে, সেই তামসী দত্ত না? শেষ পর্যন্ত এই দশা?'

'কেন, চেন নাকি ?'

'চিনতাম এক কালে। এক হস্টেলে ছিলাম পাশাপাশি। ঝানু মেয়ে, তখন থেকেই বেরুত বাইরে।'

'এখন একেবারে সরকারী ভাবে বেরিয়েছেন। বস্তির গলির মুখে না দাঁড়িয়ে আসবাবের দোকানে মিস পাবলিসিটি হয়েছেন। মানে, আরেকটি আসবাব হয়েছেন। আমি জানি ওর অনেক কীর্তিকলাপ।'

'কি, তা হলে ঢুকবে নাকি ?'

স্বামী অভয় দিল স্ত্রীকে : 'কাঠ কি দোষ করল ? কাঠের তো চরিত্র নেই।'

দু জনে দোকানে এসে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তামসী। নবোঢ়ার মুখের দিকে চেয়ে অনুকৃত বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বললে, 'আরে, সেই চন্দ্রমা সেন না ? শেষ পর্যন্ত এই দশা ?'

রাগবে ভেবেও রাগতে পারল না চন্দ্রমা। তামসীর দুই চোখের ব্যথিত কৃষ্ণিমা করুণ রাগিনীর মত হঠাৎ তাকে ছুঁয়ে গেল। বললে, 'ঢেউ আমার, আমি ঢেউয়ের নই। আমি জানতাম আমার সীমারেখা। তাই গণ্ডির মধ্যে জীবনের সুন্দর পর্যাপ্তি পেয়ে নিয়েছি। তুই ?'

'সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পেলে জীবনের উৎসব কোথায় ? গণ্ডির বাইরে না গেলে কি সোনার হরিণ ধরা যায় ?' তামসী হাসল।

'ধরতে পেরেছিস সোনার হরিণ ?'

'ধরতেই যদি পারব তবে তাকে মায়ামৃগ বলবে কেন ? অহর্নিশ শুধু তাকে খুঁজেই বেড়াচ্ছি।'

'তাই বুঝি বিয়ে করিস নি ?'

'কোথায় পাব শাঁসালো-চাকুরে সজ্জন সচ্চরিত্র ? দরিদ্রবন্ধু দেশভক্ত দিকপাল ?'

'কেন, সেই অধিপ মজুমদার কি হল ? চিবিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিলে ? কেন, আদালত করতে পারলিনে ?'

অধিপের উপর এখনো চন্দ্রমার মনোভঙ্গের তাপ আছে। তামসী বললে, 'ওসব লোক ধূমকেতুর মত, ওদের নিয়ে কি সংসার করা চলে ? অন্ধ ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে সাঁতার কাটা এক জিনিস, ঘটি করে জল তুলে বাথরুমে বসে স্নান করা আর এক।'

'বেশ তো, তেমন একটি গোলগাল ভালোমানুষ ধরলেই পারতিস। কেরানি কি ইস্কুলমাস্টার।'

'বিধির বিড়ম্বনায় আমি যে সীমাতিক্রান্ত। আমার জন্যে কোথাও যে কোনো বেষ্টনরেখা নেই। নেই কোনো বন্ধনতীর।'

'তাই বুঝি আছিস চিরন্তনী মিস পাবলিসিটি হয়ে।'

'মূর্তিমতী মধ্যবিত্ততা, তুমি আছ মিসেস পাবলিসিটি হয়ে।' তামসী ঘৃণার বদলে করুণা ফিরিয়ে দিল ঃ 'প্রচার করছ তোমার ভীরুতা, অল্পজীবীতা, তোমার সংকীর্ণ আত্মবুদ্ধি। উচ্ছৃঙ্খলতার দীপ্তিতে নিজেকে বিকীর্ণ, ভস্মীভূত করে দেয়ার মধ্যেও হয়তো প্রাণের প্রয়োজন। জীবন যখন বহনদুষ্কর তখনই জীবনবাহকের বলিষ্ঠতা। কথাটা খুব কঠিন হয়ে গেল, না?'

তবুও কতক জিনিস ওরা কিনল। অর্ডারি মালের বায়না দেবার সময় দোকানের মালিকের কাছাকাছি এসে সমরেশ বললে, 'মেয়ে-কর্মচারী রাখলে দোকানের বিক্রিপাটা ভালো হয় নাকি?'

মালিক বাধিতের মত হাসল। ভাবখানা এই, তার প্রমাণ তো হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে এখুনি।

'অনেকের কাছে এই ডেকোরেশনটাই বাধা সৃষ্টি করবে। আর কিছু না হোক, দোকানের সম্ভ্রান্ততা থাকবেনা।'

'চাকরি থেকে তবে ছাড়িয়ে দেব নাকি?' বিশ্বাসভাজনের মত জিগগেস করলে দোকানী।

'সে আপনি জানেন। আপনার খ্যাতি, আপনার সুনাম, আপনারই লুক-আউট। এর আগে ভদ্রমহিলাকে দেখেননি কোনোদিন রাস্তায়? এক নার্সের সঙ্গে হেঁটে বেড়াত ফুটপাত ধরে?'

'কে জানে মশায়? দুঃস্থ জেনে চাকরি দিয়েছি, তার মধ্যে যে এত কোরকাপ আছে কে বলবে? দুনিয়ায় যত খেমটা সব ঐ ঘোমটার নিচে।' দোকানের মালিক টিপ্পনি ঝাড়লে।

'নমস্কার।' নবদম্পতি যখন চলে যাচ্ছে তখন দুয়ারের সামনে এসে তামসী বললে, 'নমস্কার। কাঠেরও চরিত্র আছে বৈকি। কেউ সেগুন কেউ শেওড়া। কেউ চাকরি পাইয়ে দেয়, কেউ বা ছাড়িয়ে দেয় চাকরি থেকে।'

ঘুরে দোকানের দিকে মুখ করতেই দোকানের মালিকের সঙ্গে তামসীর চোখোচোখি হল। মালিক তার দিকে চেয়ে ঈষৎস্ফুরিত চোখে হাসল। ভাবখানা এই, তোমাকে চিনেছি এত দিনে, কিন্তু তোমার ভয় নেই, আমি আছি। কারু সাধ্য নেই তোমাকে এই চাকরি থেকে টলায়। এইবার আমাকে চেন।

নয়নলেহনের এই গ্লানিতে তামসী সংকুচিত হলনা। নির্ভয়ে সে-হাসি সে প্রত্যর্পণ করলে।

সমরেশদের বাড়িতে যেদিন মালগুলো পাঠান হল, সেদিন কি তার পরের দিনই রাষ্ট্র হল কলকাতায়, জাপান যুদ্ধে নেমেছে। যুদ্ধে নেমেই ডুবিয়ে দিয়েছে প্রিন্স অফ ওয়েলস। প্রশান্ত মহাসাগরে সুরু করে দিয়েছে দুর্দান্ত দস্যুতা। দুর্বার প্রাবল্যে হানা দিয়েছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। হানা দিয়েছে মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, বর্মায়।

অপরিমিত উল্লসিত হয়ে উঠল তামসী। ইংরাজ পরাস্ত হবে বলে নয়, মহাকালের মহামারণলীলা চোখের সামনে দেখতে পাবে বলে। ধ্বংসের দেবতা যখন পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁর নৃত্যপদস্পর্শ পড়বে এবার ভারতবর্ষে। সে পবিত্র স্পর্শের জন্য তামসী তার স্তব্ধ হৃদয় প্রসারিত করে দেবে। আসুক নতুন নির্মল দিন, নতুন মোহমুক্তি। আর কিছু না হোক, চূর্ণ হয়ে যাক চন্দ্রমা-সমরেশের সৌখিন আসবাব, শোভন-শালীন ভঙ্গুর সংসারকাপট্য। এই মিথ্যা প্রাচীর-গ্রন্থন, এই আপাতরম্যতা। ধ্বংস হয়ে যাক হাসিনীর সুখলগ্ন নিদ্রিত নগ্নতা, পরিচ্ছন্ন আবরণের নিচে নিজের পাপ অন্যের আত্মায় সংক্রামিত করবার কৌশলকলা। ভস্ম হয়ে যাক প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রত্যাশায় দোকানের মালিকের ঐ চকিত চাকচিক্য।

এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের প্রসঙ্গে তামসী হঠাৎ নিজেকে অনুভব করলে ধ্বংসের দূতিকা বলে। প্রিয়ংকরী নয়, প্রলয়ঙ্করী বলে। তার আতীব্র আকাঙ্ক্ষাটাই যেন আকাশচারী অগ্নি-দেবতার আকার গ্রহণ করেছে। ভবনীয় বহন করবার জন্যে আসছেন সমস্তভুক।

দোকানীও যেন পালাবার পথ খুঁজে পায় না। বললে, 'দোকানপাট বন্ধ করে দেব এবার। চলে যাব দেশের বাড়িতে।'

তৃপ্তিভরা হাসি হাসল তামসী। বললে, 'জাহাজ ডোববার আগে ইঁদুরের মত সবাই-ই তো পালাচ্ছে দেখছি।'

'আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। দেশের বাড়িতে নিরিবিলিতে থাকা যাবে দুজনে।'

'বহু আরাধনার পর এত বড় সুযোগ পেয়ে অমন তুচ্ছভাবে নিজেকে ধ্বংস করতে আর সাধ হয় না। মরি তো বড় করে মরি, ডুবি তো অগাধ অতলে ডুবে যাই। ছোট-ছোট নিশ্বাস ফেলে মনের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে বাঁচতে চাইনা। একটা বড় আহুতির জন্যে প্রস্তুত হই।' তীব্র সুরে তার বাঁধা হয়ে গেছে, তামসীর এসেছে তাই স্ফুটবাক্য।

একটা কদর্থ করলে দোকানী। যুদ্ধের আওতায় নিশ্চয়ই মোটা রোজগারের গন্ধ দেখেছে, পিদিম ছেড়ে ধরবে এবার ঝাড়লণ্ঠন। উপায় নেই, সুখের চেয়ে স্বস্তি-শান্তি

ভালো, দোকানী তার দোকানের দরজা আর জানলার ফাঁকগুলো ইটের গাঁথনি দিয়ে বুঁজিয়ে দিতে লাগল।

বাকি মাইনেটা এগিয়ে দিয়ে দোকানের মালিক জিগগেস করলে, 'এবার কোথায় যাবেন ?'

'সমস্ত কলকাতা ভূতে-পাওয়ার মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পালাচ্ছে, এখন জায়গার অভাব কোথায় ?' তামসী রাস্তার দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল : 'দেখছেননা রাস্তা কেমন দূর কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে।'

'আবার তবে সেই রাস্তায়ই হাঁটবেন নাকি ?'

'বলা যায় না, আবার রাস্তা থেকে দোকানেও উঠতে পারি। যে রাস্তায় পায়না সে দোকানেও পায় না।'

বিকেলের বিধুর আলোতে কলকাতাকে করুণ লাগছে। পলায়নপর কলকাতা! ভয়োন্মাদ কলকাতা! যে দিকে পারছে মূঢ়চেতনের মত উৎকুণ্ঠ হয়ে ছুটছে। যতরকম যানবাহন আছে—উচ্চ থেকে নীচ, গরুর গাড়ি, ঠেলা, রিকসা—সব চলেছে উদ্দাম চক্রাবর্তে। বাদবাকি পায়ে হেঁটে, উত্তাল উচ্ছৃঙ্খলতায়। কে কাকে প্রশ্ন করে, কে কাকে প্রবোধ দেয়। চারদিকে শুধু আতঙ্ক, অস্থৈর্য, অসম্বৃতি।

শান্ত, ধীর পা ফেলে-ফেলে এগুতে লাগল তামসী। অনেক দূর হাঁটলে—হাঁটতে-হাঁটতে মনটাকে মুক্ত, দৃঢ় করে ফেললে। মনে হল আজ সে নিঃসঙ্গ নয়, নিরাশ্রয় নয়। আর কাউকে তার ভয় করবার নেই, ভিক্ষা করবার নেই। তার আপন জন এসে গিয়েছে তার নিকটে। পায়ের সঙ্গে-সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে। সেই যে সে তার আগামী কালের আগন্তুক। স্থিরীকৃত মৃত্যু।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সে দক্ষিণাঞ্চলে। প্রমথেশবাবুর বাড়ির দরজায়। শুনলে, অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়াতে প্রমথেশবাবুরা ফিসে এসেছেন। এখন আবার প্রত্যাবর্তনের কথা উঠেছে। প্রমথেশবাবু ফিরে যেতে রাজি নন। নিশ্চিত ব্যারামে মরার চেয়ে অনিশ্চিত বোমায় মরা অনেক স্বস্তিকর। মেয়েরা আগেই পালিয়েছে, স্ত্রীকে নিয়েই দ্বন্দ্ব। এত বড় সঙ্গীন রুগীকে ফেলে যাওয়াই বা কেমন কথা, ওদিকে নরখাদক জাপানীর ছায়া থেকে না পালানোটাই বা কী বিবেচনা!

'কেমন আছেন আজকাল ?'

'একটু ভালো।'

'আমি দেখা করতে পারি ?'

'কী নাম বলব ?'

'তামসী।'

লোকটা ফিরে এসে তামসীকে নিয়ে গেল ভিতরে, দোতালায়। পায়ের দিকে দূরের জানলা দিয়ে বিষণ্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন প্রমথেশবাবু। বড় ঘর, বিসর্পিত ছায়া মেলে ধীরে-ধীরে বিছানার পাশে দাঁড়াল তামসী। মৌন হয়ে তাঁর ক্লান্তকরুণ কণ্ঠের অপেক্ষা করতে লাগল।

জল-উদ্বেল গুহার আনন্দধ্বনির মত বলে উঠলেন প্রমথেশ: 'স্ফটিকাচল থেকে কি গঙ্গা নেমে এলে মা ?'

তামসী থমকে রইল। আমি গঙ্গা ?

বললে, 'চিনতে ভুল হচ্ছেনা আমাকে ?'

'ভুল হবে কেন ?' প্রমথেশ তাকালেন আচ্ছন্ন চোখে। 'তুমি প্রবাহিনী। তুমি স্রোতস্বচ্ছ। তাপহরা, তৃষ্ণাহরা '

আরো এগিয়ে এসে প্রমথেশের শুষ্ক কপালে হাত রাখল তামসী। বললে, 'আমি তামসী। ভয়ংকরী। যে মহানিশা ঘনিয়ে আসছে তারই আমি অধিষ্ঠাত্রী।'

প্রমথেশ হাসলেন। বললেন, 'তুমি মনোহর তমোহর। অরুণোদয়ের প্রতিশ্রুতি। তুমি থাকো। তা হলেই সে আসবে।'

একটু ঝুঁকে পড়ে তামসী প্রশ্ন করল: 'কে আসবে ?'

হঠাৎ আবার সজাগ হলেন প্রমথেশ। কপালের উপরে একটি স্নেহশীতলস্পর্শের স্বাদ নিতে-নিতে বললেন, 'না, মৃত্যু নয়। অধিপ।'

(ক্রমশঃ)

ঘুম

রজত সেন

তিনখানা ঝুড়ি বিকেল পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হবেই। ছটোর পর থেকে হারাধন ঝিমুতে লাগল। পাঁচু তাকে বার কয়েক সাবধান করে দিল—এটা তার মামার বাড়ী নয়, জেলখানা। সাত ঘা' বেতের বাড়ি খুব মিষ্টি লাগবেনা, মনে থাকে যেন। হারাধনের সমস্ত ইন্দ্রিয় নূতন সংকল্পে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। হাত চলতে লাগল তার যন্ত্রের মত। লুকিয়ে বিড়িতে একটা টান দেবার পর্যন্ত উৎসাহ নেই। কিন্তু কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার চোখ যে বুজে এল—জানতেও পারলনা সে।

পাঁচু এবারে তার পায়ে ছুরির খোঁচা মেরে বলল, হারামজাদা, আমি তোমার বাবার চাকর যে সারাদিন তুমি চোখ বুজে পড়ে থাকবে -আর তোমার ঘুম ভাঙ্গাব ? এই শেষ বার, বলে দিলাম।'

ছুরির খোঁচায় পায়ের গোড়ালি থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল হারাধনের, কিন্তু সে খুসি। পাঁচুর কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞ হল সে, অনেক রাহাজানির সাঙ্গাৎ তার।

পাঁচটার মধ্যে হারাধন নিজে আরও কয়েকবার ধারালো ছুরির খোঁচা লাগাল নিজের শরীরে। তৃতীয় ঝুড়িতে হাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বাজল।

'এর মধ্যে পাঁচটা বেজে গেল ?' ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করল হারাধন, তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'না, বাজবেনা ?' মুখ ভ্যাঙ্গাল পাঁচু, 'তোমার মত ওরাও ঘুমোয় কিনা! যাও, আজ রাতে ভালো করে ঘুমোবে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে। কাছাটা আর আঁটছ কেন বাপধন ? খুলেই রাখ!'

'অমন করে বলিসনি পাঁচু!' হারাধন অনুনয় করল, 'বড় ব্যথা পাই ; জানিস, সাত দিন ঘুমোতে পারিনি।'

'কি কম্মে ?' রাগত দৃষ্টিতে তাকাল পাঁচু।

হারাধনের জবাব দেয়া হলনা। লিকলিকে ছড়ি দোলাতে দোলাতে মহাদেও এগিয়ে আসছে কাজের হিসেব নিতে।

'চলো, সাব কা পাস্।' মহাদেও আদেশ জারি করল।

'আজ ছোড় দিজিয়ে সরকার,' পাঁচু সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল, 'আউর কভ্ হি এ্যাসা নেই হোগা। উসকা তবিয়ৎ ঠিক নেই।'

'ঝুট!' মহাদেও মেঘমন্দ্রস্বরে বলল, 'চলো!'

হারাধন নিঃশব্দে তার অনুসরণ করল।

নালিশ শুনল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, টেবিলের ওপর পা তুলে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিল, মুখ না তুলেই বলল, 'লে যাও। পয়লা ?'

'নেই হুজুর, দো দফে !'

'ডবল লাগাও।'

ন'টার সময় রাত্রির আহার শেষ করে যখন নিজের সেলে-এ এল হারাধন তখনও তার গা জ্বলছিল। উলঙ্গ হয়ে ঘরের একটি মাত্র জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল।

'আস্তে মার ভাই।'

'নাও না, আস্তেই হবে'খন প্যান্টটা খোল।'

প্রথম ঘায়েই তার চামড়া কেটে গেল। তারপর সহ্য করা সোজা।

মাঝরাতে টেটিয়াপনা সহ্য করবার মেজাজ হারাধনের ছিলনা, পাঁচুর ত ছিলইনা।

থিয়েটার দেখে ফিরছিল লোকটি।

নিরিবিলি দেখে পথ আটকাল সে আর পাঁচু।

'সময় নষ্ট করবেন না, যা আছে দিয়ে দিন।' পাঁচু লোহার ডাণ্ডাটা বাগিয়ে ধরল। হারাধনের হাতে ধারালো ছোরাটা গ্যাস লাইটের আলোয় চকচক করে উঠল।

ধ্বস্তাধ্বস্তিতেই লোকটা কাবার হয়ে গেল। ধরা পড়ে গেল তারা। লোক এসে পড়বার আগেই তারা অস্ত্র দু'খানি ডাষ্টবিন্ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

হারাধন আর পাঁচুর উকিল হাকিমের কাছে বলল—মৃত ভদ্রলোকের হৃদরোগ ছিল, হঠাৎ তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। তার মক্কেলরা চোর হতে পারে কিন্তু খুনের দায়িত্ব তাদের ওপর কিছুতেই চাপানো যেতে পারেনা।

সাড়ে চার বছর।

কেটেই ত যাচ্ছিল সময়, কিন্তু একি উৎপাত ?

প্যান্ট পরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চীৎ হয়ে পড়ল হারাধন। একটা বিড়ি ধরাল। প্রথম প্রহরের পাহারাদার গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে গেল।

বিড়িটা শেষ করে হারাধন অপেক্ষা করতে লাগল। কোন শব্দই শুনতে পেলনা সে, কান পেতে রইল অনেকক্ষণ ; এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চুলে টান পড়তেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি সাহস ইঁদুরগুলোর, তার চুল কাটছে কুট কুট করে। বসলনা হারাধন, নিস্পন্দের মত পড়ে রইল। কিন্তু হাতের ঝাপটা মেরে

কি ইঁদুর ধরা যাবে ? ছোঁ মারল সে ! কিচ কিচ শব্দ করে গোটা কয়েক ইঁদুর ফুলঝুরির মত এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। হারাধন উঠে বসল। ততক্ষণে ওরা ঘরের কোনার গর্ত পার হয়ে বাইরে চলে গেছে।

আবার সব চুপচাপ। এগারোটার ঘণ্টা বাজল। দু'একটা অস্পষ্ট কথা, চাবির ঝন ঝন শব্দ, লণ্ঠনের আলোর একটু উস্‌কানি। আবার নিস্তব্ধতা চারিদিকে !

ইঁদুরের এই উপদ্রবে চার পাঁচ দিন চোখ বুজতে পারেনি সে। ওয়ার্ডারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। কিন্তু তাকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনা, কেউ শোনেনা তার কথা! খুনী আসামী সে, নেহাৎ কপাল জোরে গলাটা বেঁচে গিয়েছে। হারাধন প্রাণপনে বোঝাবার চেষ্টা করে, খুন সে করেনি, করতে পারেনা। সে নিতান্তই তাদের মত একজন চোর। পথে লোক আটকানো তার এলাকার বাইরে, পাঁচুর পাল্লায় পড়ে অমন জঘন্য কাজে মেতে উঠেছিল সে। পাঁচু তাকে চোখ রাঙ্গায়, ঘুসি দেখায়, হারাধন চুপ করে থাকে, অভিযোগের বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তি দেখাবার উৎসাহ থাকেনা তার।

'হুজুর, ইঁদুরের জ্বালায় রাতে ঘুমোতে পারিনা।' হারাধন বলল।

'তুমিই না বাগানে কাজ করবার সময় মূলো আর টোমাটো চুরি করেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করেছি, তার জন্যে শাস্তি পেয়েছি।'

'তুমিই না একবার দেয়াল টপ্‌কে পালাবার চেষ্টা করেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' হারাধনকে আবার বলতে হল, 'সে হুজুর গোড়ায়, এখানে ঢোকবার পর, জেলে এর আগে আসিনি কিনা, তাই বড় কষ্ট হত। কিন্তু—'

'চুপ কর, ওগুলো পোষা ইঁদুর, রাত্রে লেলিয়ে দেয়া হয় তোমার ঘরে।'

এ সাংঘাতিক ঠাট্টার জন্য হারাধন প্রস্তুত ছিলনা। কোন দিন কি ছাড়া পাবেনা সে? আর—রমণীরমণ তুমি কি কোন দিন রাস্তায় বেরুবেনা?

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, আপাততঃ ইঁদুরের হাত থেকে সে পরিত্রাণ পায় কি করে? ঐ! একটা ঢুকে পড়ল! দালানের একটু আলো যা তার সেল-এ এসে পড়েছে —তাতেই হারাধন স্পষ্ট দেখতে পেল—ইঁদুরটা যেন তারই দিকে তাকাল একবার, তারপর সামনের পা দিয়ে গোঁফগুলোকে পরিষ্কার করে নিল। আসুক, ঢুকে পড়ুক ঘরের মধ্যে, তারপর হারাধন দেখবে কেমন করে পালায় ইঁদুরের বাচ্চা।

ইঁদুরটা তাকে মানুষ বলে গণ্যই করলনা, এক দৌড়ে খাটিয়ার নীচে গিয়ে ঢুকল। হারাধন প্রায় এক লাফ মেরে দু'পায়ে গর্তটা আটকে দাঁড়িয়ে রইল। পালাবার সময় পা দিয়ে পিষে ফেলবে।

কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল হারাধন। ইঁদুরটা যেন বেরিয়ে যাবার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াল। খাটিয়ার ওপর পরমানন্দে খেলা করল প্রায় আধ ঘণ্টা। দেখা যাক।

দেখেই রইল হারাধন। ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। গর্তের ধারে কাছে এলনা, ল্যাজ তুলে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ইঁদুরটা, খাটিয়া থেকে মাটিতে, মাটি থেকে খাটিয়ায়। হারাধন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমোতে লাগল। হাঁটু ভাঙ্গছে, হাঁটু সোজা হচ্ছে। এক সময়ে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে—প্রায় মাটি স্পর্শ করছে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আধবসা অবস্থায় অদ্ভুত এক ভংগিতে ঘুমোতে লাগল হারাধন।

হঠাৎ চমকে উঠল সে, ইঁদুরটা তার চুল কাটতে সুরু করেছে। একটা প্রচণ্ড থাবা মারল সে ঘুম-ঘুম চোখে। ইঁদুরটা লাফিয়ে সরে গেল খাটিয়ার নীচে। হারাধন তাড়া করল। অন্ধকার সুরঙ্গ পথে অদৃশ্য হয়ে গেল তার পরম শত্রু—তাকে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত করে।

ঠাণ্ডা মাটিতে জন্তুর মত ঘুমিয়ে ঘুমের আস্বাদ সে পেয়েছে। আহা! কি আরাম! যদি সে সারা রাত্রি ঘুমোতে পারত ঐ খাটিয়ায়! প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে খাটিয়ার ওপর, আর, এক মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

এবারে একটা নয়, ঘরময় অসংখ্য ইঁদুর কিলবিল করতে লাগল। হারাধনের পায়ের আঙুলে দাঁত বসিয়ে দিল একটা ইঁদুর। তরাক করে উঠে বসল সে! খাটিয়া থেকে চটপট সব লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, অন্ততঃ পায়ের চাপে একটা দুটোকে ঘায়েল সে করবেই, গর্তের মুখে দেবে রক্ত ছিটিয়ে-যেন ভয় পেয়ে ঘরে আর না ঢোকে কেউ। কিন্তু কারুর যেন চলে যাবার, ফিরে যাবার তাগিদ নেই, নিশ্চন্ত নির্ভয়ে ঘর নোংরা করে চলল ওরা! কয়েকটা ঢুকে পড়ল তার কম্বলের ভাঁজে। সর্বনাশ! কম্বলটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে!

হারাধন কম্বলটা তুলে নিল।

দালানের বাতি নিবিয়ে দিল শেষ প্রহরের প্রহরী। ভোর হয়ে গেছে। আর চেষ্টা করে লাভ নেই, ঘুমের সময় কোথায়? দিনের কাজ সুরু হবে, হারাধন প্রস্তুত হল একটা বিড়ি শেষ করে।

বিকেলে পাঁচটার পর তাদের ছুটি। হারাধন এল তার সেল-এ। দেখা যাক ঘুমোনো যায় কিনা। অন্যান্য দিন দু একটা ইঁদুরের সাক্ষাৎ পেত সে। আজ দেখল তার বদলে এক রত্তি এক বেড়াল ছানা খাটিয়ার পায়ের কাছে কেঁউ কেঁউ করছে। বিস্মিত হল হারাধন, এগিয়ে গেল কাছে, বাচ্চাটা নিতান্ত অসহায় ভাবে বুঝি একবার তাকাল তার দিকে। নিচু হয়ে বসল হারাধন, দেখল বাচ্চাটার পেছনের একটা পা অস্বাভাবিক ফুলে গেছে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে হারাধন দেখল পায়ে একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে, অনেক কষ্টে হারাধন বার করল কাঁটা। বলল, যাও, কেটে পড়, আর জ্বালিও না। গরাদের বার করে দিল সে ওটাকে, মেউ মেউ করে আবার চলে এল ঘরে, হারাধন আস্তে একটা লাথি মেরে আবার বার করে দিল, আবার ফিরে এল ছানাটা। ওর পায়ের কাছে পড়ে রইল ল্যাজ গুটিয়ে।

হারাধন বিড়ি ফুঁকতে লাগল, বেড়ালটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খাবার ঘণ্টা বাজল।

খেতে বসে আধখানা রুটির টুকরো অন্যের অলক্ষ্যে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল সে।

খাটিয়ার নীচে তখনও বাচ্চাটা পড়ে আছে নিস্পন্দ, বেহুঁশ। হারাধন ওকে জাগিয়ে রুটি খাওয়াবার চেষ্টা করল, মুখ ফিরিয়ে নেয় বেড়ালছানা বারবার। বিরক্ত হয়ে হারাধন মন্তব্য করল, 'ব্যাটা নবাবের বাচ্চা, তোমার জন্য দুধভাত আমি পাব কোথায় জেলখানায়? কচুর ঘণ্ট দিয়ে চিঁড়ের ভাত খেয়েছো কখনও? ঠেকায় পড়লে সব খেতে হবে, না হলে—গেট আউট।' হারাধন একটা প্রচণ্ড লাথি মারল বাচ্চাটাকে। দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নির্জ্জিব হয়ে পড়ে রইল, তারপর ফিরে এল তার পায়ের কাছে।

হারাধন কোলে তুলে নিল।

ইঁদুরের কিচির মিচির সুরু হয়েছে।

হারাধনের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল। বেড়ালটাকে পোষ মানালেই ত হয়, রাত্রে ইঁদুর মারবে, সে পারবে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে। খুসিতে ঝলমল করে উঠল সে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করল অনেকক্ষণ, তারপর এক সময়ে তন্দ্রা এল তার, ছানাটা তার মাথার কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ইঁদুরের পেছনে ছুটোছুটি করে লাভ নেই। ওদের আসা কিছুতেই সে বন্ধ করতে পারবে না। ঘরে এমন কোন জিনিষ নেই যে গর্ত্তটা আটকে দিতে পারে। নিজের জামাটা গুঁজে গর্ত্ত একবার বন্ধ করেছিল সে, ঘুমিয়েও ছিল ঘণ্টা কয়েক। কিন্তু পরদিন দেখল জামাটা রূপান্তরিত হয়েছে ছোট ছোট কাপড়ের টুকরোয়। অসাবধান বলে তার জন্যে বেত খেয়েছিল পাঁচ ঘা। একখানা ইঁট সে লুকিয়ে নিয়ে আসছিল ঘরে, ধরা পড়ে গেল। ঘরে ইঁদুর আসে, সে-জন্যে গর্ত্তের মুখে ইঁট বসিয়ে দেবে এই সহজ কথাটা সে জেলের মাথা-মোটা লোকগুলোকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। পাঁচ ঘা বেত।

হারাধন তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল বেড়ালটা তাগড়া হয়ে উঠেছে, গর্ত্তের মুখে থাবা পেতে বসে আছে। একটা করে ঘরের মধ্যে ইঁদুর ঢোকে, চোখের নিমেষে বেড়ালটা টুকরো টুকরো করে ফেলে ইঁদুরটাকে। ঘুমের মধ্যে হেসে উঠল হারাধন। আবার স্বপ্ন দেখল—বেড়ালটা ঘুমিয়ে পড়েছে—আর সেই সুযোগে একটা মোটা ইঁদুর নিঃশব্দে তার পায়ের আঙুলগুলো খেয়ে ফেলছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল তার, জেগে উঠে দেখল গোটা কয়েক ইঁদুর তার পায়ের প্রায় সব কটা আঙ্গুলই কামড়ে দিয়েছে।

সে-রাত্রে আর ঘুমোতে পারলনা সে। বেড়ালছানাটাকেও পাহারা দিতে হল তার।

সারা পায়ে বিষাক্ত ঘা হয়ে গেল। সেই ঘায়ে ভুগ্‌ল সে পাঁচ মাস, পড়ে রইল হাঁসপাতালে; ওষুধের গন্ধ আর রোগীর চীৎকার, কিন্তু তবু—তবু সে এখানে ঘুমোতে পেরেছে। সুস্থ হয়ে সে ফিরে এল নিজের সেলে, কিন্তু ভয়ের তার অন্ত রইলনা, সে রাতের পর রাত জেগে বসে থাকা। খাটিয়ার ওপর বসতেই হারাধনের কোলের ওপর লাফিয়ে পড়ল একটা বেড়াল। হৃদপিণ্ড তার দুলে উঠল।

আর হঠাৎ তার চোখে পড়ল বেড়ালটা আর বাচ্চা নেই, বিরাট চেহারায় দাঁড়িয়েছে, চলাফেরা আর তাকানোর মধ্যে এসেছে অদ্ভুত এক গাম্ভীর্য! বুকে নিয়ে দোলাল সে কয়েক মিনিট। এই সেই একরত্তি বেড়ালছানা! চলে যাবার জন্যে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বেড়ালটা, হারাধন তাকে যেতে দিলনা। একটা নাম দেয়া দরকার, পুসি? দূর! মিনি? ক্ষেপেছ? বাঘা? বাঘা।

'এই বাঘা, ইঁদুর মারতে পারবি ত?'

বেড়ালটা হারাধনের কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হারাধন ভাবতে বসল—অত ইঁদুরের সঙ্গে বাঘা কি পেরে উঠবে? হয়ত মারবে একটা দুটো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই কি মরবেনা? এই বদ্ধ কারাগারে বেড়ালটাই ও তার এক মাত্র বন্ধু! পাঁচ মাস সে ওকে দেখতে পারেনি, কত কষ্টেই না দু'বেলা খাবার জোটাতে হয়েছে ওকে! হয়ত জোটেনি কোন কোন দিন। তবু হারাধনকে ভুলে যায়নি বেড়ালটা। বুকের মধ্যে টেনে নিল সে বেড়ালটাকে। ঘুম আসছে তার।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা ঘুমোতে পারল সে। ইঁদুরগুলো তার গায়ের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি সুরু করেছে। বাঘা শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে তার বালিশের পাশে। ছেলেবেলায় সে শুনেছিল বেড়াল রাত্রে ঘুমোয় না। গোটা কয়েক ইঁদুর বাঘার চার পাশে চরে বেড়াচ্ছে।

হারাধন মনে মনে হাসল। রাত হোক বাছাধনরা! তোমাদের মরণ-কাঠি রয়েছে আমার হাতে! হাই তুলতে লাগল বাঘা এক সময়ে, সামনের পা দুটোকে টান করে শরীরের শ্রান্তি দূর করলে কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে কোন দিকে না তাকিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত্রে জেলখানার বাতি নিবে যাবার পর হারাধন পা টান করে শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল গরাদের দিকে। ইঁদুরের আনাগোনা সুরু হয়ে গেছে, রাত বাড়তে লাগল। কোথায় বাঘা! ঘুমোবার চেষ্টা করল না সে, লাভ নেই।

বাঘা এল দুলকি তালে, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তার পাশে, বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে

ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ধুমকো ইঁদুর কামড়ে দিল তার পায়ে। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

ভয়ে আর আশংকায় তার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে এল। আবার সেই বিষাক্ত ঘা, এবারে বোধ হয় পা কেটে বাদ দিতে হবে। হারাধন দেখতে পেল হাওড়ার পুলের নীচে এক পায়ে কাঠে ভর দিয়ে ভিক্ষে করছে সে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু দুঃখের অবকাশ নেই আজ রাত্রে। আজ ঘুমোতে না পারলে মরে যাবে সে। রক্তে তার ঘুমের স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কালো ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, ঢেউ-এর তালে তালে সে ভেসে চলে যাচ্ছে ঘুমের দেশে, খাটিয়া থেকে হারাধন মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ল। আবার কামড়াল তাকে ইঁদুর। ঘরের মধ্যে কিলবিল করছে ছোট-বড়-মাঝারি আকারের প্রায় দু'ডজন ইঁদুর। ক্ষিপ্র পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াল হারাধন, মাথার মধ্যে তার আগুন জ্বলছে। বাঘা তার পাশেই কম্বলের মধ্যে অর্ধেক শরীর লুকিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। রাত গভীর।

বাতির অস্পষ্ট আলোয় বাঘাকে সে পরীক্ষা করল, দুই থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে নিদ্রিত বাঘার সমস্ত শরীরে অপূর্ব এক আরাম আর আলস্য। হারাধনের পায়ের ওপর দিয়ে একটা ইঁদুর ছুটে গেল।

অকস্মাৎ শক্ত হাতে বাঘাকে সে আঁকড়ে ধরল, ঈষৎ নড়ে উঠল বেড়ালটা। খাটিয়ার ওপর বসল হারাধন, তারপর দু'হাতে বাঘার মোটা গলাটা টিপে ধরল নির্ভিক, নিঃশঙ্ক হাতে, নখ দিয়ে বৃথা আঁচড়াবার চেষ্টা করল বাঘা। গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দটা অর্ধপথেই মিলিয়ে গেল।

বাঘার মৃতদেহটা মাটিতে ফেলল সে। ধপ করে একটা শব্দ হল। হারাধন পা দিয়ে একটা ঠোক্কর মারল। নির্জিব, নিশ্চেতন, ঠাণ্ডা একটা মাংসপিণ্ড যেন!

হারাধন দৌড়ে দৌড়ে ঘর থেকে তাড়াল সব কটা ইঁদুর। পরীক্ষা করল আর একটাও রইল কিনা। তারপর বাঘার প্রথমে মাথাটা তারপর সমস্ত শরীরটা আস্তে আস্তে গুঁজে দিল সে নর্দমার গর্তে।

মোটা শরীরটা ঢুকতে চায়না গর্তের মধ্যে, হারাধন জোরে কয়েকটা লাথি মেরে ঢুকিয়ে দিল।

খাটিয়ায় চীৎ হয়ে পড়ল হারাধন, ওঃ, কতদিন পরে আজ সে ঘুমোবে। ইঁদুরের বাবার সাধ্য নেই ঘরে ঢোকে।

একটা বিড়ি টেনে চোখ বুজবে সে।

কিন্তু বিড়ি ধরাবার ফুরসৎ পেলনা হারাধন, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্বাদ

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

কেমন যেন একটা গন্ধ আছে মেয়েদের চুলে। যে গন্ধ আকুল করে, পাগল করে। খুব যে মধুর, খুব যে মিষ্টি তা নয়। তবে কেমন যেন একটা স্বপ্ন আছে ও-তে। যে স্বপ্ন গন্ধ হয়ে ধরা দেয় মেয়েদের চুল আঙুল দিয়ে নাড়লে।

বরাবরই এই গন্ধের প্রতি একটা মোহ আছে উৎপলের। কী ভাল যে ওর লাগে সুন্দর গন্ধ-ওলা মেয়েদের ঢেউ-ঢেউ বিশৃঙ্খল চুলের কথা ভাবতে। অবশ্য সত্যি কথা বলতে আজ পর্যন্ত সে কোন মেয়েরই এমন কাছে আসে নি যে তার মাথার খোঁপা নিয়ে খেলা করবে। গন্ধ পাবে। কিন্তু ভাবতেই ওর ভাল লাগে বেশ। তাই তেলের বিজ্ঞাপনের চুল-ওলা মেয়েলী মাথাগুলোর দিকে তৃষ্ণা নিয়ে দেখে। দেখে খুসি হয়। রাস্তায় চলতে গিয়ে হঠাৎ সামনে-চলা কোন মেয়ের শুধু খোঁপা দেখেই সে পুলকিত হয়ে ওঠে। জোরে জোরে পা চালিয়ে দেখে আসে মুখখানা। কেমন যেন একটা স্বাদ পায় সে এমন করে।

তেমনই ভারী একটা বিতৃষ্ণা আছে ওর চুলগন্ধহীন মেয়েদের ওপর। ভাবলেই রেগে ওঠে মনে মনে। এখন যেমন রেগে উঠেছে সে ট্রামে করে যেতে যেতে। সন্ধ্যের সময় এ্যাস্প্ল্যানেড-মুখো ট্রাম। বসে আছে ও লেডীজ সীটের পিছন দিককার ছোট সীটটায়। সামনের সীটে বসে একটি মেয়ে। সুন্দর পাতলা বিনুনী দিয়ে লম্বা করে বাঁধা খোঁপা। খোঁপার নীচে স্বল্প ঘাড়। ঘাড়ের মাঝে ছোট্ট একটি তিল আর তার পাশে সিল্কের মত পাতলা পাতলা লোম।···একমনে দেখছিল উৎপল ওর চুলের দিকে। উড়ো-উড়ো হাওয়ায় প্রসাধনের গন্ধ ভেসে আসছে। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ। কিন্তু কোন গন্ধ আসছে না ওর চুল থেকে। ভাল করে অনুভব করে দেখে উৎপল! না, কোন গন্ধ নেই ওর মাথায়। বিরক্ত হয়ে ওঠে উৎপল মনে মনে। চুলগন্ধহীন মেয়েরা ভারী বিস্বাদ ওর কাছে।

কেনই বা তা হবে না? রাঁচীর জুলি সেনের স্মৃতি এখনও ত মুছে যায়নি ওর মন থেকে।

বেশি দিনকার কথা নয়। বছর দুই আগে রাঁচী গিয়েছিল উৎপল। তখনও সে এম্-এ ক্লাশের ছাত্র। ছোট কাকা নতুন বিয়ে করে রাঁচী গেলেন বেড়াতে। ছোট কাকা

উৎপলের চেয়ে মাত্র বছর চারেকের বড়। কাকীমা এলেন একেবারে ওর একবয়েসী। ভারী খুশি হয়েছিল উৎপল। আরও খুসি হল যখন কাকা-কাকীমা লিখলেন রাঁচীতে দিন কতক কাটিয়ে যেতে।

মোরাবাদী যাবার পথে ছোট একটা বাংলো নিয়ে আছেন কাকা-কাকীমা। সামনের বাড়ীতে থাকেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিনয় সেন। খুব প্রশংসা শুনলো সে ভদ্রলোক সম্বন্ধে। বিনয়বাবুর ছেলেমেয়েরা নাকি কাকীমার সঙ্গে ভারী জমিয়ে বসেছে। তিন ছেলে ভদ্রলোকের। একজন পড়ে যাদবপুরে, ওখানেই থাকে। বাকী দুজন আছে রাঁচীতেই—সুজিত আর সুমিত। বয়স বারো আর নয়। চার মেয়ে। তিনজনকে পার করেছেন ইতিমধ্যেই। বাকী আছে জুলি। বয়স সতেরো, আই এ পড়ে।

সকালেই সুমিত আর সুজিত আলাপ করে গেছল। বিকেল উৎপলকে নিয়ে গেল বাড়ীতে। ছোট্ট একতলা বাড়ী। সামনেই শাটিনের পর্দা-লাগানো সুদৃশ্য একটি ড্রয়িং রুম। ঘরের মধ্য থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকেই উৎপল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রেডিওর সামানের কোচটায় বসে বসে জুলি লেশ বুনছে।

সতেরো বছরের মেয়ে জুলি। সুন্দরী না হলেও, ঐ বয়সের মেয়েদের যেমন একটা মাদকতা থাকে, সেটুকু আছে। কিন্তু কী সুন্দর ওর মাথা ভরা ফুলো ফুলো চুল। চুলগুলো খুব কালো নয়, একটু যেন ফিকে সোনালী। তবু ঐ চুলের অরণ্যেই উৎপল যেন পথ হারাল। ঐ চুলেই কি গন্ধ পাওয়া যাবে? যে গন্ধের স্বপ্ন দেখছে সে এতদিন?

ওদের দেখে জুলি উঠে দাঁড়াল কোচ ছেড়ে। তারপর উৎপলের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুমিত-সুজিতের মুখের দিকে।

ন'বছরের সুমিত হৈ-চৈ করে উঠল,—ছোড়দি, ছোড়দি, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি দেখ! সেই যে ও-বাড়ীর বৌদি তোমার কাছে গল্প করেছিলেন, সেই উৎপলদা—!

ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল উৎপল। লাল হয়ে উঠল মুখ। ছোটকাকীমা কি এই অপরাচিতা তরুণীর কাছে তার গল্প এমন করেই করে যে নাম করলেই চিনবে?

কিন্তু, কোনরকম উৎসাহ দেখা গেল না জুলির তরফ থেকে। বললে, বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি! বলেই চলে গেল ভেতরের দিকে।

কেমন যেন দমে গেল উৎপল। গা এলিয়ে দিল সামনের কোচটায়। রেডিওয় কে একটি মেয়ে আধুনিক গান গেয়ে চলেছে। আঃ, কি বিশ্রী যে কথাগুলো। উৎপল বললে, রেডিওটা বন্ধ করে দাও সুজিত। ভাল লাগে না সব সময় গান শুনতে।

সত্যি উৎপলদা আমারও ভাল লাগে না। ছোড়দিটা যে কি শোনে রাতদিন! —রেডিওটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলে সুজিত।

নাঃ, ছেলেগুলো বড্ড বেয়াড়া। উৎপল আবার অস্বস্তি বোধ করে। যদি শুনতে পেয়ে থাকে জুলি ? কাছে কোথাও আছে হয় ত।

ওদিকে পর্দা নড়ে উঠেছে ততক্ষণ।

পর্দা সরিয়ে মা এলেন।

প্রণাম জানাল উৎপল। তারপর টুকরো আলাপ। কুশল জিজ্ঞাসা।

খানিক পরেই মা বললেন, বোসো বাবা, একটু চা খাও। বিদেশে বিভুঁয়ে মাসীর কাছে এলে।

ভারী মিষ্টি ব্যবহার ভদ্রমহিলার। ভাল লেগে গেল উৎপলের। তবু মুখে ভদ্রতা করে বললে, না না আপনি আবার কষ্ট করে—

না না, কষ্ট আর কি ?—জুলি—

যাই মা। সাড়া এল ভেতর থেকে। এবং পরক্ষণেই জুলি এল।

উৎপলের জন্যে চা করে নিয়ে আয়।

বলে এসেছি চায়ের কথা। ঠাকুর আনছে। সহজভাবে বলল জুলি।

চমকে গেল উৎপল মনে মনে। একেবারে চায়ের কথা বলে এসেছে ও। ওর চুলের দিকে না তাকিয়ে পারল না। এবং তাকতে গিয়ে চোখোচোখি হয়ে গেল জুলির সঙ্গে। লাল হয়ে গেল উৎপল।

উৎপল থেমে গিয়েছিল। নীরবতা ভঙ্গ করলেন মা। বললেন, এই আমার ছোট মেয়ে জুলি। এর ওপর আরও তিনটি আছে। তাদের ত আর দেখনি।

জুলি যে কে ভাল ভাবেই জানতো উৎপল। তবু হাত দুটো জড় করে একবার কপালে ঠেকালে।

জুলিও ছোট একটি 'নমস্কার' বলে গা এলিয়ে দিলে সামনের কৌচাটায়।

মা বললেন, তুমি আবার ওকে নমস্কার করছ কেন বাবা ? ও ত' অনেক ছোট তোমার চেয়ে। এই ত মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। ভেবেছিলাম কোলকাতাতেই রেখে পড়াব। কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে গোখেল মেমোরিয়েল উঠে এল হাজারীবাগে তাই ওখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব বেশী দূর ত নয়—

—হ্যাঁ, মোটে ষাট মাইল। উৎসাহিত হয়ে জবাব দিল উৎপল।

—তুমি গেছো নাকি ?

—হ্যাঁ, গতবছর বেশ কিছুদিন ছিলাম হাজারীবাগে। দেখতাম লেখা আছে, হাজারীবাগ টু রাঁচী ফিফ্‌টি নাইন মাইল্‌স্। তবে রাঁচী আসা আর হয় নি।

—ভালই ত, নতুন করে এবার এলেন। কথাটা বললে জুলি।

চমকে গিয়ে উৎপল ওর দিকে, ওর চুলের দিকে তাকাল। তারপর চুপ হয়ে গেল।

এই মুহূর্তেই ঠাকুর ঢুকল চায়ের ট্রে নিয়ে। চায়ের সরঞ্জাম আর একটা কাঁচের জারে ভর্তি ছোট ছোট নিম্‌কি।

জুলি প্লেটের ওপর নিম্‌কি সাজাল, তারপর একটা কাপ সোজা করে নিয়ে চা ঢালল। চেয়ে চেয়ে দেখল উৎপল ওর দিকে, ওর চুলের দিকে। মুখবন্ধ জারটা হঠাৎ খুলতে ভক্ করে ছড়িয়ে পড়েছে নিম্‌কির গন্ধ আর সেই সঙ্গে চায়ের ফ্লেভর। উৎপলের ধারণা হল তাই ওর চুলের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে না। তা না হলে এত কাছাকাছি বসেও কি পাওয়া যেত না ?

—আপনি খাবেন না ? হঠাৎ প্রশ্ন করল উৎপল জুলিকেই।

জুলি জবাব দিল না। হাসল একটু।

—বাঃ, আমি একলাই খাব নাকি ? মাসীমা আপনি ?

—আমি আর খাব না, জুলি বরং খাক্ এক কাপ। মাসীমা স্নেহভরে বললেন।

জুলি চা খেলে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে।

বাড়ী ফিরে উৎপল খুব খানিকটা রাগ দেখালে ছোট কাকীমার কাছে। তুমি বড় ইয়ে। যার তার কাছে আমার গল্প করতে যাও কেন বল ত ?

ছোট কাকীকা মুখ টিপে হেসে বলেন, আর তুমিই বা কেমন যে যার তার কাছে বসে চা খাও নিম্‌কি খাও !

ঝগড়াটা জমত বেশ কিন্তু ছোটকাকা এসে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বলে, একখানা ট্যাক্‌সী ঠিক করে এলাম। কাল সকালে যাওয়া যাবে হুড্রুতে।

মনটা নেচে উঠল উৎপলের। ঝগড়ার কথা ভুলে গেল সে। বললে, কখন যাওয়া হবে ছোটকা ?

—আটটায় ! শুধু যাওয়া নয়, একেবারে রীতিমত পিকনিক !

—তিনজনে মিলে পিকমিক ! অন্ততঃ জন দশেক না হলে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছোট কাকীমা বলে, না গো না, লোকের অভাব হবে না। জুলিরা সবাই যাচ্ছে।

এক নিমেষে ফুটো বেলুনের মত চুপ্‌সে গেল উৎপল। ঐ মেয়েটা যাবে সঙ্গে। ওর ঐ মাথাভরা চুল নিয়ে।

রাত্তিরে ঘুম আসতে দেরী হল উৎপলের। একরকম জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে

লাগল—চুলের মত কালো কালো এক অরণ্য ওর চারদিকে। অরণ্য ঠিক নয়, উদ্যান দেখল সে। গন্ধভরা, স্বাদভরা উদ্যান, তারপর ঘুম এল। শান্ত নিরুদ্বেগ ঘুম।

গাড়ীখানা ভাল। পন্টিয়াক সিডন বডী। গাড়ীর বাইরের সীটে বসলেন ছোটকাকা আর বিনয়বাবু। ভিতরে জুলির মা, জুলি, ছোটকাকীমা, উৎপল, সুমিত আর সুজিত। উৎপল বাইরে বসতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা একরকম জোর করেই ভেতরে পাঠিয়ে দিলে ওকে। জুলির মা বললেন, ওমা, লজ্জা কিসের ? এইটুকু ত ছেলে !

কথাটা যেন আরও লজ্জা বাড়িয়ে দিলে উৎপলের। মুখটা লাল করে উৎপল গাড়ীর একধারে গিয়ে বসল। তার পাশে ছোটকাকীমা, তারপর জুলির মা, আর গাড়ীর আর একধারে বসল জুলি নিজে। কোলে বসল সুজিত আর সুমিত।

সমস্ত রাস্তাটাই একরকম আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল উৎপল। ছোটকাকীমা তার ওপর এমন ভাবে তাকাচ্ছে ওর দিকে যে চটে যাচ্ছে উৎপল মনে মনে। তবে ভারী মিষ্টি জবাকুসুমের গন্ধ আসছে ছোটকাকীমার মাথা থেকে। সেটুকু বড় ভাল লাগছে ওর।

শীতকাল তখন। হুড্রুর খুব তোড় নেই। কাজেই বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারল ওরা। সুজিত আর সুমিতকে নিয়ে খুব ঘুরল উৎপল। জলের স্রোত খেয়ে খেয়ে পাথরগুলো ঝকঝকে আর ধারাল। বেশিক্ষণ হাঁটলে আবার ব্যথা ধরে পায়ে। ক্লান্ত হয়ে একটা বড় চার পাঁচ ফুট উঁচু পাথরের আড়ালে পা ছড়িয়ে বসল উৎপল। মনটা খুশি নেই খুব। ইচ্ছে ছিল জুলিকে একটু নিরিবিলি পাবার। কিন্তু মেয়েটা সেই যে ছোটকাকীমার সঙ্গ নিয়েছে আর ছাড়ে নি। অথচ ছোটকাকীমার কাছে ঘেঁসবার উপায় নেই। যে ভাবে গাড়ীতে তাকাচ্ছিল ওর দিকে।

হঠাৎ পাথরের ওপর থেকে একটা ছোট ছায়া নড়ে উঠল। সুজিত আর সুমিত গেছে গাড়ীতে জল খেতে। তবে কে এল ? উৎপল চেয়ে দেখল ওপর দিকে।

জুলি !

নামতে গিয়ে পা গুটিয়ে নিল জুলি। বললে, ওমা, কি করে নামি, যা উঁচু !

উৎপল হেসে উঠে দাঁড়াল। বললে, ওদিকে ঢালু আছে ও পাশ দিয়ে নামুন গিয়ে।

—ওদিকে যাবো কি, দুটো সোলজার বসে শিস্ দিচ্ছে।

যুদ্ধের সময় তখন। ওপরে যে গেষ্টরুম খানা আছে সেখানে সৈন্যরা ঘাঁটি করেছে বটে !

উৎপল বললে, লাফ দিতে পারবেন না ? এমন আর কি !

জিভ কাটল জুলি ছোট করে। বললে, ওমা, লাফ দেব কি ? কী যে বলেন।

—সে কি ? এই ত মোটে এইটুকু !

—আহা, সবাই বুঝি আপনার মত খেলোয়াড় !

—তা নয় বটে, তবে পিকনিক টিকনিকে এলে সবাই অমন অল্পবিস্তর লাফালাফি করে থাকে !

—না লাফাতে পারব না আমি।

—বেশ আমি না হয় চোখ বুজছি। সত্যি বুজছি, এই দেখুন। চোখ বুজল উৎপল। বুজেই মনে মনে অবাক হয়ে গেল। কী সুন্দর কথা বলে যাচ্ছে ও।

কিন্তু লাফাল না জুলি। ধারের কাছে বসে রইল। হঠাৎ বেশ সহজভাবে এগিয়ে গেল উৎপল ওর দিকে। তারপর নিজের বলিষ্ঠ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন ধরুন হাতটা, আমি নামিয়ে নিচ্ছি।

জুলি বললে, ও বাবা। ফেলে দেবেন না ত শেষকালে !

—সে রকম ভয়ের কি কারণ পেলেন ?

—ভাল করে ধরবেন কিন্তু,—বলেই জুলি এগিয়ে এল ওর দিকে। আর উৎপল বেশ অনায়াসেই নামিয়ে নিল ওকে ওপর থেকে।

জীবনে এই প্রথম এক তরুণীর ভার গ্রহণ করল উৎপল। গা-টা ওর শিরশির করছিল উত্তেজনায়। জুলির দেহটা ওর বুকের ওপর দিয়ে নেমে গেল। যেন একটা নরম ফুল। চুলগুলো উড়ে উড়ে মুখে এসে লাগল। উৎপল নিশ্বাস নিল একটা জোর দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, কোন গন্ধ নেই ওর চুলে। আর এক সেকেণ্ড...আর এক সেকেণ্ড ধরে রাখল উৎপল জুলিকে। জোর করে নিশ্বাস নিল আর একবার। কিন্তু নাঃ, কোন গন্ধ নেই ওর চুলে। শ্যাম্পু-করা খসকা চুলের মত, গন্ধহীন চুল জুলির।

উৎপল আর তাকাল না ওর দিকে। যে সব কথা বলবে ভেবে রেখেছিল, তার কোনটাই বলা হল না।

উৎপল ফিরে এল কোলকাতায়।

ট্রামে বসে বসে জুলির কথা মনে পড়ে গেল উৎপলের। মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল সে। মেয়েটির দিকে আর তাকাবে না। ও যদি সামনে দিয়েও নেমে যায়, তবুও না। জুলিরা বড় বিস্বাদ ওর কাছে।

চিত্রকলা

চিত্রে টেম্পেরা-প্রথা

যামিনীকান্ত সেন

উপাদানের ভিন্নতা চিত্ররচনাক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য উপস্থিত করে। সূক্ষ্মতা, রুক্ষতা, প্রগলভ উগ্রতা বা লীলায়িত স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিশিষ্টতা উপাদানের বিভিন্নতা হতেই সম্ভব হয়। বস্ত্রশিল্পবিচারে নানা রকমের ব্যবহৃত উপাদান রচনাকে নানাভাবে উপচিত করে। তুলো, রেশম বা পশমের বস্ত্রের ঘনতা, দীপ্তি বা সৌকুমার্য্য উপাদানের জন্যই মুখর হয়। সঙ্গীত সুষমায় বীণা, সেতার বা মৃদঙ্গের দান অতি বিচিত্র ও বিভিন্ন। ধ্বনিপ্রাচুর্য্যের সঙ্গতিতে সীমাহীনভাবে এসব যন্ত্রের বিচিত্র ব্যঞ্জনা উন্মিত হয়ে থাকে। তাতে ধ্বনির রূপভেদ যেমন ঘটে তেমনি মাধুর্য্যগত ভেদাভেদ ও অভিনব রসশ্রীও ফলিত হয়ে থাকে। কাজেই কলালীলাক্ষেত্রে উপাদানের বিশিষ্টতা আলোচনা অবান্তর ব্যাপার নয়।

বিভিন্ন উপাদানই কলার বিশিষ্ট বাহন। কলালক্ষ্মীর নানা বাহন রূপসৃষ্টিকে নানা ঐশ্বর্য্যে ভারাক্রান্ত করে। উপাদান ভেদে, সঙ্গীতকলায় সুরের বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যদি সুরের উপর শিল্পীর পরিপূর্ণ অধিকার না থাকে। উপাদানের যথাযথ প্রয়োগে শিল্পীর কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক উপাদানই এক এক দিকে সীমাবদ্ধ অথচ অন্যদিকে তার পরিধি একান্ত বিস্তৃত। একদিকে যা অসীম—অন্যদিকে হয়ত তা' খুবই সসীম। সব কিছুরই একটা অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য থাকে যদি তা খুঁজে বের করে কাজে লাগাবার কায়দা জানা থাকে।

চিত্রকলার উপাদান হিসেবে টেম্পেরার স্থান অসামান্য। প্রাচীনতম চিত্রকরদের রচনায় টেম্পেরার ধর্ম্ম সুস্পষ্টভাবে আছে। প্রাচীন মিশরের মমিরক্ষার (mummy) আবরণে, পেপাইরাসের (papyrus) গাত্রে টেম্পেরার পরিস্ফুট লক্ষণ আছে। ব্যাবিলনেও আসিরিয়ার প্রাচীর চিত্রে টেম্পেরার দান পাওয়া যায়। অভিজ্ঞদের মতে ভারতেও টেম্পেরা ও ফ্রেস্কো এ উভয়পদ্ধতি সমন্বয় করে চিত্রাঙ্কন হয়েছে। অজন্তার রচনায় এরূপ মিশ্র ব্যবস্থা হয়েছে--উহা ইউরোপীয় প্রথায় আঁকা হয়নি।

টেম্পেরা শব্দটি ইতালীয়—এর খাঁটি মানে হচ্ছে চিত্রের এমন কোন তরল উপাদান যার সঙ্গে রঙ মেশান চলে। এ অর্থে সকল তরল উপাদানকেই এ শ্রেণীর ভিতর ফেলা যায়। কিন্তু তেলরঙের অর্থে ইদানীং এ শব্দটির ব্যবহার হয়না। এর আধুনিক অর্থ হচ্ছে এমন জলীয় উপাদান যার ভিতর

রঙকে আটকে রাখতে বা জড়িয়ে ধরতে মশলারূপে ব্যবহার করা হয়—ডিমের ভিতরকার তরল চটচটে অংশ বা তার সঙ্গে মেশান ডুমুর গাছের কচি শাখায় ভেজান জলে একাজ হয়। অনেক সময় টেম্পেরায় চিত্র-রচনার জন্য ডিমের তরল অংশকে ভিনিগারের সঙ্গে রঙে মেশান হয়। মোটামুটি এভাবে টেম্পেরার রঙ তৈরী হলেও এর প্রচুর রকমারি আছে। টেম্পেরায় আঁকা চিত্রাদির বর্ণের দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নেই এবং তার ভিতর একটি বর্ণ গমকেরও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি জলরঙকে শিরিষ বা গঁদের মত চটচটে পদার্থে মিশ খাইয়ে চিরকাল ব্যবহার করে এসেছে। হ্যাভেল সাহেবের মতে অজন্তার চিত্রাদি টেম্পেরাতে 'touch up' করা হয়েছে। ফ্রেসকো রচনার কায়দা অন্যরকম—তা' পরে আলোচিত হবে।

অজন্তার চিত্রাদিকেও এক হিসেবে ফ্রেস্কো দ্বারা তৈরী বলা যায়—যদিও ইউরোপ ও ভারতের এ দুটি পদ্ধতি মোটেই এক রকমের নয়। ইউরোপীয় প্রথায় ডিমের তরল অংশ মিশ্রণের কোন ইতিহাস এ ক্ষেত্রে এদেশে পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতীয় রচনা খাঁটি temperaর ব্যাপার নয়। বরং ফ্রেস্কোর সহিত অজন্তার বর্ণধর্মের কতকটা সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে tempera বলতে চূণের সাহায্যে রঙ দেওয়াও বোঝায়। বালি ও চূণের তৈরী অস্তরের (plaster) উপর—যখন তা' সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়—ছবি আঁকা হচ্ছে tempera প্রথার কাজ। ফ্রেস্কো প্রথাতে ভিজে দেয়ালে ছবি আঁকতে হয় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবার আগে। এক্ষেত্রে তা' করা হয়না। একে fresco-seccoও বলা হয়। এরকমের বালি ও চূণের plasterকে জল দিয়ে ভিজিয়ে চূণ বা baryta জলে রঙ মিশিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে tempera পদ্ধতির অন্য লক্ষণ। এ অবস্থায় রঙগুলি অনেকটা উপরেই ভাসে কাজেই দেয়ালের চূণের সঙ্গে এক বা অভিন্ন হয়ে যায়না। কাজেই বৌদ্ধ অঙ্কনপদ্ধতিকে বিলিতী ফ্রেস্কো বলা সম্ভব হয়না। তাতে অগৌরব কিছুমাত্র নেই। অপর পক্ষে স্থায়িত্বের দিক হতেও ভারতীয় পদ্ধতি এ পর্য্যন্ত অনেকটা অপরাজেয় হয়ে আছে।

ইউরোপীয় টেম্পেরা পদ্ধতিতে অনেক সময় জলরঙের সঙ্গে size (এক রকম আঠা) ব্যবহার করা হয়—ডিমের তরল পদার্থ ব্যবহার না করে'। এ জিনিষটা গঁদ, গ্লিসারিন, দুধ বা সিদ্ধ করা parchment হতে পাওয়া যায়। এ রকমের size temperaই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল দেয় কারণ ডিমের তরল ভাগ ব্যবহার করলে হলদে রঙটি গাঢ় হয়ে যায়, লালরঙটি কমলালেবুর রঙে পরিণত হয়—তা ছাড়া নীল রঙটিও সবুজে এসে দাঁড়ায়। এ শ্রেণীর জিনিষগুলি গুলে নেওয়ার উপাদান হচ্ছে এক্ষেত্রে জল ছাড়া আর কিছু নয়। দেয়ালে চূণের আস্তর (plaster) অনেক রঙকেই খেয়ে ফেলে বা নষ্ট করে। মিশর ও ভারতের প্রথা অনেকটা টেম্পেরার মত বলে লাল, গোলাপী ও সবুজরঙ ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়নি।

টেম্পেরা প্রথা অবলম্বনের অনুকূলে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করা চলে। শিল্পীদেরও এসব ভেবে চিন্তে নিজের পথ ঠিক করে নিতে হয়। অতি জোড়াল তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার বর্ণপ্রয়োগ টেম্পেরাতে সম্ভব কারণ জমিটিকে এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি শুকোন হয় কাজেই একটি রঙ অন্যটির সঙ্গে সহজে মিশ খেয়ে যায় না। দ্বিতীয়তঃ এতে বেশ প্রশস্ত, উজ্জ্বল এবং খোলামেলা atmospheric toneগুলি ফলান

সম্ভব হয় এবং জমিটাও অপেক্ষাকৃত এক্ষেত্রে অমসৃণ থাকে (matt)। তাতে করে সকল দিক হতেই বর্ণের কারিগরি অধ্যয়নের সুযোগ হয়। এ শ্রেণীর রচনার দোষ হচ্ছে যে অন্য উপায়ে এ জিনিষ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কোন রকম স্যাঁৎস্যেঁতে অবস্থা বা ভিজে সংস্পর্শে রঙ নষ্ট হতে বাধ্য, হয়ত বাইরের না হয় রঙের পিছনের দিক হতে। তা'ছাড়া একবারের বেশী রঙ প্রযোগ করলে রঙ কুঁকড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যায়। অতিরিক্ত গঁদ জাতীয় জিনিষ প্রয়োগেও এ রকম ফল হতে পারে। সামান্য ঘষামাজাতেও রঙ নষ্ট হ'তে পারে ; কাজেই এ রঙকে নিষ্কণ্টকভাবে স্থায়ী করতে হলে এর উপর একটি বার্ণিশের প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন।

ভূমধ্য ইউরোপে টেম্পেরা প্রথায় আঁকার পদ্ধতি চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। তারপর ফ্রেস্কো চল্‌তি হয়ে পড়ে। উত্তর ইউরোপে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ প্রথা চলে, তারপরে তেলরঙের প্রথা সকলেই গ্রহণ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে tempera পদ্ধতি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আধুনিক যুগে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সে এই প্রথাকে আবার পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য একটা চেষ্টা হয় কিন্তু তা সফল হয়না। বর্ত্তমান যুগে থিয়েটারের scene আঁকতে শিল্পিরা এই প্রথা অবলম্বন করে থাকে। যে সব temperaর সাহায্যে রচিত চিত্র ইউরোপে এখনও আছে তাদের ভিতর Francescoর রিমিনির প্রতিচিত্র (National art gallery, London), Durer অঙ্কিত "লালটুপী পরা বৃদ্ধ" (Louvre) এবং বটিসেলির (Botticeli) "Three graces" (Florence) ইউরোপে সুপরিচিত।

ভারতীয় প্রথাকে ঠিক Fresco বলতে অনেকেই রাজি নয়। আবার কেউ কেউ প্রাচীর অঙ্কন মাত্রকেই—তা যে প্রথায় হোক না কেন—ফ্রেস্কো বলতে উৎসাহিত হয়। অথচ যথার্থ ফ্রেস্কোকে কিছুতেই encaustic বা tempera রচনার মত ব্যাপার বলা যায় না। এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আধুনিক কালে এদেশে প্রাচীর অঙ্কনের আবার একটি নূতন চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ চেষ্টাই বিফল হয়েছে। কারণ সম্প্রতি প্রাচীন ধারাবাহী পদ্ধতি কারও জানা নেই। অপরীক্ষিত রঙগুলিও আসছে বিলেত হতে। সেগুলি এদেশে সব রকম রচনার উপযোগী নয়। ভারতের প্রাচীন রঙগুলি তৈরীর বা পাওয়ার কোন বিস্তৃত ব্যবস্থাও ইদানীং নেই।

ভারতীয় রচনার প্রথাটি অনুসন্ধান দ্বারা বিশ্লেষণ করে যতটা জানা গেছে তা' বিবৃত করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে সব চাইতে আগে বিশেষ যত্নে চিত্রের জমি (ground) তৈরী করা হত। সেজন্য যে ব্যবস্থা করা হত সে বিষয়ে গবেষণা হয়ে দু'টি মত বেরিয়েছে। একটির মতে গোড়াতেই মাটি, গোবর ও পাথরের সূক্ষ্ম গুঁড়ো দিয়ে পাথরের দেয়ালে একটি আস্তর (plaster) লাগান হত। তাকে পুরু করা হত এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ হতে চারভাগের তিন ভাগ পর্য্যন্ত চওড়া করে'। কখনও এই মশলার ভিতর খড় বা চালের খোসাও মিহিন করে কেটে দেওয়া হত। তার উপর আবার সাদা একটি পাতলা স্তর (plaster) প্রয়োগ করা হত যা' ডিমের খোসার চাইতে অধিক পুরু হত না। এরকমভাবে তৈরী জমিটিকে পালিশ করে' জলরঙে আঁকা হত। আবার কারও মতে গোড়াতেই বালি ও চুণ দিয়ে আধ ইঞ্চি পুরু একটা প্রলেপ দেওয়া ছিল এর প্রথম কাজ। একে

পুরোপুরি একদিন শুকোনো হত। তার উপর চুনের একটি সূক্ষ্ম শ্বেত স্তর দেওয়া হত। শেষটা রাজমিস্ত্রীদের লোহার একটা পালিশ করবার যন্ত্রে সব জমিটি মসৃণ করা ছিল অবশ্য কর্ত্তব্যকাজ। তার উপর পরে রঙ দেওয়া হত।

আবার রঙগুলিকে চাল বা Linseed waterএর সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়ো করা হতো—তাতে কিছু গুড় ও জল মেশান হত। ছবি আঁকা হলে ছোট একটি trowel দিয়ে আবার জমিটিকে পালিশ করা হত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দুটি আস্তর বা মশলার প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল প্রাচীরে—ছবি আঁকবার আগে। এর একটিকে বলা হয় arricio বা একমেটে মোটা প্রলেপ। দ্বিতীয়টি হল intonaco শেষ বা সূক্ষ্ম প্রলেপ (finishing coat)। শ্রীগুহের চিত্রিত জমিতে শেষের প্রলেপের ঘনত্ব এক ইঞ্চির অর্দ্ধেক বা সিকি ভাগ মাত্র ছিল। অজন্তার এই প্রলেপ ডিমের খোলস অপেক্ষা অধিক মোটা করা হয়নি। টেম্পেরা পদ্ধতিতে plaster surfaceকে শুধু করা হত। শুধু যেদিন আঁকা হবে তার আগের দিন জমিকে জল দিয়ে খুব ভাল করে ভেজান হত—পরদিন সকালেও তা আবার একবার ভিজিয়ে নেওয়া হত। জলের ভেতর কিছু চূণ বা Baryta waterও এ সুযোগে যোগ করে দেওয়া হত। ভারতের অজন্তা প্রভৃতি গুহায় এ রকমের পদ্ধতিতেই কাজ করা হয়েছে ইদানীং এই সিদ্ধান্তই মেনে নেওয়া হয়েছে।

তারপর ছবি আঁকার কথা। এই জমির উপর গোড়াতেই লালরেখায় ড্রইং করে থাকেন ওস্তাদ শিল্পী। এর উপর অর্দ্ধস্বচ্ছ একটি একরঙের প্রলেপ দেওয়ার রীতি ছিল। এটার ভিতর দিয়ে নীচেকার লাল রেখাঙ্কন বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এর পরে নানা রকম রঙে ছবি আঁকা হত চিত্রকর কখনও আবার ছবির কাল ও ব্রাউন রঙগুলিকে তীক্ষ্ণ করত এবং কিছুটা ছায়াপাতও যুক্ত করত। সঙ্গে সঙ্গে সাদা কালো রঙের অংশগুলিকে বেশ তীব্র করা হত যাতে করে সমগ্র রচনাটি উজ্জ্বল ও প্রাণবান হয়ে উঠত। এমনি করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কণের বিশিষ্ট ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

সাময়িক সাহিত্য

কবিতা

অকুন্তলা : প্রমথনাথ বিশী : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স : দাম ২৷৷০।

নয়টি নাতিহ্রস্ব কবিতার সমষ্টি অকুন্তলা। প্রথম কবিতার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই পয়ার ছন্দে লেখা—মিত্রাক্ষর অথবা অমিত্রাক্ষর। গদ্যরচনায় সুদক্ষ কবির লিপি-চাতুর্য এই ছন্দের সহায়তায় যথেষ্ট প্রকাশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রথম তিনটি কবিতা—'অকুন্তলা' 'লাল শাড়ি' ও 'ক্যালকাটা রোডে'র রচনা-রীতি লঘু ও রসোজ্জ্বল—মনে হয় কথা নিয়ে খেলা করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। আরো মনে হয় রচনার গতির দ্রুততায় কবি কখনও কখনও ছন্দের সৌষ্ঠব সম্বন্ধে অনভিনিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। বাকী কবিতা কটির মধ্যে 'ত্রিশঙ্কু'ই আমার সব চেয়ে ভাল লাগলো।

প্রমথ বিশীর কবিতা আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে তার রীতির স্বচ্ছন্দ সাবলীলতার জন্য। ছন্দোবদ্ধ হয়েও প্রমথ বাবুর কবিতা উৎকৃষ্ট গদ্যের গুণ-সমন্বিত। মনে হয়, তিনি 'নিশ্বসি', 'ইচ্ছি' প্রভৃতি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার না করলে তাঁর কবিতা আরো বেশী উপভোগ করতাম।

প্রমথ বাবুকে ধন্যবাদ, আজকালকার একঘেয়ে ধ্বজাধারী কবিতার যুগে তিনি নতুন (আসলে পুরোনো) রসের স্বাদ দিয়ে আমাদের আনন্দ দিলেন।

অজিত দত্ত

দিগন্ত : মৃণালকান্তি দাশ : প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল পাবলিশার্স : দাম ২৲।
রাত্রিশেষ : আহ্‌সান হাবীব : কমরেড পাবলিশার্স : দাম ৸৹।

মৃণালকান্তি দাশ রাজধানীর কবি নন্, সুতরাং স্বভাবতই তিনি সাহিত্যিক দলাদলির বাইরে থেকে নিজের সত্তাকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তাই বোধ হয় তাঁর কাব্যের আগাগোড়া নিরবচ্ছিন্ন একটা সৌন্দর্য্যোপলব্ধির সুর এমন ভাবে প্রবাহিত হতে পেরেছে। যে কোন নির্জ্জনতাবিলাসী কবির পক্ষে যা হওয়া স্বাভাবিক, মৃণালকান্তির পক্ষেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি নিশ্চিন্ত ও অকপট হয়েই আপন মনের মুক্তি চেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে, একান্ত নিবিড়ভাবেই নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নিতে চেয়েছেন, তার ফলে, তাঁর কাব্যধারার মধ্যে যেমন একটা অবিমিশ্র রোমান্টিক সুর অনুরণিত হয়েছে, তেমনি ভাষা ও ছন্দে কোথাও অস্পষ্টতা বা জড়তার গ্লানি জড়িয়ে থাকে নি। কবির আন্তরিকতা

ও কাব্যের রূপময়তার এই অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকেই জন্মলাভ করে সত্যিকারের কবিতা—যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি জাগায় কাব্যরসিকের প্রাণে। তাই মৃণালকান্তির কবিতা এই দুঃসহ আধুনিকতার আলোড়নের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে কাব্যরসিকের মনকে জয় করে নিতে পারে। মাঝে মাঝে ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাবিপর্যায় যে কবিকে আকুল করে না তুলে তা নয়, তথাপি সৌন্দর্য্যের উপাসক বলেই তিনি এই বিপর্য্যয়ের মধ্যেও নতুন এক জীবনের আভাস খুঁজে পান। তাই বিষণ্নমনে একথা যদিও তিনি উচ্চারণ করেন :

লোভ হিংসার নিষ্ঠুর সংগ্রাম :
দিকদিগন্ত হিংস্র নখরে দীর্ণ।

তথাপি, পরমুহূর্ত্তেই আত্মবিশ্বাসের উদার আশাবাদে ফিরে আসেন :

হে বিজয়ী, জানি সর্ব্বনাশের শেষে
বিজয়কেতন উড়িবে উর্দ্ধাকাশে।
'এই ধ্বংসের ধূ ধূ প্রান্তর ভরি'
ফোটাবে নবীন জীবনের মঞ্জরী॥

শুধু তাই নয়, যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যেও কবি পরম নির্ব্বিকারে প্রাণের উদ্বেল প্রেমকে এমনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন :

জ্যোৎস্নার বনে জেগেছে জোয়ার
তোমারে আমারে ভাসিয়ে নেবার।
হয়তো জীবনে পাব না আর,
এমন মাধুরী এ মায়া রাত :
কোথা উড়ে যায় রাতের পাখী,
'একটি করুণ মিনতি রাখি'
মালতী, আমার মিনতি রাখ :
হিমানী শীতল হাতটি দাও,
হৃদয় দাও, হৃদয় নাও॥

কামনা করি, মৃণালকান্তি এমনিভাবে রাজধানীর কোলাহল থেকে দূরেই থাকুন, সমস্ত প্রকার দলাদলির বাইরে থেকে সত্যিকারের কাব্যরচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখুন ; তা হলে, যত সামান্যই হোক বাংলা কাব্যসাহিত্যের দরবারে মহৎ কিছু দিয়ে যেতে পারবেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন মুসলমান কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আহসান হাবীব অন্যতম, এমন কি তাঁর স্থান যে পুরোভাগেই তা ইতিমধ্যে কোন কোন মহল থেকে স্বীকৃতও হয়েছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর যে সব কবিতা আমি ইতস্ততঃভাবে পড়বার সুযোগ পেয়েছি, তাতে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে, আহসান হাবীব মনেপ্রাণে খাঁটি কবি তো

বটেই, শক্তিশালী কবিও বটে। সাধারণত রোমান্টিক কবিতা—প্রেমের কবিতাতেই কবি নিজেকে ব্যক্ত করেন অত্যন্ত সাবলীলতায়। 'রাত্রিশেষ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কিন্তু রোমান্টিক কবিতাবর্জ্জিত। তাই, যে আগ্রহ নিয়ে এ গ্রন্থটি হাতে নিয়েছিলাম, কবিতা পড়ে সে উৎসাহ-আগ্রহ আর বজায় রাখতে পারিনি, এ কথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে। তা বলে 'রাত্রিশেষ' উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়নি, সে কথা বলবো না। রচনাশৈলী, শব্দচয়ন ও ছন্দের কারুকলায় আহসান হাবীবের স্বাভাবিক দক্ষতা এখানে কিছুমাত্র খর্ব্ব হয়নি, কোন কোন কবিতা তো ভাববস্তুর প্রাচুর্য্যে রীতিমত ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছে। 'বাইশে শ্রাবণ'-দিনের প্রতি কবির যে আন্তরিক শ্রদ্ধা তাই যেন গম্ভীর সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হয়েছে কবিতার ছন্দরূপে :

অনেক শ্রাবণ-দিন বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে; মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়—খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন,
পাণ্ডুর মলীন !
... ...
তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এলো তার।
একটি মৃত্যুই শুধু দিলো তারে মহিমা অপার
দীর্ঘ দিন পৃথিবীতে পরম গৌরবে বাঁচিবারে।
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেলো তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিতপক্ষ আঁখির প্রসাদ,
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।

'রাত্রিশেষে' কয়েকটি গদ্যকবিতাও স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলো যে ভাল হয়নি এমন কথা বলা যায় না, তথাপি আহসান হাবীবকে অনুরোধ করব, তিনি ছন্দময় কবিতাই রচনা করুন। সেখানে যে সার্থকতা তিনি স্বচ্ছন্দে আয়ত্ত করতে পারবেন, গদ্যকবিতা তাঁকে সে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। হাল্কা মনের পরিচয় আছে কয়েকটি কবিতায়, কিন্তু সেগুলো কথার চাতুরী ছাড়া আর কি প্রকাশ করেছে? আমার মনে হয়, এ কয়টি কবিতাকে এ-বই থেকে বাদ দিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হতো না।

অনিল চক্রবর্ত্তী

সূর্যস্বপ্ন : বিমল দত্ত : দি বুক হাউস : এক টাকা।
পান্থবীণা : এ, এন, এম, বজলুর রশীদ : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : দু'টাকা।

বৈশিষ্ট্যবর্জিত ও অকথ্য বানান ভুলে কণ্টকিত কবিতার বই সূর্যস্বপ্ন। কোন কোন কবিতার দুয়েকটি লাইন হঠাৎ চমক দিয়ে উঠলেও—সমগ্রভাবে কোন কবিতাই পুনরুক্তি করবার মত নয়।

বিমল দত্তের কবিমন আছে কিন্তু কবিতা লিখে ছাপাতে হলে আরও অনুশীলনের প্রয়োজন, প্রয়োজন ছন্দ ও শব্দ চয়নের দিকে কবিজনোচিত সতর্ক দৃষ্টির।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজও ভালো লাগে, এবং আজো একথা সগর্বে ঘোষণা করা চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে যদি কেউ কবিতা লেখেন, বা কারো কবিতা যদি পুরোপুরি-ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত হয় তাও কি ভালো লাগবে? প্রশ্নটা বিতর্কমূলক। কিন্তু সমাধানটা আপাতত মুলতুবী রেখেও পান্থবীণার প্রশংসা করা চলে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে মানুষ হয়েও রশীদ সাহেব যে তথাকথিত 'আধুনিক' হবার কসরতে কাব্যকেই বর্জন করে কবিতা লেখেননি এর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

এর ব্যতিক্রম, অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অথচ সত্যিকারের ভালো কবিতা রশীদ সাহেবের কাছ থেকে পেলে নিঃসন্দেহে আরো খুশী হতুম—কিন্তু আপাতত এই ভাল।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

উদ্বাস্তু : দেবদাস ঘোষ : শ্রীগুরু লাইব্রেরী : তিন টাকা।

বর্ধমানের রাজবাড়ীর বারো টাকা মাইনের দরিদ্র দপ্তরী রামলাল সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কিছু চাষের জমি কিনে রেখে গেল···যাতে তার উত্তরপুরুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারে। দুই পুরুষের মধ্যে কোনরকম দুর্দৈব ঘটল না, তৃতীয় পুরুষে শ্যামলালের মধ্যজীবনে ভাঙনের সূত্রপাত হল, এবং শ্যামলালের ছেলে পিয়ারীলাল উদ্বাস্তু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকও লেখনী সম্বরণ করলেন।

বিষয়বস্তু হিসেবে লেখক যা বেছে নিয়েছেন তা সাম্প্রতিক বাঙলার অশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। শুধু বিহারীলাল নয়, লক্ষ লক্ষ বাঙালী চাষীও আজ এই একই ট্রাজেডির নাগপাশে মুমূর্ষু। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রসারতা ও পরিচ্ছন্নতা থাকলে এবং যে অনুপাতে সমাজসচেতন হলে এই উপন্যাস-খানি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হিসেবে আদরণীয় হতে পারত—শ্রীযুক্ত ঘোষে তা একান্তরূপেই অনুপস্থিত। তাই বিহারীলালের ট্রাজেডি কোন সর্বজনীন রূপ পায়নি—লেখকের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সেখানেই। কৃষকজীবন সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু লিখন-ভঙ্গি যারপরনাই কাঁচা ও আঞ্চলিকতা-দোষে দুষ্ট। ফলে কাহিনী একটুও জমাট বাঁধতে পারেনি—অবান্তর ঘটনাবলী ও চরিত্রের ভিড়ে শেষ পর্যন্ত 'হ-য-ব-র-ল'-এ পরিণত হয়েছে।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
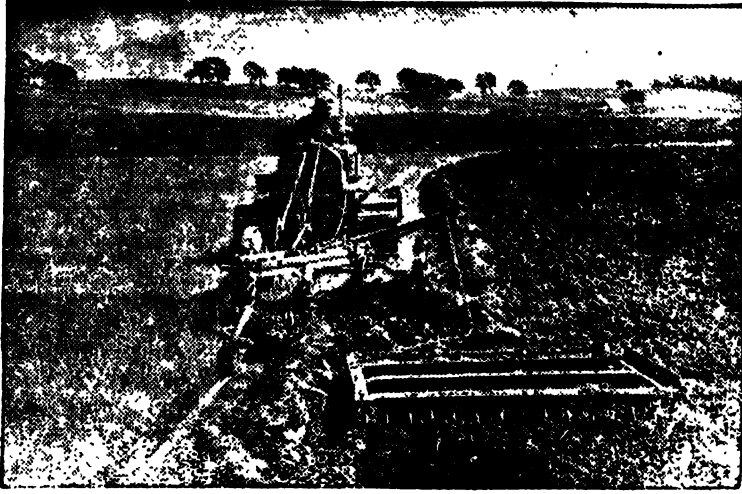
সংকলন

মেঘনা : সম্পাদক : বিমলচন্দ্র ঘোষ : ৫ বি, বেলতলা রোড : দাম ৩৲ ।

এ বৎসর যে কয়টি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, অঙ্গসজ্জায় মেঘনাই বোধ হয় তাদের মধ্যে সব চাইতে ভালো। প্রতিষ্ঠাবান লেখকের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েই সাধারণত এ ধরণের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, মেঘনার বিশেষত্ব এই, এখানে তাঁরা তো উপস্থিত আছেনই, তা ছাড়া আছেন এমন কয়েকজন লেখক যাঁরা প্রতিষ্ঠা এখনও অর্জ্জন করেননি বটে, কিন্তু সম্ভাবনা যাঁদের আছে। এ ছাড়াও এর আর একটি আকর্ষণীয় বস্তু হলো ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাছে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর একটি চিঠি। জার্ম্মানী বা হিটলার সম্বন্ধে তিনি কি মত পোষণ করতেন, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যাবে এই চিঠি থেকে। প্রতিষ্ঠিত লেখকের প্রায় সবগুলো রচনাই উল্লেখযোগ্য, সুতরাং সে সম্বন্ধে ভিন্নভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র 'আধুনিক কবির দায়িত্ব' সম্বন্ধে একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাকে Platform Lecture নামেই আখ্যা দেওয়া ভালো। তাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবই আছে ব্যাপকভাবে, আর কাব্য সম্বন্ধে কিছু না থাকলেই নয় বলেই যেন যা হোক একটু আছে। আর যাও আছে তা আপত্তিকর, বিরক্তিকরও। চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'আধুনিক বাংলা কবিতার গতি'র একটা দিকনির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। মতের অমিল প্রচুর ঘটলেও এ কথা মানতে কুণ্ঠিত নই যে, তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদভাবে বলেছেন এবং কোথাও অস্পষ্ট হয়ে যাননি, অমরেন্দ্রপ্রসাদের মত বিভ্রান্তি ঘটেনি তাঁর। এ দুটো প্রবন্ধ থেকে এ কথাটাই বিশেষভাবে মনে হলো, তাঁরা বাংলা কবিতাকে বড় বেশী গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলতে চাইছেন, বড় বেশী উদ্দেশ্যমূলক। তা না হলে, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্তকে উড়িয়ে দিয়ে এ কথা কি করে বলা সম্ভব যে, আজকের দিনের অগ্রণী কবি হচ্ছেন বিষ্ণু দে? ২২শে জুন থেকে বিষ্ণু দে যে সব কবিতা রচনা করেছেন তাদের অধিকাংশকেই আদৌ কবিতা বলা যায় কিনা ত-ই তো প্রথম প্রশ্ন। আবার নাকি রমেশ শীল নিবারণ পণ্ডিত ইত্যাদির মধ্যেও বাংলা কবিতার সম্ভাবনাকে খুঁজে দেখতে হবে। আলোচনা-প্রসঙ্গে এ ধরণের উক্তি যাঁরা করেন, তাঁদের অন্ততঃ এই সহজ সরল কথাটি মনে রাখতে অনুরোধ করি, বাংলা কবিতার ওপর কোন রাজনৈতিক দল বিশেষেরই একচেটিয়া আধিপত্য নেই এবং তা থাকতে পারে না, সুতরাং সাহিত্যপ্রসঙ্গ নামে প্রোপাগাণ্ডামূলক মতামত সোচ্চারে বিজ্ঞাপিত করা মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচয়মাত্র।

অনিল চক্রবর্ত্তী

রূপের উৎস!

স্নান করাকে অনেকেই একটা দৈনন্দিন সাধারণ কাজ বলেই মনে করেন। স্নান সাধারণ বটে, কিন্তু সামান্য নয়। স্নান রূপ-সাধনারই অঙ্গ।

মালিন্যমুক্ত তনুচ্ছদের অকলঙ্ক মৃদুসৌরভ সারাটি অন্তর ভরে তোলে, জাগিয়ে দেয় রূপ মাধুর্যের প্রীতিকর অনুভূতি। স্নানের সময় যাঁরা উৎকৃষ্ট সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করেন, তাঁদের অন্তরে স্নানের তৃপ্তি ও আনন্দানুভূতির সঙ্গে দেহকান্তি উজ্জ্বল ও শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত হয়ে ওঠে। স্নানের সময় "মার্গোসোপ" ব্যবহারে পাওয়া যায় দেহ মনের এই আনন্দ ও তৃপ্তি। স্নানের পর সর্বাঙ্গে নিমের টয়লেট পাউডার "রেণুকা" ছড়িয়ে দিলে সারাদিন চিত্তের প্রসন্নতা অক্ষুন্ন থাকে। গোধূলির অস্তরাগে দেবভোগ্য অঙ্গরাগ চন্দনগন্ধ "মলয়" সাবান মাখলে সন্ধ্যা মালতীর মতো ফুটে উঠবে তনুকান্তি।

সূচীপত্র

মাঘ—১৩৫৪

প্রবাসী — মাঘ, ১৩৫৪

স্বাধীনতার অভিযান

(ফরাসী চিত্র—১৮৩০)

শিল্পী — দেলাক্রোয়

দশম বর্ষ • দশম সংখ্যা
মাঘ • ১৩৫৪

বিপ্লব ও বিবর্ত্তন

হুমায়ুন কবির

ভারতবর্ষ আজ ইংরেজের শাসনযন্ত্র থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু ইংরেজশাসনের আমলে যে মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছিল, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ইংরেজশাসন বহুক্ষেত্রেই শোষণের নামান্তর, তাই সেই শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্ম্মকথা। সেই শাসন এবং শোষণকে ধ্বংস করাই ছিল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ধ্বংসের পরের অবস্থার কথা তখন আমরা সেভাবে চিন্তাই করিনি। শুধু তাই নয়—ইংরেজ শাসনের গ্লানি ও দুঃখ আমাদের এত বেশী অভিভূত করেছে যে তার ফলে যে কোন ধ্বংস প্রচেষ্টাকেই আমরা রাজনৈতিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলে ভেবেছি। একে গঠনমূলক কাজের অবকাশ ছিল কম, তার উপরে বিদেশীর শাসনের বিরুদ্ধে আক্রোশে সেই স্বল্প সুযোগ সুবিধাও আমরা গ্রহণ করিনি।

গঠনমূলক কাজে উত্তেজনা কম, তার ফলও তক্ষুনি ধরা দেয় না। ধ্বংস করা যত সহজ, গড়ে তোলা তত সহজ নয়। অবশ্য একথাও সত্য যে সত্যিকারের গঠন বা সৃষ্টির জন্যও ধ্বংসের প্রয়োজন, কিন্তু তাকে ধ্বংস না বলে পরিবর্ত্তন বল্লেই তার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে যা বদলায়, তার পরিবর্ত্তনও সহসা চোখে পড়েনা—আকস্মিক যা বদলে যায়, তার রূপান্তর চমকপ্রদ। এসমস্ত কারণেও মানুষ গঠনের চেয়ে ধ্বংসের দিকে সহজে

ঝুঁকে পড়ে। বিশেষ করে যারা তরুণ, যারা অসহিষ্ণু, যারা হাতে হাতে ফল চায়, তারা যে এভাবে আকস্মিক পরিবর্ত্তন বা ধ্বংসের দিকেই বেশী ঝুঁকবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পরিবর্ত্তনের গতিবেগ দিয়েই আমরা বিবর্ত্তন ও বিপ্লবের পার্থক্য বিচার করি। বিবর্ত্তনের ধারায় সমাজের চেহারা বদলায়, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন দীর্ঘকালব্যাপী ও ধারাবাহিক। বিপ্লবে সমাজের যে রূপান্তর, সে দ্রুত ও আকস্মিক—তার বিভিন্ন স্তরগুলি সুস্পষ্ট নয়, এবং বহুক্ষেত্রে মধ্যের অনেকগুলি ধাপ বাদ পড়ে যায়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তাই বিপ্লববাদ সহজেই তরুণ কর্ম্মীদের আকর্ষণ করেছে—এমনকি লক্ষ্যের কথা ভুলে গিয়ে কর্ম্মপন্থার আবেদনই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পছন্দ অপছন্দের জন্য যুক্তি খুঁজে বেড়ানো কিন্তু মানুষের স্বভাব—তাই ভারতীয় তরুণ তার বিপ্লবপ্রীতির সাফাই দিতে কসুর করে নাই।

ভারতবর্ষে আজ মার্কসবাদের যে অপ্রশ্ন স্বীকৃতি, ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসই তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। শতাব্দীব্যাপী শোষণের ফলে আজ ভারতবর্ষের জীবন খিন্ন, সে অবস্থা মোচন যে পরিমাণে প্রয়োজনীয়, পরাধীনতার ফলে ঠিক সেই পরিমাণেই দুরূহ মনে হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিদেশী শাসনের ফলে দেশের লোকের এ বিষয়ে দায়িত্ববোধও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ক্ষমতা যে ব্যবহার করে, ক্ষমতার পরিমাণ সম্বন্ধেও তার ধারণা প্রথমে না হলেও ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে,—সে জানে যে সামর্থ্যের বেশী করতে চাইলে যা সম্ভব, তাও বহুক্ষেত্রে অসমাপ্ত থেকে যায়। যার হাতে ক্ষমতা নেই, তার কোন দায় নাই—তাই তার দাবী সর্ব্বদাই অসংযত ও কোন কোন ক্ষেত্রে অসঙ্গত। অবশ্য এর একটা উল্টো দিকও আছে। সর্ব্বদাই সামর্থ্যের সীমানার মধ্যে বসে থাকলে ক্ষমতার সম্প্রসারণ হয়না। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে অনেক সময় অসম্ভবের সাধনা করতে করতে আজ যা অসম্ভব, কাল তাই সম্ভব হয়ে উঠে। ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের কাছে অসম্ভবের আকর্ষণ তাই অনেক বেশী। মার্কসবাদ ভবিষ্যতে সমাজের যে ছবি আঁকে, বর্ত্তমানের ভারতবর্ষের গ্লানির তুলনায় তাকে কল্পলোক বল্লেও অত্যুক্তি হয়না। তাই মার্কসবাদ যে ভারতীয় তরুণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে, এটা বিচিত্র নয়।

মার্কসবাদের নিজস্ব আকর্ষণ ও ভারতীয় জীবনের বঞ্চনা ও ক্ষোভ ভিন্নও আর একটী কারণে মার্কসবাদ ভারতীয় তরুণের এত প্রিয়। সেটী হচ্ছে রুষবিপ্লবের ইতিহাসে লেনিনের ব্যক্তিত্বের খেলা। আজ একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে মুষ্টিমেয় সচেতন কর্ম্মীর চেষ্টার ফলেই রুষবিপ্লবের সাফল্য। তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য, কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চরিত্রের শক্তিতে সংখ্যার দৈন্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে কখনো ভুল করেনি। বিপ্লবই ছিল তাদের লক্ষ্য। সচেতন বিপ্লবী তো বটেই, এমনকি

পেশাদার বিপ্লবী বল্লেই তাদের ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। রুষদেশের জনসাধারণ সেদিন অচেতন বা অর্দ্ধচেতন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয় ও বিড়ম্বনার ফলে অন্নবস্ত্রের অভাবে বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত। তাদের মধ্যে প্রচারের ফলে তাদের সচেতন করে বিপুল জনগণের মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন সমাজ গড়ে উঠবে—এ ধরণের কল্পনা একবারও লেনিনের মনে সেদিন আসেনি। তিনি জানতেন যে গণ-আন্দোলনের প্রচেষ্টা করতে গেলে দীর্ঘদিনের সাধনা করতে হবে এবং তার ফলে যে সুবর্ণ সুযোগ তাঁর সামনে সেদিন এসেছিল, তা হারাতে হবে। তাই নিজের অনুবর্ত্তী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলের সাহায্যে আচমকা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহারে তিনি সমাজবিপ্লব সাধন করতে চেয়েছেন। বিপ্লবের স্বার্থেই তাঁর সুবিধাবাদ, কিন্তু তবু তাকে সুবিধাবাদই বলতে হবে। সময় ও সুযোগ সম্বন্ধে তাঁর হিসাব অভ্রান্ত হয়েছিল বলেই তিনি সফল হয়েছিলেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে গণশক্তির ব্যবহারে তিনি রাষ্ট্রশক্তি দখল করেননি, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীর যে পন্থা, সেই উপায়েই লেনিন নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন।

সেদিনকার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ও মহাযুদ্ধের শক্তিকেন্দ্র বিন্দুমাত্র বদলে গেলে লেনিনের প্রতিভা এবং সময় ও সুযোগ সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারও কিন্তু রুষবিপ্লবকে সার্থক করতে পারতনা। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের ফলাফল তখনো অনিশ্চিত। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষই তখনো বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে অথচ পরাজয়ের আশঙ্কাকে একেবারে দূর করতে পারছেনা। মহাযুদ্ধের সে সন্ধিক্ষণে রুষবিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোন পক্ষেরই ছিলনা। শুধু তাই নয়, মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি। উভয় পক্ষই ভেবেছে যে রুষরঙ্গমঞ্চে যে মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীর ষড়যন্ত্র, রুষদেশের মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকবে, এবং দুদিন পরে রুষ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে যাবে। প্রতিপক্ষদের এই অবহেলার ফলেই লেনিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা নিশ্বাস ফেলবার সময় পেলেন। সেদিন যদি কোন পক্ষ নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করত, তবে রুষবিপ্লবের ভবিষ্যত যে কি হত সে কথা বলা কঠিন। রুষবিপ্লবের পূরোপূরি তাৎপর্য্য যুদ্ধরত কোন পক্ষই বোঝেনি, তা বুঝলেই নিজেদের মধ্যে আপোষে রফা করে তারা মিলিতভাবে রুষবিপ্লবের দফা শেষ করতে প্রয়াস পেত।

যুদ্ধরত দেশগুলির অসামর্থ্য ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে লেনিন রুষদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নিলেন। জনগণের আন্দোলন বা সক্রিয় সহযোগের কোন প্রশ্নই সেদিন তাঁর কাছে ওঠেনি। জনগণের সাহায্য না নিয়েই তিনি বিপ্লব করে বসলেন একথা বল্লে হয়তো অত্যুক্তির মতো শোনাবে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রুষরঙ্গমঞ্চে সেদিন যে অভিনয়, দেশের বিপুল জনসাধারণের তাতে দর্শকেরই ভূমিকা। জনসাধারণের মনে সেদিন একমাত্র চিন্তা

যুদ্ধের অবসান ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান। সেই মনোবৃত্তির সুযোগে লেনিন তিনটী দাবী নিয়ে এগিয়ে এলেন—যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, সকলের রুটীর ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষককে জমি বিলি করে দিতে হবে। শান্তির আহ্বানে জনসাধারণ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল, রুটীর ভরসায় তারা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, জমির মালিক হবে এই আশায় তিনি যা বলেন তাই করতে রাজী হয়ে গেল। লেনিন নিজে জানতেন যে তাঁর লক্ষ্য অন্য—সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ও রাষ্ট্রশক্তির অধিকারই তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু একথাও তিনি জানতেন যে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘোষণা করলে জনসাধারণ তাঁর ডাকে আসবেনা। লেনিনের বিপ্লবের ফলে রুষদেশে যে রাষ্ট্র জন্মলাভ করল, তাকে জনগণের কল্যাণকামী জনসাধারণের রাষ্ট্র বলা চলে, কিন্তু জনসাধারণ পরিচালিত গণতন্ত্র বলা চলেনা।

একপক্ষে মুষ্টিমেয় সচেতন পেশাদার বিপ্লবী, অন্যপক্ষে লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত রাষ্ট্র-অচেতন সাধারণ মানুষ। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তার ফলে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্র না হয়ে সর্ব্বগ্রাসী আমলাতন্ত্রের রূপে আত্মপ্রকাশ করল। লেনিন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্রষ্টা। কিন্তু রাষ্ট্র-স্থাপনের মুহূর্ত্তে তিনি নিজে অনুভব করেছেন যে আমলাতন্ত্রকে গণতন্ত্রে পরিণত করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অথচ রুষদেশের জনসংগঠনের কথা মনে রাখলে তাঁর অন্য উপায়ও ছিল না। বিরাট জনতা সেখানে শিক্ষাদীক্ষাহীন। রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে অপরিচিত! এমনকি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মারফৎ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণক্ষেত্রেও ক্ষমতার ব্যবহার দেখেনি। তাই অচেতন সংঘবদ্ধ বিপ্লবীশ্রেণীর সর্ব্বনায়কত্ব ভিন্ন সেদিন লেনিনের পক্ষে রাষ্ট্রচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

প্রয়োজনের তাগিদে লেনিন যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর সাফল্যের দরুণ অন্যের কাছে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আদর্শ। যেদেশে একদিকে মুষ্টিমেয় সচেতন বিপ্লবী ও অন্যদিকে রাজনীতি-অনভিজ্ঞ বিপুল জনতা, সেখানে অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দুরাশা। গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে নিলেও সেখানে উপস্থিত ব্যবস্থা করতে হবে অন্যরূপ। এবং লেনিন ঠিক তাই করেছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে নেতৃত্বের যে ব্যবধান, সে ব্যবধান কিন্তু সহজে মিটল না। লেনিনের স্বপ্ন ছিল যে বাবুর্চ্চি বা কোচোয়ানও যেন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারে। কার্য্যত কিন্তু জনসাধারণের বিপুল অংশ শাসিতদের মধ্যে রয়ে গেল, শাসকের পর্য্যায়ে উঠতে পারল না। সাধারণের পক্ষে পূর্ব্বের মত এখনও রাষ্ট্র প্রভু হয়েই রইল—থিওরীতে নাগরিক হয়েও ব্যক্তি বস্তুতপক্ষে প্রজাই রয়ে গেল। সাধারণ মানুষ হুকুম তামিল করেই দিন কাটাতে লাগল—হুকুম দেবার সুযোগ তার আর মিলল না।

মার্কস বলেন যে শ্রমবিভাগের ফলে যে শ্রেণীবিভাগ, তাতে বুদ্ধিজীবী ও শরীরজীবীর

মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। রুষবিপ্লবের প্রাক্কালে একদিকে ছিল সচেতন ও প্রতিভাবান নেতৃত্ব—অন্যদিকে অচেতন জড়স্বভাব জনতা, কিন্তু বিপ্লবের পরেও তার ব্যতিক্রম হল না। লেনিন যেভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ করলেন, তার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ কায়েমী হয়েই রইল। অথচ লেনিন ও ট্রটস্কি এবং পরে ষ্টালিনের নেতৃত্বে রুষরাষ্ট্রের যে কীর্ত্তি ও সাফল্য দেখা গেল, তার ফলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এ 'দুর্ব্বলতা' ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কার্য্য প্রায় চাপা পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, রুষবিপ্লবের সাফল্য দেখে দেশ বিদেশের প্রগতিপন্থীরা ভাবতে সুরু করল যে বিপ্লবের পন্থা ভিন্ন সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্র দুঃসাধ্য বাধা লেনিন ট্রটস্কি ও ষ্টালিনের নেতৃত্বে জয় করেছে—ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই যা নৈতিক আদর্শবাদীরা ভেবেছে যে তাঁদের অনুসৃত পথে চললেই সিদ্ধি মিলবে, নইলে পরাজয় অনিবার্য্য। রুষদেশের তৎকালীন সমাজ সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা তাদের মনে থাকেনাই। এ কথাও তারা বিস্মৃত হয়েছে যে মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে জয় পরাজয় অনিশ্চিত ছিল বলেই রুষবিপ্লব দানা বাঁধবার সুযোগ ও সময় পেয়েছিল। এ সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে লোকে এই সহজ সিদ্ধান্ত করেছে যে বিপ্লব ও সংঘর্ষ ভিন্ন ধনতন্ত্রের অবসান হবে না। ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পথে বিপ্লব ঘটানোকেই মনে হয়েছে সমাজ-সংস্কারকের একমাত্র লক্ষ্য।

লেনিনের প্রতিভায় যা সম্ভব হয়েছিল, সকলের পক্ষে যে তা সম্ভব নয় একথাও প্রায়ই চাপা পড়ে গেছে। শুধু তাই নয়—লেনিনের দোহাই দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলাদলিও বেড়ে চলেছে। মতের পার্থক্যের জন্য লেনিন রুষদেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টি ভেঙে নিজের বলশেভিক দল গড়ে তুলেন। তখন তিনি সংখ্যার উপর জোর দেননি। জোর দিয়েছেন পার্টি সদস্যের ব্যক্তিগত গুণের উপর। জনসাধারণের সমর্থন প্রথমে না পেয়েও সেই পার্টির সংগঠন ও শৃঙ্খলার শক্তিতে তিনি রুষবিপ্লবকে সফল করে তুললেন, কিন্তু তার ফল হল এই যে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে হবু লেনিনের দল বলতে সুরু করলে যে জনসাধারণের সমর্থন থাক আর না থাক, মুষ্টিমেয় পার্টি সদস্যের দ্বারাই তারা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। ফলে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে আজ অসংখ্য দল ও উপদল। সকলেই নিছক তত্ত্বের দোহাই দেয়, এবং বিন্দুমাত্র মতভেদ হলে নতুন দল গ'ড়ে বলে যে তারা লেনিনের মতনই বিপ্লবী। ভারতবর্ষে আজ যে এত বিপ্লবী, অতি-বিপ্লবী ও মারাত্মক বিপ্লবীর ছড়াছড়ি, তারও মূলে লেনিনের শিক্ষার অপপ্রয়োগ।

রুষবিপ্লবের অভিজ্ঞতায় পৃথিবীময় সমাজতন্ত্রবাদীদের এই ধারণাই হয়েছিল যে, গোপন মন্ত্রণা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও বিপ্লব ভিন্ন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কিন্তু

বিলেতে এবার শ্রমিক গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পরে সে ধারণা খানিকটা বদলেছে। বিলেতে আজ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে চলছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই, কিন্তু বিলেতে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র বিনা বিপ্লবেই অধিকার করেছে। গণভোটের দ্বারাও যে রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্তে আনা যায়, সে কথার প্রমাণই বিলাতের সাধারণ নির্ব্বাচনে লেবর পার্টির জয়ের মূলকথা। চক্রান্ত বা সংঘর্ষ না করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অর্থ বিবর্ত্তনের জয়, তাই বিলাতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় বিপ্লব না করেও সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে কথার পরীক্ষা হবে। বিলেতে লেবর পার্টির অবশ্য কতগুলি সুবিধাও আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত সচেতন শ্রমিকশ্রেণী নাই, রাজনৈতিক চেতনাও জ্ঞানত অন্য কোথাও এত ব্যাপক নয়। শুধু তাই নয়—অগ্রগামী ও অনুগামীর মধ্যে পার্থক্যও বিলেতেই বোধ হয় সব চেয়ে কম, গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতাও সেখানে দীর্ঘতম। এ সমস্ত কারণেই বিনা সংঘর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিক শ্রেণীর আয়ত্তে এসেছে। এরকম সম্ভাবনার কথা মার্কসেরও অগোচর ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের মতন গণতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিনা সংঘর্ষ ও বিনা রক্তপাতে সম্ভব হলেও হতে পারে। এঙ্গেলস্‌ও বোধ হয় এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করেই বলেছিলেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহে বা মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর নেতৃত্বে অচেতন জনসাধারণের বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে এসেছে।

সে সম্ভাবনা বাস্তব হবে কিনা, গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সিদ্ধ হবে কিনা —সে কথা জোর করে বলা যায় না। বিলেতের শ্রমিক সরকারের এ ব্যাপারে দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। যদি রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধনতন্ত্রের অবসান করে সাম্রাজ্যবাদের অবসান তারা করে, ব্যক্তিসম্পত্তিকে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করে, মুনাফার বদলে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রন করে, তবে প্রমাণ হবে যে বিপ্লবের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তনের পথে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়! যেখানে লোকায়ত্ত সরকার, সেখানেই বিবর্ত্তন সম্ভবপর এবং তাই ভারতবর্ষেও আজ গণতান্ত্রিক পথেই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করাই আজ সত্যি-কারের রাজনীতি।

কবিতা

এশিয়া

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তাই কি ভালো ছিলনা—
তুমি যখন সমুদ্রকে চিনতে পারতে না নিজের থেকে আলাদা করে
সমুদ্রের শরীরের মতো মত্ততা অনুভব করতে যখন হৃদপিণ্ডে !
সমুদ্রের কতো ভয়ঙ্কর রাত্রি গায়ে মেখে নিয়েছ—
সোনার সূর্য্যের জলে বারবার চোখ মেলে তাকিয়েছ—
তারপর একদিন কোনো পীত উপকূল তোমার চোখে—
মৃদু জলের নদী— সবুজ ঘাসের দেশ—
পেছনে ফেলে এলে হয়ত কোনো পাহাড়ের রূঢ়তা—
পাথরের নীলাভ মরীচিকা—
কোনো কালো অরণ্যের রক্তাক্ত ইতিহাস হয়ত ফেলে এলে।

হয়ত ভালো ছিল তা-ও
যখন ছিলে তুমি সেই কালো অরণ্যের সন্তান—
সেই উদ্দাম উল্লসিত জীবন—
আর উজ্জ্বল রক্তাক্ত মৃত্যু !
সেই মৃত্যুমাখা জীবনের সৌরভ ফেলে
এলে আরো গভীর মৃত্যু-স্বপ্নে—
আরো নিবিড় জীবনের বাহুবন্ধনে !—
নেমে এলে সমুদ্র-জীবনে।
হয়ত কোনো মহাবন্যার স্মৃতি উন্মন করেছে তোমায়—
সমুদ্রের লোনা জল ডাক দিয়ে গেছে
তোমার পাহাড়ের গুহায়,

তোমার সোনা রক্তে এসেছে সে-ডাক !
পেয়েছ তাই পেশীতে তরঙ্গের তাণ্ডব।

ক্লান্ত সেই সমুদ্র কোন্ শান্ত উপকূলে
তুমি তা জানতেনা।
মুক্তার ফুল ফোটায় তার মৃদু নিশ্বাস
কোন্ পীত বালুবেলায় কি করে জানবে ?
নীল আকাশ যদি নিজেকে বিছিয়ে দেয় মাটির উপর
নদী বলে কি করে চিনবে তাকে ?
ইউফ্রেটিসের তীরে তীরে ঘাসের ফুল তুমি চেনো না
নিঝুম সবুজ প্রান্তর কি চিনতে তুমি
দুধ আর মধুর দেশ ?
তবু ভালো লাগল বুঝি সে অপরূপ উপকূল
চোখে নেশার ছোঁওয়া লাগ্‌ল।
যেন কোন পলাতকা স্মৃতি খুঁজে পেলো মন
হয়ত কোনো প্রভাতের প্রসন্নতা,
পাহাড়ের নিবিড় সূর্য্যাস্ত হয়ত বা,
সমুদ্রের মরকতনীল মধ্যাহ্ন হয়ত ফিরে এলো মনে।
ফিরিয়ে দিয়ে গেল সমুদ্র
মাটির সন্তান মাটিকে।
মাটির সন্তান।
তবু কি তুমি ভুলতে পেরেছিলে সমুদ্রের স্বাদ
ভুলতে পেরেছিলে পাহাড়ের স্পর্দ্ধা ?
তোমার মৃত্তিকা-মাতা
শস্পশ্যামা ইশতার কতটুকু মধু মেশাতে পেরেছিল তোমার রক্তে ?
গুঞ্জন কি ওঠেনি সেখানে কোনো মহাশিকারী বিলুনিপ্রুর নাম,
ক্ষণে ক্ষণে কি সফেন হয়ে উঠ্‌তে চায়নি সমুদ্রের মদ
তোমার শিরায় ?
ইউফ্রেটিসের স্থবির আলিঙ্গনে

কতটুকু স্বপ্ন আর
কতটুকু প্রাণের ঘ্রাণ পেতে পার, সমুদ্র নাবিক ?
প্রাণের উল্লোল উল্লাস
জীবনের অশান্ত উত্তাপ
সূর্য্যের পরমাণুর মতো হারাতে চেয়েছিল মহাকাশের শূণ্যতায়—
তারা চায়নি নীড়, চায়নি বিশ্রাম
শিনারের সমতট তারা চায়নি।

কিন্তু থামতে হ'ল।
থামতে হ'ল হঠাৎ কার ইশারায় ?
মৃত্তিকার ভ্রূণে সূর্য্যশিল্প কি তোমায় ডাক্‌ল ?
ঘাসের ঘ্রাণে, ফুলের ঘ্রাণে, ফলের ঘ্রাণে
সুরভিত হ'ল বুঝি রক্ত,
আর রক্তের সুরভি তাই পাঠাল সূর্য্যকে মানুষের প্রথম প্রণাম।
স্তম্ভিত সে উত্তাপের কি অপূর্ব্ব রূপায়ন :
তাইগ্রিসের তীরে তীরে মৃৎপুরীর মালা
চন্দ্রসূর্য্যের আকাশ সেখানে বন্দী !
উরের মন্দিরচত্বরে অরণ্যদেবতার লিপি রচনা—
বাবিলনের প্রাচীর-গাত্রে পাহাড়ের অভ্রভেদী স্বপ্ন—
আকাশ আর পৃথিবীকে আলিঙ্গনে জড়াল মানুষের প্রথম সৃষ্টি !
এশিয়ার ইতিহাস দেবতা চোখ মেলে তাকালেন।

সে-দিনগুলোও কি ভুলে গেলে—
নীহারিকা-থেকে-ছুটে-আসা সূর্য্যের জন্মদিন ?
তোমার রক্তের সমুদ্র-ক্ষুধায় উদ্বেল দিনগুলো
কোথায় আজ ?
তোমার রক্তে তার স্মৃতি নেই।
তাদের চিতাভস্ম খুঁজে পাবে ইতিহাস-দেবতার পাণ্ডুর ললাটে—
খুঁজে পাবে।
দেখ্‌তে পাবে
বাবিলনের জনবন্যা ইউফ্রেটিসের উৎসমুখে ছুটে গেছে—

সিরিয়া-আসেরিয়া-জেরুজালেমে তার পদধ্বনি শোনা যায় ।
বারবার সূর্য্যাগ্নি নেমে এসেছে নাবুচদনসরের মশালের আলোতে
শতশত নগরপ্রাকারের পিত্তল কবাট ভস্মশেষ সেই তীক্ষ্ণ তপ্ততায়,
তীরফলকে উল্কার তীব্রদ্যুতি জ্বলে উঠেছে এশিয়ার অন্ধকার আকাশে,
শবের পাহাড় ভেঙে বিজয়ী রাজার অভিযান চলেছে ।
মৃগয়ালুব্ধ বাবিলন, .
অসুর-য়ীহুদী মিদিয়-লিদিয়-ফ্রিজিয় মানুষের অজস্র মৃগয়া--
অজস্র রক্তধারায় স্ফীত তার শিরা-উপশিরা ।
'মানুষের পৃথিবী নির্ম্মাণে মানুষ চাই—'
হয়ত তা-ই ছিল তার আত্মার কামনা ঃ
'বিচিত্র রক্তের কারুকার্য্যে জীবন রচনা কর, এই মানুষ-তীর্থে,
জন্ম দাও সূর্য্যের মতো, পৃথিবীর মতো—
জীবনের জন্ম দাও !'

মানুষ-তীর্থ, জীবন-তীর্থ রচনা করছে এশিয়া
মিশরে মৃত্যুতীর্থ নয় ।
মেম্ফিসের মৃত্যুস্তব ছিলনা তোমার কণ্ঠে
হে সম্রাট, মনে পড়ে ?—
তোমার স্বর্ণভৃঙ্গারে ছিল সেদিন দ্রাক্ষাসুরা—
দেহভৃঙ্গারের তপ্ত সুরা ছিল জীবনের মহোৎসবে ।
মানুষের কণ্ঠে মানুষকে মাটিতে আমন্ত্রণ করেছ তুমি—
নিনেভের প্রাসাদ থেকে সে-আহ্বান দিকে-দিকে নিনাদিত :
সুসা থেকে জেরুজালেমে
কসব সাগর থেকে বাবিলনে গেছে সে-আমন্ত্রণ
সেনাচেরিবের রণভেরীতে ।
সুরলোকের স্বপ্ন ছিলনা শিশু এশিয়ার
অ-সুরের কণ্ঠ ছিল তার
তাই কণ্ঠে ছিল মানুষের জয়ধ্বনি !

অন্ধকার বনচ্ছায়ায়
মিতানির প্রাসাদ থেকে সিন্ধুতীরে

কোন্‌দিন আর্য্যরক্তের স্রোত বয়ে গেছে—
যাযাবর আর্য্যের দেবতারা চুপিচুপি কোন্ মন্ত্র কয়ে গেছে—
অসুরপুরী তা জান্‌তে চায়নি,
মিদিয়ার মাটিতে তার স্পন্দন বাজেনি—
শুধ্ সুসার আকাশে তার প্রতিধ্বনি ছিল শব্দময় হয়ে!
ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি,
বৃত্রঘ্নের বজ্র নয়—আদিনিনাদ,
সমুদ্র-কণ্ঠ!
সমুদ্রকণ্ঠে বাবিলনের ম্লান স্মৃতি হয়ত বা—
আর অহুরমজদায় অসুরসম্রাটের ঐশ্বর্য্য!
আর্য্যের অগ্নিদ্যুতি চলদিয়ার-আসেরিয়ার সূর্য্যকে ভুল্‌তে পারেনি,
ভুল্‌তে পারেনি মানুষের উজ্জ্বল আবির্ভাব—সম্রাটকে।

সমুদ্রের মতো, পাহাড়ের মতো, সূর্য্যের মতো মানুষকে নির্ম্মাণ করেছিল এশিয়া—
নিজেকে তাই এতো বিশাল করে পেয়েছিলে তুমি!
তাই আর্য্যের স্বর্গমমতা মাটির কামনায় হারাল,
এশিয়ার মাটিতে পুনর্জ্জন্ম হ'ল তার।
দেখ্‌তে কি পাওনি যদু আর তুর্ব্বষের সৌরাষ্ট্রবিজয়—
সিন্ধুর মোহনায় নূতন বাবিলন?
স্মৃতির ধূসর পাতা খুলে দাও,
জরথুস্ট্রের মন্ত্রধ্বনি আর শুনবে না—
ইরানী আর্য্য কুরুষের দুন্দুভি আরাবে মিদিয়ার প্রান্তর উচ্চকিত!
দেখ্‌বে সেখানে ছায়ার বিচরণ—
থ্রেসে-মিশরে সম্রাট কম্বুষের বিভীষিকা—
পৃথিবীজয়ের স্বপ্নে অজাতশত্রু বিনিদ্র,
দেখ্‌বে মাকিদনকে শতদ্রুতীরে।
তবু এ অভিযান আর্য্যের নয়,
এশিয়ার এ-অভিযান,
সম্রাটের স্বপ্ন এশিয়ার!

তবু কতোদিন আর বন্দী থাকবে তুমি সম্রাটের সিংহাসনে?
রত্নাভরণে মুগ্ধ হয়নি
অসিঞ্জনায় লুব্ধ হয়নি আর তোমার মনের আকাশ।

আকাশের মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে যেতে চেয়েছে সে—
কুড়িয়ে নিতে চেয়েছে কোনো স্নিগ্ধ শ্বেতস্বপ্ন—জ্যোৎস্নার মতো।
বৈদূর্য্যের দ্যুতি নয় আর—ম্লান আভা—শীতল শুভ্রতা।
শুভ্রতর জীবন-রচনা ছিল তোমার মনে
পূর্ণতর মানুষ রচনা,
স্বর্ণমুকুট ধূলায় লুটাল তাই
নেমে এলে লুম্বিনীর বনতলে।
মহাচীনের নগরপঙ্ক একদিন ফুলের মতো সুরভিত হ'ল।
গলগোথার প্রান্তরে কাঁটার মুকুট পরে দাঁড়ালে।
সুঙ্গ আর্য্যের যজ্ঞধূম তোমার আকাশে ব্যর্থ—
ব্যর্থ হয়েছে রোমক আর্য্যের রক্তক্ষরা মত্ততা—
তোমার জীবন বিশ্বময়।
তবু একবার তোমার প্রাচীন মাটি কেঁপে উঠেছে
জেরুজালেমের মাটির কান্নায়—
চঞ্চল হয়েছে মধ্য এশিয়ার তৃণাঞ্চল
তপ্ত হয়েছে আরবের মরুবালুকা।
তাই আবার সমুদ্রগর্জ্জন আত্তিলার হূণবন্যায়,
সারাসেনের বালুর ঝড়ে শতচ্ছিন্ন রোমক পতাকা!

নিজেকে ছড়িয়ে দাও তুমি
জড়িয়ে ধরো নক্ষত্রের আলো
শিকার করো নীহারিকা
তবু মাটি তোমার।
তুমি ভুলে যেতে পারো মাটিকে
তবু মাটি তার প্রাচীন সন্তানকে ভুলবেনা।
মনের উপর ছড়িয়ে যাক আকাশ
যেমন সমুদ্র ছড়িয়ে গেছে তোমার ধমনীতে,
তবু মনে রেখো, মাটি আছে—
এশিয়ার প্রাচীন মাটি—
যে তোমায় সমুদ্রের মতো, পাহাড়ের মতো, সূর্য্যের মতে নির্ম্মাণ করেছিল—
যে তোমায় আকাশের মতো নির্ম্মাণ করবে।

লেনিন-আমল থেকে স্টালিন-আমল

ভিক্টর সার্জ

বিপ্লবে নেতার আবির্ভাব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আপনা থেকেই রুশবিপ্লব ঘটে গেল—মনে হয় গোড়ার দিকে তাকে চালিয়ে নেবার মতো কেউ ছিলনা। এ থেকে আমরা একটা মস্ত শিক্ষা পাই : এ ধরণের ঘটনা জবরদস্তিতে এগিয়ে আনা বা তৈরী করে তোলা যায় না। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকবার কথা অন্ধ ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারেনা। তবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনের সত্যিকারের লক্ষণগুলো বিচার করে যাঁরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন, তাঁরা তার কাছ থেকে প্রচুর ফসল আহরণ করে নিতে পারেন। অনমনীয় ঘটনাস্রোতের সঙ্গে যিনি নিজেকে যত বেশি মিশ খাইয়ে চলতে পারবেন—ঘটনাগুলোর অন্তর্গত নিয়ম সম্বন্ধে যত বেশি সচেতন থাকবেন—তিনিই তত বেশি সুফল লাভের আশা করতে পারেন। শুধু তেমন মানুষই বিপ্লবী হতে পারেন—আগে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে শান্তিবাদী গ্রন্থকীট হিসেবে দিনযাপন করলেও কিছু যায় আসেনা। যখন লগ্ন উপস্থিত হয় তখন তাঁরা গ্রন্থাগার ছেড়ে বেরিয়ে এসে ব্যারিকেডে ইঁট চড়াতে সুরু করে দেন—বিপ্লবীদল উপদেষ্টার সাহায্য লাভ করে।

লেনিন রাশিয়ায় এসে উপস্থিত হবার আগে বিপ্লব শুধু পাঁয়তারাই কষছিল।

১৯১৭ সন ছিল বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ বৎসর। য়ুরোপের সমস্ত বড় বড় দেশগুলোর শক্তসমর্থ ব্যক্তিমাত্রই একটি হাজার দিন সৈন্যের পোষাক পরিহিত রয়েছে। একটি মহাদেশের শ্রেষ্ঠ যুবশক্তি—যুবকের একটা সমগ্র পুরুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনকোটি লোক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। কামানের যুগ তখন। উত্তর সাগর থেকে আড্রিয়াতিক—বালতিক থেকে ভূমধ্যসাগর সমস্ত য়ুরোপে যুদ্ধের ব্যূহরচিত। রক্তসিক্ত সীমান্তে রোজ হাজার হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করছে। পরিখা, মাইন, ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, গ্যাস, সাবমেরিন, আর বিষাক্ত মিথ্যা মার্কা যুদ্ধ ছিল ওটা। সম্মুখরণে সৈন্যেরা

শত্রুর কাঁটাতারের খর্পরে বা নিজেদের মতোই গোলন্দাজ সৈন্যের হাতে মারা পড়ত—সৈন্যব্যূহের পেছনে মানুষ নিজেদের রক্তেরই ব্যবসা চালাত আর জঙ্গী প্রচারপত্রের ক্লান্তিতে ডুবে থাকত।

ফরাসীতে ১৯১৭ ছিল ক্লেমেঁসুবাদ, সৈন্যাধ্যক্ষ নিভেলি আর ১৬ই এপ্রিলের আক্রমণের বছর। ফ্লাণ্ডার্স আর ভাঁর্দুঁর ব্যর্থ যুদ্ধ—ক্যাম্‌ব্রেই-এ ট্যাঙ্ক যুদ্ধের বছর। মৃতের স্তূপ জড় হয়ে উঠল সার্ব্বিয়া, উত্তর ফরাসী, বেলজিয়ম আর পোল্যাণ্ডে। ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেনী উদ্দাম সাবমেরিন যুদ্ধ চালাল। বানিজ্যজাহাজে টর্পেডো চলল, নিরপেক্ষরাও ডুবতে লাগল। সমুদ্রে মৃত্যুর বিচরণ সুরু হল।

মেসিডোনিয়া, মেসাপোটামিয়া, প্যালেষ্টাইন, আফ্রিকার দূর সীমান্তেও যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিল। কালো চামড়া মানুষের দল, ভারতীয়রা, অষ্ট্রেলিয়াবাসী, কানাডাবাসী, পর্ত্তুগীজ সবাই অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত—সমস্ত জাতির রক্ত একই ধারায় একই পরিখায় প্রবাহিত হল। যুধ্যমান জাতির অবশিষ্ট স্বর্ণসম্পদ দোহন করে নিয়ে গেল আমেরিকা।

কেন্দ্রীয় শক্তি ইতালী-সীমান্তে কেপোরেত্তোর মুখে ভাঙন ধরাল। পিয়াভের দিকে এগিয়ে এলো জার্ম্মান আর অষ্ট্রিয়ানরা। লণ্ডনের উপর জেপেলিনের উদয়। ষ্টাট্‌গার্টের উপর ফরাসী বিমান। উভয়পক্ষের শত্রুবিমান ভূপতিত। রণশিক্ষার আর পদকপারিতোষিক বিতরণের হাট বসে গেল।

সৈন্যশিবিরের পেছনে উভয়পক্ষের কামান-বারুদ নির্ম্মাতারা মুনফায় ফেঁপে উঠল। যুদ্ধের আইন আর কণ্ঠনিরোধের পালা। মেয়েরা আর বুড়োরা অশ্রুসজল। অসহ্য দারিদ্র্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, রুটির কার্ড, কয়লার কার্ড—সমগ্র মানবতা ঘৃণার আর অজ্ঞতার দ্বারে ভিখারী। গ্রেটবৃটেনের বিবেকবান প্রতিবাদকারীরা উৎপীড়িত—ফরাসীতে পরাজিত মনোভাবের ঠাঁই নেই—আন্তর্জাতিকতার প্রশ্রয় নেই কোথাও। কেন্দ্রীয় শক্তি এবং মিত্রশক্তির কবলিত সর্ব্বত্র—গীর্জ্জায়, রাষ্ট্রচিন্তায়, মণীষায় শুধু যুদ্ধের প্রচার। যুদ্ধকালীন সমাজতান্ত্রিকতা সবজায়গায়ই প্রতিষ্ঠিত হল। বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিদ্যা মানুষের জীবন্তশক্তির উৎসাদনে নিয়োজিত হল—সভ্যতার দানকে উৎখাত করতে এগিয়ে গেল। বোমাবারুদ তৈরীতে যে সম্পদ অপচয় হল তা যদি সদ্বিচারে ব্যবহৃত হত তাহলে রামরাজ্যের ভাষায় বলা যেতে পারে যে তা দিয়ে একটি নূতন সমাজে সমগ্র মানুষের সুখসুবিধাবিধান করা সম্ভব ছিল।

যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষের আবির্ভাব হল মূলধনী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পৃথিবী বণ্টন করে দেবার জন্যে।

(লেনিন—ভিক্টর সার্জ প্রণীত)

হঠাৎ সেই দুর্বৎসরে একটি সাম্রাজ্যের পতনশব্দ কামানের আওয়াজ স্তব্ধ করে দিল। রুশীয় জনসাধারণ সবার জন্যে শান্তি দাবী করল—চাষীর জন্যে চাইল জমি আর শ্রমিকের জন্যে কারখানা। যুদ্ধের দৌলতে রুশীয়দের হাতে অস্ত্র ছিল। তা সত্ত্বেও মৃতের সংখ্যা তাদেরই ছিল বেশি। তাছাড়া ছিল সর্ব্বাধিক উৎপীড়ন আর দুর্দ্দশা। এ মানুষ সব কিছুই

করতে পারে। তাদের ইচ্ছাশক্তি কি ততটুকু স্পর্দ্ধার প্রয়োজন অনুভব করবে? শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে কি তারা?

১৯১৭-র ৩রা এপ্রিল লেনিন এসে পোট্রোগ্রাডের ফিনল্যাণ্ড ষ্টেশনে নামলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন গ্রীগরি জিনোভিয়েভ আর অন্যান্য সব। তখন তিনি প্রায় অজ্ঞাতনামা—এন, লেনিন, ভি আই উলিয়ান্‌ভ। বয়েস তাঁর তখন সাতচল্লিশ—ত্রিশ বছরের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। যৌবনে একবার জীবনের উপর ফাঁসীকাঠের ছায়া এসে পড়েছিল; জার তৃতীয় আলেকজেণ্ডারের ঘাতক তাঁর দাদার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরিয়েছে। তেইশ বছর বয়েসে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে একটি রুশীয় মার্ক্সবাদী দল সংগঠন করেন। সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসনে তাঁর বহু বছর কেটে গেছে। ১৯১৩-তে রুশশ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের কাছে তিনি একজন আপোষহীন মতপ্রচারক হিসেবে পরিচিত হন (ইস্‌ক্রা বা স্ফুলিঙ্গ পত্রিকার প্রবর্ত্তন করে' এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিতে ভাঙন ধরে' বিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিক দল এবং সুবিধান্বেষী সংখ্যালঘিষ্ঠ মেনশেভিক দলে বিভক্ত হওয়ায়)। লণ্ডনে, পারীতে, সুইজারল্যাণ্ডে, ফিনল্যাণ্ডে এবং ক্র্যাকাউ-এ অবস্থান-কালে দলের বাইরে তিনি অপরিচিত ছিলেন। যে কাজে গর্ব্ব অনুভব করা যায় অক্লান্তভাবে সে-কাজই তখন করে গেছেন: শ্রমসর্ব্বস্বদের মতবাদপ্রচারক এবং সংগঠকের কাজ—এক কথায় বিপ্লবীর কাজ। সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিক তাঁর দলকে 'উন্মত্ত' আখ্যা দিয়ে খুসী ছিলেন—কিন্তু যাঁদের তিনি গড়ে তুল্‌লেন তাঁর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল অসীম। ১৯০৫-এর বিপ্লবে তিনি তাঁর দলকে প্রাজ্ঞোচিত নির্দ্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রিক অর্থনীতি এবং জড়বাদী দর্শনের উপর তাঁর রচনাগুলোর দরুণ রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলোতে তাঁকে নিয়ে খুবই আলাপ আলোচনা হত। আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসগুলোর দলিলপত্রে তাঁর উপস্থিতি কোনোদিন তাঁদের নজরে আসেনি। ১৯০৭-এ ষ্টাট্‌গার্টে লেনিন রোজা লুক্সেমবার্গকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু তাঁর দিকে তখন কেউ তাকায়নি—হার্ভের উজ্জ্বলতাই তখন ছিল প্রখর। কিন্তু ১৯১৪-র আগষ্টে—সেই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতার দিনে—সমাজতন্ত্রের, নৈরাজ্য-তন্ত্রের, সিণ্ডিক্যালিজমের বড় বড় চাঁইরা যখন অকস্মাৎ যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠ্‌লেন একমাত্র লেনিনই তখন নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রলাপী দেশাত্মবোধের দাসত্বে শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যেতে বসেছে আর তাই তিনি ধীরে ধীরে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের ভিত্তি রচনা সুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯১৫-তে জিমারওয়াল্ডে ধীরস্থির কণ্ঠে বিপ্লবের কথা উচ্চারণ করলেন—শুনে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। যুদ্ধের চতুর্থ বছরে সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লেনিন তাঁর জুরিকের বাসস্থান ত্যাগ করলেন। কয়েকমাস পরেই তিনি 'পৃথিবীর

সবচেয়ে ঘৃণ্য আর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র' হয়ে উঠ্‌লেন। অবিচলিত ধীশক্তিতে ও দৃঢ়তায় তিনি এযুগের প্রথম সমাজ-বিপ্লব পরিচালনা করলেন।

সভ্যতার গোধূলিতে শ্রমসর্ব্বস্বদের কাছে বাঁচবার একটি নূতন যুক্তি এনে উপস্থিত করলেন : জয় করো।

তিনি বললেন : "এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধনী দলশাসিত বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীকে নূতন পর্য্যায়ে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবে।"

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অন্তর্যুদ্ধে পরিবর্ত্তিত করো।"

"নূতন সমাজতন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিক তৈরী করো—যা রূপ নেবে বিপ্লবী আন্তর্জ্জাতিক হিসেবে।"

সম্ভাবনার সীমারেখা তিনি স্পষ্টতই দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সেই সীমান্তে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। তিনি রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র ঘোষণা করেন নি, চাষীদের সুবিধার জন্যে জমিদারী উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন—চেয়েছিলেন উৎপাদনে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমজীবীর গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব—এবং তার কেন্দ্রশক্তি থাকবে শ্রমিক শ্রেণী।

ট্রেন থেকে নেমেই দলের সহযোগীদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "তোমরা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলেনা কেন?"

অবিলম্বে তাঁর 'এপ্রিল থিসিস্' লেখা হয়ে গেল—ক্ষমতা অধিকারের কর্ম্মসূচী। উন্মাদের প্রলাপ বলে তা আখ্যাত হল। জারের জনৈক প্রিয়পাত্রের প্রাসাদে একটি সুন্দর টেবিলের পাশে বসে তিনি একটু হাসলেন, তারপর আবার লিখতে সুরু করলেন। অভিজ্ঞ অস্ত্রজীবীরা তাঁকে ভৎর্সনা করলেন—'প্রাভদা' তাঁর মত প্রকাশ করতে রাজি হলনা। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার লোক, কারখানার মজুর আর শিবিরের সৈন্যরা যে ধ্বনি শুনতে পায় তিনিও ঠিক সেই ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এ সব লোক যা বলতে চায় অথচ বলার ভাষা নেই—লেনিনের তাই বলবার ক্ষমতা ছিল আর তাঁর প্রতিভার পরিচয়ও সেখানেই। এ-ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদ বা বিপ্লবী অর্জ্জন করতে পারেন নি।

তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি অনায়াসে দলের বেশির ভাগ লোককে নিজের মতাবলম্বী করে তুললেন। সংস্কারবাদীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বা নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম করবার কোনো প্রশ্নই আর তখন ছিলনা।

"আমরা অধিকতর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শ্রমসর্ব্বস্বের ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র চাই। তাতে পুলিশ আর স্থায়ী সৈন্য থাকবেনা—জনসাধারণকে সশস্ত্র করে তোলা হবে।"…(লেনিনের বক্তৃতা—এপ্রিল, ১৯১৭)।

জনসাধারণের ইচ্ছাধীন শাসনতন্ত্রই দলীয় সমর্থন লাভ করেছে--সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোনয়নে এবং অপসারণে জনসাধারণেরই হাত থাকবে। আইনের ও বিচারের যুক্ত ক্ষমতা শ্রমিক সৈন্যের ডেপুটিদের পরিষদের (সোভিয়েট) হাতে ন্যস্ত হবে। "সমগ্র জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ক্ষমতা" দেওয়া হবে। "ব্যাঙ্ক ও সম্মিলিত বানিজ্যিক ও শৈল্পিক প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ" এবং সোভিয়েটে সংগঠিত কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টনই ছিল দলের অভিপ্রায়। ব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠা চাই—পুঁজিবাদীর বিরোধিতায় শ্রমিকদের জন্যেই শান্তি চাই।

কর্ম্মসূচীতে এমন কিছু ছিলনা যা কার্য্যে পরিণত করা যায় না। বরং এসময়ে তা কার্য্যে পরিণত না করলেই বিপদের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কর্ম্মসূচীর নিশ্চিত সাফল্যের জন্যে শক্তি আর সাহসের প্রয়োজন---প্রয়োজন তত্ত্বস্রোতে গা ভাসিয়ে না থাকা, শক্তিশালী স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করা। যুদ্ধের কল্যাণে অনেকে জীবিকার সন্ধান পেয়েছিল—তাছাড়া রাশিয়া ছিল মিত্রশক্তির সঙ্গে আশ্লিষ্ট। সম্পন্ন শ্রেণী সর্ব্বস্ব হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করবে। দুর্ব্বল হলেও প্রাণপণে বাধা দিতে তারা কসুর করবেনা। তাদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করতেই হবে। বিপ্লবের সময় বিপ্লবী হওয়াই ছিল লেনিনের গুণ।

(ক্রমশঃ)

জানালা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিনাশ বাবুতো খুশিই, সুরমারো নিতান্ত অপছন্দ নয়, কিন্তু দেখেশুনে একেবারে দমে গেল অনুপমা। উল্টোডিঙ্গির তুলনায় অবিশ্যি ভালোই, সেখানে ঘরখানা যে শুধু ছোট ছিল তা নয়, রান্নাবাড়াও করতে হত সেই ঘরেই এক কোণে। কিন্তু এখানে রান্নাবাড়ারো আলাদা জায়গা আছে, বারান্দার একধারে—দর্মাঘেরা। ভাড়াটের সংখ্যা ওপরে নিচে মিলিয়ে যেমন আট ঘর, জলের বন্দোবস্তও তেমন ভালো—কলের বদলে টিউবয়েল। উঠোন হিসেবেও রয়েছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—উল্টোডিঙ্গির বাড়িওয়ালার মত ওখানে কয়েকটা টিনের শেড তুলে নতুন ভাড়াটে বসাবার ইচ্ছে বটকেষ্টবাবুর নেই বলেই জানিয়েছেন। সবই তো মনের মত, কিন্তু—

'ঘর পছন্দ হল তো মা।' ঠেলাগাড়ি থেকে মোটঘাট নামানোর ফাঁকে এক সময় প্রশ্ন করেন অবিনাশবাবু। অনু ঘাড় নেড়ে জানায়, পছন্দ হয়েছে। কিন্তু, মনেমনে ভয়ানক আফশোষ জাগে তার, কিন্তু এমন একটা জানালা কই এঘরে যার ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে এক টুকরো আকাশ, আর একফালি রাজপথ? আকাশে যখন এরোপ্লেনের ঘর্ঘর বেজে উঠবে, আর সংগে সংগে আকুলিবিকুলি করে উঠবে তার মন, অথবা সহসা বহুকণ্ঠের জয়ধ্বনি শুনে পাদুটি যখন তার অতি মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠবে—তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে? বাবা যখন বেরুবেন আপিশে, আর মা ঘুমোবেন পড়ে পড়ে, অপু থাকবে ইশকুলে—তখন, কি করে সময় কাটবে অনুপমার যদি না ঘরে এমন একটি জানালা থাকে যার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাজপথের অবিরাম যানবাহন আর পথচারীর মিছিল? কি দিয়ে দুপুরের নিঃসীম নিঃসংগতা ভরবে সে? মাঝরাতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে থেকে মধ্যরাত্রির হাওয়ার ছোঁয়া চোখে মুখে না নিলে নতুন করে কি ঘুমের ঢল আবার নামবে তার চোখে?

অবিশ্যি, জানালা যে নেই তা নয়, একটার গা ঘেঁষেই অপরিচিত তেতলা বাড়িটা খাড়া উঠে গেছে। আরেকটি তো বারান্দার দিকে, থাকা-না-থাকা সমান।

নতুন বাড়ীতে আসার নামে যে আবিষ্কারের আমেজটা অনুর মনে চাপ বেঁধে উঠেছিল, সেটা যে এখন শুধু গুঁড়িয়েই গেল তা নয়, উল্টোডিঙ্গির বাড়িটার জন্য মনটা তার বড্ড বেশী খাঁ খাঁ করতে লাগল।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস্ কেনরে? ঘর বুঝি পছন্দ হয়নি?' ঝোড়াটা নামিয়ে রেখে হাতের তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছে নিলেন অবিনাশবাবু। বললেন, 'আর পছন্দ! এই যে জুটল ভাগ্যি। নেহাৎ বটকেষ্টবাবু দয়া করলেন বলেই—দে তো মা পকেট থেকে দেড়টা টাকা বার করে।' টাকা নিয়েই হনহনিয়ে পুনরায় অবিনাশবাবু বেড়িয়ে গেলেন।

নির্বোধ নয় অনু, তার বাবার মত একশ পাঁচ টাকা মাইনের কেরাণির পক্ষে এর চেয়ে ভালো বাড়ী যে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সে তা জানে। দু'বছর কলকাতায় এসেই হালচাল বুঝে নিয়েছে সে কলকাতার।

মাষ্টারদা যাই বলুন, মানুষ থাকে নাকি এখানে! মাগো! কী দুঃখে যে সব কলকাতায় মরতে আসে! আঁতুর হেঁসেলের বাছবিচার নেই, গুরুজন লঘুজনের বিবেচনা নেই—একখানা-কি-দুখানা ঘরেই সব! চাটুয্যেদের কথা মনে পড়ে যায় অনুর, বউকে নিয়ে আলাদা ঘরে শুতে পেতনা বলে ছোটজামাই শ্বশুরবাড়িই আসতনা! চাটুয্যে-গিন্নির দুঃখে অনুর মনও সায় দিয়েছিল, আবার চপলাদির কথারো সে জবাব খুঁজে পায়নি—সত্যিতো, ঘরের মধ্যিখানে পর্দা টাঙিয়ে নতুন বরকে নিয়ে যায় নাকি শোয়া—তা হোক না সে ঘর যতোই বড়। ভাবলেও অনুর গা'টা শিরশির করে ওঠে।

অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকলেন। একটা তোরংগের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে হাত দিয়ে শরীরে হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মা কোথায় রে ?''

'কথা কইছে কার সংগে যেন।'

'দেখিস, বেশী মাখামাখি কিন্তু ভাল নয়', স্বর নামিয়ে আনলেন অবিনাশবাবু, 'এখানে শুঁচিবাইটা একটু কম করে—লক্ষ্য রাখিস, বুঝলি না ? অপু কই ?'

'কাদের সংগে যেন—'

'উঁহু', গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে পুনশ্চ প্রতিবাদ জানালেন অবিনাশবাবু, 'ওটাকেও এবার থেকে শাসনে রাখতে হবে।'

'এ বাড়ির ভাড়া কি বেশী বাবা ?' অচমকা অনু জিজ্ঞেস করল।

'আস্তে, আস্তে', অবিনাশবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা হানলেন, 'ভাড়া আজকাল কোথায় কম, আর বিনা সেলামীতেই বা ঘরভাড়া দেয় কে·বল—তবে বটকেষ্টবাবু নেহাৎ—'

সময় বুঝেই যেন বটকেষ্টবাবু ঘরে ঢুকলেন। কথা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে অভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবিনাশবাবু। 'আরে, আসুন আসুন—একেবারে নাম করতে করতেই—কোথায় যে বসতে দি। দেত মা অনু—।' উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু।

'আহ্হা, ব্যস্ত হবেন না অবিনাশদা।' তাঁর পরিত্যক্ত তোরংগটার ওপর একটি পা তুলে দিয়ে বটকেষ্টবাবু বললেন, 'সব গুছিয়ে—টুছিয়ে নিন না, তখন দেখবেন, বসলে আর উঠতে চাইব না—তাড়াবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।' সশব্দে একপ্রস্ত হেসে নিলেন তিনি। প্রাণ খুলে হাসলে তাঁর মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, মার্বেলের মত চোখজোড়া গুটি পাকিয়ে আসে, অবিশ্বাস্য রকম চ্যাপ্টা দেখায় নাসিকাগ্র। মোড়াটা এগিয়ে দিচ্ছিল অনু, বটকেষ্টবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই হাতটা তার থেমে গেল আপনা থেকেই।

'এটিই বুঝি আপনার কন্যা ? বাঃ, কি নাম তোমার ?—অনু। অনুরূপা ? বাঃ !'

'না, অনুপমা।'

'অনুপমা ! বাঃ, বেশ।' পরম পরিতোষ সহকারে বটকেষ্টবাবু মাথা দোলালেন—ঢাকা-পড়া মাড়ি আবার বেরিয়ে পড়ল। ইচ্ছে করেও সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না অনু।

'মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তো অবিনাশদা ?'

'লেখাপড়া !' স্বগত পুনরুক্তি করলেন অবিনাশবাবু, 'তা, হ্যাঁ, ঘরে বসে শিখিয়েছি বটে কিছু, একটা মাষ্টারও রেখে দিয়েছিলুম'—কি মনে পড়ে যেতে সহসা কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, 'তা, তেমন কিছু নয়। ওর অবিশ্যি ইচ্ছে·ছিল, ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ে, কিন্তু ওর গর্ভধারিণী—'

অবিনাশবাবুর কথা লুফে নিলেন বটকেষ্টবাবু, 'যাই বলুন, মেয়েমানুষ হলে কি হবে বুদ্ধি আছে বৌদির।' চোখে মুখে গভীর হতাশার ভাব এনে তিনি বললেন, 'লেখাপড়া শেখাটা অবিশ্যি মন্দ নয়, কিন্তু যা সব দেখছি আজকাল, তাতে করে—' ঠোঁট উল্টে দিলেন বটকেষ্টবাবু, 'তবে সেলাই-ফোঁড়াই—।'

'সেদিকে একস্‌পার্ট।' অবিনাশবাবু গদগদ হয়ে ওঠেন, 'গাঁয়ের ইশকুলের মাষ্টারনিটা যা প্রশংসা করতো—কি সেন যেন তাঁর নাম ছিলরে অনু?'

বাবার কথার উত্তর দিল না অনু, জানালার কিনার ঘেঁসে দাঁড়াল সে, দৃষ্টি তার আকাশ-সন্ধানী।

বাড়িওয়ালা লোকটিকে দেখে কেন যে মন তার অপরিসীম বিতৃষ্ণায় ভরে গেল! হয়ত আসলে লোক তিনি মন্দ নন, কিন্তু হাসেন কেন অমন করে মাড়ি বের করে? হাসলে অবিশ্যি মাষ্টারদারো মাড়ি বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু তাঁর লেখাপড়া ছাড়ান দেয়ার কথায় কি অমন উৎসাহিত হয়ে উঠতেন মাষ্টারদা? মাষ্টারদাকে বাড়ি থেকে অপমান করে বের করে দিয়েছিলেন বাবা, কিন্তু এর কথায় তিনিই বা অমন করে গলে গেলেন কেন?

জানালার শিক ধরে উপরের দিকে অনু তাকিয়ে রইল। সূর্যটা কোথায়? অপরাহ্নের এক ঝলক আলো এসে পড়েছে তেতালা বাড়ির কার্নিশে। কোনদিক পূব আর কোনদিক পশ্চিম—দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করল অনু। বাবা আর বটকেষ্টবাবুর বাক্যালাপের অবিরাম ঘড়ঘড়ানি কানের মধ্যে যেন অস্বস্তি ঢেলে দিচ্ছে তার, ঘর থেকে এই মুহূর্তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে পারলে সে বাঁচে। ইস্, অনুর মন কেঁদে উঠল হু হু করে, একটা জানালা যদি পেত সে এই মুহূর্তে—যে জানালা দিয়ে দেখা যাবে এক টুকরো আকাশ আর একফালি রাস্তা!

অথচ, ভাবতে গেলে অনুর নিজেরি অবাক লাগে, কলকাতায় আসার আগে প্রথম প্রথম কী ভয়ই না পেয়েছিল সে। হাজার হাজার লোকের ঘেঁষাঘেঁষি, অথচ কেউ কাউকে চেনে না, নাম জানে না—সুখে দুঃখে খবর পর্যন্ত নেয় না কেউ কারো। এক তলায় লোক মরেছে, দোতালায় বিয়ে সুরু হল—এ রকম ব্যাপারো নাকি হামেশা হয়। এত লোকের ভিড়—দেখে শুনে ভ্যাবাচ্যাকা লাগত অনুর, ভয় হত।

'জানালাটা বন্ধ করে রেখেছ কেন?'

প্রথমটায় মাষ্টারদার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি সে।

'খুলে দাও।'

'থাক না।'

'থাক না! কেন?'

'ভয় করে।'

'ভয়!' মাষ্টারদার মত গম্ভীর মানুষও হেসে উঠেছিলেন, 'রাস্তার দিকে তাকাতে ভয় কিসের?'

ভয় করেনা মানুষের—সব সময় পাগলের মত ছোটাছুটি করছে ট্রামবাস-গাড়ি-ঘোড়া, পায়ে হেঁটে চলেছে নানান জাতের নানান রকমের মানুষের দল—দেখেশুনে, ভয় না লাগুক, কেমন একটা নাম-না-জানা আতঙ্কে শিরশির করে ওঠেনা মেয়েমানুষের বুকের ভেতরটা? ধরো, হঠাৎ যদি ও-ই ওর মাঝখানে কোনগতিকে ছিটকে গিয়ে পড়ে, তারপর? সেদিন সেই দৈত্যের মত দোতালা বাসটার তলায় দলা-পাকিয়ে-যাওয়া বউটাকে দেখে ফেলেছিল সে, সে কথা মনে হলেই যে আপনা থেকে হাত দুটো তার ধাক্কা দিয়ে ভেজিয়ে দেয় জানালার পাট দুটো।

মাষ্টারদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। মুখখানি তাঁর এখনো মনে পড়ে অনুপমার। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'অনু, যে-বাস সেদিন মানুষ চাপা দিয়েছিল, মানুষই কিন্তু সে-বাস বানিয়েছে। আশ্চর্য, না?'

মাষ্টারদার কথার মানে বুঝতে পারেনি অনু। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল সুধু মাষ্টারদার চোখের ভীষণ মোটা কাচের চশমার দিকে—তাকিয়ে তাকিয়ে তার নিজের চোখেই ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল।

'অনু!' মা ডাকলেন বারান্দা থেকে।

'যাই।' ঘর ঝাঁট দেয়া ফেলে রেখে উঠে এল অনু। 'কি?'

'অপুটা গেল কোথায় বলত? ও ছেলেকে নিয়ে—।'

'যাবে আর কোথায়। দেখ গিয়ে গলিতে ক্রিকেট বল খেলছে।'

'খেলাচ্ছি ক্রিকেট-বল', ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন সুরমা, 'আসুন আজ উনি বাড়ি।' কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'কাকে এখন পাঠাই বলত চা দিয়ে—ভদ্রলোক মুখ ফুটে বলে গেলেন—।'

'কে, বাড়িওয়ালা?'

'চুপ চুপ, বাড়িওলা বলিসনি—ভদ্রলোক শুনলে দুঃখু পাবেন।'

'তবে কি বলতে হবে—জমিদার সাহেব?'

'আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস বাপু তুই', সুরমা সস্নেহ ধমক দিলেন মেয়েকে, 'কেন, কাকাবাবু বলতে পারিসনে? তোর বাবাকে উনি দাদা বলেন—।'

'বলেন তো বলেন!' ঠোঁট ওল্টালো অনু, 'কাকাটাকা আমি বলতে পারব না—ইঃ, মাগো, কি বিতিকিচ্ছিরি মাড়ি ভদ্রলোকের!' মুখ বিকৃত করে সারা শরীরে কাঁপুনি দিয়ে নিল অনু। হাসি চেপে ধমক দিলেন সুরমা।

'থাম। কত টাকা জানিস ভদ্রলোকের?'

'কত?'

'তা কে জানে কত। আগে ওঁর অপিসে নাকি চাকরী করতেন। তারপর সাহেবের সাথে ঝগড়া করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের সময় ব্যবসা—'

'ব্যবসা!' অনুর মনে হল ঠিকই ধরেছে সে, ব্যবসা না করলে মানুষের চোখ এমন ক্ষুদে-ক্ষুদে গোলগোল আর মুখের মাড়ি এমন বের-করা হয় না। রাজপুরের ছিদাম মুদির মুখখানাও ছিল অবিকল এই রকম, সুদখোর হারাণ সা'র মুখেও সব সময় হাসি লেগে থাকত, আর হাসতে গেলেই তার মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। 'কিসের ব্যবসা মা?'

'অতশত জানিনে বাপু। তবে হ্যাঁ—' এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বর নামিয়ে আনেন সুরমা, তারপর কি ভেবে চেপে গেলেন কথাটা। হাজার হলেও অনু ছেলেমানুষই বলতে গেলে, ওকে এসব কথা না বলাই ভালো।

'তুই-ই যা মা, চা'টা দিয়ে আয়। ও ছেলে বাড়ি ঢুকুক আগে তারপর ওর একদিন কি আমার একদিন।'

'আমি পারব না।'

'এ্যাই দেখ', উঁচিয়ে উঠলেন সুরমা, 'লজ্জা কি এতে? তোর না কাকাবাবু হন।'

শেষের কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন তিনি। না, মেয়ে তাঁর তেমন নয়। নইলে সেই মাষ্টার ছোঁড়াটাতো একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বার করে, কই, হয়েছে কিছু ক্ষতি?

'যা মা, তাড়াতাড়ি দিয়ে আয়, নইলে আবার কি ভাববেন।'

'তার থেকে, অপুকে ডেকে দিইনা।'

'নানা, তুই আর দরজার দিকে যাসনি—কে আবার কি ফুট কেটে বসবে, দরকার কি ওসবে।'

'বাড়িওলাকে চা দিয়ে এলে বুঝি কেউ আর কিছু বলবে না?' হাসল অনুপমা, 'কাকাবাবু হ'ল কিনা!' মার চোখে চোখ রেখে বলল সে।

মুহূর্তে সর্বশরীর রাগে রীরী করে উঠল সুরমার। অন্যায় তর্ক তিনি একেই সইতে পারেন না—তাছাড়া তাঁর পেটের সন্তান পর্যন্ত মুখে মুখে কথা কাটবে? মেয়ের ভালমন্দ কি মেয়ে বেশী বোঝে তাঁর চেয়ে? তিনি ওর পেটে জন্মেছেন, না ও জন্মেছে তাঁর পেটে?

'তোমায় বলার ভাগ বললুম, ইচ্ছে হয় যাও, নইলে যেওনা।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'এরপর যখন দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে তখন বাপ বেটিতে ঘুরো পথে পথে—আমার আর কি', সুরমা ঘরে এসে ঢুকলেন, 'ছেলের হাত ধরে দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দাদা কি আর—।'

চায়ের কাপ আর পাঁপড় ভাজার ডিসটা তুলে নিল অনু।

বটকেষ্টবাবু থাকেন তিনতলার চিলে কোঠায়, অনু শুনেছিল, নিজের জন্যে একখানা মাত্র ঘর রেখে সমস্ত বাড়িটাই তিনি ভাড়া দিয়েছেন।

অনু সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। এতদিন হল এবাসায় এসেছে, কিন্তু এই প্রথম সে নিজের গণ্ডির বাইরে পা দিল। দোতলাই যেন তার কাছে আর এক জগত।

সিঁড়িটা দিনে রাতে সবসময়ই অন্ধকারে ছাওয়া থাকে। কিন্তু এ অন্ধকারে পদচারণায় অভ্যস্ত অনুপমা।

তেতলায় সিঁড়ির মুখে পা দিতেই এক ঝলক আলো এসে লাগল তার মুখে—ছাদের দরজা খোলা। থমকে দাঁড়াল অনু। আশ্চর্য এক উত্তেজনার সঞ্চার হল তার মনে। নিতান্ত অভাবিত ভাবে শোনা যাচ্ছে একটা অতিপরিচিত ঘর্ঘর ধ্বনি—এরোপ্লেন। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল অনু—এরোপ্লেন! কতদিন, কতদিন সে একটা চলমান এরোপ্লেন দেখেনি!

উর্ধশ্বাসে সিঁড়ির ধাপ ডিঙোতে লাগল সে, ছলকে উঠে গরম চা পড়ে গেল পায়ে—কিন্তু পা জ্বালা করে আসার পরিবর্তে গতিবেগই যেন বেড়ে গেল পায়ের।

ছাদ। সূর্যাস্তের কনে-দেখা আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে আকাশ। আর, সত্যি রূপালি পাখির মত ডানা দুটি নিশ্চল করে একটা এরোপ্লেন চলেছে দিগন্ত-অভিসারে।

রক্তে জোয়ার এল অনুপমার। এরোপ্লেন দেখলেই কি এক আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠে তার দেহমন। অনেক বড় এই পৃথিবী—মনে পড়ে যায় মাষ্টারদার কথা—এই প্রতিদিনকার জানাশোনা মানুষগুলিই পৃথিবীর সব মানুষ নয়—বহু বিচিত্র, বিচিত্রতর মানুষের মেলা এখানে। পৃথিবীর অফুরান বিস্ময়ের কি শেষ আছে? কথার শেষে আশ্চর্য কোমল স্বরে মাষ্টারদা তার নামটি উচ্চারণ করতেন, অনু! কান পাতলে এখনো যেন সে সুর শোনা যায়। এই এরোপ্লেন সেই অজানা অপরিচিত পৃথিবীর যাত্রী।

সবকিছু ছেড়েছুড়ে সেও যদি মুহূর্তে উধাও হয়ে যেতে পারত ওই এরোপ্লেনের মত—খাঁ খাঁ করে ওঠে অনুর মন—নতুন নতুন পৃথিবীতে, নতুন নতুন সব মানুষের রাজ্যে! জানো, এমন এক দেশ আছে, যেদেশে মেয়ে মানুষ কারো বন্দিনী নয়, কারো চেয়ে ছোট নয়, পিছনে নয়—পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ জুড়ে আছে সেই দেশ। বিদ্যুৎগতি এরোপ্লেন দেখলেই মাষ্টারদার কথাগুলো এলোমেলোভাবে হানা দিয়ে যায় অনুর মনে

আর সংগে সংগে নিজের ছোট্ট ঘর আর সংকীর্ণ পরিবেশের কথা মনে পড়ে যায় তার— সারা বুক তার তোলপাড় করে ওঠে। হায়রে, তেমন একটি জানালাও নেই তার ঘরে!—অসহ্য কান্না পেতে থাকে অনুর।

'আরে, অনু যে, বাঃ।'

অনু চমকে ফিরে দাঁড়াল। বটকেষ্টবাবু পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'দেখ দেখ, চা যেন পা'য়ে না পড়ে। পড়েনি ত? যাক!' অনুর আপাদমস্তক দেখেশুনে বটকেষ্টবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। 'কী মুস্কিল, বৌদি আবার কেন পাঠালেন তোমায় কষ্ট করে।'

'না, কষ্ট আর কি।'

'বাঃ, কষ্ট নয়? তা না হক, তবু, কি দরকার ছিল—এমনি ঠাট্টা করে বললুম—।'

'এক কাপ চা তো।'

পাঁপড় ভাজার ডিস আর চায়ের কাপটা বটকেষ্টবাবুর হাতে তুলে দিয়ে অনু আলসের দিকে সরে দাঁড়াল। 'আপনি ধীরে সুস্থে খেয়ে নিন, কাপটা আমিই নিয়ে যাব।' অবাক বিস্ময়ে সে চারপাশ দেখতে লাগল। বাড়ি, বাড়ি আর বাড়ি—আকাশের কিনার আর দেখা যায় না। না যাক, কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা অজস্র বাড়িগুলোকেও কি অপরূপ দেখাচ্ছে! পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সমারোহ আকাশে—রূপকথার রাজ্য যেন সব। রূপকথা! হঠাৎ অনুর কানে বেজে উঠল মাষ্টারদার কর্কশ হাসি—রূপকথার রাজ্য আকাশে নয় অনু, এই পৃথিবীতে। রূপকথার রাজ্য পৃথিবীতে? কেন সেদিন সে হঠাৎ অমন রেগে উঠেছিল মাষ্টারদার কথায়। তবে কেন আপনারা ধর্মঘট করে আছেন এতদিন ধরে —রূপকথার রাজ্যে বাস করে কেন পেট পুরে খেতে পান না? এতদিন ধরে ডাক-তার-টেলিফোন বন্ধ থাকায় সকলের যে এত অসুবিধা হচ্ছে—কই, আপনার রূপকথার দেশের মানুষ—। কথা বলতে বলতে সেদিন কি খুব কঠোর হয়ে পড়েছিল সে—নইলে কথার মাঝখানেই মাষ্টারদা অমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন কেন, মুখখানি কালো করে কেন উঠে গেলেন?

'চা'টা চমৎকার হয়েছে। কে করল, তুমি? বাঃ!'

'না, মা।' মুখ না ফিরিয়েই অনু উত্তর দিল।

দক্ষিণের দিকে রাজপথের এক ফালি চোখে পড়ে। ট্রাম চলে না এ পথে, তবু পথ তো! অফিস ছুটি হয়ে গেছে—পথে মানুষের ভিড়। লুঙি-পরা মুসলমানদেরো দেখা যাচ্ছে, হিন্দুদের সংগে পাশাপাশি পথ চলেছে। মেয়েরা বেরিয়েছে, বেরিয়েছে ছোট ছোট ছেলেরাও। স্বাধীনতা পাওয়ার সংগে সংগে মিল হয়ে গেছে আবার হিন্দু মুসলমানে।

হবেই, অনু যেন জানত। জানতেন মাষ্টারদাও। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই—মরবার সময়ো কি এ বিশ্বাস বুকে ছিল তাঁর? গত বছরের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝির দিনগুলো মনে পড়ল অনুর, আর সংগে সংগে মনে পড়ল সেদিনের পনেরোই আগষ্ট রাত্রির কথা—সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি—চারিপাশ থেকে অবিরাম একতার ধ্বনি উত্তাল হয়ে উঠেছিল—নির্ঘুম বিছানায় ছটফট করতে করতে অসহ্য কষ্টে বুকটা চৌচির হয়ে যেতে চাইছিল তার। এক বছর পরে হিন্দু মুসলমানে মিল হয়ে গেল—এতবড় আনন্দেও চোখ ফেটে জল এসেছিল—তাঁর বিশ্বাস তো সত্য হল, কিন্তু তিনি কোথায়?

'কি দেখছো?'

অনু বুঝল, বটকেষ্টবাবু পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আলসের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল সে, তাড়াতাড়ি নেমে এল।

'হয়ে গেছে আপনার?'

'না, এই একটু বাকি।' অনুর বুকে চোখ রেখে বটকেষ্টবাবু আলতোভাবে চুমুক দিলেন কাপে, 'বড্ড গরম।' পুনরায় কাপের কিনারটা ঠোঁটে ঠেকালেন আলগোছে।

'আপনি খান ধীরে সুস্থে। অপু এসে কাপটাপ নিয়ে যাবে'খন।'

'বাঃ, তুমি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। দেরী হয়ে যাচ্ছে, মা—'

'রাগ করবেন বুঝি?'

'তা করবেন বইকি। কতক্ষণ এসেছি।'

'ও।' সহসা কথার মোড় খুঁজে পেলেন না বটকেষ্টবাবু। যত দেরী হোক, মা তার রাগ করবে না, করলেও মুখ ফুটে বলবে না কিছু—জানেন তিনি, ও-ও যে না জানে তা নয়। কিন্তু মেয়েটা যেন কি! এক চুমুকে বাকী চা'টুকু শেষ করে কাপডিস অনুর হাতে তুলে দিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চাইলেন—বিকেলের কনে-দেখা আলো—ভারী আশ্চর্য দেখাচ্ছে কিন্তু মেয়েটাকে।

খবরটা দিয়েই চকিতে উধাও হয়ে গেল অপু। গত দু'রাত একেবারে ঘুমোতে পারেনি অনুপমা, চোখদুটো তার একটু লেগে এসেছিল মাত্র, অপুর কথায় ধড়মড় করে উঠে বসল। মিছিল বেরিয়েছে! তীব্র একটা আনন্দের ধাক্কা খেয়ে যেন মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তার চোখের ঘুম।

আবার দাংগা লেগেছে, দুদিন আগে অপুই সে খবর প্রথম এনেছিল। তারপর

মহাত্মাজীর অনশন, এ-দাংগা না থামলে তিনি প্রাণ দেবেন অনশনে। গতকাল দাংগার প্রতিবাদে মিছিল বের করেছিল ছাত্ররা—কিন্তু কোথায় যেন হিন্দুরাই তাদের মেরে হটিয়ে দেয়। আবার মিছিল বেরিয়েছে আজ। কাদের মিছিল ? কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছেনা অনুর।

গত দু'রাত অন্ধকার দেওয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ে কেটেছে—দৈবাৎ চোখ লেগে এলেও 'জয় হিন্দ' 'বন্দেমাতরমের' কর্কশ ধ্বনি কেড়ে নিয়েছে তার চোখের ঘুম। আধচেনা সব হিংস্র মুখাবয়ব ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—অবাক হয়ে ভেবেছে অনু, পনেরোই আগষ্ট এরাই কি সারারাত তাকে জাগিয়ে রেখেছিল ? এই চারদেয়াল ঘেরা ঘরের গণ্ডির বাইরের জগতটা কি রকম, দেখতে ইচ্ছে হয়েছে তার, কি রহস্যের আলোছায়া সেখানে—যেখানে একদিন মানুষ মানুষকে ভাই বলে বুকে টেনে নেয়, আর একদিন বিনাদ্বিধায় ছুরি বসায় সেই ভাইএরই বুকে ?

সবকিছু জট পাকিয়ে যায় অনুর মাথায়। তাই অন্ধকারে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে থেকে বিনিদ্র কেটে গেছে দুটি রাত।

ঝড়ের মত আবার এলো অপু। 'দিদি, জামাটা দেনা ভাই, শিগগীর।'

'কি করবি জামা দিয়ে ?'

'মিছিলে যাব।' উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠল অপু, 'দেখনা সদরে গিয়ে—ইস্কুল কলেজের ছেলেরা সব মিছিল বের করেছে, দাংগা থামাবে বলে, ক-ত ছেলে। দেনা ভাই শিগগীর—'

'মা কোথায় রে ?'

'জানিনা, জামা তুই দিবি কি না বল—নইলে আমি চললুম কিন্তু গেঞ্জি গায়েই।'

'না, তোকে যেতে হবে না।'

'বাঃ রে', অবাক হয়ে বলল অপু, 'আমাদের ইস্কুলের সকলে গেল, আমি যাব না ? মাষ্টারমশাই যে বললেন সকলে মিলে মিছিল না করলে এ দাংগা থামবেনা—আর তাহলে গান্ধিজী মরে যাবেন। গাঢ় হয়ে এল অপুর স্বর, 'তাইতো—'

'মাষ্টারমশাই!' হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠল অনু।

'হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলের রামপদবাবু, অঙ্কের মাষ্টার।'

'ও।'

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অপু—ওদিকে রাস্তা থেকে হাজার হাজার কণ্ঠের কলরোল ভেসে আসছে।

'দিদি, তুইও চলনা।' অপু বলল, 'কত মেয়েও এসেছে—তোর মত, তোর থেকে ছোট, তোর থেকে বড়—।'

'না। তুই একাই যা, গোলমাল দেখলে ফিরে আসিস কিন্তু।'

আলনা থেকে অনুপমা ভাইয়ের জামাটা নামিয়ে দিল, জামা হাতে করেই ছুটল অপু।

মিছিলের কল্লোলধ্বনি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এই সামনের রাস্তা দিয়েই হয়ত চলেছে মিছিল। সমস্ত পাড়াটা গমগম করে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষের পদধ্বনির শব্দ তরংগে অনুর বুকের ভেতরটাও সহসা তোলপার করে উঠল। অজ্ঞাত দুরন্ত এক আহ্বানে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, সদর দরজায় এসে দাঁড়াল সে।

এখান থেকে দেখা যায় না বড় রাস্তা। কিন্তু অনুভব করা যায়—একটা উন্মত্ত ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তার উপর দিয়ে। হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জন করে উঠছে, এক হো এক হো। ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশবাতাস। মহাত্মাজীকে বাঁচাতে হবে—মেয়েলি কণ্ঠের উত্তাল তরংগ সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে—অপু বলছিল, অনেক মেয়েও নাকি বেরিয়েছে আজকের মিছিলে। উন্মত্ত আবেগে জোয়ার আসে অনুর রক্তে—দুহাতে দরজার দুই পাট ধরে নিজের শরীরের কাঁপন বোধ করে সে। অন্তত একবার যদি ওদের দেখতে পেত! নিজেকে মিছিলের একজন বলে কল্পনা করতেও ভয় হয়, কিন্তু দূর থেকেও যদি দেখা যেত। ওরা কারা—এই নৃশংস হানাহানির মধ্যেও কারা নিজেদের জীবনের সব মায়া ছেড়ে দিয়ে মহাত্মাজীকে বাঁচাবার জন্যে নির্ভয়ে বেরিয়েছে পথে? হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই—প্রাণ দিয়েও একথা প্রমাণ করতে পারেননি মাষ্টারদা, কিন্তু কাদের কণ্ঠে আজ ঐ ঘোষণা আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে!

হঠাৎ কি একটা ধ্বনিতে ফেটে পড়ল মিছিল, অভূতপূর্ব এক রোমাঞ্চে থরথর করে উঠল অনুর সর্বশরীর। ইচ্ছে হল, ছুটে বেরিয়ে পড়ে পথে, কিন্তু পা সরল না। সমস্ত মন আকুলিবিকুলি করে উঠল—হায়রে, একটা যদি জানালা থাকত! সামনের গলিটার দিকে তাকাল অনু—নির্জন। কল্পনা করা যায় কি এই নির্জন গলিটার পেছনেই চলেছে কি আশ্চর্য নাম-না-জানা অদ্ভুত অভূতপূর্ব সব কাণ্ডকারখানা?

ছটফট করতে লাগল অনু। বারবার অবাধ্য হয়ে উঠতে চায় পাদুটো। কিন্তু কে তাকে আজ জোর করে নিয়ে যাবে? মাষ্টারদা! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল অনু।

কোথায় মাষ্টারদা? আকাশের দিকে চাইল অনু, গুণ্ডার হাতে মরলে কি মানুষ শহীদ হয়—স্বার্গে যায়?

যেখানেই থাকুন তিনি, গত বছরের সেই দিনটির মত আবার কি তিনি ঝড়ের বেগে এসে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারেন না? অনু আজ দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত, কোন ওজর, কোন আপত্তি সে করবে না—যাবার পর বাবা যদি কিছু বলেন সব দোষ সে তুলে নেবে নিজের মাথায়। আজ আর তাঁকে অপমানিত হয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে না। কোথায় মাষ্টারদা? আকাশের দিকে চাইল অনু।

দূরে সরে যাচ্ছে মিছিল, অনুর মনে হল চোখের সামনে মহামূল্য কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে

তার। নির্জন গলিটা নির্জনতর হয়ে উঠছে—খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। এই নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, অপস্রিয়মান মিছিলের ধ্বনি শুনতে শুনতে তার মনে পড়ল আরেকটি দিনের দৃশ্য। গত বছরের জুলাই মাসের শেষাশেষি, গড়ের মাঠের লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝখানে মাষ্টারদার একটা হাত মুঠো করে ধরে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল শুধু—কি দেখছিল, সেদিন সে জানত না, আজো জানেনা। জীবনে সেই প্রথম গণ্ডির বাইরে পা দিয়েছে। দুপুরে বাড়িতে কেউ ছিল না—জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন মাষ্টারদা। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল অনু, ভয় উঁকি দিয়েছিল তার মনে—আর সেই ভয় ছাপিয়ে উঠেছিল অপরিসীম বিস্ময়।

'দেখেছ! দেখ, আমাদের শক্তি কত—সমস্ত কলকাতার লোক আজ এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে।'

বক্তৃতা দিচ্ছিল একটি মেয়ে।

'মেয়েটিকে দেখ। ও-ত আমাদের দলে। কলকাতায় থেকেও কলকাতার এ-রূপ তুমি ভাবতে পারোনা—সারা পৃথিবীর—'

কান খাড়া করে উঠল অনু। আরেক দল যাচ্ছে। আবার তেমনি ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে আকাশবাতাস। এরা কারা? হয়ত মিছিলেরই একটা অংশ, পিছিয়ে পড়েছিল—কিন্তু অনু জানেনা কিছু, কি করে জানবে সে! মেয়েমানুষ, শুধু ঘরের কোণে বন্দী থেকে এ খবর সে জানবে কি করে? কলকাতায় থেকেও কলকাতাকে ও চেনেনা—সারা পৃথিবীর—

'কে অনু!'

চমকে পিছন ফিরে চাইল অনু। বটকেষ্টবাবু নেমে এসেছেন।

'যাবে নাকি মিছিলে? এসো না, আমিও যাচ্ছি।' অনুর মুখের দিকে একঝলক চেয়ে নিয়ে বটকেষ্টবাবু বললেন, 'ছাত থেকে দেখলুম—বি—রাট মিছিল। অনেক মেয়েও রয়েছে। যাবে? বাঃ, এসো না।'

নিজের অজ্ঞাতসারেই অনু চৌকাঠের বাইরে এক পা বাড়িয়ে দিয়েছিল, থেমে গেল। এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে হাত ধরে সামান্য চাপ দিলেন বটকেষ্টবাবু, 'যাও তো এসো, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। মোড় থেকে ট্যাক্সী নিয়ে নেব।'

কথা বলেই হন্‌হন্ করে এগিয়ে চললেন তিনি।

যন্ত্রচালিতের মত তাঁকে অনুসরণ করল অনু।

ট্যাক্‌সীতে উঠে বটকেষ্টবাবু আড় চোখে চাইলেন বারকয়েক—কি রকম বিশ্রী বোকা বোকা দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! উল্টোডিঙির বাসায় এই মেয়েটিকে দেখেই কি তাঁর মাথায় প্ল্যান এসেছিল, আবার সেদিন বিকেলে কনে-দেখা আলোয় এই মেয়েটিকে দেখেই কি নরম হয়ে গিয়েছিল তাঁর মন।

আশ্চর্য!

বটকেষ্টবাবু জোর করে উল্টো দিকে চেয়ে রইলেন।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চৌত্রিশ

আবার কি পাখা গুটোলো নাকি তামসী? ঘরের আরামে আবার ঘন হয়ে উঠল?

'আমাকে শিগগির ভালো করে তোলো মা।' প্রমথেশ তামসীর উৎসুক হাত চেপে ধরলেন: 'সবাই এখন জাগছে, লড়ছে, আমিই শুধু অথর্ব হয়ে পড়ে থাকব এ বরদাস্ত করতে পারছি না।'

তামসী অকৃপণ হাতে সেবার ভার নিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় সংসারের ভার। প্রমথেশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অনেক দিন থেকে যাচাই করে দেখলেন, মেয়েটির সম্পর্কে বিরূপ হতে পারলেন না। নম্রতায়, দৃঢ়তায়, সব চেয়ে উল্লেখ্য, নির্লিপ্ততায়, মেয়েটি অনন্যপূর্ব। ঔদাসীন্যের সঙ্গে সহিষ্ণুতার চমৎকার অন্বয় করেছে—অনুদ্বেগের সঙ্গে অস্পৃহা। মেয়েটিকে ভালবাসতে সাধ হয়, বিশ্বাস করতে জোর আসে।

বললেন, 'রোগের বিরুদ্ধেই হোক আর সকল রোগের আকর ইংরেজের বিরুদ্ধেই হোক তোমরা যুদ্ধ কর প্রাণপণে, আমি পালাই। মোটা মানুষ, সাইরেণ শুনে সিঁড়ির নিচে নেমে বারে-বারে আর সরু হতে পারি না।'

'কোথায় পালাবেন ?'

'পশ্চিমে। ছোট মেয়ের কাছে।'

'আর এই সমস্ত আমি একা সামলাব ?'

'হাতে সাম্রাজ্য পেলে তাও বুঝি তুমি একা সামলাতে পারো। তোমাকে দেখিনি এ কদিন ? রোগ আর বোমা দু-দুটো শত্রুর সঙ্গে তোমার লড়াই করার তোড়জোড় ?'

'তার মানে আমাকে খোসামোদ করছেন—'

'তারই মত শোনাচ্ছে বটে। কিন্তু যদি তুমি আজ চলে যাও তামসী, তবু বোধ হয় কথাটাকে ছোট করতে পারব না। কাছে আছ বলেই খোসামোদ শোনাচ্ছে, দূরে গেলে শোনাত বন্দনার মত। কোনোরকম পয়সা-কড়ি নেবেনা, মুখের স্তুতিটুকু দিতেও আপত্তি করব ?'

'তারো চেয়ে বেশি দিচ্ছেন। দিচ্ছেন অন্তরের বিশ্বাস। কিন্তু ভয় হয়, ফিরে এসে না দেখেন আপনার সংসার আমি তছনছ করে ফেলেছি।'

'কার সংসার কে তছনছ করে ?' প্রমথেশ-পত্নী দার্শনিকের মত বললেন, কিন্তু চোখের কোণে ক্ষীণ হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'আপনি জানেন না, আমার হাতে শুধু সর্বনাশের মন্ত্র—'

'তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কি করে একটা রুগ্ন মানুষকে আরোগ্য দিয়ে নির্মাণ করে তুলছ। কি করে নিরাশ-নিরানন্দ ঘরে আনছ মিলনের সম্ভাবনা।'

'মিলনের সম্ভাবনা ?' তামসী মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, পিতা-পুত্রের মিলনের সম্ভাবনা। তুমি ছাড়া এ অজোড়যোড়ন আর কারু সাধ্য নয়।'

তামসী প্রমথেশের কাছে গেল। একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বললে, 'আমার স্ত্রী পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন।'

তাই কথা ছিল বটে। সবাইকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে কোনো নার্সিং হোমে চলে যাব। কিন্তু অযাচিত আশীর্বাদের মত তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম—

'আমি কি নার্স ?'

সন্দেহ ছিল নিশ্চয়ই। অধিপের ক্ষতব্যথিত শিয়রে তার সেবামূর্তি তিনি দেখেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। বিশেষত আরোগ্যের তটসীমায় পৌঁছে দেবার আগেই তার সেই আকস্মিক তিরোধানটা তাঁর কাছে লেগেছিল হতভম্বের মত। কিন্তু তামসীর সেই তিরোধানের পর অধিপকে তো তিনি দেখেছেন। দেখেছেন কি ভাবে তিল-তিল করে কী অসীম প্রত্যাশার মধ্যে সে ভালো হয়েছে, কী তীক্ষ্ণ অন্বেষণের মধ্য থেকে

আকর্ষণ করেছে তার জীবনীশক্তি। দেখেননি হয়ত, অনুভব করেছেন। সর্বক্ষণ প্রশ্ন করেছেন মনে-মনে, কে এই প্রাণদায়িনী, কে এই অসাধ্যসাধিকা। যে শূন্যতার থেকে রচনা করতে পারে নবীন নক্ষত্র। আরোগ্য নয় তামসী, তারও চেয়ে বড় সৃষ্টি, নবজীবন।

তামসী খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, 'যাকে ফেলে চলে গেলাম সে অনেকদিন ভুগে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠল—এইটেই আমার নার্সিংয়ের প্রমাণ ?'

'না, তার চেয়ে ভালো প্রমাণ পেয়েছি। দস্তুরমত স্পষ্ট, লিখিত সার্টিফিকেট।'

সে আবার কি !

'একটা চিঠি। লিখেছে, নার্সিংয়ে নাকি তোমার ভালো ট্রেনিং আছে। পাকাপোক্ত কোন এক বহুদর্শী নার্সের সঙ্গে অনেক নাকি হাঁটাহাঁটি করেছ '

কালো হয়ে উঠল তামসী। বললে, 'কে লিখেছে চিঠিটা ?'

কে দেখতে গেছে। নার্সের সঙ্গে বেড়াতে—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত পড়ার আর তাই দরকার হল না। ভাবলাম, আশ্চর্য, যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই পেয়ে গেছি।

'দেখি চিঠিটা।' তামসী তার ডান হাতটা দৃঢ়তার সহিত প্রসারিত করল।

'উড়ো চিঠি, আবার উড়ে গেছে।' স্মিতসৌম্য মুখে প্রমথেশ বললেন।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল তামসী। এটা-ওটা কাজ করতে-করতে অপ্রত্যক্ষভাবে বললে, 'আমিও তো অমনি বেনামী চিঠির মত। বেনামী জনতার মধ্যে থেকে কে এক অজ্ঞাতকুলশীল উড়ে চলে এসেছি এই অন্তঃপুরে—'

'সব উড়ে-আসা জিনিসকেই কি উড়িয়ে দেয়া যায় ?' প্রমথেশ তেমনি হাসলেন : 'কেউ-কেউ দিব্যি উড়ে এসে ঠিক জুড়ে বসে।'

'শেষকালে প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা ?'

'ওটা জামাইদের বেলাতেই বলা হয়েছে মা, বধূদের বেলায় নয়।'

তামসীর গভীরনিস্থত রক্তে যন্ত্রণার মত একটা শিহরণ বাজল। এই কি শৃঙ্গারশিহর ?

কোথায় আর সে যাবে ! কোন পথ ধরে হাঁটবে সে আর কিসের অন্বেষণে ! এই তো তার গম্য, এই তো তার প্রাপ্য—এই গৃহপ্রতিষ্ঠা, এই গৃহপ্রবেশ। ভাগ্যের বিরুদ্ধ-বাদিনী হয়ে আর কত কাল সে উদ্‌ঘাতিনী পন্থায় কালহরণ করবে ? আর কেন সে ছায়ানুসারিণী, পাপানুসারিণী হবে ? এই তার ভালো, এই তার যথাযোগ্য। এই বিলাস-অলস বিশ্রাম, এই রহস্যগূঢ় রমনীয়তা। কষ্টজীবীতার সকল অস্ত্রই সে বুক পেতে নিতে পারবে, শুধু নিতে পারবেনা কুসুমকার্মুকের খরশর ?

প্রমথেশ বলেন, 'যদি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে মা, তবে অভিলষিতলাভ অনিবার্য

তামসীর সমস্ত শরীরের শিরাতন্তুতে এ কিসের তীব্রতা ? কোন অভ্রংলিহ আকাঙ্ক্ষার ? কোন অবচনীয় আর্তনাদের ?

হ্যাঁ, সে আসবে। তামসীই চিরকাল আগ্রহে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে—তার নাম নেই, ধাম নেই, বস্তুসত্তা নেই—শুধু এক মহান কামনা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আকর্ষণ করেছে। আর সে ছুটবে না, চঞ্চল হবেনা। প্রশান্ত প্রতীক্ষায় স্থির হবে থাকবে। এবার তার আসবার পালা। এবার সে আসবে বলবন্যার মত, খড়্গের আহ্বানে রক্তস্রোতের মত, যেমন তিমিরাবরণ ছিন্ন করে সদ্যসূর্যের রক্তরশ্মিতীর ছুটে আসে।

দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে নাকি ? বালিশের থেকে মাথা তুলে কান খাড়া করল তামসী। কেউ না, কিছু না। ও শুধু সুষুপ্ত মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডের শব্দ।

ভীষণ গরম পড়েছে। গাছের পাতাগুলো দেয়ালের ইঁটগুলোর মতই নিস্পন্দ। আকাশের বিমর্ষ উপহাসের মত জ্যোৎস্না উঠেছে। সমস্ত নীরবতা মৃত্যুলিপ্ত। শুধু একটা উন্নিদ্র কাক ভয়ার্ত কণ্ঠে সেই নিঃস্বতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

দু-দুবার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এসেছে তামসী। ঠাণ্ডা জল খেয়েছে আকণ্ঠ। ঘুম আসছে না। পুরাদমে পাখা চলেছে। অবন্ধন করে দিয়েছে বেশবাস। খাট ছেড়ে মর্মরের মেঝের উপর মুক্তবক্ষে শুয়ে আছে, নিমজ্জমান সমর্পণের ভঙ্গিতে। একাকী ঘরে উচ্ছৃঙ্খল অন্ধকার। শুয়ে-শুয়ে, যাতে ঘুম আসে, ভাবতে চেষ্টা করছে সে গোপনলালিত সুখস্মৃতি। অপ্রকাশ্য অথচ অনাবৃত। স্মৃতি নেই, স্বপ্ন আছে শুধু। একদিন দেবিকাদের বাড়িতে দুপুরবেলা তার এক চমক ঘুম এসেছিল। চকিতে দেখেছিল সে একটা অবেলাবিলীন সুনীল সমুদ্রের স্বপ্ন। নগ্ন নিঃসঙ্গতায় সে স্নান করতে এসেছে। সেই সমুদ্রতটে সে ছাড়া আর কোনো প্রাণচিহ্ন নেই, নেই তৃণতরু। ক্রমে-ক্রমে সে পরিধানমুক্ত হতে লাগল, ঝাঁপ দিল সেই উত্তাল অতলতায়। মনে আছে তামসীর, হঠাৎ মনে হল, কোথাও আর একবিন্দু জল নেই, তৃষাদগ্ধ শুষ্ক মৃত্তিকার উপর সে শুয়ে আছে। সে কি মাটি, না, এই মর্মরমেঝে ? মনে আছে একটা লজ্জা আর ক্ষুধা ধীরে ধীরে গ্রাস করল তাকে। দেখল মাটির ঘাস সহসা দীর্ঘাকার হয়ে তাকে নিবিড় করে লুকিয়ে ফেললে। ঘাসের সে আরণ্য আশ্লেষ এখনো তামসীর স্পষ্ট মনে আছে। মনের গহন অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ সে এখন চমকে উঠল। সে কি ঘাস না পুরুষস্পর্শ ?

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সাইরেন বেজে উঠেছে। কর্কশকরুণ দীর্ঘ আর্তনাদ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল তামসী। নিজেকে আগে সম্বৃত করবে, না, খোলা জানালাগুলো বন্ধ করবে বুঝে উঠতে পারল না। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। ঢুলি-পড়া অস্পষ্ট আলো। তবু সেই আলাতে যা সে দেখলে তা ইহজীবনে কোনোদিন দেখেনি।

সামনেই আলমারিতে-বেঁধা দাঁড়া আয়না। সেই আয়নায় দেখল সে নিজেকে। পলকপতনহীন চোখে বিমোহিত হয়ে রইল।

তার এত রূপ, এত লাবণ্যলেখন! নিজের কাছেই এতদিন সে অজ্ঞাতযৌবনা ছিল, ছিল গূঢ়চারিণী। ভাবতেও অবিশ্বাস্য লাগছে। ক'মাসে কেমন উজ্জ্বল স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে তার, নতোন্নত দেহ লীলাবলম্বিত হয়ে উঠেছে। নবীন নীরদের শান্ত শ্যাম শ্রী পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। বিলম্বিত একবেণীটা কেমন অসঙ্গত লাগতে লাগল। ক্ষিপ্র আঙুলে বন্ধন খুলে কেশদামকে সে মুক্তি দিলে। চুল দীর্ঘ, ঘন দলিতাঞ্জনচিক্কণ হয়ে উঠেছে। কুসুমপেশল বাহু, স্তবকাকার বক্ষ, কটাক্ষগর্ভ চক্ষু—অনন্যলক্ষ হয়ে নিজেকে দেখতে লাগল তামসী। সে পুরুষার্থসাধনীভূতা, সে মনোনয়ননন্দিনী। পারবে সে তপস্যায় জয়ী হতে, পারবে। নিশ্চয় পারবে।

তখনো বেজে চলেছে সাইরেন। প্রমথেশের ঘর নিচে। সেটাই আশ্রয়-ঘর। প্রমথেশ তামসীর জন্যে উতলা হয়ে উঠেছেন। দোতলায় তার শোবার ঘরে নির্বারিত বিস্মৃতিতে সে ঘুমিয়ে আছে বুঝি। শক্তি নেই, নিজে ডাকাডাকি করেন। সাধ্য নেই নিজে গিয়ে করাঘাত করেন দরজায়। লোকজন আর সব গেল কোথায়? মরবে নাকি মেয়েটা?

নির্জন পার্বত্য দ্বীপে ছিল তারা সেই অর্ধ-নারী-অর্ধ-বিহঙ্গী জাদুকরীর দল। শ্রুতি-লোভন সঙ্গীতে অসতর্ক নাবিককে পথভ্রষ্ট করে আনত। গ্রীক পুরাণে তারাই তো সাইরেন। জীবনাভিনয়ে তামসীরও কি সেই পাঠ? আর ঐ আর্তনাদ কি শ্রবণসুখকর? চিত্তহারী?

দর্পণারূঢ় প্রতিবিম্বের দিকে আরেকবার তাকাল তামসী। এ কে? সে, না, সেই হাসিনী নার্স?

ত্যক্ত বসন মুহূর্তে আহরণ করে নিল তামসী। স্রস্তচুল দৃঢ় খোঁপায় বদ্ধ করলে। বদ্ধ করলে পরিকর, হ্রস্ব শীর্ণ অঞ্চলে। ছিটকিনি দিলে জানলায়। কৌতুকোৎসুক আলো-কে সমাধি দিলে অন্ধকারে। ক্ষিপ্র পায়ে নিচে নেমে গেল।

মৃত্যু আজ তাকে সমক্ষসংঘাতে আহ্বান করছে। স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। সে আহ্বান মেনে নেবে তামসী। নামবে সে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে। সে রজনীরঙ্গিনী বাসকসজ্জা রচনা করতে বসেনি।

হ্যাঁ, সে আসছে। সে কি শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, মহাপ্রলয়? না, সে সর্বজয়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা?

নিচের ঘরে প্রমথেশের সন্নিহিত হয়ে বসল তামসী। একটা অদ্ভুত প্রতীক্ষায় দুজনেই মূক হয়ে আছে। সেই নির্বোধ নৈশ কাকটাও আর ডাকছে না। (ক্রমশঃ)

বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব

নারায়ণ চৌধুরী

প্রবন্ধের শিরোনামার দৈর্ঘ্য ও গুরুগম্ভীরতায় পাঠক ভড়্কাবেন না। গোড়াতেই সকলকে আশ্বস্ত করে রাখছি, নামটাই যা জাঁকালো, আমার বিদ্যেটা ততো জাঁকালো নয়। কাজেই গবেষণামূলক প্রবন্ধের ধার দিয়েও আমি যাবো না; সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমি শুধু এখানে মোটামুটিভাবে বাংলা সাহিত্যের সহিত বিশ্বসাহিত্যের যোগসূত্রটি তুলে ধরবার চেষ্টা করব এবং এই প্রসঙ্গে আরও যা কিছু বলা উচিত বা বলা চলতে পারে তা বল্‌ব। 'আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব' না ব'লে 'পাশ্চাত্য প্রভাব' বল্‌লেই বর্ণনাটা সঠিক হতো, তবে এখন আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী শুদ্ধমাত্র পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; গত বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্ত্তী বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা সংঘাতের ফলে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মনোযোগ কিছুদিন যাবৎ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই গত ছ' সাত বৎসরের আন্দোলন আলোড়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাবটাকে শুদ্ধমাত্র পাশ্চাত্যের সীমায় সঙ্কুচিত না রেখে আন্তর্জ্জাতিক আখ্যা দেওয়াই বোধ হয় অধিক যুক্তিযুক্ত।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান যে রূপের সহিত আমরা পরিচিত তার সঙ্গে ইংরিজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। এই সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকেই সুরু হয়। ইংরাজ যদি বাণিজ্যবিস্তারব্যপদেশে আমাদের দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে না বসতো, তা হলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের ধারা আমাদের সাহিত্যে আরও কতোকাল অব্যাহত থাক্‌তো বলা শক্ত। বৈদেশিক শাসক কর্ত্তৃক কৃত্রিম ভাবে আরোপিত ইংরিজি ভাষা আমাদের মানসিক বিকাশকে নানা দিক দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছিলো সত্যি, কিন্তু ইংরিজি সাহিত্যটাকে আমরা ঠিক কৃত্রিম ভাবে গ্রহণ করি নি। অর্থাৎ জাতিগত ভাবে ইংরিজি ভাষা আমাদের সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ইংরিজি সাহিত্য থেকে আমরা প্রচুর ভাবে উপকৃতও হয়েছি। গত দেড় শত বৎসর আমাদের দেশে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে, ধর্ম্মীয় প্রেরণায়, শিল্পে সাহিত্যে যাঁরাই শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন তাঁরা সকলেই মুখ্যতঃ ইংরিজি সাহিত্য

পরিবেশিত জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের মানস-সন্তান। ঐতিহাসিক হিসাবে রামমোহন থেকে এই প্রক্রিয়ার সুরু; তারপর থেকে চিন্তা ও কর্ম্মের সর্ব্বস্তরে, সর্ব্ব বিভাগে সেই প্রভাব-প্রবাহ একটানা বয়ে চলেছে এবং অদ্যাবধি সেই স্রোত অক্ষুণ্ণ। গত পৌণে দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসনের অধ্যায়ে আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের স্তরে স্তরে বহু আবর্জ্জনা, বহু ক্লেদ, অভিশাপ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, কিন্তু ওই স্তূপীকৃত ময়লা থেকেই আমরা এমন একটি বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলাম যাকে রাশীকৃত কয়লার কালিমাকলঙ্কিত হীরকখণ্ডের সহিতই মাত্র তুলনা করা যায়। সে হীরকখণ্ড—ইংরিজি সাহিত্য। এরই দ্যুতিতে আমাদের দেশের গত দেড়শত বৎসরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবনের সাফল্যের ইতিহাস দ্যুতিময়। শুধু ব্যক্তিজীবনই বা কেন, যে জাতীয়তাবাদের আমরা উপাসক এবং যে জাতীয়তার প্রেরণা থেকে আমরা রাষ্ট্রীক মুক্তিসংগ্রামের প্রণোদনা লাভ করি তার সাফল্যের রহস্যও তো এইখানেই নিহিত। জাতীয়তাবাদ থেকে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম 'নেশনের' ধারণার উদ্ভব—সেটিরও মূলে পাশ্চাত্য ভাবধারা। অতীত ভারতের "বিভেদের মধ্যে ঐক্যে"-র যে সংস্কারের মহিমা ইতিহাসকার, দার্শনিক ও কবিকুল কীর্ত্তন করে গেছেন তা নিতান্তই ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে টেনে আনার কৃতিত্ব নিঃসংশয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই প্রাপ্য।

অনেক রক্ষণশীল, ভারতীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠ সমালোচক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের মাটির যোগ নেই, তার সবটাই পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা নিঃশেষে আচ্ছন্ন। পাশ্চাত্য দেশের চিন্তার ভঙ্গী, পাশ্চাত্য দেশের আচার-ব্যবহার এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের শব্দসম্ভার ও 'ইমেজারী', পাশ্চাত্য-ভঙ্গিম ঘটনা ও দৃশ্যসংস্থান, পাশ্চাত্য আদর্শ ও নীতি—এসবের প্রতি আধুনিক সাহিত্যিকদের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁদের রচনাকে কৃত্রিম ও প্রাণহীন করে তুলেছে। এঁদের বিচারে এসব রচনা বড়ো জোর 'অর্কিডের' ফুল; কিন্তু মাটির সঙ্গে সে ফুলের সংযোগ না থাকায় দু'দিনেই তা বিশুষ্ক-বিশীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। সমালোচকদের আরও অভিযোগ এই যে, সম্প্রতি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে এই প্রভাব আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে—মার্কিণ চিন্তাধারা আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের সাহিত্যিকদের উপর তার সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। পাশ্চাত্য তথা আন্তর্জ্জাতিক প্রভাবে আমরা ক্রমেই কৃত্রিম জীবনাদর্শের ভক্ত হয়ে উঠ্‌ছি এবং সেই পরিমাণে আমাদের স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও স্বদেশীয় জীবনদর্শন আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে ক্রমেই দূরে স'রে যাচ্ছে, ইত্যাদি ও প্রভৃতি।

অভিযোগটি যে আংশিক সত্য তা অস্বীকার করি না। কিন্তু কথা হচ্ছে, অভিযোগ করলেই অভিযোগের কারণ দূর হয় না। যা' নিছক বাস্তব সত্য এবং অপ্রতিরোধ্য সত্য,

যাকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই, সে সম্পর্কে অভিযোগের কারণ থাক্‌লেও তাকে স্বীকার করে নেওয়াই পন্থা। আমাদের মনে আন্তর্জ্জাতিক ভাবধারার প্রভাব অতিমাত্রায় সক্রিয় তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু আমাদের সাধ্য কী যে এই প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করি? (আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার আমি রাখি না; তর্ক ও রচনার খাতিরেই মাত্র এই কাল্পনিক অধিকারটি প্রয়োগ করছি।) আন্তর্জ্জাতিক ভাবধারাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে সজ্ঞানে নির্ব্বাসন দিলে তার দ্বারা আমরা ব্রিটিশ যুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যটাকেই কি খণ্ডন করবো না? পাশ্চাত্য প্রভাব বাদ দিলে গত একশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এমন কী বস্তু অবশিষ্ট থাকে যাকে নিয়ে আমরা গর্ব্ববোধ করতে পারি? বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিক্‌পাল তাঁদের সকলেই কি ইংরিজি সাহিত্য ও ইংরিজি ভাবধারার মানস সন্তান নন? ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাংলা দেশ ছিল নিঃশেষে পল্লীকেন্দ্রিক, আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসরের পুরাতন কৃষিসভ্যতার ক্রম-অনুসরণ করে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষ সনাতন বৈদিক আদর্শেরই জাবর কেটে চল্‌ছিলো। বাংলার এই ধূসর, উষর মরুতে নূতন ভাবের বন্যা নিয়ে এলো পাশ্চাত্য সাহিত্য। পাশ্চাত্য ভাবগঙ্গাকে শিরে ধারণ করলেন রামমোহন, তার ধারাকে বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন শ্রোতে চালিত করে তাকে বাংলার মনের মাটিতে মিশিয়ে দিলেন মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নব্য বাংলার ভগীরথগণ।

মাইকেল মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি খৃষ্টীয় সংস্কৃতিরই যৌগিক ফল। মাইকেলের জীবন থেকে পাশ্চাত্য ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব বাদ দিলে তাঁর মানসিকতার আর বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যে তৎকাল-প্রচলিত ইংরিজি সাহিত্য, বিশেষ করে স্কটের উপন্যাস এবং প্রবন্ধসাহিত্যে ইউরোপের তদানীন্তন ভাবগুরু যথা মিল, বেন্থাম, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কোঁথ প্রভৃতির প্রভাব দ্বারা নিঃশেষে আচ্ছন্ন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনাবলীতে যে সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই তার উৎস তাঁর মনেই,—এটাকে পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ভাবধারার প্রভাবজাত ফল মনে করলে অন্যায় করা হবে, কেননা তিনি শেষ বয়সে সজ্ঞানে এবং প্রকাশ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছিলেন। হেমনবীনের কাব্য মাইকেলের অনুসৃতি, কাজেই মূলতঃ পাশ্চাত্যধারাবাহী। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্রের নাট্যের সংস্কার ইউরোপীয় নাট্যের সংস্কারকে কেন্দ্র করেই আবর্ত্তিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতার নব্য উত্তরাধিকারী, উপনিষদীয় আদর্শের আধুনিক ধারক ও বাহক। কিন্তু এটা তো হলো নিতান্তই সাহিত্যের বস্তু (content)-সম্পর্কিত কথা যেটাকে সাহিত্যের 'ফর্ম্ম' বলা হয় এবং

রসিকসুজনের বিচারে যেটা হচ্ছে সাহিত্যের আসল প্রাণ তার আদর্শ কি তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই গ্রহণ করেন নি? যে গীতিকবিতা রবীন্দ্রনাথের রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার মধ্যে বৈষ্ণবপ্রভাব হয়তো কিছু পরিমাণে আছে, কিন্তু তার ভঙ্গীটা মুখ্যত: পাশ্চাত্য কাব্যপাঠেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনটাকে যদি তৌলদণ্ডে বিচার করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কালিদাস ভবভূতি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীর সম্মিলিত প্রভাবকে ছাড়িয়েও সেখানে শেলী-ব্রাউনিঙ্-সুইনব্যর্ণের লীলা অধিক প্রকট।

উপরের নামগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র, পূর্ণাঙ্গ নামপঞ্জী নয়। ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব প্রমাণের পক্ষে কয়েকটি নাম মাত্র বেছে বেছে এখানে নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব যে অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করা চলে না। বিশেষত: কল্লোল যুগের পর থেকে এই প্রভাব সীমাহীন হ'য়ে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের এই পাশ্চাত্যমুখিনতাকে ভারতীয় আদর্শের প্রতি অব্যভিচারী নিষ্ঠাপরায়ণ গোঁড়া সমালোচকের ভঙ্গিতে অঘাত হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। যে যাই বলুন, একথা আমি গৃহচুড়া থেকে সুউচ্চে ঘোষণা করতে পারি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের এই পাশ্চাত্যমুখিনতা, এই আন্তর্জাতিক-প্রবণতা কিছুমাত্র অন্যায় তো নয়ই, বরং সেটা তাঁদের মনের সুস্থ সচলতারই লক্ষণ। অবশ্য এমন যদি কেউ থাকেন যিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য ভাবধারারই অনুকরণ ক'রে চলেছেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র। আমার কথা হ'লো এই যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর যুগে ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস আকণ্ঠ পান ক'রে থাকতে পারেন, তা হ'লে এযুগের কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে লরেন্স-হাক্সলী-জয়েসের নাম উচ্চারণ করাই অপরাধ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি সজ্ঞানে মিল-বেন্থামের হিতবাদের আদর্শ প্রচার ক'রে যেতে পারেন, তা হ'লে মার্ক্স কিম্বা লেনিনের ভাবধারা বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করলেই সেটা বিজাতীয় চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব'লে ধিক্কৃত হবে কেন? রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর কালে শেলী সুইনব্যর্ণকে অনুসরণ করতে পারেন, তা হ'লে এযুগে এলিয়ট-পাউণ্ড-অডেনকে অনুসরণ করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? তরুণ বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সমারসেট মম্-প্রিষ্টলি-ইশারউড-হেমিংওয়ে-এরেনবুর্গ প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের রচনাদর্শ অনুসরণ করতে চাচ্ছেন। এই অনুসরণ প্রচেষ্টার পিছনে হয়তো আতিশয্য আছে, হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃত আদর্শের পোষকতাও আছে, কিন্তু প্রচেষ্টাটা একেবারেই কৃত্রিম

একথা বল্‌তে পারেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা প্রাক্‌রবীন্দ্র বাংলাসাহিত্যে কণ্ডূয়ন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করেন নি। আজকের দিনের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপ্রবাহকে আশ্রয় ক'রেই স্বদেশীয় রাজনীতির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্তর্জ্জাতিক প্রভাবকে গ্রহণ ও জীর্ণ ক'রেই স্বদেশীয় সাহিত্যের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। রাজনীতির ন্যায় আজকাল সাহিত্যেরও দুইটি দিক—জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক। জাতীয়তার বাড়া ও বাইরে যা কিছু তা-ই বিজাতীয়—এই মনোভাব যাঁদের মধ্যে সক্রিয় তাঁরা বাংলা সাহিত্যের সীমাকে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ সীমায় সঙ্কুচিত করতে চাচ্ছেন। তাঁদের অপ-প্রয়াসকে সর্ব্বাংশে খণ্ডিত করা প্রয়োজন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণব সাহিত্য পড়তে যেমন আমাদের আগ্রহের কম্‌তি হওয়া উচিত নয়, তেমনি সমান আগ্রহ নিয়ে আমরা আইরিশ ব্যালাডও পড়বো। বাংলা মঙ্গলকাব্য যেমন আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে উপভোগ করবো, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিকতম কবিদের রচনাকেও অপাংক্তেয় ক'রে রাখবো না। এপিঠে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো ওপিঠে কোয়েস্টলার-অরুওয়েল। এদিকে দাশরথি রায়ের পাঁচালি তো ওদিকে বের্গ্‌সঁ-র দর্শন। সুক্ত ও মোগ্‌লাই কাবাব দুইয়েতেই আমাদের সমান রুচি। রসনার স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা অসাড় হয় নি এইটে বুঝবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ভিন্নজাতীয় বহুবিধ ভোগ্যবস্তুর প্রতি রসনার এককালীন সমান লোলুপতা। এই বাঞ্ছিত লোলুপতার পরীক্ষায় আমরা আধুনিক সাহিত্যিকেরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ না আমাদের মনের মণিমঞ্জুষায় আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্যের পাশে আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যকে সমান আসনে স্থান দেওয়ার মতো সমদর্শী ও সম্যকদর্শী মনোভাব অর্জ্জন করতে পারছি ততক্ষণ শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপারে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে একথা কোনক্রমেই বলা চলে না।

অপরের কথা বলতে পারি না, আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে নির্জ্জন নিশীথে দরাজ গম্ভীর গলায় দরবারি কানাড়ার সুর শুনলে যেমন আমি স্থির থাকতে পারি না, তেমনি ভর দুপুরের একাকীত্বে পিয়ানোতে বিদেশী সুরের টুং টাং শব্দ শুনলেও আমার মন সমান আনচান করে উঠে। তারাশঙ্করের রচনায় যখন বীরভূমের ফুটি-ফাটা গেরুয়া প্রান্তরের বর্ণনা পড়ি তখন যেমন মনটা উদাস হয়ে যায়, তেমনি আধুনিক মার্কিন লেখকের রচনায় আমেরিকার কোনো 'ফার্ম্মের' বর্ণনা পড়লে মনটা অকস্মাৎ কৃষি-কেন্দ্রিক হয়ে অগাধ বিস্তার লাভ করে। বাংলার সমুদ্রপারের নারিকেল-বীথির ছবি যেমন মনকে টানে, তেম্‌নি প্রাণোচ্ছলা সুন্দরী ইতালীয় তরুণীর কলহাস্য-মুখরিত ইতালীর দ্রাক্ষা ও জলপাই কুঞ্জের ছবিও মনকে সমান ভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। দার্জ্জিলিং পাহাড় থেকে সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিমালয়ের রূপ দেখে যেমন বিমুগ্ধ হই, তেমনি মিষ্টি কোনো হাতের বেহালার সুরে আমার মনে আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ের রৌদ্রলিপ্ত বরফ যেন গ'লে

গ'লে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার লীলাস্থল শান্তিনিকেতন যেমন মনের মধ্যে একটা মনোহর ছবি ঘনিয়ে তোলে, তেমনি ওয়ার্ডস্বার্থ কোল্‌রিজ সাদে অধ্যুষিত ইংলণ্ডের 'লেক ডিষ্ট্রিক্‌ট'ও মনের মধ্যে একটা স্বপ্নালু ছবি ফুটিয়ে তোলে। অগণিত জলা-নালা-খাল-বিল বেষ্টিত নদীমাতৃক সমতল বাংলা দেশের এক রূপ, আবার 'অরোরা বোরিয়ালিশ'-এর দেশ, অসংখ্য ফিয়্যর্ড-খচিত পর্ব্বতসঙ্কুল নরওয়ের আরেক রূপ। দুটি রূপই মনকে সমান টানে। বাংলার দরিদ্র, অসহায়, সর্ব্বরিক্ত চাষী তার পুরণো যন্ত্রপাতি, পুরণো কৃষি পদ্ধতির সাহায্যে শতধাদীর্ণ মাঠে রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চাষ ক'রে চলেছে—তার এক রূপ, আবার সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত রুশিয়ার বিভিন্ন যৌথ কার্য্যের সমষ্টিগত বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রচেষ্টার আর এক রূপ। কোনো রূপই সচল মনের কাছে অপাংক্তেয় নয়।

উপরের ছবিগুলি আঁকলাম শুধু এটা দেখাতে যে কোনো বস্তুই আধুনিক মনের অগ্রাহ্য হতে পারে না। সাহিত্যে সুন্দর ও সর্ব্বজনীন আবেদনপূর্ণ যা কিছু পরিবেশিত হবে তাকেই ক্ষিপ্রতার সহিত লুফে নিতে হবে। রসভোগের ক্ষেত্রে সদর ও অন্দর ব'লে কোনো কথা নেই, কেননা সব উৎকৃষ্ট সাহিত্যেরই সমান কদর ও সমান দর এবং দেশী বিদেশী সব সাহিত্যিকই সহোদর। এটা যেমন নিসর্গশোভার বেলায় সত্য, তেমনি মনোবিশ্লেষণের বেলায় সত্য, তেমনি ভাবের বেলায়ও সত্য। এদের সব কিছুকে জড়িয়েই আধুনিক সাহিত্যরস-পরিবেশনকারী ও সাহিত্যরসভোক্তার বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বত্রগামী অভিযান।

মিঞা-মল্লার

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বিকেল যখন হয়, রোদ যখন নামে নামে হৃতেশনাথ বের হন। কিছুক্ষণ বেড়ান হেদুয়ার ধারে, তারপর সন্ধ্যা নামতেই বাসার দিকে পা বাড়ান। গেট-এর কাছ দিয়ে লনের ভেতর ঢোকেন, ফুলের চাড়াগুলো ছাখেন, তারপর রেডিয়ো খুলে গান শুনতে বসেন।

এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক, ধরাবাঁধা।

কিন্তু আজ বাধা পড়ে গেলো।

দু'টো ছেলে এসে ঢুকলো। হৃতেশনাথ তাদের দিকে তাকালেন। ওরা নমস্কার জানাতেই তাদের বসতে বল্লেন, নিজে সোফায় বসলেন, হাতের বইখানা ছোট্ট টিপয়এর ওপর রাখলেন, শালখানা একটু জড়িয়ে নিলেন, তারপর বল্লেন—আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?

আপনার কাছে আমরা একটা লেখা চাই, একটা গল্প।

হৃতেশনাথ চমকে উঠলেন, যেন অস্বাভাবিক কিছু শুনলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়েছেন, সারা মুখখানায় সাদা সহজ হাসি তুললেন—আমি গল্প লিখি কে বল্লে আপনাদের ?

ছেলেদু'টো পাওনার আশায় আর একটু এগুলো, যেন হৃতেশনাথের এই সহজ সরল হাসিতে কিছু ভরসা পেলো—জানি আপনি লিখতেন।

—আমি লিখতাম। কে বল্লে আপনাদের।

—মনোতোষ বাবু।

—কবি মনোতোষ ?

ওরা ঘাড় নাড়লো।

চুপচাপ রইলেন কিছুক্ষণ, কি যেন ভাবলেন একটু, কি যেন একটু চিন্তা করলেন, তারপর আবার হাসলেন—আমি আগে লিখতাম, এখন আর লিখি না।

ওরা চুপচাপ।

হৃতেশনাথ বল্লেন—লিখি না মানে লিখতে পারি না। গল্প আর আসে না। যদি প্রবন্ধ চান, পড়েশুনে দাঁড় করাতে পারি, কিন্তু গল্প আর আমার দ্বারা হয় না।

ওরা চুপচাপ শোনে।

হৃতেশনাথ ওদের চুপচাপ দেখে একটু থামেন।

ওদের ভিতর একজন বল্লে—তাহলে তাই দেবেন।

হৃতেশনাথ ম্লানভাবে হেসে উঠলেন, যেন ওদের মনটাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন—ওরা খুসী হয় নি।

—আপনারা খুসী হলেন না বোধ হয়। তিনি বল্লেন।

—না, অসুখী হবো কেন। ওরা হাসলো।

—যদি লিখতে পারতুম দিতাম,—এবার আন্তরিক খুসীতে বলেন, মনটাকে উচ্ছ্বাসের আনন্দে দুলিয়ে—আমি বেশ আনন্দ পাই যদি শুনি কেউ সাহিত্য আলোচনা করছে, কেউ লিখছে। কিন্তু নিজে আর লিখতে পারি না, আর লিখি না। আপনাদের ওপর আমার পূর্ণ সদিচ্ছা রইলো, এ ছাড়া আর আমি কি বলতে পারি।

ওরা উঠলো।

হৃতেশনাথ ওদের পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন।

কিন্তু আশ্চর্য। মনটা দুলছে কেন, মনে কি হলো। বসে সিগারেট ধরালেন। লরেন্সের একখানা বই টান দিলেন, তারপর বুজিয়ে রাখলেন। লিখতেন কি? কোনদিন-লিখতেন, কিছুদিন আগে, বছর চারেক আগে। শিলিগুড়িতে যখন থাকতেন, ইন্টারনড্ হোয়ে যখন থাকতেন, কাঞ্চীকে মনে পড়ে এখন। সেই নেপালী মেয়েটি—সেই ছিপ্‌ছিপে, চোখছোট, নাকচাপা, ছিপছিপে মেয়েটি—মনে হয়নি নেপালী—তখন লিখতেন মানে লিখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তারপর হারিয়ে গেলো, নিভে গেলো। ইতিহাস আছে কি তার? ইতিহাস?

সিগারেটে টান দিলেন। মনে হোলো মনোতোষকে একটা ফোন করলে হয়, কেন পাঠালো, আমি মৃত, আমার মৃত আত্মা এখন পরশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, প্রেরণা কই? প্রেরণা? রিসিভারে হাত দিয়ে মনে হোলো, মনোতোষের বাসায় ফোন নেই।

ঘটনা পরিক্রমায় যেন ছন্দপতন হোয়ে গেলো।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখেন, বিকেলের পড়ন্ত রোদের শেষ আভা তখনো ঘন নীল। চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর আনমনেই পা বাড়ান হেতুয়ার দিকে, ঘুরলেন, বেড়ালেন। লনে এসে তেমনি ফুলের চারাগুলো দেখলেন। দেখলেন আকাশে তারা উঠছে, দিন ডুবছে।

মোটরের হর্ন শুনেই বুঝলেন মণিকারা এসেছে, ঘরে গিয়ে বসলেন। বই টান দিলেন। কিন্তু চোখের ওপর কোন অক্ষর নেই যেন, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। মণিকাদের হাসি শুনছেন, বিলিয়ার্ড টেবিলের ঠোকাঠুকি। জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

যদি পিয়ানো বাজাতে পারতেন, মণিকার কথা মনে হোতেই মনে হোয়ে গেলো—যদি পিয়ানো বাজাতে পারতেন, ঘরে বসে বসে সুর তুলতেন।

কিন্তু দুটো ছেলে এসে হঠাৎ বল্লে—আমি গল্প লিখতাম।

মনোতোষ পাঠিয়েছে। কবি মনোতোষ, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানাতোষ। আশা পেয়েছে, ঘর পেয়েছে, জীবন পেয়েছে। মনোতোষ খুসী।

কিন্তু—

মণিকা বিলিয়ার্ড টেবিলে, কিম্বা···

উস্‌খুস্ করে ওঠেন, আমার ঘর কই, সুন্দর বাসা—জীবনের আশা?

চাকরকে ডেকে কফি দিতে বল্লেন। মাথাটা দপ্‌দপ্ করছে, কপাল জ্বল্‌ছে।

দুদিকে দুটো মোম জ্বালিয়া হৃতেশনাথ লিখছেন।

—জানো মনোতোষ, তুমি কবি ছিলে, তুমি কবিতা পড়তে আমি শুনতুম। ভাবতুম, তুমি এত ভাল লেখো কি করে। তোমার যে কথা, তা আমার মনের তন্ত্রীতে এত সাড়া জাগায় কি ভাবে। অনেকদিন ভেবেছি আমি যদি কবিতা লিখি—অনেক চাঁদিনীরাতে ভেবেছি, মর্ম্মরঘন শালবনের ধারে ধারে ঘুড়ে বেরিয়েছি—কিন্তু কবিতা লিখতে পারি নি। তুমি বলতে, আমার ভিতরে প্রতিভা আছে, আমি মনে করতুম ঠাট্টা করছো। তুমি যে ভাল লেখো এটা আমায় বিশেষ করে জানাচ্ছো।

কিন্তু একদিন লেখার প্রেরণা পেয়ে গিয়েছিলুম, তখন আমি শিলিগুড়িতে সরকারের নজরবন্দী হোয়ে শিলিগুড়ির কাছে এক গণ্ডগ্রামে। বিকেলে বেড়াতুম তিস্তার পাড়ে, শালবন দেখতুম, নদীর কলোচ্ছ্বাস শুনতুম, একদিন দেখলুম—দিগন্তের রঙীন আলোর নীচে, প্রথম দিনের সূচনায়, দুধ নিয়ে, আঁচলে রুটি বেঁধে এলো।

—আপনি নতুন এসেছেন?

বেশ পরিষ্কার বাংলা।

—হ্যাঁ, কেন বলো তো।'

—আপনি দুধ নেবেন না?

—কি করে জানলে আমি দুধ নেবো?

—এখানে যারা আসে তারা সবাই নিতো।

বুঝলাম, কারা এখানে আসতো।

—যদি দরকার হয় নেবেন।

—হ্যাঁ, নেবো।

হেসে চলে গেলো। আমি একবার ভাল করে তাকালুম।

থেমে গেলেন হৃতেশনাথ। কি মানে আছে এ জানিয়ে, আমার ব্যক্তিগত মানসিক দ্বন্দ্বের কাহিনী জানিয়ে। চুপচাপ বসে থাকেন। মোম দু'টো পুড়ছে, নিবছে। ড্রয়ারটা টান দিয়ে আর দু'টো মোম বের করে জ্বালাতেও ইচ্ছে করলো না। মোম দু'টো পুড়ছে, নিবছে।

ঘর যদি অন্ধকার হয় এইখানে বসে থাকবেন। চুপচাপ। অনেক রাত কাটিয়েছেন চুপচাপ, না হয় আরও কাটাবেন। সেই শালবন, সেই শিলিগুড়ির ধার, রেল লাইন, পুলিশ ব্যারাক, দার্জিলিং, কাঞ্চি। আবার মনে হয়; আবার উসখুস্ করে ওঠেন।

লিখতেন, কাঞ্চিকে নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। এখনও মনে হয় সেই মেয়ে, সেই স্পষ্ট সরল মেয়ে, যে ঘর গুছাতো, ঘর সাজাতো, নির্ব্বান্ধব পুরীর একমাত্র সহায়ক ছিল। কিন্তু সেইখানে আঘাত পেলেন, জীবনের প্রথম আঘাত—সে সরকারের ভাড়া করা মেয়ে। মনের দিক থেকে আমরা পংগু হোতে পারি, আদর্শের দিক থেকে শ্লথতা আসে। সে সরকারের ভাড়া করা, আশ্চর্য হোয়েছিলেন শুনে। আবার উস্‌খুস করে ওঠেন, ভাবতে ভাবতে মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। Every morning I shall be beaten and I shall begin—জাঁ ক্রিস্তফের কথা, I shall begin again মনে মনে আবার আওড়ালেন—শৃঙ্খল বিশ্বে।

আবার মোম দু'টো জ্বাললেন। লিখবেন তিনি, তিনি প্রেরণা পেয়েছেন আজ; দু'টি ছেলে এসেছিলো, দু'টি ছেলে বহু আশা নিয়ে এসেছিলো কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন। কেন ফিরিয়ে দিলেন, কেন?

কলমটা ধরলেন আবার, কাগজের দিকে চোখ রাখলেন। 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব এক সুরে বাঁধা'। কার কথা, কার কথা যেন!

কিন্তু মণিকার সাথে দেখা। জ্বলজ্বলে চেহারা, তন্বী, ঘন কালো কেশের ঘনতা। ভালবেসেছিলাম। তারপর, তারপর বিয়ে হোলো। একি ভাবছেন, স্বীকারোক্তি? কার কাছে স্বীকারোক্তি?

এবার সুইচ বোর্ডে হাত দিয়ে বোতাম টিপলেন, ঘরে আলো—জমকালো আলো। দোদের স্যাঙ্কো টান দিলেন। স্যাঙ্কো না প্যারাডাইজ লষ্ট, বইখানার জন্যে হাতড়ালেন, খুঁজলেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

মাই প্যারাডাইজ ইজ লষ্ট ফর এভার। ক্লান্তি আস্‌ছে, ঘুম। বেল টিপলেন। এক কাপ কফি। একটু শান্তি যদি খুঁজে পেতেন। একটু শান্তির ধ্বনি যদি শুনতে

পেতেন। কিন্তু কোন ধ্বনি নেই, আর কোন শব্দ নেই জীবনে। সাউণ্ড সত্য না মাইণ্ড সত্য। না দু'টোর একাত্মতা আছে।

কিন্তু শব্দকে ভালবেসেছিলাম, গান ভাষা সাহিত্য, সবচেয়ে শ্রুতিকে। যে'টা বদলায় না, মনুর স্মৃতি বড় না বেদের শ্রুতি বড়। পলিটিক্স্ না ট্রুথ বড়।

তিনি চুপ্‌চাপ্ বসে হাতড়াতে লাগলেন, দর্শনের অধ্যায়, স্মৃতির অধ্যায়। কফি আস্‌তেই আলগোছে হাত বাড়িয়ে চুমুক দিলেন। চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে যেন আশ্চর্য শান্তি পেলেন—মায়ী চলে গেছে। জিগ্যেস করলেন।

—চলে গেছে ;

—মোটঘাট সব ঠিকঠাক উঠেছে।

চাকর ঘাড় নাড়লো।

—তোমার আর রাত করে কি লাভ, যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।

তারপর কানটা এগিয়ে দিলেন। যা লিখেছেন তা দেখলেন, সিগারেটের প্যাকেটের জন্য ড্রয়ার হাতড়ালেন। হঠাৎ চোখে পড়লো বাইরে চাঁদ উঠেছে। শীতের চাঁদ, কলকাতার চাঁদ—মাঝরাতের। গাঢ় ঘুমে নিঃঝুম। আকাশে ঘুম, প্রকৃতিতে ঘুম। গাড়ী চল্‌ছে, মণিকা চলছে। ঘুম নেই এখানে, এই ঘরে—এই নিঃশব্দ ঘরে।

কলম তুল্লেন।

—আমার আশা ছিলো, জীবনের আশা। আমি ফুল ফোটাবো, জীবনের ফুল, ভবিতব্যের ফুল। মানুষের অনুরাগ, আনন্দ ইব বিশ্বের অনুরাগ। ভালবেসেছিলুম পৃথিবীকে প্রকৃতিকে, মানুষকে। আমি জানিয়ে যাবো, বুঝিয়ে যাবো, আমি কি চাই, আমার আত্মা কি গান গায়—কিসের আশায় আমি প্রলুব্ধ। আমি চেয়েছিলাম আশা আকাংক্ষার প্রতীক, আমার জীবনের মডেল, উদ্দীপনার। আমি সৃষ্টিকার, সে সৃষ্টির উপাদান দিক, আমার জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ হোক। বিয়ের রাতে প্রথম যখন বল্লে—তুমি যদি আমায় বেঁধে না রাখো খুব খুসী হ'বো। কথাটায় আমিও খুসী হোয়েছিলাম। দু'জনে বেঁচে উঠি নিজস্ব প্রেরণায়, সৃষ্টির প্রেরণায়, লাইফ ডিভাইংএর প্রেরণায়।

কিন্তু হ'লো না—কত আশা হ'তো, যখন ওকে দেখতাম, যখন ওর হাসি শুনতাম, ফুল-ঝরানো হেমন্তের দিন মনে হতো। কিন্তু হ'লো না!

রাত জেগে জেগে কেন ও বাইরে কাটাতো, আমি একদিন শুনলাম, জানলাম। মানুষের মৃত্যু হয় কি ভাবে তা আমি জানি, তা আমি জানি বলেই আজও আমি পাগল হোয়ে যাই নি। বুঝছি, আমি পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছি। কিন্তু উপায় কি! তুমি বিশ্বাস করবে না, প্রতি রাতে

এ ঘর থেকে শুনতাম ও ঘরে এসেছে, শাড়ী ছাড়লো, আয়নার কাছে দাঁড়ালো, কানের টব খুল্লো, তারপর বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। আর আমি এ ঘরে পড়ার ভান করে রাত কাটিয়েছি। আমি অপ্টিমিষ্ট হোলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু আমি বোধ হয় পেসিমিষ্ট। এখন নিরাশক্তির সাধনা করছি, know thyself এর সাধনা, আত্মানং বিদ্ধির সাধনা। কিন্তু আজ রাতে, তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে—হাসি হাসি মুখ করে আমার সামনে দাঁড়াল, ও শিলং যাবে। আমি চুপ্‌চাপ বসে রইলাম। আমার কাছে আব্দার জানালে—আমি চুপ্‌চাপ বসে রইলাম। এই একটু আগে মোটরে বেরিয়ে চলে গেলো। আমি জানি ও কার সাথে গেলো। প্রথম ভেবেছিলাম, আমি যদি ওকে যেতে না দিই, জোর যদি করি, কি করতে পারে, কি করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পারিনি, ও যদি আমায় ভালবাসতে না পারে আমার দাবী কই ? আমার জীবনে আশা আছে, কিন্তু কোন দাবী নেই !

হৃতেশনাথের কলম হঠাৎ থেমে গেলো। মাথা গুঁজে চুপ্‌চাপ রইলেন। ক্লান্তি লাগছে ক্রমে, ঘুম আস্‌ছে। হাত দিয়ে লেখা কাগজটা মাটিতে ফেলে দিলেন। সমস্ত শরীরটা দু'ল্লো, মাথাটা দু'ল্লো, সিগারেটটা পড়ে গেলো।

তিনি এখন বাতাস চান, বুকের নিঃশ্বাস দূর করবার জন্যে শুধু এক ফোঁটা বাতাস।

"জীবন-পদ্ধতিকে অভিজ্ঞতার রূপ দিয়ে বুঝ্‌তে গেলে তাতে মনন, আবেগ আর ইচ্ছার বিচিত্র দিক আবিষ্কৃত হয়। সংস্কারবশে আমরা যুক্তিসম্মত চিন্তার (মানে ধারণার অনুগামী চিন্তা) সঙ্গে রূপানুগামী চিন্তার (তথাকথিত আবেগের রাজ্য) পার্থক্য তৈরী করে থাকি। সত্যি বল্‌তে কি, বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার স্রোতোধারা অচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য। এই ঐক্যেতেই একটি মননের এবং আরেকটি আবেগের রাজ্য অবস্থিত—হয়ত সেখানে তারা নিজেদের বিশুদ্ধ প্রভায় প্রতিভাত নয়, হয়ত একে অন্যের সঙ্গে তারা জড়িয়েও থাকে। কাজেই তথাকথিত আধ্যাত্মিক জীবনকে জবরদস্তিতে আলাদা করে আবেগ ও মননের সুরক্ষিত দুর্গে বন্দী করবার কোনো মানে নেই—তেমনি চৈতন্য ও অচেতনতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও যৌক্তিকতা প্রভৃতিতে পার্থক্য রচনা করা সম্পূর্ণত ভ্রমাত্মক। এরা বিমূর্ত নামের আলাদা কোনো এলাকার বাসিন্দে নয়। এদের দ্বান্দ্বিক রূপের সমবায়ে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়ে ওঠে।"

—বুখারিন।

সাত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঘের থাবার মত বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলেন বিমলের হাতখানি ; একটু মিষ্টহাসি হেসে গোপেন বাবু বল্লেন---বিখ্যাত লোক হয়েছ এখন—এ্যাঁ ?

একটু কুণ্ঠিত হ'ল বিমল, সে বুঝতে পারলে না গোপেন দা' কি বলতে চাচ্ছেন ; তবে কথার সুরের মধ্যে এবং তাকে গ্রহণের ভঙ্গিতে স্নেহের ভরসা রয়েছে ; তা ছাড়া প্রশংসা বস্তুটাই এমন যে অকুণ্ঠিত গ্রাসে ও বস্তুটিকে গলাধঃকরণ করা যায় না, সমাজ-চলিত রীতির অভ্যাসে---নতুন বউয়ের মত মুখ নামিয়ে রক্তিম মুখে আস্বাদন করতেই হয়। বিমল একটু হেসে মুখ নামালে।

গোপেন দা' বললেন— তুমি তো জান—আমি নাটক নভেল পড়িনা। তোমার লেখা আমি পড়ি নি, তবে লোকে নাম ক'রে, শুনেছি ; কাগজে সমালোচনা পড়েছি। ভারী আনন্দ হয়। হঠাৎ সেদিন একজন আমাকে তোমার একটা লেখা প'ড়ে শোনালেন।

গোপেন দা' সোজা হয়ে বসলেন। কণ্ঠস্বর বেশ একটু উস্কে দেওয়া প্রদীপের শিখার মত প্রখরতর হয়ে উঠল—বললেন—গল্পটা শুনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। গল্পটার নাম আমি ভুলে গেছি। একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পাঠশালা পণ্ডিতের স্ত্রীকে নিয়ে গল্প।

বিমল বললে—হ্যাঁ, 'সারথি' পত্রিকায় বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেদিন তোমায় সামনে পেলে আমি তিরস্কার করতাম।

বিমল চুপ ক'রে রইল।

গোপেন দা' বললেন— আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারও বিমল চুপ ক'রে রইল।

গোপেন দা' বললেন—আমার পাশের বাড়ীতে ঠিক ওই ব্যাপার ঘটে গেল। নিতান্ত দরিদ্র কেরাণী-ভদ্রলোক—যক্ষ্মা হয়েছিল, স্ত্রী দেবীর মত সেবা করছিলেন, হঠাৎ একমাত্র ছেলে তার ধরল ওই রোগ। গোপেন দা' চুপ ক'রে গেলেন—তারপর বললেন—ভদ্রমহিলা যেন পাগল হয়ে গেলেন, সেই রাত্রেই ভদ্রলোকটি মারা গেলেন। আমার সন্দেহ হয়—। গোপেন

দা'র চোখ দুটো ঝকমক ক'রে উঠল—খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—যখন ঘটনাটার কথা মনে হয়—তখনই তোমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে।

এর উত্তরেই বা বিমল কি বলবে ? গোপেন দা বললেন—ওই ব্যাপারেই তোমাকে ডেকেছি। ভদ্রমহিলাটি তাঁর ওই রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিবেশী হয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তা-ছাড়া ভদ্রলোকটিকে বড় ভালবাসতাম আমি।

বিমল অস্বস্তিকর বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে গোপেন দা তাকে ডেকেছেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অরুণার কথা। অরুণাকে নিয়ে সে অকারণে অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি ভোগ করছে। যে জলে ডোবে সে প্রাণের আকুলতায় পাশে যাকে পায় তাকেই আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাকে আশ্রয় ক'রে—তার জীবনও যে যায় তাতে। বাঁচে না কেউ—ডুবে মরে দু জনেই। বিপুল শক্তির অধিকারী যে—সেই তীরে উঠতে পারে বিপন্ন জনকে পিঠে নিয়ে।

গোপেন দা বললেন—তোমাদের গ্রামের শ্রীচন্দ্রবাবু, যিনি বালীগঞ্জেই থাকেন—তাঁর কাছে একবার যেতে হবে তোমাকে। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি আজ।

বিমল এবার আরও বিস্মিত হল। শ্রীচন্দ্রবাবু মস্ত ধনী লোক। নানা ব্যবসায় প্রচুর সম্পদ অর্জ্জন ক'রেছেন। বালীগঞ্জের নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

গোপেন দা বলেই গেলেন—শ্রীচন্দ্রবাবুই এই বাড়ীখানা এবং আশপাশের বাগান বস্তী সব কিনেছেন। বুঝছ তো, সহর বাড়ছে, সস্তায় জমি কিনে ব্যবসা করছেন। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের পৈত্রিক বাড়ীই ছিল, তিনি বিক্রী করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে। কথা ছিল—জায়গাটা ভেঙেচুরে ডেভেলপ করে প্লট ক'রে বিক্রীর সময়—ছোট একটা প্লট এঁদের এমনি দেবেন। দলিলে কিছু নেই অবশ্য।

হাসলেন একটু গোপেন দা'। বিমল প্রশ্ন করলে—এখন বুঝি দিতে চাচ্ছেন না।

গোপেন দা' বললেন—দেওয়া-না-দেওয়ার প্রশ্ন তোলার পথই বন্ধ হয়ে গেছে শুনছি। শ্রীচন্দ্রবাবু নাকি আবার গোটা সম্পত্তিটাই বিক্রী ক'রে দিয়েছেন এক লিমিটেড কোম্পানীকে। তারা নোটিশ দিয়েছে—বাড়ী ভাঙবে তারা, বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

গোপেন দা বললেন—কি ভাবছ ? যেতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

—আপত্তি ? না আপত্তি নয়। তবে ভাবছি গিয়ে ফল হবে না।

—ফল হবে না ? গোপেনদার চোখ দুটি অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই।

শঙ্কিত হয়ে উঠল বিমল। পুরাণে অবশ্য শোনা যায়—মদোদ্ধত স্ফীত কলেবর বিন্ধ্য তপস্বী অগস্ত্য সম্মুখে উপস্থিত হতেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছিল, অগস্ত্য

বলেছিলেন—কোটী কোটী মানুষের আলো ও বায়ুর পথরোধ ক'রে আর মাথা তুলো না; বিন্ধ্য আর মাথা তোলে নাই। কিন্তু এ যুগে সে হবার নয়। না-হ'লে ফল হবে সংঘর্ষ। গোপেনদা কি প্রত্যাখ্যানকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবেন!

বিমল বললে—আপনি যাবেন?

—কেন যাব না? সংসারে লিখিত প্রতিশ্রুতিরই দাম আছে? মুখের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নাই?

—আগে আমি যাই, আপনার নাম আমি করব। শ্রীচন্দ্রবাবু কি বলেন শুনি। তারপর প্রয়োজন হয় তো যাবেন।

একটু চিন্তা ক'রে গোপেনদা' বললেন—বেশ! তা হ'লে কালই খবর দেবে আমাকে।

—তা হ'লে আমি উঠি গোপেনদা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব। মিহির!

পাশের ঘরে মিহির বসেছিল। সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে গোপেনদা' বললেন—চল।

মিহির কুণ্ঠিত হয়ে বললে—এই রাত্রেই যাবেন? কাল দিনের বেলা—

—নাঃ। চল রাত্রেই ভাল। গোপেনদা উঠে দাঁড়ালেন। আলোয়ান খানা তুলে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে বিমলকে বললেন—চল। তারপর হেসে বললেন—এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে রাত্রে কাজ করতে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশী। তবু যেন তুমি পেঁচার সঙ্গে তুলনা করোনা বিমল।

বিমল বললে—আমি তান্ত্রিকের দেশের লোক দাদা। অমাবস্যায় শ্মশানে যাঁরা শক্তির সাধনা করেন তাঁদের কথা আমি না-জানা নই।

মুহূর্ত্তে গোপেনদা'র চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। উষ্ণ হাত দিয়ে বিমলের হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসতেই একটা চীৎকার কানে এল। প্রাণ ফাটিয়ে কেউ যেন কোথাও চীৎকার করছে। সে চীৎকার এত উচ্চ এত তীব্র যে ভাষা বুঝা যায় না। ঢেউ উঠলে যেমন স্রোত বুঝতে পারা যায় না—ঠিক তেমনি ভাবেই গলা ফাটানো বুকফাটানো বিকৃত চীৎকারের ধ্বনির মধ্যে ভাষার রূপ বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

গোপেনদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিহিরকে বললেন—সেই পাগলটা!

রাস্তার বাঁক ঘুরে 'ল্যাণ্ড ফর সেল' সাইনবোর্ড-মারা সেই জায়গাটায় আসতেই চীৎকার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে ক্রমাগত চীৎকার করে চলেছে, —ওরে—। ওরে! ওরে! ওরে। ওরে! ওরে। প্রতিটি চীৎকারের আক্ষেপে লোকটি প্রতিবারই ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, হাঁপাচ্ছে, চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে তবু সে চীৎকারের তার বিরাম নাই।

গোপেনদা তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। ভ্রূক্ষেপ না-ক'রেই সে গোপেনদা'র হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে; তারপর আবার চীৎকার করতে লাগল—ওরে। ওরে!ওরে! ওরে!

গোপেনদা আবার তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—সুরেনবাবু, আসুন। ছি! কি করবেন চীৎকার ক'রে?

পাগল এবার চীৎকার ক'রে উঠল—না—না—না! আমি যাব না!

—না। আসুন। আমার সঙ্গে আসুন। দৃঢ় মুষ্টিতে গোপেনদা তার হাত চেপে ধরলেন।

সহরতলীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করে সহরে এসে ঢুকে পথের ধারের একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন গোপেনদা। পাগলকে বললেন—আসুন একটু চা খাবেন।

খানিকটা পথ এসেই পাগল চুপ করে গিয়েছিল, এখন সে সম্পূর্ণ শান্ত, সে ধীর বিনীত কণ্ঠে বললে—চা খাব? খাওয়াবেন।

—হ্যাঁ। রাত্রি হয়েছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা। তা ছাড়া খান নি তো বোধ হয় কিছু। ক্ষিদে পায় নি?

পাগল হাসলে। বললে—ক্ষিদে তো অভাব মানে না। ওটা যে জীব ধর্ম্ম। জীবন যতদিন আছে—ক্ষিদে ততদিন পাবেই।

—আসুন কিছু খাবেন আসুন।

পাগল বললে—খাওয়ান। দুনিয়াতে যতদিন গরীব আছে ততদিন ধনী আছে। যতদিন দাতা আছে ততদিন ভিখিরী আছে। কর্ত্তা থাকলেই ক্রিয়া থাকবে—ক্রিয়া থাকলেই কর্ম্মও থাকবে সম্প্রদানও থাকবে। খাওয়ান।

বিমল বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল পাগলের কথাবার্ত্তা শুনে। গোপেনদা' ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করলেন—কৌতূহল প্রকাশ করতে।

পাগল চেয়ারে বসল না, দোরের গোড়ায় বসে বগলের পুঁটলী থেকে বের করলে একটা ভাঙ্গা কলাই করা কাপ ও ডিস। বললে—এতেই, এতেই।

দুখানা চপ—এক কাপ চা নিয়ে নিঃশব্দে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে সে খেতে লাগল। গোপেনবাবু বললেন—আপনি খান। আমি চলি।

পাগল কথা বলে উত্তর দিলে না, ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

শীতের রাত্রি। বোধ হয় ন টা বাজে। গত কয়েকদিনের বাদলার জন্য মাটি ভিজে রয়েছে, কনকনে ঠাণ্ডা উঠতে সুরু করেছে। ট্রামে ভিড় কমে এসেছে। পথেও লোক কম। অধিকাংশ বাড়ীর জানালা বন্ধ, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে, দু একখানা বাড়ী থেকে—সঙ্গীত শিক্ষার্থিনীর গান ভেসে আসছে। দু একটা ফাকা প্লটে ব্যাডমিন্টন খেলার আড্ডায় দু পাশে জোর আলো জ্বালিয়ে খেলা চলছে। দু চারখানা মোটর হেডলাইট জ্বালিয়ে খালি রাস্তায় দুরন্ত বেগে চলেছে।

হঠাৎ গোপেন দা' বললেন—কতদূর তোমার বাসা?

—মনোহরপুকুর রোডে। বাসা ঠিক নয়, আশ্রয়। বাস করা চলে কিন্তু যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনোহারিত্ব থাকলে বাসা বলা যায়—তার কিছু নাই। মাসে পাঁচটাকা ভাড়া। হাসলে বিমল।

—না থাক। তার জন্য আক্ষেপ করো না। চল—দেখে যাব তোমার আশ্রয়। ওখানেই ট্রামে উঠব।

এতক্ষণে মিহির বললে—ফেরবার সময় কিন্তু ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে।

—হাঁটব। কষ্ট হবে? মিহিরের দিকে চেয়ে গোপেন দা হেসে প্রশ্ন করলেন।

মিহির হেসে উত্তর দিলে—আপনার কষ্ট হবে। ঠাণ্ডা লাগলে আপনার আঙুলের ব্যথা বাড়বে।

হাতের আঙুলগুলি একবার চোখের সামনে মেলে ধরে মধ্যমাটিকে বার কতক নেড়ে বললেন—লোহার হাতুড়ি দিয়ে ঠুকেছিল, অন্যগুলোতে বেদনা হয় না, শুধু এইটেতে। ডাক্তার বলে—হয় তো বাতে দাঁড়াতে পারে শেষ পর্য্যন্ত! হঠাৎ হাতখানা পকেটেপুরে বললেন—পকেটে পুরলাম।

মিহির হাসলে। গোপেন দা বললেন—না হয় একটু বড়লোকী করা যাবে। একখানা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করা যাবে। কত ভাড়া নেবে খিদিরপুর থেকে?

বিমল এবার প্রশ্ন করলে—খিদিরপুর যাবেন?

হ্যাঁ। ডকের ওয়ার্কার্সদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে। তাদের ওখানে যাব।

হঠাৎ পিছন থেকে কারও ডাক যেন কানে এসে পৌঁছুল—শুনুন, শুনুন, গোপেনবাবু! শুনুন!

গোপেন দা দাঁড়ালেন।

মিহির বললে—পাগল, সুরেনবাবু ডাকছে।

গোপেন দা বললেন—না দাঁড়ালে ও তো সমস্ত রাত্রিই আমাদের খুঁজে বেড়াবে। দাঁড়াও। বিমলের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—খুব সম্ভব কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নি, তাই ছুটে আসছে।

বিমল বললে—বড় বিচিত্র পাগল তো।

গোপেন দা বললেন—শ্রীচন্দ্রবাবুর ওখানে ওকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। লোকটা উন্মাদ পাগল হয়ে গেল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই পাগল হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে দাঁড়াল। বললে—পাগল বলে আমাকে মাফ করবেন—গোপেনবাবু। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনি আমাকে খাওয়ালেন, না-হলে—। পাগল হাসলে, হেসে বললে—না জুটলে না খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি বলুন, কিন্তু বড় কষ্ট হয়, জীবাত্মা কেন পরমাত্মাও কাঁদেন।

পাগল ফিরল। শ্রান্ত মন্থর পদক্ষেপে বিয়োগান্ত রহস্যের মত ফিরে চলে গেল। গোপেন দা' বললেন, যে জমিটার কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল ও, ওইখানেই ওর বাড়ী ছিল। একতলা পুরানো বাড়ী। বাড়ীখানা ভেঙে ফেলেছেন শ্রীচন্দ্রবাবু। ভদ্রলোক ছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক প্রকৃতির—সন্ন্যাসীর মত। সাধন ভজন করতেন। স্ত্রীর নামে বাড়ী জমি সব লিখে দিয়েছিলেন। বাড়ীতেও থাকতেন না। তীর্থে যেতেন। এখানে থাকলেও কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বর যেতেন, দশদিন পাঁচদিন পর একদিন বাড়ী ফিরতেন। ওঁর স্ত্রী খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে বাড়ী আর জমি সব বিক্রী ক'রে দিলে শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভদ্রলোক খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তখন বাড়ী বিক্রী করে স্ত্রী চলে গেছে। ভদ্রলোকের বৈরাগ্য ছুটে গেল। বাড়ীর চারদিকে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগলেন। তারপর যে দিন ওঁর পুরানো বাড়ীখানা ভাঙতে সুরু করলে—সে দিনই ঠিক ওই—ওরে ওরে বলে বুক চাপড়ে গিয়ে পড়লেন—বাড়ী তিনি ভাঙতে দেবেন না। ওরা জোর করে ঠেলে ফেলে দিলে, অজ্ঞান হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। রাস্তার ধারে পড়ে রইলেন। জ্ঞান হয়েও চীৎকার করতে লাগলেন—ওরে—ওরে—ওরে -ওরে!

দম নেবার জন্যেই থামলেন গোপেন দা। বিমলের হঠাৎ মনে হল—সে যেন দূরে একটা চীৎকার শুনতে পাচ্ছে—মনে হল পাগল চীৎকার করছে—ওরে—ওরে—ওরে—ওরে!

গোপেন দা বললেন—ঈশ্বরকে ভুলে গেছে পাগল, এখন এই পাড়াতেই থাকে, মধ্যে মধ্যে ওই জায়গাটার সামনে যায়, দাঁড়িয়ে ঠিক ওই ভাবে বুক ফাটিয়ে চীৎকার করতে থাকে, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে নিজেই একসময় থামে, কিম্বা আমারই মত কেউ ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গাটা চোখের অন্তরাল হলেই থেমে যায় বেচারী। এ ছাড়া আর পাগলামী নাই। এমনি সহজ কথাবার্ত্তা, যেমন বিনয় তেমনি ভাষা তেমনি কর্ত্তব্যজ্ঞান। দেখলে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে গেছে—যেই মনে হয়েছে অমনি ছুটে এসেছে। যদি দেখা না পেতো তবে আমার সন্ধানে ঘুরেই বেড়াতো। অথবা আমি কখন ফিরব সেই প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকত ওই মোড়ে।

আবার একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন—ওই ভদ্রমহিলার জন্যে আমি এতখানি হয় তো করতাম না, কিন্তু এই সুরেনবাবুর অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। না-হলে—।

বিমল বলে—এই মোড়ের থেকে ডাইনে—

—হ্যাঁ, এই তো মনোহরপুকুর রোড। চল-চল বাসা পর্য্যন্ত যাব তোমার।

* * * * *

বাসার প্যাসেজের মুখে হঠাৎ বিমলের মনে হল কালীনাথের কথা। সে বললে—দাঁড়ান দাদা।

—কেন? কি ব্যাপার?

—বলছি। আসছি আমি। হন হন করে এগিয়ে গেল সে। কালীনাথ চলে গেছে, ঘরের তালা বন্ধ। চাবী চিত্তর কাছে। সে বেরিয়ে এসে বললে—দাঁড়ান চাবীটা নিয়ে আসি।

মিহির বললে—আজ থাক বিমলবাবু। অনেক দেরী হয়ে যাবে। বসলে গোপেন দা গল্পই করবেন।

হা—হা করে হেসে উঠলেন গোপেন দা। হেসে বললেন—ওরে সয়তান—আমি বুঝি গল্পই করি! না—না, বিমল চাবী আন তুমি।

বিমল বুঝলে গোপেন দা'র অভিপ্রায়, সম্ভবতঃ সে ক্ষুণ্ণ হবে বলেই গোপেন দা দেরী হওয়ার যুক্তিটা উপেক্ষা করেও তার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে চাচ্ছেন। সে বললে—না—গোপেন দা, মিহিরবাবু সত্যিই বলেছেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে আপনার। আজ থাক।

—থাকবে?

হ্যাঁ, অন্যদিন আসবেন। সেদিন—আপনাকে কিছু খাওয়াব। গল্প করব। চলুন আজ আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

—চল। তবে কথা রইল, খাওয়াবে। আচ্ছা কালই আসব আমি। তোমার তো শ্রীচন্দ্রবাবুর কথা নিয়ে আমার ওখানে যাওয়ার কথা। তোমায় যেতে হবে না, আমিই আসব। মিহির, মনে ক'রে দিয়ো।

মোড় পর্য্যন্ত এসে গোপেন দা' দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি বুঝিয়ে বলো শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভাল করে বুঝিয়ে বলো।

বিমল কোন উত্তর দিলে না, মিহির বললে—এ আপনাদের মিথ্যে চেষ্টা হবে গোপেন দা'। কোন ফল হবে না। আমি জানি, এদের আমি জানি।

গোপেন দা বললেন—জানি; তোরা হয় তো এদের জানিস, আমি জানি—এই সভ্যতারই এই নিয়ম। এ নিয়ম মানে আইনের কথা বলছি—সে তো শ্রীচন্দ্রবাবুরা

করে নি, করেছে গভর্ণমেণ্ট। কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট জমি এ্যাকোয়ার করে তাকে ডেভেলপ করে চড়া দামে বিক্রী করছে। সহর বাড়ছে, বাড়বে, সহরের এই ধর্ম্ম। বন কেটে সহর বাড়ছে, সমুদ্রের গর্ভপূর্ণ করে সহর বাড়ছে, বম্বেতে মেরিন ড্রাইভ তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। আবার দরিদ্র মানুষের বসতি কৃষিক্ষেত্র ভেঙে সহর বাড়ছে। কিন্তু—

সশব্দে একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গোপেন দা বললেন—আচ্ছা কাল আসব।

ট্রামে চড়ে বসলেন গোপেন দা ও মিহির। বিমল ফিরল। প্রচণ্ড শব্দ ক'রে একখানা লরী আসছে। স'রে দাঁড়াল বিমল। বড় বড় লোহার বীম বোঝাই নিয়ে চলেছে লরীখানা। গতির ঝাঁকানিতে লোহাগুলো সশব্দে নড়ছে সেই জন্য এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। বাড়ী তৈরী হবে, লোহার কড়ি চলল। মহানগরী প্রসারিত হচ্ছে। বন জঙ্গলে ঘেরা দরিদ্রের পল্লীভবন ভেঙ্গে তৈরী হবে দীপমালায় উজ্জ্বল—আরামের উপকরণ-সমৃদ্ধ- শ্রী সম্পদে ঝলমল পুরী।

চীৎকার করছে—কে? চমকে উঠল বিমল! ওরে! ওরে! ওরে!

না। সে চীৎকার তো নয়। কেউ দুরন্ত ক্রোধে চীৎকার করছে। কিন্তু ওই ওরে-ওরে চীৎকার হ'লেই যেন বিমল আনন্দ পেত'। হ্যাঁ আনন্দই পেত'। এ আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। বিমলের মত মন না-হলে সে আনন্দ অনুভব করা যায় না।

হৈ—হৈ চীৎকার উঠছে। কি হ'ল? বিমল চমকে উঠল এবার। কেউ যেন ছুটে আসছে।...... ছুটে চলে গেল একটা লোক। তার পিছনে বিশ পঁচিশ জন লোক ছুটেছে। খুন—খুন। ছোরা মেরেছে। ছোরা!

মহানগরীর রাত্রি। এমন একটি রাত্রিও বোধ হয় মহানগরীর ইতিহাসে নাই যেদিন মানুষের দেহের তাজা রক্ত মাটির বুকে না পড়ে।

চাবী নেবার জন্য সে চিত্তর ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল। চিত্তর ডিপোতেই লোক জমে রয়েছে।

—কি ব্যাপার চিত্ত? খুন?

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—বেঁচে গেছে। হাত দিয়ে আটকেছিল—হাতে লেগেছে। লাবণ্য দি'র বাড়ীতে আসে এক ছোকরা, ছবি আঁকে, পাগলাটে ধরণ, অতি গো বেচারা লোক, বেঁচে গেছে খুব।

এবার নজরে পড়ল, সেই শিল্পী পিনাকী বসে আছে হাতখানা ধরে, একজন তুলো দিয়ে বাঁধছে।

(ক্রমশঃ)

খুকী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বৌবাজার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট দেখা শেষ করে বসুধা যখন রাস্তায় নামল ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বাজে। চৈত্র মাস। রৌদ্রে চড়চড় করছে পৃথিবী। নীল নিস্পন্দ আকাশের দিকে একবার চেয়ে বসুধা রুমাল দিয়ে কপাল মুছল। গাল ও গলার ভাঁজে পাউডার ও ঘাম একসঙ্গে মিশে কেমন কাদার মতো প্যাচপ্যাচ করছে টের পেয়েও সেসব মুছে ফেলে নতুন ক'রে সে আর পাউডার বুলোতে চেষ্টা করল না। আর তো সে এখন কোথাও যাচ্ছে না। এখন বাড়ি। ঠোঁট দু'টো কেমন শুকিয়ে ওঠেছে। তৃষ্ণা অনুভব করল বসুধা। শেয়ালদার মোড় থেকে দু'টো কমলানেবু কিনে নিয়ে এবার সোজা সে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামে চেপে বসল।

আজ সে এদিকে এসেছিল খুকীর (বসুধার মেয়ে মণিমালা) জন্যে একটা অর্গ্যান কিনতে। পুরানো, যেমন তেমন একটি হলেও কাজ চলে যায়। মণিমালা শিখবে শুধু। বসুধা দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত। হারমোনিয়ম আছে যদিও কিন্তু হাতফেরতা একটা যন্ত্রের জন্যে ওরা যত দর হাঁকল বা এমন যে দর হাঁকতে পারে বসুধা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। তাই সে ঠিক করল কাল যাবে, কি আজ বিকেলেও ও একবার যেতে পারে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের সেই দোকানটায়। চেষ্টা করলে কি আর এই টাকার মধ্যে সে একটা অর্গ্যান পাবে না। খুব পাবে। খুকীর একটা না হ'লে চলছে না।

এসব ভাবল সে ট্রামে ব'সে। আর ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির রাস্তায় ঢুকবার আগে বসুধার আরও দু'তিনটা কাজের কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য সবগুলি কাজই সে সম্পন্ন করে, করবার জন্যেই সেই সকাল ছ'টায় একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ও। কেবল আজ বলে নয়, রোজই এমন বেরোতে হচ্ছে। এমন কেউ নেই যে বসুধার হয়ে বসুধার নিজের এবং খুকীর এতসব কাজ রোজ রোজ করে দেবে। সংসারের কে কা'র দিকে তাকায়। আর কেউ করলেও, বলতে কি, বসুধার তো পছন্দ হয়ই না, মণিমালারও মন ওঠে না। সেদিন কা'কে দিয়ে একটা কোল্ড্ ক্রীম আনিয়েছিল সে। সেই ক্রীম খুকী আজ অবধি ছোঁয়নি, তেমনি পড়ে আছে। বসুধা নিজে আর একটা মানে আর এক রকম ক্রীম এনে দিয়েছে তো মেয়ের মন ওঠেছে, মুখে মেখেছে সেই জিনিস। আশ্চর্য।

আশ্চর্য, বসুধা অনেক সময় ভাবে, মা'র পছন্দ, মা'র ভাল লাগা না লাগার সঙ্গে ওর পছন্দ অপছন্দের এত মিল কি ক'রে হল, কেন হ'ল। যেন দিন দিনই বাড়ছে এটা।

না কি বসুধাও মনে-প্রাণে চাইছিল তাই।

সতেরো বছর ধ'রে এই ইচ্ছাই লালন ক'রে এসেছে ও। মা'র মতো হোক মেয়ে। মা যা পছন্দ করবে মেয়েও তাই করুক।

ভাবতে বসুধার ভালই লাগল। ডাইং ক্লিনিং-এ ঢুকে নিজের শাড়ী শায়া বাছবার আগে বসুধা দেখে নিলে খুকীর সব ক'টা ঠিক আছে কিনা। তিনটে শাড়ী ব্লাউজ চারখানা রুমাল দু'টো। একটা বেড-কভার। তারপর একসঙ্গে সবগুলো গুণে বিল চুকিয়ে বসুধা বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

ঢুকল পাশের মণিহারী দোকানে। একটা চিরুনি। বসুধার নিজের যেটা আছে চায়না সে, মেয়ে সেটা ব্যবহার করুক।

ওর আলাদা একটা থাকা দরকার।

আলাদা সব কিছুই বসুধা ক'রে দিয়েছে খুকীর জন্যে। আলাদা সাবানের বাক্স, তোয়ালে, তেল, আয়না। পর্যন্ত আলাদা একটি বিছানা, ওর টেবিল, ওর বসবার ছোট্ট একটি সোফা।

ঘর। আলাদা একটি ঘরের দরকার খুকীর। সেটা অবশ্য আর এখন সম্ভব না। বাড়ির-দুর্মূল্যের বাজারে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া, যে ঘরে ওরা আছে মা মেয়ে সেই ঘরের সবটাই কি এখন খুকীর নয়! কে আছে, ও ছাড়া, কে আর আছে বসুধার আপন বলতে। এই ঘরের সর্বত্র বসুধা দেখতে চায় খুকী হাঁটছে খুকী বসে আছে পড়ছে কথা কইছে ঘুমিয়ে আছে চুপচাপ।

খুকীই যদি এ ঘরে না রইল ঘর দিয়ে বসুধা করবে কি। খুকী-ছাড়া ওর ঘর। চিরুনির দাম মিটিয়ে দিয়ে বসুধা আস্তে আস্তে নামল রাস্তায়।

এবং রাস্তা পার হয়ে বাড়ির সদরের কাছে এসে, বসুধা ঠিক যা ভেবে রেখেছিল, দেখল চৌকাঠের ওপারে চেয়ার বিছিয়ে ভবানী উকিল ব'সে আছেন। চেয়ে আছেন হা ক'রে রাস্তার দিকে। অর্থাৎ বাজার করে বাড়ি ফিরবে বসুধা এখন। এখান দিয়েই সিঁড়িতে ওঠবে। তাই কি। বসুধা ঠোঁট টিপে হাসল অথবা হাসি গোপন করবার জন্যে ঠোঁট টিপল একটু।

'এই যে মিসেস চক্রবর্তী, কদ্দূর!'

দেখা হলেই ভবানী দাস ডাকাডাকি করেন চিৎকার ক'রে। ঘাড় তুলে ডান হাতের কাপড়ের বাণ্ডিল বাঁ হাতে নিয়ে মিসেস চক্রবর্তী মানে বসুধা ভবানীর চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার।'

'জিজ্ঞেস করছিলাম এই রৌদ্রে কোথায় ঘুরে এলেন?'

'অনেক জায়গায় আমায় হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে মিঃ দাস।'

'সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।' মিঃ দাস বসুধার মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে ওর হাতের জিনিষগুলো দেখতে থাকেন।

মেয়ের জন্যে সওদা করে আনা হয়েছে বুঝি! মেয়ের ধোবাবাড়ির কাপড়? বলে ভবানী ভ্রূ কুঞ্চিত করেন।

বসুধা মাথা নাড়ল।

ভবানী দাসও নীরব।

অর্থাৎ ভবানীবাবু বুঝেছেন বসুধাকে কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বসুধা ভবানীর মনের কথা টের পায়। ভবানী ভাবছেন এই সেদিন জ্বর থেকে উঠেই বসুধা আবার বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বসুধার জ্বর হয়েছিল। কথাটা শুধু ভবানী দাস কেন, দোতলায় যতগুলি ফ্ল্যাট আছে, এবং নিচে, তার সব ক'টির বাসিন্দাই ভাল করে জানে।

তারা কেবল দেখছে অবাক হয়ে কত পরিশ্রম করতে জানে এই মেয়ে। নগেন ডাক্তারের স্ত্রী।

মরবার সময় ডাক্তারবাবু একটি হাজার টাকাও রেখে যায়নি।

একলা হাতে বসুধা মেয়েকে মানুষ করছে।

নুয়ে পড়েনি, ভাঙেনি।

এ বাড়িতে কতো পুরুষ আছে একটা সংসার চালাতেই হিমসিম খাচ্ছে।

শিথিলতা দুর্বলতার চিহ্ন দেখবে দূরে থাক, যেন তারা দেখছে দ্বিগুণ উৎসাহ বসুধার। অনেকের চেয়েই পরিপাটী, সুন্দর করে সংসার চালানো তো ঠিকই, বলতে গেলে সাজিয়ে রেখেছে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে, মেয়ের স্বাস্থ্য দেখছে, দেখছে মেয়ের সকলদিকের সকলরকমের দীপ্তি স্ফূর্ত্তি। ত্রুটি নেই একচুল।

আর যতো বেশি অবাক হচ্ছে ততো যেন সহানুভূতি বেড়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির অনেকের। বসুধা টের পায়। এই যেমন নিচের ভবানীবাবু। ওপরের সতীশবাবু। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের তারিণীবাবু। কুশল রায়, হেম নাহা। এঁরা বৃদ্ধ। বিরলকেশ স্খলিতদন্ত। কেউ সরকারী চাকরি থেকে পেন্সন নিয়েছেন, কেউ বা ওকালতি প্র্যাক্‌টিস্ করা ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলেরা রোজগার করছে, নাতীরা বড়ো হচ্ছে।

সাদা, চাঁদের ফালির মতো চিলতে কপালের ওপর আর একবার নীল ছোট্ট রুমাল-খানা বুলিয়ে নিলে বসুধা। ভবানীর মাথার পক্ক অপক্ক চুলগুলি দেখতে দেখতে ছলাৎ করে একটা কথা ওর মনে পড়ে গেছে। নগেন ডাক্তার বেঁচে থাকলে একদিন এমন হত দেখতে? তাই কি!

কিন্তু বসুধার নিটোল পরিচ্ছন্ন হাসিতে সে কথা ফুটল কই।

সে কথা ওর মনে নেই।

তার মনে ভিড় করে আছে এখনকার কথা, আজকের সমস্যা।

'শরীরটাকে অত অবহেলা করবেন না।' ভবানী দাস গম্ভীর হয়ে বললেন।

'আমার তো আর কেউ নেই।' বসুধা মাটির দিকে চেয়ে উত্তর করল, 'সব দিক একলা আমাকেই দেখতে হচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি।' নিরুপায় ভবানী উকিল যেন এর বেশি কিছু বলতে পারল না। এর বেশি কেউ বলে না। ভাবল বসুধা, তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে লাগল ওপরে।

দোতলার বারান্দায় হেম নাহা বসে। মস্ত শরীর মার্কিনে মুড়ে নিয়ে চুল কাটছেন নাপিত ডাকিয়ে।

শরীর ঘোরাতে না পারলেও মাথা ঈষৎ কাৎ করে হেম নাহা আড়চোখে দেখেই চিনলেন কে।

'মেয়ের জন্যে মাখনের কৌটো আনলেন বুঝি? হরলিকস? দ্বারিকের সন্দেশ?'

'ধোবাবাড়ির কাপড়।' অল্প হাসল বসুধা এবং এখানেও তাকে একটু দাঁড়াতে হল।

'অই একই কথা।' গম্ভীর গলার স্বর হেম নাহার। এবং বসুধা যা ভাবছিল, ভেবে তার বুকের ভিতর ঢুব্ ঢুব করছিল, হেমবাবু ঠিক তাই বললেন, 'এতো পরিশ্রম করলে আপনার শরীর টিকবে কেন।'

মসৃণ সুগৌর ঘাড়ের সুসংবদ্ধ শক্ত পেশীগুলি হলদে রং ধরে ঢিলে থলথলে হয়ে গেছে হেমবাবুর। বসুধা লক্ষ্য করল। রিটায়ার্ড মুন্সেফ। এই ফ্ল্যাট বাড়ীতেই জীবন কাটালেন। আরো কতদিন এমন কাটবে বসুধা ঠিক সে কথাই এখন ভাবতে পারত, আশ্চর্য সে ভাবনার ধার দিয়েই ও গেলনা। সেকথা বসুধার মনেই হয়নি।

বরং ক্লান্ত কুণ্ঠিতের হাসি হেসে, আস্তে আস্তে বলল, 'কি করব, আমি যে—'

বসুধা একলা। মাথা নত করে হেম নাহাও যেন তাই ভাবতে থাকেন। আর তার অসহায়তায়, তার অমানুষিক পরিশ্রমে বিচলিত বিক্ষত মন নিয়ে এ বাড়ীর আরো ক'জন বুড়ো মানুষ এমনভাবে চুপচাপ বসে আছেন তার হিসাব কষতে কষতে বসুধা এগিয়ে চলল নিজের ঘরের দিকে।

কুশল রায় নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতরে এখন মধ্যাহ্ণ-ভোজনে রত। তাঁর বসবার ঘর শূন্য দেখে বসুধা আন্দাজ করল। এখানেও ওকে একটু সময় দাঁড়াতে হ'ত বৈকি। 'এতো বেলায়, এমন অবেলায় কোথা থেকে ঘুরে আসা হ'ল?' যেন অপরাধ করেছে বসুধা। 'এই গরমে রোদে কী যাচ্ছেতাই হয়েছে চেহারা, ছাখো।' ভদ্রলোক হা হা

ক'রে চেয়ার ছেড়ে ছুটে আসতেন ঘরের দরজায়। আর বসুধা দেখত অভিযোগ ও অনুযোগের তিক্ত বিরক্ত সব রেখা ডক্টর রায়ের শান্ত প্রসন্ন মুখে জেগে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ অস্বস্তি তাঁর ছানিপড়া চোখ দুটোতে প্রকট ও প্রখর হয়ে আছে।

হ্যাঁ, এমন বিচলিত হয়ে পড়েন এরা।

কিন্তু কুশল রায় সেখানেই থামতেন কি।

'মেয়ে বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, একটা পাশ পর্যন্ত করল। এবার ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিন, মিসেস চক্রবর্ত্তী, আর কত !'

অর্থাৎ নিচের ভবানীবাবু যেমন একটা ইঙ্গিত ক'রেই ক্ষান্ত হন, হেমমুন্সেফ সরাসরি ব'লে ফেলেন, সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেন। 'আর কত,—মেয়ের জন্যে আর কত করবেন, মিসেস চক্রবর্ত্তী !'

এবং এই কথার উত্তরে বসুধার বলার কিছু থাকে কি ! নির্মল হেসে কৃতজ্ঞ চোখে প্রবীণ সবজজের উদ্বিগ্ন রেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বসুধা তাঁর উপদেশটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে বটে, অন্ততঃ মুখের ভাবে তখনকার জন্যে তাই ওকে করতে হয়। তারপর আস্তে আস্তে সরে যায়।

ভাবতে ভাবতে বসুধা কুশল সবজজের ফ্ল্যাটও পার হয়। এঁরা দেখছেন বসুধাকে। বসুধা দেখছে মেয়েকে। একি সত্যি অদ্ভুত নয়! না কি ডাক্তার বেঁচে থাকলে এই-ই করত ! বসুধা রৌদ্রে গরমে ঘুরে এলে এমন ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে ছট্‌ফট আরম্ভ ক'রে দিত !

এঁরা কি বোঝেনা বসুধার এতো ছুটোছুটি, দিনরাত এই পরিশ্রম, শরীর না সারতে শরীরের ওপর এমন ধকল বিনা কারণে নয়! নিজের শরীর ক্ষয় ক'রে নিজেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে যে আর একটি শরীর গড়ছে,—একদিকের খরচ দিয়ে অন্যদিকে সঞ্চয়। আর—

বারান্দার বাঁক ঘুরতে তারিণী নন্দীর ঘরের দরজা। বসুধার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তারিণীবাবুকে দেখলে খুশি হ'ত এবং হেমবাবু বা কুশলরায়ের সঙ্গে যেভাবে সে কথা বলে এসেছে, যেভাবে উত্তর দিয়েছে তাঁদের স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গতি রেখে অল্প একটু হেসে, একটু লজ্জিত হয়ে,—বসুধা এখানেও ঠিক সেভাবেই দুটি কথা শোনা ও দুটি কথা বলার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল। তারিণী নেই। স্বয়ং তারিণীগিন্নী দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠ ধ'রে। যেন বৈঠকখানা ঝাড়পোছ করছে, কোমরে আঁচল জড়ানো, স্ফীত বিশাল দেহ বেয়ে ঘামের স্রোত বইছে অনর্গল।

বসুধা চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারিণীগিন্নী কদর্যরকম মোটা হয়ে গেছে বা কুৎসিৎ ভাবে ঘেমে উঠেছে ব'লে নয়, ভদ্রমহিলা এমন সাংঘাতিক কটমট ক'রে বসুধার দিকে

তাকায়, বসুধা যখন এই বারন্দা পার হয়ে তেতলার সিঁড়িতে ওঠে বা নিচে নামে, যার কোন অর্থ হয়না। কি কারণ।

অথচ,—না, কেবল এই মহিলাটির কথা নয়, ব্যাপকভাবে এ-বাড়ীর প্রায় সবকজন মহিলার কথাই বসুধার মনে হয় এই সঙ্গে। কাল বিকেলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেমবাবুর স্ত্রী বসুধার সঙ্গে চোখাচোখি হতে এমনভাবে ঠোঁট বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকলো কেন। হ্যাঁ, এই কুশল রায়, যিনি বসুধাকে দেখলে উত্তাল ও অস্থির হয়ে পড়েন তাঁর ঘরের মানুষটিরও সেই রোগ আছে। বসুধা যেন ভূতের ছায়া। সেদিন ও যখন ডক্টর রায়ের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন রায়গিন্নী দরাম ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। একি ছেলেমানুষী নয়। বসুধা মনে মনে হেসেছে। এর কী অর্থ থাকতে পারে। বসুধা তোমাদের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সত্যি বলতে কি, এদের পুরুষরা যেচে, বলতে গেলে গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে কথা বলে, তাই বসুধাও একটা দুটো কথা কয়। একসঙ্গে একবাড়ীতে থেকে আজ অবধি, বসুধা কারো ঘরেই যায়নি। দরকার কি। সে আছে তার নিজের ভাবে। তাই, এদের,—এই গিন্নীদের এক এক সময় বসুধার ডেকে বলতে ইচ্ছে হয় ভদ্রতা গায়ে লেখা থাকে না, তোমরা যদি অভদ্র হও অসুন্দর হ'ও তাতে বসুধার কিছু যায় আসে না।

না কি বসুধার মেয়ে এ-বাড়ীর আর পাঁচটি মেয়ের চেয়ে সুন্দর এই ঈর্ষা! খুকীর মতো গায়ের রং, নাক, চোখ কেউ পায়নি আর সতেরো বছর বয়সে কেউ পাশও দিতে পারেনি তাই এবাড়ীর আর সব মেয়ের মায়েদের মন খারাপ? মেয়েদের মন। বাঁ হাত থেকে কাপড়ের বাণ্ডিলটা ডান হাতে নিয়ে বসুধা আস্তে আস্তে কুশল রায়ের বৈঠকখানাও পার হ'ল।

খুকীর মতো এমন গলা নেই কোনো মেয়ের। গান শেখার ধুম তো শোনা যাচ্ছে ঘরে ঘরে। ভাবল বসুধা।

কী আছে খুকীর সঙ্গে তুলনা করলে এ-বাড়ীর ডলি মিলি লোটন বাসন্তী হেনা সুধার? না তিনতলার চাকোর চামেলীর?

যে-শাড়ী পরবে সেই শাড়ীই মানায় খুকীকে। খুকীর মতো বেণী হয়না কারো। চুলই বা আছে কোন্ মেয়ের মাথায় কতো। বেণী বাঁধবে! ভেবে বসুধা নিজের মনে হাসল।

সত্যি, এ-বাড়ীর সব মেয়েকেই বসুধার চোখে এমন কুৎসিৎ ঠেকে। মায়েরা যদি জানতো বসুধার মনের কথা!

না কি বসুধা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থেকে ডাক্তারের মৃত্যুর পরও নিজে রোজগার ক'রে ছিমছাম ছোট্ট ওর সংসারটি চালাচ্ছে, অভাব নেই হায়হুতাশ নেই এবাজারেও—তাই সকলের ক্ষোভ।

কিভাবে সংসার চালাচ্ছে কী করছে বসুধা সকলের মনে এই প্রশ্ন? সন্দেহ? কেমন চাকরি তার কৌতূহল! মেয়েমানুষ চাকরি করে!

নিশ্চয়ই, বসুধা সকলের চেয়ে ভাল খায়। ডাক্তার থাকতে যদি একতলায় ছিল ওরা, এখন মা মেয়ে উঠে গেছে তেতলার সবচেয়ে ভাল ফ্ল্যাটে। রেডিও এনেছে, পাখা খাটিয়েছে ঘরে। ঘরে সে ফুল রাখে, ফার্নিচার করছে কিছু কিছু।

জজ মুন্সেফ, এবাড়ীর উকিল অধ্যাপকরাও যা পারছে না।

তাঁদের স্ত্রীদের কাছে বসুধা একটা খট্‌কা বৈকি! অনিয়ম। অবাঞ্ছিত।

বসুধা বড় একটা গ্রাহ্য করে কিনা ওদের চাওয়া আর না চাওয়া! তিনতলার সব ক'টা সিঁড়ি শেষ করে ওপরের রৌদ্র ফুরফুরে খোলা পরিচ্ছন্ন বারান্দায় উঠে এল ও। মনে মনে বলল, বাঁচলাম! আর একটা কথা মনে করে বসুধা শূন্যের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। যদি এই তোমাদের মনের ভাব, তোমরা গিন্নীদের, কর্তাদেরও কেন নিষেধ করে দাওনা বসুধার সঙ্গে কথা কওয়া দিন কতক বন্ধ রাখুক। বসুধার দুঃখ নেই তাতে।

বসুধা দুঃখ পাবে যদি হেমবাবু তাকে দেখেই চুপ করে থাকেন?

বুড়ো ভবানী দাস যদি আর না তাকান?

কুশলরায় বসুধার স্বাস্থ্য নিয়ে এতটা শঙ্কিত না হন? -সাদা স্বল্প-চুলযুক্ত কয়েকটি মাথা আর কুটিল ঈর্ষান্বিত মেদবহুল কতগুলি মুখ বসুধার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কোনোপক্ষে নেই, বসুধা মনে মনে বলল, সিঁড়িগুলি দিয়ে যখন সে ওঠা নামা করে তখন, তখনই শুধু একপক্ষের সহানুভূতি দেখে সুন্দর করে হাসে ও, সরল স্বাভাবিক নিয়মে সংসারাসক্ত প্রবীণদের সমবেদনার মূল্য দেয় সংক্ষেপে একটি দু'টি কথা বলে—যা উচিত, শোভন, আর এতেই যদি এঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। বাইরে গেলে বা যতক্ষণ নিজের ঘরে থাকে সবগুলি মুখ কি সে ভুলে থাকে না! তেমনি এবাড়ীর প্রবীণদের ঈর্ষায় কণ্টকিত সন্দেহে শীর্ণ চাউনি কতক্ষণ মনে থাকে বসুধার। কতক্ষণ মনে রাখে ও। কী তার মূল্য! পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে নিজের দক্ষিণ-খোলা ঘরের কাছে এসে ঘরের দরজা জানালায় নিজের হাতে খাটানো নীল নতুন পর্দাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে এসব কি ও এখুনি ভুলে গেল না! বসুধা আবার হাসল। দেখতে দেখতে ওর খুকী কতো বড় হয়ে গেছে!

খুকী বাড়ছে খুব তাড়াতাড়ি, হঠাৎ মনে হল বসুধার। গতবছরের সোয়েটার এবার শীতে মেয়ে গায়ে দিতে পারল না। এবং নতুন একটা কিনতে হয়েছে। এসব বিষয়ে বসুধার কার্পণ্য নেই। যখন যা দরকার,—নিজে গিয়ে দেখে কিনে আনছে। কিন্তু একটা জিনিস সে আজও কোনো দোকানে খুঁজে পেলে না। বসুধা যে-ঘাসের চটিটা পরছে খুকী

চেয়েছিল ঠিক সেরকম চটি। ওর খুব পছন্দ ওরকম চটি। মাঝখান একটি করে ঘাসফুল।

আশ্চর্য, মার যা ভাল লাগে মেয়ের ঠিক তা-ই কেন ভাল লেগে যায়। সব মেয়েরই কি এমন হয়!

দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বসুধা এ-বাড়ীর সব মেয়ের মুখ আর মণিমালার মুখ একসঙ্গে তুলনা করল।

বসুধার দুই ভুরুর মাঝখানে গোপন মৃদু জিজ্ঞাসা। মধুর উষ্ণ পরিতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সারা মনে।

কেন এমন হয়, কেন এমন হল মণিমালা।

ঘরে ঢুকে হাত থেকে খুকীর কাপড়গুলো নামিয়ে ও রাখল খুকীর টেবিলের পাশে। নতুন চিরুনিটা রাখল খুকীর আয়নার সামনে। মেয়ে ঘরে নেই। বাথরুমে গেছে। জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে বসুধা তাই আন্দাজ করল।

তাই খুকীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বসুধা চট্ করে সরে এল না। এমন এক একটি সময় আসে। খুকী যখন ঘরে থাকে না। খুকীর খাটের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বেড-কভারের পদ্মকলিগুলো দেখতে দেখতে, ওর টেবিলের বইগুলো নাড়তে নাড়তে, ওর নতুন কেনা সুন্দর ফ্রেমে-আঁটা বড় আয়নাটির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে বসুধা আচ্ছন্ন হয়।

আর ভাবে। শুধু তার বেলায়ই কি এমন হয়! আরো যারা মা আছে আর মেয়েরা যাদের বড় হচ্ছে? বসুধা প্রশ্ন করে নিজেকে।

মার বয়েস সাইত্রিশ, মেয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে এমন?

না কি এমন মা নেই এ-বাড়ীতে, আর এ বয়েসের মেয়ে! যৌবনের ম্রিয়মান মধ্যাহ্ন-শেষের রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেনা নতুন ঝক্‌ঝকে একটি শরীর ভরে লাবণ্যের ঝিকিমিকি জ্যোৎস্না-রেখা!

খুকীর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বসুধা একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলল। আড় চোখে একবার চেয়ে দেখল সকালের সবটুকু দুধ ও রুটি-মাখন মেয়ে খেয়েছিল কিনা! কোনো কোনো দিন খেতে চায়না, অর্ধেকই পড়ে থাকে, কতদিন এসে সে দেখেছে এই টেবিলে। বসুধা এটা পছন্দ করে না। এবং দরকার হলে এর জন্যে খুকীকে কটুকথা অনেকদিন শোনাতে হয় বৈকি।

আর, অসাবধান মেয়ে ঘুমের সময়। মশারী খাটানো আছে তবু ধারগুলো একটু হাত বাড়িয়ে টেনে দেবে না। কতো যেন কষ্ট।

এ-বাড়ীর ভুবনদাসের একটি ছেলে, দোতলার একটি শিশু ম্যালেরিয়ায় ভুগছে মণিমালা একথা জানে না কি? বসুধা কতদিন নিজের খাট থেকে উঠে এসে মেয়ের মশারী

টেনে দিয়েছে মাঝরাত্রে।

ভুল ? আলস্য ? ঘুমন্ত মেয়েকে হঠাৎ বকতে গিয়ে বসুধা কি ভেবে সেদিন চুপ করেছে। তারপর নিজের খাটে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছে।

না কি সকালের দুধ খাওয়ার মতো মশারী খাটানো ওর ভাল লাগে না।

বসুধা এখন আবার ভাবল নতুন ক'রে।

সত্যি, ঘুম আর খাওয়ার ব্যাপারে মেয়ের ঔদাসীন্য, ভাল-না-লাগার লক্ষণগুলো দিন দিন যেন বাড়ছে।

মন খারাপ হয় বসুধার, আবার এক এক সময় ভালও লাগে দেখতে। আ,—এ বয়সের ভাল-লাগা না-লাগা।

ঘাড় ফিরিয়ে খুকীর দুধের গ্লাস থেকে চোখ সরিয়ে বসুধা তাকাল এবার দেয়ালের দিকে। খুকীর টুথ-ব্রাসটা হুকে ঝুলছে।

নিশ্চয়ই আজ আবার ভুলে গেছে খুকী। সকালেও দাঁত মাজা হয়নি। বসুধা দেখে গেছে। বিছানায় ব'সে মেয়ে চা খাচ্ছিল তখন।

বসুধা দেখল মণিমালার চুলের রীবনগুলো একটাও জায়গায় নেই। অর্থাৎ বাথরুমে যাবার আগে যেখানে সেগুলো ও ঝুলিয়ে রাখে। তার অর্থ মেয়ে আজও চুল খোলেনি, মাথায় জল দেবে না। কাল মেঘলা দিন ছিল বটে, কিন্তু আজ ত রৌদ্রে দেশ পুড়ে যাচ্ছে। আজ চুল না ভেজাবার কারণ কি। অনিয়ম। জানালার দিকে তাকাল বসুধা। এই একটু আধটু অনিয়ম,—মেয়ের স্বভাবের একটু একটু পরিবর্তন বসুধা ক'দিন ধরে দেখছে। দেখছে আর ভাবছে।

না কি এই হয়। এরকম হয়েছিল বসুধার এবয়সে। ঘাড় ঘুরিয়ে খুকীর আয়নায় ফের সে নিজের মুখ দেখল। সত্যি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে চেহারা। ষ্টোভ ধরিয়ে একটু চা ক'রে খাবে কি না বা একটু ওবলটিন ভাবতে পারত ও, তাই ভাবা উচিত ছিল, সারা সকাল এত ঘোরাঘুরি ক'রে ঘরে ফিরে এসে এসময়ে। 'এত পরিশ্রমে শরীর টিকবে কেন,'—এই মাত্র কে বলেছিল, হেমবাবু কি কুশলবাবু, না নিচের ভবানী দাস। আশ্চর্য, তা-ও আর বসুধার এখন মনে নেই। নিজের সম্পর্কে এত বেশি ভুলে থাকে ও ঘরে পা দিতে না দিতে। তাই বলা চলে, বসুধার সব চিন্তা সবটুকু মনোযোগ, সকল ভাবনা আর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কি কেবল মেয়েকেই কেন্দ্র ক'রে নয় ? খুকী, খুকী। কিন্তু খুকীর জুতো কোথায়। জুতো রাখার শেল্‌ফ-এর দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে বসুধা অবাক হ'ল।

না, বুটিদার খয়েরীরঙের ব্লাউজটাও যে ঝুলছে না ব্রেকেটে। হ্যাঁ, নতুন কেনা শাড়ীখানাও নেই আলনায়।

আশ্চর্য, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে মনিমালা বুঝি বাথরুমে গেছে। জল পড়ছে ওমনি। উড়ে ভূতটা কি কাজ সেরে কোনোদিন কল বন্ধ করে গেছে। বসুধা ত্যক্ত হয়ে গেছে চাকরটাকে নিয়ে।

কিন্তু, চিন্তিত হ'ল ও ভেবে, এমন অসময়ে কোথায় বেরোতে পারে খুকী। অবিশ্যি মেয়ের বেরোনো নিয়ে বসুধা বাড়াবাড়ি করেনি কোনোদিন। মেয়ে লেখাপড়া শিখেছে বড়ো হয়েছে বুদ্ধি রাখে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ও পরিমিতিজ্ঞান এ বাড়ীর অনেকের মেয়ের চেয়ে বেশি আছে ওর, মা হয়ে বসুধা জানে। সেবিষয়ে সে নিশ্চিন্ত।

বলতে কি বসুধা অনেকদিন ব'লে কয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছে, একটু খোলা হাওয়ায়। পরীক্ষার আগে সারাদিন যখন বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকত। 'একটু বাইরে ঘুরে আয়গে', বলেছে বসুধা।

'এখানে তো বেশ হাওয়া আছে মা, আমাদের এই খোলা বারান্দায়।' খুকী হেসে উত্তর দিয়েছে।

তবু মেয়েকে জোর ক'রে পাঠিয়েছে বসুধা, একটুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে। 'স্বাস্থ্য দেখতে হবে আগে।' বলেছে বার বার। বুঝিয়েছে।

এগ্‌জামিন হয়ে গেছে পরেই বা কি। 'মা তুমি যদি বাইরে যাও আমার একটা রাইটিং প্যাড কিনে এনো, আমার অমুকটা ফুরিয়েছে।'

মা'র ওপর নির্ভর। বাইরে ও বড় একটা যায় কোথায়।

কিন্তু—

বসুধা ওর ছাতা-ব্যাগ কিছুই আজ ঘরে দেখতে না পেয়ে পরিষ্কার বুঝল, খুব ধারে কাছে যায়নি, তা'লে এমনি বেরোতো। গেছে দূরে। সত্যি এত জামাকাপড় থাকতে, এমন সুন্দর তিনজোড়া জুতো থাকতে সাদাসিধে একখানা কাপড় আর স্যাণ্ডেল প'রেই খুকী স্বভাবত দরকার হলে বাইরে যায়। তা-ও খুব কাছে।

আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পেল বসুধা। শাড়ী আর রঙীন ব্লাউজ মেয়ের গায়ে উঠেছে।

উঁচু হিল্‌-এর জুতোটা এতদিন পর পায়ে লাগল তবু। ছাতা নিয়েছে সঙ্গে। বসুধা খুশি হল।

বসুধা এই প্রথম, জানালার বাইরে চৈত্রের নতুন পাতাভরা দেবদারু গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় দেখল দূরের একটা রাস্তার পাশ ধ'রে হেঁটে হেঁটে চলেছে মণিমালা, না কি হাতল ধ'রে ট্রাম থেকে নামছে। দোকানে ঢুকবে। সহপাঠিনী কোনো বন্ধুর বাড়ির রাস্তা ধরল।

বাইরের আকাশে চোখ রেখে বসুধা হাসল একটু।

যেন খুকী হাঁটতে হাঁটতে একবার দাঁড়াল, তা-ও এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে বসুধা, কপালে ঘামের ফুটকি। নীল ছোট রুমাল ব্যাগ থেকে বার ক'রে বার বার মেয়ে ঘাম মুছচে।

আস্তে আস্তে, খুকীর কথা ভাবতে ভাবতে, বসুধা ঘর ছেড়ে ফের এল বারান্দায়। তার কাপড় ছাড়া হয়নি, খোলা হয়নি জুতো।

চৈত্রের স্তব্ধ দুপুর প্রচুর রৌদ্র ও আলস্য ছড়িয়ে আকাশের গায়ে ঝুলছে, বসুধা চোখ মেলে তাই দেখতে দেখতে যেন ছবি আঁকল দূরের।

কতদূর গেছে খুকী এবং কোন রাস্তায়!

এখন, এ সময়ে, বসুধার যতখানি অভিজ্ঞতা, রাস্তায় লোকজন কম চলে, গাড়ীঘোড়া বিরল।

গরম অ্যাশফল্ট পায়ের তলায় চটচট করে যদি তুমি রাস্তার ওপারে যেতে চাও। তপ্ত হাওয়ার নিঃশ্বাস চারদিকে।

মণিমালা একটি রাস্তা পার হল, বসুধা কল্পনায় দেখল। দেখল চাঁপা রঙের নিটোল মসৃণ হাত, চাঁদের ফালির মতো ছোট্ট কপাল আর আপেলের মতো গোল, একটু বা চাপা, কোমল সুন্দর চিবুক লাল হয়ে গেছে গরমে, তবু খুকী হাঁটছে।

আজ আর, কেন জানি বসুধার মনে হল, চেরা-বেণী নয়, সুন্দর শোভন খোঁপা উঠেছে খুকীর মাথায়। তাই, কি মনে হতে তাড়াতাড়ি বসুধা আবার ঘরে এল। দেখল কাজলদানীতে নতুন কাজল করা হয়েছিল। কুমারী চোখে আজ তা'লে এই প্রথম কাজল পরেছে মেয়ে।

সত্যি, বসুধার বুকের ভিতর দুবদুব করছে অসহ্য সুখে। আলমারী খুলে দেখলে, যা সে ভেবেছে, গয়নার বাক্সে দুল জোড়া নেই। রিং ছেড়ে রেখে ওটা পরে গেছে খুকী।

আর কি নেই, আরো কি নিতে পারে খুকী সঙ্গে, বসুধা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাই খুঁজল যেন। স্নান খাওয়ার কথা বসুধার একবারও এখন মনে হলনা, খাওয়ার পরে বিশ্রাম বা দুপুরের নিয়মিত নিদ্রা। এতদিন, এতকাল বসুধাই নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে অবেলায় ঘরে ফিরেছে। মা'র আসতে দেরী দেখে খুকী খাওয়া শেষ করেছে। 'আমার ফিরতে কতো বেলা হয় তার ঠিক কি—তুমি বসে থেকো না।' বসুধা মেয়েকে বলে রেখেছে 'অনিয়ম ভাল নয়, স্নান খাওয়া সেরে ফেলো।'

না কি আজ সেই নিয়ম-রক্ষা বসুধা করবে! মেয়ে যখন বাইরে গেল! স্নান সেরে এখনি খেতে বসবে! তারপর ঘুম?

বসুধার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। নিয়ম। যদি তা-ই হত তবে এই সেদিন অসুখ থেকে উঠে আবার এত হাঁটাহাঁটি ও পরিশ্রম তোমার মা করত না। রোজ সকালে

গ্রাস ভরে তোমাকে দুধটুক না খাইয়ে বসুধা নিজের জন্যে রাখত। তুমি মেয়ে আমি মা,—বসুধা প্রায় বিড়বিড় করে উঠল। তোমার স্বাস্থ্য ও সুখ আগে, পরে আমার। আমার ওটা গৌণ, তোমারটাই মুখ্য। তুমি আমার লক্ষ্য, তুমি স্বপ্ন।

দেয়াল থেকে দেয়ালে, বসুধা চোখ ফেরাল, ভাবল। নগেন ডাক্তার অসময়ে মারা গেছে, আত্মীয়বন্ধু অন্তর্হিত। কপর্দকহীন বিধবা, তার ওপর একটি অপোগণ্ড। হ্যাঁ, শেষ হয়ে যাওয়াই তো উচিত ছিল, সেই দশবছর আগে। নিয়মরক্ষা হ'ত সেটা। জীবনধারণের দুঃসহ চাপে মধ্যবিত্ত এই নিঃস্ব মহিলা, তা না হয়ে, দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে, বেঁচে আছে। অভাবিত, যা কেউ ভাবতে পারছে না। চোখ-টাটানো ব্যাপার।

অর্থাৎ বসুধার বেঁচে থাকতে পারাটাই অপরাধ, অনিয়মের সামিল। তার ওপর চাকরি করছে, মানুষ করছে মেয়েকে মনের মতন।

তাই কি এ বাড়ীর সিঁড়ির আনাচে কানাচে নিন্দা ঈর্ষা সন্দেহ! যেন আর সব মায়েরা ভাবতেই পারে না, এ অবস্থা ওদের হলে, ছেলে বা মেয়ের জন্যে কতটুকু ওরা করতে পারত।

ওরা অবাক, ওরা নিষ্ঠুর।

এবং এসব নিন্দার, নিষ্ঠুরতার, অপবাদের জঞ্জাল দুই হাতে ঠেলে ঠেলে বসুধাও এগিয়ে গেছে, থামেনি। কাকে ভয়? কিন্তু কেন, কা'র জন্যে, কোন্ মুখটির দিকে চেয়ে সে এতো করছে।

অথচ, বলতে কি খুকী এসব বোঝে না, আজও ও কতো শিশু। দুই চোখ বুজে খুকীর মুখখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে মনে একবার বিশ্লেষণ ক'রে বসুধা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। না, এটা ওর ভাল লাগে, বসুধা চেয়ে এসেছে তা-ই। বয়সের অনুপাতে, কেবল চেহারা নয়, মেয়েদের মনও যদি পেকে যায় আগে আগে সেকি সত্যি খুব দুঃখের নয়! এ-বাড়ীতে এ-বয়সের আরো কতো মেয়ে তো আছে। সব ক'টাকেই মণিমালার চেয়ে সেয়ানা, বেশি বুড়ি মনে হয়। বসুধার চোখে তো তা-ই ঠেকে।

অবিশ্যি আজ এই দুপুর রোদে ছাতা-ব্যাগ হাতে দূরের একটি রাস্তা ধরে খুকী চলেছে ভাবতে বসুধার যেমন ভাল লাগছিল তেমন একটু কষ্টও পাচ্ছে সে মনে মনে।

ভাত খেয়ে বেরোয়নি। অনভ্যস্ত দ্বিধাগ্রস্থ দু'টি পা। রাস্তাঘাট সম্পর্কে ধারণাই বা কতখানি। আর, ট্রাম-বাস না থাক সব জায়গায়, গরম পিচ্ ছাড়াও যে পথের ডাইনে বা বাঁয়ে কোন কোন দিকে ছায়া-ঢাকা সুন্দর পেভ্‌মেন্ট থাকে তা কি খেয়াল থাকবে মেয়ের। বসুধার হঠাৎ আবার খুকীর মশারী না খাটিয়ে শুয়ে পড়ার ছবিটা মনে পড়ল।

না, এখন বসুধার মনে হচ্ছে, এর সবটাই মেয়ের ভুলে থাকা বা খেয়াল না রাখা নয়।

এর পিছনে যেন একটুখানি ইচ্ছাও লুকিয়ে আছে। এই কষ্ট পাওয়ার, শরীরকে একটু পীড়ন করার।

বসুধা মনে মনে হাসল।

মা সকালে শুধু চা খেয়ে বেরোয়, আমারও তাই দুধরুটি রুচবে না, মা মশারী টাঙায় না, আমার কেন। মা রোজ রৌদ্রে বেরোয়, আমিও যাব। খাব এসে অবেলায়।

অর্থাৎ আমিও এখন থেকে একটু একটু কষ্ট' করব। এই ?

ওর অনেকসময় চুপচাপ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, খেতে বসে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে ভাবা, চোখে চোখ পড়তে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ার টুকরো টুকরো সব ছবি বসুধার চোখের সামনে ভেসে ওঠল। কদিন ধরেই খুকীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সে। ওর শরীরের আশ্চর্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন। বসুধা ভাবে। যেন সতেরো বছরের একটি ধানশিষ। ওপরের রং পাকা সোনার মতো হচ্ছে শক্ত হচ্ছে মনের দুধ। খুকী বড় হচ্ছে। খুকীর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে, বসুধা নতুন ক'রে বরং খুকীকেই দেখল।

কিন্তু না, ভাবছিল সে, আগে থাকতে বসুধা যদি জানতো দুপুরে আজ মণিমালা বেড়াতে বেরোবে সেভাবে সে ব্যবস্থা করত। একটা ডিম সিদ্ধ ক'রে দেওয়া যেতো ওর সকালের মাখনরুটির সঙ্গে। আর পুরোনো সেই ফ্লাস্কটায় ক'রে একটুখানি চা। দিতে পারতো ওকে রিষ্টওআচটা, আজ ছুটির দিন ডিউটী নেই, দরকার ছিল না বসুধার হাতঘড়ির। আরো কি দিতে পারতো মেয়েকে ভাবতে ভাবতে বসুধা মণিমালার শূন্য খাট, টেবিল চেয়ার আলনার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখল ও একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। আড়াইটার কাছাকাছি কাঁটা। ঘরের ভিতরটা কেমন একলা ঠেকছিল, হাঁফ ধরছিল তার। আস্তে আস্তে আবার এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

না, এই প্রথম আজ, ভাবল বসুধা, মণিমালা এমন সময়ে বাইরে, আর বসুধা আছে ঘরে বসে। এমন আর কোনোদিন হয়নি। বারান্দায় এসে বসুধার একটু ভাল লাগল। চৈত্রের হাল্কা হাওয়ায় ওর জানালার পর্দাগুলো রবারের এক একটি বেলুন হয়ে সুন্দরভাবে ফুলে ফুলে ওঠছে। এ-বাড়ীর আর সব ঘরে জানালা আছে বৈকি, পর্দা নেই। লজ্জা ঢাকবার জন্যে ওরা বরং সদরের দিকের জানালাগুলোই বন্ধ করে রাখে রাতদিন। সংস্কার।

বসুধা হাসল।

কোথায় থাকে এই লজ্জা গিন্নীরা যখন খালি খোলা গায়ে সদরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়। একটা সেমিজ পর্যন্ত না।

দোষ বসুধার। বসুধা বাইরে যায়। এরা ডিপুটি-গিন্নী উকিল-গিন্নী মুন্সেফ-গিন্নী।

অথচ এঁদের মেয়েরাও বাইরে যাচ্ছে কলেজ করছে। কিন্তু না, যেহেতু মাথার ওপর ওদের বাপ আছে স্বামীর ছায়া আছে তাই ওরা সব ভাল সবাই সুস্থির। বসুধা একলা, মনিমালার বাপ নেই? বসুধা একলাই পুরুষের হাল ধরেছে আর মণিমালা সেই হালের ছায়ায় মানুষ হয়েছে সুতরাং দূরে থাক?

দূরেই সরিয়ে রেখেছে বসুধা খুকীকে। নিজে সে যেমন এ-বাড়ীর কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশে না তেমনি খুকীকেও কারোর সঙ্গে মিশতে দেয়নি। বলতে কি এবাড়ীর লোটন চাঁপা বাসন্তীকে বসুধা অনেকদিন রাস্তায় পার্কে, চায়ের দোকানে ছেলেদের সঙ্গে ব'সে দিব্যি আড্ডা দিতে দেখেছে। বসুধা বাইরে যায় বলেই বাইরের এতসব জিনিস তার চোখে পড়ে।

আজ খুকী যখন সেজেগুজে বাইরে গেল, বসুধা কল্পনায় আনবার চেষ্টা করল, না জানি কেমন হয়েছিল এই গিন্নীদের চেহারা আর ওঁদের মেয়েদের।

আর সেই সঙ্গে বসুধার চোখের ওপর আরো কয়েকটি মুখ ভেসে ওঠল। বালাপোষ গায়ে দিয়ে যাঁরা বৈঠকখানায় বসে থাকেন। যাঁরা উঠতে নামতে মেয়ের মাকে তাগিদ দিচ্ছেন, আর কতো, এইবার বিয়ে দিন মেয়ের। অনেক ত করলেন। যেন তাঁরা ঠিক মালুম করতে পারছেন না বসুধার বা এখন বয়স ঠিক কতো। খুকী সব গোলমাল করে দিচ্ছে! অনেক বড় হয়ে গেল!

বসুধার হাসি পায় পুরুষদের বয়সভ্রম দেখে। যেন একটি ছোট ফুল বড় ফুলের পাশে ফুটতে ফুল-দুটোর আকৃতি ও অবয়বের মতো রং ও গন্ধেরও গোলমাল হচ্ছে। তাই কি সরিয়ে দেখতে চাইছেন এঁরা মেয়ে ছাড়া মা কেমন, মা বাদ দিয়ে মেয়ে কিরকম দেখতে! অথচ এক একজনের মেয়ের বয়স ঢের বেশি হয়েছে খুকীর চেয়ে। লক্ষ্য সেদিকে নয়।

সেই মুখগুলির কিরকম ভাবান্তর হয় খুকী যখন সুন্দর সাজগোজ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে বসুধার দেখতে ভারি ইচ্ছা হয়। কথাটা মাঝে মাঝে সে ভাবে বৈকি।

এখনও ভাবল। তার জানালায় পর্দা, আর দোতলার নিচের সবগুলো ফ্ল্যাটের রেলিং-এ বারান্দায় ঝুলছে অসংখ্য কাঁথা ও অয়েলক্লথের টুকরো। বসুধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভবানী দাসের পঞ্চাশোত্তর জীবনের কীর্তিস্বরূপ তাঁর আধুনিকতম একটি নাবালকের ফ্রক পেনি শুকোতে দিচ্ছে ভবানী-গিন্নী। স্ফীতোদর হেমনাহার পুত্রবধূর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেমজায়া এই একাদশবার সন্তান সম্ভাবনায় রোদে বসে পাণ্ডুর হাতে পায়ে অলিভ তেল মালিশ করছে অবিশ্রাম। কুশলগিন্নী বৈঠকখানা ঝাড়পোছ শেষ করে এবার বুঝি তার তেরোটি ছেলেমেয়ের তেরোজোড়া ছেঁড়া বিবর্ণ জুতা-চটি সারাটা ব্যাল্‌কনি জুড়ে শুকোতে দিলে।

রুচি ও শুচিতা, লজ্জা ও শোভনতার এসব বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে বসুধার চোখ

জুড়িয়ে যায়। তাই ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকায় নিজের ঘরের দিকে। নতুন চুনকাম করা মেঘের মতো শাদা ধবধবে দেয়াল। অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে বসুধা এই সেদিন ঘরের রং ফিরিয়েছে। বলতে কি এ-বাড়ীতে ঢুকতে চল্টা-ওঠা পানের পিক ছিটানো দেয়াল আর সিঁড়িগুলি পার হয়ে ওপরে উঠে আসতে বসুধার যেন মরে যেতে ইচ্ছা করে। যতক্ষণ না সে তার ছিমছাম নিরিবিলি এই বারান্দা, ঠাণ্ডা ঘর, আর টব-ভরতি সাদা নীল ফুলগুলির পাশে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। তার ঘর, তার স্বপ্ন, মণিমালার ছোট ছোট নিঃশ্বাসে ভরতি অপরূপ জগত। বসুধা এখানে এসে বাঁচে।

ভাবতে ভাবতে, বারান্দায় অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর ঘড়ির কাঁটা যখন তিনটার দাগ পার হয়ে গেছে, টবের একটা সদ্য-ফোটা অর্কিডের সামনে এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রৌদ্রের রং বাদামী হয়েছে, মণিমালা এখনও ফিরল না, এইবার বেলা শেষ হবে। কিন্তু বসুধা এতটুকু ভাবল না। বরং হলদে সোনালী অর্কিডের গা বেয়ে নীল নিঃশব্দ একটা পোকার আস্তে আস্তে একদিকে সরে যাওয়া দেখতে দেখতে বসুধার অন্য কথা মনে হল এখন।

না, এর সবটাই কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছায় নয়। বসুধা দেখল, রৌদ্রের রং-ফেরার মতোই খুকীর মনের পরিবর্ত্তন।

বাইরে রৌদ্রের নিচে সুন্দর হয়ে একদিন হাঁটবার ইচ্ছা কি এই বয়স থেকেই হয়না মেয়েদের। বরং এর অনেক আগেই হয়েছে এ-বাড়ীর চকোর চামেলীর লোটন বাসন্তীর। দল বেঁধে ওরা কি শনিবার সিনেমায় যায়, লেকে পার্কে।

পাউডার ক্রিমের শ্রাদ্ধ।

ফ্যাশন কায়দার অত্যাচার।

অথচ এই শ্রী এই ভূষা। পুরোনো হয়ে গেছে ওদের বাইরে যাওয়া, তবু রোজ বাইরে টো-টো করতে বেরোনো চাই।

আর সেই তুলনায় খুকীর আজ বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা কতো ধীর কতো বিলম্বিত। আকাশে চাঁদ ওঠার মতো। বসুধা মনে মনে দেখল মনিমালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল বেঁধেছে, সাজগোজ করেছে। দুলের সঙ্গে রুলি মানাবে না বলে চুড়ি পড়েছে, রাং-বাঁধা রাবনে কাজ নেই আজ তাই খোঁপায় গুজেছে রূপোর ডবল কাঁটা।

রূপোর কাঁটায় চৈত্রের বিকেলী রোদ হ্রদের জল হয়ে টলটল করছে, বসুধা এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল।

কিন্তু কোথায় ও যাবে।

এ-বাড়ীর চকোর চামেলীর অনেক বন্ধু, খুকীর একটিও নেই, দেখেনি সে কোনোদিন।

কাজেই সহপাঠিনী কোনো মেয়ের বাড়ী পা বাড়াবে বলে একটু আগে বসুধার মনে যে-কথাটা উঁকি দিয়েছিল এখন তা-ও মিলিয়ে গেল। আর দোকানেই বা ও যাবে কেন। দোকানে গেলে এতক্ষণে খুকী ফিরে আসত। আর কী আছে সেখানে। দোকানে জিনিস নেই সেকথা নয়, এমন কি মনের মতো সামগ্রী আছে যে খুকী পছন্দ করে নিয়ে আসবে? ওর যা পছন্দ মনিমালা চাইবার আগে বসুধা এনে মেয়ের হাতে তুলে দেয়, দিয়েছে এতকাল। সত্যি মণিমালা আজ অবধি মুখ ফুটে কিছু চায়নি। বসুধা এত বেশি এনে দিয়েছে যে ওর চাইবার ফুরসত ছিল না। আর বসুধা জানে ওর পছন্দ, ওর মন কি চায়। বসুধার নিজের হাতে গড়া এই মন।

না দোকানে নয়। এমনি। এমনি মনিমালা বেড়াতে বেরিয়েছে। ফুলের গা বেয়ে নীল পোকার নিঃশব্দ সঞ্চরণের মতো চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় খুকী নিজের মনে হাঁটছে। টব থেকে চোখ সরিয়ে বসুধা বাইরে দেবদারু পাতাদের শেষ রৌদ্র-পান দেখতে লাগল। একটু পরে ওখানে অনেক পাখি এসে ভিড় করবে। বসুধার মনে পড়ল খুকী এসময়ে গা ধোয় চুল বাঁধে। আর বিকেলের ডিউটিতে বেরোবার জন্যে বসুধাও তৈরী হয়, কাপড়জামা পরে। চাকরটার ফিরতে সেই সন্ধ্যা হয় ব'লে রোজ বেরোবার আগে বসুধা ষ্টোভ জেলে খুকীর বিকেলের খাবার লুচি সুজি মামলেট যাহোক একটা কিছু ক'রে রেখে যায়। মেয়ের বিছানা ক'রে রাখে আলোটা নামিয়ে দেয় টেবিলে। সন্ধ্যা হ'তে খুকী পড়বে। পড়বে অথবা ঘুমোবে। বসুধা কতদিন রাত্রে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখেছে টেবিলে মাথা রেখে ও ঘুমোচ্ছে। আলোর শেড্-এর নিচে এলোমেলো অন্ধকার চুলের ঢেউ, আর, ঢেউয়ের মাঝখানে মোমের দ্বীপের মতো ঘুমে-ভরা ছোট্ট একটি মুখ সুন্দর হা ক'রে আছে।

টের পেয়ে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। নিজের কাপড়জামা ছাড়বার আগে বসুধা বাতির ঢাকনা তুলে দিতে গেছে, করমচার মতো লাল গোল চোখে খুকী ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে তাকিয়েছে মা'র দিকে, যেন হঠাৎ ও আন্দাজ করতে পারছে না রাত কতো হ'ল। কতো আর রাত হয় বসুধার ডিউটি থেকে ফিরতে। মেয়ে এর মধ্যেই ঘুমে মুড়মুড়ে।

সেই লাল করমচা-চোখে এখন বিকেলের আলোয় কেমন রং ধরেছে বসুধার দেখতে ইচ্ছা হ'ল।

আচ্ছা, মণিমালা কি সিনেমায় যাবে। কথাটা ভাবতে অবিশ্যি বসুধার বেশ হাসি পেল। সিনেমায় যাবে রেষ্টুরেণ্টে যাবে। লোটন বাসন্তীর যা চিরদিনের প্রিয়। আ,—সত্যি যদি জানতো এ-বাড়ীর মায়েরা কি মেয়েরা খুকীর রুচি। ওরা জানেনা, বসুধা এসব নিজে যেমন পছন্দ করে না তেমনি মেয়েও ভালবাসে না। কাজেই এসম্পর্কে নিশ্চিত, একরকম নিশ্চিন্ত সে। বসুধা আস্তে আস্তে চলে এল ঘরে।

তার ঘড়ির কাঁটায় এখন পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

বাইরের সবটুকু রোদ প্রায় নিভে গেছে।

চাকরটাও ফিরেছে যেন, রান্নাঘরে বাটনা বাটার শব্দ শুনল বসুধা। কিন্তু ওদিকে উঁকি দিতে একফোঁটা ইচ্ছা নেই, বেশ লাগছিল তার এঘরের এই আবছা অন্ধকারে। বসুধা আলো জ্বালল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এমন আর কোনোদিন হয়নি। এমন আর কোনোদিন হয়েছে কি, একটু একটু ক'রে সন্ধ্যা নামছে, আর সেই সকালের কাপড় জামা জুতা পরা অবস্থায় অস্নাত অভুক্ত বসুধা ঘরে, খুকী নেই।

অদ্ভুত এক অনুভূতিতে বসুধার মন ছেয়ে গেছে।

কিন্তু খুকী কি ভাবছে যেহেতু ঝোঁকের মাথায় বেশিদুর বেড়াতে গিয়ে ফিরতে ওর রাত হচ্ছে, মা রাগ করবে বকবে ?

কথাটা মনে হতে বসুধার হাসি পেল। ও কি জানে না ওর মাকে। লোটন বাসন্তীর মা নয় তোমার মা, আর, লোটন বাসন্তী কি চকোর চামেলী তুমি নও, খুকী। বসুধার যেন জোরে জোরে বলতে ইচ্ছা হল অন্ধকারে অদৃশ্য মনিমালাকে সম্বোধন করে।

এসব ভাবল ও, আর অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে কান খাড়া করে রাখল। খুকীর জুতোর শব্দ শুনবে বলে নয়, শুনছে সে নিচে দোতলায় চকোর চামেলীর রাত করে ঘরে ফেরা নিয়ে হেমগিন্নীর তর্জন গর্জন আস্ফালন বিক্ষোভ।

আ, কতোদিন পর মনিমালা বেড়াতে বেরিয়েছে, যদি ওর ফিরতে রাত দশটাও হয় বসুধা কি রাগ করবে মেয়ের ওপর। ওর যে আজ বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে এই কি যথেষ্ট নয় ?

না, এই গিন্নীরা, নিচের মায়েরা মেয়েদের জন্যে যতোবেশি যন্ত্রণা ও নিগ্রহভোগ করল তার শতভাগের একভাগও যদি বসুধা পেতো মণিমালাকে দিয়ে! সার্থক তার মা হওয়া, বলল ও মনে মনে আর খুকীর মতো মেয়ে পাওয়া। খুকী খুকী।

আটটা বাজল। ন'টা।

রেডিও বাজল রেডিও বন্ধ হল।

নিচে ফ্ল্যাটগুলিতে সাড়াশব্দ কমে এসেছে আস্তে আস্তে।

বৈঠকখানায় বুড়োদের কাশির শব্দ আর শুনছেনা বসুধা। যেন ওঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন, এবেলা বসুধা নিচে নামেনি তাই ?

চাকরটা এই মাত্র রান্নাঘরের দরজার শিকল তু'লে দিয়ে চ'লে গেল। তারপর সারা বাড়ী নিঃসাড়।

জানালার নিঃশব্দ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বসুধা শুনছিল বাইরে দেবদারুর মাথায়

হাওয়ার শব্দ।

ঠিক তখন। তখন শোনা গেল সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। আর পরমুহূর্ত্তেই একশ পাওয়ারের দু'টো বাল্‌ব জ্বলে উঠল বসুধার ঘরে বারান্দায়, আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারিদিক।

কাজলপরা হরিণ-চোখ মেলে হাসছে মণিমালা।

টিয়ার পালকের মতো সবুজ ওর শাড়ী।

মুক্তা হয়ে জ্বলছে মোমের মতো শরীর। দেখল বসুধা সুইচ্-বোর্ড থেকে হাত নামাতে নামাতে। আর কতক্ষণ সে চোখ ফেরাতে পারল না।

কথাবার্ত্তায় রাত বারোটা বাজল মা মেয়ের খেতে বসতে। নিশুতি রাত। মুখোমুখি বসেছে দু'জন। আর খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। হঠাৎ আবার কি মনে হ'তে বসুধা জিজ্ঞেস করল, 'তোকে ও চিনল কি ক'রে খুকী বল তো!'

'বা রে, আমায় দেখেই যে কর্ণেল করঞ্জীলাল গাড়ি থামাল।'

'তারপর?'

'বললে, নার্স বসুধার মেয়ে তুমি?'

'তারপর?'

'আমায় গাড়িতে টেনে তুলল।'

'তারপর? কোথায় গেলি তোরা?' যেন বসুধা গল্পটা আবার শুনতে চাইছে, এমনভাবে হেসে মেয়ের দিকে তাকাল।

'প্রথম গ্র্যাণ্ড-হোটেল তারপর গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন। সারাটা সার্কুলার রোড দুবার চক্কর, তারপর আবার হোটেল হয়ে এই তো আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল দরজায়।

'বুড়ো হয়েছে চুল পেকে গেছে তবু তো ছুটোছুটি কমল না রে।' রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বলল বসুধা।

'বুড়ো হয়েছে।' মৃদু হেসে খুকী চেয়ারের পিঠে মাথা রাখল, 'বুড়োয় বুড়োয় কি তফাৎ নেই মা। এ-বাড়ীর কুশল রায় হেমনাহা তো বুড়ো হয়েছে, দেখলে কি ঘিন্‌ঘিন করে না, গা বমি ধরে না!'

'সত্যি বলেছিস।' নিবিড় হেসে বসুধা মাথা নাড়ল, 'আমায় একটা ব্রোচ্ প্রেজেণ্ট করেছিল ও, সেই কবের কথা।'

'আমায় বললে তোমার রঙের সঙ্গে এই পাথর মানাবে ভাল, তাই এই পাথরের আঙ্‌টি।'

এই প্রথম একটি রাত যে এত রাত অবধি জেগে থেকে খুকী বসুধার সঙ্গে একত্র

খেতে বসেছে, ভাল লাগছিল বসুধার। খুকী বড় হয়েছে, বড় হয়েছে, বারবার তার মন বলছিল, আর খেতে খেতে একসময়ে বলল সে মণিমালার সুন্দর ভুরুর দিকে চেয়ে, 'বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিনা, এখানে থেকে তো আর সম্ভব না, আরো বড় সার্কেলে তোমায় আমি পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম, মালা।'

'কিন্তু—' কি বলতে গিয়ে মণিমালা থামল।

'কি বলছিলে বলো না।' অভয় দিলে বসুধা মেয়েকে।

'ওরা কি সবাই এমন বুড়ো ?' খুকী মার চোখের দিকে তাকাল। যেন হঠাৎ ধরতে না পেরে বসুধা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। এখনও ওকে এক এক সময় এমন শিশু মনে হয়, ভাবল সে।

চিত্রকলা

উপাদান-বৈচিত্র্য—ফ্রেস্কোপদ্ধতি

যামিনীকান্ত সেন

ফ্রেস্কো শব্দটি ইতালীয় "al-fresco" শব্দের অনুকৃতি। এর মানে হচ্ছে সজীব বা টাট্কা—ইংরাজীতে যাকে বলে "fresh"। ভিজে অস্তর (plaster) দেওয়া জমির উপর জলরঙে আঁকা হ'ল এর নিয়ম। এ প্রথায় চুণের রাসায়নিক ভাবে তৈরী রঙ নষ্ট করার শক্তি আর থাকে না। টেম্পেরা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ইদানীং ফ্রেস্কো (fresco) বলতে এক হিসেবে দেয়ালে আঁকা সব রকমের চিত্রকেই বোঝায়। বাস্তবিক এ রকম ব্যাখ্যা ভুল। ইতালীতে ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রকরগণ এই পদ্ধতিকে প্রচুর মহিমাযুক্ত করে। ইতালীয় চিত্রকর Giotto, Paduaর Arena গির্জ্জায় এ রকমের চিত্রপদ্ধতিতে ছবি আঁকেন। Orcagna, St maria Noveliaর গির্জ্জাতে, Masaccio Carmine চ্যাপেলে, Corregio পারমার গির্জ্জায়, রাফেল Vaticanএ, Michael Angelo Sistine chapelএ ফ্রেস্কোপ্রথায় ছবি এঁকে এ পদ্ধতিকে বিশেষ গৌরবান্বিত করেন। এজন্য বিরাট ও স্থায়ী কিছু আঁকতে হলেই সকলের ফ্রেস্কো পদ্ধতির কথা মনে হয়।

অথচ প্রাচীনতম চিত্রকলা এ প্রথাকে সব সময় কোথাও শিরোধার্য্য করেনি।

ভিজে জমির উপর আঁকাই হল এর প্রধান লক্ষণ। তা'তে করে রঙটি চুণের প্রলেপের সঙ্গে একেবারে মিশ খেয়ে গিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটি আস্ত সূক্ষ্ম বর্ণস্তর সৃষ্টি করে যা' দেয়ালের সমগ্র জমির ভিতরই খাপ খেয়ে যায়—উপরে অসংলগ্নভাবে একটা বর্ণস্তররূপে থাকেনা। স্থায়িত্বের দিক হতে এ প্রথাকেও যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতে হয়। অন্য দিকে প্রাচীনদের fresco ও tempera মিশিয়ে আঁকবার প্রথাও একেবারে যে ভঙ্গুর ও সাময়িক হয়নি তার প্রমাণও যথেষ্ট। ফ্রেস্কো প্রথার সাহায্যেই বিরাট প্রাচীরে চিত্রাঙ্কণের পদ্ধতি ইউরোপের খুবই মনঃপূত হয়েছিল এক সময়। ক্রমশঃ প্রথাটি

অন্তর্হিত হয়ে যায়। কাজেই তাকে আর অনুকরণ করা সম্ভব হয়নি। ফ্রেস্কো চিত্র স্থানান্তরিত করা যায়না—সব স্থানের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাকে চিরন্তনভাবে সুশ্রী করে' আঁকা যায়—বাইরের পরিবর্ত্তনশীল আলো ও ছায়ায় তার সামঞ্জস্য নষ্ট করতে পারেনা। এজন্যই শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ক্যানভাসে না এঁকে এরকম স্থায়ী ও স্থির একটি জমিতে বর্ণালঙ্কার প্রয়োগ করতে চিরকালই উৎসাহিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে তাই রসেটি (Rosetti) প্রমুখ শিল্পীগোষ্ঠী ভেবেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ শ্রেণীর একটা স্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যেতে হবে। তাই অক্সফোর্ড ইউনিয়ানের তর্কসভাগৃহে ফ্রেস্কো প্রথার চিত্র রচনা করতে রসেটি, বার্ণ জোন্‌স্ প্রভৃতি শিল্পী একটা চক্র সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের আনুকূল্য এবং প্রচুর ধনবলও এক্ষেত্রে সহায় হয়। কিন্তু ফল বিপরীত হয়ে পড়ে। সভাগৃহ চিত্রিত হওয়ার অতি অল্পকাল পরেই দেখা গেল যে সব চিত্রগুলি জীর্ণ গলিত ও বিবর্ণ হয়ে ঝরে' পড়েছে! A. Clutton Brock এ সম্বন্ধে একটি চৎমকার উক্তি করেছিলেন। তা হচ্ছে এই :—'The failure of this spirited adventure must have made Morris feel the contrast between science and organisation of the great ages of art and the ignorance and indiscipline of our own time''.

বস্তুতঃ প্রাচীন প্রথাটি লুপ্তই হয়ে যায়। খাঁটি fresco চিত্রাঙ্কনে রঙকে গালার (wax) সহিত মেশান হয় না তা'কে চটচটে বা উজ্জ্বল করতে। আবার কোন রকম শিরিষের আঠা, ডিমের হলদে বা সাদা অংশকেও তার সঙ্গে যোগ করা হ'ত না। শুধু জল বা চুণের জলের সঙ্গেই রঙ মেশান হত মাত্র। রঙগুলি দেয়ালে লাগান হত দেয়ালটি ভেজা থাকা অবস্থায়—এই হল ফ্রেস্কোর বিশেষত্ব।

ফ্রেস্কোপ্রথার যথাযথ প্রণালীর কথা ভাল করে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। খাঁটি ফ্রেস্কোকে Buon fresco বলা হয়। এজন্য দেয়ালে দুরকমের plastering বা বালি ও চুণের প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত। একটি হল arricio বা মোটা প্রলেপ যার সঙ্গে আমাদের প্রতিমা তৈরীর একমেটে ব্যাপারকে তুলনা করা চলে। Arricioতে দুভাগ বালি ও একভাগ চুণ মিশিয়ে আধ ইঞ্চি পুরু করে দুতিনটা প্রলেপ দিতে হয়। জমিটাকে অমার্জ্জিত ও অসমতল রাখা হয় যাতে করে' শেষ স্তরটি ভাল করে তার উপর স্থায়ী ভাবে চাপান যায়। যতক্ষণ সব জমিটা ভাল রকমে না শুকোয় ততক্ষণ এর উপর হস্তক্ষেপ করা হয়না। এর উপর intonaco বা শেষ প্রলেপটি দেওয়া হয়। এই শেষ প্রলেপটিও দুই স্তরে দেওয়া হয়। দুটি স্তর মিলে আন্দাজ $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি পুরু হয়। তারপর একটা কর্নিকের (trowel) সাহায্যে সমস্ত ভূমিটিকে মসৃণ ও সুচিক্কণ করা হয়। শেষ স্তরের সবটা একদিনে ন্যস্ত করা হত না—কারণ শুকিয়ে যাওয়ার পর এ প্রথায় বর্ণপ্রয়োগ করার রীতি ছিলনা। কাজেই শিল্পী একদিনে রঙ দিয়ে যতটা আঁকতে পারে শুধু ততটুকু জমির উপরে প্রথম প্রলেপের প্রয়োজন হত। আঁকবার ছবির আকার ছোট হলে একটা আসল নক্সাকে ভিজে দেয়ালের উপর চেপে ধরে তার রেখাঙ্কনের ছায়া নেওয়া হত। যদি ছবিটা খুব বড় রকমের করাই কাম্য হয় এবং তা' আঁকতে যদি বহুদিনের প্রয়োজন হয় তা' হলে কখনও বা একমেটে অবস্থাতেও রেখাঙ্কনটির প্রতিরূপ নেওয়া হত।

আবার কাগজের উপর নক্সা এঁকে তার রেখার উপর ছোট ছোট বিন্দুর মত বহু ছেদা করা হত। তারপর একখানি পাতলা কাপড়ের একটা পুটলি করে তার ভিতর্ কয়লার গুঁড়ো ভর্ত্তি করা হত। তারপর এই ফুটো করা কাগজখানি দেয়ালের উপর ধরে পুটলি দিয়ে তার উপর বারবার আঘাত করা হত (pouncings)। এ রকম করলে সূক্ষ্ম ছেদাগুলির ভিতর দিয়ে কয়লার গুঁড়োগুলি দেয়ালে সহজেই একটা নক্সা রচনা করে তুলত। এভাবেই পাকাপাকি একটা নক্সার প্রথম রেখাঙ্কন দেয়ালের উপর ফলিয়ে তোলা হত।

এদিকে তুলির ও রঙের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হত। যা তা একটা কিছু করে কাজ সফল করা সম্ভব হত না। বহু পরীক্ষা করে তুলিকা নির্ব্বাচন করা হত। তুলিগুলি লম্বা ও নমনীয় হওয়া দরকার। একখানা টিনের থালায় (palette) রঙগুলিকে মিশিয়ে রাখা হত—থালাখানির

মাঝখানটা ছোট বাটির মত একটা নীচু জমিতে কিছু জল রাখা হত, প্রয়োজন মত রঙে মিশিয়ে আঁকবার জন্য। রঙগুলি জান্তব বা উদ্ভিজ্জ না হওয়া দরকার কারণ তা হলে সে সব রঙগুলিকে দেয়ালের চূণ নষ্ট করে দেয়। কাজেই শুধু মেটে বা খনিজ রঙের ব্যবহার চলত এক্ষেত্রে। ফ্রেস্কোতে ব্যবহৃত রঙগুলির ইংরাজী নাম হচ্ছে lime white, yellow ocre, Naples yellow, Venetian red, burnt sienna, terre verte, oxide of chromiums, raw and burnt umber, burnt vitriol, cobal and ultramarine, blue, vermilion ও earth black.

এদেশেও উদ্ভিজ্জ ও খনিজ রঙ যথেষ্ট আছে। ইদানীং ইউরোপ হতে রঙ আমদানি হওয়াতে বহু রঙ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কাজল রঙ, চীনে লাল, গেরুয়া রঙ, হরতেল, মুলতানি হলদে, তরমুজী সবুজ, দেশী নীল প্রভৃতি রঙ দুর্লভ নয়।

খাঁটি ফ্রেস্কো চিত্র রচনা খুব তাড়াতাড়ি করতে হয় যাতে করে দেয়াল না শুকিয়ে যায়। এ প্রথার অসুবিধা হচ্ছে যে রঙের শেষ ফল শিল্পীরা দেখতে পায় না। কারণ শুকিয়ে গেলে রঙগুলি কিছুটা হাল্কা হয়ে যেতে বাধ্য। এজন্য এক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তি থাকা প্রয়োজন। যাদের সে সব নেই তাদের পক্ষে এ প্রথার ছবি আঁকতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ফ্রেস্কোর স্থায়িত্বও হচ্ছে একটা বিশেষ গুণ। Plaster-এর উপর রঙ ন্যস্ত হওয়ায় দুটি মিশে এক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম Carbonate of lime-এর স্তর তৈরী হয়ে যায়। এজন্য ভিজলে বা ঘসলে চট্ করে এসব রঙ নষ্ট হয়না। তা'ছাড়া জমিটা খুব মসৃণও হয়না—তাতে করে আলো ও ছায়ার কৃত্রিম প্রকোপ চিত্রের বর্ণ ও সঙ্গতি নষ্ট করেনা। সব দিক হতেই সমানভাবে ছবিটি দেখলে তার ভিতরকার সম্পূর্ণতা সুস্পষ্ট হয়।

রঙের প্রভা, ঔজ্জ্বল্য ও পরিচ্ছন্নতা ফ্রেস্কোতে অক্ষত থাকে। এজন্য সব সময় মনে হয় যে রচনাটি একেবারে নূতন। রাফ্যেল প্রভৃতি শিল্পীরা এই চিত্রপন্থাটি একসময় গ্রহণ করেছিল বলেও এর খাতির যথেষ্ট এযুগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরেই এই প্রথার অধঃপতন হয়। অনেক যত্ন করেও একে আবার প্রাচীন মর্য্যাদা দান করার চেষ্টা সফল হয়নি।

তবুও নূতন শিল্পীরা এ পথে এযুগে অগ্রসর হয়েছে—যদিও এদেশের অনেকের তা' জানা নেই। মেক্সিকোর শিল্পী Diego Rivera ও C. Orozco ফ্রেস্কো প্রথায় চিত্র এঁকে ইদানীং অনেকের প্রশংসা অর্জ্জন করছে। আমেরিকার Detroit ও Newyork-এ Rivera নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে Fresco প্রথায় ছবি এঁকে। শিল্পী Orcozo ও Newyork-এর New school of social research গৃহে এ প্রণালীতে ছবি এঁকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাজেই গুণমুগ্ধ নব্য শিল্পীরা এদেশে আবার এ প্রথাকে উন্নীত করার সাধনায় অগ্রসর হ'তে পারে। খাপছাড়াভাবে এদেশেও যে দেয়াল আঁকবার চেষ্টা হয়নি তা' নয়। কিন্তু যেভাবে হয়েছে তা'তে সেগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বস্তুতঃ মন্দিরে, অট্টালিকায়, শিক্ষাভবনে, ক্লাবে ও অধ্যয়নসম্মিলনী গৃহে এ প্রথায় ছবি আঁকার বিপুল অবকাশ এদেশে আছে। কাজেই শিল্পীদের একটা বিশেষ চক্র এর ভিতরকার রহস্যগুলি আয়ত্ত ক'রে এদেশে আর একটি বিরাট আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। কিন্তু কাজটি এলোমেলো, অস্থির বা অপ্রামাণ্যভাবে হ'লে এর স্থায়িত্ব আশা করা বৃথা হবে। স্থায়িত্বের দিকে দৃষ্টি না রাখলে এ প্রথায় ছবি আঁকার কোন মানে হয়না।

ভারতের নব্যযুগে রচিত বিরাট অট্টালিকা, মন্দির ও শিক্ষায়তনগুলিকে চিত্রাঙ্কিত করার কাজ বাকি আছে। সাধারণের চোখ ফিরলে এ দিকে শিল্পীদের অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পথ খোলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতার যুগ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এসে পড়েছে। এ সময় বিরাট কর্ত্তব্যে দেশের বা জাতির ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

পূর্ব্বাশা

সূচীপত্র

স্মরণে—

ফাল্গুন—১৩৫৪

বাপু

পূর্ব্বাশা—

ফাল্গুন—১৩৫৪

শিল্পী—

বীরু হালদার

"আমার সর্ব্বস্ব আমি ভারতবর্ষকে সমর্পণ করিয়াছি—ভারতবর্ষের সঙ্গে আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে ভারতবর্ষকে দিয়া পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। ইউরোপকে অন্ধ অনুকরণ করিবার তাহার দরকার নাই। ভারতবর্ষ অস্ত্রধারণের মন্ত্র গ্রহণ করিলে আমার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিব। সে-পরীক্ষায় দুর্ব্বলতা দেখাইব না বলিয়াই আমার আশা। আমার ধর্ম্ম ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়। তাহাতে যদি আমার জীবন্ত বিশ্বাস থাকে তবে তাহা আমার দেশপ্রেমের উর্দ্ধে আসন পাতিয়া লইবে। অহিংসা-ধর্ম্মে ভারতবর্ষকে সেবা করিবার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমার বিশ্বাস যে অহিংসাই হিন্দুধর্ম্মের মূলাধার।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১১ই আগষ্ট, ১৯২০]

M. K. Gandhi

মহাত্মাজী-স্মরণে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী ভ্রান্ত-আদর্শ উন্মত্ত আততায়ীর দ্বারা হত হয়েছেন। প্রেম ও ক্ষমার সমন্বয়ে করুণা, করুণা ও অমোঘ বীর্য্যের সমন্বয়ে অহিংসা; সেই অহিংসার সাধনায় সিদ্ধ-সাধক, সেই সিদ্ধিফলের প্রচারক গান্ধীজী· ভারতবর্ষের সকল ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ গান্ধীজী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা গান্ধীজী, বিশ্বের জীবননাট্যের বর্ত্তমান অঙ্কের শ্রেষ্ঠ নায়ক গান্ধীজী, মহাপ্রস্থান করলেন বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ থেকে। এই মহাপ্রস্থান যত গৌরবময় তত নাটকীয়। এই প্রস্থানের তুলনা আমাদের মহাভারতের ব্যাধশরবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তুলনীয়। পৃথিবীর জীবন-মহাকাব্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তুলনীয়। শরবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ শেষ মুহূর্ত্তে অনুতপ্ত ব্যাধকে ক্ষমাসুন্দর হাস্যে মার্জ্জনা করেছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ যীশু ঈশ্বরের কাছে ভ্রান্ত আততায়ীর জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিলেন, গুলীবিদ্ধ গান্ধীজী রামনাম উচ্চারণ করে হাত দুটিকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কৃতাঞ্জলীতে আবদ্ধ করে ধরাশায়ী হয়েছেন। তিনিও ক্ষমা করে গেছেন অথবা ঈশ্বরের কাছে আততায়ীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গেছেন।

বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধশতকের মুখে বিশ্বের জীবননাট্যে একটি মহাসংঘাতময় অঙ্কের সুনিশ্চিত পরিসমাপ্তি হল এই ঘটনায়। হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর হিংসাত্মক রক্তধ্বজা-বাহী অভিযান ও তার শোচনীয় ব্যর্থতা, জড়বাদী প্রতিপক্ষের এ্যাটম বমের আবিষ্কারে জয়ের মধ্যেও ভাবীকালের ভয়ঙ্করতর যুদ্ধের শোচনীয় সূচনা—এই দুয়ের পটভূমিতে মহাত্মাজীর জীবনসাধনা ও তার এই নাটকীয় পরিসমাপ্তি একটি বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে গেল ভাবীকালের বিশ্বজীবননাট্যের নূতন অঙ্কের গতি ও রূপ নির্ণয়ে। বিশ্বের জীবন সাধনায় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা সম্ভবত শেষ হয়ে গেল বলেই মনে হয় যেন। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা, হৃদয় ও অনুভূতির এই দ্যুতিময় প্রকাশ জলস্থল অন্তরীক্ষ থেকে হিংস্র আক্রমণ-সম্ভাবনাসঙ্কুল অথচ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ সমৃদ্ধ জড়বাদের সাধনার সম্মুখে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে নীরব হ'ল। প্রশ্ন উত্থাপিত করে দিয়ে গেল—কঃ পন্থা!

আজ বিশ্বের জীবনধারায় যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে তাতে তার মুহূর্ত্তের জন্যও থামবার

অবসর নাই। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই অর্দ্ধ অবনমিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পতাকাকে কিন্তু আগামী যুদ্ধের আয়োজন বা মন্ত্রনায় বিন্দুমাত্র বিরতি ঘটে নাই। আজ বাহিরের জগৎ প্রধান হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে দেওয়া শিলাখণ্ডের মত এমন ক্রমবর্দ্ধমান বেগে ছুটে চলেছে যে তার গতিরোধ অসম্ভব হয়ে উঠেছে, যারা গড়িয়ে দিয়েছে তারা পিছনে থেকে দৃঢ়তম রজ্জুতে তাকে বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেও পারছে না, তাদেরও ছুটতে হচ্ছে ওই গতিবেগের টানে। এই দ্রুত ধাবমান বহির্লোক-প্রধান সভ্যতার পরিণতি কোথায়? বহির্লোকের সীমা পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তার সকল আয়োজন বস্তু-জগতের উপাদানের মধ্যে সংকীর্ণ। সুতরাং এই গতিকে একদা স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ হতে হবে—নিঃশেষিত-ইন্ধন বহ্নিশিখার মত পরিণত হতে হবে অঙ্গারে। অথবা তার পূর্ব্বেই তাকে স্তব্ধ হতে হবে কোন আকস্মিক বিস্ফোরণের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন—পৃথিবীই একদা শেষ হবে—তার সকল উপাদান উত্তাপের অভাবে নিঃশেষিতশক্তি হয়ে মৃত বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে। কিন্তু এই গতিতে ধাবমান বহির্লোকমুখী সভ্যতা সে কাল পর্য্যন্তও সৃষ্টিকে বাঁচতে দেবে না। আয়ু সত্ত্বেও পৃথিবী ও সৃষ্টিকে আত্মঘাতি হতে বাধ্য করবে।

এর একমাত্র উপায় বহির্লোকমুখী সভ্যতা ও আত্মিক সাধনা এই উভয় ধারার সমন্বয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংযোজন। গান্ধীজীর সাধনা এবং মার্কীয় বিজ্ঞানের সহযোগ। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই দুয়ের মিলন। বিজ্ঞান বলে এ অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস বলে সম্ভব। সে বলে—আমার গতি অবাধ, বস্তু সত্যে ও মানবীয় সত্যে এইখানেই পার্থক্য। হৃদয় সত্যের উপাসক গান্ধীজী এই কথাই রেখে গেলেন তাঁর বাণী ও কর্ম্মের মধ্যে।

মহাত্মা গান্ধী

জীবনানন্দ দাশ

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো বলে মনে হয় ;—সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতর ভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরি হৃদয়ের পরে এসে নগ্ন হাত রাখে ;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্ম্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্ব্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা ব'লে চ'লে গেল—মনে হ'ল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মত বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা ক'রে আছে ব'লে—চায় ব'লে,—
নিরাময় হতে চায় ব'লে।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে ;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু ;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী

দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে : মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মত এনে দাঁড় করাবার ;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মত একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে,—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে,—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ ক'রে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে ;—
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে ;
যেই সব বড় বড় মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তদান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মত আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত ; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ করে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত করে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়—

কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে—সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দ্দেশের দিকে রেখে গেছে ;
রেখে চ'লে গেছে—বলে গেছে : শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;—
হয়তো বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন বলে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো বা শুভ পৃথিবীর মানে কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা—রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা ;
হয়তো বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রস্থতির মানে এই শুধু, এই।

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশালী দেখ ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে—শীত ;
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে স'রে চলে গেছে ;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দস্থির
সে সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে ;

আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য্য নীলিমার সফলতা আছে,—
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মত বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই;
তবুও উদয় হয়—ঈশা নয়—ঈশার মতন নয়—আজ এই নতুন দিনের
আর এক জনের মত;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় ব'লে;
হয়তো বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়;
হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে;—সত্য আছে, আলো আছে; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।
আমরা আজকে এই বড় শতকের
মানুষেরা সে আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে
জেগে রবে; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন মহাত্মা।
নিরীহ মফস্বলের নির্জীব রাত্রে কানে এসে পৌঁছুলো
দুঃশ্রব দুঃসংবাদ।
এ কি বিশ্বাস করবার মত? এ কি আয়ত্ত করবার?
মহাচ্ছায় বনস্পতি কি নিমেষে উন্মূলিত হবে
বাতুল বাত্যার অভিঘাতে?
নিবাতনিষ্কম্পা অভ্রান্ত অর্চি কি নির্বাপিত হবে
আকস্মিক ফুৎকারে?
এক নিশ্বাসে শুকিয়ে যাবে কি সেই সরসসুন্দর নির্মল স্নেহসিন্ধু?
যোগসিংহাসন ছেড়ে মহাপ্রয়াণ করবেন কি
মহাযোগী মহারাজ—
ভারতের সারনাথ?
বিশ্বাস করতে পারিনা। কে পারে বিশ্বাস করতে?
বন্ধুহীনের যে বন্ধু,
নিঃস্বজনের যে আশ্রয়,
গৃহহীনের যে আচ্ছাদন,
সঙ্গীহীনের যে শরণাগত পালক—
অবিঘ্ন ও অকপট, মুক্ত ও ছলশূন্য,
অপাপ অকাম অকোপ অখেদ
পুণ্যপুঞ্জতীর্থজলনিধি—
তাঁর উপর হানবে কে আগ্নেয় আঘাত,
কার হবে এই বর্বর বিরুদ্ধতা?

জেনে রাখো, কে সেই হত্যাকারী।

পূর্ব্বাশা ফাল্গুন, ১৩৫৪

তাঁরই স্বদেশবাসী—
যে দেশকে তিনি পদদলিত পথধূলি থেকে
নিয়ে এসেছেন স্বুবর্ণসৌধশীর্ষে :
তাঁরই স্বধর্মাশ্রয়ী—
যে ধর্মকে তিনি মার্জিত করেছেন
আচারের আবিল আবর্জনা থেকে।
প্রার্থনাপিপাসু চিত্তে
কাতর জনতার সম্মুখীন হচ্ছেন
সমাধিনিষ্ঠ সাধনায়,
অমনি নিক্ষিপ্ত হল ঘাতকের অস্ত্র
নির্বুদ্ধি নির্দয়।
এ ঘাতককে প্রেরণ করেছে চক্রান্তকারী ইতিহাসের বক্রতা,
নির্মাণ করেছে জিঘাংসাজর্জর জগৎনাট্যের কালকূট।

জানতে চাইনা।
জানতে চাই সেই ঘাতসহকে,
সেই অঘাতনীয়কে।
যার অভাবে ধরণী ভারভ্রষ্ট হল সেই ধরণীধরকে।
প্রশ্ন করি, এই কি সেই মহৎ পর্যটনের যাত্রাশেষ ?
এই কি সেই মহৎ পরীষ্টির উদ্‌যাপন ?
এই কি নিয়তিনির্ধার ?
অহিংসার ব্রতধারী বলি হবেন হিংসার যূপমূলে ?
বিদ্বেষবিষে পক্ষাহত হবে মানবপ্রেমের আলিঙ্গন ?

তুচ্ছ তৃণখণ্ডও নড়েনা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া,
বৃন্তচ্যুত হয় না সামান্য জীর্ণ পত্র,
প্রস্ফুটিত হয় না বিজন সমুদ্রের সুদূর ফেনবুদ্‌বুদ
মেঘের গায়ে যে অলক্ষিত লেখা ফোটে
শিশুর মুখে যে অহেতুক হাসি

পাখির কণ্ঠে যে অকারণ কাকলী—
সব সেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়—
বিশ্বাস করতেন মহাত্মা।
তাই, এই ভয়াবহ মৃত্যুও কি ঈশ্বরসমর্থিত ?
এ মৃত্যুকে প্রেরণ করেছে কি ইতিহাসের রথচালক,
নির্মাণ করেছে কি জগৎনাট্যের গ্রন্থকার ?

একশো তিরিশ বছর বাঁচতেন নাকি মহাত্মা।
তারপরেও তাঁর জীবন একদিন অবসান হত—
হয়তো বা দুঃসহ রোগে, নিঃসহ জরায়
হয়তো বা আত্মঘাতী অনশনে।
সে মৃত্যুর চেয়ে এ মৃত্যু কি মহনীয় নয় ?
জ্যোতির্ময় নয় ?
নয় কি অর্থান্বিত ও সমীচীন ?
এ বীরের মৃত্যু, তপস্বীর মৃত্যু,
মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার অস্বীকার করার
পরাভূত করার মৃত্যু।
মহাভারতের মহালাভের পর মৌন মহাপ্রস্থান।
এ দধীচির মৃত্যু—
অস্থায়ী অস্থি-র চিতাগ্নিতে সুচিরজীবিনী দীধিতি।
আমাদের চারদিকে শব্দহীন সান্দ্র অন্ধকার—
তার মাঝে জ্বলবে এই স্থির শিখা, অক্ষুন্ন বিভাসা,
কল্যাণ-আলয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাসের মত।
যা বলহীনের বরাভয়,
অশরণের আচ্ছাদন,
নাথহীনের তনুত্রাণ।
অবিশ্বাসীর আস্তিক্য-আরাম,
যুযুধানের সামবাণী।
মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার প্রতিভাস।

ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা রঞ্জিত হল তাঁর রক্তে
তার পরেই হয়তো শুভ্রতার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদ
অবৈরিতার শুভারম্ভ।
এই মৃত্যু তাই তাঁর সাধনার সারবিন্দু,
যথার্থ ও যথাকালীন।
এ মৃত্যু তাঁর জীবনশ্লোকের প্রকৃত ভাষ্যকার।
এ মৃত্যু ছাড়া উদ্ঘাটিত হত না তাঁর
জীবনবহনের চূড়ান্ত মহিমা,
সম্পূর্ণ হত না তাঁর জয়গাথার শেষ চরণ।

কে জানে—

প্রায় দুহাজার বৎসর আগে
এমনি করে মেরেছিল আরেকজনকে
তাঁরই স্বদেশবাসীরা।
তারা কিন্তু আজও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে
অভিশপ্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
খুঁজে পাচ্ছেনা তাদের দেশ, তাদের স্থান, তাদের আশ্রয়।
আমরাও কি অতঃপর অমনি করে
দেশহারা স্থানহারা আশ্রয়হারা হয়ে ঘুরে বেড়াব?
না, চিরন্তন-সম্মুখবর্তী বর্তিকায়
খুঁজে পাব আমাদের মন্ত্রসিদ্ধির সরণি?

গান্ধীজি

অজিত দত্ত

বুদ্ধিকে বুঝি দেবতা ভেবে পূজা করেছিলাম।
যুক্তির গোঁড়ামিতে বুঝি ভুলে গিয়েছিলাম
উপলব্ধির সে অচিন্ত্য লোককে
যেখানে বুদ্ধির কিংবা চাতুর্যের,
বিদ্বত্তার অথবা বিদ্বন্মন্যতার
কারুই প্রবেশের অধিকার নেই।
হয়তো আমাদের মানবিক দৌর্বল্যে
এবং ধূর্ততার শাসন-কৌশলে
অনেক অনেক অসতর্ক মুহূর্তে
আমাদের আত্মাকে আমরা নত করেছি
চতুরতার ছদ্মসম্রাটের সিংহাসন-তলায়।
হয়তো কখনো—হায় দুর্ভাগ্য—
গ্রন্থগত, অধীত ও অনধীত
যথাযথ কিংবা বিকৃতরূপে শ্রুত
অনুপলব্ধ অথচ উচ্চকণ্ঠ
তর্ক ও ব্যাখ্যার অপকৌশলে
মনে হয়েছে—বুদ্ধির বিশালাকার অভিধানে
সত্যই বুঝি লেখা আছে
জগতের সব ধাঁধারই উত্তর,
জীবনের সব রহস্যেরই সমাধান।
কোনোদিন হয়তো আমরা
কসাইয়ের পালিত তুচ্ছতা-তৃপ্ত পশুর মতো
খুঁটে খুঁটে চেখে দেখেছি

চমকপ্রদ কথার মুখরোচক জঞ্জাল,
আর চিত্তের আসন্ন সর্বনাশকে ভুলে গিয়ে
পরম খুশিতে ভেবেছি
এইবার আমরা একটা কিছু পেলাম।
আমরা কি ভয়ের গ্লানি ও লোভের পঙ্কিলতায়
হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রাণের সে শুচিতা—
যা না থাকলে মানুষের হৃদয়ের শাশ্বত সভায়
পৌঁছুনো যায় না ?
আমরা কি তথাকথিত মননশীল বস্তু-চেতনার গর্বে
ভুলে গিয়েছিলাম মানুষের আত্মাকে ?
যুক্তির চক্রাকার মৃত্যুময় আবর্তকেই কি
আমরা মর্যাদা দিয়েছিলাম
মুক্তিতীর্থের ?

আজ সরিয়ে দিলাম
সেই নিরালম্ব বায়ুভূত বুদ্ধির
ভয়াবহ অভিধানকে
বুকের উপর থেকে।
যুক্তি আর তর্কের গগনভেদী ঘোষণযন্ত্রকে
রাখলাম বন্ধ করে।
ক্ষমতার সংগ্রামে চতুরালির কোলাহল যেখানে স্তব্ধ,
জীবিবার দ্বন্দ্বে প্রচারের যন্ত্র যেখানে বিকল,
আর ভাষা যেখানে মূক—
সেই নীরব গম্ভীর আত্মপরিচয়ের মন্দির প্রাঙ্গণে
আজ দাঁড়ালাম এসে
শরীর ও মনের সব আবর্জনা ফেলে দিয়ে
সদ্যোজাত শিশুর মতো ক্ষণিক শুচিতায়।

পূর্ব্বাশা ফাল্গুন, ১৩৫৪

বহুদিনের ঠুলি খুলে
গুণ্ঠনমুক্ত চোখে আজ তাকালাম তোমার দিকে,
আর চোখ ভরে দেখলাম আমার আত্মাকে।
আজ এতদিনে তোমাকে কিছুটা চিনলাম
আর কিছুটা হয়তো জানলাম
মানুষের অদৃশ্য কিন্তু জাজ্বল্যমান আত্মাকে—
কেননা, তুমিই আমাদের আত্মাস্বরূপ—
উপলব্ধিতে ভাস্বর, যদিও দৃষ্টিতে অনুপস্থিত।

৩০শে জানুয়ারী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আকাশে অনেক অন্ধকার,
জ্বলে ওঠে তবু কোনো দীপশিখা যেন বারবার—
নিভে যায়, তবু জ্বলে ওঠে।
একটি আলোর কণা কবে যে হারিয়ে গেছে গাঢ় অন্ধকারে
পৃথিবীর মনে নেই—আকাশেরও মনে নেই আর,
তবু যেন কারা কবে কোথায় সে কথা বলে ওঠেঃ
একটি আলোর কণা ভেঙে দিতে চায় অন্ধকার।

একটি অপূর্ব্ব মন—পৃথিবীর, মানুষের মন
আলো হয় তারার মতন,
একটি অপূর্ব্ব মনে আশা থাকে, থাকে ভালোবাসা

আমরা মৃত্যুর মতো অন্ধকার বুকে নিয়ে জানিনে কোথায় হেঁটে যাই
আমরা মৃতের মতো অন্ধকারে নিয়ত তাকাই
আমাদের ভয় থাকে, থাকেনা হৃদয়।
একটি অপূর্ব্ব মন, একটি হৃদয়
পৃথিবীর ধূলো হয়ে পৃথিবীর মতো কথা কয়,
ধূলো হতে জানে যেন একটি হৃদয়—
পৃথিবীর মতো যেন সয়ে যেতে পারে
প্রভাতের প্রতীক্ষায় পৃথিবীর, পাখীর মতন
হয়ে যেতে পারে অন্ধকারে।

ভয় নেই শুধু আছে একটি হৃদয়
মৃত্যু নেই শুধু থাকে একটি হৃদয়
একটি হৃদয় তার অন্ধকার নেই।
বুঝি তার অন্ধকারও দেবতার মতো
কোন এক প্রাচীন দেবতা
তারে যেন দেখা যায়, শোনা যায় যেন তার কথা
অরণ্যে, আকাশে আর তারপর আশপাশে, ঘরে।
ঘরে দীপ জ্বলে,
মানুষের ঘর নেই, অন্ধকার চেনেনা মানুষ,
আকাশের অন্ধকারে অগণন শবযাত্রা চলে॥

পূর্ব্বাশা ফাল্গুন, ১৩৫৪

তিনটি গুলি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত,
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য,
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত ।

তুমি কত কিছু দিলে,
ধনমান যৌবনেরও বেশী
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি ।
সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকীরিত প্রেমে করুণায় ।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি ।

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়,
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয় ;
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয় ।

তিনটি গুলির শব্দ !
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে কেঁপে দিগন্ত ছাড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হয়ে যায় ।
দূর ভবিষৎ পানে চেয়ে চেয়ে দেখি—
পিস্তলের শব্দ আর নয় ;
অগণন মানুষের বুকে বেজে বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত এই শব্দ নিজেরে ভোলে যে ;
হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয় ।
মারণ অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃতমন্ত্রে পায় শেষে লয় ।

পূর্ব্বাশা ফাল্গুন, ১৩১৪

দশম বর্ষ ● একাদশ সংখ্যা
ফাল্গুন ● ১৩৫৪

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ইত্যাদি গানটি নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সহসা তার সমাপ্তি ঘটবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই বিতর্কের একটা কুফল এই যে, সাধারণ পাঠকের চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে এবং তর্কের ধূলিজালে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে সত্যনির্ণয়ের সম্ভাবনা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আর, এই তর্কটা হচ্ছে প্রধানত বাংলা দেশেই, কিন্তু তার বাহন মুখ্যত ইংরেজি। ফলে তর্কটা অচিরেই বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। তখন তাকে সংযত করবার কোনো উপায় থাকবে না। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ এবং রবীন্দ্রনাথের জনগণ, এই দুটি গানই বিতর্কের বিষয় বলে জাতীয় সংগীতের মর্যাদাভ্রষ্ট হবে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনো নবাগত গানকে উক্ত মর্যাদায় স্থাপন করা হবে। এটাই বিতর্ককারীদের কোনো পক্ষের অভিপ্রেত কিনা জানি না।

তর্কটা যাতে যুক্তিভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত না হয় এবং নিরপরাধ পাঠক-সাধারণ যাতে গোলক-ধাঁধায় পড়ে দিশেহারা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এতদিন হয়তো তর্কটাকে উপেক্ষা করা চলত। কিন্তু ইদানীং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও যেভাবে তর্কজাল বিস্তার করে সাধারণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাতে

আর এটাকে উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জনগণ গানটির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে ত্রিবিধ। এক, গানটি সর্বভারতীয় নয়। তাতে কোনো কোনো প্রদেশের নাম বাদ পড়েছে, সুতরাং সব প্রদেশ এটিকে জাতীয় সংগীত বলে স্বীকার করতে পারে না। দুই, ওটা বস্তুত রাজবন্দনাগীত। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত। তিন, ওটা আসলে ভগবদ্‌বন্দনা অর্থাৎ ধর্মসংগীত। সুতরাং জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেতে পারে না। এই তিন আপত্তির সারবত্তা কতখানি একে একে বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম আপত্তিটি উঠেছে আসামে। সেখানে নাকি একদল লোক গানটিকে জাতীয় সংগীত বলে মানতে চায়নি, কারণ এ গানে আসামের নাম নেই।[১] বলা বাহুল্য এ আপত্তির ভিত্তি অতি দুর্বল। শুধু আসাম নয়, বহু প্রদেশের নামই নেই এ-গানে। তাতে কোনো কোনো প্রদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অন্যগুলির প্রতি ঔদাসীন্য প্রমাণিত হয় না। ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তৃতিকে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনাস্বরূপ কয়েকটিমাত্র প্রদেশের নাম করা হয়েছে। কিন্তু রচনাটি পড়লেই বোঝা যায় বিশাল ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সমগ্রতাই কবির লক্ষ্য। নেহাত বিরুদ্ধতা করাই যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এই রচনায় কবির প্রাদেশিক সংকীর্ণতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রসঙ্গক্রমে দুএকটি কথা বলা অনুচিত হবে না। লক্ষ্য করার বিষয় এই রচনায় ভারতবর্ষের রাজকীয় প্রদেশবিভাগ স্বীকৃত হয়নি। গুজরাট-মরাঠার নাম আজও ভারতীয় মানচিত্রে স্থান পায়নি। সিন্ধু এবং উৎকল তৎকালে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলে স্বীকৃত ছিল না। আর, বঙ্গদেশ তখন কার্জনী বিধানে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু কবি তা স্বীকার করেননি। তিনি রাজকীয় কৃত্রিম বিভাগকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জনপদ-বিভাগকেই এই রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আশা করা যায় স্বাধীন ভারতবর্ষে এই স্বাভাবিক বিভাগগুলিই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এই গানের সার্থকতা আরও বাড়বে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল ...আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের

১ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৭-১২-৪৭) সি. গুপ্ত লিখিত পত্র। আসাম নিবাসী বিজনীর রানী এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছেন (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৮-১২-৪৭)।

প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি—বিন্ধ্যহিমাচল-যমুনাগঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয়-গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে?

—যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, দশম পত্র (৩১-৮ ১৯২৭)

দেখা যাচ্ছে ভারতবিধাতা গানটি দেশাত্মবোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, দেশাত্মজ্ঞান প্রচার এর উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ এটি কেবল মাত্র দেশপরিচয়-গান নয়, সুতরাং 'সমস্ত' প্রদেশ ও নদীপর্বতের নাম এতে নেই। অতএব আসাম, বিহার, কোশল, অন্ধ্র, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশবাসীর ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ নেই।

২

দ্বিতীয় অভিযোগটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও প্রবল। অশোকনাথ শাস্ত্রী ও শশাঙ্কশেখর বাগচী প্রণীত একখানি বহুপ্রচলিত ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে ভারতবিধাতা গানটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সংগীত বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' আবালবৃদ্ধবনিতার সমধিক প্রিয় স্বদেশী সংগীত। প্রথম গানটি অবশ্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের ভারতাগমন ও দিল্লিতে অভিষেক উপলক্ষে রচিত হইলেও দেশবাসী আজ সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে।

—নবপ্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ, ১৩ শ সং (১৯৬৭), পৃ ৩২৬

কোনো বহুপ্রচলিত ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে এরকম উক্তি করার মধ্যে যে সত্যনির্ণয়ের প্রয়াসলেশশূন্য দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তা এই দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষে পরম দুর্লক্ষণ বলে মনে করতে হবে। অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মনে দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক কবি ও তাঁর রচিত সর্বজনপ্রিয় জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে এরকম গ্লানিকর অসত্যসঞ্চারের দ্বারা সমগ্র জাতির দেশাত্মবোধের উৎসধারাকেই যে বিষিয়ে দেওয়া হয়, একথা গ্রন্থকারদ্বয় ক্ষণকালের জন্যও ভাববার অবকাশ পাননি। এই অসত্য প্রচারের বিষক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেশের চিত্তকে আক্রমণ করেছে।

এই অপবাদের উপর নির্ভর করে বিজয় সরকার নামে এক ব্যক্তি এই গানটিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে এটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদাচ্যুত করার প্রস্তাব তুলেছেন। অভিযোক্তার ভাষাই উদ্ধৃত করা যাক।—

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের ভারতে পদার্পণ উপলক্ষে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক হে' সংগীতটি রচনা করিয়াছিলেন। যথাসময়ে দিল্লির দরবারে উক্ত সংগীত গীত হইয়াছিল। আজিকার

শৃঙ্খলমুক্ত ভারতে, শাসক রাজ্যের স্তুতিপূর্ণ সেই সংগীত কোন্ গুণে ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করিতেছে? এটা কি জাতির অপমান অপিচ দাসমনোভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? বাংলায় তথা ভারতবর্ষে জাতীয় সংগীতের কি এতই দৈন্য যে, বিদেশী শাসক সম্রাটের উদ্দেশ্যে রচিত স্তবদ্বারা আজ ভারতবাসী স্বাধীনভারত-দেবতাকে পূজা করিতে থাকিবে?[২]

—হিন্দুস্থান, ১২ নভেম্বর ১৯৪৭

অভিযোগের ভাষা দৃঢ় ও সুনিশ্চিত, কোথাও সংশয়ের লেশমাত্র আভাসও নেই। অথচ এই অভিযোগের আসল ভিত্তি হচ্ছে জনশ্রুতি। জনশ্রুতিতে অতিকৃতি বা বিকৃতি অনিবার্য। বিকৃতির দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—

শুনেছি 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি তিনি বানিয়েছিলেন যুবরাজ জর্জের ভারতভ্রমণের সংবর্ধনার ছলে।

—কবিতা ১৩৫৪ আশ্বিন, পৃ ১৬

এটা যে জনশ্রুতি তা লেখক স্বীকার করেছেন। কিন্তু জনশ্রুতিসুলভ বিকৃতির ফলে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ হয়েছেন যুবরাজ জর্জ এবং দিল্লির দরবার হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত-ভ্রমণ। বলা বাহুল্য যে-সময়ে গানটি রচিত হয় তখন কোনো যুবরাজ ভারত ভ্রমণে আসেননি অথচ জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল লেখক নিরঙ্কুশভাবে এই উক্তিটি করবার পূর্বে এ বিষয়টা একটু ভেবে দেখাও দরকার বোধ করলেন না।

যাহোক, মূল অভিযোগের সত্যতা বিচার করবার পূর্বে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে উক্ত আন্দোলনপ্রসঙ্গে এক বন্ধুর সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। তর্কের বিষয় অসহযোগনীতি ও রবীন্দ্রনাথ। বন্ধু অভিযোগ করে বললেন, যিনি বিদেশী সম্রাট্‌কে ভারতবিধাতা বলে বন্দনা করতে পারেন স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর কোনো কথাই গ্রাহ্য নয়। আমার প্রধান যুক্তি ছিল এই গান, বিশেষত যুগযুগধাবিত যাত্রী, হে চিরসারথি ইত্যাদি উক্তি কোনো সম্রাটের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। সব তর্কের যা গতি হয়, এই তর্কেরও তাই হল। কেউ কাউকে স্বমতে আনতে পারিনি। ভারত-বিধাতা তথা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রথম শুনলাম তখনই। তারপরে আরও অনেকবার শুনেছি। যাহোক, এই তর্কের কিছুকাল পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশনে (বোধ হয় ঢাকা জেলার দিঘির পাড় নামক স্থানে) উপস্থিত হই। অধিবেশনের প্রারম্ভেই গান হল 'জনগণমন-অধিনায়ক'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ তথা বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে স্তব্ধতার দ্বারা জাতীয় সংগীতের প্রতি

২ এ পত্রটির একটি ইংরাজি প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক Orient পত্রে (১৬-১১-৪৭, পৃ ১৫)। লেখাটির শিরোনাম *Is it a national song?* লেখকের নাম B. Sircar।

সম্মান প্রদর্শন করলেন। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম জনতার হৃদয়স্রোতের মুখে কুতার্কিকের সমস্ত যুক্তি তুচ্ছ তৃণের মতোই ভেসে চলে যায়, আরও বুঝলাম 'সেই সংগীত কোন্ গুণে ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করিতেছে'।

১৯৩৭ সালে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের এক পত্রের উত্তরে (২০।১১।৩৭) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভারতবিধাতা গানটি রচনার ইতিহাস দিয়েছেন। কোনো রাজভক্ত বন্ধু তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে। তারই প্রতিবাদে ভারতবিধাতার জয়গান রচিত হয়। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাষাই উদ্ধৃত করি।—

আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি।...সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারে না সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।

—বিচিত্রা ১৩৪৪ পৌষ পৃ ৭০৯

এর পর অভিযোগকারীদের নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভ্রান্ত জনশ্রুতিকে নিরস্ত করা সহজ নয়। কাজেই এর পরেও রবীন্দ্রনাথকে ওই একই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় দ্বিতীয় বার। উপলক্ষ্যটা এই। ১৯৩৯ সালের ৮-৯ এপ্রিল তারিখে (বাংলা ১৩৪৫, ২৫-২৬ চৈত্র) কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ (বা শেষ) অধিবেশন হয়। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই অধিবেশনের জন্য গান নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভারতবিধাতা গানটি নিয়ে অভ্যর্থনাসমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। একপক্ষ বললেন, গানটি দিল্লিদরবারের সময় পঞ্চম জর্জকে লক্ষ্য করে লেখা— সুতরাং এই গানকে জাতীয় সংগীত বলা যেতে পারে না এবং সাহিত্যসম্মেলনেও গাওয়া হতে পারে না। এই পক্ষেরই প্রতিপত্তির জোর ছিল বেশি, তাই অপর পক্ষের প্রবল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ও গানটি বর্জিত হয়। তখন পরাজিত পক্ষের একজন ক্ষুব্ধ সদস্য শ্রীমতী সুধারাণী দেবী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, তা সমগ্রভাবেই প্রকাশ করছি।[৩]

---

৩ রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি লেখার ইতিহাস আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার সেন (শ্রীমতী সুধারাণী দেবীর স্বামী)। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি এই পত্রখানির একটি যথাযথ প্রতিলিপিও পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রভবনেও এই পত্রের একটি নকল রাখা হয়েছিল। বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পত্রখানি এই প্রথম প্রকাশিত হল।

ওঁ

উত্তরায়ণ,
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে প্রশ্ন করেছ এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন পূর্বেও শুনেছি।

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগযুগধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা। ইতি ২৯।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবিধাতা গানটি মন দিয়ে পড়েও যাঁরা এটিকে সম্রাটের স্তব বলে মনে করতে পারেন তাদের সম্বন্ধেই 'অপরিমিত মূঢ়তা'র সন্দেহ মনে জাগে। যে বুদ্ধিভ্রংশকে রবীন্দ্রনাথ দেশের পক্ষে দুর্লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন তাই যেন আজ বাংলা দেশকে বিশেষ করে পেয়ে বসেছে। কিন্তু বুদ্ধিহীনকে বুদ্ধিদানের প্রয়াস বৃথা, যাঁরা স্বেচ্ছায় সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান তাঁদের লক্ষ্য করেও কিছু বলতে যাওয়া নিষ্ফল। কিন্তু অসতর্ক জনসাধারণকে তথ্য ও সত্য জানিয়ে বিভ্রম থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। ভারতবিধাতা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি উক্তি তিন স্থলে উল্লেখ করেছি, আশা করি তার থেকেই সাধারণ পাঠক এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারবেন। তথাপি অভিযোক্তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা বা সংবাদপত্রের নানা স্থান থেকে সংকলন করে দেওয়া প্রয়োজন।

চুঁচুড়া থেকে শ্রীযুক্ত বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—

A 'National Anthem' was indeed sung at the Delhi Durbar to the accompaniment of guns; and it was 'God Save The King' as I find from my copy of 'The Historical Record of the Imperial Visit to India, 1911', published by John Murray, London, in 1914 under the authority and order of the Viceroy of India. The only Indian Musical programme for the occasion was composed and presented to Their Majesties by Prof. Dakshina Sen and Sir Prodyot Tagore during the Pageant at Calcutta on the 5th January, 1912.

—The Orient, 7 Dec., 1947, p. 15

এর থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'যথাসময়ে উক্ত সংগীত দিল্লির দরবারে গীত হইয়াছিল' এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। যাঁর ইচ্ছা তিনিই উল্লিখিত পুস্তকখানি সংগ্রহ করে বিস্তৃত বর্ণনা পেতে পারেন। দক্ষিণা সেন এবং প্রদ্যোৎ ঠাকুরের রাজবন্দনা আজ কোথায় গেল ?

ভারতবিধাতা গানটি প্রথম গীত হয়েছিল কোথায় ও কি উপলক্ষ্যে, তাও অনুসন্ধানের বিষয়। এবিষয়ে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। শ্রীযুক্ত অমল হোম জানিয়েছেন—

This great anthem was first sung at the session of the Indian National Congress held in Calcutta in 1911. It met during the Christmas at Greer's Park — now the Ladies' Park — on Upper Circular Road with Pandit Bishan Narayan Dhar of Lucknow as President. ...I was one of the choir of youngmen and women singing the song led by the late Dinendra Nath Tagore.

—Hindusthan Standard, 14 Dec., 1947

দিল্লিতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অভিষেকদরবার হয় ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে। আর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তার দু সপ্তাহ পরে বড়দিনের ছুটিতে (২৬-২৮ ডিসেম্বর)। তার পরেই সম্রাট্ কলকাতায় আসেন ৩০ ডিসেম্বর এবং কলকাতা থেকে স্বদেশযাত্রা করেন পরবর্তী ৮ জানুআরি (১৯১২) তারিখে। যে গান কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত হল তা যে তৎপূর্বে বা পরে দিল্লিতে বা কলকাতায় রাজসংবর্ধনা উপলক্ষ্যে গীত হতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য।

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উক্তিও আলোচ্য ইতিহাসের মূল্যবান্ উপাদান হিসাবে বিশেষভাবে সংকলনযোগ্য।—

I may be permitted to relate what I know about the song being sung in the 1911-Congress, of which I was an humble worker under one of its principal organisers, the late Sir Dr. Nilratan Sarkar. Dr. Sarkar (as he then was) having come to know that the Poet had composed a song for the forthcoming Maghotsava ceremony which might very suitably be sung also at the Congress, had communicated with him. He asked me to see the Poet, which I did, and I brought the song for Dr. Sarkar. I can never forget the impression it created when first sung at the rehearsal at Dr. Sarkar's Harrison Road House.

—Hindusthan Standard, 15 Dec., 1947

এই বিবৃতিতে যে অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল যথাস্থানে তার উল্লেখ করা

যাবে। তৎপূর্বে তৃতীয় প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

My recollection is clear that this song was specifically composed for the 1911 session of the Congress, although it was sung on the occasion of the Maghotsava, too, that followed soon.

I was living at Jorasanko then and was in charge of the publication of the 'Tattwabodhini Patrika', the official organ of the Adi Brahma Samaj. Rabindranath was the editor. When I asked him what I should use for a heading for the song in the 'Tattwabodhini Patrika', he smiled and said atonce, 'Brahmasangit.' He knew the source of his inspiration and therefore it did not take even a second thought for him to give the answer. To anyone with sense the inner spiritual bearing of the song is unmistakable.

—Hindusthan Standard, 18 Dec., 1947

এই তিন জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি থেকে শুধু তথ্যগত সংবাদগুলিই গ্রহণীয়, ব্যক্তিগত অভিমত বা অনুমানগুলি নয়। উক্ত অভিমত ও অনুমানগুলির সত্যতা বিচারের বিষয়। তথ্য হিসাবে বিবৃতিগুলি থেকে এই কয়েকটি বিষয় জানা যায়।

১ সংগীতটি ১৯১১ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্বে রচিত হয়। তিনটি বিবৃতিতেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

২ ডাঃ নীলরতন সরকার জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে পাঠিয়ে গানটি কবির কাছ থেকে কংগ্রেসের জন্য সংগ্রহ করেন এবং ডাঃ সরকারের বাড়িতেই গানের রিহার্সাল হয়।

৩ এই গানের শিক্ষক বা পরিচালক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪ গানটি কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেই প্রথম গীত হয় (একথাও তিন বিবৃতি থেকেই সমর্থিত হয়) এবং গায়কদের অন্যতম ছিলেন অমল হোম মহাশয় নিজে।

এই সব কয়টি তথ্যই মূল্যবান্।

কিন্তু গানটি রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে বিবৃতিকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। জ্ঞানাঞ্জন বাবুর মতে গানটি মূলত মাঘোৎসবের জন্যই রচিত, যদিও কংগ্রেসে গাওয়ার উপযোগিতা ছিল বলে এটি প্রথমে কংগ্রেসেই গাওয়া হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মতে গানটি মূলত কংগ্রেসের জন্যই রচিত, যদিও এটি পরে মাঘোৎসবেও গাওয়া হয়েছিল। দুই বিপরীত মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়? জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বিবৃতির মধ্যে একটু দ্বিধা দেখা যায়। প্রথমে তিনি দৃঢ়ভাবেই বলেছেন যে, গানটি কংগ্রেসের জন্যই বিশেষভাবে রচিত, কিন্তু বিবৃতির শেষাংশে বলেছেন আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকেই গানটির উদ্ভব এবং সে জন্যই এটি তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকায় 'ব্রহ্মসংগীত' নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ ১৮৩৩ শক, ১৩১৮ বাংলা, ১৯১২ ইংরেজি) এটি শুধু ব্রহ্মসংগীত নামে প্রকাশিত হয়নি। উক্ত পত্রিকায় দেখা যায় গানটির মূল শিরোনাম হচ্ছে 'ভারতবিধাতা' এবং তার নীচে বন্ধনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হরফে লেখা আছে ব্রহ্মসংগীত। সুতরাং ব্রহ্মসংগীত কথাটাই গানটির মুখ্য পরিচয় নয়, মুখ্য পরিচয় হচ্ছে ভারতবিধাতা। রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি সর্বপ্রথমে উদ্ধৃত করেছি তাতে দেখা যায় কবি নিজেই এটির পরিচয় দিচ্ছেন 'ভারতবিধাতার জয়গান' বলে এবং দেশাত্মবোধকেই এই রচনার প্রেরণা বলে জানিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়।

গানটি রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধেও কবি মতভেদের কোনো অবকাশ রাখেননি। পুলিন বাবুকে লিখিত পত্রে (২০।১১।৩৭) তিনি দুটি কথা অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন।— (১) 'বিশেষভাবে এ গান কন্‌গ্রেসের জন্য লিখিত হয়নি'। (২) সম্রাটের জয়গান রচনার অনুরোধের প্রতিবাদ হিসাবেই 'ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা' করে তিনি এ গান রচনা করেছিলেন। সুতরাং এ গান বিশেষভাবে মাঘোৎসবের জন্যও লিখিত হয়নি। পরে যে এটি কংগ্রেস এবং মাঘোৎসব উভয়ত্রই গাওয়া হয়েছিল তার কারণ এই যে, দুই জায়গায় গাওয়ার উপযোগিতাই গানটির আছে। অর্থাৎ এটি যুগপৎ জাতীয় সংগীত এবং ভগবৎসংগীত। এ গানের মূলপ্রেরণা 'দেশাত্মবোধ' অথচ এর লক্ষ্য বিধাতা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশী গানের মূলেই আছে ভক্তিমিশ্র দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

ভারতবিধাতা গানটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'ধর্মসংগীত' নামক পুস্তকে। ওই সালেই কয়েক মাস আগে 'গান' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তাতে অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে জাতীয় সংগীতগুলিও স্থান পেয়েছিল। ভারতবিধাতাকে এই জাতীয় সংগীতগুলির মধ্যে স্থান না দিয়ে ধর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করাতে মনে হয়, কংগ্রেসে প্রথম গীত হওয়া সত্ত্বেও কবি হয়তো তখন পর্যন্ত এটিকে প্রধানত ভক্তিসংগীত বলেই মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে গীতবিতান গ্রন্থে কবি যখন তাঁর সমস্ত গানকে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলায় ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে সাজান (১৯৩৮), তখন জনগণ গানটিকে তিনি যে শুধু 'স্বদেশ' পর্যায়ভুক্ত করেন তা নয়, এটিকে তিনি 'হে মোর চিত্ত', (অর্থাৎ ভারততীর্থ) এবং 'দেশ দেশ' এই দুটি গানেরও পুরোভাগেই স্থান দেন। তাতেই গানটির ভাবদ্যোতনা সম্বন্ধে কবির শেষ অভিমত সংশয়াতীত রূপে ব্যক্ত হয়েছে।

৩

উপরের আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহেই অনুমান করা যায় যে, গানটির রচনাকাল হচ্ছে ১৯১১ সালের নবেমবর-ডিসেমবর মাস। প্রথম গাওয়া হয় কংগ্রেসে সম্ভবত ২৬ ডিসেমবর তারিখে, একমাস পরে আবার গাওয়া হয় মাঘোৎসবের সময় (১১মাঘ ১৩১৮, ইং ২৫ জানুআরি ১৯১২)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসাবে তাও এস্থলে উল্লেখ করা অনুচিত হবে না। গোরা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের প্রারম্ভে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটিকে যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উপন্যাসটির একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ও সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে গোরার দুএকটি উক্তিতে।—

'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দুমুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।...আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দুমুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,...যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।"

—গোরা, অধ্যায় ৭৬

এই ভারতবর্ষের দেবতাই আলোচ্যমান গানটিতে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই গানেও ভারতভাগ্যবিধাতাকে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান ও খ্রীস্টান সর্বসম্প্রদায়ের দেবতা বলেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্ম বাদ গেছে। বৌদ্ধের স্থলে অনায়াসেই ব্রাহ্ম বসান যেতে পারত। এই বাদ যাওয়াটা আকস্মিক নয়। গোরায় ব্রাহ্মদের উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। ভারতবিধাতায় সে প্রয়োজন ছিল না। ১৯১১ সালের আদমসুমারির সময় প্রশ্ন ওঠে ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা। রবীন্দ্রনাথ বলেন ব্রাহ্মরাও হিন্দুই। এবিষয়ে তাঁর মত ও যুক্তি বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপরিচয়' এবং 'হিন্দুব্রাহ্ম' এই দুই প্রবন্ধে। ভারতবিধাতা তার অল্প আগের রচনা। সুতরাং তখনই এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্থির হয়ে গিয়েছিল একথা অনায়াসেই মনে করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনার তারিখ হচ্ছে ১৮ আষাঢ় ১৩১৭, ইংরেজি ২ জুলাই ১৯১০। অর্থাৎ গোরা প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই এটি রচিত হয়। তাতেও দেখি ভারতবিধাতা গানের মতোই প্রথমে আছে ভারতবর্ষের ভূমূর্তির ধ্যান এবং তারপরে আছে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের জনগণের ঐক্যবিধানেরই বাণী। 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি' দেবার এবং 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' মার অভিষেকের কথাই এই রচনাটির মর্মকথা।

এই কবিতায় 'উদার ছন্দে পরমানন্দে' যে দেবতাকে বন্দনা করা হয়েছে, বস্তুত তিনিই হচ্ছেন জনগণঐক্যবধায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা।

দেখা যাচ্ছে গোরাতে (১৯১০ জানুআরি) এবং ভারততীর্থ কবিতাতে (১৯১০ জুলাই) যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে, ভারতবিধাতায় সেই বাণীই উৎসারিত হয়েছে সংগীতের রূপ ধরে। এর পরেও এই ভাবটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে অধিকার করে ছিল; বস্তুত জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই আদর্শকেই নানাভাবে প্রচার করে গিয়েছেন। এখানে ওবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েকমাস আগে নানা কারণে দেশে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছে তখন রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি এবং তারই অনুষঙ্গী হিসাবে 'দেশ দেশ নন্দিত করি' ইত্যাদি বিখ্যাত গানটি প্রকাশিত হয়।[৪] এই গানের সূচনা হিসাবেই উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান্ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন'। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতবিধাতা গান এবং এই গানের আসল ভাব নিগূঢ়ভাবে এক। বস্তুত দুই গানেরই সম্বোধনপাত্র হচ্ছেন জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা। দুই গানের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্যও যথেষ্ট, এই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই উক্ত মন্তব্যের সার্থকতা বোঝা যাবে।

পূর্বোল্লিখিত—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা,
যুগযুগধাবিত যাত্রী,
হে চির সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা॥

এই লাইনগুলির সঙ্গে তুলনীয়—

জনগণপথ তব জয়রথ-চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি' ॥

৪ প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র, পৃ ৫০৯-২১ এবং ৫২২।

এই দুই অংশের মধ্যে ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে থাকা যায় না। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব উদয়গিরিভালে।

এর সঙ্গে তুলনীয়—

নূতনযুগসূর্য উঠিল
ছুটিল তিমিররাত্রি।

দ্বিতীয় গানটি ভারতের ভাগ্যবিধানকর্তা 'জাগ্রত ভগবান্'কে সম্বোধন করে রচিত। জনগণ গানেও ভারতবিধাতাকে প্রকারান্তরে 'জাগ্রত ভগবান্' বলে অভিহিত করা হয়েছে।—

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে
পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল
নত নয়নে অনিমেষে।

শুধু জাগ্রত ভগবানের কথা নয়, এই লাইনগুলির মূল ভাবটাও 'দেশ দেশ' গানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। দুটি গানকে একত্র পড়লে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে, 'দেশ দেশ' গানে যাঁকে বলা হয়েছে জাগ্রত ভগবান, 'জনগণ' গানে তাঁকেই বলা হয়েছে ভারতভাগ্যবিধাতা— কোনো বিদেশী সম্রাট্‌কে নয়।

বস্তুত গোরা উপন্যাস এবং ভারততীর্থ, ভারতবিধাতা ও 'দেশ দেশ' এই তিনটি রচনায় দীর্ঘ কাল ধরে যে মূলভাবের আধিপত্য দেখা যায় তার মধ্যে কোনো মতেই বিদেশী সম্রাটের স্তুতি কল্পনা করার মতো ফাঁক একটুও নেই। বস্তুত ওই মূলভাবের প্রেরণা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, যার ফলে 'দেশ দেশ' রচনার পর দু বছর না যেতেই কবিকে সম্রাট্-দত্ত স্যর উপাধি ত্যাগ করতে হয় (মে ১৯১৯)।

তৃতীয় অভিযোগ উত্থাপন করেছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর মতে 'জনগণ' গানটা হচ্ছে আসলে ধর্মসংগীত, বিশেষভাবে মাঘোৎসবের জন্য রচিত, সুতরাং এটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেবার কোনো হেতু নেই। শুধু এটুকু বলেই তিনি নিরস্ত হননি, যাঁরা এগানটিকে জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করতে চান তাঁদের সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে বর্জন করার অভিসন্ধিও আরোপ করেছেন। তাঁর বিবৃতির গোড়াতেই তিনি বলেছেন—

An attempt is being made by a section of our countrymen to replace Bankim-

chandra's Vande-mataram by this excellent song composed for a different purpose by one of India's great sons.

—Hindusthan Standard, 10 Jan, 1948

Composed for a different purpose অর্থাৎ ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত, এই কথাটাই হেমেন্দ্র বাবুর সমগ্র বিবৃতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞানাঞ্জন বাবু এবং জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পূর্বোদ্ধৃত বিবৃতি দুটির উপরে নির্ভর করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, 'জনগণ' গানটি ভক্তিমূলক ধর্মসংগীত। অতঃপর তিনি বলেছেন—

It is a devotional song and we need not attempt to give it the colour of a patriotic song and convert it into the National Anthem in place of the one (অর্থাৎ বন্দেমাতরম্) which has...supplied inspiration to thousands of Indians during the last forty years.

অর্থাৎ বন্দেমাতরম্ গানের পরিবর্তে এই ভক্তিমূলক গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়। আমরা যথাস্থানে দেখিয়েছি জনগণ গানটি আসলে ভক্তিমূলকও (devotional) নয়, মাঘোৎসবের জন্য রচিতও নয়; গানটি আসলে দেশাত্মবোধমূলক। 'দেশ দেশ' গানের মতো এটিরও মূলপ্রেরণা হচ্ছে দেশপ্রীতি, যদিও ভারতবিধাতা জাগ্রত ভগবান্‌কে সম্বোধন করে রচিত বলে স্বভাবতই ভক্তির গভীরতাও আছে এটিতে। সুতরাং ভক্তিমূলক আখ্যা দিয়ে এগানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদাচ্যুত করা যুক্তিসংগত নয়। যদি গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা না দেওয়াই অভিপ্রেত হয় তাহলে অন্য যুক্তি দিতে হবে, কিংবা একেবারেই কোনো যুক্তি দেবার প্রয়োজন নেই। কেননা জনগণের ইচ্ছা অনুসারেই জাতীয় সংগীত নির্বাচিত হয়। জাতির যদি পছন্দ না হয় তাহলে কোনো যুক্তিতেই গান-বিশেষকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এবং তৎবিপরীতটাও সমভাবে সত্য।

এস্থলে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় সংগীত ও জাতীয় এনথেম এক কথা নয়। এনথেম কথার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নেই, আপাতত মুখ্যতম জাতীয় সংগীত বলে কাজ চালানো যেতে পারে। ভারতবিধাতা জাতীয় সংগীত কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে না। রচয়িতা এটিকে দেশপ্রেমের প্রেরণায় রচনা করেছেন এবং সেভাবে তার প্রয়োগও করেছেন। তাছাড়া, কংগ্রেস থেকে শুরু করে বহু জাতীয় সম্মেলনে ওটিকে সেভাবে গাওয়াও হয়েছে। সুতরাং এটি যে জাতীয় সংগীত সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এটিকে মুখ্যতম জাতীয় সংগীত বলে স্বীকার করা হবে কিনা, তা জাতিরই বিবেচনার বিষয়, ব্যক্তিগত অভিমতের উপর তা নির্ভর করে না। বর্তমানে এ বিষয়টা গণপরিষদের বিবেচনাধীন আছে, সেখানে শেষ সিদ্ধান্ত কি হবে বা হওয়া উচিত সেটা আমাদের চিন্তনীয় নয়।

হেমেন্দ্র বাবুর অভিযোগের দ্বিতীয়াংশ এই যে, কেউ কেউ জনগণকে বন্দেমাতরমের স্থলবর্তী করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সংবাদপত্রে যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের কেউ ওরকম অভিপ্রায় পোষণ করেন এরকম মনে করবার কোনো কারণ দেখি না। বস্তুত জনগণকে বন্দে-মাতরমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করারই কোনো কারণ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এরকম মনে করতেন না। সকলেই জানেন যে তিনি বন্দেমাতরম্ গানের প্রথমাংশের সুর যোজনা করেছিলেন[৫] এবং নানা উপলক্ষ্যে তিনি নিজে এ গান গেয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে যখন বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আপত্তি উঠেছিল তখনও তিনি পণ্ডিত জওহরলালের মারফতে দেশবাসীর কাছে ওগানের প্রথমাংশকে মুখ্য জাতীয় সংগীত বলে স্বীকার করার পক্ষেই অভিমত জানিয়েছিলেন। এমন কি শিশুপাঠ্য পুস্তকে[৬] তিনি বন্দেমাতরম্ গানের উল্লেখ এমনভাবে করেছেন যাতে বোঝা যায়, অপরিণতবুদ্ধি বালকের পক্ষেও ওগানের কথা জানা তিনি আবশ্যক বলে মনে করতেন।

প্রশ্ন হতে পারে জনগণকে বন্দেমাতরমের পাশেই আরএকটি মুখ্য জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করতে বাধা কি? আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো মূলগত অন্তরায় দেখি না। যদি দেশ এটিকে দ্বিতীয় জাতীয় সংগীত বলে মেনে নেয় তাহলে সেটাকে অসংগত বলেও মনে করব না। এ বিষয়ে হেমেন্দ্র বাবুর অভিমত কি জানা গেল না।

৫

বন্দেমাতরম্ গানটি কোন্ গুণে ভারতবর্ষের মুখ্য জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেল তাও এ প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা অসংগত হবে না। প্রথমে ত্রুটির দিক্‌ই দেখা যাক। এই গান সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণজাত এক অদ্ভুত ভাষায় রচিত। তার ছন্দও ত্রুটিহীন নয়। প্রায় সত্তর বৎসরের আয়ুষ্কাল[৭] এবং চল্লিশ বৎসরব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এ গানের সর্ব-সম্মত সুর ঠিক হল না; কোনো জাতীয় সংগীতের পক্ষেই এটা গৌরবের বিষয় নয়। এর ভাব এবং আদর্শও সর্বকালীন এবং সর্বজনীন নয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষেরই সব লোকের পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয় নয় যার জন্য কংগ্রেসকেও এর খণ্ডন স্বীকার করতে হয়েছে (১৯৩৭ অক্টোবর)। এই

৫ রবীন্দ্রনাথ সুখদাং বরদাং মাতরং পর্যন্ত প্রথমাংশের সুর দিয়েছিলেন। এই অংশের রবীন্দ্রপ্রযুক্ত সুরের স্বরলিপি পাওয়া যায় সরলা দেবীর শতগান নামক পুস্তকে—প্রথম সংস্করণ (বৈশাখ ১৩০৭), পৃ ১১৩।

৬ সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩০), চতুর্থ পাঠ।

৭ আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে। তৎপূর্বে এটি বঙ্গদর্শনে (১২৮৭ চৈত্র-১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

খণ্ডনের ফলে মহাসংগীতটির মর্মচ্ছেদ ঘটেনি এমন কথাও বলা যায় না। বস্তুত এই গানের যে অংশ কংগ্রেসকর্তৃক বর্জিত হয়েছে তার সঙ্গে এর প্রাণবস্তুটিও বাদ পড়েছে একথাই আমি মনে করি। অথচ এই গানকে সমগ্রভাবে স্বীকার করলে তাকে সমগ্র ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় করাও কঠিন। আর, আদর্শের দিক্ থেকে এটি বিলেতি জাতীয় মহাসংগীত থেকে অনেক উঁচু স্তরের হলেও ভারতবিধাতার সমস্তরের নয় একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর 'ভুবনমনোমোহিনী' নামক বিখ্যাত স্বদেশী সংগীতটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন,

'এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সেকথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতিকে আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্মংগম হবে না।'

—বিচিত্রা ১৩৪৪ পৌষ, পৃ ৭০৯

সমগ্র বন্দেমাতরম্ গানের পক্ষেও একথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। এটি ভারতবর্ষের সব হিন্দুরও সুপরিচিত ভাবে মর্মংগম হয় না। ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালি হিন্দুর প্রাণকে সমগ্র গানটি যেভাবে স্পর্শ করত আজই সেভাবে করে না। অবাঙালি হিন্দু তথা অহিন্দুর কথা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই এই চমৎকার গানটির প্রাণচ্ছেদ ঘটাতে হয়েছে।

এ গান রচনার উপলক্ষ্যটাও সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করবে না। বস্তুত এ গান আসলে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রূপে পরিকল্পিত বা রচিত হয়নি। সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখের দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায় এ গান সর্বভারতের জন্য উদ্দিষ্ট নয়। সমবেত কণ্ঠে গীত হবার কথাও বঙ্কিমচন্দ্র ভাবেননি। অবশ্য বন্দেমাতরম্ ধ্বনিটাকে তিনি সমবেত কণ্ঠেই স্থাপন করেছেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি-তথা স্বদেশ-উদ্ধারব্রতী সন্তানসম্প্রদায়ের উপযোগী করেই এটি রচিত। বিংশ শতকের গোড়াতে যে স্বদেশপ্রেমিকরা অনুরূপ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে চরম ত্যাগ ও দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন, এ গান সমগ্রভাবে তাঁদের প্রাণে যে-প্রেরণা সঞ্চার করত তার তুলনা নেই। কিন্তু আজ সে আদর্শ ও লক্ষ্য কি স্বদেশব্রতীদের সমভাবে প্রেরণা দিচ্ছে? সে আদর্শ ও লক্ষ্যের কি কোনো পরিবর্তন ঘটেনি?

একথা মনে হতে পারে যে লেখক বন্দেমাতরম্ গানের প্রতি বিরূপ। কিন্তু তা ঠিক নয়। কিছু কাল পূর্বে যখন এই মহাসংগীতটির অঙ্গচ্ছেদের কথা ওঠে (১৯৩৭) তখন সংবাদ-পত্রে এই খণ্ডনপ্রস্তাব তথা পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। তখন যে মত পোষণ করতাম, এখনও তার পরিবর্তনের কারণ ঘটেনি। কারণ জাতীয় সংগীত

কারও ফরমাসে, এমন কি জাতীয় মহাসভার নির্দেশেও রচিত হয় না। জাতীয় মহাসংগীতের আসল নির্বাচক হচ্ছে জাতির হৃদয় এবং ইতিহাসের গতি। সে নির্বাচন কোনো গানের ভাবের গভীরতা, আদর্শের উচ্চতা বা রচনার উপলক্ষ্যের মহত্ত্বের উপরেও নির্ভর করে না। বিলাতের God save the King গানের কথা স্মরণ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বস্তুত কোনো জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমমূলক গানই যে তার মহাসংগীত বলে স্বীকৃত হয় তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যে God save the King এর চেয়ে মহত্তর দেশপ্রীতির গান অনেক আছে। কিন্তু তথাপি উক্ত গানটি স্বমর্যাদাভ্রষ্ট হয়নি। ওদেশে রাজভক্তির গভীরতাও ক্রমেই কমে আসছে, তথাপি সে গান স্বমহিমায় অবিচলিতই আছে। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, ঐতিহ্যের অটল ভিত্তির উপরেই জাতীয় মহাসংগীতের আসল প্রতিষ্ঠা। বন্দেমাতরম্‌কেও নির্বাচন করেছে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ, তার পাদপীঠ রচিত হয়েছে অসংখ্য বীরের চরম আত্মত্যাগে। সুতরাং তার উপরে হস্তক্ষেপের কথা ওঠাই উচিত নয়।

বন্দেমাতরম্‌কে যে আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা হল, ভারতবিধাতাকেও তা দিয়েই পরিমাপ করতে হবে। স্বদেশপ্রীতির গীতগঙ্গোত্রী থেকে এর উদ্‌ভব এবং ভগবদ্‌ভক্তির সাগর-সংগমে এর পরিণতি। তার ভাব ও আদর্শের মহত্ত্ব তথা সর্বজনীনতাও অনস্বীকার্য। আধুনিক কালের পক্ষে এর উপযোগিতাও বন্দেমাতরমের চেয়ে বেশি বই কম নয়। অধিকন্তু তার ভাষা, ছন্দ, সুরও অনবদ্য। কিন্তু এসমস্ত গুণ ও গৌরবের জন্যই যে এ গান জাতীয় মহাসংগীতের মর্যাদা পাবার অধিকারী তা নয়। ইতিহাসের স্বীকৃতি সে পেয়েছে কি না তাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। কার্জনী বিভাগের (১৯০৫) ফলে বাংলা দেশের ক্ষুব্ধ চিত্ত যখন আত্মপ্রকাশের ভাষার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখনই আবিষ্কৃত হল বন্দেমাতরম্ সংগীত। তার পূর্ব্বে তুষারস্তূপে জলধারার মতো আনন্দমঠের উপাখ্যানের মধ্যেই এ গানটি স্তব্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু বঙ্গবিভাগের প্রচণ্ড উত্তাপে বিগলিত হয়ে সে সংগীতধারা যখন আনন্দমঠের শিখর থেকে প্রবল বেগে নির্গত হয়ে বাঙালির চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলল তখনই সে জাতীয় মহাসংগীতের মর্যাদা লাভ করল। ভারতবিধাতা গানটি রচিত হয় ১৯১১ সালে এবং রচনার অত্যল্পকাল পরেই ভারতরাষ্ট্রসভায় গীত হবার গৌরব লাভ করে। সে হিসাবে ভারতবিধাতা বন্দেমাতরম্ থেকে মাত্র কয়েক বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ। অতঃপর গানটি বহু উপলক্ষ্যে বহু জনসভায় গীত হয়ে সমগ্রভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বস্তুত অন্যতম জাতীয় সংগীত হিসাবে এ গানটি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হয়েছে, বন্দেমাতরম্ ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় গানেরই সে সৌভাগ্য হয়নি। এভাবে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই বন্দেমাতরমের পরেই এ গানের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিহাসদেবতা যে অগ্নিঅভিষেকের দ্বারা বিশুদ্ধ করে জাতীয় সংগীতকে জাতির

হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন, শুভলগ্নের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল এ সংগীতটির ললাটে সে পাবকশিখার স্পর্শ ঘটেনি। অবশেষে সে শুভলগ্ন এল গত মহাযুদ্ধের সময়ে। যখন বিদেশী শাসকের আদেশে দেশের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ এবং নেতৃহীন জনতা অসহায় ও ভীতিবিমূঢ়, সেই সময়ে সুদূর মালয় ও ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের ও সর্বসম্প্রদায়ের লক্ষাধিক নরনারী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করল। হাতে অস্ত্র বুকে দুর্জয় সাহস ও মুখে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি নিয়ে তারা যখন ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করল তখন জগতের ইতিহাসের একটি চরম বিস্ময়কর অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হল। এই যে দেশোদ্ধারব্রতী শহিদবাহিনী, তাদের প্রাণে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জুগিয়েছিল ভারতবিধাতা গানেরই একটি রূপান্তরিত সংস্করণ। এই গানের—

জয় হো জয় হো জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো

ধুয়াটির শক্তি কতখানি, লক্ষ শহিদের শোণিতপাত ও আত্মোৎসর্গের দ্বারাই তার পরিমাপ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা বলেন গানটি বিদেশী সম্রাটের স্তুতিমাত্র তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ইতিহাস ভারতীয় থার্মোপাইলি কোহিমা ও মণিপুরের রণক্ষেত্রে সে কথার প্রতিবাদ অক্ষয় রক্তাক্ষরেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। কোহিমা-মণিপুরে নবভারতীয় সন্তানসম্প্রদায় যে কীর্তিকাহিনী রচনা করেছে, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও তা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সত্যানন্দ-ভবানন্দের তুলনাও চলতে পারে না। Facts are stranger than fiction, একথার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। স্বদেশী যুগের বন্দেমাতরম্‌পন্থী শহিদসম্প্রদায়ের বিস্ময়কর ত্যাগের আদর্শকেও অতিক্রম করে গিয়েছে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু তাদের মুখে ছিল না বন্দেমাতরম্, ছিল জয়হিন্দ; আর যে গান তাদের বুকে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল তাও বন্দেমাতরম্ নয়, সেটি হচ্ছে রূপান্তরিত ভারতবিধাতা গান। তাই বলছিলাম ইতিহাসের চরম অগ্নিপরীক্ষার জয়টীকাও এই গানের ললাটে পরানো হয়েছে। সুতরাং এ গানটির জাতীয় সংগীত বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই একথা বলা দুঃসাহসিকতা মাত্র।

জয়হিন্দ ধ্বনিটাও এ প্রসঙ্গে বিচার্য। বঙ্কিমকৃত জাতীয় সংগীতের প্রাণবস্তু যেমন বিধৃত হয়ে আছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে, তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজ যে ভারতজয়গাথাকে জাতীয় সংগীত বলে বরণ করে নিয়েছিল তার মর্মবস্তুও নিহিত আছে জয়হিন্দ ধ্বনিতে। একটাকে আরএকটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ জয়হিন্দ গান ও ধ্বনির সম্পর্ক দেহ এবং আত্মার সম্পর্কের মতোই অচ্ছেদ্য। সুতরাং একথা

স্বীকার করতে হবে যে, জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা গানটিই হচ্ছে জয়হিন্দ ধ্বনির আসল উৎসস্থল। এই জয়হিন্দ ধ্বনিকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তিও এটিকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। জয়হিন্দ ডাকটিকিট প্রকাশের মধ্যেই তার বিশ্বব্যাপী প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আর, জয়হিন্দ ধ্বনিকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এই প্রাণবস্তুর দেহস্বরূপ ভারতজয়-গাথাকেও স্বীকার করা, একথা বিস্মৃত হওয়া চলে না। সুতরাং জয়হিন্দ ধ্বনিকে আশ্রয় করে ভারতবিধাতা গানও যে জাতীয় মহাসংগীত বলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তথা রাষ্ট্রশক্তিরও পরোক্ষ অর্ঘ্যলাভ করেছে একথা বলা অনুচিত হবে না।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও গানের পরিবর্তে জয়হিন্দকে জাতীয় ধ্বনি ও ভারতজয়গাথাকে জাতীয় সংগীত বলে বরণ করে নিয়েছিল। এটা তাৎপর্যহীন নয়। বন্দেমাতরম্ গান ও ধ্বনি সকলের হৃদয়কে সমভাবে স্পর্শ করে না, রাষ্ট্রপতি জওহরলাল ১৯৩৭ সালেই এটা বিশেষভাবে অনুভব করেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অভিজ্ঞতাও ছিল অনুরূপ। মহাত্মাজি অবশ্য বন্দেমাতরম্ ধ্বনির অনুকূলেই মত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকেও এর সঙ্গে আল্লা হো আকবর-কে দ্বিতীয় ধ্বনি বলে মেনে নিতে হয়েছে। তাই ভারত-জাতীয়-বাহিনীর নেতারূপে ঐক্যনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র বন্দেমাতরমের পরিবর্তে একমাত্র জয়হিন্দ ধ্বনি তথা গানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

বহু বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও এক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আদর্শগত চরম অভিন্নতা ছিল, সেটি হচ্ছে জাতিধর্মপ্রান্তনির্বিশেষে সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাধনা। রবীন্দ্রনাথের ভারতবিধাতা গান রচনা ও সুভাষকর্তৃক সে গানকে জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃতির মধ্যেই ওই আদর্শনিষ্ঠার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ একদা সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক বলে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই দেশনায়করূপেই সুভাষচন্দ্র যে ধ্বনি ও গানকে জাতীয় ঐক্য সাধনের মন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন তাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলে না।

৬

রচনার কাল ও ইতিহাসের অগ্নিদীক্ষার তারিখের হিসাবে ভারতবিধাতা বন্দেমাতরমের অনুজ। দেশের স্বীকৃতির বিচারেও বন্দেমাতরমের পরই এর স্থান। পূর্বে নবপ্রবেশিকা রচনা নামক পাঠ্যপুস্তক থেকে যে উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও একথার সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। ইদানীং কংগ্রেসসাহিত্যসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বদেশী গান' নামক পুস্তকেও (১৯৪৬)

ভারতবিধাতা গানটিকে এই দ্বিতীয় স্থানেই স্থাপন করা হয়েছে। আজাদবাহিনীর প্রদত্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে অবশ্য এর স্থান আরও উর্ধ্বে। কিন্তু সেটা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবে ভাবগত ঐতিহ্যগৌরবের দিক্ থেকে আরও একটি চিন্তনীয় বিষয় আছে। সে কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রথম ব্যক্ত হয় ১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে। এই মেলার প্রায় প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের আরম্ভে গীত হত ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত 'গাও ভারতের জয়'। এই সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দিষ্ট।[৮] এই গানের প্রথম অংশটি এই।—

মিলে সব ভারতসন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

তারপর দুই স্তবকে আছে ভারতের অতীতগৌরবকাহিনী। অতঃপর শেষ স্তবকটি এই।—

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি।

এই গান সম্বন্ধে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা

---

৮ যোগেশচন্দ্র বাগল-কৃত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫২), পৃ ১০২।

সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।

—বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, চৈত্র[৯]

লক্ষ্য করার বিষয়, এই গানটির মতো বন্দেমাতরম্ গানেরও প্রথমাংশে মাতৃভূমির ভূমূর্তির ধ্যান আছে। বিশেষভাবে 'ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী' অংশ 'সুজলাং সুফলাং' বিশেষণ দুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্দেমাতরম্ ভাবটিরও পরোক্ষ আভাষ পাওয়া যায় 'মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়' অংশে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে হিন্দুমেলার যুগে 'গাও ভারতের জয়' গানের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। এই বাল্যশিক্ষার প্রভাবই যৌবনকালে তাঁকে এই গানে সুর দিতে প্রবৃত্ত করেছিল এবং আরও পরবর্তী কালে তাঁকে স্বরচিত জনগণ গানে ভারত-বিধাতার পৌনঃপুনিক জয়ঘোষণায় উদবুদ্ধ করেছিল। তবে 'গাও ভারতের জয়' গানে যে হিন্দুসংস্কৃতির প্রাধান্য দেখা যায় তার পরিবর্তে তিনি ভারতের সর্বজনীন ঐক্যের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই হিসাবে সুভাষচন্দ্রের জয়হিন্দ ধ্বনি এবং গান বন্দেমাতরমের অগ্রজ 'গাও ভারতের জয়' মহাগীতেরই উত্তরাধিকারী। অতএব ভারতবিধাতা তথা জয়-হিন্দ গানের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে সরলা দেবীকৃত হিন্দুস্থান গানটিও স্মরণীয়। এই বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ১৯০১ সালে কলকাতা বীডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। আনি বেসান্ত-কৃত কংগ্রেসের ইতিহাসগ্রন্থে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।—

After the President-elect's procession had made its slow way through the crowd, a song, 'Hindustan', composed by Sarola Devi Ghoshal, was sung by a choir of 58 men and boys, the nearly 400 volunteers joining the chorus with fine effect.

—How India Wrought for Freedom, পৃ ৩৩১

জাতীয় মহাসভায় গীত এই গানটির প্রথম কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি।

অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পূরিত সেই নাম গান!
বঙ্গ বিহার উৎকল মান্দ্রাজ মারাঠ
গুর্জর পঞ্জাব রাজপুতান!

৯ বঙ্কিমগ্রন্থাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ), 'বিবিধ' খণ্ড, পৃ ৩৩১ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে 'নমো হিন্দুস্থান'।
জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
নমো হিন্দুস্থান!
ভেদরিপু-বিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
বঙ্গ বিহার উৎকল মান্দ্রাজ ইত্যাদি।[১০]

এই গানে এক দিকে সত্যেন্দ্রনাথকৃত মহাগীতের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকৃত ভারতবিধাতার পূর্বাভাসও তেমনি সুস্পষ্ট। গাও ভারতের জয় এবং গাহ আজি হিন্দুস্থান, এই দুই গানেই ভারতের অতীত গৌরব, তার পৌনঃপুনিক জয়ঘোষণা এবং ঐক্যের দ্বারা বল লাভের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। অপর পক্ষে হিন্দুস্থান এবং ভারত-বিধাতা, এই দুই গানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত[১১] ও সম্প্রদায়ের উল্লেখের মধ্যে চিন্তা ও

১০ এই গানটিকে লেখিকা একাধিকবার পরিবর্তন করেছেন। উদ্ধৃত অংশটি ও-গানের প্রথম রূপ থেকে নেওয়া। বিভিন্ন রূপের জন্য দ্রষ্টব্য প্রগতিলেখকসংঘ-কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় সংগীত' (২য় সং, ১৯৪৫, পৃ ৪০), 'বন্দনা' নামক স্বদেশী গানের সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড, ১৩১৫, পৃ ১৭) এবং সরলা দেবী-কৃত 'শতগান' (তৃতীয় সং, ১৩৩০, পৃ ১১৩-১১৪)। গানটির শেষ রূপে প্রদেশগুলির নাম বাড়ানো হয়েছে। যথা—

বঙ্গ বিহার অযোধ্যা উৎকল
মান্দ্রাজ মরাঠ গুর্জর নেপাল
পঞ্জাব রাজপুতান।
—শতগান, তৃতীয় সং

১১ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (কলকাতা, ১৮৮৬) উপলক্ষ্যে রচিত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গানেই বোধ করি সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাম সংযোজিত হয়। যথা—

পূরব-বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।
—মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৩৫২), পৃ ১৯১-১৯২

হেমচন্দ্রের 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' কবিতাতেও অনুরূপ ভাব দেখা যায়।

আদর্শগত ঐক্য সুস্পষ্ট। আধুনিক কালে বোধ করি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সিংহল থেকে হিমালয় পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষের সমগ্র রূপটি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সন্ততিদের মধ্যে যদি সর্বভারতীয় ঐক্য ও আদর্শের প্রাধান্য দেখা যায় সেটা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে ভারতবিধাতা গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে। বন্দেমাতরম্ গানটি সম্ভবত কংগ্রেসে প্রথম গীত হয় ১৯০৬ সালে।[১২] হিন্দুস্থান গানটি তারও পাঁচ বছর আগে ১৯০১ সালেই কংগ্রেসমণ্ডপে গীত হয়। ওই তিন বছরই কংগ্রেস অধিবেশন হয় কলকাতায়। এই হিসাবে হিন্দুস্থান গানটি শুধু ভারতবিধাতা নয়, বন্দেমাতরমেরও পূর্বে দেশের চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুধু তাই নয়, এ গানটি আসলে বন্দেমাতরমের অগ্রজ 'গাও ভারতের জয়' মহাগীতটিরই রূপভেদ মাত্র। সুতরাং বলা যায় ভারতবিধাতা তথা জয়হিন্দ্ গান রচনাকালের বিচারে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও আভিজাত্য মর্যাদায় হীন নয়, বরং ভারতের প্রথম জাতীয় মহাগীত 'গাও ভারতের জয়' তথা হিন্দুস্থানের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতবিধাতা বা জয়হিন্দেরই ঐতিহ্যগৌরব সব চেয়ে বেশি; এবং এই প্রথম মহাগীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সে বাক্য এই শেষোক্ত মহাগীতটি সম্বন্ধে অধিকতর সংগতি সহকারেই প্রয়োগ করা চলে। বস্তুত ভারতের 'জয়োচ্চারণ' গানে প্রীত হয়ে দেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন –

> এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক :—

এই ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাবাণী রবীন্দ্রনাথকৃত—

> পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
> বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
> তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
> গাহে তব জয়গাথা।

ইত্যাদি ভারতবিধাতা গান কিংবা তারই প্রতিরূপ সুভাষস্বীকৃত জয়হিন্দ্ গান সম্বন্ধে যেমন চমৎকার ভাবে খাটে, আর কোনো গান সম্বন্ধেই তেমন খাটে না, এমন কি বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধেও নয়।

---

১২ আনি বেসান্ত-কৃত *How India Wrought for Freedom*, পৃ ৪৪৭। পূর্ববর্তী পাদটীকায় উল্লিখিত হেমচন্দ্রের গানটিতে বন্দেমাতরমের প্রথমাংশ ও অন্য একটি অংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

অনুলেখ

এই প্রবন্ধ রচনার পর সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত অমল হোম ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উত্তর-প্রত্যুত্তর (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ১৫-১-৪৮ এবং ১৬-১-৪৮) দেখলাম। নূতন কথা কিছুই নেই। সুতরাং এই প্রবন্ধে উক্ত দুই পত্রের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের একখানি পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের (১৯১১ সালের কিনা তাঁর স্মরণ নেই) পূর্ব রাত্রিতে জনগণ গানটি রচিত হয় কংগ্রেসের জন্যই। এই উক্তি অন্যান্য তথ্যের বিরোধী। সম্ভবত দ্বিজেন্দ্র-বাবুরই ভুল হয়েছে। তিনি বীডন স্কোয়ারের কংগ্রেস অধিবেশনে বন্দেমাতরম্ গানেরও উল্লেখ করেছেন। বীডন স্কোয়ারের কংগ্রেস বসে ১৯০১ সালে। সে কংগ্রেসে বন্দেমাতরম্ গান হয় নি, হয়েছিল সরলা দেবীর হিন্দুস্থান গান। সম্ভবত এখানেও দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রান্তি ঘটেছে।

সর্বশেষে এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার বসুর একখানি পত্র দেখলাম অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৫-১-৪৮)। তাতে কোনো তথ্য নেই, আছে একটি প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর বর্তমান প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

সর্বশেষে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্তের একখানি পত্র (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ৪-২-৪৮)। পাটনার সিংহ-লাইব্রেরিতে রক্ষিত কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশ অধিবেশনের রিপোর্ট থেকে তিনি দুএকটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন। উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনের (২৬ ডিসেমবর, মঙ্গলবার) অধিবেশনে গাওয়া হয় বন্দেমাতরম গান এবং দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের কার্যারম্ভ হয় রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রীতিমূলক সংগীতের দ্বারা—"the proceedings commenced with a *prtriotic* song composed by Babu Rabindranath Tagore"। জনগণ ইত্যাদি গানটিই যে এই উক্তির লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রভৃতির সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। তৎকালীন কংগ্রেসের রাজভক্ত মডারেট নেতারাও গানটিকে patriotic অর্থাৎ দেশাত্মবোধমূলক বলেই অভিহিত করেছেন, এ বিষয়টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই দিনের অধিবেশনেই বিভক্তবঙ্গের পুনর্যোজনা ঘোষণার আনন্দে উল্লসিত নেতারা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর সম্রাটদম্পতিকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানানোর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত একটি সংগীত মিলিতকণ্ঠে গাওয়া হয় —"a song of welcome to Their Majesties composed for the occasion was

sung by the choir"। এই গানটি কার রচনা, দক্ষিণা সেন কিংবা প্রদ্যোৎ ঠাকুরের কিনা, তা জানা যায়নি; রবীন্দ্রনাথের যে নয় তাতে সংশয়ের সুযোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ' গানটি দেশভক্তিমূলক (patriotic) অর্থাৎ রাজভক্তিমূলক নয়, সুতরাং এটিকে যে রাজসংবর্ধনার কাজে লাগানো চলে না, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধির অভাব তাঁর তৎকালীন রাজভক্ত বন্ধুদেরও ছিলনা—একথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের আধুনিককালীন দেশ-ভক্তদের মধ্যে সে অভাব দেখলে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে। কেননা 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' গীতার এই উক্তি একটি চিরন্তন সত্য। জনগণ গানটি যদি সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জকে লক্ষ্য করেই রচিত ও গীত হত তাহলে একমাসের মধ্যেই মাঘোৎসবের সময় এই উচ্ছিষ্ট বস্তুটিকে সর্বজন-সমক্ষে ভগবানের উদ্দেশ্যে পুনরুৎসর্গ করা সম্ভব হত না, একথাটা বোঝাও কি খুব কঠিন ?

"বর্ত্তমানে যে বিভ্রান্তিই থাক্‌ ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের মতো বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে; কিন্তু তার জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে অভিন্ন। আমার আশা সে-জাতীয়তা নিজের গণ্ডীতে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকবেনা। তার রূপ হ'বে সহনশীল, সৃষ্টিশীল—আত্মপ্রত্যয়ী এবং জাতির প্রতিভায় বিশ্বাসী হ'য়ে সে একটী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে। সর্ব্বশেষ লক্ষ্য বলে যদি আমাদের কিছু থাকে, তা একমাত্র অভিন্ন পৃথিবীর লক্ষ্যই হতে পারে। আজ তা একটি দূরের স্বপ্ন বলে মনে হয়, কেন না আজ চারদিকে যুধ্যমান দল এবং তৃতীয় মহাসমরের প্রস্তুতি ও উন্মত্ত চীৎকার। তবু, এই চীৎকার সত্ত্বেও, সেই লক্ষ্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। কারণ বিশ্বমৈত্রীর পরিবর্ত্তে যা আমরা চাইব, তা হবে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বনাশ।"—(আলিগড় অভিভাষণ)

—জওহরলাল

লেনিন-আমলে থেকে ষ্টালিন-আমলে

ভিক্টর সার্জ্জ

বিপ্লবের দ্বিতীয় নেতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটি ভাব, তার মানে তার জন্মের ও বিকাশের সাধারণ অবস্থা যখন কোন যুগের হাওয়ায় বর্ত্তমান থাকে, মানুষ যেন তার আভাস পেতে সুরু করে আর এমনও হয় যে একই সময়ে অনেক মানুষ তা উপলব্ধি করে। এভাবেই সব যুগের সত্য ফলপ্রসূ হয়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ত তা খাটেই—রাজনীতি সম্বন্ধেও তাই। একভাবে বলতে গেলে রাজনীতিও বিজ্ঞান, অবশ্য সে-সঙ্গে তাকে শিল্পও বলা যায়। ডারুইন আর ওআলেস্ একই সময়ে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন—তার আভাস এসেছিল বিকাশোন্মুখ তরুণ ধনতান্ত্রিক সমাজের চেহারা থেকে। এক সঙ্গেই জোল আর মেয়ার শক্তির নিত্যতা সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করেন। মার্ক্স এঙ্গেল্স্ বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তি সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—পঁচিশ বছর যাবৎ সমবেত মননচর্চ্চা করে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। রুশ বিপ্লবকে কার্য্যে পরিণত করা এবং অব্যর্থ চিন্তায় সে কার্য্যের পুষ্টিসাধন করা ঠিক তেমনি সমবেত চেষ্টার ফল—সেই সমবেত প্রশংসনীয় চেষ্টা ছিল লেনিনের এবং ট্রট্স্কির।

মেল্ভি স্বাক্ষরিত আদেশের বলে ১৯১৬-তে ট্রট্স্কি ফরাসী দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন—তাঁর নামে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ ছিল। তারপর অবাঞ্ছিত বলে স্পেন থেকেও বিতাড়িত হয়ে তিনি ন্যুইয়র্ক যান। যে কদিন তিনি সেখানে ছিলেন—বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপেই তাঁর সময় কেটেছে। তারপর কানাডায়—সেখান থেকে সমুদ্রপথে রাশিয়ায়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে কিছুকাল বন্দীনিবাসে অন্তরীন থাকবার পর পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের চেষ্টায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯১৭-র ৫ই মে তিনি রাজধানীতে এলেন—এসেই প্রথম বক্তৃতায় ক্ষমতা অধিকারের দাবী জানালেন। বক্তা, সাংবাদিক এবং সংগঠক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব এক-এক সময় মনে হ'ত লেনিনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—লেনিন তাঁর মতো চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারতেন না। লেনিন ছিলেন সৎপ্রকৃতির, সরল এবং দেখ্‌তে সাধারণ মানুষের মতো,

বাইরের লোকের তাঁর দিকে চোখই পড়তনা—কথাবার্ত্তা ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল—শ্রোতারা তাঁর যুক্তিতে মুগ্ধ হতেন, ভাষায় নয়। তিনি লিখতেন বক্তব্য বিষয়টা বল্‌বার জন্যেই—তাতে রচনাশক্তি বা আঙ্গিকের বালাই ছিলনা। কস্মিন কালেও তিনি সাহিত্যের দৈত্যকে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি। কিন্তু ট্রট্‌স্কির দিকে না তাকাবার কারো উপায় ছিলনা—তাঁর চুল, বলিষ্ঠ ঋজু ঘাড় এবং নীল্‌চে ধূসর চোখের তীক্ষ্ণতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা কর্ত্তৃত্বের এবং মান্যতার আবহাওয়া ছিল। সভামঞ্চে তাঁর কণ্ঠ ধাতব সুরে বেজে উঠ্‌ত—প্রত্যেকটি বাক্য তীরের ফলার মতো গিয়ে বিঁধত। এ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ বক্তার আসন তাঁর জন্যেই যেন শূন্য পড়ে ছিল। তাঁর লেখার ভঙ্গীতে চরম কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা—যে লগ্নের প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন—যে লগ্ন আজীবন কামনা করেছেন, আগে থেকেই দেখতে পেয়েছেন, সে লগ্নই যেন এখন এসে উপস্থিত হল। সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলে চিরন্তন বিপ্লবের সূত্রকার ছিলেন তিনি। চিরন্তন বিপ্লব মানে, একটি বিপ্লব তার কাজ সুসম্পন্ন করবার আগে নিঃশেষ হয়ে যায়না কাজেই আন্তর্জাতিক পটভূমিতেই শুধু একটি বিপ্লবকে উপলব্ধি করা যায়।

য়ুরোপের ভাষা আর জাতিগুলোর সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতার দরুণই তিনি রুশ-বিপ্লবীদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশী য়ুরোপীয় ছিলেন। এক বিষয়ে অবশ্যি লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিলনা—লেনিনের ছিল একটি দল, ১৯০৩-১৭ পর্য্যন্ত চোদ্দ বছরের সংগ্রাম ও শ্রমে তৈরী একটি দল। লেনিনের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর এ দলটির মতি ও কর্ম্মসূচী পরিবর্ত্তনের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি: যে মতবাদের সঙ্গে বহুদিন আগে থেকেই ট্রট্‌স্কি সুপরিচিত ছিলেন—মাত্র সেদিন সে মতবাদ সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা জন্মাল। তবু ট্রট্‌স্কি সবান্ধবে সে দলে যোগদান করলেন। এ সময়ের কাগজপত্রে দেখা যায় এ-দুজনের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে আছে—একই সত্তায় যেন এঁরা দু'জন কাজ করে চলেছেন, লক্ষলক্ষ মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তাকে রূপ দিচ্ছেন। এঁরা ছিলেন বিপ্লবের দু'টি শীর্ষ। এঁরাই ছিলেন সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় এবং সর্ব্বাধিক ঘৃণিত। ম্যাক্সিম গোর্কি তখন তাঁর 'নোভায়া ঝিজ্‌ন্' কাগজে নৈরাজ্যের দুষ্ট প্ররোচক এ-দু'জন ব্যক্তিকে রোজ গালাগালি দিতেন:

লেনিন, ট্রট্‌স্কি আর তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা শক্তিমদে মত্ত হয়ে উঠেছেন; বাক্যস্বাধীনতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে তাঁদের লজ্জাকর মনোভঙ্গীই তার প্রমাণ।

লেনিন এবং তার চেলারা মনে করে যে সব রকম অপরাধ করবার অধিকার তাদের আছে···

লেনিন সর্ব্বশক্তিমান যাদুকর নয়, আত্মপ্রত্যয়হীন একজন কৌশলবাজ মাত্র, তার মানসম্মানের পরোয়া নেই—শ্রমসর্ব্বস্বদের জীবনের ভাবনাও নেই······

ভ্লাডিমির লেনিন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তন করছেন—পাঁকে ডোবাবার মতলবে। লেনিন

ট্রট্স্কি আর অন্যান্য যারা বাস্তবের পাঁকে ডুবে মরবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে আত্মঅবমাননার অধিকারের কথা বল্‌লেই একজন রুশকে সুপরিচালিত করা যায়……

১৯১৭-তে ম্যাক্সিম গোর্কি এসব কথা লিখতেন। গৃহযুদ্ধের সুরুতে সমাজবিপ্লবীদল বলশেভিক নেতাদের হত্যা করবার সঙ্কল্প করে—তাদের নজরে ছিল এ-দুজন নেতা। লেনিনকে গুলি করা হয়—লেনিন আহত হন। ট্রট্স্কির গাড়ী উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা ট্রট্স্কিকে হত্যা করবার জন্যে একটি রেলষ্টেশনে ওৎ পেতে ছিল—ভাগ্যক্রমে তিনি অন্য পথে গিয়ে বেঁচে যান। একসময়কার দলিলপত্রে এদু'জন সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মীর নামই সমস্ত ঘটনার শীর্ষে স্থান লাভ করেছে। সাদোলের 'বলশোভিক বিপ্লব', জন রীডের 'প্রলয়ের দশদিন', গিলবোর 'লেনিনের চিত্র' এসময়কার বর্ণনায় ভরপুর। ১৯২৩-এ আদ্রেঁ মোরিৎসে মস্কো থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করেই 'লেনিন-ট্রট্স্কি' নামে একটি বই লিখ্‌লেন। আলবার্ট টমাসকে সাদোল লিখেছিলেন, "বিপ্লবের ভেতর সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছেন ট্রট্স্কি। বিপ্লবের ইস্পাতময় প্রাণপুরুষ তিনি, লেনিন হলেন বিপ্লবের প্রবক্তা।"

১৯১৭-তে অস্থায়ী সরকার বিভিন্ন সীমান্তে আক্রমণ করলেন। পশ্চিমসীমান্তের ভারলাঘব করবার অভিপ্রায়ে মিত্রশক্তি এ দাবী জানিয়েছিলেন। দাবী মেটাতে গিয়ে অস্থায়ী সরকার বিপন্ন হয়ে উঠলেন। মেসিনগানের মুখে সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল—বাহিনীর প্রধান অংশ ছত্রভঙ্গ হল। পিটুনির ভয় দেখিয়ে বা সঙ্গীন উঁচিয়ে কোন ফল হলনা—গ্রীষ্মের গরমে সমস্ত বাহিনী জল হয়ে গড়িয়ে গেল। বন্দুক-বারুদের বোঝা নিয়ে সৈন্যরা সীমান্ত ছেড়ে চলে আস্‌তে সুরু করল—এসে শান্তির দাবী করে বস্‌ল। পেট্রোগ্রাডের সৈন্যশিবির আর কারখানা খালি করে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—তাদের মন্ত্রণাদাতা ছিল নৈরাজ্যবাদীরা। বলশেভিকরা এ উপদেশ তাদের দেননি, তাঁরা ভেবেছিলেন ক্ষমতা অধিকারের সময় এখনও উপস্থিত হয়নি।

এই বিদ্রোহ দমনে কেরেনস্কি প্রভুভক্ত প্রচুর কশাক সৈন্যের উপর নির্ভর করতে পারতেন। পরদিন বলশেভিকদল বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। ফিনল্যাণ্ডের বলটিক সমুদ্রের ধারে একটি কুটিরে গোপন আশ্রয় নিয়েছিলেন লেনিন আর জিনোভিয়েভ্‌। এখানেই লেনিনের রাষ্ট্রসম্পর্কিত পুস্তকটি রচিত হয়। ট্রট্স্কি ধরা দিলেন—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হতে পারে জেনেও ধরা দিলেন এজন্যে যে দু'জনের অন্তত একজন প্রকাশ্যভাবে দায়িত্ব বহন করছে দেখা যাবে।

এ সময়ে এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে একটি বিষ অবিষ্কৃত হ'ল—অব্যর্থ তার ক্রিয়া কিন্তু অল্পের জন্যে তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন এবং তাঁদের সঙ্গে শিশুবিপ্লবেরও জীবন রক্ষা হ'ল।

ক্রমশঃ

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঁয়ত্রিশ

প্রমথেশ বললেন, 'কংগ্রেস এবার কি করবে ?'

বিছানা ছেড়ে এখন তিনি নেমে এসে ইজিচেয়ারে বসতে পারছেন। পাশে টুলে বসে তামসী কি-একটা সেলাই করছে। কোনো উত্তর দিলে না। নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হাতের সেলাইটা নাড়তে চাড়তে লাগল।

প্রশ্নটা প্রমথেশ আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আগ্রহশূন্যের মত তামসী উত্তর দিলে, 'আপনার কী মনে হয় ?'

উত্তরটা প্রমথেশের মোটেই মনঃপূত হলনা। মনে হল তামসী যেন এ সব বিষয়ে উত্তাপ হারিয়ে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে দেখলেন তাকে তাকিয়ে। অনর্গল আলস্যে-আরামে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, শিশিরগদগদ প্রাতঃস্ফুট ফুলের মত। যেন উৎসর্গ নেই, নিবেদন নেই, শুধু ফুলদানির উপচার। শুধু গৃহসজ্জার আভরণ। সংসারশৃঙ্খলায় বড় বেশি তার উল্লাস, তার উদ্ঘাটন এখন বিলাসে-বিন্যাসে। তাঁরই প্রশ্রয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে কি সে ধার হারাবে, তাপ হারাবে, হয়ে উঠবে নিষ্প্রাণ পটপুত্তলি ? জাপানের ত্বরিত আক্রমণের আতঙ্ক এখন কমে যাচ্ছে, বিতাড়িতের দল প্রত্যাবৃত্তের মত ফিরে আসছে ক্রমে-ক্রমে। প্রমথেশের স্ত্রী পর্যন্ত ফিরে এসেছেন। তবু মেয়েটার চলে যাবার চেষ্টা নেই। যেন এ সংসারের সেই কাণ্ডারী, তারই মৌরসী মালিকানা। এর সংস্কার-শোধনের সেই অধিনায়িকা। যেন আর কেউ আসবে তারই প্রতীক্ষা করার বিনিশ্চিত স্বত্ব বর্তেছে তাতে। সেই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাটা প্রকট হয়ে উঠছে তার উৎসুক দৈহিকতায়। ছি ছি, ব্যক্তিত্বের দীপ্তির চেয়ে শোভাসর্বস্ব দেহটাকেই সে বড় করে ধরবে ? অধিপের আসার চাইতে আর কোনো বড় আশার সে পদশব্দ শুনবেনা ?

প্রমথেশ বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। 'আমার কী মনে হয় না-হয় তা জিজ্ঞাস্য

নয়, কথা হচ্ছে তুমি কী মনে করছ ? তোমার উত্তরে অন্তত তোমার আজকের মনের গড়নটা বোঝা যেত।'

অত্যন্ত রুষ্ট প্রশ্ন। তবু তামসীর মনে আঁচড় পড়ল না। ভাবখানা এই, মনের গড়ন যাই হোক, দেহের গড়ন মনোলোভন হচ্ছে। আপনার সংসার আর নামঞ্জুর করতে পারবেনা আমাকে। অনির্দেশ্য কাল প্রতিপালিত হব। আমি আপনার কুলবর্তিকা।

শান্ত, নিস্পৃহ গলায় তামসী বললে, 'ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যমে আপ্রাণ সাহায্য করবে।'

সাহায্য করবে! প্রমথেশের ক্ষীণ, মরা রক্ত জ্বলে উঠল অকস্মাৎ। তুমি এই কথা বলছ ? সাহায্য করবে যাতে সে যুদ্ধে জিতে আরো জেঁকে বসতে পারে বুকের উপর। যাতে আমাদের দাসত্বটা অবিনশ্বর হয়ে থাকে। যাতে সমস্ত উত্থান-আন্দোলন চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। বা, চমৎকার বলেছ। বলবেই বা না কেন ? নিজে আরামজড়িমায় আচ্ছন্ন হয়ে আছ, তাই আর আঘাতসংঘাতের কথা ভাবতে পারছ না। ভাবছ, সমস্ত দেশের লোকই বুঝি অমনি দুর্বল, সহিষ্ণু, নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু দেশের মেজাজ তোমার মেজাজের মতন আজ আর ঠাণ্ডা নেই। দেশ আজ উপবাসী, তীক্ষ্ননখর। তোমার আর কি, কদিন পরে দেখব বসে-বসে সূঁচলো নখে দিব্যি রঙ লাগাচ্ছ—

তামসী স্নিগ্ধমুখে হাসল। বললে, 'মন্দ লাভ হবে না। ইংরেজকে তাড়িয়ে জাপানীর পদানত হবেন। শৃঙ্খলের স্বত্ব আমাদের ঠিক কায়েমীই থাকবে। আমাদের চিরাচরিত সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।'

না, তবু ইংরেজ বিতাড়িত হোক। দুশো বৎসরের এই কঙ্কালস্তূপভার অপসারিত হোক একবার। পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন, যখন সুযোগ আছে, পুরাতন বনেদী ব্যাধি থেকে তো ত্রাণ পাই, তারপর দেখা যাবে তরুণ রোগের আক্রমণ। দূরমূলপ্রসারী বিষবৃক্ষকে তো একবার উচ্ছেদ করি, তারপর দেখব এই মৃত্তিকায় কি করে আর বিদেশী গুল্মের জন্ম হতে পারে। আমরা এবার যে পরশু হাতে তুলে নেব তার আস্য বিস্তৃত, তার কাজ পাতন আর ছেদন—যে আছে তার ছেদন, আর যে আসছে তার পাতন—তোমার হাতের ঐ ফুল-তোলা ঠুনকো বিলাসী ছুঁচ নয়।

নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচ চেপে ধরে দুষ্টু মুখে আবার হাসল তামসী। বললে, 'তবু নীতির দিকটা তো বিচার করবেন। যুদ্ধে পক্ষের চেয়ে নীতিরই মূল্য বেশি। আপনিই বলুন, বেশি নয় ? ইংরেজ গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধ করছে, আর আপনার ঐ অক্ষশক্তি—'

ইজিচেয়ারের সামনে টেবিল নেই। থাকলে তার উপর প্রবল কিল মেরে উঠে বসতেন প্রমথেশ। নীতি! তুমি নীতির কথা বলছ ? যে জাত পরভোজী, পরস্বাপহারী, পরপীড়ক, তার আবার নীতির বালাই কোথায় ? একটা মহাদেশের মত দেশকে যে স্বার্থস্ফীতির জন্যে

খর্ব, খণ্ড, পঙ্গু করে রেখেছে, তার নীতির কথা বলার আগে জিহ্বা যেন অসাড় হয়ে যায়—

'যাই আপনার দুধ নিয়ে আসি গে।' সেলাইটা হাতে নিয়েই মন্থর পায়ে চলে গেল তামসী।

আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছা ছিল প্রমথেশের। অনেক উত্তেজিত বক্তৃতা। বলা হল না। বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। ক্লান্তের মতো চেয়ারে পিঠ নামিয়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, তাঁর পথ্য খাবার সময় হয়েছে বটে। কাঁটার দিকে ঠিক লক্ষ্য আছে তামসীর। থাকবে না কেন ? সে যে মূর্তিমতী শৃংখলা, মূর্তিমতী নির্মিতি।

সেদিন তামসী দেখল প্রমথেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অথর্ব পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করছেন আর টলছেন। ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে তামসী ধরতে গেল তাঁকে।. প্রমথেশ চেঁচিয়ে উঠলেন: 'না, ধোরো না আমাকে। তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি উঠতে পারব, হাঁটতে পারব—'

'কোথায় যাবেন আপনি ?' তামসী ধরে ফেলল।

'গতবার ডাণ্ডি-যাত্রায় সমুদ্র পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এবার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে চলে যাব।' তামসীর হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগলেন প্রমথেশ।

'লাভের মধ্যে এই, পড়ে মরে যাবেন।' আস্তে-আস্তে তামসী আবার তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

না, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চিরকাল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটেছি, এবার কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটব। শাল-দোশালা চড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলেছি, এবার গায়ে তুলে নেব রিক্ততার শরাঘাত। কী দিলাম দেশকে ? একটা পুত্র দিয়েছিলাম, তাও শেষে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দেশের ব্রতে যাতে অমনোনীত হতে পারে তার জন্যে তাকে অমানুষ করে তুললাম। যেমন তোমাকে এখন চেষ্টা করছি। তাই তোমাদের দিয়ে আশা নেই, আমিই যাব। নেতা হব বলে অভিমান ছিল, এখন দেখতে পারছি সামান্য সৈনিক হবার মত সুখ নেই। তুমি কী করবে ?

তামসী চুপ করে বসে রইল।

'তুমি খবরটা এখনো শোননি বুঝি ?'

'শুনেছি।'

'কী শুনেছ ? ইংরেজ খুব জিতছে ? আর তাইতেই খুব উল্লাস করছি ?'

'না। ওয়ার্কিং কমিটির সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে গভর্ণমেণ্ট। মায় মহাত্মাকে পর্যন্ত।'

'এর পরেও তুমি ভাবছ তুমি চুপ করে বসে থাকবে ?'

তামসী ঢোঁক গিলল। শান্ত স্বরে বললে, 'যারা চুপ করে বসে থাকে, তারাও হয়তো সেবা করে, সংগ্রাম করে।'

বিশ্বাস করি না। সেদিন নীতির কথা বলছিলে না? যদি নীতি কিছু থাকে তবে আছে শুধু এই মন্ত্রে—কুইট ইণ্ডিয়া, ভারত ছাড়ো। কত বড় সত্য কত বড় ধর্ম নিহিত আছে এই সূক্তে। বাক্য যদি কোথাও সার্থক, সমীচীন হয়ে থাকে, তবে এই কুইট ইণ্ডিয়ায়। এ ঘর-বাড়ি তোমার নয়, তোমাকে আমি ভাড়াটে বসাইনি, পাট্টা-পত্তন দিইনি, তুমি অনুমতিসূত্রে দখলকারও নও। তুমি অনধিকার প্রবেশকারী। তোমার স্বত্ব নেই কাণাকড়ির। তুমি গায়ের জোরে বেদখল করে আছ। তুমি ফৌজদারিতে দণ্ডণীয়, দেওয়ানিতে উচ্ছেদ-যোগ্য। পরের খাদ্যে দাঁত বসিয়ে তাকে তুমি আত্মসাৎ করতে চাও কোন ধর্মবলে? গায়ের জোরের পিছনে তোমার যুক্তি কোথায়? অতএব, হে নীতিমান, সরে পড়। যদিও দরকার নেই, তবু তোমাকে যে একটা মৌলিক নোটিশ দিচ্ছি তা আমাদের ভদ্রতা মাত্র। যদি এই নোটিশে না চলে যাও, তবে উলটো গায়ের জোরে তোমাকে দেশছাড়া করব।

এই নীতির উত্তর দিক উদ্ধতেরা। এর উত্তর নেই। নতি স্বীকার করে সংকুচিত হয়ে আস্তে-আস্তে সরে পড়তে হবে। এই নীতিতেই জয় হবে ভারতবর্ষের।

'কিন্তু গায়ের জোরে পারবেন ওদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয় পারব। লক্ষ-লক্ষ হাত মেলাতে পারলে মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে ওদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ। ভেঙে পড়বে যুদ্ধজয়ের আয়োজন-আস্ফালন—

'কিন্তু ফল কী হবে?'

'ফলের কথা তারাই ভাবে যারা তোমার মত বসে-বসে বুলি কপচায়, শূন্যগর্ভ ভাবের উপরে মেকি বুদ্ধির পালিশ ঘসে! আর যারা মরে তারা তর্ক করে না, গবেষণা করে না, দগ্ধ মশাল আরেক জনের হাতে পৌঁছে দিয়ে নিজে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। অহেতুক হোক, দেশের জন্যে কোনো মৃত্যুই অসার্থক নয়। আর অগণন অহেতুক মৃত্যু ছাড়া দেশ কখনো বন্ধনমুক্ত হয়েছে?'

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন প্রমথেশ। দূরে কোথাও ট্র্যাম বা মিলিটারি লরি পুড়ছে। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিকটা। তামসী কোথায়? দোতলায় তার নির্জন ঘরে বসে বোধহয় বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করছে। হে পর্জন্যদেব, আগুন নিবিয়ে দাও। একটা ট্র্যাম বা লরি পুড়িয়ে কী হবে?

পশ্চিম আকাশটা আস্তে-আস্তে ম্লান হতে-হতে মুছে গেল। দরজার বাইরে পরদার আড়ালে বারান্দায় কে যেন মৃদু পায়ে পাইচারি করছে। কী দরকারে দেখা করতে এসেছে বুঝি। দ্বিধা করছে কাউকে ডাকবে কি ডাকবে না।

'কে ?' প্রমথেশই সম্বোধন করলেন।

'আমি।' আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করল।

'এ কে, অধিপ ?' প্রমথেশ সবল হাতে নিজের বুক চেপে ধরলেন: 'ফিরে এলি ?' উঠে ধরতে গেলেন ছেলেকে: 'আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকলে সব জিনিসই তা হলে ফিরে আসে। তেমনি তবে ফিরে আসবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।'

'আসবে। আপনি অস্থির হবেন না।' অধিপ প্রমথেশকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসল একটা চেয়ার টেনে। বললে, 'সত্যি ফিরে এসেছি বাবা।'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন প্রমথেশ। অধিপের এ কি চেহারা এ কি সাজগোজ! যেন কোন আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝলসে গিয়েছে সর্বাঙ্গ। উন্মাদ জটিল চুল, দুই চোখে আতঙ্কপীড়িত অনিদ্রা। পরনে কালিঝুলি মাখা ট্রাউজার্স। গায়ে হাতা-গুটানো ছেঁড়া শার্ট। যেন কতদিন স্নানের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় নেই, নেই নিশ্চিন্ত শয্যার সঙ্গে। শরীর শুকিয়ে গিয়েছে আমসির মত। একটা দয়াহীন রুক্ষতা সমস্ত চেহারার উপরে কঠিন ছাপ ফেলেছে। মৃত্যুর গালা দিয়ে ঢেকেছে যেন বাকি জীবনের আয়ুষ্কাল।

তবু, যাক, ফিরে এসেছে অধিপ। আয়। এবার তোকে নির্মল ঘুম দেব, দেব মেদুর নিভৃতি, শান্তশীতল গৃহচ্ছায়া। তুই তো জানিস না তোর জন্য কী ধন আমি আহরণ করে রেখেছি। তার বিস্ময়-উজ্জ্বল উপস্থিতি দিয়ে তোর ঘর সে পূর্ণ করবে, স্নেহার্দ্র স্পর্শে মুছে নেবে তোর সমস্ত ক্লেদক্লান্তি। তুই জানিস না সে করুণার ধারাঙ্কুর।

'ফিরে এসেছি বাবা সেই প্রথম যাত্রাবিন্দুতে। যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলুম, সেইখানে। বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছি এতদিনে। এবার আর বেঁকবনা, ঘুরবনা, লক্ষ্যস্থলের দিকে ঠিক সোজা এগিয়ে যাব—তীরের মত, বুলেটের মত।'

প্রমথেশ অধিপের দুই হাত চেপে ধরলেন। ভয়ে না উৎসাহে কে বলবে।

'হ্যাঁ বাবা, আবার আমি কর্মক্রিয় বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। অজেয় আগুনে শোধন করে নিয়েছি নিজেকে। এই দেখুন।' পেন্টালুনের কোন অদৃশ্য গহ্বর থেকে সে রিভলবার বার করলে। বললে, 'আপাতত কিছু টাকা চাই আপনার কাছে।'

দীপ্ত মুখে প্রমথেশ জিগগেস করলেন, 'কত ?'

'পাঁচ হাজার।'

'কী হবে টাকা দিয়ে ? আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ হবে ?'

এবার বলদৃপ্ত রিক্ত হাতের বিপ্লব। জনকয়েকের বিপ্লব নয়, জনতার বিপ্লব। এবার আগ্নেয়াস্ত্র চেয়েচিন্তে চুরি করে জোগাড় করতে হবেনা, এবার হামলা দিয়ে লক্ষ হাতে ছিঁড়ে-কেড়ে ছিনিয়ে নেব ওদের থেকে। এবার আমাদের আসল অস্ত্র দেয়াশলাইর শীর্ণ কাঠির ক্ষীণ

বারুদবিন্দু। আর ঐ এক বহ্নিকণা থেকেই অখণ্ড অগ্নিকাণ্ড। তবু টাকার প্রয়োজন আছে নানা কারণে—

'শুধু একটা ট্রাম বা লরি পুড়িয়ে কি হবে?' প্রমথেশের কণ্ঠে যেন আর কার প্রশ্ন অতর্কিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

দুশো বছরের পত্রপুষ্পহীন মৃত অরণ্যে আগুন লেগেছে এবার। শুধু শাখা পুড়ছেনা, পুড়ছে দণ্ড-কাণ্ড, ভিত-বনেদ। যে যা পারছে তাই পোড়াচ্ছে। ভেঙে ফেলছে যত যুদ্ধকরণের আয়োজন। শুধু ট্রাম-লরি নয়, পুড়ছে রেলস্টেশন, পুড়ছে ব্রিজ, পুড়ছে আর্সেনেল। গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ হচ্ছে অথচ ভারতবর্ষ থাকবে দাসত্বের ভারবাহী হয়ে এ উপহাসের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে—

'কিন্তু তোমরা তা পারবে?'

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মরতে তো পারব। অপমানের প্রহারে সমস্ত দেশ যদি মরিয়া হয়ে জেগে ওঠে একবার—'

'কিন্তু আমার মনে হয় এ আন্দোলন ওরা সহজেই বন্ধ করে দিতে পারবে। যখন বল পরীক্ষার প্রশ্ন, তখন সন্দেহ কি, ওদের বল বেশি।'

'আমাদের বলি বেশি। জানিনা বন্ধ করে দিতে পারবে কিনা। বন্ধ করতে পারলেও হাড়ে-হাড়ে বুঝবে এতদিনে, আমরা রাগতে পারি, আর রাগলে আমাদের ভঙ্গিটা কি রকম দেখায়! আগে-আগে আবেদন করেছি, পরে করেছি অভিমান, এখন সবল সাবালকের মত ক্রুদ্ধ হতে শিখেছি। এবার একবার আমাদের ক্রোধের উত্তাপটা ওরা দেখুক। দেখুক আমাদের মাত্রা উঠতে পারে কতদূর। এবার হাঁটতে শিখেছি, কদিন পরে ছুটতে শিখব, হামাগুড়িতে আর ফিরে যাওয়া নেই। দিন, দেরি করবার সময় নেই, টাকাটা বার করুন শিগগির।' দুর্বৃত্তের ভঙ্গিতে হাত বাড়াল অধিপ।

দেব, নিশ্চয়ই দেব। আরেকদিন এমনি পাঁচ হাজার টাকাই চেয়েছিলি আমার কাছে। দিইনি। সেদিন আর আজ! সেদিন চেয়েছিলি ইলেকশানে দাঁড়াতে, তার মানে, নিজে দাঁড়াতে। আজ চাইছিস দেশকে দাঁড় করাবার জন্যে। প্রথম অস্ত্রপ্রহারের উদ্ধতিতে। হাসিমুখে খুলে দেব আলমারি। লুট করতে হবেনা, ডাক করতে হবেনা রিভলভার।

কিন্তু অত টাকা কি মজুত আছে? হাজার দুই হতে পারে মেরে-কেটে। তার চেয়ে, আমি বলি কি, এক কাজ কর। এই রাতটা এখানে থাক্। খা, ঘুমো। কাল সকালে তোকে চেক দেব পুরো টাকার। ভাঙিয়ে নিবি ব্যাঙ্ক থেকে। সেই ভাল হবেনা? একটি রাত এক পলকে উড়ে যাবে।

রাতের অনির্দেশ্য অন্ধকার যেন ভয় দেখাল অধিপকে। সে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

বললে, 'না, রাত কাটাবার সময় নেই। আমাকে চলে যেতে হবে এক্ষুণি। দিন, চাবি দিন। যা আছে তাই এখন নিয়ে যাই।'

স্নেহাভিষিক্ত চোখে প্রমথেশ তাকালেন অধিপের দিকে। দেব, সব দেব, কিন্তু চলে যাবি কেন? কোথায় যাবি? কী হবে ঐ প্রমত্ত প্রলয়ে ঝাঁপ দিয়ে? তার চেয়ে, জীবনে সত্যিকারের বিশ্রাম নে এবার। অনেক ঘুরেছিস উদ্ভ্রান্তের মত, এবার শান্তির নিকুঞ্জে চলে আয়, চলে আয় আনন্দের বন্দরে। তোর জন্যে আমি গৃহ রেখেছি, রেখেছি অনিন্দ্যাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী। অন্ধকার আকাশের অব্যর্থ শুকতারা। তোর উৎসুক চোখের স্থির আশ্রয়। তোর অভীষ্টপূর্তি। রেখেছি সৌভাগ্যবর্দ্ধন ভবিষ্যৎ, কুসুমকোমল জীবযাত্রা। কোথায় যাবি ঐ অগ্নিশিখার ভষ্মশেষে?

একটা পুত্র দিয়েছিলাম দেশকে, তাও আজ ফিরিয়ে নেব অক্ষণে? ধর্মভ্রষ্ট করব? অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত করব? আবার?

মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলেন না প্রমথেশ।

অধিপ আবার তাড়া দিল। চাবি দিন শিগগির। দেরি করে ভাল করছেন না।

'দাঁড়া, চাবি কি আমার কাছে আছে? চাবি আছে তামসীর কাছে। দাঁড়া, তাকে ডাকি।' বলে প্রমথেশ কলিং-বেলে আঙুলের বাড়ি মারলেন।

কথাটার অর্থ যেন ভাল করে বুঝতে পারল না অধিপ। একটা প্রহেলিকার মত মনে হল। রিভলভারটা উন্মুখ করে রাখল।

ফিরে যাবে অধিপ। এসেছে কিন্তু ফিরে যাবে। তৃষ্ণার জল কণ্ঠের উপকণ্ঠে এসে শুকিয়ে যাবে। মেয়েটার মুখের দিকে আর কি করে তাকাবেন প্রমথেশ? তার এত দিনের প্রতীক্ষা এতদিনের প্রস্ফুটন নিস্ফল পরিহাসে পরিণত হল। এর পর এই শূন্য পুরীতে মেয়েটাকে তিনি কিসের আশ্বাস দেবেন? কিসের প্রলোভন?

ঘণ্টায় আবার ঘা দিলেন প্রমথেশ। মেয়েটা দেরি করছে। সাজগোজ করছে নাকি?

হ্যাঁ, একটু যেন ফিটফাট হয়েই এসেছে তামসী। একটু যেন প্রস্তুত।

'দেখছ অধিপ এসেছে।'

'দেখেছি।'

'পাঁচ হাজার টাকা চায়। নগদ কত আছে?'

'মজুত দু হাজার। আর চলতি সংসার খরচের খাতে—'

'দু হাজারই ওকে দিয়ে দাও। পাঁচ হাজারই আজ দিয়ে দিতাম। আদ্ধেকেরও বেশি বাকী থাকল। মরবার আগে বোধহয় আর শোধ করতে পারবনা। যদি আবার কোনোদিন ও এ বাড়িতে আসে—'

চাবি দিয়ে আলমারী খুলল তামসী। টাকাটা লম্বা একটা খামের মধ্যে মোড়া ছিল। বার করে নিয়ে ফের আলমারি বন্ধ করলে। খামটা বাড়িয়ে ধরল অধিপের দিকে।

থাবা মেরে অধিপ খামটা ছিনিয়ে নিল। যেন তার প্রয়োজন ছিল। কে টাকাটা দিচ্ছে, কি করেই বা দিচ্ছে, যেন তা দেখবার কোনই প্রয়োজন নেই। মনে-মনে প্রমথেশ বোধহয় অভাবিতেরই আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। ভাবছিলেন বিস্ময়ের সূর্যোদয়ে বৈরাগ্যের তুষার হয়তো গলে যাবে মুহূর্তে। হতাশ হলেন সম্পূর্ণ। অধিপের ভঙ্গিতে ক্ষীণতম দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা ফুটলনা। না এতটুকু কৌতূহল। যেন সমস্ত বাধা সমস্ত মিনতি সমস্ত আহ্বান-আমন্ত্রণ সে সবলে উপেক্ষা করে বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি।

'দাঁড়ান, আমিও যাব।'

দরজার পরদার প্রান্তটা অধিপের হাতের মুঠোয় আড়ষ্ট হয়ে রইল। যেন চিনেও চেনেনা এমনি মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অধিপ বলল, 'তুমি?'

'আমি। যার জন্যে এতদিন একমনে প্রতীক্ষা করছিলাম তার দেখা পেয়ে তাকে ছাড়তে পারিনা।' তামসীর মুখে ও স্বরে সরল সত্যের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠল।

'তুমি—তুমি কোথায় যাবে?'

'জানিনা। বিপ্লবের পথে যেখানে গিয়ে পৌঁছানো যায় হয়তো সেইখানে।' তামসীর সমস্ত ভঙ্গিতে সহজ প্রতীতি। স্বয়ংসিদ্ধ সত্যের স্থিরতা।

অধিপ অন্তরে অন্তরে মথিত হতে লাগল। এমন নিশ্চয় নিশ্চল সত্যকে কি বলে ফেরাবে, কি বলে প্রতিরোধ করবে ভেবে পেলনা। তবু দ্বন্দ্বাতীত হতে পারলনা। বললে, 'এখন, এই রাত, এখুনি যাবে কি? আরেকদিন—আরেকসময়—'

'এখুনি, এই মুহূর্তে। দেখুন আমি তৈরি।'

দ্রুত দৃষ্টিতে অধিপ তামসীকে একবার দেখল আপাদমস্তক। চুল থেকে শাড়ির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সে দৃঢ়ীকৃত। পায়ে ঘুন্টি-বাঁধা জুতো আঁটা।

তামসী হাসল। বললে, 'গুণ-লাগা ধনুকের মত টান হয়ে আছি। সঙ্গে না নিন, পিছনে যাব। সময় কি বারে বারে আসে? ভারতবর্ষের পক্ষেও এই একবার হয়তো সময় এসেছে।'

অকস্মাৎ দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল। যজ্ঞের জন্যে সমিধ সংগ্রহ করছেনা অধিপ? এই তো সে পেয়ে গিয়েছে নায়িকা—চণ্ডনায়িকা। ধূমাবতী, তামসীশক্তিস্বরূপিনী।

উদ্বেলতাকে গোপন করল অধিপ। বললে, 'এসো।'

তামসী এগিয়ে গেল প্রমথেশের কাছে। স্নেহকরুণ চোখে তাকাল তাঁর চোখের

দিকে। বললে, 'যাবনা আমি? যাওয়া উচিত নয় আমার? এই ঘরে বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকব? এই ঘর কি আমার ঘর? এই সংসার কি আমার সংসার? দেশ কি আমার দেশ নয়? বলুন, আপনি কি বারণ করবেন? কিসের জন্যে বারণ করবেন? ছেলের কাছে আপনার তিন হাজার টাকার ঋণ থেকে গেল ভাবছিলেন, আমাকে দিয়ে তার শোধ হয়ে যাবে না?

প্রমথেশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ব্যাকুল দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তামসীর দুই হাত গ্রহণ করে খানিক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটি নীড়ের স্বপ্ন দেখছিলেন, বিরামবিহীন বায়ুমণ্ডলের নয়। তাই এক কথায় ছেড়ে দিতে বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে বৈকি। তবু ছেড়ে না দেয়ার কোন অর্থ হয়না। হয়তো ছেড়ে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হয়তো বিরত করতে পারবে ঐ বন্ধনহীনকে। নির্বিষ, নির্বিঘ্ন করতে পারবে। উজান ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চিন্ত তীরের আশ্রয়ে। বন্যাশেষে শ্যামললাবণ্য ফসলের পর্য্যাপ্তিতে। এতদিন অকারণ অপেক্ষা করেনি তামসী। রূপে রসে বরবর্ণিনী হয়ে উঠেছে। এত অজস্রতা নিরর্থক হবে না। জানি যাচ্ছে ধ্বংসের নান্দীপাঠে। ঐ ধ্বংসের থেকেই আনন্দের দেহধারণ।

যাচ্ছে শিবসংযুক্তা মহামায়া। অপর্ণা যাচ্ছে বাসরপর্ণশয্যায়।

নিজের দুই হাতের ভার যেন আর কারু ভার প্রমথেশ তামসীর হাতে সঁপে দিলেন। বললেন, 'যাও। কোন ভয় করবনা। তোমার তপস্যার সিদ্ধি হোক এই শুধু আশীর্ব্বাদ করব।'

পা ছুঁয়ে প্রণাম করল তামসী। প্রীতমুখে হেসে বললে, 'এর চেয়ে আর বড় কি আশীর্ব্বাদ আছে জানিনা। কিন্তু কি যে তপস্যা, কিসে বা যে তার সিদ্ধি তাই বা কে জানে।'

অসম্পৃক্তের মত চলে গেল। অনায়াসে মিলিয়ে গেল বিরাট বেনামী অন্ধকারে।

রাস্তায় একটা গাড়ির ঝকঝক শুনলেন প্রমথেশ। কিন্তু, ওকি ওদের মিলিত হাসির উচ্ছল কলধ্বনি?

টেবিলের উপর চাবির গোছাটা রেখে গিয়েছে তামসী। তার দিকে প্রমথেশ চেয়ে রইলেন শূন্যচোখে। মনে হল চাবি যেন বিকল হয়ে গিয়েছে। আর ঘুরবেনা। খুলবেনা আলমারি। মিশ খাবেনা কোনোদিন। ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছে তাঁর।

যে মেয়েটা অলক্ষিতে এসেছিল, আবার চলে গেল অতর্কিতে, সে কি মনোহারিণী বংশীধ্বনি, না, ঝঙ্কারবাহিনী ঝঞ্ঝা?

(ক্রমশঃ)

সন্দর্শন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে পদ্ম আর রাধা যার যার ঘরে ফিরে গেল, যাওয়ার সময় বলল, 'আয়লো কাঞ্চন, আজ আর কোন সুবিধা টুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। নতুন লোক কেউ বোধ হয় আজ এ-মুখো হবেনা। পুরোণ আলাপী টালাপী যদি কেউ আসে ঘর তো চেনেই, তার জন্য আর পথে দাঁড়াবি কেন, চলে আয়।'

কাঞ্চন বলল, 'তোরা যা রাধা, আমি আর একটু দেখি।'

রাধা হেসে বলল, 'তাহ'লে দেখ, দু'চারজন বাড়তি খদ্দের টদ্দের যদি পাস, আমাদের ডেকে দিস কিন্তু, একাই সব ভোগদখল করিসনে।'

দিব্যি ঠাট্টার সুর ওদের গলায়, চোখে পরিহাসের ঝিলিক কিন্তু সে চোখ দেখেও দেখলনা কাঞ্চন, বরং ওরা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর দু'এক পা করে গলির মুখের দিকেই এগিয়ে এল।

ঘর থেকে বেরুলেই সরু একটু কানাগলি। হাত দেড়েক দুই চওড়া। দক্ষিণে বুক পর্যন্ত উঁচু লোহার রেলিংএর বেড়া। বেড়ার ওপাশে বাজার। সে বাজারের দোকানে দোকানে কাল সন্ধ্যার পর থেকে যে ঝাঁপ পড়েছে আজও তা ওঠেনি। সারাদিন ধরে আজ গেছে হরতাল। একটা কাকপক্ষীও আসেনি ওখানে।

দু'পা এগিয়ে এসে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়াল কাঞ্চন। সামনেই ট্রামলাইনওয়ালা চীৎপুরের বড় রাস্তা। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত ট্রাম আজ আর চলছে না, বাস কি ট্যাক্সী রিকসাও নয়, দলে দলে লোক কেবল পায়ে হেঁটে চলেছে। কারো পায়ে জুতো আছে কারো বা পা একেবারে খালি, কেউ কেউ যেতে যেতে দু'একটা কথা বলছে, কেউ বা একেবারে নিঃশব্দ। লোকগুলির চেহারা আর রকম সকম দেখলে মনে হয় যেন বিরাট এক অনাথ আশ্রম থেকে তাদের এইমাত্র ঠেলে বের করে দেওয়া হয়েছে।

বিড়ির দোকানের ফটিককে কালই কাঞ্চন জিজ্ঞেস করে জেনেছিল ব্যাপারটা কি। বিকেলে দিল্লী সহরে গান্ধীজীকে কে একটা লোক গুলি করে মেরে ফেলেছে। খানিকক্ষণ পরেই রেডিওতে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে সেই খবর। কাগজে কাগজেও তা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। আর দলে দলে লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। কে জানে তারাই এখন পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা। কাল থেকে আর ঘরে ফেরেনি, খায় নি, ঘুমোয় নি;

আর কোন কাজকর্ম চিন্তা ভাবনা করেনি, স্রোতে ঠেলে নেওয়া কচুরি পানার মত কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে। অবাক কাণ্ড। এমন কাণ্ড আর কলকাতার সহরে দেখেনি কাঞ্চন।

দলের ভিতর থেকে একটি লোক কাঞ্চনের দিকে তাকাল। কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে একটু নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সেই লোকটির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে সে মুখ আর নেই। মুখশুদ্ধ সেই লোকটি ইতিমধ্যেই দলের ভিড়ে পালিয়েছে। তার বদলে আর যার মুখ দেখা গেল, তার চোখ কাঞ্চনের দিকে নয়, কিসের দিকে কে জানে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পেটের ভিতরে হঠাৎ জ্বালা করে উঠল কাঞ্চনের যেন সহস্র সূঁচ বিঁধেছে নাড়ীতে নাড়ীতে। কয়েক কাপ চা ছাড়া সারা দিনের মধ্যে পেটে আর কিছু পড়েনি, বাজারের দোকানপাট থেকে সুরু করে গলির মোড়ের হোটেলটি পর্যন্ত বন্ধ। কনট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে সপ্তাহে একদিন করে রেশন ধরে কাঞ্চন, তারপর নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে খায় কারণ হোটেলে খোরাকী খরচ বড় বেশী পড়ে যায়। কিন্তু সাতদিনের রেশনে সাতদিন তো আর চলেনা, দিন পাঁচেক পরেই ভাঁড়ার বাড়ন্ত হয়ে পড়ে, তখন হোটেল ছাড়া আর গত্যন্তর থাকেনা। তাছাড়া রাত্রে এক একদিন এত বেশী জ্বালাতন করে যায় লোকগুলি যে পরদিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করেনা, ভারি অবসাদ আসে দেহে, উনানের পিঠে গিয়ে বসবার আর ভরসা হয় না, সেইসব দিন হোটেল থেকে ভাত তরকারী আনিয়ে খায় কাঞ্চন, খরচ খুব বেশীই পড়ে, কিন্তু রান্নাবাড়ার ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়ে তৈরী বাড়া ভাত তরকারীর থালা সামনে নিয়ে বসতে ভারী আরামও লাগে।

দুদিন ধরে হাঁড়িতে চাল ছিলনা, আজ ছিল রেশনের তারিখ, কিন্তু হরতাল বলে আজ সেই রেশনের দোকানও খোলেনি, হোটেলও খোলেনি, রাস্তার ওপাশের উড়ে হোটেলওয়ালা বেলা এগারটা বারটার সময় যদিবা একবার দোর খুলতে চেষ্টা করেছিল পাড়ার ছেলেরা জোর করে তা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। বহু চেষ্টা চরিত্র করে গলির চাওয়ালার কাছ থেকে দু' চার কাপ চা কিনে খেয়েছে কাঞ্চন আর মাঝে মাঝে টেনেছে বিড়ি, সে বিড়িও কি আর সহজে মিলেছে। কত লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে সন্তর্পনে বিড়ি দেশলাই কিনতে হয়েছে কাঞ্চনকে। তারপর বিকেলে তাড়া খেয়ে সেই বিড়িওয়ালাও কোথায় উধাও হয়েছে তার আর দেখা নেই।

পদ্মরা আগের দিন চাল কিনেছিল ব্লাকে। রান্না বান্না করে খেয়ে আঁচিয়ে, আঁচলে মুখ মুছে মুচকি হেসে বলেছিল, 'আহাহা, একবেলা না খেয়েই মুখখানা শুকিয়ে ফেলেছিস কাঞ্চন, তা একেবারে ঠোঁট-শুকিয়েই বা রইলি কেন, হোটেলওয়ালার সঙ্গে যে পীরিতের বহর দেখি তোর, ঘুরে পিছনের দোর দিয়ে একবার গেলেই পারতিস তার কাছে, আর কিছু না হোক ঠোঁট তো ভিজত।

রাধা হেসে বলেছিল, 'উঁহু তাও ভিজতনা, সে নিজেও ঠোঁট শুকিয়ে বসে আছে জানোনা বুঝি। কাঞ্চনের জন্য আমি তার ওখানেও খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনলুম, নিজেদের জন্যও তারা নাকি রান্নাবান্না করেনি। উপোস করে রয়েছে গান্ধীর শোকে। দেশশুদ্ধ লোক অনেকেই নাকি আজ ইচ্ছা ক'রে খায়নি দায়নি। ইচ্ছাটা আমাদের কাঞ্চনের মত, কি বলিস কাঞ্চন ?'

কাঞ্চন রেগে উঠে বলেছিল, 'বলব আবার কি, সবাই কি তোদের মত নাকি ?'

কিন্তু পেটে খিদে আছে বলে তো আর চুপ করে থাকা চলে না। সারাদিন শুয়ে বসে কাটালেও বেলা পড়তেই কাঞ্চন উঠে পড়ল। কিছুদিন ধরে বড় হাত টানাটানি যাচ্ছে। একদিন বাদে বাদে বাড়িভাড়ার জন্য তাগিদ দিচ্ছে বাড়িওয়ালী মাসী। পুরোণ আলাপী হোটেলের জগন্নাথ মিশ্রও কিছুকাল ধ'রে মুখ ভার ক'রে রয়েছে। ধার দেনা তার কাছেও নিতান্ত কম হয়নি। আর রোজগার একটা দিনও বন্ধ থাকলে চলবেনা কাঞ্চনের। হাতে কিছু জমলে সেও রাধা আর পদ্মদের মত মাঝে মাঝে আরাম আয়েস করতে পারবে। পা টান করে শুয়ে থাকতে পারবে সন্ধ্যা বেলায়ও।

অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশী রকম আর বিশেষ ধরণের সাজসজ্জাই বসে বসে করল কাঞ্চন। অল্পবয়সী কুমারী কিশোরীদের মত বিনুনী ক'রে দীর্ঘ বেনী ঝুলিয়ে দিল পিঠের ওপর। শক্ত করে বাঁধল কাঁচুলী। পথচারীদের একবার চোখ পড়লে সে চোখে যেন আর পলক না পড়ে। চোখের কোলে সযত্নে সুর্মা লাগাল কাঞ্চন, মুখে বার কয়েক বেশি ক'রে বুলাল পাউডারের পাফ, দু'তিন বার বেশি লিপষ্টিকের পোঁচ দিল ঠোঁটে, যেন না খাওয়া শুকানো ঠোঁট বলে কিছুতেই কেউ না ধরতে পারে, ষোড়শীর সরস সুন্দর বিম্বাধর বলে ভ্রম হয় যেন আগন্তুকের। বাক্স ঘেঁটে ঘেঁটে গাঢ় রক্তরঙের জর্জেট শাড়িখানা বের ক'রে পড়ল কাঞ্চন। একটু পুরোণ হয়ে গেলেও এই শাড়িখানাই তাকে সবচেয়ে ভালো মানায়। তারপর আলতাপরা পা দুখানি ফুল তোলা নীল রঙের স্যাণ্ডেলের ভিতরে ঢুকিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল।

সাজের ঘটা দেখে পদ্ম আর রাধা দুজনেই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর হেসে বলল, 'সইলো সই, ভুবন মোহিনী বেশে দাঁড়ানু দুয়ারে এসে, হৃদয়-মোহন মোর কই। রূপের ফাঁদে একেবারে নির্ঘাৎ রাজা বাদশা কেউ আজ ধরা পড়বে কাঞ্চন কি বলিস।'

কাঞ্চন জবাব দিয়েছিল, 'পড়বে ছাড়া কি। তোদের মত তো আর বুড়ী হয়ে যাইনি এখনো।'

পদ্ম বলেছিল, 'ষাট্ ষাট্ বুড়ী হবি কেন। বছর বছর আমাদেরই কেবল বয়স বাড়ে, তোর বাড়ে চেকনাই। তা রাজা বাদশার সঙ্গে দু' একজন চাকর বাকর যদি আসে আমাদের কিন্তু ডেকে দিস কাঞ্চন, ভুলে যাসনে যেন।'

ভিতরে ভিতরে জ্বলে গেলেও কাঞ্চন কোন জবাব দেয়নি ওদের, নিঃশব্দে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। মুখে জবাব দিয়ে লাভ নেই। ভালো খদ্দের পাকড়াও করে ওদের ঘরের সুমুখ দিয়ে হাসতে হাসতে যেতে হবে। সেই হাসিতেই আসল জবাব পাবে ওরা, কথার আর দরকার হবে না।

তাই পদ্ম আর রাধা ঘরে ফিরে গেলেও কাঞ্চন দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হ'য়ে। মন তার উল্লাসে ভরে উঠল। হিংসুটে প্রতিযোগিনীরা তো হটেছে। ওরা তো ফিরেছে নিস্ফল হয়ে। এবার সবুরে মেওয়া ফলবে কাঞ্চনের।

কিন্তু রাত ক্রমেই বাড়তে লাগল, কারো দেখা নেই। অথচ তেমনি ভিড় আছে সহরের রাস্তায়। সেই বাপমা-মরা গুরুদশা-গ্রস্তের মত লোকগুলি দলে দলে এখনো পথের ধূলো নিংড়ে নিয়ে চলেছে। একটা লোকও কাঞ্চনের সামনে এসে দাঁড়াবার নাম করল না। ঘরে ঢুকুক আর না ঢুকুক বাইরে দাঁড়িয়ে একবার দর দরাম ক'রে গেল না পর্যন্ত। পেটে আরো বারকয়েক পিন ফুটল। মনটা অদ্ভুত এক আক্রোশ আর হতাশায় জ্বালা ক'রে উঠল কাঞ্চনের। আশ্চর্য, হোল কি আজ সহরটার। এমন তো আর কোন দিন হয়নি। এই বছর কয়েকের মধ্যে কলকাতার সহরে না হয়েছে কি। আকাশ থেকে বোমা পড়েছে, না খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে পড়ে শুকিয়ে মরেছে মানুষ, দিনের পর দিন মরেছে মারামারি কাটা কাটি ক'রে—এই চীৎপুরের ওপরই কত রক্ত দেখেছে কাঞ্চন, দেখেছে রক্তমাখা ক্ষত বিক্ষত বিকলাঙ্গ মানুষের দেহ কিন্তু তাই বলে কোনদিন তো ঘর খালি থাকেনি কাঞ্চনের। দু'চারজন কেউনা কেউ রোজ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তারপর পিছনে পিছনে ঢুকেছে গিয়ে তার ঘরে। কেউ বুক ফুলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে গেছে কারো বুক কেঁপেছে, ঠোঁট শুকিয়েছে, তবু কাঞ্চনের আকর্ষণ ছাড়াতে পারেনি। যে কোনদিনই হোক, কাঞ্চনের ঘরে তাদের আসতেই হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করা কোন দিন বিফল হয়নি তার, আজ কেন হবে। কি হয়েছে আজ সহরের। কোথায় কোন রাজ্যে কে মরেছে গুলি খেয়ে, সেই জন্যে লোক কেন আসবে না তার ঘরে। আসবে, নিশ্চয় আসবে। এই ভিড়টা একটু পাতলা হলেই গুড়িসুড়ি মেরে এসে ঢুকবে, ঢুকবে চাদর মুড়ি দিয়ে। কাঞ্চন মনে মনে একটু হাসল।

আরো কাটল কিছুক্ষণ। একটু একটু ক'রে পাতলা হয়ে এল রাস্তার ভিড়। পাশের

বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজল। কাঞ্চন উৎসুক হয়ে নড়ে চড়ে দাঁড়াল। না, এখনো কারো দেখা নেই।

অধীর বিরক্তিতে চীৎপুরের রাস্তা ধরে দক্ষিণের দিকে দু'এক পা করে এগিয়ে গেল কাঞ্চন। চোখে পড়ল বিডন স্ট্রীটের মোড়ের ফুলওয়ালাটা ডালি সাজিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কাঞ্চন মুখ মুচকে হাসল। সে জানে এফুল তাদের জন্যেই, এফুল তার জন্যেই। সৌখিন নাগরের দল কতদিন এখান থেকে তার জন্যে ফুল কিনে নিয়ে গেছে। গোঁড়ের মালা, গাঁদার মালা, বড় বড় ডাঁটীওয়ালা রজনীগন্ধার ঝাঁড় কতদিন কত উপহার পেয়েছে কাঞ্চন। সুখস্মৃতিতে মনটা ভারি প্রসন্ন হোল কাঞ্চনের, আশায় বুক ভরে উঠল। ফুলের ডালি সামনে নিয়ে মালী যখন এসে বসেছে, মালা কিনে গলায় পরবার মানুষ কি আর আসবে না, মাঝখানে কতটুকুই বা ব্যবধান। ফুলের ডালি থেকে মালা তুলে এনে রূপের ডালিতে রাখবে। হাঁটতে হাঁটতে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়াল কাঞ্চন। ফুল নিয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসবে। সহর শুদ্ধু লোক তো আর কাণা হয়ে যায়নি, তাদের ফুলও চোখে পড়বে ফুলের মত মুখও চোখে পড়বে; সহর শুদ্ধু লোক তো আর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি, সহর শুদ্ধু লোকও আর গুলি খেয়ে মরেনি। কেউনা কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে কাঞ্চনের জন্যে।

আশায় আশায় মধুর প্রতীক্ষায় কাটল আধঘণ্টা; অধীর ছটফটানিতে এক মিনিট এক মিনিট করে আরো আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তারপর ফুলের ডালি নিয়ে সত্যিই মনের মানুষ এসে দাঁড়াল কাঞ্চনের সামনে। একটি দুটি মালা নয়, একটি দুটি ঝাঁড় নয় রজনীগন্ধার রাজ্যের ফুল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রসিকরাজ। মুখে হাসি ফুটল কাঞ্চনের, মৃদুস্বরে, কণ্ঠে সমস্ত মাধুর্য ভরে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

ললিত তার পিছনে পিছনে রাস্তার মোর থেকে কাণা গলির মধ্যে ঢুকল, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল, 'নেবে নাকি ফুল ?'

কাঞ্চন ঠোঁট টিপে একটু হাসল, 'নেবই তো, তুমি সাধ করে এনেছ আর আমি না নিয়ে পারি ? কিন্তু এখানে কেন, আগে ভিতরে চলো তারপর যতখুসি সাজিয়ো, ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ো আমাকে।'

কাঞ্চন আবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু ললিত অনড়।

কাঞ্চন অপরূপ ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কই, এসো, লজ্জা করছে নাকি তোমার ?'

ললিত এবার একটু লাজুক ভঙ্গিতেই বলল, 'না, লজ্জা আবার কিসের, তা যে ফুল আছে আমার কাছে তাতে সমস্ত অঙ্গ তোমার ঢেকেই যায়। সব নিচ্ছ তো ? খুব সস্তায় দেব তোমাকে!'

হঠাৎ যেন কাঞ্চনের চমক ভাঙল, 'সস্তায় মানে? তুমি কি ফুল বেচতে এসেছো নাকি আমার কাছে?'

কাঞ্চন এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ললিতের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল তার, ঘোর ভাঙল চোখের, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, হাতে একরাশ রজনীগন্ধার ঝাঁড়, গোড়ার দিকটা একখানা কাগজে জড়ানো। রাস্তার মোড়ের সেই আধা-বয়সী মালীটি, যেতে আসতে কতদিন চোখে পড়েছে। আর আজ তাকে দেখেই চিনতে ভুল হোল কাঞ্চনের? রাস্তার একটা নগণ্য ফুলমালীকে মনে করে বসল তার যৌবন নিকুঞ্জের মালাকর? ছি ছি ছি।

রাগে দুঃখে ক্ষোভে আক্রোশে কাঞ্চন আর একবার ধমক দিয়ে উঠল ললিতকে, 'মুখপোড়া মিনষে, রঙ্গ করবার আর জায়গা পাওনি? ফুল আমরা নিজেরা কিনি যে বেচতে এসেছ আমার কাছে? কেন, কোন সৌখীন নাগর পুরুষ চোখে পড়ল না? তাকে গছাতে পারলেনা সস্তায়?'

ললিত ম্লান বিষণ্ণ ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'রোজ তো গছাই, অন্যদিন অন্য লোকে কিনে দেয়, আজ না হয় নিজেই নিলে, সাধ আহ্লাদও তো আছে মনের?'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল কাঞ্চনের কাছে। তার মত ললিতেরও আজ আর খদ্দের জোটেনি। গাঁদার মালা আর রজনীগন্ধার ঝাঁড় সাজিয়ে সেও কাঞ্চনের মত বিকেল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে কিন্তু এই বিশেষ ধরণের ফুল কিনবার মত সৌখীন খদ্দের ললিতের কাছে এসে আজ আর দাঁড়ায়নি। আর সেইজন্যেই ফুলের ডালি নিয়ে ললিত নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চনের কাছে। সেইজন্যেই এত সাধ সখের দোহাই, সেইজন্যেই এত সাধাসাধির পালা।

ললিত আর একবার বলল, 'নাওনা গো। তুমি নিজে হাতে করে যখন কিনছ, তখন আর বেশী দাম নেবনা, অর্দ্ধেক দামেই ছেড়ে দেব তোমাকে।'

কাঞ্চন মনে মনে ভাবল, 'অর্দ্ধেক দামে আজ আমিও তো ছেড়ে দিতে রাজী। কিন্তু নিচ্ছে কে।'

হঠাৎ রাধা আর পদ্মর কথা মনে পড়ল কাঞ্চনের। বড় মুখ করে বড়াই করেছিল তাদের কাছে। আর এখন খালি হাতে তাদের ঘরের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে কাঞ্চনকে। তারা হাসাহাসি করবে গা টেপাটিপি করবে, তাদের কাছে কিছুতেই আজ আর তার মুখ থাকবেনা। তার চেয়ে এই মালীকেই আজ সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাবে কাঞ্চন। ওরা তো তাকে আর দূর থেকে মালী বলে চিনবেনা, হাতে ফুলের রাশ দেখে নাগরের নাগরালীই মনে করবে। পকেটে পয়সা না থাকুক হাতে তো ফুল আছে ললিতের, তাতেই ওরা ভুলবে। পেট না বাঁচুক, মান বাঁচবে কাঞ্চনের। আর যেমন তেমন

করে ঘরে একবার নিয়ে যেতে পারলে পকেট হাতড়ে কি দু'এক টাকাও মিলবেনা? ঝি চাকরকে দু' চার আনা দিয়ে থুয়ে যা বাঁচে তাই আজ লাভ কাঞ্চনের, কাল সকালে তাতেই চা জল খাবারটা কুলিয়ে যাবে।

কাঞ্চন ললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার অপরূপ মোহনভঙ্গিতে হাসল, 'বেচা কেনাটা কি পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় নাকি। লোকে ভাববে কি। চল, ঘরে চল। সেখানেই সব কথা হবে!'

ললিত চেয়ে চেয়ে দেখল কাঞ্চনের লিপষ্টিকমাখা ঠোঁটটেপা হাসি। তার মনের ভাব বুঝতে ললিতেরও কিছু আর বাকি নেই। নিজের হাতে শুকিয়ে ওঠা ফুলগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল ললিত। এই বিক্রি-না-হওয়া ফুলের রাশ নিয়ে কি হবে এত সকাল সকাল বাড়ীতে ঢুকে। ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও তো কাঠির মত কঙ্কালসার দেহ নিয়ে সরলা এসে হাত পাতবে 'দাও টাকা দাও।' ভোরে উঠে রেশন ধরতে হবে, কয়লা কিনতে হবে, বাজার করতে হবে, দাও টাকা দাও, চার পাঁচদিন ধরে জ্বরে ভুগছে ছোট মেয়েটা তার জন্য মিকশ্চার আনতে হবে ডাক্তারখানা থেকে, দুটো ছেলেরই মাইনে বাকী পড়েছে স্কুলে, অন্তত এক মাসের শোধ না দিলে চলবেনা, 'দাও টাকা দাও'। চোদ্দ পনের বছরের বড় মেয়েটার শাড়ি সেমিজ রঞ্জে রঞ্জে ছিঁড়েছে, চোখ মেলে কিছুতেই তাকানো যায়না তার দিকে, 'দাও টাকা দাও।'

কাঠির মত কঙ্কালসার দেহে, তোবড়ানো গালে, কোটরগত চোখে ললিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরলা মুখ খুলবে গলা খুলবে। অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় মনের কথা বলতে সুরু করবে। ঢাক ঘোর, ইসারা ইঙ্গিত, আড়াল আবডাল এখন আর কিছু নেই সরলার; ভারি সরল তার মন, সরল তার মুখ, আর একেবারে কাঠির মতই সোজা আর সরল তার চেহারা।

তার চেয়ে যে তাকে সাদরে আজ ঘরে ডেকে নিচ্ছে তার ডাকে সাড়া দেওয়া মন্দ কি। তবু তো এর চোখে কাজল আছে, ঠোঁটে রঙ, রঙীন শাড়ির আড়াল আর আবরণ আছে সর্বাঙ্গে। ক্ষতি কি, একটু চেষ্টা করে দেখলই বা ললিত খানিকক্ষণ এই রঙ তার নিজেরও চোখে ঠোঁটে লাগিয়ে রাখতে পারে কিনা। ললিত সায় দিয়ে বলল, 'বেশ চল।'

সরু আর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বিজয়িনীর মত কাঞ্চন ললিতকে পিছনে পিছনে নিয়ে চলল দোতলায় নিজের ঘরে।

রাধা আর পদ্মের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ও রাধা, ও পদ্ম, ঘুমোলি নাকি। চাকর আর নফর কিন্তু একজন করে সত্যিই এসেছে। পান সিগারেট কিনতে পাঠিয়েছি বাইরে। এক্ষুনি এসে কড়া নাড়বে, ঘুমোসনি যেন।'

রাধা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পদ্ম জানলা দিয়ে কাঞ্চনের মানুষের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, চেহারা আর পোষাক আসাক দেখলে রাজরাজড়া বলে মনে হয়না বটে কিন্তু লোকটি যে সৌখীন তাতে আর সন্দেহ কি! নইলে কি এত রাজ্যের ফুল নিয়ে আসে এইসব জায়গায়। কাঞ্চন পদ্মের সেই বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে আর এক ঝিলিক হাসল, 'জেগে থাকিস বুঝলি।'

পদ্ম বলল, 'জেগে থাকব বইকি! তোর এমন ফুলশয্যার রাত, আর আমরা মিঠাই মণ্ডা না খেয়েই ঘুমোব।'

আঁচলে বাঁধা চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে ঘরের তালা খুলল কাঞ্চন, তারপর পিছনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কই এস, বনমালী না মনোমালী, বসো এসে ঘরে।'

ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিল কাঞ্চন, নিবুনিবু হ্যারিকেনটা ভালো করে জ্বেলে দিল হাত বাড়িয়ে। তক্তাপোষের ওপর ধবধবে পাতা বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো।'

বিছানায় বসে ললিত একবার ঘরের চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল। পায়রার খোপের মত ছোট একটু ঘর। সামনে দরমার বেড়া ঘেরা এক ফালি বারান্দা। দরজাটা খোলাই আছে ওদিকের।

ঘর ছোট হলেও, খুব বেশী অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন নয়, বরং একটু বেশি ঝকঝক তকতকই করছে এক পাশে মাজা কাঁসার বাসন বাটিগুলি। আলনায় ঝুলান দু' তিনখানা পুরোণ শাড়ি, কালো পালিশ উঠে যাওয়া, কাঁচভাঙ্গা একটা আলমারীও দাঁড় করানো আছে উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে। চ্যাপটা ধরণের গোটা কয়েক খালি বোতল আর চায়ের কাপ ডিস দেখা যাচ্ছে তার ভিতর থেকে। এক সময় বোধহয় অবস্থা ভালোই ছিল কাঞ্চনের, অবস্থাপন্ন কারো বাঁধা ছিল, কাউকে বেঁধে রেখেছিল রূপ যৌবনের ডোরে। তারপর সে ডোর কবে শিথিল হয়ে গেছে।

ঘরের চারিদিকের দেয়ালে দু' চার খানা করে ফটোও আছে টাঙানো। চৌচির হয়ে কাঁচ ফেটেছে কোনখানার, কোনটিতে কাঁচ একেবারেই নেই কেবল কাঠের ফ্রেমের ভিতর থেকে অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি বিলোল চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। খানকয়েক পুরোণ ক্যালেণ্ডার ঝুলছে এখানে ওখানে। গন্ধ তেলের বোতল সামনে নিয়ে কোন সুবেশিনী চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠ ভরে, কোনটিতে বা কোন গন্ধবিলাসিনী ঘাটে বসে বসে আনমনে সাবান মাখছে, বেশবাসের দিকে আর হুঁস নেই।

কাঞ্চন এসে গা ঘেঁষে বসল ললিতের পাশে, তারপর একটু মুচকি হেসে বলল, 'কি গো, রাতভর কেবল ছবিই দেখবে নাকি।'

ললিত মনে মনে রসস্থ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'না না, তুমিই তো রয়েছ চোখের সামনে। তোমাকে ফেলে ছবি দেখতে যাব কেন ?'

কাঞ্চন বলল, 'তবু ভালো, এতক্ষণে নাগরের কথা ফুটল মুখে। তারপর ফুলগুলি কি ওইরকম কাগজে জড়ানোই থাকবে নাকি। না খুলে টুলে দেখাবে। ফুলের মালা বেচে বেচে জন্ম কাটালে গলায় তুলে দেওয়ার কথা বুঝি বেমালুম ভুলে গেছ ?'

ললিতও হাসল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে ফের আবার মনে পড়েছে। এসো, আরো কাছে এগিয়ে আনো গলা।'

কাঞ্চন আরো সরে এসে গায়ে গা লাগিয়ে ললিতের ফতুয়ার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'কিছু মনে করোনা মনোমালী, খালিহাতে মালা পরবার রীতি নেই আমাদের।

ললিত বাধা দিল না, কিন্তু গাঁদার মালাও সঙ্গে সঙ্গে গলায় পরিয়ে দিল না কাঞ্চনের। মালাগুলি বিছানার ওপর রেখে যে খবরের কাগজের পাতাখানা দিয়ে রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি জড়িয়ে এনেছিল সেই কাগজখানা খুলতে লাগল।

হাত দুখানা ললিতের পকেটের মধ্যেই ছিল কাঞ্চনের কিন্তু কৌতুকের চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল ললিতের কীর্তি, জড়ান কাগজখানা বিছানার ওপর সরিয়ে রাখতেই কাঞ্চন হঠাৎ একটু মুচকি হেসে বলল, 'বাঃ, পকেটে পয়সা না থাকলে কি হবে নাগরের আমার সখ তো আছে দেখি ষোল আনা। কেবল ফুলই নয়, আমার জন্য ছবিও নিয়ে এসেছ বুঝি একখানা। দেখি দেখি।'

কাগজখানার কথা ললিতও এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিল। কাঞ্চনের চোখের সঙ্গে সঙ্গে তারও চোখ গিয়ে পড়ল ছবিখানার ওপর। সর্বাঙ্গ সাদা খদ্দরের চাদরে ঢাকা চসমা চোখে সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের দিকে চেয়ে।

কাঞ্চন ললিতের চোখের দিকে একবার তাকাল, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বুঝি, ইনিই বুঝি—'

ললিত খানিকটা বিস্মিত বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো মহাত্মা গান্ধীর ছবি। কেন, এ ছবি দেখনি তুমি এর আগে। এত বড় মহাত্মা মহাপুরুষ সারা পৃথিবী শুদ্ধু লোক জানে, সারা পৃথিবীশুদ্ধু লোক দেখেছে আর তুমি—'

ধমক খেয়ে কাঞ্চন একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'দেখব না কেন দেখেছি। দূর থেকে কাগজওয়ালাদের হাতে দেখেছি। তাইতো একটু একটু যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।' তারপর একটু থেমে স্বগতোক্তির মতই কাঞ্চন অস্ফুট স্বরে বলল, 'কি করে চিনব বলো, এত

কাছে থেকে তো কোনদিন আর দেখিনি, এত কাছে তো আর কেউ কোনদিন নিয়ে আসেনি এঁর ছবি।'

বলতে বলতে কাঞ্চন ছবিখানার ওপর মাথা রেখে প্রণাম করল। আর তার প্রণাম করবার ভঙ্গি দেখে শিরশির করে উঠল ললিতের। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ল ছবিখানার ইতিবৃত্তের কথা, চারপয়সা দিয়ে টেলিগ্রামখানা কিনে খবরটুকু পড়ে প্রথমে নিজের পাশেই রেখে দিয়েছিল ললিত। ভেবেছিল বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেবে। তারপর ফুলের দোকান সামনে নিয়ে বসে বিকাল কাটল, সন্ধ্যা কাটল, রাত হোল তিন চার ঘণ্টা, একটা গাঁদার মালা একটা রজনীগন্ধার ছড়াও বিক্রি হোলনা। তখন হতাশায়, বিরক্তিতে উঠে পড়েছিল ললিত, খবরের কাগজে রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছিল।

কাগজখানা, দুমড়ে কুঁচকে গেছে, ফুলের জলে ভিজে গেছে জায়গায় জায়গায় তবু যাঁর ছবির ছাপ পড়েছে কাগজে তাঁর সম্মান তিনি পেলেনই, এমন জায়গায় এসেও পেলেন, এমনভাবে এসেও পেলেন। ভাবতে ভাবতে আর একবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ললিত, বিস্ময়ে, আনন্দের অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভরে উঠল মন, কানের মধ্যে বাজতে লাগল, 'এত কাছে তো এঁর ছবি কেউ এর আগে কোনদিন নিয়ে আসেনি।'

যেমন করেই আনুক, এ ছবি তাহলে এখানে ললিতই প্রথম নিয়ে এসেছে, কাঞ্চনের সামনে, কাঞ্চনের কাছে ললিতই প্রথম এনে পৌঁছে দিয়েছে গান্ধীজীর ছবি।

মিনিটখানেক পরে মাথা তুলল কাঞ্চন, ললিতের দিকে চেয়ে বলল, 'সব বুঝি লেখা আছে কাগজে, পড় না শুনি কি লেখা আছে, তুমি তো পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া জানো,—'

হ্যাঁ কোনরকমে পড়তেই যা একটু আধটু জানে ললিত, কিন্তু তার বেশি আর কে জানে। যমুনা তীরে রাজঘাটে গান্ধীজীর নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টি সুরু হয়েছে এই সংবাদটুকুই কেবল সেদিনকার বিকালের টেলিগ্রাফে বেরিয়েছিল কিন্তু সেটুকু শুনে তো শুধু তৃপ্তি নেই কাঞ্চনের সে আরো শুনতে চায়, আরো জানতে চায়। কিন্তু ললিত যেন এই প্রথম অনুভব করল জানানো সহজ নয়, শুনানো সহজ নয়, বুঝিয়ে বলবার মত সে কতটুকুই বা জানে। গলির মোড়ে চায়ের দোকানে সমবয়সীর সঙ্গে দেশ বিদেশের কত গরম গরম খবর কত যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে সে তর্ক করেছে, মুরুব্বির মত, বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করেছে নিজের মৌলিক মতামত, বাহদুরী নেওয়ার জন্য কত খবর, কত ঘটনা, কত তথ্য আর তত্ত্ব সে নিজের মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে কিন্তু আজ কাঞ্চনের কাছে মহাত্মার জীবনচরিত শোনাতে গিয়ে ললিত অনুভব করল কোন কৌশল, কোন বাহাদুরীই যেন এখানে খাটছে না। পদে পদে নিজের কাছেই নিজের অজ্ঞতা নিজের মূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের, গলির মোড়ের শ্রোতাদের মত

কাঞ্চন কিন্তু একটুও তর্ক করছেনা একটুও প্রতিবাদ করছেনা, পরম কৌতূহলে সে কেবল শুনেই যাচ্ছে। পাউডারের পুরু প্রলেপ ছাপিয়ে উঠেছে তার স্নিগ্ধ ভক্তি আর শ্রদ্ধার নম্রতা। ছেলেবেলা থেকে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যার কাছে যতটুকু শুনেছে ললিত, নিজের বিদ্যাবুদ্ধিমত খুঁটে খুঁটে কাঞ্চনকে সব বলতে লাগল। তারপর এককথায় অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল, 'ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এসেছিলেন পৃথিবীতে, কারো সঙ্গে কি তুলনা হয় ওঁর? রামায়ণে রামের কথা শুনেছ তো, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের কথা, বৈরাগী বাউলের মুখে শুনেছ নদের নিমাইয়ের গান—সব এসে নতুন করে অংশ নিয়েছিলেন ওঁর মধ্যে।'

বলতে বলতে যুক্ত করে প্রণাম করল ললিত।

কাঞ্চনও প্রণাম করল সঙ্গে সঙ্গে, তারপর বলল, 'কিন্তু এমন লোক শেষে মারা গেলেন কার না কার বন্দুকের গুলিতে। আহাহা গুলি ছুঁড়তে হাত উঠল তার? একটুও প্রাণ কাঁপলনা, হাত কাঁপলনা?'

ললিত বলল, 'কাঁপবে কেন! কাঁপলে লীলাসংবরণ হবে কি করে, অমন যে রাম সরযুর জলে আত্মহত্যা করে মরেছিলেন না, অমন যে কৃষ্ণ, মরেছিলেন না ব্যাধের বাণ খেয়ে! মহাপুরুষরা এইরকম করেই লীলাসংবরণ করেন, তাঁদের কি আর মৃত্যু হয় কোন দিন?'

কাঞ্চন বলল, 'একটা জিনিষ চাইছি তোমার কাছে। ছবিখানা দিয়ে যাও আমাকে।'

ললিত বলল, 'এর চেয়ে ভালো ছবি অনেক বেরিয়েছে—'

কাঞ্চন বলল, 'তা বেরোক। মহাপুরুষের সব ছবিই ভালো। এখানাই তুমি আমাকে দাও।'

ললিত বলল, 'বেশ।'

তারপর বড় এক গাছা গাঁদার মালা নিয়ে খবরের কাগজের টেলিগ্রামখানার চার দিক ঘিরে পরিয়ে দিল কাঞ্চন।

ললিত একটু শিউরে উঠে বললে, 'ও কি করছ, এই মালা পরাচ্ছ ওঁকে।'

কাঞ্চন বলল, 'তাতে কি মহাপুরুষের কাছে সব ফুলই ফুল, সব মালাই মালা।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ললিতের চোখ, বলল 'ঠিক, ঠিক।'

একটু বাদে কাঞ্চন বলল, 'একটী কথা বলব তোমাকে?'

ললিত বলল, 'বলনা।'

কাঞ্চন বলল, 'সারাদিন আজ আমার খাওয়া হয়নি, কেবল কয়েক কাপ চা খেয়ে রয়েছি। হোটেলে কিছু মেলেনি। এখন ভাবছি, চা কয়েক কাপও যদি না মিলত, নির্জলা উপোস হোত তাহ'লে। এখন বুঝতে পারছি কেন অন্ন জোটেনি দিন ভ'রে,

মহাপুরুষ এমন ক'রে আমার হাত থেকে আজ পূজো নেবেন বলেই, সারাদিনের না খাওয়ার কষ্ট এখন পুণ্য বলে মনে হচ্ছে—'

ললিত বলল, 'একটা কথা বলব তোমাকে ?'

কাঞ্চন বলল, 'বলনা।'

ললিত একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ভারি লজ্জা করছে বলতে। কি তুমি মনে করবে, কি না কি আবার ভাববে তুমি, কিন্তু কথাটা আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। না বলে থাকতে পারছি না।'

ললিত একটু থামল, তারপর কাঞ্চনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'অনেক কাল আগের কথা। বাবা মারা গেছেন, অশৌচ পালন করছি গুরুদশার। বউ সঙ্গে সঙ্গেই আছে, হবিষ্যান্ন রাঁধতে রীতি নিয়মের সাহায্য করছে, মাঝে মাঝে দু'জনেই চোখ মুছছি বাবার কথা মনে ক'রে। আজ তোমাকে দেখে ঠিক একেবারে—গায়ে তোমার হাত দেবনা—আজ আর দিতে নেই—না হলে গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলতে পারতাম—ঠিক একবারে তার মত—'

কথাটা ললিত শেষ করতে না করতেই এক অননুভূত আনন্দ আর লজ্জায় সস্তা পাউডারের তলায় সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল কাঞ্চনের। কিন্তু সেও আর তাকালনা ললিতের দিকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে চেয়ে প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'একটু আগেও দলে দলে কত লোক গেছে এই রাস্তা দিয়ে। খালি পা, শুকনো মুখ, দেখে তখনই কিন্তু আমার একেকজনকে মা বাপ মরা গুরুদশাধারী মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আহাহা, গুরুদশা যে কি তা তো জানি, মা বাপ মরার দুঃখ যে কি তা তো নিজেও বুঝেছি।'

আট

মহানগরীর ইতিকথায় ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। স্বাভাবিকও বটে, যে ভাবের ব্যবস্থায় মহানগরীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে স্বাভাবিক বললে সত্যই বলা হবে, মহানগরীর অপমান করা হবে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক ভাবে।

পিনাকী বিদায় নিচ্ছিল লাবণ্যদের কাছে। এক লাবণ্য ছাড়া পাগল পিনাকী অপর মেয়েগুলির কাছে কৌতুকের মানুষ। সদাই অপ্রস্তুত হতভম্ভ শিল্পীটিকে বেশী ক'রে অপ্রস্তুত করে মেয়েরা আমোদ পায়। পিনাকী বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছিল — মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। লাবণ্য ছিল ভিতরে। তারুণাও এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কথা হচ্ছিল সমাজব্যবস্থা নিয়ে। সমাজ সম্বন্ধে কথা হলেই ক্ষেপে ওঠে পিনাকী। শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে ওঠে, তার মুখ চোখের ভীরুভাব কেটে যায়, সে তার মাথার বড় বড় চুল অধীর ভাবে টানে এবং সমাজকে ভেঙ্গে ফেলবার শপথ গ্রহণ করে। সেই সুযোগে মেয়েরা কেউ বিধবা বিবাহের কথা তুলে দেয়। অর্থাৎ সকলেরই ধারণা পিনাকী লাবণ্যকে ভালবাসে। মেয়েদের ঐদিক দিয়ে একটা সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে কোন পুরুষের দৃষ্টি কাকে দেখে রঙীন হয়ে উঠছে। লাবণ্যকেও এ নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে পরিহাস করে থাকে কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে পরিহাস জমে না। তার সহজ গাম্ভীর্য্যের স্পর্শে এসে তটের উপর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেঙে পড়ে নেমে যাওয়ার মত মিলিয়ে যায়। এই কারণে পিনাকীকে নিয়েই তারা একটু বেশী ক'রে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তার ওপারের বাজারটার পিছন দিকের নিম্নস্তরের বস্তীর ভিতর

থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ভদ্র বেশভূষা, চলার ভঙ্গি একটু আস্বচ্ছন্দ। ওরা ওই বস্তীর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। লাবণ্য-ও এদের একটু একটু চেনে। এ পাড়ায় রাস্তায় মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে বিরক্ত করে থাকে। দেখা হলেই খানিকটা পিছু নিয়ে চলে, কখনও শিষ দিয়ে ওঠে, কখনও অকস্মাৎ চোখে চোখ পড়লে ইঙ্গিত করে থাকে। লাবণ্য এদের দেখলে, যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর না হয় সে ক্ষেত্রে অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পথ চলে। খানিকটা অনুসরণ করেই ওরা ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। লোক দুটি পেশাদার গুণ্ডা নয়, কাজ কর্ম্ম করে, কিন্তু মহানগরীর জীবনধারায় সঞ্চারিত এই ব্যাধির বিষে জর্জ্জরভাবে সংক্রামিত। ওদের ধারণা লাবণ্যদের ধরণের অভিভাবকহীন মেয়ে--যাদের ভরণপোষণের ভার নেবার কেউ নেই, জীবিকার দায়ে যারা এমন পথে পথে স্বাধীন ভাবে ঘুড়ে বেড়ায় তারা কখনও ভালো মেয়ে হতে পারে না। স্বাধীন ভাবে মেয়েদের জীবিকা উপার্জ্জনের একটি পথই তাদের চোখে পড়ে। সে এই পথ। তারা জানে মেয়েদের মূলধন একমাত্র দেহ। দেহের শক্তিতে মেয়েরা ভাত রান্না করে, ঝিয়ের কাজ করে, দিন মজুরী খাটে অথবা দেহ ভাঙ্গিয়ে তারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। বি-এ, এম-এ পাশ করে যারা চাকরী করে খেটে খেলেও তাদের কথা স্বতন্ত্র। এ ছাড়া অপর কোন রকম বুদ্ধিগত পন্থায় মেয়েরা জীবিকার্জ্জন করতে পারে এ ধারণা তাদের নাই। এটা শুধু তাদের মন্দত্ব ঢাকবার ছদ্মাবরণ। স্নো ক্রীম পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক রূপকে ঢেকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতই এই জীবিকার্জ্জনের চেষ্টাটা তাদের মন্দত্ব ঢাকার একটা পালিশ বা প্রলেপ।

আজ এই সন্ধ্যার অভিসার-রাগময় সময়ে মেয়েগুলিকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবং পিনাকীর সঙ্গে এই চপলপরিহাসমুখর অবস্থায় দেখবামাত্র তাদের মনে হল আজ তারা এদের চাতুরী ছলনা ধরে ফেলেছে। তারা মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেই সরাসরি এসে পিনাকীর পিছনে দাঁড়াল। মেয়েগুলি চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল এতক্ষণ, সে প্রশ্ন করলে—কে? কে আপনারা? কি চান?

একজন হেসে বলে উঠল—আজ তো ধ'রে ফেলেছি বাবা।

অপরজন হেসে উঠল। পিনাকী সবিস্ময়ে এদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। হাসির শব্দ শুনে এবং কথা শুনে লাবণ্য ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে অরুণা?

—দু'জন লোক।

—লোক ? লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চান এখানে ?

—তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। শীর্ণ কুব্জদেহ পিনাকী, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল !

মুহূর্ত্তে লোকটির হাতে ছুরি ঝলকে উঠল, ছোরা নয়, স্প্রিং-দেওয়া পিতলের বাঁটের ছুরি। স্প্রিং টিপ্‌লেই ফলাটা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা চীৎকার ক'রে উঠল। লাবণ্য হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টেনে নিলে পিনাকীকে, পিনাকী হাত তুলেছিল আত্মরক্ষার জন্য, সেই হাতে ছুরিটা গেল বিঁধে। এর পরই লোক দুটো পালিয়ে গেল।

বিমল বিস্মিত হয়ে গেল পিনাকীর এমন সাহসের পরিচয় পেয়ে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হাসতে লাগল। বললে—ও সব লোকগুলো এমনিই হয়। যে কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়। আমি দেখেছি, ওদের জানি আমি।

—জানেন ? সবিস্ময়ে চিত্ত বললে—জানেন ওদের আপনি ?

—হ্যাঁ। আরও বারদুয়েক ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একবার পিঠে ছুরি মেরেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে পিনাকী বললে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ধারে গাছ-গুলোর তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে—সেই রাস্তার উপর। পিঠে দাগ আছে এখনও। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। সাহস করে দাঁড়ালেই ওরা ভয় পায়, পালায়। সন্ধ্যের অন্ধকার ছিল নইলে বোধ হয় ছুরি মারতে পারত না। এমনিই ভয়ে পালাত।

চিত্ত হেসে বললে—পালায়। কিন্তু ছুরি বসিয়েও দিয়ে যায়। আপনার তো এই তালপাতার সেপাইয়ের মত শরীর, সেবার পিঠে ছুরি খেয়ে বেঁচেছেন—এবারে খুব ফস্কে গিয়ে হাতে লেগেছে কিন্তু এরপর বুকে পিঠে বিঁধলে হাসপাতালে যাবার সময় হবে না। এ রকম গোয়ার্ত্তুমি আর করবেন না। শুধু হাতে এগুবেন না। আমিও অবিশ্যি দুর্ব্বল মানুষ কিন্তু হাতিয়ার আমার সঙ্গে থাকে। ওটি না নিয়ে আমি এক পা বাড়াই না।

তারপর সে আক্ষেপ করে বললে—লোকটাকে চড় না মেরে যদি চীৎকার করে ডাকতেন মশায়! আঃ! এই তো প্রায় দোরের কাছে বললেই হয়। হারামী দুটোকে আজ। আঃ! বসে আছি আমরা—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে দৌড়ে পালাল।

—চিত্ত দা'।

—কে ? লাবণ্য দি ? চিত্ত ডিপোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর।

লাবণ্যই। লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে—পিনাকীকে আজ মেসে ফিরতে দেবেন না। আমি বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপোতেই একটু জায়গা করে যদি—

—ডিপোতে ? এখানে তো কুলীরা থাকে, চারিদিকে কয়লা আর কালী—

—না না। আমি বেশ চলে যাব। আপনি কিছু ভাববেন না। পিনাকী উঠে দাঁড়াল ব্যস্ত হয়ে।

—না। দৃঢ়স্বরে বললে লাবণ্য। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত আধ-কানা আধপাগলা মানুষ, পথে যদি লোক দুটো কোথাও লুকিয়ে থাকে—কি। না। যাওয়া হবেনা তোমার। এখানে অসুবিধা হলে বিমলবাবুর ওখানে থাকবে, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

বিমল বিস্মিত হয়ে নিস্তব্ধ বসে ভাবছিল পিনাকীর কথা। অপ্রতিভ নিস্প্রভ এই জীর্ণদেহ পিনাকীর এই সাহসটা কি ? চিত্তর শরীর এমনি দুর্ব্বল কিন্তু জীবনে এমন আবেষ্টনীর মধ্যে সে পড়েছে যে এই দুঃসাহস তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাধির মত। ক্ষেত্র ছিল অনুকূল। শিক্ষার অভাব; নেশায় আসক্তি, দুর্দ্দান্ত লোকদের সাহচর্য্য দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় বাতাসের সাহায্যে শুকনো কাঠের আগুনের মত। কিন্তু পিনাকীর এ দুঃসাহস কি করে হ'ল ?

লাবণ্যের কথা শুনে সে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললে—আমি এখানেই রয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই রাত্রে পিনাকীবাবুর যাওয়া ঠিক হবে না। ও আমার কাছেই থাকবে। তবে। একটু লজ্জিত ভাবেই বললে—ওঁর জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মানে আমি তো পাইস হোটেলে খাই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

পিনাকীর জামা কাপড় অপরিচ্ছন্ন ময়লা, একটা দুর্গন্ধও তাতে আছে কিন্তু পুলওভার এবং সার্টটা খুলতেই এমন দুর্গন্ধ অনুভব করলে বিমল যে মনে হ'ল তার বমি হয়ে যাবে এখনি। পিনাকীর গায়ের গেঞ্জীটার দুর্গন্ধ, এতক্ষণ জামাদুটোর তলায় চাপা ছিল। অসংখ্য ছিদ্রভরা প্রায় রান্নাঘর নিকানো নেতার মত ময়লা এবং চটচটে একটা গেঞ্জী। বোধ হয় নতুন কিনে পরেছে, আজও কাচা হয় নি, এক দিনের জন্যও গায়ে থেকে নামে

নি। কিন্তু বলবেই বা কি করে ?

বিছানার উপর বসে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে খুব আরাম ক'রে বিড়িটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ বললে—আপনি বেশ আরামে আছেন। চমৎকার ঘরখানি। ছোট্ট, বেশ ঝকঝকে—তকতকে—তেমনি নির্জ্জন। I am monarch of all I survey—একলা ঘর না হ'লে লেখা কি ছবি আঁকা হয় ?

বিমল বললে—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না যেন।

অপ্রতিভ নির্ব্বোধের মত তার মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী বললে—মনে করব কেন ? কি মনে করব ?

একটু ইতস্তত ক'রে বিমল বললে—গেঞ্জীটা খুলে ফেলুন গা থেকে। বড়—

—হ্যাঁ। বড্ড দুর্গন্ধ। অপ্রতিভের মত পিনাকী গেঞ্জীটা টেনে নাকের কাছে তুলে শুঁকলে ;—বড্ড দুর্গন্ধ। ছিঁড়েও গেছে। মানে একটাই গেঞ্জী কি না। ওটা আর কাচা হয় না। বলতে বলতেই সে খুলে ফেললে গেঞ্জীটা। তারপর একবার ভাল ক'রে দেখে আর একবার শুঁকে বললে—এটাকে তা' হ'লে ঘরের বাইরে রেখে দি। সে উঠে বাইরে রেখে এল গেঞ্জীটা দরজার ওদিকে সিঁড়ির উপর।

বিমলের কোন কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে বিস্ময়ে বেদনায় বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল—পিনাকীর দেহ দেখে। পাঁজড়ার প্রতিটি হাড় গণা যায়, বোধ হয় ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে—হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকুনিও দেখা যাবে চামড়ার উপর। শুধু তাই নয়—পিঠে একটা সাংঘাতিক ক্ষতের চিহ্ন—যেন দগদগ করছে। পিনাকী ফিরে বিছানার উপর বসে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে তার দৃষ্টির অর্থ। হেসে বললে, আমার শরীর দেখছেন ?

—আপনার শরীর এত খারাপ !

—এত খারাপ ছিল না আগে। অপ্রতিভের মত হাসলে পিনাকী ;—ওই যে পিঠে ছোরা মেরেছিল—তারপর থেকেই শরীরটা বেশী খারাপ হয়ে গেল। মানে আর সারতে পারলাম না। আমার ছবি একবারেই কেউ নিতে চায় না ! ভাগ্যিস লাবণ্য দিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—উনিই আমার বড় খরিদ্দার। দশটাকা বারোটাকা মাসে পাই ওঁর কাছে।

—পিঠে ওই দাগটা বুঝি সেই ছোরার দাগ ?

—হ্যাঁ। আর খানিকটা ঢুকলে বাঁচতাম না। ডাক্তাররা বললে। হাসতে লাগল পিনাকী।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রশ্ন করলে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ওপাশে গাছের তলায় সন্ধ্যের সময় যান কেন? জায়গাটাতো খুব ভাল নয়।

—না। জায়গাটা খুব খারাপ। তবে ওখান থেকে সূর্য্যাস্তের সময় ফোর্টের ছবিটা খুব ভাল লাগে। গরমের সময়, ওখানে গাছতলায় বসে সূর্য্যাস্ত দেখে বসেই ছিলাম। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা শব্দ শুনে। কেউ যেন আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কেউ যেন বললে—চুপ। চেঁচালে জান মেরে দেব। আমি লাফিয়ে উঠে গাছের ওপাশ থেকে এসে লোকটার ঘাড় চেপে ধরলাম। লোকটা ঝাঁকি মেরে ফেলে দিলে আমাকে। আমি উপুড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে পা চেপে ধরলাম। অন্য লোকটি চীৎকার করতে লাগল; এ লোকটা আমার পিঠে ছোরা মারলে।

একটু থেমে সার্টটা তুলে পকেট খুঁজলে পিনাকী, দুটো পকেটই খুঁজলে। বললে—এ হে—বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

—সিগারেট খান। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে বিমল।

—সিগারেট আমার পোষায় না দাদা। বিড়ি না হলে গলায় সানায় না।

—চুরুট আছে খাবেন?

—চুরুট? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকীর।—ওঃ—জীবনের বিলাসকামনার মধ্যে ওইটে একটা। চুরুট খাব আমি। বুঝলেন?

স্যুটকেশ খুলে চুরুট বার করতে গিয়ে বিমল একটু ভাবলে—তারপর চুরুটের সঙ্গে একটা নতুন গেঞ্জী বার করে পিনাকীর হাতে দিলে, বললে—শীতকাল, খালিগায়ে রাগে সুড় সুড় করবে। এটা পরে ফেলুন। আর এই নিন চুরুট।

—নতুন গেঞ্জী। খুব নরম। এটা গায়ে দেব?

—হ্যাঁ গায়ে দিন—চুরুটটা ধরান।

—আপনি আমাকে—আপনি বলবেন না। গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে বললে—আজকের দিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। বুঝলেন? চিরকাল মনে থাকবে। লাবণ্যদি এত স্নেহ করলেন, নিজে হাতে বিছানা ক'রে দিয়ে গেলেন, খাওয়ালেন, আপনি গেঞ্জী দিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল, তারপর এই চুরুট। আমার বিছানাটা খুব ময়লা আর খুব শক্ত—চমৎকার বিছানাটি।

বিমল উঠে আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছিল। পিনাকী বললে—আর একটু থাক। চুরুটটা

খেয়ে নি। ধোঁয়া না দেখতে পেলে আরামটা পূরো হবে না। গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব তবে তো!

পিনাকীই উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

বিমল তখনও ভাবছিল পিনাকীর কথা। পিনাকীর মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। হয়তো আতঙ্ক অনুভব করার স্নায়ুশিরাগুলি দুর্ব্বল, অথবা ওর রক্তের ধারার মধ্যে একটা দুর্দ্দান্তপনার সূক্ষ্ম স্রোত প্রবহমান রয়েছে। হয় তো সেটা অপরাধপ্রবণতাও হতে পারে।

—ঘুমুলেন দাদা?

—কিছু বলছেন?

—এই দেখুন। আবার আপনি বলছেন?

হেসে বিমল বললে—অভ্যেস হয় নি এখনও। কিছু বলছ!

—আর একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জীবন—কি-ই বা জীবন! তাতে বলবার মত স্মরণ করবার মত দিন আর আসবে কি করে? কিন্তু এসেছিল একটি দিন। সে দিনটির মত দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনর বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে। আমি ঢুকে পড়েছিলাম, এক কোণে বসেছিলাম। মহাত্মাজী বলছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে বুঝাতে গিয়ে বললেন;—বুঝলেন দাদা, থম থম করছে সমস্ত আসরটা—আস্তে আস্তে গান্ধীজী কথা বলছেন, সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছে, অনেকের মনে বিরুদ্ধ যুক্তি ধারালো ছুরির মত উঁচিয়ে উঠে ঝকমক করছে, তাঁদের চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ছোট, ভুরু কপাল উঠেছে কুঁচকে; ওঃ সে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—আমার অহিংসা দুর্ব্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী নির্ভয়ে দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তার দিকে তাকাব। আমার বুকটা গুর গুর করে কেঁপে উঠল। মনে হল মৃত্যু বুঝি খুব কাছে—হয় তো আমারই পাশে—কিম্বা গান্ধীজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। শরীরের রোঁয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমলের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে কথা বলতে পারলে না। পিনাকী বললে—ওই কথাটি রোজ আমার মনে পড়ে। জানেন—এই যে দুবার ছুরি খেলাম, দুবারই আমার মনে পড়েছে কথাটি।

ভোরবেলা দরজায় কড়া নড়ে উঠল, বিমল তখন উঠেছে। মুখ হাত ধুয়ে সে বিব্রত হয়ে বসেছিল—ভাবছিল বেড়াতে বেরুবার কথা। পিনাকী এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে; ওই শীর্ণ দেহ—ওতেও ওর নাক ডাকছে। সম্ভবত আরামটা হয়েছে বেশী। কিন্তু এই ভোরে কড়া নেড়ে ডাকছে কে?

দরজা খুলতেই দেখলে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য। তার পিছনে অরুণা। হাতে কেটলি চায়ের কাপ।

—এ কি? এই সকালে চা নিয়ে খাওয়াতে এসেছেন?

লাবণ্য বললে—আপনি খুব সকালে বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যান—সে আমি জানি। তার আগেই আসব বলে এলাম। কিন্তু পিনাকী এখনও ঘুমুচ্ছে? পিনাকী! পিনাকী!

পিনাকী চোখ মেলে চাইলে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে—লাবণ্যদি!

—ওঠ, মুখ ধুয়ে চা খাও। তারপর চল—হাতটা খুলে গরম জলে ধুয়ে ভাল করে বেঁধে দেব।

চারদিকে সিটি বাজতে লাগল। মহানগরী ঘুম ভাঙ্গাবার আহ্বান জানাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই বিমল গল্পটা শেষ করতে বসল।

(ক্রমশঃ)

★তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ১৯১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সরোদ শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমিরবরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতা সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 281

সাময়িক সাহিত্য

বন্দনা (সংকলন)—সংকলয়িতা : শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। উষা পাবলিশিং হাউস্। দাম—৫৲

গ্রন্থখানিতে 'বঙ্কিম যুগ' হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সদ্য বন্ধন-মুক্তির নবযুগ পর্য্যন্ত প্রায় শতেক খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কবির অত্যুৎকৃষ্ট রচিত জাতীয় সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে। ইহার সুদীর্ঘ ৫২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এখানে সঙ্কলয়িতা কবি পৃথিবীর বিভিন্নদেশের জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ধারা, উহার উৎস, গতি ও ক্রমপরিণতি বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমনি হইয়াছে তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি হইয়াছে মনোজ্ঞ। এই সকল কার্য্যে সাবিত্রীবাবুকে যে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কত পুঁথিপুস্তক নাড়িতে ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের খোঁজে ছুটিতে হইয়াছে, দূরের ও নিকটের চেনা-অচেনা কতজনের কাছে যে হাত বাড়াইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশকে যাঁহারা মনে-প্রাণে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, দেশপ্রীতির আগুনে পুড়িয়া যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে পারিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেই বর্তমানের এই ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংসার-জীবনের দায়িত্ব মিটাইয়া এরূপ একটি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব। সাধারণ ভাবে সঙ্গীতগুলির বিচার বিশ্লেষণ করা ছাড়াও 'বন্দেমাতরম্', 'জনগণমন-অধিনায়ক', 'আমায় বলো না গাহিতে' প্রভৃতি কতকগুলি গানের স্বতন্ত্রভাবে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে ; তাহাতে কবি আমাদিগকে অনেক সরস সুন্দর নূতন কথা শুনাইয়াছেন।

বৃটিশ-শাসনে দুর্ব্বার নিপীড়নের মুখে জাতির মেরুদণ্ড এক একবার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিয়াছে, চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিয়াছে, আশা নাই, উদ্যম নাই, সংহতি নাই ;—এমনি দিনে, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এক একজন কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে মাতৃপূজার অভয় মন্ত্র ! জাতি আবার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিতে সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কে তাহার সঙ্গে আসিল, কে গেল, সেদিকে সে দৃকপাত করে নাই,—একলা চলিয়াছে অন্ধকার কারাগৃহে, আন্দামানের নির্ব্বাসনে, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে ফাঁসির মঞ্চে। এমনিভাবে দিনে দিনে যুগে যুগে চলিয়াছে বন্ধনমুক্তির সাধনা। এই সাধনায় জাতীয় সঙ্গীতগুলির স্থান যে কত উচ্চে তাহার পরিমাপ আজও হয় নাই। সাবিত্রীবাবু অতি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃপূজার অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মায়ের চরণে উৎসর্গীকৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক একটি

গীতি-কুসুম তুলিয়া লইয়াছেন এবং সেগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দর এই 'বন্দনা'-মালা গাঁথিয়াছেন। মুক্তির দিনের আনন্দ কোলাহলে পাছে আমরা ভুলিয়া যাই, কি পদদলিত করিয়া বসি আমাদের সেই দুঃখদুর্গতিময় দিনের হৃদয়-নিঙড়ানো মাতৃপূজার অমূল্য অর্ঘ্য, তাই ভক্তকবি সাবিত্রীপ্রসন্ন সেগুলি চয়ন করিয়া, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া রাখিয়া দিলেন মালার আকারে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা আমাদিগকে, আমাদের পরবর্ত্তীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে, কত দুঃখে, কত কৃচ্ছ্র সাধনায় পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা। 'বন্দনা'র পাতায় পাতায় তখন আনন্দাশ্রু ঝরিবে! তখনই সাবিত্রীবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কামিনীকুমার রায়

পূর্ব্বাশা

সূচীপত্র

চৈত্র—১৩৫৪

কোপাই-চর

শিল্পী
শ্রীরামকিঙ্কর

দশম বর্ষ • দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র • ১৩৫৪

শ্রম ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মার্ক্সকে অনুসরণ করেই বলা যাক, শ্রমপদ্ধতির আদিতে মানুষ পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মানুষ তখন একা, তার সমাজ তখনও গড়ে ওঠেনি। পাথরের কুচি, বনের কাঠ নিয়ে প্রথমেই তার প্রাণধারণমূলক কাজে যে শ্রম নিয়োজিত হ'ল বলাবাহুল্য শ্রমের ইতিহাসে তা-ই গোড়ার কথা। পাথরের বর্শাফলক দিয়ে আমমাংস ভোজী মানুষ পশুবধও করেছে—পশুর আক্রমণ প্রতিরোধও করেছে। আর পরেকার অধ্যায়ে হয়ত কাঠ-লতা দিয়ে গাছের উপর মাচা বেঁধে গুহাবাসের পর্ব্ব সমাধা করে এসেছে। খাদ্যগ্রহণ ও আত্মরক্ষা নামক দুটি মূল জৈবিক বৃত্তিই মানুষকে পেশীসঞ্চালন করে খাদ্যোপকরণ ও রক্ষণোপকরণ তৈরী করতে প্রবৃত্ত করেছিল বলে ভেবে নেওয়া যায়। ভেবে নিতে হয় এই জন্যে যে এ যুগের ইতিহাস বাস্তব ঘটনার মালায় গ্রথিত নয়, ইদানীংকার যুক্তির মালায় গ্রথিত। তবে যুক্তিকে অনৈতিহাসিক মনে করবার বিশেষ কারণ নেই, কেননা জীবনধারণের জন্য একসময় কতগুলো উপকরণ মানুষকে প্রথম তৈরী করতে হয়েছিল। সে উপকরণ তৈরীতে যে শ্রম নিয়োজিত হয়েছে তাকে একটা পদ্ধতির সূচনা বলা যেতে পারে—ব্যায়ামের শ্রমকে যা বলা যায় না।

একটি প্রাকৃতিক উপকরণকে আত্মসাৎ করতে গিয়ে মানুষ যে প্রক্রিয়া অবলম্বন

করেছে, পদ্ধতিগত শ্রমের জন্ম সেখানে নির্ণিত হলেও, শ্রম নামক বিষয়টির জন্মকথা অন্ধকারেই থেকে যায়। বহিরাগত খাদ্যকে আত্মসাৎ করবার জন্যে প্রাণীর পাকস্থলীর তন্তু এবং কোষ অবিরত শ্রম নিয়োগ করছে, তাছাড়া দেখা যায় শুধু সঞ্চালনধর্ম্মী শ্রমে, মানে ব্যায়ামে, পেশীর তন্তু-কোষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। কাজেই শ্রম নামক বিষয়টিকে ক্ষুধা-পাওয়ার মতো একটা রহস্যাচ্ছন্ন, দেহগত বৃত্তি ছাড়া আপাতত আর কি মনে করা যায়? তবে শ্রম যখন দেহাভ্যন্তর ছেড়ে বাইরের আলোবাতাসে এসে প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তার একটা নূতন পর্য্যায় সুরু হল বলতে বাধা নেই। মার্ক্স এখান থেকেই যাত্রা সুরু করেছেন।

মার্ক্সকে অনুসরণ করলে এখন শুনতে পাই: "উৎপাদনপদ্ধতিতে মানুষের কাজ প্রকৃতিরই অনুরূপ—প্রকৃতির মতোই মানুষ বস্তুর রূপ পরিবর্ত্তন করে। মানুষের বেলায় যা বেশি তা হচ্ছে মানুষ এই রূপ পরিবর্ত্তনের পালায় প্রাকৃতির শক্তির সাহায্য পায়। কাজেই দেখা যায় শ্রমজাত দ্রব্যের ব্যাবহারিক মূল্যে শ্রমের দানই সবটুকু নয়, বাস্তব ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উৎস শ্রম নয়। উইলিয়াম পেটির ভাষায় বলা যায়, বাস্তব ঐশ্বর্য্যের জনক হল শ্রম আর তার জননী হচ্ছে পৃথিবী।" (ক্যাপিটেল, প্রথম গ্রন্থ, প্রথম অধ্যায়)। মার্ক্সের কথা পদার্থ বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। অ্যাটমের বিচিত্র সম্বদ্ধতায় যখন এই বিচিত্র বস্তুজগৎ তখন উৎপাদন কথাটাকে আমল দেওয়া ভুল। পরিবর্ত্তন, রূপান্তর প্রভৃতি কথাগুলোই প্রাকৃতিক শক্তির কর্ম্মের সন্ধান দেয়। অবশ্য অ্যাটমের শক্তিগুলো অন্য কোনো বস্তুর রূপান্তরিত অবস্থা কিনা—পদার্থ বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সে-খবর আমাদের দিতে পারেনি। তবে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ যে অ্যাটমে বিলীন হতে পারে ততটুকু খবরই রূপান্তর-তত্ত্বের পক্ষে যথেষ্ট। এই রূপান্তর-তত্ত্বে সন্দেহ ঢোকাতে পারে এমন কোনো সৃষ্টি-তত্ত্ব যদি প্রকৃতির থাকেও তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের বাইরে। মার্ক্স সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী নন। কিন্তু সৃষ্টির (সৃষ্টি বলে যদি কিছু থাকে) আদিম রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়েও মার্ক্স সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি—'উৎপাদন', 'উৎপাদন পদ্ধতি' প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক ধারণা তাঁর মনে শুধু বদ্ধমূলই ছিল না—তাঁর বক্তব্যের মূলাধারই ছিল এ-ধারণাগুলো। কিন্তু সত্যি কি এ-কথাগুলো অবৈজ্ঞানিক? পদার্থবিজ্ঞান বা প্রকৃতিবিজ্ঞানের সূত্রে কথাগুলোকে তা না বলে উপায় নেই সত্যি কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে হুবহু তাল মিলিয়ে চলেনা—মানুষের বিজ্ঞানে 'উৎপাদন' ও 'উৎপাদন পদ্ধতি' কথাগুলোর সার্থকতা সংশয়াতীত। উৎপাদনে উৎপাদকের একটা ইচ্ছামূলক বা উদ্দেশ্যমূলক শক্তি সক্রিয় থাকে—চৈতন্যসম্পন্ন না হয়ে কেউ উৎপাদকের ভূমিকা অভিনয় করতে পারে না। জড় প্রকৃতি বা পশুজগৎ

এ কাজের অনুপযোগী—এ কাজ পারে শুধু মানুষ। প্রকৃতি বস্তুর পরিবর্ত্তন করতে পারে, সে পরিবর্ত্তনের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। মানুষ যে বস্তুর পরিবর্ত্তন করে তা উদ্দেশ্যমূলক, সেই উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্ত্তনের নামই উৎপাদন। উৎপাদনপদ্ধতিতে মানুষকে প্রকৃতির অনুরূপ মনে করার ক্রুটী থেকেই মার্ক্স সৃষ্টিতত্ত্বের ফাঁদে জড়িয়ে গেছেন।

প্রকৃতির রূপান্তর-প্রক্রিয়ার একটি জটিল পরিণতি মানুষ—জড় প্রকৃতির সঙ্গে মিলের চেয়ে তার অমিলই বেশি। যতটুকু তার প্রাকৃতিক পরিচয়, আত্মশিল্পী হিসেবে পরিচয়ও তার চেয়ে কম নয়। তাই প্রকৃতির বিজ্ঞান আর মানুষের বিজ্ঞান আজ আলাদা। এদুটো বিজ্ঞান যে আলাদা তা আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকেই এ-শতাব্দীতে লাভ করেছি। মানুষের শ্রম-প্রসঙ্গে মার্ক্সও অবশ্য মানুষকে সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক নিয়মের একটি সূত্রে মানুষের কার্য্যাবলী বর্ণনা করে গেছেন—মার্ক্সের সমাজ-বর্ণনার সূত্রে প্রকৃতি কখনও এসে উঁকি দেয়নি—কিন্তু গোড়ায় তিনি মানুষের শ্রমশক্তিকে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। শ্রম আর প্রকৃতিকে জনক-জননীর বিশেষণে বিশেষিত করাটাও কাব্যধর্ম্ম ছাড়া কিছু নয়। উৎপাদন-পদ্ধতির পরিচ্ছন্ন বর্ণনা জনক-জননীর উপমায় ব্যক্ত হতে পারে না। ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে নিয়োজিত হতে পারে মানুষের এমন শ্রম আর রূপান্তরধর্ম্মী প্রাকৃতিক বস্তুই শ্রমপদ্ধতির গোড়ার কথা।

তাছাড়াও আরেকটি কথা আছে—শ্রমপদ্ধতিতে আরেকটি বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের ইতিহাসের অতি প্রাচীন অধ্যায়েই উঁকি দিতে সুরু করেছে। যখন শুধু হাত-পা'র সম্বল নিয়ে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে বনিবনাও করে থাকা যায়না বলে মানুষের মনে একটি কথার উদয় হয়েছিল প্রাকৃতিক বস্তুতে শ্রম-প্রয়োগ করবার উপকরণ সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়েরই আবিষ্কার। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বস্তুর যে রূপান্তর ঘটছে শুধু তা দিয়ে তার প্রয়োজন মিটানো চলে না বলে কোনো বোধ মানুষের সেই আদিম, অপরিণত মনেও কাজ করতে সুরু করেছে, তাই একসময় সে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাকৃতিক বস্তুকে রূপান্তরিত করবার উপায় উদ্ভাবন করে তার উপকরণ তৈরী করতে পেরেছিলে। তখন আর শুধু হাত-পা নয়, এই উপকরণের মারফৎই মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুতে শ্রম-প্রয়োগ করে তার ইচ্ছা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করেছে। এই শ্রমোপকরণ শ্রমপদ্ধতির সঙ্গে গোড়া থেকেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। শ্রমের এই অচ্ছেদ্য অঙ্গটির জন্মকথা আজপর্য্যন্ত সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয়নি—পশুপাখী বা মানুষের অঙ্গের জন্মকথার জন্মদাতা ডারুইনের মতো কোনো প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে আবির্ভূত হননি। অথচ মানুষের ইতিহাস তার শ্রম ও

শ্রমোপকরণের সঙ্গে অনেকখানি জড়িত। মার্ক্স তাদের বিবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু কিভাবে যে গুহাবাসী মানুষ পাথরের প্রথম বর্শাফলক হাতে তুলে নিল তার সঠিক সন্ধান তিনিও দিতে পারেন নি। মার্ক্স বলেছেন: "পৃথিবী যেমন মানুষের আদিম খাদ্যভাণ্ডার, ঠিক তেম্নি তার যন্ত্রশালাও পৃথিবীই।" যন্ত্রের জন্মসম্পর্কে এ-উক্তি বাহুল্য মাত্র—প্রাসঙ্গিক উক্তি যতটুকু পাওয়া যায় তাতে মার্ক্স হেগেলের যুক্তিবাদকেই টেনে এনেছেন। বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কুশলী যুক্তি যে বস্তুকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে হেগেলের এই উক্তি সামনে রেখে মার্ক্স বলেছেন: "কোন বস্তুর বলগুণ, পদার্থগুণ এবং রসায়নগুণ অন্যবস্তুকে বশ করবার উপায় হিসেবে শ্রমিক ব্যবহার করে থাকে এবং তা করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে।"—(ক্যাপিটেল, প্রথমগ্রন্থ, পঞ্চমঅধ্যায়)। যন্ত্রের জন্মেতিহাস যতো অজ্ঞানতাতেই আবৃত থাক—এ সত্যটি হয়ত আমরা মেনে নিতে পারি যে মানুষের বুদ্ধিবলই বলবিদ্যার সূচনা করেছে। কাজেই মানুষের ইতিহাস শুধু শ্রমের ইতিহাস নয়, শ্রমোপকরণেরও ইতিহাস আর তাই বুদ্ধিবলের ইতিহাস।

প্রকৃতিকে শ্রমের উপাদান-উপকরণ হিসেবে যুক্তভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে শ্রমকে কর্ত্তার ভূমিকা দান করলে দৃশ্যটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট পরিস্কার হয়ে ওঠেনা, পেছনে কেউ যেন ভূমিকাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তার নাম শ্রমদাতা মানুষ। 'মানুষের শ্রম' কথাটায় শ্রমপদ্ধতিতে মানুষের সুচারু স্থাননির্ণয় হয়না। শ্রমপদ্ধতিতে শ্রম থেকে আলাদা করে মানুষের স্থান নির্ণয় করতে গেলে বলতে হয়—প্রকৃতির মতো মানুষও সেখানে শ্রমেরই উপকরণ। মানুষের ইন্দ্রিয়সঞ্চালনের ফলে শ্রমের জন্ম হচ্ছে এবং সেই শ্রম বস্তুগত হয়ে ব্যবহার্য্য সামগ্রীর জন্ম দিচ্ছে—এ পদ্ধতিতে মানুষ শ্রমের উপকরণ ছাড়া কিছু নয়, শ্রমশক্তিই এখানে আসল সংগঠক। কিন্তু শ্রমোপকরণের ভূমিকা অভিনয় করতে হয় বলেই যে মানুষ আর মানুষ নয় এমন কথা ভাবা যায় না। যে-শ্রমশক্তি উৎপাদনের কর্ত্তা তার নিয়ামক মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি এবং কল্পনা। তাই পশুর মতো মানুষ নিছক শ্রমোপকরণ নয়, শ্রমের প্রভুত্ব করবার সুযোগ তার সর্ব্বদাই ছিল এবং আছে। আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রমোপকরণের কাহিনী যদি কোনোসময় রচিত হয়, তা শুধু প্রকৃতি ও পশুশক্তির কাহিনী হবেনা—মানুষের কাহিনীও তার অনেকখানি জুড়ে থাকবে।

সমস্ত বিশ্লেষণ সঙ্কুচিত করে এখন আমরা আবার প্রথম কথাতেই ফিরে যেতে পারি—শ্রমপদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে মানুষ আর পৃথিবী। মানুষ শ্রমের ধারক, বাহক, প্রয়োজক এবং নিয়ামক আর পৃথিবীও শ্রমের ধারক, বাহক আর শ্রমলভ্য বস্তুর ভাণ্ডার। শ্রম এখানে শক্তিরই নামান্তর। পৃথিবী আর মানুষ আজ যতটুকু আলাদা—তাদের শক্তির রূপও ততটুকুই আলাদা। শুধু বেগ আর বল মাত্রায় বিভিন্ন হয়েও মানুষে আর প্রকৃতি জগতে

অভিন্ন রূপে সক্রিয়। তাই শ্রমের প্রথম অধ্যায়ে বেগ আর বলই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। শ্রমোপকরণ হিসেবে মানুষ বেগ ও বলপ্রয়োগ করেই প্রার্থিত বস্তুর রূপদান করেছে। কিন্তু মানুষের দৈহিক বল প্রকৃতির জল-বায়ু-প্রবাহের বা পশুর তুলনায় খুবই সামান্য। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে নিরাপদে নির্ভয়ে জীবন যাপন করা যায় না—বলহীন দ্বারা আত্মা লাভ ত দূরের কথা, প্রথমত আত্মরক্ষা করাই মুস্কিল। এই রূঢ় বাস্তব বোধ নিয়ে মানুষ যে শক্তিসাধনায় তৎপর হ'বে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। দুর্ব্বোধ্য প্রাকৃতিক শক্তির পূজায় আর বলবিদ্যার প্রথম স্ফুরণে আদিম মানুষের শক্তিসাধনার একই ইঙ্গিত বর্ত্তমান। নিজেকে বলহীন এবং প্রকৃতিকে বলসম্পন্ন বলে মানুষ যেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিল, সেদিনই তার বৃহৎ ইতিহাসের প্রথম পংক্তি রচনা হয়ে গেছে। আর যেদিন বলবিদ্যার প্রথম স্ফুরণে মানুষ তার দৈহিক শক্তিকে বর্দ্ধিত করবার একটি বাস্তব প্রক্রিয়া বা উপায় খুঁজে পেয়েছিল, সে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, সেদিনই তার প্রকৃতিজয়ের প্রথম পর্ব্ব সুরু। সেদিন শুধু তার দেহই আর শ্রমোপকরণ নয়, প্রকৃতি তার কাছে ধরা দিতে সুরু করেছে শ্রমোপকরণ হয়ে।

নিজের বাস্তব প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রকৃতি থেকে একটু একটু করে শক্তি অপহরণ করে নেওয়ার পালা মানুষের অনেকদিন ধরেই চলেছে—যখন পশুর মতো তার দলীয় জীবন, জীবনের সেই দীর্ঘ অধ্যায়ে প্রকৃতি তার কাছে খাদ্যভাণ্ডার আর যন্ত্রশালার দ্বিবিধ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। তখনও মানুষের সমাজ-জীবন সুরু হয়নি, জনসংখ্যা বেড়ে যাযাবরবৃত্তিতে তার জীবনধারণের সমস্যা সমাহিত। তখনও যদি মানুষকে গুহাবাসী বলে কল্পনা করি, তাহলে কল্পনাতে দেখা যাবে পশুহননের অস্ত্র তৈরী করতেই সে শ্রম-নিয়োগ করছে আর সম্ভবত সেই অস্ত্রের সাহায্যেই গুহাগাত্রে পশুচিত্র খোদাই করছে। সে-অস্ত্র যদি লৌহমিশ্রিত প্রস্তরখণ্ড হয়ে থাকে তাহলে মনে করতে হবে তার শ্রম তখনও অনেকাংশে দেহনির্ভর হয়ে আছে—কিন্তু সে যদি তখন ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার আয়ত্ত করে থাকে তাহলে বল্‌ব যে বলবিদ্যা মূর্ত্তিমতী হয়ে তার হাতে ধরা দিয়েছে—মানুষের কাছে প্রকৃতি তার শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে সুরু করেছে। মানুষের এই ধূসর অধ্যায় পার হয়ে যখন আমরা কৃষির রৌদ্রকরোজ্জল অধ্যায়ে এসে দাঁড়াই তখন দেখা যায়, শ্রম একটি ব্যাপক ক্ষেত্র লাভ করে বিচিত্র ধারায় বিকশিত। কৃষির অধ্যায় মানে, প্রকৃতির আচ্ছাদন ছেড়ে মানুষ আকাশের নীচে সমতলে এসে দাঁড়াল; তাছাড়া প্রকৃতি মানুষের হাতে স্বেচ্ছায় যে-খাদ্য তুলে দিয়েছিল, তার পরিমাণ বাড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর সমস্যা আর তার সমাধানও ছিল এ-অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। দলীয় জীবনের বহুবিধ শ্রমের ও জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা সন্নিবিষ্ট হয়েই নিঃসন্দেহে কৃষির অধ্যায় গড়ে তুলেছে। কৃষির অধ্যায়ে যে-ব্যাপক প্রকৃতি-জ্ঞানে মানুষকে

সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়, তার অঙ্কুর দলীয় জীবনে উদ্গত না হলে কৃষির অস্তিত্ব কল্পনা করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতিকে জানবার বা প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করবার পালা তাই কৃষি-পূর্ব্ব জীবনে অনুপস্থিত ছিল বলে মনে করা সম্ভব নয়। কৃষিজীবনে বহুবিধ পরিবর্ত্তনের মতো প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করবার পালাও সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক পরিণতি লাভ করেছে। কৃষিজীবনে শ্রম ও শ্রমের বিষয় দলীয় জীবনের শ্রম ও শ্রমের বিষয় থেকে মূলত এতোই আলাদা যে দলীয় জীবনের শ্রমদাতা কৃষিজীবনে শ্রমদাতা হিসেবে প্রাধান্য অর্জ্জন করতে পারেনি—আদিম কৃষিকর্ম্মে নারীর প্রাধান্যই তার প্রমাণ। কৃষিকর্ম্মের ক্ষেত্রও অবারিত পার্ব্বত্য বা অরণ্য ভূমি নয়, গৃহাঙ্গনের সমতল—কাজেই সন্তানের জননী, গৃহচারিণী নারীর পক্ষেই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা স্বাভাবিক ছিল, পশুহন্তা, যাযাবর পুরুষের পক্ষে নয়। তারপর গাত্রাচ্ছাদন। আচ্ছাদনের প্রয়োজন বোধ পুরুষের চেয়ে প্রথম নারীরই বেশি হওয়া স্বাভাবিক—তাছাড়া তা তৈরীর যে ইঙ্গিত প্রকৃতিতে ছিল, পুরুষের তা লক্ষ্য করবার কথা নয়। মাকড়সার কর্ম্মপদ্ধতি মৃগয়ালুব্ধ পুরুষ অনুসরণ করতে পারে না। এ কাজ নারীর। মাকড়সার দেহঘূর্ণন লক্ষ্য না করলে সূতা কাটা কোনোদিন সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। বয়নের জ্ঞাত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েও আমরা চরকা আর তাঁতের পাশে নারীকেই দেখ্‌তে পাই। একটি সমতল অঞ্চলের বেষ্টনে কোনো গোষ্ঠীর নারীপুরুষকে জড়িয়ে রাখার মধ্যেই সমাজের বীজের সন্ধান মেলে—নারীর শ্রমেই মানুষের যাযাবর জীবনে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা। প্রকৃতির যে শক্তি তার শস্যকণায় রূপায়িত সে-সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতা জননী-নারীর পক্ষেই সম্ভব। বলাবাহুল্য এ-শক্তি বলবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, রসায়নের এলাকাতেই আজ তার স্থাননির্দ্দেশ হয়েছে—কিন্তু রসায়নশাস্ত্রের আবির্ভাবের বহুসহস্র বছর আগে নারী একটি রাসায়নিক অভিজ্ঞতাকে শ্রমে প্রয়োগ করেছিল দেখা যায়।

কৃষিকর্ম্মে খাদ্যসংগ্রহের নূতন পথ খোলা হল বটে—অন্য একটি শক্তিতে প্রকৃতির পরিচয়ও পাওয়া গেল কিন্তু তা বলে মানুষের পূর্ব্বার্জ্জিত বলবিদ্যা বাতিল হয়ে গেল না। এই নূতন পথকে বাঁধান সড়কে পরিণত করবার কাজে ধীরে ধীরে বলবিদ্যার ডাক পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল বলবিদ্যাধর পুরুষেরও। গোষ্ঠীতে জনসংখ্যা বাড়ছে—প্রচুর উৎপাদন চাই, নারীর দৈহিক শ্রম যতোটা উৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে ঢের বেশি শস্য চাই—তাই বলবিদ্যাধর পুরুষের ডাক পড়ল। দেখা গেল পুরুষ আর নারী উভয়েই কৃষির শ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে—শ্রমবিভাগের ভূমিকা তৈরী হ'ল এখানেই। যে-শ্রমবিভাগ পরবর্ত্তী যুগে সমাজের চাবিকাঠি হাতের মুঠোতে রেখে দিয়েছে তার সূচনাতেই গোষ্ঠীজীবনে একটি বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। শ্রমশক্তির প্রাধান্যের দরুণই পুরুষ

মাতৃপ্রধান গোষ্ঠীর বন্ধন মোচন করে পিতৃপ্রধান গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করল। পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীই শ্রমবিভাগের স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন করে সমাজের একটি সম্পূর্ণ রূপ দান করেছিল।

সমাজ-জীবনের বিচিত্র শ্রমবিভাগ বিচিত্র প্রয়োজনের পথমোচন। এই বিচিত্র প্রয়োজন একটি গোষ্ঠীজীবনে আপনা থেকেই জন্ম গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র জীবন যাপন প্রণালীর আদান-প্রদানে এবং সংমিশ্রণে সমাজ-জীবনে প্রয়োজনের বহুধা বিকাশ হয়েছে। গোষ্ঠীগত মানুষের বহুতর প্রয়োজন সেদিন বহুপ্রকার শ্রম বিভাগে বিভক্ত হয়ে একটি সুসম্বন্ধ মানুষের মৌচাক বা সমাজ গড়ে তুলেছিল। এ-সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের সুসম্বন্ধতার জন্যে যেমনি আবার নিজের জন্যেও তেম্নি খানিকটা শ্রম দান করে জীবন-ধারণের একটি নূতন পর্য্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতীয় পল্লী সমাজতন্ত্র বা আদিম সমাজের জন্ম এখানেই। পল্লীভুক্ত মানুষের যতোটা খাদ্যশস্য প্রয়োজন একদল লোক ভূমিকর্ষণ করে তা-ই উৎপন্ন করছে, প্রত্যেকটি পরিবার সুতা কাটছে—নিজেদের কাপড় বুনছে, ছুতোর কামার আছে কৃষির সাজসরঞ্জাম তৈরীর জন্যে, কুমোর আছে মাটির বাসনকোসন তৈরী করবে।* ছুতোর-কামার-কুমোরকে সেদিন ভূমিকর্ষণ করতে হয়নি, সবার মতো নিজেদের কাপড় নিজেরা বুনে নিলেও কৃষকদের শ্রমের সঙ্গে নিজেদের শ্রম বিনিময় করেই তারা খাদ্যসংগ্রহ করেছে। সমাজকে যদি আমরা মালার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বল্‌তে হয় এ-মালার সুতো শ্রম-বিভাগ ও শ্রম বিনিময়। এখানে ছুতোর-কামার-কুমোর একটি বিশেষ বিদ্যা অর্জ্জন করে তার নির্দ্দেশে শ্রম প্রয়োগ করে বস্তুর রূপদান করছে আর সে বস্তুর সঙ্গে কৃষিবিদ্যা নির্দ্দেশিত শ্রমফলের বিনিময় হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। কাজেই শ্রম বিনিময় কথাটাতে খানিকটা অপূর্ণতা থেকে যায়। শ্রমের বিভিন্নতার দরুণই যদি তাদের মধ্যে বিনিময় বন্ধন গড়ে ওঠে তাহলে বল্‌তে হয় বিদ্যার বিভিন্নতাই শ্রমের এই বিভিন্নতার স্রষ্টা এবং শেষ বিচারে দেখা যায় বিদ্যার বিভিন্নতাই শ্রম বিনিময় ও শ্রমজাত বস্তুবিনিময় প্রভৃতি ঘটনার নিয়ামক।

পল্লীসমাজতন্ত্র বা সমাজের শৈশবাবস্থার পরেকার চিত্র এতো সহজ, সরল নয়। সমাজের দ্বিতীয় স্তরে বহু জটিলতা এসে জড় হয়েছে—এ জটিলতা শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে পল্লীকে রক্ষা করবার উপায় থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল। খাদ্যসংস্থানের শ্রম এবার আত্মরক্ষার শ্রমের দ্বারস্থ হ'ল—বাহুবলের কাছে নতি স্বীকার করল বলবিদ্যা। জনরক্ষী বাহুবলই একদা রাজন আখ্যায় নিজের একটি সুস্পষ্ট প্রভুত্ব স্থাপন করে নিয়েছিল। হয়ত একটি পল্লী রাজধানীতে বা নগরে উন্নীত হল—

* ঊনবিংশশতকেও লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল মার্ক উইল্‌কস্‌ দক্ষিণ ভারতে প্রায় এধরণের চিত্রই দেখেছেন (ক্যাপিটেল, প্রথমগ্রন্থ, দ্বাদশ অধ্যায়)।

তাকে কেন্দ্র করে নূতন নূতন পল্লী গড়ে উঠল। রাজকীয় মহিমা যে-শ্রমকে উচ্চে তুলে ধরল তা পল্লীসমাজতন্ত্রে বিঘ্ন উপস্থিত না করলেও সামাজিক শ্রম-চিত্র আর ঠিক আগেকার মতো থাকেনি। স্বাধীন একটি সমাজ যদি ব্যক্তি বিশেষের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে তাহলে সমাজের-ভারসাম্য বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। পল্লী-সমাজতন্ত্র বিঘ্নিত না হলেও যে-পল্লী নগর হয়ে উঠল—তা' আর পল্লী রইল না—কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাবে সেখান থেকে কৃষিজীবীর বাস উঠে গেল কিন্তু পল্লীশিল্পীদের নগর ত্যাগের কোন কারণ ছিল না। নাগরিকদেরও জীবন ধারণ করতে হয় এবং তার আসবাব ও সাজসরঞ্জাম তারা হাতের কাছেই পেতে চায়—কাজেই নগরে পল্লীশিল্পীদের প্রয়োজন ছিল। খাদ্য সংস্থানের জন্যে কৃষকদের প্রয়োজনও যে তাদের ছিলনা এমন নয়—কিন্তু নগর দিয়ে কৃষকের প্রয়োজন নেই। পল্লীর সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও রাজধানী জনরক্ষা শ্রমের বিনিময়ে পল্লীর শস্যের অংশ গ্রহণ করেছে। নগর-পল্লীর এই পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাই শ্রমবিভাগকে সুস্পষ্ট, সুমার্জ্জিত করে তুলছে দেখা যায়। শুধু কৃষক ও রাজপুরুষের শ্রমের বিভিন্নতাই নয় পল্লীশিল্পীদের নাগরিক শিল্পীতে পরিণতি ও এ-শ্রমবিভাগের পর্য্যায়ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে মার্ক্সের এ-কথাটি স্মরণীয়: "পল্লী ও নগরের পার্থক্যের পরিণতিতেই সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত আছে বলা যায়।"—(ক্যাপিটেল প্রথম গ্রন্থ—দ্বাদশ অধ্যায়)।

বিপুল সৈন্যসমাবেশে, রাজপুরুষ ও রাজানুগ্রহপ্রার্থীর ভিড়ে রাজধানীর জনসংখ্যা পল্লীর চেয়ে বহুগুণ বর্দ্ধিত ছিল, কাজেই ব্যবহার্য্য সামগ্রীর প্রয়োজনও ছিল সেখানে বিস্তর। পল্লীশিল্প নাগরিক পরিবেশে বিপুল পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হল। প্রত্যেকটি শিল্পে একাধিক শিল্পীর চাহিদাই বড় কথা নয়, একই ধরণের শিল্পীদের যৌথ শ্রমের এক একটি প্রতিষ্ঠানও (গিল্ড) নাগরিক জীবনের প্রয়োজনেই গড়ে উঠল। সেসব প্রতিষ্ঠানের নায়কের পদ শ্রেষ্ঠ কারিগররাই লাভ করতেন। শ্রমের পরিমাণগত এ-পরিবর্ত্তন ছাড়াও শ্রমের প্রকারগত খানিকটা পরিবর্ত্তন জেনোফোনের রচনা থেকে আবিষ্কার করা যায়। একজন কাঠের মিস্ত্রী পল্লীর জনবিরল পরিবেশে হয়ত দেহলী, কাষ্ঠাসন, লাঙ্গল সবই একা তৈরী করত—জনবহুলতার দরুণ নগরে কাঠের বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদা সর্ব্বদাই এতো বেশি যে এক একটি সামগ্রীর নির্ম্মাণেই এক-একজন কারিগরের জীবিকার্জ্জনোপযোগী শ্রম নিয়োগ করতে হত। সদৃশ সামগ্রীতে যাবতীয় কৌশল ও শ্রম নিয়োগ করার ফলে প্রত্যেকটি শিল্প নিখুঁতভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ লাভ করল। জেনোফোনের এ-উক্তিতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই: "নগরীতেই শিল্পসমূহের পূর্ণ সমৃদ্ধি।"

নাগরিক অধ্যায়ে শ্রমের এই পরিণতির চেয়েও যা উল্লেখযোগ্য তা শ্রমের দেহগত নয়, সামগ্রীর দেহগত। সামগ্রী পণ্যে রূপান্তরিত হল—প্রত্যক্ষ শ্রমবিনিময় মুদ্রার আড়ালে

মুখ ঢাকল। সামগ্রী তার ব্যবহারগত মূল্য ছাড়াও বিনিময়-যাত্রায় মুদ্রার মাধ্যমে আরেকটি মূল্য অর্জ্জন করতে চেষ্টা করল। এই স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জনের পথে সামগ্রী পণ্য নাম গ্রহণ করে। এখানে এ ধরণের একটি ছবি আঁকা যায়ঃ একজন রাজপুরুষের তিন মাসে একটি কাপড় দরকার—তিন মাসে তিনি রাজভাণ্ডার থেকে হয়ত পারিশ্রমিক ৬০টি কার্ষাপণ মুদ্রা পাচ্ছেনঃ একটি তাঁতী রোজ হয়ত একটি কাপড় বুনতে পারে, একটি কাপড়ের সূতায় ৬ পণ খরচ হয়, তার নিজের দৈনন্দিন খরচ ৪ পণ, রোজই তার কাছে একটি কাপড়ের চাহিদা আসে তবু সাবধানী তাঁতী একটি কাপড় ১৬ পণ বা এক কার্ষাপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিচ্ছে। রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁতীর শ্রমের বিনিময়ে পরিমাণগত সাদৃশ্য রইল কি না সেই হিসেব তাঁতী করতে বসেনি, তাছাড়া কাপড়টির স্বকীয় মূল্যও (সূতা ৬ পণ+শ্রম মূল্য ৪ পণ+তাঁতযন্ত্রের ব্যবহার মূল্য) নির্দ্ধারণ করতে চায়নি; ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই সে বিনিময়মূল্য নিরূপণ করেছে—সে অসুস্থ থাকবে কি-না, তাঁত ভেঙে যাবে কি না, রোজ একটি কাপড়ের চাহিদা হবে কি না। সামগ্রীর রূপদাতা হিসেবে সামগ্রীর উপর এবং সামগ্রীর মূল্য ধার্য্যের উপর তারই প্রভুত্ব; একটি কার্ষাপণ নিয়ে রাজপুরুষ যে তার সঙ্গে শ্রম বিনিময়ই করতে আসছে সে-বিচার তখন আর সামগ্রীর প্রভু তাঁতীর নেই। তাঁতীর এই প্রভুত্বের ক্ষতিসাধন করতে পারে একমাত্র অন্য কোনো কুশলী তাঁতী রোজ যার দুটি কাপড় তৈরী করবার ক্ষমতা আছে। একাধিক কার্ষাপণ মূল্য ধার্য্য করে যে কুশলী তাঁতী রোজ একটি উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী করে, তা'কে দিয়েও আমাদের পরিচিত তাঁতীর ভয় কম নয়, কারণ যে-রাজপুরুষ তাঁর পারিশ্রমিক থেকে একটি কাপড়ে দুই কার্ষাপণ ব্যয় করতে পারেন, তিনি আর তখন আমাদের পরিচিত তাঁতীর ক্রেতা রইলেন না। রাজপুরুষদের ক্রয়শক্তির তারতম্যের সৃষ্টি যেমন তাঁদের শৌর্য্য ও প্রয়োজন হিসেবে রাজবিধানদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, ঠিক সেই সঙ্গে শিল্পকারদের বিক্রয়শক্তির তারতম্যও তাদের নিজস্ব কৌশলদ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। রক্ষণশ্রম আর ভক্ষণশ্রম বিনিময়ের ক্ষেত্রে এসে মুদ্রার সাহায্য ছাড়া চলতে পারেনি। মানুষের জীবনযাত্রা কেবল উৎপাদক-খাদকের সহজ সম্বন্ধ নিয়ে নিরুপদ্রবে চলবার অবকাশ পায়নি বলেই পল্লী থেকে পৃথক হয়ে রক্ষণশ্রমকেন্দ্রে নগরের আবির্ভাব হল।

বলাবাহুল্য মুদ্রার উদ্ভবও নগরেই হয়েছিল, পল্লীতে নয়। পল্লীতে শ্রমের কারণ ছিল উৎপাদন—উৎপাদক-খাদক হিসেবে পল্লীবাসী শ্রমলব্ধ বস্তুর বিনিময় করেই অনায়াসে জীবন যাপন করতে পারে, তখন আর সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটি তৃতীয় বস্তুকে বিনিময়ের কাজে টেনে আনতে হয়না। পরবর্ত্তী সময়ে পল্লীতেও অবশ্য মুদ্রার প্রচলন হয়েছে—কিন্তু তা সুবিধা-বোধে, স্বেচ্ছায় একটি নাগরিক রীতির অনুসরণ।

নগরের সূত্রপাতে পল্লীসমাজতন্ত্র গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হলনা বটে কিন্তু নাগরিক

রাষ্ট্রশক্তির বন্ধনে পল্লীর অর্থনৈতিক শক্তি খানিকটা স্বাতন্ত্র্যভ্রষ্ট হল। প্রাক্‌নাগরিক যুগে পল্লীর উৎপাদন পল্লীবাসীর ভোগেই পর্য্যবসিত হত, দুর্বৎসরের জন্যে সঞ্চয় যা থাকত তা ব্যবহারেরই অভিপ্রায়ে। তার মানে পল্লীর শ্রম ছিল ভোগের জন্যে—কিন্তু নাগরিক যুগে ভোগ ছাড়াও রাজস্বের জন্যে পল্লীবাসীদের খানিকটা অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করতে হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের শ্রম নগরের হাতে তুলে দিয়ে পল্লী নগরকে খানিকটা শ্রমমূল্য দিয়েছে। শ্রমকে এধরণের পণ্য করে তুলবার জন্যে দায়ী নগর কি পল্লী তা হয়ত সঠিক জানবার উপায় নেই কিন্তু প্রথাটির শিকড় যে এ অধ্যায়েই প্রোথিত সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলেনা। এ-প্রথা ভবিষ্যৎ সমাজে ফলে-ফুলে বিকাশ লাভ করেছে—উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে মার্ক্স তাকে আবিষ্কার করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন তখন যখন শ্রমিক তার শ্রমকে পণ্য করে প্রত্যক্ষভাবে এসে বাজারে দাঁড়াল। এই পণ্যীভূত শ্রম কি তার হাজার হাজার বছর আগেই রাজভাণ্ডারে কার্ষাপণের কলেবর লাভ করেনি ?

উদ্বৃত্তশ্রম আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে মার্ক্স ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রসঙ্গে বলেছেন—শ্রমিক তার শ্রম বিক্রয় করবার জন্যে ধনতন্ত্রীর নিকট আসে, ধনতন্ত্রী তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাবে যেমি উৎপাদনযন্ত্র ও কাঁচা মাল কিনে নেয় ঠিক তেমি উৎপাদনোপযোগী শ্রমও কিনে নেয়। শ্রমিক যে যন্ত্র চালায় এ ঘটনাটিকে তিনি এ বলে বিবৃত করেছেন যে ধনতন্ত্রী শ্রমিকের শ্রম আত্মসাৎ করতে থাকে।—(ক্যাপিটেল-প্রথমখণ্ড পঞ্চমঅধ্যায়)। এ-চিত্রটিকে শ্রম প্রয়োগ পদ্ধতির মারফৎ দেখতে গেলে মার্ক্সের দৃষ্টি আমাদের থাকেনা। ধনতন্ত্রীর জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মার্ক্স স্বীকার করেছেন—উৎপাদনে তার ব্যক্তিগত দান জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং শ্রমিকের ব্যক্তিগত দান শ্রম—দু তরফের এ-দুরকম মানবিক শক্তি, যন্ত্র (মানুষের প্রাক্তন বুদ্ধি + প্রাকৃতিক বস্তু + শ্রম) ও কাঁচামালের (প্রাক্তন শ্রম + প্রাকৃতিক বস্তু) সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক অধ্যায়ে উৎপাদনপদ্ধতির গোড়াপত্তন করেছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ কায়িকশ্রম ক্রমেই পশ্চাৎপটে সরে সরে যাচ্ছে দেখা যায়, মার্ক্স সেই পশ্চাদপসারী প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রমকেই সম্মুখে এনে স্থাপন করেছেন। শ্রমকে মানবিক শক্তির প্রথম বিকাশ এবং বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতির মতো মানবিক শক্তিবিশেষ বলে মেনে নিলে আমরা কিছুতেই তাকে মানুষের ইতিহাস-নাটকের নায়ক বলে মেনে নিতে পারিনে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন উৎপাদনের একটি পরিণত অবস্থা—এ অবস্থার উৎপন্নবস্তুকে বিশ্লেষণ করতে গেলে এ ধরণের অঙ্কই দাঁড়ায়ঃ ধনতন্ত্রী (মানুষের আধুনিক জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল) + শ্রমিক (যন্ত্রপরিচালনক্ষম আধুনিক শ্রম) + জটিল যন্ত্র ও কাঁচামাল। আধুনিক উৎপাদন দৃশ্যে ধনতন্ত্রী নায়ক হতে চান, এবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বুদ্ধি ও জ্ঞানকে কায়িক শ্রমের উর্দ্ধে স্থাপন করবার প্রাক্তন সংস্কারই এখানে সক্রিয়। উৎপাদন-প্রাচুর্য্যের জন্যে বা শ্রম লাঘব করবার

জন্যে যেদিন উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির জন্ম দেওয়া হয় সেদিন মানুষের বুদ্ধি বিদ্যাই সর্ব্বপ্রধান ভূমিকা অভিনয় করে। যন্ত্রনির্ম্মাণের ইতিহাসে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের কাহিনীই জড়িত হয়ে আছে; বলবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা আয়ত্ত করেই মানুষ উৎপাদনের উপায়কে ক্রমে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সুপরিণত করে তুলেছে। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অধ্যায়ে শ্রম-যন্ত্রের বহুধা বিকাশ দেখতে পাই। তদানীন্তন বিদ্যা ও জ্ঞান শ্রমযন্ত্র নির্ম্মাণে নিশ্চেষ্ট ছিলনা—ধনতন্ত্রে আমরা তার পরিণত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি।

ভোগ্যবস্তুর পণ্যত্ব প্রাপ্তির প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। দেখা যায় পণ্যে শ্রম ও শ্রমবিষয়ের মূল্য ছাড়াও আরেকটি মূল্য ধরা থাকে, মার্ক্সের ভাষায় যাকে বলা যায় অবস্থা বিশেষের গুণ (Circumstantial qualities), আমরা তাকে প্রাচীন পণ্যনির্ম্মাতার ভবিষ্যৎ চিন্তার ফল বলে উল্লেখ করেছি। পণ্যে যে ব্যাবহারিক মূল্য ছাড়া একটি বাড়তি মূল্য সংযুক্ত হ'তে পারে তাই এখানে লক্ষণীয়। তাছাড়া বিনিময়ের-ঘটনায় পণ্যের পর্য্যটন ক্ষমতা বলেও একটি গুণ আবিষ্কার করা যায়। পণ্যের এই পর্য্যটনক্ষমতাকে আত্মসাৎ করে একদল পর্য্যটক এ-সময়েই আবির্ভূত হয়েছিল এবং নিজেদের পর্য্যটনশ্রম হিসেবে আরো খানিকটা বাড়তি মূল্য পণ্যের উপর চাপিয়ে নিজেদের জীবিকাসংস্থান করতে চেয়েছিল। একটি জনপদের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পণ্য নিয়ে পর্য্যটনের শ্রম অবশ্য সামান্য নয় এবং বণিকসম্প্রদায়ও সে শ্রমের অসামান্য মূল্যই পণ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই এককালে ভারতবর্ষে বণিক-সম্প্রদায় সমাজে শ্রেষ্ঠীর আসন অধিকার করে আছে দেখা যায়। পণ্যভোক্তা ও পণ্যনির্ম্মাতার মধ্যবর্ত্তী যেন একটি বিনিময়যন্ত্র উদ্ভূত হয়ে পণ্যমূল্যের একটি বৃহৎ অংশ গ্রাস করতে সুরু করল। পণ্যে একটি চমৎকার অবস্থা-বিশেষের গুণ সংযোজিত হল! শ্রেষ্ঠীদের পণ্যসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার ছিল যৌথশ্রমের প্রতিষ্ঠানগুলো। শ্রেষ্ঠীর মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদায় যৌথশ্রমের প্রতিষ্ঠানগুলোও স্ফীতকায় হবার সুযোগ লাভ করেছে। এই পরোক্ষ সামাজিক উপকারই শুধু নয়, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে শ্রেষ্ঠীদের চেষ্টায় ও অর্থেই রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের কাজ তখন ব্যাপকভাবে সুসম্পন্ন হ'ত আর তাছাড়া চম্পা, কম্বুজ, যবদ্বীপে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য-স্থাপনও দক্ষিণ ভারতীয় বণিকসঙ্ঘের তৎপরতায়ই সুসাধ্য হয়েছিল। —(শ্রীযুক্ত পানিক্করের 'এ সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি'—সপ্তম, অষ্টম ও দশম অধ্যায়।)

মুদ্রার মতো বণিকশ্রেণীও নগরেই উদ্ভূত। কিন্তু নগর উপকণ্ঠের যৌথশ্রম প্রতিষ্ঠানে ছাড়া পল্লীতেও তাদের গতিবিধি ছিল। বণিকশ্রেণী পল্লীতে শুধু মুদ্রারই প্রচলন করেনি —বণিকবৃত্তিও প্রচলন করে দিয়েছে। বণিকের সংস্পর্শে এসে পল্লীর শিল্পকাররা শুধু ভোগ ও রাজস্বের জন্যে আর উৎপাদন করত না। তাতে পণ্যের প্রেরণাও থাকত। নতুবা পল্লীসমাজ-

তন্ত্র ভেঙে স্বতন্ত্র চাষী ও শিল্পকারের সৃষ্টি হ'য় কি করে ? যৌথকৃষিতে শ্রমের তারতম্য সর্ব্বদাই উপস্থিত ছিল, তা সত্বেও ভোগের জন্যে উৎপাদন বলে তখন শ্রমের পরিমাণ বিচার করবার দরকার ছিল না—তার পরিমাণ বিচার করে দেখবার দরকার হ'ল শ্রমলব্ধ বস্তুকে পণ্য করা যায় বলে। অধিক শ্রম দান করবার ক্ষমতা আছে যে কৃষকের সে দেখতে পেল, যৌথকৃষি থেকে পৃথক হয়ে এলে তার শ্রমে ভোগ্য, রাজস্ব ছাড়াও অপর অপর কৃষকের চেয়ে বেশি পণ্য তৈরী হ'তে পারে, তার মানে তার বেশি মুদ্রাসঞ্চয় হয় আর তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন পণ্যসংস্থানের ব্যবস্থা তার বেশি থাকে। বণিকের মুদ্রা এবং বিচিত্র পণ্যই এই লাভ-ক্ষতির হিসেব পল্লীবাসীর মনে এনে দিয়ে ব্যক্তিগত উৎপাদনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। নগর উপকণ্ঠের যৌথশ্রমপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্নস্তরের বেতনভুক্ শ্রমিকের উদ্ভবও বণিকের মুদ্রার সংস্পর্শে এসেই হয়েছিল—য়ুরোপে হয়ত গিল্ড ভেঙে সমপর্য্যায়ের শ্রমিক সমবায়ে নূতন গিল্ড তৈরী হয়েছে (ক্যাপিটেল-প্রথমগ্রন্থ-দ্বাদশ অধ্যায়) কিন্তু ভারতবর্ষে, মনে হয়, যৌথশ্রম-প্রতিষ্ঠানের নায়ক মুদ্রাসঞ্চয়ের দ্বারা ধনী এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়েই ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা অভিনয় করেছে। পল্লীকৃষির অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেই এ মন্তব্য করা যায়, নতুবা তার আর স্পষ্ট কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ব্যক্তিগত উৎপাদনের অধ্যায়ে কুশলী কৃষক নিজের শ্রম ছাড়াও ক্রীত শ্রম নিয়োগ করে ভোগ্য, রাজস্ব ও পণ্যের সংস্থান করেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বণিকবৃত্তির ভূমিকা পল্লীসমাজতন্ত্রের চেয়ে কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাই ভারতবর্ষের বানিজ্যশক্তি একসময় রাষ্ট্রশক্তির চেয়েও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল।

পণ্যের আবির্ভাব সমাজকে যতো প্রকারে ভেঙেগড়ে পরিণত করে তুলতে পারে ভারতবর্ষে তা সমস্তই একের পর এক হয়ে গেছে—এবং প্রাচীন যুগে যা আর অন্য কোনো দেশে হয়নি, তেমন বহু বণিকসঙ্ঘেরও উদ্ভব এদেশে হয়েছে। কৃষক, শিল্পকার, বণিক সবাই নিজেদের প্রয়োজন ও সমৃদ্ধির জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে—তারপর, এই শ্রেণীগত সমৃদ্ধি একটি স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছুবার পরই, সঙ্ঘপ্রচেষ্টা ভেঙে ব্যক্তিপ্রচেষ্টার অধ্যায় সুরু হয়েছে। মানুষের ইতিহাসের চিত্রও হয়ত তা-ই ; ব্যক্তিপ্রচেষ্টায় তার সুরু সঙ্ঘ-প্রচেষ্টায় এসে তার একটি অধ্যায় শেষ, তারপর নূতন অধ্যায়ের সুরু আবারও ব্যক্তিপ্রচেষ্টায়, হয়ত সঙ্ঘপ্রচেষ্টায়ই এ-অধ্যায়েরও শেষ হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অধ্যায় স্বকীয় গতিতে অগ্রসর হ'তে পারে নি। এ-অধ্যায়ে যন্ত্রবিজ্ঞান যে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে—তা ভারতীয় সমাজের নয়, য়ুরোপীয় সমাজের।

সমবেত শ্রম প্রয়োগ করে যারা কাজ করেছে (সম্ভূয় সমুত্থাতারঃ-) তারা তাদের উপার্জ্জন সমভাবে অথবা পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে বণ্টন করে নিত।—(কৌটিল্য- -অর্থশাস্ত্র-তৃতীয়গ্রন্থ-চতুর্দ্দশ অধ্যায়)। এই চুক্তির প্রধান অঙ্গ ছিল সময় নিয়ে।

এ ধরণের সঙ্ঘকে কৌটিল্য 'সমায়ানুবন্ধ' বলে বিশেষিত করেছেন। কারিগর যদি সময়েরই চুক্তি করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তাহলে কৃতী-অকৃতী কারিগর পারিশ্রমিকের তারতম্যে নির্দ্দিষ্ট হয়না, সময়ক্ষেপ দ্বারা তাদের কৃতত্বের বিচার হয়। যৌথশ্রম সঙ্ঘে যখন শ্রমিক (সঙ্ঘভৃত্য) এবং কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক (গ্রামভৃতক) নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল তখনও তাদের উপার্জ্জন (বেতনম্) সময়ের বিচারেই নির্ণিত হত। পণ্য-উৎপাদনে বা মুদ্রার ব্যবহারে অথবা শ্রমিক নিয়োগে শ্রমিকের শ্রম-সময়ে উপর থেকে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি, এমন কি বণিকশ্রেণীও যখন উৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেছে তখনও শ্রমিকের সঙ্গে সে একটি কাজের পূর্ণতায় চুক্তিই করেছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষে যখন ব্যাপক উৎপাদনের পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, তখনও দেখা যায় শ্রমিকের শ্রমসময় নিয়োগকর্ত্তার নিজের কাজে নিয়োগ করবার কোনো প্রশ্নই উপস্থিত হয়নি। কাজেই 'Manufacture'-এর সঙ্গেই যে সর্ব্বত্র শ্রমিকের শ্রমসময় অপহরণের পালা আর মূলধনের লীলা সুরু হয়ে গিয়েছিল, মার্ক্সের এ-প্রতিপাদ্য প্রমাণসহ নয়। মার্ক্স বলছেন: 'কুটিরোৎপাদনের সঙ্গে ব্যাপক উৎপাদনের তুলনা করতে গেলে দেখা যায় যে ব্যাপক উৎপাদন পদ্ধতিতে অল্পসময়ে অধিক উৎপাদন করা যায়। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি তাতে বর্দ্ধিত হয়।'—(ক্যাপিটেল-প্রথমগ্রন্থ-দ্বাদশ অধ্যায়)। অধিক উৎপাদন কথাটা অনস্বীকার্য্য কিন্তু সময়ের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার বিচার ব্যাপক উৎপাদন পদ্ধতি ততদিন কিছুতেই করতে পারে না যতদিন মানুষের শ্রমে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি পরিচালিত হয়ে পণ্যোৎপাদন সম্ভব ছিল। বিভিন্ন হস্তশিল্প একটি মূলধনের গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে অথবা মূলধনের বেষ্টনে একটি শিল্পীর বিভিন্ন কর্ম্ম বিভক্ত হয়ে যে ব্যাপক উৎপাদনের জন্ম দিয়েছে মার্ক্সীয় এই চিত্র মার্ক্সের নিজেরই মনঃপূত হ'য়েছিল কি না সন্দেহ, তাই তিনি বলছেন: "সুরুতে যা-ই হয়ে থাকে, ফল একই—যথা—(ব্যাপক উৎপাদন) একটি উৎপাদন যন্ত্র, মানুষ তার বিভিন্ন অবয়ব।"—(দ্বাদশ অধ্যায়)।

কৌটিল্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রাচীনভারতে রাজশক্তি সম্রাট্‌শক্তিতে উন্নীত হয়ে বাণিজ্যশক্তিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে দেখা যায়। সম্রাটের স্বামীত্ব ও প্রভুত্ব শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয় শিল্পক্ষেত্রে এবং বানিজ্যক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। অবশ্য সম্রাট্‌শক্তির পতনের পর এ-ব্যবস্থা আর টিক্‌তে পারেনি—বহুদিন পর মাত্র মোগলসম্রাট আকবরের আমলে আবার এ 'সাম্রাজ্যবাদ' ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিল।

মুদ্রাসম্পর্কেও কৌটিল্য নীরব ছিলেন না। তখন রূপ্যরূপ (রৌপ্যনির্ম্মিত), তাম্ররূপ (তাম্রনির্ম্মিত) মুদ্রা তৈরী হত। বিনিময় যন্ত্র অথবা 'ব্যাবহারিকী' এবং আইনানুগত অথবা 'কোষপ্রবেশ্য' এই উভয় ভূমিকা অভিনয় করবারই অধিকার তার ছিল। 'রাজকীয়

'অক্ষশালা'য় জনসাধারণ স্বর্ণখণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী করিয়ে বা পরিবর্ত্তন করে নিতে পারত।—(কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র-দ্বিতীয়গ্রন্থ-দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়)। বলাবাহুল্য যে ব্যাবহারিকী গুণ ছিল বলেই মুদ্রা কোষপ্রবেশ্য হতে পেরেছে। রাজমহিমা তার শ্রমের কথা ভুলে গেলেও একদা জনসাধারণের কৃষি ও শিল্প নির্ম্মাণের শ্রমের সঙ্গে তার রক্ষণাবেক্ষণের শ্রম বিনিময় করেই রাজকোষ নামক একটি বিত্তভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছিল। মুদ্রাতে পণ্যই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আছে। স্বর্ণকে মুদ্রার উপাদান ধরে নিলে এই মূর্ত্তি বিশ্লেষণ খানিকটা সুসাধ্য হয়ে আসে। স্বর্ণের গুণাবলী বর্ণনা করতে গেলে দেখতে পাই তা একটি ব্যবহার্য্য সামগ্রী অথচ দুষ্প্রাপ্য—শস্য সম্পদের মতো প্রকৃতি আমাদের হাতে অঢেল স্বর্ণসম্পদ তুলে দিতে অক্ষম। ব্যবহার্য্য হয়েছে তা চির-উজ্জ্বল বর্ণসম্ভারে ও ঘনত্বের দরুণ। ক্ষুদ্র আয়তনে তার ওজন বেশি, তার মানে অল্প ওজনের একটি স্বর্ণখণ্ডকে শ্রমপ্রয়োগে দীর্ঘ ও প্রশস্ত করে তোলা যায়। স্বর্ণের ব্যবহারের সঙ্গে এসব গুণাবলীর জ্ঞান মানুষের মনে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পণ্যমূল্য আছে বলেই স্বর্ণের মুদ্রাত্বপ্রাপ্তি স্বাভাবিক। একজন কৃষক বা কারিগর তার পণ্যের বিনিময়ে একটি দুষ্প্রাপ্য অথচ ব্যবহার্য্য সামগ্রী লাভ করেছে, তাছাড়া তা গুরুভারও নয়, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থায় এ ব্যবস্থা দেবতার আশীর্ব্বাদের মতোই হয়ত মনে হয়েছিল।

স্বর্ণমুদ্রা তার পরিমাণগত স্বর্ণমূল্যের দরুণই মূল্যবান। কিন্তু স্বর্ণের মূল্যে শ্রমের দান যতোটা নয়, প্রকৃতির দান তার চেয়ে বেশি। বর্ণের গুণাবলী অথচ দুষ্প্রাপ্যতাই তাকে মূল্যবান করবার সুযোগ দিয়েছে। মানুষের বিভিন্ন শক্তি ও শক্তিলব্ধ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্যকে সমীকরণ করে একটি বস্তুর মূল্যে যদি প্রকাশ করতে হয়, তাহলে সে বস্তু মানুষের তৈরী কোনো বস্তু হতে পারেনা—এমন বস্তুই তার হওয়া উচিত, যার গুণ বহুলাংশে প্রকৃতিদত্ত। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আকৃতি মানুষ দিয়েছে, বিভিন্ন শক্তির প্রতিমা তৈরী করেছে কিন্তু সেই বিভিন্ন শক্তিকে যখন একটি শক্তিতে পরিণত করবার যুক্তি মানুষের মনকে অধিকার করল, যখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল, তখন আর ঈশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণের যুক্তি থাকল না। বিভিন্ন পণ্য মানুষের বিভিন্ন শক্তির প্রতিমা—বিভিন্ন দেবতার মতো, আর সেখানে স্বর্ণমুদ্রা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের প্রথম আবির্ভাবকে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু কালক্রমে তিনি নেপথ্যে গিয়ে রৌপ্য, তাম্র এবং মিশ্রধাতুর প্রতিভূদের দ্বারাই রাজ্যশাসন করেছেন। প্রাচীন চীনে এবং পাঠনি আমলে কাগজও এই প্রতিভূর পদে বৃত হয়েছিল। এই প্রতিভূদের কাজ সমাজে নিরর্থক হয়নি—'অর্থের আমল' এরাই স্থাপন করে, বিত্তবান্ মানুষ অর্থবান হতে সুরু করে—অর্থগৃধ্র বা অর্থপিশাচ হয়েও শেষে আর তাদের আটকায়না।

পণ্যের এই রূপান্তর—অর্থের সত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা, অর্থের দেহে পণ্যগুণ সংযোজিত করে দেয়। অর্থ তাই অবলীলায় পণ্য হয়ে ওঠে। ষোড়ষ-সপ্তদশ শতকে কাথিয়াবারের অর্থবণিক বা বানিয়াসম্প্রদায় যে হুণ্ডি কাটতেন তা তখনকার সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র স্বীকার করে নিত।—(পানিক্করের ইতিহাস—সপ্তদশ অধ্যায়)। হুণ্ডিতে অর্থপণ্যের যে জটিলতা বিদ্যমান মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় অর্থপণ্য ততটুকু পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিল।

শ্রমের ইতিহাসে শ্রমযন্ত্রে যে-বিপ্লব সংসাধিত হয় তার কাহিনী ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে না। পণ্যবস্তুতে যে দেশ ঢাকার মস্‌লিন, করমণ্ডলের কেলিকো-তে পৌঁছুতে পেরেছে, যেখানে ব্যাঙ্কিং-এর অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে—সেদেশ শ্রমযন্ত্রে উন্নতি দেখাতে পারেনি কেন? সভ্যতার যাত্রায় পশ্চাৎবর্ত্তী য়ুরোপেই বা কেন শ্রমযন্ত্রে এই বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা যায়? প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধান বা বিজ্ঞান সাধনার পেছনে কি য়ুরোপের কোনো প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ প্রেরণা ভারতবর্ষ অনুভব করেনি, সেই প্রয়োজনই অনুভব করেনি। য়ুরোপের মতো অন্নবস্ত্রের অভাব ভারতবর্ষের ছিলনা—ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান য়ুরোপের মতো নয়, প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদও তাই এ দুজায়গার এক নয়। ভারতবর্ষের মাটি যে-শ্রমে ভারতীয়দের অন্নবস্ত্র সংস্থান করবে, সে-শ্রমে য়ুরোপের মাটি য়ুরোপবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাবে না। তাছাড়া প্রাচীন য়ুরোপের জনসংখ্যাও প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যার চেয়ে কম হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সেখানে শ্রমকে বর্দ্ধিত করবার উপায় অনুসন্ধান করতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বস্তুকে রূপান্তরিত করবার যন্ত্র অথবা মানুষের বা পশুর শক্তিচালিত সরল যন্ত্র নিয়ে য়ুরোপ তাই নির্ভাবনায় বসে থাকতে পারেনি। প্রকৃতিকে পেতে চেষ্টা করেছে শ্রমশক্তিবর্দ্ধক একটি উপকরণ হিসেবে। বায়ুস্রোত বা জলপ্রবাহ চালিত চাকার বলবিদ্যা তাই য়ুরোপেই উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হয়েছে।* প্রাকৃতিক শক্তির সাধনাই য়ুরোপকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের পরিণত জ্ঞানে এবং এই পরিণত জ্ঞানকে সুচারুরূপে শ্রমযন্ত্রে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সামগ্রীতে বা মুদ্রায় মানুষ যতো শক্তি আর শক্তির প্রতীকই প্রতিষ্ঠা করুক, তাতে প্রকৃতির গুণের অস্বীকৃতি নেই—তবে শ্রমযন্ত্রে প্রকৃতির গুণ বৃহত্তর সত্তায় উপস্থিত। প্রকৃতির বলগুণ, রাসায়নিক গুণ এবং পদার্থগত গুণ মানুষেরই শক্তিতে শ্রমযন্ত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। সামগ্রী যেমন অর্থে রূপান্তরিত, সরল শ্রমযন্ত্রও আজ বিরাট কারখানার জটিল যন্ত্রে পরিণতি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু মার্ক্স শ্রমযন্ত্রের এই ব্যাখ্যা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তিনি শ্রমযন্ত্রকে মূর্ত্তিমান শ্রম আখ্যা দিতে

* হস্তশিল্পের যুগেই য়ুরোপে নাবিকের দিক্‌দর্শনযন্ত্র এবং ঘড়ি তৈরী হয়েছিল।—(ক্যাপিটেল-প্রথমগ্রন্থ দ্বাদশঅধ্যায়)।

চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ আবিষ্কার করলেই কি তা মানুষের শক্তি বলে আখ্যাত হবে? অ্যাটম বমের বিদারণ ক্ষমতা অ্যাটম বম আবিষ্কর্ত্তার নেই—অ্যাটমের শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মাত্র তিনি ওয়াকিবহাল। এশক্তি আবিষ্কর্ত্তার কায়িক নয় কিন্তু আবিষ্কৃত শক্তি অ্যাটমের কায়িক। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, প্রাকৃতিক বস্তুর শক্তি তার দেহ সংলগ্ন হয়েই থাকে। যন্ত্রবিজ্ঞান মানুষের শক্তির নামাঙ্কিত হতে পারে কিন্তু তা বলে যন্ত্রের শক্তি আর মানুষের শ্রম সমার্থক নয়।

সামগ্রীর পরিণত রূপ অর্থ আর সরল যন্ত্রের পরিণত রূপ শিল্পযন্ত্র। এ দুটি বাহন নিয়েই আজ মূলধন পরিণত বয়সে এসে দাঁড়িয়েছে। মূলধন আজ তার চারপাশে সমাজকে আকর্ষণ করছে। মূলধনের বর্ণনায় মার্ক্স বলছেন: "যে শ্রম প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক এবং ব্যাপকভাবে সম্প্রদায়গত তার পরিচালনা ও শৃঙ্খলা থাকা দরকার—বিচিত্র কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান এবং উৎপাদন যন্ত্রের স্বতন্ত্রঅবয়বসঞ্চালনের পরিবর্ত্তে একীভূত উৎপাদন যন্ত্রের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ সেই পরিচালনা ও শৃঙ্খলার অধীন। একজন বেহালাবাদক তার নিজের কাজ সুচারু-ভাবেই করতে পারে কিন্তু ঐক্যতানে পরিচালক দরকার। মূলধনের অধীনে শ্রম সমবায়ী হওয়া মাত্র মূলধন পরিচালনা, পর্য্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।"—(ক্যাপিটেল-প্রথমগ্রন্থ-একাদশ অধ্যায়)। মূলধনের এই পূর্ব্বতন চেহারার সঙ্গে আজ তার পরিণত বয়সের চেহারার অমিল হয়নি তবে পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণের শক্তি থেকেও মূলধনী ইদানীং নিজেকে মুক্ত করে নিতে চান। আজকের দিনের সমাজে সত্যিকারের দুর্লক্ষণ তা-ই। মানুষের জীবনে মানবিক শক্তির দান না থাকা যে মানুষের সভ্যতার ইঙ্গিত নয়, একথাটাই আজ আবার পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

"যুক্ত কাজ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায়না। আপনা থেকেই তা গড়ে উঠবে। বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে আমি কাউকে দোষ দেই না, দোষ দিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা যতদূর চালিয়ে নিতে পারে আমাদের পরিকল্পনা ততদূরই অগ্রসর হয়েছে।"

—গান্ধীজি

কবিতা

মন

অনিল চক্রবর্ত্তী

ক্লান্ত মন তন্দ্রালীন : অবিচ্ছিন্ন রাতের মতন
হৃদয়-আকাশ ছেয়ে অন্ধকার ছড়ায় কেবল,
অপ্রমত্ত দু' একটি জ্যোতিহীন তারার কম্পন
অস্ফুট স্বপ্নের মত যেন কোন আশায় চঞ্চল।
এ-মন এ-রাত আর স্বপ্ন-আশা সকলি বিফল
হৃদয়ের চেতনারে ঢেকে দিয়ে মৃদু আবরণ
টেনে দেয়, ছেয়ে দেয়— নিমীলিত জীবন-মনন :
এইমত কত কথা তোমরাতো কহ অবিরল।

তোমাদের মন—সে তো প্রভাতের উদার আকাশ,
যে-আকাশ পৃথিবীর প্রণিপাত করেছে গ্রহণ ;
তোমাদের মন—সে তো সমুদ্রের প্রাণের মতন,
যে-প্রাণ উচ্ছল এক জীবনেরে করেছে প্রকাশ !
নিরন্তর এ-পৃথিবী যে-মনের চেয়েছে আভাস
রাত্রির তপস্যামগ্ন সেতো এই তোমাদেরি মন ॥

ঢল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হে আকাশ, হে পৃথিবী—এখন অনেক রাত ; আর
এখানে নামেনি ঘুম, জড়ানো সুরের মতো ঘুম
পারেনি নামতে। শুধু কোনো ক্ষীণ কঠিন নেশায়
হৃদয়ে নেমেছে ঢল ; বিপুল ব্যথায় সরে যায়
ছিঁড়ে যায় রাত। আর অগাধ মনের হাহাকার
তখন মুখর হয় ; তখন জীর্ণ মরা বাঁধ
ভেসে গেছে। গান আর প্রাণের অমর মৌসুম
এসেছে ঝরিয়ে দিতে সকল নিথর অবসাদ।

এখন অনেক রাত। নেই, তবু চোখে নেই ঘুম—
দেখি ঠায় জেগে আছে শিথিল বিমূঢ় সেই চাঁদ।

নির্ব্বাণ

আরতি রায়

সঙ্ঘমিত্রা বহুদূর সিংহলে
যে বাণী বহিয়া ফিরেছে নিরন্তর ;
সে আজ বিস্মৃতির,
গহন অতলে নিলীম সমুদ্রের ;
অনুশাসনজ শিলালিপি গেছে ভেঙে
প্রস্তরীভূত বুদ্ধও নির্ব্বাক !

প্রাণবহ্নি

ললিত মুখোপাধ্যায়

ধূ ধূ ধূ উষর বালুকা-বেলায়
বহু-বেসাতির পরে—
এইখানে শেষ বণিক পৃথিবী
দুর্দ্দম কোন ঝড়ে !
এখনো কোথাও হাজার মানিক
সাগরের বুকে জ্বলে—
কোথাও সৌম্য মহীরুহদল
বেদের মন্ত্রবলে।
মহাজাগরণ দেশে—
অনেক সুপ্তি অনেক বনানী শেষে
জন-উদধির পুর :
দীপ্ত উষার শাখায় ছড়ানো
কলকাকলীর সুর।

সেখানে হয়ত এমন স্বপ্ন
সত্যের মাঝে আছে—
দিবসরাত্রি বাঁধা এক সুরে
সেই পৃথিবীর কাছে !

দীনবন্ধু ও গিরীশচন্দ্র

করালীকান্ত বিশ্বাস

আধুনিক নাটকের উৎপত্তিকালে নাট্যকারেরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিষয় নির্ব্বাচন প্রধানতম ছিল। মধুসূদন সংস্কৃত রীতির গতানুগতিক অনুসরণ নিন্দা করিয়াও সংস্কৃত নাটকের আদর্শ একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এমন কি 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সম্বন্ধে তাঁহার মনে দ্বিধা ছিল। রামনারায়ণ সামাজিক প্রহসন রচনা করিলেও রীতির দিক হইতে সংস্কৃতপন্থী ছিলেন। এবং সংস্কৃত নাটকের একাধিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। দেশে নাট্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জাতীয় ভাষায় জাতীয় জীবন হইতে উপাদান সংগ্রহ করা। প্রথম যুগের নাট্যকারেরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম পনের কুড়ি বৎসর সংস্কৃত নাটকের অনুবাদই বেশী অভিনীত হইয়াছে। বাংলা দেশের কালীয়দমন, ভাসান প্রভৃতি যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা এই উক্তির যাথার্থ্য অপ্রমাণিত করে না। কারণ ঐ সব যাত্রাগানের বিষয় সমাজ-জীবন হইতে গৃহীত না হইলেও উহাতে প্রকাশিত ভাবানুভূতি একান্তভাবে বাঙ্গালীর। আধুনিক নাটক তাহা বর্জ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, অথচ নূতন নাটকে জাতীয় জীবনের সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এইখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া কলিকাতা ও তাহার চারিপাশে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একান্তভাবে নূতন মধ্যবিত্তের।

তখনকার দিনের নাটকে এই নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত জীবনের রূপ প্রকাশ পাইবে ইহাই আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় নাই,—অথচ প্রথম পনের কুড়ি বৎসর তাহার অভাব ছিল। প্রথম যুগের আধুনিক নাটক যদি ইয়োরোপীয় নাটকের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া দেশজ যাত্রাগানকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে আধুনিক নাটকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা সঙ্গত হইত না। আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া আদর্শের কাছাকাছিও পৌঁছিতে পারে নাই বলিয়াই এই অভিযোগ। প্রথম যুগের বাংলা নাটক গ্রীক প্রভাবান্বিত গান্ধার ভাস্কর্য্যের সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। ভারতীয় ভাস্কর পূর্ব্ব হইতেই প্রচুর কুশলতা অর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়াই গান্ধার ভাস্কার্য্যের নিদর্শন নগন্য নহে, কিন্তু ভারতীয়

ক্লাসিকাল ভাস্কর্য্যের সহিত তুলনা করিলে তাহার দৈন্য ধরা পড়ে। আধুনিক অনেক নাটকও সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে, কোন কোনটিতে উল্লেখযোগ্য গুণাবলীও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু ইয়োরোপীয় আদর্শের সহিত তুলনা করিলে উল্লসিত হইবার আর কারণ থাকে না।

বাংলা নাটকের এই অবস্থা দূর করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন মধুসূদন। কিন্তু তখনকার দিনের যাঁহারা নাটকের প্রযোজক ছিলেন তাঁহাদের কল্যাণেই মধুসূদনের সহিত বাংলা নাটকের যোগ নষ্ট হয়। বাংলা নাটকের পক্ষে ইহা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইয়াছে। মধুসূদন যখন নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন বাংলা সাহিত্যের কোন কর্ম্মই তখন পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে কেহ কেহ লিরিক রচনা করিতেন বটে, কিন্তু আজ তাহার কোন নিদর্শনই টিঁকিয়া নাই, ইহাতে ঐসব রচনার মূল্য বুঝিতে পারা যায়। গল্প ও উপন্যাস তখনও জন্মলাভ করে নাই বলিলে ভুল হয় না। নাটকই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন। নাটক ব্যতীত দাঁড়াকবি, হাফ আখড়াই প্রভৃতিতে গান রচনাও অন্যতম সাহিত্যিক কর্ম্ম হিসাবে পরিগণিত ছিল। এই অবস্থায় বাংলা নাটক সৃষ্টি করিতে যে প্রতিভার প্রয়োজন ছিল তাহা তথাকথিত প্রথম নাট্যকারদিগের ছিল না। মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু সে প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে নাট্যরচনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

বাংলা নাটকে "নীলদর্পনের" আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। "নীলদর্পন" লইয়া তখনকার দিনে যে আলোড়ন হইয়াছিল একমাত্র সেই কারণেও এই নাটকখানি অবিস্মরণীয়। কিন্তু 'নীলদর্পনের' ইহাই একমাত্র গৌরবের কারণ নহে। প্রথম জীবন হইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় অবলম্বনে বাংলা ভাষায় রচিত ইহাই প্রথম নাটক। রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' সমাজের একটি ব্যাধির প্রতি আক্রমণ হিসাবে রচিত। কিন্তু নাটকটির উৎপত্তির ইতিহাস স্মরণ রাখিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে তাহা লেখক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লেখেন নাই, জনৈক জমিদারের পুরস্কার ঘোষণাই লেখককে প্রেরণা জোগাইয়াছে। রামনারায়ণের আরও একটি নাটক রচনার ইতিহাস অনুরূপ। লেখক নিজের অন্তর হইতে যে বিষয় রচনা করিবার প্রেরণা লাভ করেন নাই, তাহাতে জীবনের স্পন্দন কিরূপে আসিবে! রামনারায়ণের রচনা তাই অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের অভাব কিঞ্চিৎ দূর করিয়াছে মাত্র। রামনারায়ণের মৌলিক নাট্যকারের প্রতিভা অপেক্ষা improvisor-এর গুণাবলী বেশী ছিল। 'রত্নাবলী'কেও improvised version বলা যাইতে পারে।

দীনবন্ধু নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন বাংলা দেশকে ভালভাবে জানিতে পারিয়া। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার শোনা কথা নহে, অত্যাচারিতের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে মিশিয়াছিলেন, তাহাদের অভিযোগ তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ডাক

বিভাগের কাজে তাঁহাকে নানা জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে, বহুলোকের সঙ্গে তিনি মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সাহিত্য রচনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সাহিত্যে বাংলাদেশের সাধারণ নরনারীর জীবন্ত পরিচয় দীনবন্ধুর রচনাতেই প্রথম পাওয়া যায়। বাংলা নাটকের বিকাশে এমন অভিজ্ঞ রচয়িতারই আবির্ভাব তখনকার দিনে প্রয়োজন ছিল।

দীনবন্ধুর প্রথম নাট্যরচনা নীলদর্পন। বিশ্লেষণ করিলে নাটকটিতে বহু ত্রুটি ধরা পড়িবে। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে গঠনের শিথিলতা। দেশী অথবা বিদেশী নাট্যাদর্শের গঠনে এই শৈথিল্য মার্জ্জনা করা হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নীলদর্পণের গৌরব ম্লান হইবার নহে। তখনকার দিনে অভূতপূর্ব্ব ত নিশ্চয়ই, আজিও নীলদর্পন আমাদের কাছে আদরণীয় এই কারণে যে পৃথিবীতে যে কয়খানি বই সমাজের মঙ্গল সাধনে সহায়ক হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত, নীলদর্পন তাহাদের অন্যতম। দীনবন্ধু নীলদর্পনের অত্যাচারকাহিনীও বিবৃতি করেন নাই, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতদের দাঁড়াইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বৈদেশিক শাসনের প্রভাবে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যাচার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে নিষ্ক্রিয়তা সাধারণত দেখা যায়, দীনবন্ধু তাহার প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন। সামান্য হইলেও নীলদর্পনেই প্রথম সাধারণের প্রতিরোধের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা দেখাইতে গিয়া দীনবন্ধু মাত্রা ছাড়াইয়া যান নাই। সাধারণ লোককে তিনি চিনিতেন, তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহার অজ্ঞাত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহত শক্তিতে সমগ্র দেশ দণ্ডায়মান হইয়াছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে। এই বিদ্রোহের অসাফল্য সাধারণের মনে বিদেশী সম্বন্ধে ভীতি আরও জাগাইয়া তুলিয়াছিল, অত্যাচারের মাত্রাও কমে নাই। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকে একত্রিত হইয়া তখনকার দিনে লড়াই করিবে ইহা কল্পনাতীত। কিন্তু নবীন মাধবের মত ন্যায়পরায়ণ লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশী না থাকিলেও, তাহারাই গ্রামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, অত্যাচার অবিচারের মুখে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যথাশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। পাশে দাঁড়াইতে তোরাপের মত সরল নির্ভিক গ্রামবাসীর অভাব হয় নাই। প্রবল পক্ষ অধিকতর সংহত, নানা বলে সে বলীয়ান, কাজেই এ বিদ্রোহ নিষ্ফল হইলেও ব্যর্থ নহে। পরবর্ত্তী যুগে এইরূপ ছোট-খাট ঘটনাই বহুলোকের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে। নীলদর্পন নাটক হিসাবে সার্থক কিনা বিচার করিতে গেলে উপরোক্ত উক্তিগুলিও বিবেচ্য। ট্রাজেডি সৃষ্টি করিতে গিয়া শেষের দিকে পাইকারী মৃত্যু আধুনিক সমালোচকের কাছে হাস্যকর, ঘটনা বিন্যাসে পারিপাট্য এমন কি নৈপুণ্যের অভাবও দেখা যায় তথাপি নীলদর্পন বাংলা

সাহিত্যের একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক—যুগপ্রবর্ত্তক হিসাবে ত বটেই, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেরও উহাতে অভাব নাই।

বাংলা নাটকের সূত্রপাত ব্যঙ্গাত্মক নাটকে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে কমেডি অফ ম্যানার্স। রামনারায়ণের একাধিক নাটককে কমেডি অফ ম্যানার্স' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরণের নাটকে চরিত্রগুলি এক একটি টাইপ, সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ। চরিত্রগুলির এই বিশেষ শ্রেণীগত রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই এই শ্রেণীর সার্থকতা। রামনারায়ণের নাটকে এই চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হয় নাই। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুইখানিতে কয়েকটি সার্থক টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রহসন রচনা সম্বন্ধে মধুসূদনের নিজেরই আপত্তি ছিল, শুধু প্রহসন নহে নাটক রচনাই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মধুসূদনের রচনা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিলে হয়ত ভুল হইবে। সে যুগের নাট্যরীতিই ছিল ব্যঙ্গাত্মক রচনার পক্ষপাতি। তদুপরি দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য এবং রুচির দিক হইতে ব্যঙ্গরচনা তাঁহার নিকটে অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলেকামিনী প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন, যাহাতে হাস্যরস সৃষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এই সব নাটকগুলিতে যেখানে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে এই অনাবিল হাস্যরসের অবতারণায় তিনি আজও অপরাজিত।

দীনবন্ধু নাটকগুলিতে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর যে চরিত্রগুলি ব্যঙ্গ অথবা হাস্যসৃষ্টির জন্য রচিত নহে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসার্থক। ভাষার কৃত্রিমতা এই চরিত্রগুলিকে একেবারে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকে যাহা ত্রুটি তাহা এইখানে। ঘটনা বিন্যাসের ত্রুটি অবশ্য আছে কিন্তু অন্যত্র যে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন তাহা বজায় থাকিলে এই ত্রুটি ঢাকা পড়িয়া যাইত। অনেক সময়ে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে দীনবন্ধু-নাট্যাবলীর প্রহসনাংশে যে বিচিত্র জীবন্ত নরনারীর সাক্ষাৎ পাই অন্যত্র তাহার একান্ত অভাব কেন। দীনবন্ধুর প্রতিভা ছিল একান্তভাবে হাস্যরসিকের, যেখানে হাস্যরস অবতারণার সুযোগ নাই দীনবন্ধুর বক্তব্যও সেখানে কম। এই দিক হইতে দীনবন্ধুর সহিত প্রায় সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাসকার ডিকেন্স তুলনীয়, ডিকেন্সের চরিত্রাঙ্কণরীতি দীনবন্ধুরই অনুরূপ। ডিকেন্স সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি কোনও 'জেন্ট্‌ল্‌ম্যানে'র চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। দীনবন্ধু সম্বন্ধেও এই অভিযোগ সত্য। কিন্তু ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতে দীনবন্ধু আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিমচাঁদ, তোরাপ, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ প্রভৃতির স্রষ্টার অন্য ত্রুটির উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধুর গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে দীনবন্ধুর কতখানি দান তাহাই এখানে বিবেচ্য। পূর্ব্বেকার নাট্যকার হইতে দীনবন্ধুর স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে হইলে তাঁহার রচনার যতটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন উপরোক্ত মন্তব্যগুলি তাহার পক্ষে যথেষ্ট। বিষয়ের অবতারণায়, হাস্যরস সৃষ্টিতে, বিশেষ করিয়া 'কমেডি অফ ম্যানার্সে'র' প্রকৃত স্রষ্টা হিসাবে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী জীবন অবলম্বন করিয়া পরপর কয়েকখানি বাংলা নাটক রচনা করিয়াছেন, এই হিসাবে তিনিই প্রকৃত বাংলা নাটকের স্রষ্টা। দীনবন্ধুর নাট্যাবলী সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করিবে।

দীনবন্ধু ও গিরীশচন্দ্রের মাঝখানে সামান্য কিছুদিনের ব্যবধান। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে বাংলা নাট্যরীতিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল। বাংলা নাটক যদিও আদর্শ হিসাবে ইয়োরোপীয় নাটককে গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি গঠণের দিক হইতে আজও বাংলা নাটক ইয়োরোপীয় আদর্শের কাছেও পৌঁছাইতে পারে নাই। কেন পারে নাই তাহা লইয়া বহু আলোচনার অবকাশ আছে। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চ ছিল না বটে, কিন্তু নাটক ছিল। ইংরাজী সাহিত্যের মারফতে ইয়োরোপীয় নাটকের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। নাটকের কথা বলিতে গেলেই আমাদের ইয়োরোপীয় আদর্শের কথা স্বতই মনে হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক কারণেই বাংলা দেশের নিজস্ব নাটকীয় অনুষ্ঠানকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করি না, নাটকের আলোচনায় তাহা বর্জ্জন করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নাট্যকারেরা কেহ কেহ সংস্কৃত এবং অপর সকলে ইয়োরোপীয় নাটক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশজ নাট্যরীতি একেবারেই পরিবর্জ্জন করিবার সম্যক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও দেশজ কলা সকলের অলক্ষ্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ধীরে ধীরে বাংলা নাটককে দেশজ ধারায় টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। কবিগান, হাফ আখড়াই, পাঁচালী যাত্রা সব কিছুর চিহ্ন উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিগান, হাফ আখড়াই প্রভৃতি কলিকাতা হইতে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রভাব গিয়া পড়িয়াছে নাটকে ও বিশেষ করিয়া সখের যাত্রায়। সখের যাত্রা ও তখনকার দিনের নাটকের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার ছাড়া আর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। মনোমোহন বসুর নাম এই দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিগান হাফ আখড়াই পাঁচালী প্রভৃতিতে ছড়া বাঁধিতেন আবার অনেকগুলি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকে প্রচুর গান থাকিত। গানের এই প্রাচুর্য্যই সখের যাত্রার জনপ্রীতির কারণ।

মনোমোহনের নাটকগুলির জনপ্রিয়তা দেখিয়া গীতিনাট্য রচনার একটি হিড়িক দেখা দেয়। গিরীশচন্দ্রেরও হাতেখড়ি এই জনপ্রিয় নাট্যরচনায়।

আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কেহ গিরীশচন্দ্রের রচনা সংখ্যায় ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহিত যুক্ত হইবার পর হইতে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সহিত তাঁহার যোগ অবিচ্ছিন্ন এবং দীর্ঘদিনের। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া গিরীশচন্দ্র বাংলা নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি নাটক বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সখের থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। আজও তাঁহার অনেক রচনা অভিনীত হইয়া থাকে। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদিগের অনুসৃত রীতি কিছুটা গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নাটক রচনা এবং অভিনয়দ্বারা তিনি সাধারণ বাঙালী দর্শকের রুচিও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলেই বাংলা নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের পরিচালক এবং মালিকেরা ব্যবসার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ দর্শকের রুচির স্থূল দিকটাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। গিরীশচন্দ্র ধর্ম্ম সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ মতামত পোষণ করিতেন। রামকৃষ্ণের উপদেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। কাজেই তাঁহার রচনায় তথাকথিত জনপ্রিয় উপাদানের বাহুল্য থাকিলেও একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত সামাজিক আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা তা রচনাতে সর্ব্বদাই স্থান পাইয়াছে। দীর্ঘকাল নাট্যরচনার ফলে গিরীশচন্দ্র বহু অনুকারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, গিরীশচন্দ্রের আদর্শপ্রীতি তাঁহাদের রচনাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় গিরীশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি এবং স্থূলতা। কারণ রঙ্গমঞ্চের মালিক এবং পরিচালকেরা লেখকের নিকটে দাবী করিয়াছেন। প্রতিভা কাহারও নির্দ্দেশ মানে না, কিন্তু মঞ্চাধ্যক্ষের এই নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার মত প্রতিভা আজও দেখা দেয় নাই।

গিরীশচন্দ্রের অবির্ভাব এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটকের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগ বলা যাইতে পারে। প্রথম যুগের শেষ দীনবন্ধু। দ্বিতীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোকের সহিত নাট্যালয়ের যোগ স্থাপন। রাজা মহারাজাদের উৎসাহ ও নাট্যপ্রীতির ফলে কোন কিছুতেই জাতীয় নাটক বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। কারণ সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এই অসুবিধা দূর করিল বটে, কিন্তু প্রথম দিকে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা "মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাসা" প্রভৃতির আয়োজনদ্বারা তামাসা দেখাইয়া দর্শক আকৃষ্ট করিবার যে চেষ্টা করিতেন তাহার প্রভাবে নাটক সম্বন্ধে সাধারণ দর্শকের রুচি প্রথমাবধিই বিকৃত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। গিরীশচন্দ্রও এই রুচি উন্নত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

গিরীশচন্দ্র দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতাই তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট করে। অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী উপন্যাস দুইখানির নাট্যরূপ দান করেন। কিন্তু দর্শকদের সাময়িক তাগিদে তিনি গীতিনাট্যই রচনা করেন প্রথম। কিন্তু এ যুগে গিরীশচন্দ্রের স্বকীয়তা ততটা দেখা দেয় নাই। পৌরাণিক নাটক রচনাতেই গিরীশচন্দ্রের সবগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। যে ছন্দের সহিত আমরা গিরীশচন্দ্রকে যুক্ত করিয়া থাকি তাহা গিরীশচন্দ্রের আবিষ্কার নহে,—ব্রজমোহন রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বে তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরীশচন্দ্রের হাতে এই ছন্দ আরও নমনীয় হইয়া উঠে এবং ব্যাপক প্রয়োগে তাহা "গৈরিশ ছন্দ" আখ্যা লাভ করে।

পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের একটি সমস্যা ছিল ভাষা। বাংলা গদ্য নাটকের প্রথম যুগে ততটা বিকাশ লাভ করে নাই। তাই প্রথমদিকের নাট্যকারদের ভাষা অনেক সময়েই গুরুগম্ভীর। এমন কি দীনবন্ধুর নাটকের ভাষাও বহু অংশে অত্যন্ত কৃত্রিম। গিরীশচন্দ্র এই ছন্দ ব্যবহার করিয়া অভিনয়ের ভাষাতে সারল্য আনিতে পারিয়াছিলেন। অথচ স্থান বিশেষের প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য্য ব্যাহত হয় নাই। বাংলা নাটকে গিরীশচন্দ্রের ইহাই অন্যতম বিশেষ দান।

পৌরাণিক বিষয় লইয়া বহু নাটক রচিত হইতে পারে। সর্ব্ব দেশেই হইয়াছে। গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বেও পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা আদর্শের দিক হইতে সংস্কৃত নাটক অনুসরণ করিয়াছিলেন। গিরীশচন্দ্র তাহা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি অসামান্য স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বত্র সুফল হয় নাই বটে কিন্তু নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতির জন্য এই স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। পুরাণের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পৌরাণিক চরিত্রগুলি সকলে একভাবে দেখে না। কাজেই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করিতে গিয়া লেখকের চরিত্রপরিকল্পনায় স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ আছে। গিরীশচন্দ্র এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ফল সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় নহে, এমন কি অনেক চরিত্রের পরিকল্পনা মূল হইতে শুধু স্বতন্ত্র নহে, পাঠকের মনে হয় যে এইরূপ অক্ষম স্বাধীনতার প্রয়োগ অপেক্ষা কঠোরভাবে মূলানুগ হওয়া অনেক ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাবণ বধের রাবণ চরিত্রের উল্লেখ করা যায়। রাবণ বধ কাহিনী একটি উপাদেয় ট্রাজেডির উপাদান হইতে পারে। কিন্তু গিরীশচন্দ্র রাবণ চরিত্র কল্পনা করিয়াছেন শাপভ্রষ্ট পরমভক্ত জাতিস্মর হিসাবে। তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের কথা স্মরণ আছে, আবার ফিরিয়া কৃষ্ণচরণে পৌঁছিতে হইবে। তাই অন্তর্বর্ত্তী সময়টি সে হা হুতাশ করিয়া এবং রাম হস্তে নিহত হইবার

কাটাইতেছে। ভক্তিবাদ বাংলা নাটকে গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বে মনোমোহন বসু আমদানী করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে ভক্তিবাদের প্রাবল্য চিরদিন। ভক্তির বানে ভাসিয়া যাওয়া বাঙ্গালীর স্বভাব---শুধু ধর্ম্মে নহে, আধুনিক রাজনীতিতেও। এই ভক্তি বুদ্ধিনিরপেক্ষ ত বটেই, কিন্তু ঠিক ততখানি বিশ্বাসসঞ্জাত নহে—যে বিশ্বাস থাকিলে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে আকুল আগ্রহ জন্মে। বাঙ্গালী ভক্তি সাধারণত ভাবালু উচ্ছ্বাসসঞ্জাত। মনোমোহন বসু সাধারণ দর্শকের এই উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভক্তিপ্রীতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচনা করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র মনোমোহন এবং দীনবন্ধুর কাছেই ঋণী।

ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনা' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নাটক দুইখানি গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। গিরীশচন্দ্রের যাহা কিছু গুণ এবং ত্রুটি সবই ইহার মধ্যে আছে। তবে ঘটনা-সমাবেশ সংহত এবং চরিত্রসৃষ্টিও অনেকাংশে সার্থক।

গিরীশচন্দ্র আর এক শ্রেণীর নাটক অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন। কোন কোনও সমালোচক এই শ্রেণীকে "অবতার মহাপুরুষ" আখ্যা দিয়াছেন। ঈষৎ বিদ্রূপ মিশ্রিত হইলেও এই শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত। কেন্দ্রস্থিত এক ব্যক্তি অথবা প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ নাটকের ঘটনার পরিণতি আনিয়া দিতে সাহায্য করিতেছে—নাটকগুলির ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলিয়া এই মহাপুরুষ এবং অবতার চরিত্রগুলি গ্রীক নাটক deus ex machinaর সহিত তুলনীয় নহে। গিরীশচন্দ্র রামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। নাটক রচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে। এখানেও বাংলা দেশের ভক্তিপ্রবণতা। মহাপুরুষের চরিত্রে দার্ঢ্য বা অপর বৈশিষ্ট্য ততটা দেখা যায় না, কেবল মাত্র তাঁহাদের চরিত্রে ঔদার্য্য, ক্ষমা, কারুণ্য প্রভৃতি গুণের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। সাহিত্যে মহাপুরুষ আমদানীর কৃতিত্ব একমাত্র গিরীশচন্দ্রেরই নহে, বঙ্কিমের উপন্যাসে একাধিক মহাপুরুষ আছে। তাঁহাদের আচরণ কার্য্য-কারণের সঙ্গতির অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যে বিশেষ করিয়া নাটকে ইহা অপূরণীয় ত্রুটি।

গিরীশচন্দ্রের নিজের আধ্যাত্মিক শুভবুদ্ধিজাত একটি সামাজিক আদর্শ সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে তিনি নাটক রচনা করিতেন। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিবার মত অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করিতে পারিলেই এই প্রয়োজন মিটিয়া যায়। গিরীশচন্দ্রের রচনায় সাধারণ দর্শককে খুসী করিবার মত উপাদানের অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দর্শক যাহা চায় তাহাই তিনি লেখেন নাই, নিজের বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিয়া দর্শককে খুসী করিবার চেষ্টা তাঁহার রচনায় নাই।

সামাজিক নাটকে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বে মধুসূদন

ও দীনবন্ধুর অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের ছড়াছড়ি দেখা দিয়াছিল। অধিকাংশ প্রহসনগুলি অত্যন্ত গর্হিত রুচির পরিচায়ক। গিরীশচন্দ্রের বহু নাটকের মধ্যে সামাজিক নক্সার সংখ্যা নিতান্তই কম। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে রুচি-বিচারের পরিচয় নাই। অথচ হাস্যরস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা গিরীশচন্দ্রের ছিল না একথা বলা যায় না। সমাজ সংস্কার করিবার ইচ্ছাও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। তাঁহার সংস্কার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় ট্রাজেডিতে। বলিদান, গৃহলক্ষ্মী, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটক তাহার সাক্ষ্য।

গিরীশচন্দ্র কয়েকখানি শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ট্রাজেডি পরিকল্পনায় তিনি শেক্সপীয়রকে আংশিক অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। অন্যতম প্রধান চরিত্রের ঈষৎ অথবা সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি বোধ হয় শেক্সপীয়রের প্রভাবে। ট্রাজেডির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে বিয়োগান্ত কথাটি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গিরীশচন্দ্রের ট্রাজেডির বাংলা নামকরণ বিয়োগান্ত খুবই সার্থক। বিশেষ করিয়া সামাজিক বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে শেষাংশে মৃত্যু, আত্মহত্যা ইত্যাদির ভিড়।

গিরীশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির একটি দিক এখনও যথেষ্ট আলোচিত হয় নাই। ইংরেজ শাসন কায়েম হইবার পরে আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। পরিবর্ত্তন এত দ্রুত যে সকলে তাহার সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। ইহার ফলে অনিবার্য্য সামাজিক দ্বন্দ্ব জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। গিরীশচন্দ্র সমাজ ও ব্যক্তিমনের এই দ্বন্দ্বসংঘাত নাটকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত সামাজিক নাটকগুলিতে তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে সকল সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সব কয়খানিই ট্রাজেডি। নানা কারণে পাত্রপাত্রীর জীবনে ট্রাজেডি ঘটিয়াছে ; ইংরেজী শাসন ও শিক্ষা হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বও এই ট্রাজেডিগুলির অন্যতম কারণ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সমাজব্যবস্থা মধ্যবিত্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূলে আঘাত করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের পরিবার টলমল করিয়া উঠিয়াছে। নূতন ব্যবস্থা অস্বীকার করিবার উপায় নাই. অথচ পুরাতনকেও সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। গিরীশচন্দ্রের একাধিক সামাজিক নাটকে এই দ্বিধার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বই উৎকৃষ্ট ট্রাজেডির উপাদান হইতে পারে, কিন্তু গিরীশচন্দ্র অন্যত্র দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ফলে যাহা সত্যই উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি হইতে পারিত তাহা না হইয়া তা নিছক 'বিয়োগান্ত' নাটকে পরিণত হইয়াছে। নাটকগুলির শেষাংশে পতন ও মৃত্যু বাহুল্য আধুনিক দর্শকের মনে করুণা উদ্রেক করে না।

গিরীশচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা দেশের রঙ্গালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি নানা জাতীয় নাটক রচনা করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মিটাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমসাময়িক অন্যান্য নাটক তুলনায় অনেক হীন। সহজেই তিনি নাট্যসম্রাট আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই আখ্যা একদিক হইতে নিশ্চয় যথার্থ। পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই গিরীশচন্দ্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ট্রাজেডির নায়কের মস্তিষ্ক বিকার, শেষাংশে পতন ও মৃত্যুর ছড়াছড়ি, গীতিনাট্য, অবতারের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধরহিত আচরণ, তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক এবং শেষোক্ত দুইটি বিষয় অবলম্বনে স্পষ্টতই উপদেশ দিবার চেষ্টা—এ সবই গিরীশচন্দ্রের প্রভাবের ফলে পরবর্ত্তী যুগের নাটকে ছাইয়া গিয়াছিল। আজও বাংলা দেশের নাটক এই প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। গিরীশচন্দ্র যেভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যসাহিত্যকে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে নাট্যসম্রাট আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না।

দেশজ শিল্পরীতি কিভাবে বিদেশ হইতে আনীত ভাবধারাকে সকলের অলক্ষ্যে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে তাহার সাক্ষী বাংলা নাটক। প্রথম দিকের উদ্যোক্তারা ইয়োরোপীয় নাটকই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া দেশের যাত্রাগান বর্জ্জন করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের প্রয়াসের পরে দেখা গেল বাংলা দেশে নাটক নামে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত আদর্শের ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত। হাল আমলে কেহ কেহ আবার নাটকের গঠন আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের এই দিকটা স্মরণ রাখিলে উপকৃত হইবেন। দেশজ শিল্পরীতিকে একেবারে বন্ধন করা সম্ভব নহে —পূর্ব্বে তাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতে ঐ সাময়িক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলিতে এই উক্তির সত্যতা অঙ্কিত রহিয়াছে। দাস, খালজী এমন কি তোগলোকেরাও ভারতীয় পদ্ধতিকে তাঁহাদের স্থাপত্য কীর্ত্তি হইতে দূরে রাখিতে পারেন নাই। বাংলা নাটকেও নানাভাবে দেশজ রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গিরীশচন্দ্রের অন্যান্য রীতির মধ্যে ইহাও স্মরণীয় যে তিনি বাংলা নাটককে দেশজ রীতির নিকটতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

"আমার চেষ্টা থাকে ভাবের আগে যেন কথা না বেরিয়ে আসে। ভাবই কথা দরকার মতো তৈরী করে নেবে। কথা অনিবার্য্য, অবধারিত হয়ে উঠবে। একটা বাক্যরচনা সম্বন্ধে এ যেমন সত্যি—সম্পূর্ণ একটি শিল্পকর্ম্ম সম্বন্ধেও তেম্নি সত্যি। শিল্পীর জীবিকা যেম্নি অপ্রতিরোধ্য হওয়া চাই, তাঁর জীবনও তা-ই।"

—আঁদ্রে জিদ

ঘুমপাহাড়ের কথা

মাধুরী রায়

ঠিক মনে হয় যেন কারা সব বাইরে কথা কইছে ফিস্ ফিস্ করে। ভোর থেকেই গুমট্-করা জমাট মেঘের সমারোহ আর বাতাসের অন্তর্ধান আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছিল, আজ বরফ পড়্‌তে পারে। জানালাটা খুলে দেখি, অভ্রের গুঁড়োর মত ঝর্ ঝর্ করে তুষার ফুল ঝরে পড়্‌ছে বিরামহীন। একটা অস্ফুট ম্লান আলোকে সমস্ত দৃশ্যমান জগতটা যেন এক রহস্যপুরীতে পরিণত হ'য়েছে। তুষারের চলমান আবরণ ঢেকে দিয়েছে আমার নিত্যকার পরিচিত দৃশ্যপট। এমন্‌কি আমার নিকটতম প্রতিবেশিনী জেঠি নেওয়ারণীর ছোট্ট ঘরটার হদিশ পর্য্যন্ত বেমালুম হারিয়ে গেছে হিমাণীর শুভ্র আবরণে। অদ্ভুত কন্‌কনে একটা ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা মুখে মাথায় অনুভব কর্‌তেই তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

মুখটুখ সব ভিজে গেছে। মাথায় হাত দিতে চুল থেকে ঝরে পড়্‌লো গুড়ো গুড়ো তুষার-কণা। চিম্‌নীর ধারে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে ভাবছি এ সুদীর্ঘ শীতের রাতটা কি ভাবে কাটানো যায়। হয়তো এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। ঘড়ি তো ঠাণ্ডায় বন্ধ হ'য়ে আছে বেলা তিন্‌টে থেকেই, সময় জানবারও উপায় নেই। বিছানায় যেতেও ভয় করে, ঠিক মনে হয় যেন লেপ তোষকগুলো কে বরফগলা জল থেকে সদ্য চুবিয়ে এনেছে। চাকরটা দিনের গতিক দেখে দুপুর বেলায়ই ওর বাড়ীতে ভেগেছে। হট্‌ওয়াটার ব্যাগটায়ও গরম জল ভরা হয়নি যা দিয়ে বিছানাটা একটু গরম ক'রে নেব। কিন্তু ভাবছি আগেকার ডাকবাবু কি ভীষণ নীরস লোক ছিলেন। জরুরী খবর পেয়ে মাত্র কয়েকদিনের ছুটিতে দেশে গেছেন ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে, তাই জিনিষ পত্র তার সবই র'য়ে গেছে প্রায়। কিন্তু তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও একটা গল্প বা উপন্যাসের বই পেলাম না। শুধু খট্‌মটে নামের মলাটে গা জড়িয়ে কতগুলি ইংরেজী দর্শন, ইতিহাস আর ইক্‌নমিক্‌সের বই যেন অহঙ্কারে চোখ পাকিয়ে সেল্‌ফের উচ্চ আসনে বসে অবহেলাভরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

থাকো বাপু, তোমাদের দুর্ব্বোধ্যতা নিয়ে, তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে আমার চাবি লাগিয়ে খুলে ফেল্‌লাম ভদ্রলোকের ছোট্ট স্যুট্‌কেশটা। কিন্তু এখানেও নিরাশ হ'তে হোল;—টুকিটাকি নানা জিনিষ, খান দুই ধুতি ও সার্ট আর একগাদা চিঠি। নাঃ, চিঠির প্রতি আজকাল আর আসক্তি নেই, সে ছিল প্রথম যখন ডাকবিভাগের কাজে ঢুকেছিলাম। অন্যমনস্কভাবে একটা ধুতি সরাতে গিয়ে তার ভাঁজ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এলো একটা খাতা। উপরের মলাটে বেশ পরিচ্ছন্ন

অক্ষরে লেখা—অনলকুমার ব্যানার্জ্জী। যাহোক্ মন্দের ভালো। আমি চাই শুধু এই সুদীর্ঘ রাতটার দৈর্ঘ্য ভুলে থাকৃতে, তা এই অনলকুমারের ডায়েরি পড়ে বা যে করেই হোক্। আগাগোড়া র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বস্‌লাম এসে চিম্‌নীটার ধারে।

২২শে মে, ঘুমপাহাড়

চিঠিতে জানলুম তুমি হরিলুট দিয়েছ, কত ধুমধাম ক'রে মানসিক পূজো করেছ আমার চাকুরী স্থায়ী হওয়ার খবর পেয়ে। কিন্তু হায়, তুমি তো জাননা মা তোমার ছেলের অপমৃত্যু হোল, ম'রে গেল তার আত্মা কি দুঃসহ যন্ত্রনায়। আজ এই গভীর রাত্রে ঘুমহীন চোখে ব'সে ভাবছি; ভাবছি আর হাস্‌ছি সেই মৃত নির্ব্বোধ ছেলেটিকে মনে ক'রে। —কত কি তুমি হ'তে চেয়েছিলে অনল! কবি, শিল্পী, দেশকর্ম্মী, অভিযাত্রী! দাম্ভিক, পার্‌লে কি তাদের কারুর মধ্যে বাঁচতে? ওই নির্ব্বোধটার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভস্ম করে দিয়েছি; তার কবিতার খাতা, তার ছবি আঁকবার সংগ্রাম, সব। শুধু পারিনি অজিতের দেওয়া মার্কসের দর্শন আর অর্থনীতি ও ইতিহাস বই কয়টি নষ্ট করতে। অজিত! সেই চিরদিনের অশান্ত অজিত, আগষ্টের গণ-অভ্যুত্থানে যার তপ্ত রক্ত শুষে বালুরঘাটের তপ্ত বালুর রাক্ষুসী-তৃষা তৃপ্ত হ'য়েছে, যার অগ্নিময় হৃদয়-জ্বালার আহুতি হোল প্রতিবাদের তীব্র অগ্নুৎপাতে। সেই অজিতের দেওয়া স্মৃতি-চিহ্নকে কেমন করে দৃষ্টির আড়াল কর্‌বো আমি?

৫ই জুন

ঘুমের দেশ, ঘুমের দেশ! ঘুমের দেশে এসেছি আমি। মেঘে মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন করে অবিরাম বৃষ্টি ঝর্‌ছে, ঝর্‌ছেই। দিন নেই, রাত নেই, সূর্য্য নেই, আলো নেই শুধু আছে মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা আর অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। ঘুমপাহাড়ের সাড়ে সাত হাজার ফিটের অহঙ্কার।

অহঙ্কার কি তোমারই কম নাকি দীপা? ধনী পিতার হাজার হাজার টাকা আয়ের অহঙ্কারের উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিতা। আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার করুণা তোমার কেন হয়েছিল কে জানে! হয়তো বা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী-মহলে সাহিত্যিক ও ডিবেটার হিসাবে সম্মানের যে জৌলুসটুকুর চাকচিক্য দেখা দিয়েছিল আমার তাইই এই করুণাবর্ষণের কারণ। তারপর বাবার মৃত্যুর পরে সহসা যখন সে জৌলুসের আবরণ ভেদ করে আমার দারিদ্র্যের নগ্নরূপ প্রকট হয়ে পড়লো, যখন সব ছেড়েছুড়ে চাকুরীর জোয়াল কাঁধে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতির পাঠ নিতে সুরু করলাম, তখন—!

কিন্তু অহঙ্কার কি আমারই কম ? তোমার অহঙ্কার শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের আর আমার অহঙ্কার দারিদ্র্যের। নইলে কি আর তোমাদের প্রদত্ত অর্থে সারা গায়ে বিলেতের ছাপ মেরে আসতে অস্বীকার করতাম ? করুণাময়ী তুমি, তোমাদের সমকক্ষ অসনে স্থাপিত করে বরমাল্য পরিয়ে দিতে আমার কণ্ঠে। আমার গরীব মা বোনেরাও একেবারে বঞ্চিত হোত না সে করুণা থেকে। ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জীর ব্যারিষ্টার জামাতার কাছ থেকে মাসোহারা যেতো তাদের নামে। কম সৌভাগ্য ?

রাজকুমারী রাখাল ছেলেকে ভালেবেসে বিয়ে ক'রে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতো সেই রূপকথার যুগেই। আজকালকার রাজকন্যারা বড় হুঁসিয়ার। রাখাল ছেলেকে ঘটনাচক্রে ভালোবেসে ফেললেও বিয়ে করে তারা রাজপুত্রকেই।

অজিত, মনে পড়ে যেদিন ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম সেদিন যেন কতবড় ত্যাগ করেছি এমনি অহঙ্কারের ভঙ্গীতে সুদীর্ঘ লেকচার দিয়েছিলাম তোমার কাছে। বিপুল উচ্ছ্বাসে তোমার খাতা টেনে লিখে দিয়েছিলাম বিপ্লবের আগুনের মত জ্বলজ্বল-করা এক টুক্‌রো কবিতা !

সেদিন তুমি নিশ্চয় মনে মনে হেসেছিলে অজিত। তখন কি আর ভালো করে জানতাম যে শত রাজকন্যার বরমালা, শতরাজার রাজত্ব, সব তুমি কত নির্ব্বিকার অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে যেতে পার ! তখন কি জানতাম তেমন করে যে তুমি নির্ণিমেষে চেয়ে আছ উদয়াচলের যে মহাসূর্য্যের দিকে সে দৃষ্টিপথে আর সব কিছু—তোমার সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব একাকার হ'য়ে তুচ্ছ হয়ে গেছে, নিস্প্রভ হয়ে গেছে এক বিরাট আদর্শের দীপ্ত জ্বালায়।

২৬শে জুন

অবসর পেলেই এই যে ষ্টেশনের ধারে ছুটে আসি সে কি মনে কর তোমাকে দেখবার সম্ভাবনায় দীপা ? ধনী দুহিতা তুমি, আতপ তাপে ক্লান্ত হ'য়ে হিমগিরিছায়ে দার্জ্জিলিংয়ের শীতল আশ্রয়ে যে ক্লান্তি দূর করতে আসবে, এমন সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তবু তোমাকে দেখতে আসিনা। একথা দিনের আলোর মতই সত্য।

দেখতে আসি সুখ, ঐশ্বর্য্যের স্ফীতিতে স্ফীতকায় 'সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার'দের যারা সিজন্‌ অবসানে ডি, এচ, আর-এর ক্ষুদ্র কামরাগুলিকে ধন্য করে বর্ত্তমানে অবতরণের পালা সুরু করেছেন। ভীষণ বিস্ময় লাগে, তাইতো দেখ্‌তে যাই। ওদের পোষাক আর অলঙ্কারের ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায় আমার।

এপথে কোনদিন যদি হঠাৎ তোমার দেখা মেলেই তবে কি ওই সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারদের থেকে আলাদা করে দেখবো তোমাকে, চিনবো ? এমন কথা জোর করে বলতে পারো ?

২রা জুলাই

এখানকার বাঙালী, মারোয়ারী ও পাহাড়ীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত যারা অর্থাৎ বাবু ও মিষ্টার শ্রেণীয়রা, তারা আমার দুর্নাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার অপরাধ, আমি মিশিনা তাদের সঙ্গে, আমি যোগ দিইনা তাদের তাসের আড্ডায়। তারপর আমি যে জেঠি নেওয়ারণীর সব্‌জী দোকানে বার বার যাতায়াত করি সে তো তার সুন্দরী নাত্‌নী ঝাউড়ীর জন্যই।

হ্যাঁ, ঝাউড়ী সুন্দরী, তার সৌন্দর্য্য আমার ভালো লাগে, তাতে কী অপরাধ ? এই যদি অপরাধ তবে ওই যে যাত্রীর দল ছুটে আসে দলে দলে হিমবর্ষী রাতের শৈত্য আর অন্ধকারকে তুচ্ছ ক'রে টাইগারহিলে সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দেখতে, তারাও কি তবে অপরাধী নয় ?

কিন্তু দীপা, ঝাউড়ী সত্যই তোমার মত সুন্দরী নয়। সেই মনে পড়ে কলেজের রি-ইউনিয়নের দিনটিকে ? সেদিন সমস্ত উৎসবের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে দিয়ে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তোমাকেই জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার জরিপাড়-বস নো টক্‌টকে রঙের শাড়ী, তোমার রক্তাভ চুনি বসানো দুলদুটি, রাঙা পাথরের মালা, এমনকি তোমার কবরীর রক্ত গোলাপটি পর্য্যন্ত যেন সেই উদ্ধত বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করছিল।

তবু ঝাউড়ীর যা আছে তোমার তা নেই। হয়তো ওর খাঁদা নাককে কল্পনা ক'রে তোমার উন্নত নাসিকা অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌বে, জ্বলে উঠ্‌বে দীর্ঘায়ত কালো চোখের তারা। তবু ঝাউড়ী যখন ওদের অন্ধকার ঘরের দাওয়ায় ব'সে নিবিষ্ট মনে পশমের জামা বুন্‌তে থাকে মাতৃহীন ছোট ভাইটির জন্য, তখন ওর সেই তন্ময়তার রূপ যেন ম্লান ক'রে দেয় তোমার সেই রক্তসজ্জার আড়ম্বরকেও। অথচ ওর সজ্জায় কোন বাহুল্য নেই। সস্তাদরের ছিটের লম্বাহাতা ব্লাউজের উপরে সাধারণ একখানা শাড়ী জড়িয়ে পরা ওদের পাহাড়ী ধরণে, সাদা মোজাত্রা বা ওড়্‌না দিয়ে মাথায় ঘোম্‌টা দেওয়া আর গহনার মধ্যে সুগোল হাতে মোটা দুগাছা রূপোর বালা, গলায় দুলছে রঙীন পলার মালা—এই তো সাজ।

আমার বেশ ভালো লাগে ওদের দোকানের সাম্‌নে পাতা বেঞ্চিটার উপরে ব'সে তাদের কাজ দেখতে। স্বল্পবাক্‌ মেয়েটি বুনেই চলে নিঃশব্দে। "বৈজু" অর্থাৎ বুড়ি দিদিমা জেঠি নেওয়ারণীর বাক্‌যন্ত্র কিন্তু সামান তালেই চল্‌তে থাকে। আর আসর সবচেয়ে জমে ওঠে যেদিন ঝাউড়ীর দাদু অন্ধ "বাজেবুড়ো" শয্যা ছেড়ে এসে বসে।

ওদের গল্প শুনে শুনে অদ্ভুত এক বিচিত্র যুগে চলে যাই, চলে যাই সেই আদিম ভারতের যুগে। দুর্ভেদ্য বনবেষ্টিত দুর্গম পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওদের সেই গাঁগুলিতে যেখানে আজও টাকা পয়সার চল নেই, জিনিষপত্র বিনিময়ের কারবার। সেই সব গ্রামকে ঘিরে কত অদ্ভুত উপকথা—কত বিচিত্র রজনীর আতঙ্কভরা কাহিনী। গরিলার মত দেখ্‌তে কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ হিমালয়চারী 'সপ্পা'র নৃশংস আক্রমণ, বনদেবতার আকস্মিক আবির্ভাব ও করুণা। তারপর সেই অদ্ভুত পাহাড়ে অভিযানের কথা যেখানকার পাহাড়গুলো কাঁচের মত স্বচ্ছ, নানারংয়ের প্রভায় দ্যুতিময়, সেই বিপদ-সঙ্কুল তীব্রস্রোতা পাহাড়ী নদীর কথা যার জল-আবর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট এক পদ্মরাগ মণি, সূর্য্যালোকের ক্ষণিকস্পর্শে যার ঝল্‌মলে রক্তিমাভায় সমস্ত নদীর বুক দীপ্তিময় হ'য়ে ওঠে।

স্বপ্নেও এক একদিন চ'লে যাই নেপালের সেই গহন বনপথে যেখানে ভারতগামী যাত্রীর দল অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে প্রতিক্ষণ নিশাচর জন্তুর আক্রমণ সম্ভাবনায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গণনা কর্‌ছে। চ'লে যাই সেই নামহীন নদীতীরে যার বালুকণায় ছড়িয়ে আছে স্বর্ণরেণু, পথহীন পর্ব্বত গহ্বরে গহ্বরে খুঁজে ফিরি অনাবিষ্কৃত হীরার খনির সন্ধান। এর চেয়ে কি তাসের আড্ডার কুৎসিত গালাগালীর বদ্ধ আবহাওয়া আর পঞ্চাশবার খিতানো পলিটিক্‌সের একই বিষয় নিয়ে মিথ্যে তর্ক করতে ভালো লাগ্‌তো ?

১২ই জুলাই

শেষ ডাউন ট্রেন চলে গেছে। আঁধার নাম্‌ছে গাঢ় হ'য়ে। সারা দিনমান আজ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি ঝর্‌ছে, মনে হয় সৃষ্টির শেষদিন পর্য্যন্ত এমনি ক'রে ঝর্‌তেই থাক্‌বে।

আশ্চর্য্য! একটা ঝড় হ'তে পারে না? একটা ভীষণ প্রবল ঝড় এসে সমস্ত কালো মেঘগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না? সমভূমির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে না ওই পাহাড়ের উদ্ধত চূড়োগুলাকে? সাগরবক্ষ থেকেই একদিন তোমার জন্ম হয়েছে হিমালয়, তবু তোমার এ আকাশস্পর্শী দম্ভ?

টেবিলের উপরে প'ড়ে আছে গোলাপী খামখানা। নিজের হাতে নাম ঠিকানা লিখে বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছ। মনে ক'রেছ বুঝি আমাকে খুব আহত করতে পেরেছ। কিন্তু আহত আমায় করতে পারনি। আমি শুধু গভীর লজ্জা অনুভব করছি তোমার পরাজয়ের হীনতায়।

হ্যাঁ দীপা, তুমি হেরে গেছ এই সাধারণ পাহাড়ী মেয়েটার কাছে। ওর বৈজুর মুখে শুনেছি, কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় ঝাউড়ী একদা যাত্রা করেছিল

নিঃশঙ্কচিত্তে আনন্দ থাপার হাত ধরে। আনন্দ ধনীপুত্র হ'লেও ঝাউড়ী সে আশায় যায়নি। সেই ধনী ব্যক্তিটির অসম্মতি ও বিরাগই তাদের যাত্রা করিয়েছিল নিরুদ্দেশের পথে। কোনও দূরান্তরের চা-বাগানে গিয়ে কুলির কাজ করবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে মাথায় নিয়েই ঝাউড়ী নেমেছিল পথে কিন্তু মধ্যপথেই এলো প্রচণ্ড বাধা। পুলিশের লোক নিয়ে আনন্দের ধনী পিতা মিঃ থাপার রুদ্র আবির্ভাব ঝাউড়ীকে না টলালেও টলিয়ে দিল আনন্দকে। সে কাপুরুষ নির্ব্বিবাদে ঘরে ফিরে এলো ঝাউড়ীর উপরেই সমস্ত দোষারোপ চাপিয়ে দিয়ে। ঝাউড়ীও ফিরে এলো কিন্তু আগেকার সেই উচ্ছল মেয়েটি লজ্জায় ঘৃণায় পথেই পড়ে রইলো, পথেই মৃত্যু হোল তার। ফিরে এলো বিষাদময়ী নূতন আরেকটি মেয়ে। কিন্তু তবু ওর বিষণ্ণ মুখে ছায়া ফেলেনি কোন পরাজয়ের হীনতাই।

আমি তো হারিনি, তুমিই ভীষণভাবে হেরে গেলে দীপা। তুমি তো সব বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন ক'রে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আসন ছেড়ে, সব অসাম্যকে জয় করে নেমে আস্‌তে পার্‌তে। যাক্‌, কষ্টিপাথরে তোমার মূল্য যাচাই হ'য়ে গেল। না, না, তবু তোমাকে অভিশাপ দিইনা। তুমি সুখী হও, তুমি শান্তি পাও এই কামনাই করি। তুমি দুঃখ বরণ ক'রে আমার দুয়ারে এলেও হয়তো ফিরিয়ে দিতাম তোমাকে। আমার ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াতে দিতাম না কোনমতেই। এতো ভালোই হোল, তুমি তো থাকবে সুখে, তুমি তো থাকবে কল্যাণে।

কিন্তু এ ঘুমের দেশ অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার। এত নিস্তব্ধতা আর সইতে পারিনা আমি। মনে হয় জীবনময় জগত থেকে আমার নির্ব্বাসন হ'য়ে গেছে। ম'রে গেছে অজিত, মরে গেল দীপা, মৃত্যু হোল আমার মনের সজীব তারুণ্যের। এই শ্মশানাগ্নির মধ্যে জ্বলে জ্বলে আমার এই কেরাণী আমিটাই বুঝি শুধু বেঁচে থাক্‌বে।

এ দহনজ্বালা আমি আর সইতে পারিনা। চমৎকার নাম রেখেছিলে মা তোমরা। সারাটা জীবন দাহ বহন করেই বুঝি নিঃশেষ হ'য়ে যাবো তিলে তিলে।

৯ই সেপ্টেম্বর

কিছুদিন জ্বরে ভুগেই শরীরটা এমন দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে যে মনে হয় যেন কতকাল ভুগেছি। গতকাল বিয়ের চলন গেল আমার বাসার সামনের পথ দিয়ে। আনন্দ তার নববধূকে নিয়ে গেল বিরাট জাঁকজমক ক'রে। বধূটি দরিদ্র পরিবারের ঝাউড়ী নয়, নেপালের কোন্‌ সম্ভ্রান্ত বংশের দুহিতা,—ধনে মানে থাপাদের ঘরের উপযুক্ত।

ডুম্ফুর ভেঁপু আর সানাইয়ের কোমল মীড়ের ঐক্যতান শুনে জানালা ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আনন্দ চ'লেছে আগাগোড়া শাদা পোষাক পরে, মাথায় শাদা পাগড়ী জড়িয়ে রাঙা ঘোড়া টগ্‌বগিয়ে, আর সবাই বধূকে কেন্দ্র ক'রে পায়ে হেঁটে। বাঁশের দোলায় কাপড় ঢাকা বউ অদৃশ্যই র'য়ে গেল। হঠাৎ ঝাউড়ীদের বাসার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠ্‌লাম। ওদের ছোট্ট বারান্দার রেলিংটার উপরে প্রাণপণে ঝুঁকে পড়েছে, দেখছে শোভা-যাত্রা। এমনভাবে দেখছে যে তার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যে এর সামান্যতম অংশটুকুও দৃষ্টিপথ থেকে বাদ দিতে সে দেবে না। সামনের পথটা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় শোভাযাত্রা-কারীদের অনেকেই ফিরে তাকালো ওর দিকে, আনন্দও। তার মুখ লজ্জায় লাল হোল কি দুঃখে কালো হোল তা আমি বুঝতে পারলাম না। শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলাম যে তার ঘোড়ার গতিবেগ অনেকটা বেড়ে গেল। ক্রমে ক্রমে ওরা পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, সানাইয়ের রেশও এলো ক্ষীণ হয়ে। তবু দেখি ঝাউড়ী তেমনি করে ঝুঁকে আছে প্রাণহীনের মত, যেন ওর সমস্ত সত্তা চলে গেছে ওই সানাইয়ের মিলিয়ে যাওয়া করুণ রেশটার গতিপথ ধরে। তারপর একসময় হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একছুটে ঢুকে পড়লো ঘরে, সশব্দে বন্ধ করে দিল দুয়ারটা। আমি জানি এখন ও লুটিয়ে লুটিয়ে বুকফাটা কান্নায় ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের অন্ধকার ঘরের ভিত্তিতল।

দীপা, কোলকাতায় থাকলে হয়তো বা আমিও শত শত ফুটপাথচারী দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার বিয়ের সুসজ্জিত মোটরকারকে সদর্পে পথ অতিক্রম করতে দেখতাম। কিন্তু চোখে জল আমার আস্‌তোনা। আজও যে এলো সে তো ওই বোকা মেয়েটার জন্যই, ওর প্রতি কেমন অদ্ভুত মায়া প'ড়ে গেছে, তাই।

১২ই সেপ্টেম্বর

তুমি ছায়ার বিয়ের কথা লিখেছ মা। ভাব্‌তে কেমন লাগে! সেই ছোট্ট ছায়া, ওর হাসি হাসি দুষ্টুমিভরা মুখখানি,—সেই ছায়া বিয়ে হয়ে চলে যাবে পরের ঘরে কতদূরে? কিন্তু তবু এই নাকি নিয়ম!

আমার অভিমানিনী আদুরে বোনটিকে একদিন বিদায় দিতেই হবে। ছেলেমানুষী ঘুচিয়ে দিয়ে গাম্ভীর্য্যের ঘোমটা টেনে ও বউ সেজে বস্‌বে একদিন বদ্ধ ঘরের গণ্ডীতে। শুধু চঞ্চলা মেয়েটার ত্রস্তপদে ছুটোছুটির পদধ্বনি আর গান গাওয়ার গুণগুণানি সুরের স্মৃতির রেশ আমাদের শূন্য ঘরের কোণে কোণে গুমরে মর্‌বে। যেমন হয়েছে আজকাল জেঠি নেওয়ারণীর ঘর ঝাউড়ীর হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে চলে যাওয়ার পর।

তুমি লিখেছ, বেশ রোষের সঙ্গেই, গুহ মশাইর ভাইপো সমর ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, ওর স্পর্দ্ধায় অবাকও হ'য়েছ তুমি। কিন্তু আমি তো বলি সেইতো ভালো। গ্রামের ছেলে, সামনেই থাকবে ছায়া। নাইবা হোল বড়লোক তবু বোনটি তো থাক্‌বে সুখে। আমি নিশ্চয় করে জানি ছায়া সুখী হবে। ছায়া তো চেনে জানে সমরকে ছোটবেলা থেকেই। হোলই বা কায়স্থ, মিথ্যা সংস্কারের দেওয়াল তুলে মনোধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি আমি করবোনা। আমার বোন যদি সুখী হয় তবে সমস্ত গ্রাম আর সমাজের চোখরাঙানী আমাকে ঠেকাতে পারবেনা। আমি একঘরে হয়েই থাকবো না হয়, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

কিন্তু মা, তোমার আর একটি সাধকে নির্ম্মমভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে হোল আমায়। শতকরা নিরানব্বুইটি বাঙালী মায়ের মত তুমিও উল্লসিত হ'য়ে পুত্রের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখ্‌ছো, পুত্রের কেরাণীত্বেই কত পুলক তোমার। আজ যদি আমি বিদেশী ছেলে ম্যালরী, আর্‌ভিন বা স্কটের মত দুরন্ত স্বপ্ন নিয়ে তুষার অভিযানে প্রাণ হারাই কিংবা দেশের ছেলে অজিতের মতই প্রতিবাদের তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠে মুহূর্ত্তে নিভে যাই চিরদিনের জন্য তবে হয়তো কেঁদে কেঁদে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, নিজেকে ফেল্‌বে পৃথিবীর চরমতম অভাগাদের দলে। অথচ এই যে কেরাণী-জীবনের অন্ধ কোটরে তোমার অনল আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার নিস্ফল বেদনায় মাথা ঠুকে ঠুকে পলে পলে আত্মহত্যা করছে সেজন্য তোমার দুঃখ নেই একতিলও। আঁচলে ঢেকেঢুকে নিরাপদ গহ্বরকে নিরাপদতর করে তুলেই তুমি নিশ্চিন্ত, সেইখানেই আমার চিরস্থায়ী শিকর যাতে নির্ব্বিঘ্ন হয়ে থাকতে পারে আজীবন সেজন্যও তোমার চেষ্টার অন্ত নেই। অসম্ভব, এমন ভাবে টিঁকে থাকতে আমি পারবোনা। তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র বিফল করে আমি আবার বেঁচে উঠ্‌বো। আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচ্‌বোই।

অজিত, অজিত !—তোমাকে আজ এত মনে পড়ছে কেন ?

ম্লান চাঁদের আবছায়া আলো ঝ'রে পড়ছে ঘুমের দেশের ঘুমন্ত পুরীতে। আর নীলাভ শুকতারায় কার বেদনার্ত্ত চোখের মমতাভরা দৃষ্টি ?

৭ই অক্টোবর

উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মত গাঢ় নীল আকাশ, মেঘের লেশমাত্র নেই কোনখানে। এমন আকাশ ঘুমপাহাড়ে অভিনব। জানি এর স্থায়িত্ব ক্ষণিকের, মুহূর্ত্তেই কুয়াশার কুহেলিকা, মেঘের যবনিকা ছুটে এসে ঢেকে দেবে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের সবটুকু। ডাকওয়ালা-দের কাছে ডাক দিয়েই তাই বেড়িয়ে পড়েছি।

ওই দীপ্তিময় অলাতবন্যাকে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে চাই।

অন্ধকারের দেশে ওই আলোকস্নাত আকাশ আজ পূজোর খবর নিয়ে এসেছে। নিটোল নীল আকাশে ওই যে তুষারময় পর্ব্বতশ্রেণী রূপালী আলো বিকীর্ণ করে দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেও কি আগমনীর আনন্দবার্ত্তা বয়ে আনেনি? তবু কেন আমার সমস্ত আনন্দানুভূতির মধ্যে তীব্র বেদনার রেশ এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে, ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না কোনমতেই।

কতকগুলি বনগোলাপের গুচ্ছ নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ফিরে আসছি কার্ট রোড ধ'রে। ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি ঝরতে সুরু করেছে এরই মধ্যে। কিন্তু ছোট্ট একফালি হাল্কা মেঘের টুকরো ঝল্‌মলে আলোকে একেবারে নিভিয়ে দিতে পারেনি, খানিকটা ম্লান করেছে মাত্র।

ঝোরার ধারটা নির্জ্জন, শুধু জলের ধারে মস্ত পাথরটার উপরে একটি মেয়ে বসে আছে। আরও একটু সামনে আসতে চমকে উঠলাম,—ঝাউড়ি! ঝাউড়ি স্বেচ্ছায় এক কাঠের কণ্ট্রাকটরকে বিয়ে করেছে আনন্দের বিয়ের দিন দশেক পরেই। লোকটি প্রৌঢ়বয়স্ক,—আরেকটি বউ এবং ছেলেপিলেও আছে। ফেলেডি ফরেষ্টের কাছে কোথায় যেন তার ঘর। তবে একটা জিনিষ তার আছে যা আনন্দদেরও নেই। মস্ত বড় ঠ্যাস কার একখানা। ওই মোটরেই বিয়ের পরে বার দুই এসেছে ঝাউড়ি, সমস্ত ঘুমপাহাড় চক্কর দিয়েছে বার বার। এবার যে কোনদিন এলো জানতে পারিনি মোটে। বিয়ের পরে হারেমের মেয়েদের মত স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব কেন যে ও বরণ করে নিয়েছে তাও জানিনে। বিয়ের পরে এই প্রথম ওকে দেখলাম, আর আর বার দেখেছি শুধু ওর মোটর। বৈজু বলছিল দিন দুই আগে যে, মেয়েটা ম্যালেরিয়ায় ভুগছে; ওর স্বামী বা সতীনও ভালো ব্যবহার করেনা ওর সঙ্গে, এমন কি মারধোর করে পর্য্যন্ত।

ডাকলাম,—ঝাউড়ি।

ভীষণভাবে চম্‌কে উঠে ফিরে তাকালো। হয়তো কিছু বুনতে এসেছিল, কখন সে উল কাঁটা পড়ে গেছে ওর পায়ের কাছে। রুক্ষ পিঙ্গল চুলের মধ্যে জমেছে মুক্তোর মত জলবিন্দু। ওর মন এই তুষার-স্বপ্ন পেরিয়ে চলে গেছে কোথায় কত দূরদূরান্তরে কে জানে। ওকে ভিজতে বারণ ক'রে গোলাপগুলি তুলে ধরলাম ওর দিকে। নিঃশব্দে তা গ্রহণ ক'রে তেমনি নির্ব্বাক দৃষ্টি তুলে ঝাউড়ি তাকিয়ে রইলো। চ'লে এলাম দ্রুতপদে। বৃষ্টি নামল এবার সশব্দে। ওর নীরব দৃষ্টি যেন এখনও আমাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণ করছে আরও বহুদূর বাঙলার এক কুটির থেকে ছায়ার ব্যথাতুর দৃষ্টি ওর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। না, না, ধনীর দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিনী হ'তে দেবনা আমার বোনকে—শত সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনাতেও নয়। কালই মাকে চিঠি লিখতে হবে।

১৩ই নভেম্বর

আজকের পত্রিকায় তোমার ফটো দেখলাম দীপা,—কোন্ এক বিদ্যালয়ের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করছো সোনার চাবি দিয়ে। তোমাকে বেষ্টন ক'রে বিখ্যাত গণ্যমাণ্যের দল, তুমি মধ্যমণি স্মিতহাস্যে কি নিখুঁতভাবে দাঁড়িয়ে আছ। কি চমৎকারই না উঠেছে তোমার ফটোটা। ওই ভ্যানিটি ব্যাগ ধরার ভঙ্গিটি, ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর অপূর্ব্ব ধরণটি, মায় হাসিটুকু পর্য্যন্ত একেবারে ত্রুটিশূণ্য। ক্যামেরাম্যান এমন ফটো তুলতে পেরে ধন্য হয়ে গেছে।

তোমাকে মডেল ক'রে কোনদিন ছবি আঁকিনি বলে একদিন কত অভিমান করেছ। আমার মধ্যের সে শিল্পীটি বেঁচে থাকলে আজই কি সে পারত তোমার সে অভিমানের মর্য্যাদা রাখতে? হয়তো সে দীন-শিল্পীর তুলিরেখায় ফুটে উঠতো ডোকো পিঠে যে শ্রান্ত মানুষের দল সারা দিনের শেষে ঘরে ফিরছে তাদেরই মলিন ছবি, হয়তো বা রূপ পেতো ঝোড়ার ধারে ব'সে থাকা আন্‌মনা একটি নির্ব্বোধ মেয়ের করুণ মুখচ্ছবি।

৩রা ডিসেম্বর

কী ভীষণ অন্ধকার! সমস্ত দুয়ার জানালা এই আমি খুলে দিলাম। ঘুমের দেশের অন্ধকার,—তুমি তোমার যত কুয়াসা, যত মেঘ, যত তীব্র শীতলতা আছে সব নিয়ে অভিযান করো, আমি তোমাকে ভয় করি না। এই ঘুমের দেশে একা অতন্দ্র আমি জেগে আছি, নির্ম্মম প্রকৃতি, আক্রমণ করো। নিশ্চল পাষাণ প্রহরীদল, তোমাদেরও আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পারবে কি আমার গতিপথকে রুদ্ধ করতে? আমি যাবো, আমি যাবোই অশান্তির বন্যায় বিক্ষুব্ধ আমার জন্মভূমির বুকে। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছি আমি বেদনাময় আহ্বান।

আমি কি পাগল হয়ে যাবো? কি সব লিখছি। কেন ইচ্ছা করছে চীৎকার ক'রে নিদ্রিত ঘুমপাহাড়কে সচকিত ক'রে তুলতে। সব অন্ধকারকে অগ্রাহ্য ক'রে আমি যাবোই আমার সূর্য্যের দেশে। কিন্তু কেন রিলিফম্যান এলোনা আজও? কালও যদি না আসে? অসম্ভব, তাহ'লেও আমি যাবো, আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না।

মাগো, সে চিঠি এখনও আমার পকেটে, বুকের কাছে রয়েছে অদ্ভুত দাহ ছড়িয়ে। কিন্তু মাত্র আড়াইটে,—আরও কত ঘণ্টা,—কখন ভোর হবে?

এখানেই শেষ হয়েছে অনলের লেখা। ৩রা ডিসেম্বর রাত্রে ওর লেখা শেষ হয়েছে, আমি এসে পৌঁচেছি ৪ঠা ডিসেম্বর আর আজ জানুয়ারীর বিশ তারিখ!

জানিনা কি দুঃসংবাদ পেয়ে অনল অমন পাগলের মত ছুটে পালিয়েছে কিন্তু কাজ বুঝে নেওয়ার সময় ওর ব্যস্ততায় বিরক্ত হ'য়ে যে রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম খানিকটা, সে অনুতাপের লজ্জা থেকে আজ রেহাই পাবো কেমন করে ?

কেন পড়লাম খাতাটা ? কোন যুগে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া আমার তারুণ্য, কি তার রূপ, কি তার কামনা সে তো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ডুবে গিয়েছিল অতীতের গহ্বরে। স্ত্রীপুত্র-পরিবারের দায়িত্ব বহন করে আমি তো স্বস্তিতেই বেঁচে আছি। জীবন-সন্ধ্যা এলো ঘনিয়ে, ভোরের স্বপ্ন দেখবার মন প্রদোষছায়ায় ক্লান্ত আসন পেতেছে আজ। আর কেন ? দিন শেষের ক্ষীণ-আহ্বান শোনা যায় একুশ বছর দাসত্বের আজ এই অবসন্ন জীবনে।

টেবিলের উপরেই মাথা রেখে কখন তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ দুয়ারে প্রচণ্ড আঘাতের শব্দে জেগে উঠলাম। এ তুষার-ঝরা রাতে কে এলো আবার ? দুয়ার আর টেনে খুলতে পারি না, বরফ পড়ে আটকে গেছে এমন শক্ত ক'রে। বাইরে যারা ছিল তাদের ঠেলা-ঠেলিতেই অবশেষে খুলে গেল দরজা, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে কাঁপিয়ে দিল হাড় পর্য্যন্ত। লোকগুলো ছুটে ঢুকে পড়লো ঘরে। ওদের গা ব'য়ে ঝরে পড়তে লাগলো ঝুরো তুষারকণা, ভিজে গেল মেঝের অনেকটা। পাহাড়ী সবাই, আমার পরিচিত মুখ। জেঠি নেওয়ারণীর বাসা থেকে এসেছে ওরা ভীষণ নিরুপায় হ'য়ে। বুড়ি মূর্চ্ছা যাচ্ছে ঘন ঘন। ডাক্তারের বাসার দূরত্ব অনেকটা, এ তুষার বৃষ্টিতে সেখানে যাওয়া অসম্ভব তাই নিরুপায় বুড়ো ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে যদি কোন উপায় বলে দিতে পারি। বুড়ির অসুস্থতার কারণ আমার অজ্ঞাত নয়। নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন ক'রে আজ টেলিগ্রাম এসেছে জেঠি নেওয়ারণীর নামে আমারই হাত দিয়ে। কিন্তু কি করতে পারি আমি ? স্মেলিং সল্টের শিশিটা দিয়ে ওদের বিদায় করলাম। ওরা চলে যেতে দুয়ারের কাছে এগিয়ে এলাম বন্ধ ক'রে দিতে। কি বিস্ময়কর দৃশ্য !—তুষারপাত বন্ধ হ'য়ে গেছে এখন। যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই অপূর্ব্ব শুভ্রতা,—যেন শ্বেত-মর্ম্মর রচিত বিরাট রাজপুরী গ'ড়ে উঠেছে কার।

চাঁদও দেখা দিয়েছে আকাশে, কেমন নিস্প্রভ ঘুমন্ত আলো তার। সে আবছা স্তিমিত আলোয় রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তুষারের স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হ'য়ে, মর্ম্মরপুরীর গায়ে খচিত হ'য়েছে মণিমুক্তারাজি। নিদ্রিত তুষারপুরী।

ফিরে এলাম টেবিলের ধারে। অনলের খাতায় লিখতে হবে আমাকে ঘুমের দেশের শেষ অধ্যায়। ঝাউড়ি নেই, সুদূর তরায়ের এক দুর্গম অরণ্যাবাসে ঘুমপাহাড়ের মেয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই দুঃসংবাদ বহন ক'রেই এসেছে আজ জেঠি নেওয়ারণীর তার।

যে যা-ই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছত্রিশ

টাকা-শুদ্ধ তামসীর প্রসারিত হাত চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট আঁকা আছে। সতেজ, সমর্থ, আবার সমর্পণের ব্যগ্রতায় সুকোমল। ছোঁ মেরে টাকাটা ছিনিয়ে নিল অধিপ। হয়তো পর মুহূর্তেই সে হাত প্রত্যাখ্যানে কঠোর হয়ে উঠবে। কে জানে!

সে-হাতখানার দিকে এখন একবার তাকাল কৌতূহলীর মত। তার বাঁ জানুর কাছে দুর্বলের মত বিশ্রাম করছে। মোটরের ভিতরে পাশাপাশি বসেছে দুজনে, তামসীর ডাইনে অধিপ। বসেছে রহস্যধূসর নিস্তব্ধতায়। আরো একদিন যেন এমনি বসেছিল তারা। মনে তীক্ষ্ণ ইচ্ছা থাকলেও তামসীর হাত সে সেদিন ছুঁতে পারেনি। সেদিন সে দেখেছিল বুঝি কামনার চোখে, মিত্রতার চোখে নয়। সেদিন সে ছিল উচ্ছৃঙ্খলতার, বিপ্লবের নয়। নয় নির্মল নির্মুক্তির। তাই সেদিন তার সাহস হয়নি, প্রতিরোধের ভয় ছিল। আজ তার সাহসের অন্ত নেই, কোনো প্রত্যাঘাতকেই সে ভয় করেনা।

তামসীর দক্ষিণ হাত অধিপ তার বাঁ হাতের মুঠায় সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করলে। কোনো মতান্তর নেই, অবিশ্বাস নেই। নিমগ্নের মত আরো নিবিড় করে গ্রহণ করল সেই স্পর্শের আস্বাদ। যেমনটি ভেবেছিল তেমন যেন লাগল না। কী ভেবেছিল নিজেকে জিগগেস করল অধিপ। কী ভেবেছিল তাই বা সে স্পষ্ট জানে না কি? তবু, এ হাত যেন বড় বেশি আর্দ্র, কাঠিন্যশূন্য। এ হাত যেন পরিচর্যার হাত, গৃহস্বজনের হাত, পাপস্খালনের হাত। অনেকক্ষণ ছুঁয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয়না কিছু ছুঁয়ে আছে। যেন গলে গেছে, নিবে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। তামসীর মুখের দিকে তাকাল অধিপ। চোখ বোজা, নীরব প্রার্থনায় সমাহিত। যেন মৃত চাঁদ সূর্যের কাছে তাপ খুঁজছে, তেজ খুঁজছে। আত্মদীপ্তিহীন অক্ষম চাঁদ। প্রত্যাশায় মলিন, অকর্মক।

'তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।' হাত ছেড়ে দিল অধিপ।

'আমি জানতাম। বিশ্বাস করতাম।' কালো চোখ আলো করে তামসী বললে। 'সকল জিনিসের বড় হচ্ছে বিশ্বাস, অনাসক্তি।'

'যে ভাবে পালিয়ে গেলে ভাবতেও পারিনি আবার ফিরে আসতে পার কোনোদিন। এমন ভাবে, এই শারীরিক সত্যে।'

'যে পালিয়ে যায় সে আবার ফিরে আসে। একভাবে না একভাবে ঠিক ফিরে আসে।' তামসী

বললে। খুব দূর শোনালেনা তার কণ্ঠস্বর? কিন্তু সেই সঙ্গে সে কি অতর্কিতে আরো সরে এলনা অধিপের গা ঘেঁসে? তার চূর্ণালক কি অধিপের মুখের উপর উড়ে পড়লনা?

যেন অধিপই ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নতুন রূপ নিয়ে। নতুন প্রার্থিতের চেহারায়।

অধিপই প্রত্যাগত। তার আদিম আকাঙ্ক্ষার নবীন প্রতিনিধি।

চঞ্চল হলনা অধিপ। তামসীর করতল আবার সে তুলে নিলে। মুকুলমৃদুল করতল।

এই হাতে কি সে বন্দুক ধরতে পারবে? আগুন লাগাতে পারবে? ছুরি বসাতে পারবে শত্রুর মর্মমূলে?

'কিন্তু আমার সঙ্গে কোথায় তুমি চলেছ?'

অসীম ওদাস্যে হাসল তামসী। নিমেষমাত্র দেখল, অচেনা ড্রইভার অচেনা রাস্তা দিয়ে মোটর চালিয়ে চলেছে। বললে, 'তা কে জানে। আপনার সঙ্গে যাচ্ছি এই তো আমার যথেষ্ট।'

'আমি তো আর সেই আগের মত নেই।'

'কেউ থাকে না। আমিই বা কি আছি নাকি?'

'আমি চলেছি এখন ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে—'

'সে তো রাজপথ। প্রশস্ত, প্রশংসিত। আর আমি চলেছি যত অন্ধ অলি-গলি। ক্ষুধার পথ, পাপের পথ, প্রবঞ্চনার পথ—'

কেন পারবে না? খুব পারবে। সংহার করতে না পারুক, সংগঠন করতে পারবে। মিলিটারি লরিতে আগুন লাগাতে না পারুক, যারা আগুন লাগাবে, তাদের পূর্বাহ্ণে রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারবে। এই তো সে ক্ষীণজীবিনী মেয়ে, তবে একদিন তারই তিরোভাবের অন্ধকারে অধিপ তার পুরাতন পুরুষত্বকে আবিষ্কার করলে কি করে? ঐ মেয়েটাই কি তাকে একমুহূর্তে সুস্থ ও সচেতন করে দিয়ে গেল না? তার তেজোবল? মূল্যহীন, অর্থহীন মনে করে তাকে সে সেদিন যে অপমান করে গেল সে অপমানে সে কি নতুন করে নিজের অধঃপতনটা উপলব্ধি করলে না? আর, নিজেকে তুলতে গিয়েই মনে হলনা দেশকে তুলে ধরি? দেশের মুক্তিতে নিজেকে মূল্যবান করি?

তবে কি করে বল, মেয়েটা পারবেনা—মেয়েটা অক্ষম, ভঙ্গুর!

ভিড়ের মধ্যে থেকে পথ চিনে-চিনে আবার এসে যখন হাত ধরেছে তখন তাকে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে অধিপ। কাজে লাগাবে। কোথায় ছিল এতদিন, কেনই বা ফিরে এল, প্রশ্ন করবেনা, তর্ক করবে না। সে ঘৃত না ক্লেদ, কি এসে যায়! অগ্নিদেব সমস্ত আহুতি গ্রহণ করবেন।

মোটরটা থামল একটা গলির মুখে। ওদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে গেল। অধিপ বললে, এক বন্ধুর মোটর। আগের বার দেখেছি, পুলিশকে এড়াবার জন্যে যখন কোথাও সাহায্য নিতে গিয়েছি, সবাই ভয় পেয়েছে, ভেবেছে অন্যায় করছি সাহায্য চেয়ে। এবারে একেবারে উল্টো। সবাই কিছু না কিছু করতে চায়, নিজে না করতে পারলেও পরোক্ষে সাহায্য করতে চায়, করাটাই ন্যায় বলে স্বীকার করে। সব দেশ যুদ্ধ করছে, আর আমি আমার দেশের জন্যে যুদ্ধ করবনা? মেজাজে এই ঝাঁজ লেগে গিয়েছে আজ। তাই টাকা পাচ্ছি হাত পাততেই, সৈন্য পাচ্ছি হাতছানি না দিতেই। দরকার হলে মোটরটাও আবার পাওয়া যাবে।

সহরের কোনো একটা নির্জন প্রান্তদেশ। নোংরা গলিটাতেই তারা ঢুকল। দু পাশে ঝেঁপে-পড়া নিচু খোলার চালে মুমূর্ষু বস্তি। সার দিয়ে দাঁড়ানো রোগ গ্লানি ক্লান্তি মূর্খতা পীড়ন শোষণ বঞ্চনা বেদনার প্রতিচ্ছায়া। প্রতিচ্ছায়া কেন, প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

'এইখানে ?' তামসীর স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল।

'এইখানে একটা ঘর নিয়ে আছি। আত্মগোপন করছি। কেন, আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি ? এই তো আমাদের বিষয়, আমাদের অবলম্বন। এই নিপীড়িত জনতা। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এরাই তো অগ্রনায়ক। আর, এদের জন্যেই তো সংগ্রাম।'

অন্ধকারে তামসীর মুখাভাস স্পষ্ট বোঝা গেলনা। তবু তার কথার স্ফূর্তি অনুভব করা গেল স্পষ্ট।

এইখানেই তো একদিন আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম। মনে নেই ? এই নিম্ন-নিমজ্জিত জনগণের সমাজে। দেখতে চেয়েছিলাম কত কঠিন এদের বন্ধন, কত গভীর এদের লাঞ্ছনা। সঙ্গে-সঙ্গে এও দেখতে চেয়েছিলাম কোথায় আমাদের সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের সম্ভাবনা। এ জায়গাটা তো তাই আমাদের সাময়িক ঘাঁটি নয়, এ আমাদের রাজধানী, আমাদের তীর্থক্ষেত্র।

সেদিন আমাদের ওরা চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। সন্দেহ করেছে, অবিশ্বাস করেছে। কেনই বা করবে না শুনি ? সেদিন আমাদের গায়ে স্বার্থপরতার ধুলো লেগে ছিল। আমরা এসেছিলাম নিজের কাজে, ওদের কাজে নয়। ওদের কাজ দিয়ে নিজেদের কাজ বাগাতে। ওদের জোরে নিজেদের জোর দেখাতে। তাই জারিজুরি টেঁকেনি বেশিক্ষণ। ওদের লোকই মাথায় লাঠি মারল। বলল, বাইরের লোক দূরে থাকো। তোমাদের চরকার তেল এখানে খুঁজতে এসো না। যদি কোনোদিন আমাদেরই একজন হতে পারো, প্রভুত্ব বা প্রাধান্য করবার জন্যে নয়, পরিচর্যা করবার জন্যে, যদি মিশে যেতে পারো এক জলের সমতলে, এক শিলার সংহতিতে, তবে সেদিন চিনব তোমাদের, ডাকব, হাতে-হাত মেলাব। বুঝলে হে উপরতলার লোক, উপর-পড়া ফোঁপর-দালাল ?

'আজ কি সেই দিন এসেছে ?' প্রশ্ন করল তামসী।

'এসেছে।' ঘরে যাবার চিলতে গলির ফাঁকটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, হাত ধরে তামসীকে অধিপ বাধা দিলে।

'আপনার সংগ্রামের সৈনিক এদের থেকেও সংগ্রহ করেছেন তা হলে ?'

'নিশ্চয়। সবাইর থেকে সংগ্রহ করছি। জানোনা, এ টোট্যাল ওয়ার—সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। আমাদেরও তাই সর্বনাশের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে তাই সমান নিমন্ত্রণ সকলের। যে যেটুকু পারো, যার যতটুকু ক্ষেত্র, ধ্বংস করো, প্রচণ্ডাকার প্রতিবাদ জানাও।' হাতের মুঠে যেন উত্তাপের বদলে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে, অধিপ তেমনি জোরে হাতের চাপ দিলে।

ঘরের মধ্যে চলে এসেছে দুজনে। ছোট ঘর, দম আটকে শুম্ভিত হয়ে থাকার মত। এক পাশে একটা দড়ির খাটিয়া, তার উপরে নামমাত্র বিছানা। দড়িতে টাঙানো কটা অনাদৃত কাপড় জামা। একটা পিঠ-ভাঙা চেয়ারের উপর হেরিকেন জ্বলছে। মাটির উপর একটা চট বিছানো—কতক্ষণ আগে কারা আড্ডা দিয়ে গেছে তারই চিহ্ন ছড়ানো চারদিকে। সিগারেটের টুকরো, চায়ের খুরি, খাবারের ঠোঙা। পলাতক ছন্নছাড়ার পরিবেশ।

হেরিকেনটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসতে দিল তামসীকে। অধিপ নিজে বসল খাটিয়ার উপর। অন্তরঙ্গতা নিয়ে এল। নিয়ে এল ষড়যন্ত্রীর নিভৃতি।

এরাই তো আমাদের আসল সৈনিক, আমাদের অক্ষৌহিনী। যেখানে এরা কাজ করছে সেটা যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কারখানা। এরা ধর্ম্মঘট করবে। যুদ্ধোদ্যমে আঘাত হানবে। আর, এই ধর্ম্মঘট করিয়েই উত্তাপ-মান উঁচু করে তুলব। ও পক্ষেরও মেজাজ নিশ্চয়ই তিরিক্ষি হয়ে উঠবে। লাগবে সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষ থেকেই স্ফুলিঙ্গ। আমি—তুমি—আরো অসংখ্য—ঠিকমত ফুঁ দেব। আগুন লেলিহান হয়ে উঠবে। আর সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে কারখানা। এমনি করে, দিকে—দিকে—

শরীরের মধ্যে হঠাৎ একটা অস্থিরতা অনুভব করল তামসী। বললে, 'আজো ওরা আমাদের জন্যে লড়বে? ওদের নিজেদের জন্যে লড়বেনা?'

'ওদের নিজেদের জন্যেই তো লড়ছে। সমস্ত দেশের জন্যে লড়ছে। ওরা আমরা কি আজ আর আলাদা নাকি? যে যেদিক থেকে পারছি ইঁদুর তাড়াচ্ছি। যে ইঁদুর ধানচাল খেয়ে যাচ্ছে, সৎ গৃহস্থের যা কিছু কাপড় চোপড় বিছানা বালিস সব দাঁতের সুখে কেটে কুটিকুটি করে দিচ্ছে। যত শাদা ইঁদুর—'

'কিন্তু আপনার কালো ইঁদুরের দল তো থেকে যাচ্ছে।' তামসী দুই চোখে একটি স্থির শান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। 'তাদের রংই শুধু আলাদা কিন্তু চরিত্র এক। সেই দাঁত, সেই বিষ, সেই ধূর্ততা। সেই কালো ইঁদুর তাড়াবেন না? এদের যখন ডাকছেন এরা ইঁদুরের বংশ নিয়ে তারতম্য করবে কেন—শাদা হোক, কালো হোক, সব নেংটি ইঁদুরের বিরুদ্ধেই এদের অভিযান।'

শোনো। দুশো বছরের পাপ কি একদিনে মুছে যেতে পারে? বনস্পতি যখন মুক্ত রৌদ্রকে অবরোধ করে দাঁড়ায়, তখন তাকে অপসরণ করবার জন্যে তুমি হাতে কুঠার তুলে নাও। আগে শাখা-প্রশাখা কাটো, যত ছায়াপ্রসারী পত্রের আচ্ছাদন। যত তাড়াতাড়ি পারো, রোদ আসতে দাও, আসতে দাও আকাশের আশীর্বাদ। পরে ক্রমে ক্রমে দণ্ডে কাণ্ডে কোপ মারো। আস্তে-আস্তে মুক্তির বিস্তার জেগে ওঠে।

কিন্তু শুধু দণ্ড কাণ্ড কাটলেই কি চলবে? মূলোৎপাটন করতে হবে না? মাটির যে গভীর গহ্বরে শিকড় তার বাহুপ্রসার করেছে তার শেষ খুঁজতে হবে না? উচ্ছেদ করতে হবে না সেই গুল্মমূল? শুধু রৌদ্র হলেই কি চললে? চাই না মাটির শস্যশক্তি? মুক্তি তো নঙর্থক, চাইনা সক্রিয়, অস্তিবাচক স্বাধীনতা?

বেধে গেল তর্ক। ঘোরতর মতান্তর।

তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? সময়ের শিথিল মুষ্টি থেকে সুবর্ণ সুযোগ ছিনিয়ে নেবনা? অধিপ উত্তেজনায় ফুটতে লাগল।

কিন্তু শুধু ধ্বংস করা বা উৎসাদন করাই তো বিপ্লব নয়। বিপ্লব মানে মন বদলানো, মানুষ বদলানো। দৃষ্টি বদলানোর দুঃসাহস। শুধু ভাব নয়, চরিত্র। শুধু জাগরণ নয়, উত্থান।

বুঝিনা অতশত। আগে মুক্তি চাই। চাই রুদ্ধ দুয়ারের উন্মোচন। পরে স্বাধীনতা। পরে বাতাসের অনাময়। বলো, তাই না? আগে আরোগ্য, পরে আয়ু।

একটু ভেবে দেখুন। হয়তো এক বন্ধন থেকে আরেক বন্ধনে চলে যাব। আজকের যে অসহায় সেদিনেরও সেই অসহায়। আজকের যে অপহারী সেদিনেরও সেই অপহারী। জেব বদলাবে কিন্তু জিভ বদলাবে না। চামড়া বদলাবে কিন্তু জাত বদলাবে না। দিন বদলাবে কিন্তু দিক বদলাবে না।

মিথ্যে কথা। গর্জে উঠল অধিপ। আগে চাই বিদেশীর বিতাড়ন। হাত পা বাঁধা আছে থাক, আগে চাই বুকের থেকে জগৎদলন পাথর নামানো। সেই ভার সরে গেলে হাত পার বাঁধন খুলে নিতে দেরি হবে না। বিদেশীর লৌহবন্ধন থেকে আত্মীয়ের বাহুবন্ধন ভালো।

আত্মীয়ের বাহুবন্ধন? সশ্লেষে হাসল তামসী। ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবন্ধনে লৌহভীম চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

অধিপের সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগল। তর্কের বিকারে তামসীকে তার ঘৃণা করতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল শারীরিক সামর্থ্যে তার এই অন্যায় অনম্যতা ভেঁঙে পিষে থেঁৎলে দেয়। অন্ধ রাগে যাকে সুন্দর দেখায় মূর্খ তর্কে তাকে এমন কুৎসিত দেখাবে কে জানত। এত কাছাকছি বসে, অথচ মনে হচ্ছে যেন বহু যোজনের ব্যবধান। মতের দূরত্ব কি মনকেও নিমেষে এমনি করে বিচ্ছিন্ন করে? কতক্ষণ আগে ঐ হাত কি করে কোমল মমতায় স্পর্শ করেছিল অধিপ, আশ্চর্য লাগছে ভাবতে। আশ্চর্য লাগছে ভাবতে, তারস্বরে এত শ্লেষ, চাউনিতে এত জ্বালা, ভঙ্গিতে এত অবাধ্যতা ছিল!

'তবে আমার সঙ্গে তোমার আসতে চাওয়া বৃথা।' গা থেকে সমস্ত স্পর্শ ঝেড়ে ফেলে দেবার মত করে অধিপ উঠে দাঁড়াল, যেখানে মতের মিল নেই সেখানে মনেরও ছন্দোভঙ্গ। ছন্দোভঙ্গ যেখানে, সেখানে মহাকাব্য রচনা করা চলে না। তুমি ফিরে যাও।'

তামসী হাসল তার সেই অনাসক্ত হাসি। বললে, 'আমি কোনোদিন ফিরে যাইনা, আমি সব সময় এগিয়ে যাই। বসুন, রাগ করছেন কেন? কাজের সঙ্গে একটু চিন্তা মেশালে ক্ষতি কি?'

'আমার যা কাজ আর তোমার যা চিন্তা তার মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান।'

'তাতে কি, অক্ষদণ্ড তো এক। একই আবর্ত্তনে তো আমরা ঘুরছি। পথে না মিলি পথপ্রান্তে তো মিলব। সেই প্রান্ত তো আমাদের আলাদা নয়। তাই আজ কারু ফিরে যাওয়া নেই। আমারও নেই আপনারও নেই। বসুন, আপনার সঙ্গে আমি যেমন এসেছি, হয়তো আমার সঙ্গেও আপনি তেমনি এসেছেন। কত দূর যাব দুজনে এখুনিই তার হিসেব করতে বসবনা—'

দরজার দিকে যাচ্ছিল, অধিপ থামল।

'তবু পথের মোরে এসে হয়তো একটু দ্বিধা করতে হবে কোন দিকে সত্যিকারের পথ। ডান না বাঁ।'

'ককখনো না।' গর্জে উঠল অধিপ, 'দ্বিধা নেই, এক পথ এক লক্ষ্য। আমার এদিক-ওদিক নেই— আমি সিধে, আমি অকপট। চিহ্নমুখের দিকে আমি সরল শরক্ষেপ।'

'তবু দেখতে হবে সেইটেই আমাদের দেশের চিহ্ন কিনা। দেখতে হবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা, কাদের জন্যে। শুধু আমার আপনার জন্যে, না, এইসব দলিত-দমিত দীন জনসাধারণের জন্যে?'

দরজার কাছে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তিরই বাসিন্দে। জানতে এসেছে খাবার কি সংস্থান হবে, শোবার কি বন্দোবস্ত। ও, হ্যাঁ, তর্কের কৌতুকে আহার নিদ্রার কথাই ভুলে গিয়েছে। যেমন আসছে, হোটেল থেকেই ভাত-ডাল নিয়ে এসোগে, দুজনের মত। শোয়া? ঘরের চারদিকে তাকাল অধিপ। এখানে সম্ভ্রম কোথায়, শিষ্টতা কোথায়? পাশের ছোট কুঠুরিটা ছেড়ে দেওয়া যায় না?

খুব যায়। ঐ ছোট ঘরটাতে আছে প্রায় সাত আটজন ঠেসাঠেসি করে। ওদেরকে চারিয়ে দেয়া যাক এখানে-ওখানে। অনায়াসে। একটু কুকুর-কুণ্ডলী হবার মত জায়গা পেলেই ওদের রাত-কাবার। কষ্ট হবে তোমাদের, কিন্তু অনুপায়। না, কষ্ট কি, যখন আমাদের নিজের লোক, যে ভাবে পারি মাথায় করে

রাখব। হ্যাঁ, টাকা নাও, খাটিয়া, কিছু বিছানার সাজপাট, একটা লণ্ঠন। দোকান বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আজকের রাতের মত চালিয়ে নিতে হবে চেয়ে চিন্তে। ভাবনা নেই, অসুবিধে হবে না। সাহায্য যখন দিয়েছেন তখন আমরাও সেবা দেব সাধ্যমত। হ্যাঁ কদিন কে আছি ঠিক কি। কিন্তু যতদিন আছি থাকব তোমাদের পাশে পাশে চলব একজোটে। আর আমাদের বাসাবদল নেই। হ্যাঁ, টাকা নাও, যারা-যারা ঘর ছাড়ছ—ঘর ছাড়ার টাকা।

দুজনে খেয়ে নিল একসঙ্গে, মেঝের উপর বসে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় বিমুখ মনের মীমাংসা খুঁজল। একটু বা তরল হাসি, একটু বা লঘু পরিহাস, একটু বা সন্ন্যাস-সংসারের স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। চোরাবালির উপর দিয়ে সতর্ক হয়ে হাঁটা। যেন কেউ কারু মতামতের গভীরতায় না পা ফেলে। প্রতি মুহূর্তে গা বাঁচিয়ে চলা। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

মধ্যরাত্রে গোপন সভা বসবে। এই বস্তিরই অভ্যন্তরে। দলের চাঁই দু-তিনজন থাকবে, থাকবে শ্রমিকদের মাথালরা কেউ কেউ। সভা বসবে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে। কাল থেকেই সুরু করে দাও ধর্ম্মঘট।

'পাশের ঘরে তোমার জায়গা হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়। আমার সঙ্গে যখন এসেছ, তখন ভাল করে বোঝো কোথায় আসতে হয়েছে সত্যি, আরো কতদূর বা যেতে হতে পারে শেষ পর্যন্ত। সকালে উঠে যদি দেখি তুমি পালিয়ে গেছ, আশ্চর্য হবনা—'

'যাচ্ছেন কোথায় আপনি?'

'একটা মিটিং আছে। বেশিদূর নয়। এই বস্তীর মধ্যেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম যাও।'

মুখের কথায়ই কি ঘুম আসে? শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল কি করে অধিপকে ফেরানো যায় এই সর্বনাশের নিষ্ফলতা থেকে। শক্তির অপপ্রয়োগকে কি করে নিবারণ করা যায়। তার উপচিত পৌরুষকে কি করে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করা যায়। অধিপের হাতেই যেন তার ভার, যেন তার হাতে অধিপের ভার নয়! যেন সেই অধিপের সঙ্গ নিয়েছে, অধিপকে সে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি! মনে মনে হাসল বোধহয় তামসী। দেখা যাক কার ব্যক্তিত্বের জোর বেশি। কার দিকে দাবির প্রবলতা। আর ফিরে যাওয়া নয়। প্রতীক্ষার পরীক্ষা দেব নিঃশব্দে। জয় করব। আগুনে তাতিয়ে, বেঁকিয়ে আনব কঠিন লোহা। বেঁকিয়ে আনব নিজের দিকে। ভবিষ্যতের দিকে।

সভা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে এসে অধিপ অবাক হয়ে গেল। তামসী তার নির্ধারিত পাশের ঘরে শুতে যায়নি। অধিপেরই খাটিয়ার উপর কুঞ্চিত-কুণ্ঠিত হয়ে শুয়ে আছে। এককোণে ভাঙা চেয়ারের উপর লণ্ঠনটা জ্বলছে মিটিমিটি।

ব্যাপার কি?

পাশের ঘরে গাদাগাদি করে তেমনি শুয়ে আছে ভাড়াটেরা। রাত অনেক, তবু অধিপ জাগাল একজনকে। সে বললে, তামসীই নাকি তাদেরকে ঘর ছাড়তে দেয়নি। একজনের লাভের জন্যে আটজনের বঞ্চনা এ নীতির সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু টাকা? তাদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল খেসারৎ বাবদ? তামসী বলেছে সে টাকা তাদেরই থাকবে। কেননা তারা তো ছেড়েই দিয়েছিল, তামসীই আবার তাদের পুনর্দখল দিয়েছে—লেনদেনে তাদের কোনো ত্রুটি নেই। তাঁকে যদি রাজি করাতে পারেন এখনো তারা প্রস্তুত।

ঘরে ফিরে এসে নিভুর্ল হাতে দরজা বন্ধ করলে অধিপ। আলোর শিখটা একটু উঁচু করলে। মুহূর্তে চোখে যেন ঘোর লাগল। এরই মধ্যে, যতদূর সাধ্য, নোংরা ঘুচিয়ে ঘরের সে চেহারা ফিরিয়েছে। নতুন খাটিয়াটা দূরে এককোণে পেতে রেখেছে, অন্ত শিয়রে। বিছানার বেশি অংশটা ওখানে বিস্তারিত করেছে। যত্ন ও পারিপাট্য দেখলে ভেবে নিতে দেরি হয় না ওটা অধিপের জন্মে। যেন অমনি দড়ির খাটে, কঠিন রিক্ততার মধ্যে, শোয়ার কত কালের অভ্যাস তামসীর। যাই বলো, আশ্চর্য দুঃসাহস বলতে হবে, অধিপের নিজেরই ভয় করে উঠল। ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্ন একটু বা ঘৃণা, অনুকম্পা। হাতের নাগালের মধ্যে আলোটা রেখে দিয়েছে কেন? চরম ভয়ের মুহূর্তে জেগে উঠে আলোর কাছে ত্রাণ ভিক্ষা করবে? এখনো কি তার জেগে ওঠবার সময় হয়নি? এখনো কি লগ্ন আসেনি ভয় পাবার?

দরজা বন্ধ। আলো জ্বলছে নিশ্চিন্ত নির্লজ্জতায়। অধিপ নিস্পন্দ চোখে দাঁড়িয়ে। তবু অনাহত শান্তিতে ঘুমুচ্ছে তামসী। সে শান্তিতে যেন অনেক শক্তি, অনেক উপেক্ষা, অনেক প্রত্যাহার। সে-নিঃশব্দতায় সে-নিশ্চলতায় পুঞ্জীকৃত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। জ্বালা করে উঠল অধিপের। আলোর শিখাটা অতি সন্তর্পণে আস্তে-আস্তে ডুবিয়ে দিতে লাগল।

তবু এতটুকু নড়লনা তামসী। অঞ্চলের পাড় কাঁপলনা এতটুকু। লণ্ঠনের পলতেটা নামাতে-নামাতে অধিপ থামল এক পলক। অস্পষ্ট আলোকে তামসীকে হঠাৎ কি-রকম অদ্ভুত মনে হল। মনে হল কত পরিচিত অথচ কত দূরদেশী। কত কঠিন অথচ কত অসহায়। অন্তরে গভীর বেদনা থাকলে যেমন সৌন্দর্যময় শিল্প-সৃষ্টির সম্ভব হয়, তেমনি তার মুখের এই শান্তি এই সৌন্দর্য এই শিল্পসৃষ্টি যেন কোন গভীর বেদনার প্রতিচ্ছবি। আসলে সে হয়তো বিপ্লবিনী নয়, সে পুরুষকাব্যলোকের চিরন্তনী বিরহিনী।

না, থাক, আর কমাতে হবে না আলো। এমনিই ছিল। হ্যাঁ, এইটুকু, এই পর্যন্ত। স্থির পায়ে অধিপ এখন যাক তার নিজের খাটিয়ায়। হঠাৎ উলটো মুখ হতেই সামনের দেয়ালে অস্পষ্ট ছায়া নড়ে উঠল। চমকে উঠল অধিপ। না, ও তার নিজের ছায়া। নিজের অন্তরের ছায়া।

নিজের খাটিয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল অধিপ। মৃত্যু ছাড়া অভাবনীয় কিছু নেই এমনি শান্তিময় অনুভূতিতে নিজেকে শিথিল করে দিতে চাইল। কিন্তু কি অসম্ভব মশা! মেয়েটা তবু স্পন্দনহীনের মত পড়ে আছে কি করে? একটা মোটা চাদর দিয়েও আপাদমস্তক আবৃত করেনি। পায়ের খানিকটা হাতের অনেকখানি মুখ আর গলা আঢাকা। তবে কি ও জেগে আছে? আসন্নবিকাশলজ্জায় মুদ্রিত করে আছে চক্ষু? না, দেহানুভূতিহীন হয়ে শবসাধনা করছে মনে-মনে?

শয্যারচনা যে করেছে সে পায়ের নীচে চাদর রেখে দিয়েছে ভাঁজ করে। যেন তার নিজের চেয়ে অধিপের প্রয়োজন বেশি। ভব্যতা ভদ্রতা দূরে যাক, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিল অধিপ। তারই প্রয়োজন বেশি, আত্মরক্ষার প্রয়োজন। শুধু মশার থেকে নয়, লণ্ঠনের আলোর ঐ ক্ষীণ হাতছানি থেকে। অন্ধকারে, নিজের মনের দেহের চেতনার অন্ধকারে, খুঁজে পাক সে নিষ্ঠুর অব্যাহতি, প্রশান্ত বিস্মরণ।

কিন্তু ঘুম না এলে নিস্তার কোথায়?

অসহ্য, এমন জনের সঙ্গে তার মনের মিল হবে না? পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে যে চলে এল সে হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে না? যে একদিন দূরে চলে গিয়ে জীবনে মহান অর্থ এনে দিয়েছিল, সে আজ বন্ধ ঘরে হাতের নাগালের মধ্যে এসে জীবন অর্থহীন করে দেবে? জীবনের নির্জনতায় একান্তচারী হয়ে পরিব্রাজন

করতে করতে পেয়ে গেল তো পথসঙ্গিনী, কিন্তু হায়, সঙ্গ আছে তো পথ নেই, পথ আছে তো সঙ্গশূন্য। কত সমস্যা তার সামনে, কত সংকল্প। সকলের চেয়ে এই সমস্যাটাই তার কাছে এখন বড় হয়ে উঠল? কি করে একসঙ্গে এক পথে চলে যেতে পারে তারা। কি করে, যেমন প্রথম দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা, তেমনি পৌঁছুতে পারে শেষ দরজায়। কি করে ভিন্নপন্থীকে ব্যক্তিত্ববলে বশীভূত করে নিয়ে আসতে পারে নিজ শিবিরে। রক্তে আন্দোলিত হতে লাগল অধিপ। মতের ঐ ঔদ্ধত্যকে অধীনীকৃত করা যায় না? চূর্ণ করে দেয়া যায়না মনের ঐ বিরুদ্ধতা? সব বাধা-বন্ধন দূর করে এক সমতলে একবাহী জলের প্রবলতায় মিলতে পারেনা তারা? এক রণ এক পথ এক পতাকা?

কিন্তু ও পক্ষ থেকে এতটুকু ইঙ্গিত নেই কেন? অধিপ যখন দরজা বন্ধ করল তখন হাত বাড়িয়ে আলোটা ডুবিয়ে নিবিয়ে দিলনা কেন তামসী?

আজকেই কিনা তার এত ভয়, এত স্পর্শসংকোচ। আজই কিনা তার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা। হ্যাঁ, সে জানে জীবনের আগের পরিচ্ছেদ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। তা ছাড়া এ তো আকস্মিকা ক্ষণজীবিনী নয়, এ যে তার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী। সেই থাকবে দূর হয়ে, পর হয়ে, পৃথক হয়ে? সে যে এক ডাকে চলে এসেছে, নেমে এসেছে এক ধাপে—এই কি যথেষ্ট ইঙ্গিত নয়?

চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়ল অধিপ। আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল আলোর দিকে। আলোর শিখাটা আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে দিল।

সুন্দর ঘুমিয়ে আছে তামসী। কোথায় শুয়ে আছে, মশা কামড়াচ্ছে কিনা, এ রাত ভোর হলে কোথায় যাবে কোন লক্ষ্য নেই, জিজ্ঞাসা নেই। লক্ষ্য নেই, মধ্যরাত্রে শয্যা থেকে উঠে এসে আলো জ্বালিয়ে কেউ তাকে ব্যাকুল চোখে দেখছে কিনা। মুখের লাবণ্যটি যেন সুখস্বপ্নমালা। যেন স্নিগ্ধ বিশ্বাস ও সহজ উৎসর্গের ভঙ্গিতে সমর্পিত। রসোৎসুকা রাগলেখা। কোমলা কামলতিকা। হৃদয়ে তুলে ধরলেই যেন ঘুচে যাবে সব অসাম্য, মুছে যাবে সব ব্যবধান। যে হৃদয়সংস্থিতা ভাগ্যদোষে সে বহির্বর্তিনি হয়ে পড়ে আছে। বাহু বাড়িয়ে বুকের উপর তুলে নিলেই হয়। কোথায় তখন আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কোথায় বা তখন বিচ্ছেদবিরোধ।

সেই আর্ত, অন্ধ মুহূর্তে ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করল অধিপ। ভগবান, বল দাও, বীর্য দাও, বীরকে ব্রতভ্রষ্ট কোরো না। যে কাজ হাতে দিয়েছ, যে মহান আত্মোৎসর্গের কাজ, তার সাফল্য না দাও, তার শুচিতাটুকু রক্ষা কর। আমার আদর্শ যদি বড় করেছ, আমাকেও বড় কর। স্বাদ চাইনা, স্নেহ চাইনা, চাইনা স্বর্গরাজ্য—আমাকে নিরিন্দ্রিয় কর। ত্যাগ করতে শেখাও—চরম ফলত্যাগ। যোগ্য কর, যুদ্ধের জন্যে যোগ্য কর। বল দাও সবার আগে নিজেকে বশীভূত করার। আমার বল থেকে তামসীও বল পাক। পাক দুর্নিবার দুঃসাহস। তার আদর্শের প্রতি অনুরক্তি। তাকেও তুমি ছোট কোরো না, অপমানিত কোরোনা। আমাকে মুক্তি দিয়ে তাকে দাও স্বাধীনতা।

অধিপ নিজের বিছানার থেকে চাদরটা কুড়িয়ে আনলে। আলগোছে, করুণাধারার মত, তামসীর গায়ের উপর ঢেলে দিলে। আলোটা আগের মত এখন কমিয়ে দিক। শুতে যাক তার নিজের খাটিয়ায়।

এ কি, আলোটা যে সম্পূর্ণ নিবিয়ে ফেলল অধিপ। এ কি!

চেরা বাঁশের সংকীর্ণ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে টর্চের আলো এসে পড়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ভীত কণ্ঠের অস্ফুট ডাক: 'অধিপদা, অধিপদা।'

ধড়মড় করে উঠে বসল তামসী। তার গায়ে চাদর, সামনে অধিপের ছায়া, ঘরের আলো নেবা, টর্চের এক ঝলক হলদে আলো দেয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে। একি অঘটন!

'কে?' অধিপ নির্ভয়স্বরে প্রশ্ন করলে।

'আমি।' স্বর শুনে চিনল তাদের দলের একজন পুরোনো যুবক।

তামসীকে বললে, 'আমাদেরই দলের লোক। বাইরে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপার কি। তুমি ততক্ষণ আলোটা জ্বালাও।' জামা খুঁজে দিয়াশলাই বের করে দিল।

তামসী আলো জ্বালাল না। কান খাড়া করে রইল।

'অধিপদা, আজকের রাতের মত এখানে একজনের আশ্রয় হবে?'

কেন? ব্যাপার কি?

ব্যাপার শুভ। জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে ফের যোগ দিতে চায়।

জেল থেকে পালিয়ে এসেছে! জেল হয়েছিল কেন?

জেল হয়েছিল অবিশ্যি চুরির জন্যে। তা হোক। যখন ফিরে আসতে চায় তখন তাকে নিশ্চয় ডেকে নেব।

'না, তা বোলো না। লোক খাঁটি কিনা দেখতে হবে। চোর যদি জেল থেকে পালায় তবুও তাকে সেই চোর বলব। লোকটা কে? চিনি?'

চেন বৈকি। আমাদের পুরোনো বন্ধু। রণধীর।

'রণধীর?' একমুহূর্ত্ত শুব্ধ হয়ে রইল অধিপ। যেন যথাযথ কঠিন হবার জন্যে। বললে, 'বিশ্বাস করিনা পালিয়ে এসেছে জেল থেকে। কেন, কিসের জন্যে পালাবে? মেয়াদ ফুরিয়েছে, ছাড়া পেয়েছে। ওকে জাননা তুমি, ও তো শুধু চোর নয়, ও মিথ্যাবাদী।'

'তা হোক। তবু যখন আসতে চায় আমাদের দলে—'

'না।' প্রায় গর্জে উঠল অধিপ: 'আমরা দল বুঝিনা আমরা ব্যক্তি বুঝি।'

একি, সে কি আর কারু কথা বলছে? সেই কথাটা কি এখনো গেঁথে আছে তার বুকের মধ্যে? আর তারই জন্যে সে কি খাঁটি হতে চেয়েছিল, চেয়েছিল অগ্নিশুদ্ধ হতে?

'পতাকা বুঝিনা, পতাকা বহনে মুষ্টির দৃঢ়তা বুঝি।' বলে চলল অধিপ: 'ফল বুঝিনা, উদ্দেশ্য বুঝিনা, বুঝি যুদ্ধ বুঝি অভিযান।'

'আজকের যুদ্ধে কেউ অযোগ্য নেই অধিপদা—'

নিশ্চয়ই আছে। যে চরিত্রহীন এ যজ্ঞে তার সমিধ হবার অধিকার নেই। আজকে দরকার বিশুদ্ধ ঘৃতের, আহুতি যাতে আকাশস্পর্শী হতে পারে।

কিন্তু এ পাবক তো পতিতপাবন। তাই না? যে মুক্তির জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি তা পাপের থেকে মিথ্যার থেকে লজ্জার থেকে—সমস্ত কিছুর আকর ঘোরতর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি।

'কিন্তু রণধীরকে তুমি চেননা। যার চরিত্র নেই তার নীতি নেই আদর্শ নেই। এমন কুকাজ নেই যে করতে পারেনা। তুমি একটা ধর্মঘট বাধালে, ও হয়তো টাকা খেয়ে তাই ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা দেখতে লাগল। হয়তো হয়ে বসল পুলিশের স্পাই, মালিকের ঠিকাদার। ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পারনা।'

'যাই বলো, বড্ড বিপন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। চাল নেই চুলো নেই—মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় নেই। একটা আতঙ্ক পিছু নিয়েছে চোখের দৃষ্টিতে সেই আতঙ্ক আঁকা। কতদিন না জানি খেতে পায়নি। ওকে যদি আমরা না দেখি না ডাকি—'

'টাকা চাও তো টাকা দিতে পারি।'

'টাকা কিছু আমি দিয়েছি। খাইয়ে দিয়েছি লুকিয়ে। কিন্তু আজকে ওর সবচেয়ে প্রয়োজন আশ্রয়। একটা নিঃসন্দেহ ভদ্র আশ্রয়।'

'ওর পক্ষে যেটা ভদ্র সেটা ভদ্রলোকের পক্ষে নিঃসন্দেহ নয়। আর কোনো বস্তি-টস্তিতে ঢুকিয়ে দাও গে।'

'সত্যি কথা বলতে, আজকে ওর সবচেয়ে বেশী দরকার তোমার সান্নিধ্য, তোমার সাহচর্য। যাতে ওর সংশোধন হতে পারে। যাতে ও চিনতে পারে বিপ্লবকে। বুঝতে পারে কাকে বলে আদর্শ, কাকে বলে আত্মদান। তাই আমাদের ইচ্ছা ওকে তোমার জিম্মায় রেখে যাই। তুমি ওকে যোগ্য কর, যোদ্ধা কর—'

'অসম্ভব।' সমস্ত শরীরে প্রতিবাদ করে উঠল অধিপ: 'এখানে জায়গা কোথায়?'

'তোমার ঘরের এককোণে মাটির উপর ও পড়ে থাকবে। তোমার সংস্পর্শে এসে ও আবার খুঁজে পাবে ওর নিজের প্রতিশ্রুতি। ও আবার নতুন হয়ে উঠবে। তুমিই ওকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, চালিয়ে নিতে পারবে, হয়তো বা ওরই মুঠোতে তুলে দেবে তোমার পতাকা। ও চোর, ও চরিত্রহীন, কিন্তু যে যাই বলুক, তুমি তো জানবে, ওরও মুক্তি চাই, চাই পুনর্জীবন। মোড়ের মাথায় ও দাঁড়িয়ে আছে গা-ঢাকা দিয়ে। তোমার কাছে সরাসরি এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। যদি বলো তো ডেকে আনি। এই তো দু-পা—'

'অসম্ভব।' দৃঢ় গাম্ভীর্যে কঠিন হয়ে গেল অধিপ: 'আমার ঘরে একজন ভদ্রমহিলা আছেন।'

ভদ্রমহিলা?

'হ্যাঁ, আমাদেরই দলের একজন। সেনানায়িকা। চণ্ডনায়িকা বলতে পারো। তাঁর ধারে-কাছে ঐ পাপাত্মার স্থান নেই। সাধ্য নেই বুঝতে পারে তাঁর মহিমা। ঠিক ভুল বুঝে বসবে—'

কেন, ভুল বুঝবে কেন?

ও আগে জানত তো আমাকে। জানত পাপাশ্রয়ী বলে। একদিন দেখা করতে এসেছিল, নিরাশ নিরুদ্যমের মত অন্ধকার ঘরে বসে মদ খাচ্ছিলাম। আমার অখ্যাতির সঙ্গে আমাকে সেদিনও সমান অপরিচ্ছন্ন করে দেখেছিল, একটুও আশ্চর্য হয়নি। আজকেও আমাকে এই অবস্থায় দেখে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবে না। ভাববে বস্তির আড়ালে ভদ্র মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করছি। বিপ্লবের নামে করছি মোহান্তগিরি।

'কি করে জানবে ও, এর মধ্যে কী ভাবে বদলে গিয়েছি আমি, উদ্ধার পেয়ে গেছি। ও হয়তো ভাববে ওরই মত কেবল ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি অতলে—' অধিপ একটু পায়চারি করে নিল।

কিন্তু ওকেও তো বদলে দেওয়া দরকার। ওরও তো উদ্ধার চাই। ওকেও তো দিতে হবে সেই অধিকার।

'রক্ষে করো।' ঘৃণায় অধিপের কণ্ঠস্বর আরো তিক্ত হয়ে উঠল: 'ওকে আশ্রয় দিয়ে একজন ভদ্রমহিলার সম্মান বিপন্ন করতে পারিনা। ওর নামহীন ভবিষ্যতের চেয়ে ভদ্রমহিলার সুনাম সম্ভ্রম অনেক মূল্যবান।'

'তবে—আজকের রাতটা—'

আরো কটুস্বাদ করল কথার অর্থ। অধিপ গলা নামাল। 'টাকা দিচ্ছি, ওর পছন্দমত একটা বস্তি-টস্তি খুঁজে নিতে বলো গে। ছুটোছাটা দু-একটা পেয়েও যেতে পারে বা। তাতে লজ্জা নেই, নজিরেরও অভাব হবে না। এমনি অনেক ফেরারী আর দাগী জেলঘুঘুকে ওরা আশ্রয় দিয়েছে। অভাজন জনগণের সেবা করে বলেই তো ওরা গণতোষিণী।'

ভগবান, বল দাও, বীর্য দাও, দাও পুরুষকার। দাও দুরতিদলনের তেজস্বিতা। কঠিন না হলে তোমার বর্ম গায়ে আঁটব কি করে, হাতে কি করে ধরব তোমার বৈজয়ন্তী? কাঁচা মাটির কলসী বুকে ধরে কি নদী পার হওয়া যায়? মাটিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে পাকা কর, কঠিন কর, কলসীকে জলশূন্য, জীবনকে লোভশূন্য কর। নইলে নদী, এই ভরা কোটালের নদী, পার হব কি করে?

আগন্তুককে বিদায় দিয়ে অধিপ একা ফিরতে লাগল ঘরের দিকে।

যা অক্লেশলভ্য তার দিকে প্রধাবিত কোরোনা। গম্যস্থল যদি বহুদূরবর্তী হয়, তবু পথচ্যুত কোরোনা। অসিচর্যার মাঝে যদি সহকারিণী পাঠিয়েছ তবে অসিধারাব্রত যাপনের ব্রহ্মচর্য দাও। আমাদের দেশকে বড় কর।

ঘরে এসে দেখল ঘর অন্ধকার। তামসী তখনও আলো জ্বালায়নি। অনড় আড়ষ্টের মত বসে আছে বিছানায়। কতক্ষণ পর-পর দেশলাইর বাক্সের গায়ে ঘসে-ঘসে একটা করে কাঠি জ্বালাচ্ছে, আবার নিবিয়ে দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে মেঝের উপর।

সাইত্রিশ

কারখানার কুলিরা পরদিন সকাল থেকেই ধর্মঘট করলে।

রাত্রির নির্জনে তপস্যা করে ভোরের শিশিরে অম্লান ফুল-ফোটার মত দেখাচ্ছে এখন অধিপের পরিতৃপ্তিকে। শুধু জয় নয়, গর্ব, আত্মশ্লাঘা।

বললে, 'এখান থেকে এবার আমি চলে যাব পশ্চিমে। পাটনা নয় কাশী। তুমি যাবেতো আমার সঙ্গে?'

তবু এততেও যেন ইচ্ছা, তামসী সায় দেয়। যে যন্ত্রণা বুক থেকে নেমে গেছে আবার তাকে সাধ করে তুলে নেয় বুকের উপর।

তামসী চোখ নামাল। বললে, 'না। আমি এইখানেই থাকব।'

'এইখানে থাকবে? মানে এই বস্তিতে?'

'হ্যাঁ, এইখানে যখন এসে উঠলাম, এইখানেই আমার বাসা। মন্দ কি। আমিও বৃত্ত সম্পূর্ণ করলাম এত দিনে।'

'তোমার এখানে কি কাজ?' চঞ্চল হয়ে উঠল অধিপ।

'আপনারই বা কি কাজ এখান থেকে চলে যাওয়ায়?' তামসী কথার সুরে একটু ঠেস দিল।

'আমার যা কাজ সব আজকের কাজ। আজকের গরম লোহাকে আজকের শক্ত হাতুড়ি

দিয়ে আঘাত করা। হাতের কাছে আজকের যেটুকু কর্তব্য তাই সহজ মনে সম্পন্ন করা, চোখের কাছে আজকের যেটুকু প্রলোভন তাই নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করা—'

'কিন্তু আমার কাজটা আগামী কালের।' তামসী সরলভাবে হেসে কথাটাকে স্বচ্ছ করলে: 'এই ধর্মঘটীদের বোঝানো, শেখানো—কেন তাদের এই ধর্মঘট, কার স্বার্থে, কোন উপস্বত্বের দাবিতে? যদি পারি তো এই ধর্মঘটটা ভেঙে দেব।'

হৃৎপিণ্ড বোধ করি একটা তাল ভুল করল। রক্তে যেন কি বিষ ঢেলে দিলে। বাঁ চোখের কোণটা কুঞ্চিত করে স্বরে বক্রতা আনলে। বললে, 'একা পারবে? সৈনিক সংগ্রহ করবে না?'

তামসী ধৈর্য হারাল না। বললে, 'নিশ্চয়, সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে বৈ কি। আপনাদের মত সৌখীন সৈন্য নয়, বাপের কাছে হাত পেতে যা সহজে পাওয়া যায় তা পিস্তল দেখিয়ে ছিনিয়ে নেবার সৌখীনতা—এ সৈন্য সত্যিকারের বীর, সত্যিকারের বিদ্রোহী। ভদ্রজীবন থেকে এরা বঞ্চিত, ভদ্র আদর্শ থেকে প্রত্যাখ্যাত। এরা আসছে নর্দমা থেকে, আঁস্তাকুড় থেকে, শ্মশানকুণ্ড থেকে—'

'থাকো তোমার ওসব ভূতপ্রেত প্রমথ-মন্মথদের নিয়ে। আমি চলি।' অধিপ তার জিনিস গুটোতে লাগল।

'এ একেবারে পালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি!' কথার সুরটাকে বাঁকা করলে তামসী।

'পালিয়ে যাচ্ছি? আমি?'

'আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তা বলছি না। পালিয়ে যাচ্ছেন বাস্তবতা থেকে। আর যেটা বাস্তবতা সেটাই যুদ্ধক্ষেত্র।'

কী অসম আস্পর্ধা মেয়েটার! কি বোঝে, কী বলে! অধিপের ইচ্ছে হল সবলে ওর মুখ চেপে ধরে। দিনের আলো-কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে সেই রাতের পাথুরে অন্ধকার।

'মিথ্যে কথা।' গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল অধিপ। 'পালিয়ে যাচ্ছ তুমি। চোখে আবার তোমার নতুন অঞ্জন লেগেছে—নীলাঞ্জন নয়, জ্ঞানাঞ্জন। চরম জ্ঞানোদয় হোক তোমার এই আশীর্বাদ করি।'

'কারু আশীর্বাদ আমি চাইনা। টাকা চাই।' তামসী হাত পাতল। 'ডাকাতির লাভে আমারও নিশ্চয় কিছু অংশ আছে।' তামসী জানে রিক্ততার কী কষ্ট, কী লজ্জা!

সামান্য কিছু টাকা অনুকম্পার ভাব থেকে যেন অস্পৃশ্যের হাতে ফেলে দিলে অধিপ। বললে, 'তবু এইটুকু শুভকামনা জানাই যেন সত্যি সত্যিই পালাতে পার সেই পাপ থেকে। যে পালাতে জানে সেই হয়তো জেতে। জানিনা।'

'আপনার উপদেশ মনে থাকবে।'

'আমার সঙ্গে যে আসতে চাওনি ভালই করেছ। রাত্রির নির্জনতায় জর্জর হবার আমার সময় নেই। বুঝলে তামসী, সংসারে কিছুই টেঁকেনা—খ্যাতি না, জনপ্রিয়তা না, প্রেম না, কামনা না, একমাত্র থাকে শুধু চরিত্র। সংগ্রামের অনম্যতা। তোমার আদর্শের জন্যে নির্মম ও নিরন্তর যুদ্ধ করে যাও। চরিত্রবতী হও। চরিত্রবান সৈনিক সংগ্রহ কর। আমরা মুক্তির জন্যে লড়ছি, তোমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়। আমরা আগে শাদাসাহেব তাড়াই তোমরা কালাসাহেব তাড়াও।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল অধিপ।

'আমি আর হয়ত ফিরব না। তবু এই যে আমি না-ফেরার দলে ফিরে গেলাম এ শুধু তোমার দৌলতে। টাকা কম দিয়েছি? যাতে তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যেতে পার তার জন্যে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।'

রিকশাতে চড়ে বেরিয়ে গেল অধিপ।

তামসী এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে ফিরে এল ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে এসেও এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। পাপ? সে কি পাপের থেকে পালাচ্ছে?

আচ্ছা, কে সৃষ্টি করল এ পাপ? মানুষ? কী দুরপনেয় পাপ, মানুষ সৃষ্টি করা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারে না। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই পাপ সৃষ্টি করেছেন। এক হাতে যিনি প্রেম সৃষ্টি করেছেন, আরেক হাতে তিনিই পাপ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতি যাঁর এত সুন্দর এত মহিমাময় তাঁরই কল্পনায় পাপের এই বীভৎসতা কেন? একসঙ্গে দুজনকেই তিনি ভালবাসাতে পারেন না কেন? একদিকে অশ্রু রেখে কেন আরেকদিকে রাখেন অপমান আর অবহেলা? এক হৃদয়ে প্রেমের পথ ফুটিয়ে আরেক হৃদয়ে কেন তিনি হলাহল ঢালেন? অনেকদিন ভেবেছে তামসী। বই পড়েছে। মনে হয়েছে ঈশ্বর সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু এই পাপ এই কদর্যতাও তাঁরই সৃষ্টি। পাপ তিনি সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু স্পর্শ করছেন না, বেষ্টিত আছেন বটে, কিন্তু লিপ্ত হচ্ছেন না। অস্থির করে উঠল তামসীর। পাপ না ছুঁলে পাপীকে উদ্ধার করব কি করে? গলিত ঘায়ে হাত না দিলে তাকে নিরাময় করব কি করে?

আগে সেই নির্বিকল্প শক্তিকে ভাগ্য বলেছে, এখন বলছে ভগবান। অন্ধ নয়, অতন্দ্র। ইচ্ছাহীন নয়, ইচ্ছাময়। বলতে অন্তত ভাল লাগছে বলে বলছে। নইলে অধিপের সঙ্গে এক বাক্যে এক বস্ত্রে সে চলে এল কি করে? সে কি ভাগ্যের হাত ধরে না ভগবানের হাত ধরে? চলে এল অথচ পথের মমতা পেল না। কী আশ্চর্য অমিল এসে গেল তাদের মধ্যে, কী সুন্দর অন্তরাল। এক দিকে নিরোধ অন্য দিকে নিবারণ। গহ্বরের প্রান্ত থেকে ভগবান রক্ষা করলেন, শূন্যতল শক্ত মাটি হয়ে উঠল। একজনকে দিলেন বীর্য, আরেকজনকে শক্তি। অনেক আশ্রয় তামসী হারিয়েছে জীবনে, কিন্তু এক আশ্রয় তার যায়নি। সে তার শুচিতার আশ্রয়। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু ধ্রুবতারাকে এখনো যেন ঠিক চেনা যায়। আশা নেই কিন্তু একটি সাহস আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।

ভাগ্য দোষদর্শী। ভগবান সহিষ্ণু।

তামসী বাসা বদলাল, কিন্তু লক্ষ্য ছাড়ল না। কাছেই একটা বাঙালী বস্তিতে আলাদা ঘর নিল, যেখানে পরিবার নিয়ে আছে এখনো কেউ-কেউ। এত দুঃস্থ-নিম্ন তারা যে তামসীর এই নিঃসঙ্গবাসকেও সন্দেহের চোখে দেখবার মত সচেষ্ট নয়। সকলের সঙ্গে ভাব করলে তামসী, সবাইকে কাছে টানলে। কিন্তু শুধু লক্ষ্য নিয়ে বসে থাকলে তো চলবেনা, কাজ করতে হবে। এমন কাজ যাতে জীবন স্বচ্ছ হবে, বহনযোগ্য হবে। সে আবার কী কাজ! পতিতোত্থানের কাজ। উদ্ধার নয়, উত্থান। করুণা নয়, শ্রদ্ধা। দরিদ্রনারায়ণ নয়, দরিদ্রনরসিংহ।

কিসের জন্যে তোমরা ধর্মঘট করে আছ? কোন প্রলোভনে? শাদার বদলে হলদে, না

হলদের বদলে শাদা—তাতে তোমাদের কি? তোমরা তো সেই যে-কে-সে। হাত না বদলিয়ে এবার জাত বদলাবার যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর নিজের জন্যে, সকলের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। যে লাঙল চালায় তার জমি, যে কল চালায় তার মুনফা। এজমালি পৃথিবীতে সকলে সমান সরিক, সকলের সমান দখল। কতকের জন্যে অনেকে নয়, অনেকের জন্যে কতক নয়, সকলের জন্যে সকলে।

নিজের দিকে তাকাও। নিচের দিকে তাকাও। নিজের নিশান নাও। নীচের নিশান উঁচু করে তুলে ধর। পরের গায়ের রঙিন জামার চেয়ে তোমার নিজের গায়ের চামড়ার দাম বেশি।

শুধু মুখের কথা বললেই তো হবে না, কাজ করো এসে। অপজাত-অধোগতদের মধ্যে কাজ কর। দলের ঝোঁক ডাকে তামসীকে, বলে দলে চলে এসো। ভিড় বাড়াও। ভিড় ছাড়া কাজ করবে কি করে? এ তো একার কাজ নয়, বহুজনের কাজ। এক হাতে তো হাতী ঠেলা যায়না। দল দরকার, দলবল দরকার। বহু হাত লাগাতে হবে একসঙ্গে। পাথরও যে জগদ্দলন।

থমকে থেমে দাঁড়ায় তামসী। দল? দল তো উপরদিকের কয়েকজনের উপকারের জন্যে নিচের দিকের অনেক জনের উন্মত্ততা। শেষে দলকেই মনে হয় দেশ, বহুকেই মনে হয় বেশি। যা আমাকে ধারণ করে তা নয়, যা ধরে থাকি তাকেই মনে হয় ধর্ম। সেই ভুলে পা দেবেনা তামসী। জনতার মধ্যে গিয়ে সে তার নিজের নির্জনতাকে হারাবেনা। নিজের আধ্যাত্মিকতাকে।

প্রায় সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় তামসী। এখানে-ওখানে অলিতে-গলিতে, অপথে-বিপথে একজন অধঃপতিতকে সন্ধান করে। মনে হয় সেইখানেই বুঝি তার দেশ, সেইখানেই বুঝি তার ধর্ম। সেই প্রাপ্তির সমাপ্তিতেই বুঝি তার স্বাধীনতা।

চারদিকে রোষ-অসুস্থ মন শুধু ধ্বংসের কথা ভাবছে। ধ্বংসের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে দলে-দলে চলেছে প্রতিযোগিতা। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে, কাকে ধরে কাকে মারবে এই নিয়ে মারামারি। এরই মাঝে তামসী গঠনের স্বপ্ন দেখছে, নীড়নির্মাণের স্বপ্ন। নির্জনে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় তামসীর। তবু অবুঝের মত নির্লক্ষ্য পথে হাঁটে। সে গঠন করবে, নির্মাণ করবে। ভগ্নকে অভঙ্গ করবে। পতিতকে উত্তুঙ্গ। কলঙ্কিতকে বিজয়জ্যোতির্ময়।

যে যাই বলো, এই আমার কাজ।

সকলের থেকে চোখ সরিয়ে তামসী চুপি-চুপি তাকায় একবার আগাখাঁর প্রাসাদের দিকে। দেখে সেই দুর্বলকায় প্রবলতম বিদ্রোহীকে। শুধু ধ্বংসের কথাই ভাবেননি, ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে গঠনের কথা ভেবেছেন। এক হাতে ভেঙেছেন আরেক হাতে গড়েছেন, গড়ে দেখিয়েছেন কেমনটি আমার স্বপ্ন। একহাতে চক্র আরেক হাতে চরকা। একহাতে কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন আরেক হাতে বস্ত্র জোগাচ্ছেন দ্রৌপদীকে। শুধু ভাবনির্মাণ করেননি, লোক নির্মাণ করেছেন। লোকচক্ষুর মত লোক।

সেও তেমনি একজন লোক নির্মাণ করতে চায়। তার হাতে তপস্বীর ইন্দ্রজাল নেই, কিন্তু একতাল কাদা থেকে মূর্তি গড়ে যে ভাস্কর, আছে তার হাতের সেই সেবা আর স্নেহ আর স্বপ্ন।

দিনে দিনে আবার সেই কাঠি হয়ে পড়ছে তামসী। গায়ে চামড়ায় ছোপ পড়ছে কাগুজে বিবর্ণতার। চোখের কোল বসে গাল ভেঙে যাচ্ছে। গলা ঢিলে হয়ে আসছে, কোমর সংকুচিত।

সেই লাবণ্যউর্মিলা তামসী আর নেই। বেশে-বাসে নেই আর সেই ছন্দ-ছটা। পাঙক্তেয় থেকে চলে আসছে যে পরিত্যক্তের এলেকায়।

কেনই বা আসবেনা? অশন নেই বসন নেই, নেই সেই শারীরিক চারুচর্চা। সেই ললিত বিশ্রাম। সেই প্রগাঢ় উন্মীলন।

তবু তামসী সন্ধান ছাড়েনা। তবু সে প্রতীক্ষা করে। যদি কেউ পিছু নেয়। যদি কেউ এগিয়ে আসে অতর্কিতে।

"ওয়াকি"-তে চাকরি নেবে নাকি? কিংবা এ-আর-পিতে? কে জানে, চুরির দায়ে জেল হয়েছে খোঁজ পেলে হয়তো বা ঘাড়ধাক্কা দেবে। দরকার নেই। কিন্তু একটা তো কাজ দরকার, জীবিকার্জনের কাজ। উপবাসের উপকূলে বসে কতকাল আর মৃত্যুকে উপহাস করা যাবে?

এই বস্তিতেই কাজের সে হদিস পেল। সেলাইয়ের কাজ, বোনার কাজ। মহাজন সুতো দেয়, পশম দেয়, তারি থেকে নানান কছমের জামা করিয়ে নেয়। বোনার জন্যে মজুরি দেয় কাজ বুঝে।

সেলাই করতে বড় আনন্দ তামসীর। বিচ্ছিন্ন বিশৃংখল সুতো কেমন করে তার আঙুলের মায়ায় আঁট ও আস্ত জামা হয়ে ওঠে তাই দেখবার প্রতীক্ষায় সে শিহরিত হয়। কেমন করে মাটি পুড়িয়ে ইঁট, আর থাকে থাকে ইঁট সাজিয়ে কেমন অট্টালিকা।

সেলাইয়ের কাজ নিলে তামসী। যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সেলাই করে, বা বোনে। নির্মাণ করে। আর থেকে থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ক্যালেণ্ডারের দিকে।

ক্যালেণ্ডারে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ক্যালেণ্ডারে তারিখ বদলায়, মাস বদলায়, কিন্তু মহাত্মার মুখের হাসিটি ম্লান হয় না। বলে, বিশ্বাস কর, প্রতীক্ষা কর, সবার আগে প্রস্তুত কর নিজেকে।

মানুষে কী আশ্চর্য আস্থা মহাত্মার! সব মানুষই ভালো, পরিচ্ছন্ন, উর্ধ্ব দিকে আকৃষ্ট। যন্ত্রের চেয়েও বড় হচ্ছে মানুষ। যন্ত্রের দাস না হয়ে হবে সে যন্ত্রের দময়িতা, যন্ত্রের দণ্ডবিধাতা। যাতে যন্ত্রের ষড়যন্ত্রে মানুষ না স্বর্গচ্যুত হয়, যাতে যন্ত্রকে সে চালনা করতে পারে মানুষের মঙ্গলকরণে। যন্ত্রের চেয়েও বড় হচ্ছে জীবনমন্ত্র। বিশ্বাস করো মানুষের পুনরুজ্জীবনে। মানুষের ফিরে আসায়।

শুধু একজনই বোধহয় ফিরে আসবে না।

না-আসুক—একদিন জোর করে বলতে পারত তামসী। কত পাতা ঝরে যাবে গজাবে আবার কত পাতা—কি যায় আসে! শুধু খাঁটি রাখতে হবে মাটি, মাটির তেজোবল। দেবিকার কথাটা গাঁথা আছে মনের মধ্যে। একজন সে মাটির স্পর্শে পুনর্নবীন হয়েছে—সে অধিপ, সে অপ্রার্থিত। আর যে অন্তরের অন্তেবাসী তার কাছে এ-মাটি ধূলাবালি। এ মাটি অমেধ্য। যাকে সে বিপ্লবী করল তাকে সে চায় না; আর তারই জন্যে সে উদ্ধাবিত, যে স্থবির, বধির, পঙ্কমগ্ন। একি পরিহাস! একজনকে যদি সে ঘরছাড়া করতে পারে আরেকজনকে ঘরবাসী করতে পারেনা? তার সঞ্জীবনী মন্ত্র একের বেলায় ফলদায়ী হয়ে অন্যের বেলায় বন্ধ্য হবে? এক পথভ্রষ্টকে উদ্ধার করতে পারলে আরেক পথচ্যুতকে সে ত্রাণ করতে পারবে না? কে জানে? যে প্রত্যাখ্যাত হয় সেই হয়তো এগোয় আর যে অভীপ্সিত সে কোনোদিন ফেরে না। যে দেয় সে ফিরে পায়না, আর যে পায় সে দেয়না ফিরিয়ে।

'যদি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না, তবে অভিলষিত লাভ অনিবার্য।' প্রমথেশের সেই আশ্বাস-বাণী মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নিজের এই ছোট দরিদ্র ঘরটিকে বড় ভাল লাগল তামসীর। দড়ির খাট, দড়ির আলনা। দুটো মোড়া, চটের একটা আধশোয়া চেয়ার। কাঠের ছাড়া তাকের উপর গুটিকয় বই, কলাই-করা লোহার বাসন, থালা-বাটি-গ্লাস। কোণে সরা-ঢাকা জল-ভরতি কুঁজো। খাটিয়ার নিচে দড়ির পা-পোষ।

একটি একাকী ঘরের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তামসীর। সেই কবে থেকে, যৌবনের যখন প্রথম কলিকা-কাল। আত্মীয়ের মত একটি অন্তরঙ্গ ঘর। নির্জন, কিন্তু নির্বারিত। এর আগে আরো অনেক সে একা থাকার ঘর পেয়েছে। কিন্তু কোনোটাই এর মত তৃপ্তিতে ঘন, প্রতীক্ষায় পবিত্র নয়। এতো ঘর নয় এ তার হৃদয়ের তাপমণ্ডল।

ঘরের কিছু সংস্কার শোধন দরকার হবে। সস্তায় একটা পাশালো তক্তপোষ পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিনে নিলে হয়। বাড়িওলাকে বলে ভিতরের বারান্দায় খানিকটা যায়গা ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর করার দরকার। অন্য ঘর থেকে রান্না কিনে খাওয়া তার আর পোষাবে না। নিজের হাতে পঞ্চ ব্যঞ্জন সে রান্না করবে। ভাল খেতে পাচ্ছে না বলেই এমন হাল হয়েছে তার চেহারার। কাঠামোতে আবার সে মাংস লাগাবে, আবার আনবে সে পুরন্ত বয়সের চাকচিক্য। একখানা হাত-আয়না ছিল, হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে। যেদিন প্রথম সে আঁৎকে ওঠে মুখের কঠিন কুশ্রিতা দেখে। ভেঙে গিয়েছে তো যাক। এবার সে দাঁড়া-আয়না কিনবে।

ছি ছি ছি! শুধু গলায় দেবার জন্যেই দড়ি জোটে না?

সংসার জুড়ে সবাই বিদ্রোহ করছে। প্রত্যেকের এই বদ্ধস্রোত সংকীর্ণ-মলিন জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ভবিষ্যৎহীন বর্তমানের বিরুদ্ধে। ভবদেব, নারায়ণ—কল্যাণী, উষসী, সকলে। এমনকি মনসিজ পর্যন্ত। সেও তার ভঙ্গি বদলেছে, উচ্চারিত করেছে তার অসন্তোষ। জগৎ, তার দাদা, যে অগণিতের মধ্যে নগণ্য ছিল সেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পঙ্গু প্রমথেশও লাঠি ফেলে দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছেন। যে পুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাকে আবার ঠেলে দিলেন আগুনের মধ্যে।

শুধু রণধীরই মেনে নেবে এই বর্তমান? মসীলাঞ্ছিত জীবনের এই ঘৃণ্য অবমাননা? এর বিরুদ্ধে সে জাগবেনা, যুঝবেনা? সমরেশ তো তবু উন্নতি করছে, চন্দনা উচ্চ পুচ্ছ অবনমিত করে ত্রাণ খুঁজছে পরিমিত পত্নীত্বের মধ্যে। কেউই থেমে নেই। বিপ্লব না হোক, পরিবর্তন তো হচ্ছে। শুধু একা রণধীরেরই কোন পরিবর্তন হবেনা? সেই শুধু পৃষ্ঠা ওলটাবেনা? সেই শুধু রূপান্তর খুঁজবে অবধারিত মৃত্যুর পরিণামে?

আচ্ছা, দেবিকা-নীলাচলের বদল হবে কিছু? নিশ্চয়ই হবে। ইংরেজ যখন বিতাড়িত হবে তখন তাদের এই পেটোয়ারাও পিঠ দেখাবেন। লাল-ফিতে-আঁটা এই কালোসাহেবের পরিষদ। কে জানে! হয়তো এরাই আবার জেঁকে বসবে, মঞ্চের নিচের খুঁটি হবে—খামের খুঁটি একেকটি। আগে গাছেরটা খেয়েছিল এখন তলারটা খাবে। তবু বদলাতে হবে মনোভঙ্গি, পশ্চিম মুখে না তাকিয়ে তাকাতে হবে পূর্বমুখে, দেশমুখে। মিষ্টাররা সব শ্রী হবেন। মেমসাহেবরা মা।

সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হতে সুরু করে। ড্যালহৌসি স্কোয়ারে বোমা

পড়েছে। ট্রাম-বাস বেশি রাত চলাফেরা করে না। কি যেন অকস্মাৎ ঘটে যাবে সর্বত্র সেই উদ্ব্যস্ততা। রাস্তায় সৈন্যদের ভিড়। দূরে দূরে স্থগিতগতি অভিসারিকার ইসারা। বন্ধনহীন আনন্দে ছুটে চলেছে রহস্যময় ট্যাক্সি। সময় ফুরিয়ে আসছে, যা পার, ফূর্তি করে নাও—চারদিকে সেই পরাজয়ের শৈথিল্য পলায়নের বিশৃঙ্খলা।

তামসীও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল, কে একটা লোক পিছু নিয়েছে সন্তর্পণে। হঠাৎ ফুটপাতের উপর সে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুটপাতের ধার ঘেঁসেই উঠে গেছে সিঁড়ি—দোতলায় মদের হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ে হুড়মুড় করে নামছে কতগুলি মাতাল, সঙ্গে তাদের দুটো পণ্যস্ত্রী। সেই দলের মধ্যে একজন রণধীর।

ভীষণ নেশা করেছে। একটা মেয়ের কাঁধের উপরে হাত রেখে এলিয়ে পড়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে কি প্রলাপ বকছে। মেয়েটা নেশায় থমথমে হলেও এ প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় কিছুট কুণ্ঠা প্রকাশ করতে চাইছে, কিন্তু রণধীরের পক্ষে এ নির্লজ্জতাটাই যেন অহংকার, জগজ্জনকে দেখাবার মত। ত্রস্ত পায় সরে গেল তামসী। ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল থরথর করে। পিছনের লোকটার থেকে কত দূর তার ব্যবধান দৃকপাত করল না।

মোড়ের থেকে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে উঠল তাতে মাতালের দল। সঙ্গে সেই দুটো হেটো মেয়ে। একটার কোলের উপর রণধীর ঢলে পড়েছে। ঢলে পড়েছে মৃত্যুর অতলে।

ট্যাক্সিটা চলে গেল।

তামসী কি তবু দাঁড়িয়ে থাকবে মূঢ়ের মত? বাড়ি ফিরবেনা? আলো জালিয়ে দেখবেনা সেই বরাভয়ময় মহাত্মার মুখ?

টলতে-টলতে থামতে-থামতে বাড়ি ফিরল তামসী। পরাস্ত, পর্যুদস্তের মত। বিছানায় পড়ে রইল অনেকক্ষণ। আলো জ্বালালনা, ঘর-মন অন্ধকার করে রইল। কান্না নেই কাতরোক্তি নেই—একটা ব্যর্থ ঘৃণা নিঃশব্দে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। কুরে-কুরে খেতে লাগল বুকের মধ্যে। শুধু ঘৃণা নয়, ঘৃণার চেয়ে বেশি—ক্রোধ, পারুষ্য, প্রত্যাহারের প্রতিজ্ঞা।

ঘরের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তামসীর। শীত, তবু বাইরের রোয়াকে এসে একটু বসল। কোথাও এতটুকু তার আশ্রয় আছে কিনা তাকাল আকাশের দিকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্লজ্জ আকাশ। মৃত্যুর বার্তাবহ। পথ চিনে এখুনি হয়তো এসে পড়বে জাপানী বিমান। আবার ঢুকে পড়তে হবে নিঃসঙ্গতার বিবরে।

তাই হোক, বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক কলকাতা।

চাঁদের আলো হলেও গলিটা অন্ধকার। হঠাৎ তামসীর গায়ের উপর টর্চের ঝলক পড়ল। একটা লোক গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

রাস্তার সেই পিছু-নেওয়া লোকটা হবে হয়তো। কিংবা আর কোনো নিশাচর। দস্তরমাফিক ভদ্রলোকের চেহারা। এত রাতে শীতে নির্জন গলিতে রোয়াকের ধারে চুপচাপ বসে আছে বলে ঠিকঠাক ধরে নিয়েছে। যেন এমনি এক পথচারীর জন্যেই তার যত প্রতীক্ষা।

রাগে গায়ের রক্ত জ্বলে উঠল তামসীর। খালি পা, জুতো নেই, নইলে ছুঁড়ে মারত মুখের উপর।

আচ্ছা, আরো এগিয়ে আসুক লোকটা। কদর্যতার স্পর্ধাটা একবার দেখি। আর—একটু। তোক দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাবে। লোকজন ডাকিয়ে মেরে তুলো-ধুনো করে দেবে। ধরিয়ে দেবে পুলিশে। লাঞ্ছনার একশেষ করাবে। জগৎসংসারের কাছে রাষ্ট্র করে দেবে তার অকীর্তি।

লোকটা ইতি-উতি করতে লাগল। কাছে এসেও যেন একটু দূরে থেকে যাচ্ছে।

কোমলকণ্ঠে তামসী জিগগেস করলে, 'কি চান? কাকে চান?'

'তুমি—আপনি—এই একটু—এমনি এদিকে—সমস্ত রাত নয়—'

'আপনার ভুল হয়েছে। এটা গৃহস্থপাড়া। আর আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই।'

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। বললে, 'আমাকে মাপ করুন। না জেনে মনে কষ্ট দিলাম আপনাকে। চলে যাচ্ছি এখুনি।' পড়ি-মরি করে সরতে পারলে যেন বাঁচে। বললে, 'ওদিকে আর রাস্তা আছে?'

'নেই। বাড়ি ফিরে যান।'

'বাড়ি ফিরে যাব!' লোকটা যেন এমন অপূর্ব কথা শোনেনি কোনোদিন।

'হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে নিজের মার কথা, স্ত্রীর কথা, কি মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবুন। দেখবেন ভালো হয়ে গিয়েছেন।' আশ্চর্য, তামসীর স্বরে রাগ নেই জ্বালা নেই। বরং যেন মায়া, সহানুভূতি।

লোকটা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

আটত্রিশ

'বয়!'

একাকী কামরায় বসে জ্ঞানাঞ্জন মদ খাচ্ছেন। আপিস থেকে বাড়ি ফেরেননি। মোটর ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছেন হোটেলে।

দাও আরো দু পেগ। একটু নেশা করার মত করে খাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

চিরকাল পরের সর্বনাশে প্রফুল্ল হয়েছেন জ্ঞানাঞ্জন। আজ বুঝি নিজের সর্বনাশে আনন্দিত হচ্ছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই যদি যায় তবে কোথায় থাকবে তাঁর এই ধনপতিত্ব, স্ফীতোদর স্বার্থপরতা! না, তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো যাক। একটা সাম্রাজ্য যাওয়ার আনন্দ তো কম নয়।

আশ্চর্য, তাঁর নেশা হয়েছে বুঝি।

নইলে নিজের সর্বনাশে উৎসব করছেন তিনি? তাঁর কি যাবে? কল-কারখানা, প্রভাব, প্রসার, এই মাংসল পরিপূর্তি? কিন্তু সেই সঙ্গে এত দিনের সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। সেই বনেদ খুঁড়ে ফেলে দিয়ে পত্তন হবে নতুন সভ্যতার, স্বকর্মকৃৎ স্বাধীনতার। চারদিকের এই প্রলয়-বিলয়ের মাঝখানে শুধু এই অনুভূতিটুকুই তাঁর অবলম্বন। সব যাবে, তিনি যাবেন, তবু দেশ স্বাধীন হবে—সর্বনাশের সমুদ্রের শেষে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ তীর—সকলের মত তাঁরও যেন সেই শেষ আশ্রয়—তারই উৎসব-রাত্রি আজ।

জাপানীরা আজ মধ্যরাত্রে কলকাতায় অবতরণ করবে। এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবে কলকাতা। কেমন দেখতে হবে না জানি সেই দৃশ্য! মদের গ্লাশের গহ্বরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন জ্ঞানাঞ্জন।

সেই বুঝি তোমার স্বাধীনতার নমুনা? ইংরেজকে ছেড়ে জাপানীর পদসেবা। জাপানের সাধ্য কি সে ভারতবর্ষকে বশীভূত করে? জাপানী কি ইংরেজের মত শিল্পী, রূপদক্ষ? ইংরেজ কি ভারতবর্ষকে পৌরুষে জয় করেছে, মাত্র কায়িক বলপ্রয়োগে? কখনো না। ইংরেজ জয় করেছে চালাকি করে, আমাদেরকে বোকা-বুঝিয়ে। সর্ববিষয়ে সে আমাদের বড়, আমাদের মাননীয় এই ধাপ্পা দিয়ে। শুধু মাননীয় নয়, পালনীয়, পূজনীয়, অনুকরণীয়। বলেছে, তোমাদের ভাষা দাস-ভাষা, আমাদের ভাষা শেখ; তোমাদের পোষাক বন্য পোষাক, আমাদের পোষাক পরো; তোমাদের খাদ্য অসভ্যের খাদ্য, আমাদের খানা খাও। আমরা গদগদ হয়ে বলেছি, আহা এমন ভাষা নেই, আমরি এমন পোষাক নেই, আর অহো এমন খানা কি হাতে ধরে খাওয়া চলে! আমাদের এমনি করে মজিয়েছে যে আমরাই ওকে ভজনার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। কালোসাহেব বানিয়ে ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্যে কালো করে রেখেছি। জাপানীর আছে কি সেই শিল্প-বুদ্ধি, সেই উচ্চম্মন্যতা? হয়তো শহরে ঢুকেই আস্তাবলের হোটেলগুলোতে ঢুকে গোস্ত কাবাব খেতে সুরু করবে, দল বেঁধে বলাৎকার করবে মেয়েদের, জুতোসেলাই, গারোয়ান, ফিরিওয়ালা কোন কিছুতে তাদের আপত্তি হবে না। সাধ্য নেই সে ইংরেজের মহিমা অর্জন করে। যদি সে পূজাই না পায়, তবে প্রসাদভোজী আমরা, কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারব না। ঠিক তাড়িয়ে দেব।

ভয় নেই, সুভাষ বোস আসছে। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে আজ আর আজাদ হিন্দ ষ্টেশন থেকে সুভাষ বোসের বক্তৃতা শোনা হলনা। শহরের দেয়ালে দেয়ালে আষ্টেপৃষ্ঠে আনাচে কানাচে লেখ—কুইট ইণ্ডিয়া! গাছের পাতায় পাতায় লেখ, পায়ের ধূলায় ধূলায় লেখ। সেকি বক্তৃতা! ওদের যদি 'ভি', আমাদের তবে 'কিউ আই'। ভারত শুধু ইংরেজ ছাড়বে না, জাপানীও ছাড়বে। কোনো ভয় নেই, কোনো সংশয় নেই। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে গান্ধী অন্য প্রান্তে সুভাষ।

তাই আজকে একটা পরমোৎসবের রাত নয়? জ্ঞানাঞ্জনের হয়তো সব যাবে, কিন্তু দেশের লোক তো পাবে। সে-পাওয়াতে কি তাঁরও কিছু পাওয়া হবে না? তিনি যাই হোন, তিনিও তো দেশেরই একজন। তাই সব যাবে এ কথা কে বলে?

'বয়!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁক দিলেন জ্ঞানাঞ্জন।

হোটেলের ছোকরা তটস্থ হয়ে কাছে দাঁড়াল।

আরো কাছে এসে দাঁড়াতে ইসারা করলেন জ্ঞানাঞ্জন। গলার স্বর ঈষৎ ঝাপসা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েমানুষ আছে?'

'আছে।'

'বাজারে বাজে জিনিষ?'

'না হুজুর, একদম ফ্রেশ। ভদ্দরলোক।'

জ্ঞানাঞ্জন মৃদু হাস্য করলেন। বললেন, 'বাঙালী?'

'য়্যাংলো চান, তাও হাতে আছে। কিন্তু রেট বেশি। তাছাড়া ওদিকে আজকাল সোলজারদের আনাগোনা—'

'না, না, ওসব দোআঁশলা চাই না। শুধু মাতৃভাষায় একটু প্রেমালাপ করতে চাই। টাকা দিয়ে তো প্রেম কেনা যায়না, একটু না হয় ক্ষণস্থায়ী প্রেমালাপ কিনি।' শেষ দীর্ঘরেখায় চুমুক টেনে নিলেন জ্ঞানাঞ্জন।

'এখানে আনব, না, বাইরে নিয়ে যাবেন? চেনা-মারা ট্যাক্সি আছে আমাদের।'

'দাঁড়াও, নেশাটা আগে জমুক। নেশা না জমলে প্রেয়সীকে রূপসী বলে মনে হবে কি করে? মাত্র মুখের আলাপকে কি করে মনে হবে প্রেমের আলাপ? তার চেয়ে আগে আমাকে আরো দু পেগ হুইস্কি দাও। পাশের ঘরে এত হল্লা কেন? ডার্টি ন্যুইসেন্স!'

পাশের ঘরে বিরলে বসে একা কেউ খাচ্ছেন না। সেখানে চার-চারজন বন্ধু স্থূলরীতিতে ইয়ার্কি ফুর্তি করছে। কোনো রাজনীতি বা দার্শনিকতার ধার ধারবার তাদের সময় নেই। যতক্ষণ না হোটেল বন্ধ হয় যতক্ষণ না পকেটে টান ধরে ততক্ষণ তারা কোলাহল করবে। অসম্ভ্রান্ত হবার সখ হয়েছে কেন জ্ঞানাঞ্জনের? হয়েছে যখন তখন মেনে নিতে হবে প্রতিবেশীকে। প্রেমালাপ শুনতে হলে কিছুটা দুঃখের আলাপও শুনে যেতে হয়।

'আরেক রাউণ্ড নে মাইরি। তোর পায়ে পড়ি।'

'আর খাসনে, রণধীর। এবারে মারা পড়বি।'

'পড়ব তো পড়ব। তাতে তোর কি। কার জন্যে, কিসের জন্যে বাঁচব? একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম—'

'আহা! ভালোবাসা যে ভালোবাসা! না ব্রাদার, ভালোবাসার কথা যখন বলছে তখন দে ওকে আরো দু দাগ।' আরেকজনকে কে সুপারিশ করলে। 'হ্যাঁ, তারপর—'

'জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম দিব্যি কোন বড়লোকের রক্ষিতা হয়ে বসেছে। বাঁচতে গিয়েছিলাম, বাঁচাতে পারল না। ঠেলে আবার জেলে পাঠিয়ে দিলে। তারপর—' রণধীরের কণ্ঠস্বরে নতুন স্বাদ অশ্রুজলের স্বাদ।

'আর এক পেগ পাবি। বেশি নয়।' বললে কাপ্তেন-বন্ধু। 'আর টাকা নেই।'

'ইংলণ্ডের এরোপ্লেন নেই বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তোমার টাকা নেই বিশ্বাস করতে পারব না।' বললে তৃতীয়জন। 'স্লিট ট্রেঞ্চের কণ্ট্র্যাক্ট নিয়ে তুমি আঙুল হয়ে বসেছ।'

'বেশ, দু পেগ। কিন্তু বলে রাখছি আজ আর মেয়েমানুষ পাবিনে।' পকেটে হাত ঢোকাল কাপ্তেন।

'তোদের না হোক আমার একটা চাই।' বললে রণধীর। সামনের টেবিলের উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে।

'ওর যে ভালোবাসা!'

সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠল।

'হ্যাঁ, ভুলতে চাই সেই ভালোবাসা। আমার প্রথম যৌবনের সত্যিকারের প্রেম। এক পাপের পর আরেক পাপের পলস্তারা লাগিয়ে সেই ভাঙা প্রেমের ফাঁক বোজাচ্ছি। সেই বিশ্বাসঘাতকতার সিঁধ। আর বিশ্বাসঘাতকতা কি একটা?' রণধীর মাথা তুলতে যাচ্ছিল, টেবিলে আবার এলিয়ে পড়ল।

'নেভার মাইণ্ড ব্রাদার, নে, খা।'

'পিও সরাব পিও।' আরেকজন কে গান ধরলে করুণসুরে: 'তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।'

'এবার জেল থেকে বেরিয়ে আবার বাঁচতে গিয়েছিলাম। এবার গিয়েছিলাম দেশনেতা অধিপ মজুমদারের কাছে। অধিপদা আমাকে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন।'

'কেন? কেন?' একসঙ্গে টেবিলের উপর অনেকগুলি চড় পড়তে লাগল।

'আমি অযজ্ঞীয় বলে।'

'মানে।'

'যজ্ঞের অযোগ্য বলে। চরিত্রহীন বলে। তোমার টাকা নেই টাকা হতে পারে, বিদ্যা নেই বিদ্যা হতে পারে, স্বাস্থ্য নেই স্বাস্থ্য হতে পারে, কিন্তু চরিত্র যখন একবার নেই তখন তুমি আর চরিত্র ফিরে পেতে পারনা। দেশের হোমানলে আহুতি হবারও তোমার অধিকার নেই।'

'ভালই তো হল।' টিপ্পনি কাটল কাপ্তেন। 'মরতে হল না।'

'বাঁচতে পারলাম না!' নতুন-ভরতি গ্লাশটা রণধীর আঁকড়ে ধরল: 'বাঁচার মত করে বাঁচতে পারলাম না। তাই চলেছি আবার মৃত্যুর সন্ধানে। ভয় নেই মদে মরবনা, বোমায় মরবনা, মরব পাপে —সেই চরিত্রহীনতায়। যুদ্ধের যুগে পাপও আজকাল সম্ভ্রান্ত হচ্ছে—কিন্তু আমাদের কোনো দৈবযোগ নেই—পাপের বাজারেও আমরা সেই চিরকালের অভাজন। নইলে অধিপদা—'

'কেন, কী করেছে?'

'আমাকে তাড়িয়ে দিলেন চরিত্রহীন বলে। কিন্তু তিনি, নিজে— দাঁড়া, শেষ করে নি গ্লাশটা।'

একজন সিগারেট ধরিয়ে দিলে রণধীরকে।

'কিন্তু তিনি নিজে গিয়ে কী! তাঁর ঘরের মধ্যে লুকানো মেয়েমানুষ! বললেন কিনা, নায়িকা, চণ্ডনায়িকা। শোনো কথা। ভণ্ডনায়কের চণ্ডনায়িকা—' রণধীর টেবিলে আবার মাথা রাখল।

'তার মানে চণ্ডু খাচ্ছে আজকাল।'

সবাই আবার প্রবল শব্দে হেসে উঠল।

'এর পর রণধীরকে জোগাড় করে দিতে হয় একটি। অধিপের পাল্‌টা জবাব।'

'একটি মদালসা মদিরনয়না—' আবৃত্তির মত করে বললে একজন টেনে-টেনে।

'হ্যাঁ বাবা, চণ্ডু-চরসে চলবে না আমাদের, আমাদের মদো-মাতালই ভালো।' বললে তৃতীয়জন।

স্লিট ট্রেঞ্চের কণ্ট্র্যাক্টার সবাইর চোখের সঙ্গে চোখ মেলাল একবার। 'বললে, কিন্তু, মাইণ্ড ইউ, ওনলি ওয়ান।'

একটা ছোট তমসা খোপে কালচিহ্নহীন পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তামসী। সর্বংসহা বসুন্ধরার মত। মূর্তিমতী তিতিক্ষা। হাসিনী-নার্সের থেকে পাঠ নেওয়া তার মিথ্যে হয়নি। পাপের সম্মুখে অগ্রসর হবার অক্ষুণ্ণ উপেক্ষা সে পেয়ে গেছে এত দিনে। অনেক ধৈর্য, অনেক প্রতীক্ষা দিয়ে তা তৈরি। এ একটা কঠোর শান্তির মত। দুঃখে যা উদ্বেল করে না, সুখে যা বিগতস্পৃহ করে। এ যেন অপরিহার্য নিয়তি। এ পাপের সমুদ্রে ডুবতে হবে তামসীকে। পাপীয়সী সাজতে হবে। এ যেন তার সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ। এমন যজ্ঞ যাতে সর্ব-

সম্পত্তি দক্ষিণা দিতে হয়! বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। প্রেমের কাছে আবার পাপ কি? যিনি সর্বান্তর্যামী তাঁর কাছে নিবেদনে আবার অশুদ্ধি কি?

ভগবান, শক্তি দাও। আঘাত সহ্য করবার, অপমান সহ্য করবার ক্ষয়হীন ক্ষমতা দাও। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য কর। কোমলেকঠোরে অচঞ্চল আত্মসংযমিনী হতে দাও। যাতে জয়ী হতে পারি। পাপপঙ্ক থেকে তুলে আনতে পরি সে মনোরত্নকে। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে। যে কোনো কলঙ্কের যৌতুকে। ভগবান, তুমি কি চাও না, আমার প্রেম জয়ী হোক, পাপের উপর জয়ী হোক?

'ভালো মক্কেল আছে। চলুন।' তামসীকে লক্ষ্য করে বললে হোটেলের—'বয়'। অস্পষ্ট অথচ ত্বরিত স্বরে।

আরো দুজন বসে আছে অপেক্ষারতা। এরা তামসীর মত ছদ্মবেশিনী নয়। স্পষ্ট চিহ্নাঙ্কিত। এতক্ষণ এদের সঙ্গে সমগোত্রতাই অনুভব করছিল তামসী, কিন্তু এখন মনে হল, এদের চেয়ে তার দাবিটাই অগ্রগণ্য। এদের চেয়ে বুঝি একটু বেশি ভদ্র, বেশি পরিচ্ছন্ন। ভালো মক্কেলের পক্ষে উপযুক্ত।

গাড়ি যেন ছেড়ে দেবে এমনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তামসী। ঘরের দেয়ালে ভাগ্যিস কোনো আয়না নেই। থাকলে নিজের করুণ-কুৎসিত মুখটা দেখে খানিকক্ষণ হয়তো দ্বিধা করতে হত। গায়ের ছোট র‍্যাপারটার বিন্যাস নিয়ে দ্বন্দ্ব করতে হত মনে মনে।

'ঐ ঘরে।' দু'হাতে প্লেট-গ্লাশ নিয়ে চলে যাচ্ছিল বয়, চিবুক তুলে ঘর দেখালে।

আধা-কাটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তামসী।

'এই? এরি এত ব্যাখ্যানা? দিস ওল্ড হ্যাগ! এরি সঙ্গে প্রেমালাপ করতে হবে? উইথ দিস বিচ?' চেয়ার পেরিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন জ্ঞানাঞ্জন: 'মাই গুড গড! ওম্যান ইজ ফানি।'

দু হাতে মুখ ঢাকল তামসী। যাতে জ্ঞানাঞ্জন না সত্যি চিনতে পারেন। যাতে না এতদিনে শোধ তোলবার সুযোগ পান।

বাতিল হয়ে গিয়েছে যখন, তখন এক মুহূর্তও আর দাঁড়ান উচিত নয়। ওদিকে আর কারু হয়তো ডাক পড়ে যাবে। ওদিকের ডাকের জন্যে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যে ডকিনী তার আবার নিমন্ত্রণ কি। সে ডাকাতি করে ছিনিয়ে আনবে তার মণিহার।

'নাও টাকা নিয়ে যাও। পঞ্চাশ টাকা। ঐটেই আমার লোয়েস্ট চাঁদা।' জ্ঞানাঞ্জন হাত বাড়ালেন টেবিলের উপর দিয়ে। 'মন্দ কি, প্রেমালাপ করতে চেহারা লাগে না। যাবেই যদি, তোমার নামটি বলে যাও। নাম কি বায়সী?'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পাশের ঘরে দ্রুততর পায়ে অন্তর্হিত হল তামসী। যেন প্রায় আশ্রয় নেবার প্রয়োজনে। এবার আর তার ঘর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

মাতালের দল স্তম্ভিত হয়ে রইল। এ যে প্রায় জল না চাইতেই বৃষ্টি দান। গাছে না উঠেই এক কাঁদি। আর, এ তো দেখি দিব্যি! রণধীরটার ভাগ্য ভাল।

'আপনাদের একজনের জন্যে দরকার শুনলাম। এঁর জন্যে বোধ হয়?' টেবিলের উপর মাথা রেখে মুহ্যমানের মত বসে ছিল রণধীর, তামসী তার কাছে এসে দাঁড়াল।

'না মাইরি, মুফৎ নিতে পারবে না রণধীর। লটারী হোক।' বললে একজন।

'কিংবা স্বয়ংবরা হোক। দময়ন্তীর যাকে পছন্দ।'

'পছন্দ হবে কি দেখে? টাক না চেহারা? দুটোতেই আমি সমান ওস্তাদ।'

'বোসো না মাইরি বোসো। দু এক পাত্তর হোক। অত তাড়া কিসের? আমাদের দরকারে কী এসে যায়? তোমার কাকে দরকার তাই বল?' কাপ্তেন হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তামসীকে। দলাধিপতির অধিকারের বলে।

তামসী আরো এগিয়ে এল রণধীরের চেয়ার ঘেঁসে। হাসি-কান্না রাগ-বিরাগের ওপারে চলে এসেছে সে। প্রসারিত স্পর্শটা সহজেই অম্লান করে মুখে সান্ত্বনার মেকি হাসি টেনে সে বললে, 'আমাকে যার সত্যিকারের দরকার, আমারও দরকার সেই তাকেই।' বলে রণধীরের চেয়ারের হাতলটা সে ধরলে শক্ত করে। আত্মস্থিতের মত বললে, 'চেয়ে দেখ, আমি এসেছি।'

উদয়দিগন্তে সে যেন প্রাত্যূষিকা রশ্মিরেখা।

'শালা যে এখনো ঘুমুচ্ছে। এই শালা, ওঠ,' রণধীরের কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিলে তার নিকটের সঙ্গী: 'চেয়ে গ্যাখ, মেয়েমানুষ এসেছে। নিজে থেকে পছন্দ করেছে তোকে। তোর দরকারে নাকি তারও দরকার।'

'কই?' মাথা তুলে আচ্ছন্ন চোখে তাকালো রণধীর। বললে, 'বাঃ, এই তো এত কাছে। আর আমি কিনা দূরে-দূরে খুঁজছি।' বলে তামসীর একটা হাত সে গভীর অবলম্বনের মত করে আঁকড়ে ধরল। বললে, 'তোমার নামটি কি বল না।'

'অত আদিখ্যেতায় দরকার নেই।' রাগে কণ্ট্র্যাকটর-কাপ্তেনের শরীর ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল। হোটেলে নতুন জিনিস আমদানি হয়েছে অথচ দলের মধ্যে প্রথমে তার ভাগে আসবে না তারই জন্যে রাগ। গলার স্বরে তীব্র ঝাঁজ ফুটে উঠল: 'বলি, ছুরৎ পছন্দ হবে, না, বাতিল করে দিবি?'

'কেমন ঠক্কে গিয়েছে চেহারাটা, তাই না? নেশার চোখে ঠিক ধরতে পারছিনা। চেহারা দিয়ে আমার কী হবে! সব চেহারাই সমান। যারা এ লাইনে আছে তাদের চেহারার আবার রকমফের কি! যাঁহা একুশ তাঁহাই একান্ন। আর যাঁহা একান্ন তাঁহাই একুশ।'

'কিন্তু টাকা? টাকার কথা জিগগেস করেছিস?' দাম্ভিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে কণ্ট্রাকটর।

ফেরেববাজ মেয়ে টাকা নিশ্চয়ই বেশি হাঁকবে। নিজেকে অন্তত কৃত্রিম সম্ভ্রম দেবার জন্যে। যত বেশি বলবে ততই কণ্ট্রাকটরের আশা। অনায়াসে মুখ ভার করে বলতে পারবে, অত টাকার ক্ষমতা নেই আজকে। নির্বিবাদে নামঞ্জুর হয়ে যাবে রণধীর। এতটুকু প্রতিবাদ করবার জায়গা পাবেনা। পরের দয়ার উপর যে খায় তার আবার প্রতিবাদ কি। সামান্য কটা খুচরো টাকা তাকে না-হয় ভিক্ষে দিয়ে দেবে। রিকশাতে চড়ে আশেপাশের কোনো আটপহুরে শস্তা পল্লীতে গিয়ে আস্তানা গাড়বে।

সত্যিই তো, টাকা? টাকা কত নেবে? রণধীর বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল।

এক হাত হাতের মধ্যে, অন্য হাত পিঠের উপর রেখে রণধীরকে তামসী আকর্ষণ করলে। বললে, 'ওঠো, আমার ঘরে চল। টাকা লাগবে না। আমার কোনো দাম নেই। তুমিই দামী কর আমাকে।'

চোখে ঠিক নির্ণয় করতে পারেনি। সব ছিল অস্পষ্ট ও রেখাহীন। কিন্তু কণ্ঠধ্বনি যেন নিয়ে এল কোন অপূর্ব পরিচয়ের জাদুমন্ত্র। মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠল রণধীর। বললে, 'তুমি কে?'

ভয় পেল তামসী। বললে, 'আমি কেউ নই। আমি যা আমি তাই।'

তামসীর মাথাটা রণধীর জোর করে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে এল। বললে, 'সব ভোঁতা, ঘোলাটে লাগছে। বল, কথা কও, আমার কানে-কানে বল তুমি কে।'

'এখানকার সবাই আমাকে চিনেছে, আর তুমিই শুধু চিনলেনা?' তরল সরলতায় সশব্দে হেসে উঠল তামসী। বললে, 'ছাড়ো, আর কত মাতলামো করবে? আমার সঙ্গে বাইরে চলো, ঠিক চিনতে পারবে। দেখবে কোথায় তোমাকে নিয়ে যাই।'

রণধীরের নাকে এসে লাগল যেন তামসীর গায়ের গন্ধ—আত্মার গন্ধ।

'চিনেছি।' সহর্ষকণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রণধীর। 'তুমি অসি। বলো, তাই না? তুমি সেই অসি না?'

দশদিক ঝলকিত হল মুহূর্তে। হ্যাঁ, আমি মসী নই, আমি অসি। আমি খড়্গাধার। আমার প্রখরতাই আমার পবিত্রতা।

তামসী চুপ করে রইল।

তার নমিত চক্ষুকে স্পর্শ করতে চাইল রণধীর। বললে, 'তুমি এইখানে এসেছ? এই হোটেলে?'

চোখ তুলল তামসী, নির্ভর-ভরা দুটি গভীর কালো চোখ। 'এইখানে না এলে তোমাকে ধরতাম কি করে?'

'তুমি কোথায়, কতদূর নেমে এসেছ অসি।'

'তুমি অত নিচেই আমাকে পেতে চাইলে। সমুদ্র তো অত নিচেই থাকে। দেখনি, পাহাড়ের জল কতদূর নেমে আসে সমুদ্রের জন্যে। নিচে থেকেই তো সমুদ্র মহান হয়।'

তামসীর হাত ও কাঁধের উপর শরীরের ভর রেখে অবশ পায়ে উঠে দাঁড়াল রণধীর। বললে, 'তোমার ঘরে আমাকে যায়গা দেবে?'

'তোমার জায়গার জন্যেই তো আমার ঘর। যাতে তোমারও যায়গা হয় তেমনি করেই আমার ঘর বাঁধা।'

'তুমি জান না অসি, আমার কত পাপ!'

'জানি বলেই আমার পাপেরও আর সীমা রাখিনি। কিন্তু, কিছু ভয় নেই, চলো। আমার ঘরেই আবার পাপমোচনের মন্ত্র আছে।'

সেদিন যখন এমনি সিঁড়ি দিয়ে নামে, রণধীরের পার্শ্বলগ্ন মেয়েটা কুণ্ঠাক্লিষ্ট হয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সমর্পণ অকুণ্ঠতায় গ্রহণ করল তামসী। রণাঙ্গণ থেকে যেন কোন আহত সৈনিককে নিয়ে যাচ্ছে সে নিভৃত সেবাশিবিরে।

'মামলাটি মাইরি ভাল ছিল।' পিছনের মাতাল বন্ধুদের একজন বললে।

'চোখ রাখিস একটু। মামলাটি যেন না বেতদবিরে মারা যায়!'

ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এল তারা—তামসী আর রণধীর। রণধীর আর তামসী। যা ছিল ঘর তাই এখন বাড়ি।

ঘর খুলে আলো জ্বালাল তামসী। দড়ির খাটিয়ার উপর পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা। রণধীরের হাত ধরে টেনে এনে বিছানার উপর বসিয়ে দিল। বললে, 'তোমার শরীর সুস্থ নেই, তুমি শুয়ে পড়। ঘুমোও।'

'আর তুমি ?'

'আমি ঐ চেয়ারটাতে বসে রাত জাগব তোমার শিয়রে।'

'রাত জাগবে ?'

'হ্যাঁ, পাছে না আবার পালিয়ে যাও চুপিচুপি।'

'আর পালাবনা। তোমার ঘরে বা গায়ে আর কিছুই নেই যা নিয়ে পালাতে পারি।'

'তোমাকে আর এই ঘর বা ঘরণীর রূপসজ্জা দেখতে হবেনা। আলোটা নিবিয়ে দি।'

'কিছু খাবেনা ?'

'তুমি জাননা, কত খেয়েছি আজ। পেট ভীষণ ভরে আছে।'

'আলো নেভাবে যে, অন্ধকারে ভয় করবেনা ?'

তামসী মনে-মনে হাসল। বললে, 'আর ভয় কি। আজ তো সব সমান-সমান। কোনোদিকেই আজ আর পাপ-পুণ্য অপমান-অভিমান নেই। ঘর অন্ধকার করে দেব, ভাবব, সত্যিই পেয়েছি কিনা, না, সব অন্ধকারের মতই মিথ্যে ?' আলো নিবিয়ে দিল তামসী। 'মাঝে-মাঝে যদি তন্দ্রা আসে, তন্দ্রা ভেঙে মাঝে-মাঝে তোমাকে স্পর্শ করে দেখব, সত্যিই তুমি কিনা, না, আর-কেউ।'

অনেকক্ষণ বেহুঁসের মত পড়ে ছিল রণধীর।

ডাকলে : 'অসি ?'

'কেন ?'

'অনেকক্ষণ সুন্দর ঘুমোলাম। কী শান্তি তোমার ঘরে ! এত শান্তি পেলে কোথায় ?'

'শান্তি ?'

'পবিত্রতা। তুমি আমাকে কঠিন মিথ্যা কথা বলেছ, অসি। তোমার পাড়াটা দরিদ্র হলেও ভদ্র, পরিচ্ছন্ন। আর তোমার এই ঘর আর বিছানা, তোমার হাতের এই স্পর্শ, পবিত্র তীর্থস্থান। ঘরের বাতাসটি পর্যন্ত সুস্বাদু। এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে ?'

চুপ করে রইল তামসী।

'অন্ধকার হলেও আমি সব বুঝতে পারছি স্পষ্ট। তুমি এই অন্ধকারের মতই অমল, অকলঙ্ক। আমিই পাপী, কলুষিত। আমরা সমান-সমান নই। আমি অনেক নিচে পড়ে। অনেক নিচে পড়ে। তুমি তোমার প্রেমে সেই অনেক নিচেই নেমে এসেছ। হাত ধরে তুলে নিতে এসেছ আমাকে।'

'না। তোমার হাত ধরে সামনে চলতে এসেছি। 'আমরা চিরদিন সমান-সমান। এক সমতলে। এই সামনে চলাতেই আমাদের মুক্তি। আমাদের পাপমোচন-শাপমোচন।'

'হবে, আমারও পাপমোচন হবে ? তুমি বিশ্বাস করো, অসি ?'

'যেমন বিশ্বাস করি আজকের রাত্রি প্রভাত হবে। প্রতিদিন প্রভাতে আমাদের এই পুরাতনী পৃথিবী নতুন হচ্ছে। তেমনি করে নতুন হব আমরা। জীবনে নতুন পৃষ্ঠা ওলটাব।'

'আমি—আমিও নতুন হব?'

'হবে। মাটিতে নতুন ঘাস গজায়, গাছে নতুন পাতা আসে। নতুন শিশুর দল তাদের হাসিতে কলরবে নতুন ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে। অহরহ চলেছে এই নতুনের নামজারি। আমরাও নতুনের খাতায় নতুন নাম-পত্তন করব। আমাদের সমস্ত দেখাটি নতুন হয়ে উঠবে।'

'তুমি বিশ্বাস কর অসি? কর?' প্রশ্নটা শোনাল আর্ত-আকুতির মত।

'করি, বিশ্বাস করি।' গভীরনিস্থত শান্তির বাণীর মত শোনাল তামসীকে। 'কাজ করি, ক্লান্ত হই, কূল হারিয়ে ফেলি। আবার এই বিশ্বাসের আলোতে পথ চিনে ঘরে ফিরে আসি। এ আলো নেবে না, কাঁপে না, ক্ষয় হয় না। এ আলোতে জীবনের পরমধন খুঁজে পাই।'

দুজন ধীরে-ধীরে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। শরীরহীন গভীর স্পর্শে সেই বিশ্বাসের তাপ যেন পরস্পরের দেহের সঞ্চার-সঞ্চয় হতে লাগল।

সূর্য উঠেছে। বিরাট নভোমণ্ডলে বিপুল সমারোহ পড়ে গিয়েছে। পুরাতনী পৃথিবী নবনবীনা হচ্ছে। আসছে বৃহদ্ভানু, বিভাবসু। যে লোকসাক্ষী, লোকচক্ষু—যে লোকপ্রকাশক।

ভোরের আলোতে দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল—নতুন দৃষ্টিতে। নতুন বিশ্বাসের শক্তিতে। মুগ্ধের মত, তৃপ্তের মত, শক্তিশালীর মত। তারপর দুজনের মিলিত দৃষ্টি পড়ল গিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে। মহাত্মা গান্ধীর দিকে।

তামসী বললে, 'মানুষে যাঁর মরণহীন বিশ্বাস তাঁকে বিশ্বাস করি।'

এমন যেন প্রত্যাশা করেনি রণধীর। এমন উচ্চারণ, এমন উদ্‌ঘাটন। কিছুক্ষণ সে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল সেই সৌম্য-সহাস্য সরল-শান্ত আননমণ্ডলের দিকে। তামসীর একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টেনে নিল। চেপে ধরে রইল সবলে। বললে, 'বিশ্বাস করি।'

শেষ

নয়

রাত্রি তিনটে বাজল।

পাশের বাড়ীর দোতালাতে একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি আছে। যার শব্দ শীতের রাত্রে দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও শোনা যায়। বিমল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করলে। চোখ জ্বালা করছে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। আজ সে সারাটা দিনই লিখছে। গল্পটা শেষ করতেই হবে। বাংলা মাসের সংক্রান্তি আজ। হিরণদের কাগজ লেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমলের অনুরোধে সম্পাদক অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। বিমলের উপর ক্রমশ তাঁর আস্থা বাড়ছে। আগামী কাল পর্য্যন্তও তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন। কিন্তু বিমল আজই লেখাটা শেষ করবে বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছে। কালকের দিনটা তার নিস্ফলা দিন গিয়েছে। লাবণ্য অরুণার নিমন্ত্রণ, কালীনাথের আকস্মিক আবির্ভাব, গোপেন দার ডাক, পিনাকীর ছুরি খাওয়া এবং রাত্রিটা তাকে নিয়ে কাটানো— এই সব নানা ঘটনার মধ্যে লেখার কাজ তার কিছুই হয়নি। লেখা দূরে থাক, গল্পটা নিয়ে সে ভাবতেও পারেনি। আজ সকালে পিনাকীকে বিদায় করে সে লিখতে বসেছে। স্নান করে নি, খায় নি, লিখেই চলেছে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবে সে লেখে। এ লেখায় যত যন্ত্রণা তত আনন্দ। আবিষ্ট মস্তিষ্কের অন্তরালে দৈহিক সচেতনতা ক্লান্ত কাতর হয়ে থামতে চায়, কিন্তু থামবার উপায় নেই। চলচ্ছক্তিহীন তৃষ্ণার্ত্ত যেমন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলে দূরবর্ত্তী পদ্মদীঘির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই লেখা লিখেই চলে লিখেই চলে। মধ্যে মধ্যে কলম রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী আঙুল দুটি টেনে মটকে নিতে হয়, মধ্যে মধ্যে চা খায়, বাঁ পাশে থাকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই, একটার পর একটা ধরায় কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয়।

এই চায়ের জন্যেই সে একটা ফ্লাস্ক কিনেছে, নইলে চা খাবার জন্য বারবার উঠে দোকানে যেতে হয়। এর সঙ্গে থাকে একটা পাঁউরুটি আর দু-চার পয়সার মাখন। নিতান্ত ক্লান্ত হ'লে—এক একবার উঠে রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসে—সেই সময়ে ফ্লাস্কটা নতুন চায়ে ভর্ত্তি করে আনে।

চুমুক দিয়ে বিমলের চা আর ভাল লাগল না। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন প্রদাহ অনুভব করছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে কুঁজো থেকে গড়িয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃপ্তি পেলে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে হ'ল না। একটু চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইল।

শেষ রাত্রে স্তব্ধ মহানগরী। রূপকথার জনহীন পুরীর মত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এ অঞ্চলটা মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে এমন কোন কারখানা নাই যা দিন রাত্রি চলে। খবরের কাগজের আপিস থাকলে এতক্ষণ রোটারী চলতে সুরু করত। স্টেটস্‌ম্যান অমৃতবাজার আনন্দবাজারের মেসিন রুম এতক্ষণ মুখর হয়ে উঠেছে। বসুমতীরও রোটারী আছে। এ ছাড়া আর বোধ হয় সব তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসপাতালে রোগী দু একজন জেগে আছে। নার্স ঢুলছে। হাঁপানীর রোগীরা উঠে বসে কাশছে হাঁপাচ্ছে। চোরেরাও আর জেগে নেই, তারা নৈশ অভিযান সেরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ। দেহপণ্যাদের পল্লীতেও তাণ্ডবের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ।

হঠাৎ সে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজপথের উপর। চিক্ চিক্ শব্দ ক'রে চকিত হয়ে ছুটে পালাল একটা ছুঁচো। তার পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদুর।

পল্লীগ্রাম হলে হয় তো দেখা যেত একটা সাপ। কিম্বা ঝাঁপ্ শব্দ করে লাফ দিয়ে পালাত একটা 'পাউস বেড়াল'। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত' বাদুড়। গাছ থেকে ডাকত' পেঁচা। আর ডাকত অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে জনহীন রাজপথ। দু ধারে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, মধ্যে মধ্যে দু একটার শিখা কাঁপছে—লালচে হয়ে উঠেছে তাদের শিখা, ম্যাণ্টাল ভেঙে গেছে। কালো পিচ দেওয়া পথের রঙ মনে হচ্ছে ইস্পাতের মত। শীতের রাত্রে ছাইগাদায় শুয়ে আছে পথ-বিহারী কুকুর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল। তারপর ফিরে এসে আবার লিখতে বসল। মিহিরের বাবাকে নিয়ে গল্প। কিছু দিন আগে সে তাঁকে দেখেছিল, বর্ষার রাত্রে ভাঙা ফাটলধরা পুরাণো ড্রয়িংরুমে পায়চারী করতে। সেই দিনই তিনি বিক্রী করেছিলেন তাঁর বাড়ী। লালচে কেরোসিনের আলো পড়েছিল তাঁর পীত পাণ্ডুর দেহবর্ণের উপর। অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল তাঁর চোখে। অতীতকালের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়। অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল বিমলের। তাঁর জীবন আজও শেষ হয় নি কিন্তু গল্প তাকে শেষ করতে

হবে। তাই সে ভাবছিল। পুরাণো বাড়ীখানা ভাঙতে সুরু করেছে এইটুকু সে জানে। মিহিরের বাবা কোথায় সেও সে জানে না। মিহিরকেও সে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। তাই তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের বাপের কথা। মনে পড়ল তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মহলটি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি আর বাইরে বড় বের হতেন না। দিনে থাকতেন পুজো-অর্চ্চনা নিয়ে, শাস্ত্রপাঠও করতেন; গভীর রাত্রে তিনি গিয়ে উঠতেন ছাদে। মনে পড়ছে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে সে শুনতে পেত ছাদের উপর ভারী পায়ের খড়মের শব্দ বাজছে খট-খট, খট-খট, খট-খট। মধ্যে মধ্যে শব্দ বন্ধ হ'ত। সে শুনেছে তার মা বলতেন তিনি তাকিয়ে থাকতেন উত্তর দিকের দূরের গাছপালার দিকে; রাত্রির অন্ধকারে গাছপালা স্পষ্ট দেখা যেত না কিন্তু তিনি নাকি বলতেন 'ওই ডিহি শ্যামপুরের অশত্থগাছের মাথা, ওই তারাসায়রের পাড়ের তালবনের শোভা, দেখতে পাচ্ছ?"

হাতে কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে বসল।

"শেষ রাত্রির মহানগরী। নিস্তব্ধ, কিন্তু আলোকিত। জনহীন পথ ঘাট। ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের নতুন তৈরী বিশাল প্রশস্ত কংক্রিট করা পথের ধারে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি। সেই পথের ধারেই একটা বিশাল পুরাণো বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ। অর্দ্ধেক ভাঙা হয়েছে— ছাদ নাই, দরজা জানালা ছাড়ানো হয়ে গেছে। একদিকে সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং পুরাণো চুণ সুরকীর গাদা পড়ে আছে।

তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। পীত পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে মৃতের দৃষ্টির মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বিশাল পুরাণো বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীত কালের যক্ষ, মুক্তি পেয়েও বিব্রত হয়ে পড়েছে, মাথার উপরে গ্রহতারকার দীপ্তিময় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কোথায় যাবে? মধ্যে মধ্যে নিজের পাঁজরায় হাত বুলায়, মনে হয় পাঁজরাগুলি ভেঙে গেছে—বুকের মধ্যে জমে উঠেছে অস্থিপঞ্জরের ভগ্নস্তূপ, ঠিক এই ইট চুণ সুরকীর ভগ্নস্তূপের মতই। কদর্য্য লাগে নূতন কালের ইমারতগুলি। গড়িয়ে আসে চোখ থেকে জলের ধারা। রাত্রি শেষ হয়ে আসে। অকস্মাৎ এক সময় বড় বস্তীর ধারের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিভে যায় এক সঙ্গে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটতে থাকে কিন্তু সে মূর্ত্তিকে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে বোধ হয়। সকালে শুধু দেখা যায় ওই ইট চুণ সুরকীর স্তূপের উপর পড়ে আছে ছেঁড়া একটা শালের টুকরো; জীর্ণ পুরাণো শালের আঁচলার খানিকটা। মজুরের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, ছেলেদের খেলা করতে দেবে।

সকাল বেলা ওদিকে মিহির বের হয় তার কাজে, বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে সে চলে—

ডকের ওখানে তাকে সাড়ে সাতটায় পৌঁছুতেই হবে। সে এখন কাজ নিয়েছে ডকের নূতন কন্‌ষ্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টে।"

* * * *

শ্রীপত্রিকার সম্পাদক কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। মোটা নাক বড় বড় চোখ বলিষ্ঠ চেহারা, যেমন হাস্যরসিক তেমনি অপ্রিয়ভাষী। এই দুয়ের যেখানে সংমিশ্রণ হয় সেখানে লোকটির জুড়ি মেলা ভার। আর একটি দুর্লভ গুণ মজলিষী শক্তি। সকাল আটটা থেকে চেয়ার জুড়ে বসেন—খাওয়া নাই স্নান নাই ঘর নাই সংসার নাই আছে শুধু কাগজের আপিস আর লেখকের দল, একদল আসে একদল যায়, গল্প লেখক কবিতা লেখক প্রবন্ধ লেখক চিত্রশিল্পী, প্রফেসর, ধনীর সন্তান মায় রাজনৈতিক নেতারা পর্য্যন্ত।

চায়ের পেয়ালা খালি বা ভর্ত্তি টেবিলের উপর আছেই। মধ্যে মধ্যে টোষ্ট ডিম আসে। কখনও চলে নূতন কালের সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা কখনও চলে নূতন কালের প্রশস্তি; অর্থাৎ যখন যাদের দল ভারী থাকে তখনই চলে তাদেরই মতের উচ্চ ঘোষণা।

সম্পাদক বিজনবাবু কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ মত প্রকাশ করেন না, শুধু হুঁ-হাঁ পূরে যান মধ্যে মধ্যে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করে হাসির উল্লাসে জমিয়ে তোলেন আসরকে। মধ্যে মধ্যে লোকটির অকপট চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সে কিন্তু কদাচিৎ।

গল্পটি নিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিমল। এঁদের এই আসরে প্রত্যেকেই তার চেয়ে খ্যাতিমান। এবং সকলেই এই গ্রাম্য লোকটির প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা পোষণ করে থাকেন। সে বিমল জানে। কিন্তু তাকে জয় করতেই হবে। জেনে শুনেও সে আসে লেখা নিয়ে, চেষ্টা করে সম্পাদককে একা পেতে। একা তাঁকে শুনিয়ে লেখাটি তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় দলের ভিড়ে এসে পড়লে চুপ করে একপাশে বসে থাকে। এদের তরল উচ্ছ্বসিত সংস্কৃতি-বিলাস চোখ মেলে চেয়ে দেখে। মজার কথা হচ্ছে—বিমল এদের দলের কবি ও গল্প লেখকদের সকলের চেয়েই বয়সে বড়, কিন্তু সে এখানে বসে থাকে সকলের কনিষ্ঠের মত।

শুধু নীরেন তার একমাত্র সমবয়সী এ দিক দিয়ে—অর্থাৎ এই অবজ্ঞাত সহকারী সম্পাদকটিই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। আর সম্পাদক বিজনবাবু অন্তরঙ্গ না হলেও তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এক ক্ষেত্রে বিমলের কাছে বিজনবাবুকে ঠকতে হয়েছে।

শ্রী পত্রিকা প্রথম বের হচ্ছে সেই সময়ের কথা। এই আপিসেই বিজনবাবু প্রত্যেককেই লিখতে অনুরোধ করলেন তাঁর কাগজে, শুধু বিমলকে অনুরোধ করলেন না। কথা দু চারটে বললেন অবশ্য—তাও আরও দু চারটে সিঙাড়া কচুরী নেবার অনুরোধ জানিয়ে।

সিঙাড়া কচুরী বিমল খেলে না কিন্তু উঠেও গেল না আসর থেকে। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল প্রথম সংখ্যার লেখক-তালিকা। গল্প লিখবেন স্থির হল বিখ্যাত গল্পলেখক সূর্য্য লাহিড়ী এবং কমল রায়। আসরের শেষে উঠে গেল বিমল। সন্ধ্যায় নীরেন তার বাসায় এসে তার কাছে কাতর ভাবেই ক্ষমা চাইলে, সেই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওই আসরে। প্রত্যক্ষভাবে বিজনবাবুর সঙ্গে বিমলের আলাপও সেই প্রথম। বিমল হেসে সে দিন নীরেনকে বলেছিল—বস, ও সব কথা ছেড়ে দে। কাল রাত্রি থেকে একটা লেখা সুরু করেছি, শুনবি? শেষ হয় নি তবু শোননা খানিকটা—।

লেখা যতদূর হয়েছিল পড়া শেষ হতেই নীরেন তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—লেখাটা শেষ কর। আর আমায় না বলে কোথাও দিবি না বল?

—দেব না।

—ওরে তুই যেন হঠাৎ সোনার কাঠী খুঁজে পেয়েছিস। লিখে ফেল বিমল—লিখে ফেল।

সত্যিই সে সোনার কাঠী হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। লেখা শেষ করে সে নিজেও আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। লেখাটার শেষের দিকে বিজনবাবুর প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভটাই হয় তো সে সোনার কাঠী খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

নীরেন গল্পটা চেয়ে নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছিল বিজনবাবুকে। বিজনবাবু লেখাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে এসে বিমলের টিনের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন লেখাটি আমায় দিতে হবে। এই প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব আমি। সূর্য্যবাবুর লেখা দ্বিতীয় সংখ্যায় যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—শ্রীতে আপনাকে লিখতে হবে, নিয়মিত ভাবে লিখতে হবে। আপিসের আসরে যাবেন।

আসরে সে আসে, চুপ করে একপাশে বসে থাকে, শোনে। বড় বড় কথা, অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহিত্যের কোটেশন। মোটামুটি ওমরখৈয়ামী ধারা—জীবন একপেয়ালা আনন্দরস, তার উপর জমে আছে বেদনার ফেনা।

তাকে দেখেই বিজনবাবু বললেন—আপনার জন্যে বসে আছি। বসুন। ওরে—চা নিয়ে আয়। পড়ুন লেখা পড়ুন।

লেখাটি হাতে দিয়ে বিমল বললে—আপনি পড়ে দেখুন। আমার শক্তি নেই আর। ঘুমে চোখের পাতা ভেঙে পড়ছে। চাও খাব না, কাল দিন রাত চা খেয়ে আছি।

বিজনবাবু মজলিষে উপস্থিত লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—থাক এখন।

—আমি উঠি।

—না। ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকটা।

একখানা বইয়ে ঠাসা ঘর, বিজনবাবুর লাইব্রেরী, তারই মধ্যে একটা ক্যাম্পখাটে একটা বিছানা পাতাই আছে। মধ্যে মধ্যে বিজনবাবু এখানেই রাত্রি কাটিয়ে থাকেন। পত্রিকা বের হবার আগে দুদিন থাকতেই হয়, তা ছাড়াও থাকেন—কবিতা লেখার নেশা চাপলে সেদিন আর বাড়ী যান না। আরও দু চার দিন থাকেন; বইয়ের আলমারীর ফাঁকে প্রকাণ্ড বিয়ারের বোতল রাখা রয়েছে। আলমারীর পিছনে আরও দু চারটে ছোট বোতল খুঁজলে পাওয়া যাবে। জটিল চরিত্রের লোক বিজনবাবু। লেখক দলের একটি গোষ্ঠী আছে যাদের নিয়ে এই হৈ হৈ করে বেড়ানোও তাঁর জীবনের একটা দিক।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বিজনবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিজনবাবু ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। বিমলের মুখের ওপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে ষাট ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেকট্রিক বাল্ব, আলোটা জ্বলছে। তীব্র আলো চোখে লাগল। বিজনবাবু বললেন—উঠুন। রাত্রি নটা বাজে। নীরেন।

নীরেন উত্তর দিলে— যাই।

পাশের বাথরুমের দিকে দেখিয়ে বিজনবাবু বললেন—যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিমল দেখলে—নীরেন এসেছে, টেবিলের উপরে তিনটে প্লেটে তিনটে ডবল ডিমের মামলেট - আর চা। বিজনবাবু বললেন -খেয়ে নিন। তারপর গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনব।

বিমল শঙ্কিত হল। পড়তে পড়তে তা হ'লে কি সে নিজেই বুঝতে পারবে লেখাটা ভাল হয়নি?

বিজনবাবু তাড়া দিলেন—পড়ুন।

সঙ্কোচ রেখে বিমল খাতাটা টেনে নিলে। ব্যর্থ হয়ে থাকে—তাতেই বা কি? বইতে পারবে সে ব্যর্থতার বোঝা। পড়তে আরম্ভ করলে সে।

—মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরাণো বাড়ী।

গল্প শেষ করলে বিমল। বিজনবাবু বড় বড় চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। চোখে শিরার জাল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে নেশা করেছেন তিনি। নীরেনও চুপ করে বসে রয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজনবাবু বললেন—দিন লেখা।

নীরেন হেসে আবার বললে—বড় জবর লিখছিস রে বিম্‌লা।

গভীর স্বরে বিজনবাবু বললেন—জবর মানে? বাংলা সাহিত্যের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে এটি একটি। যাও দিয়ে এস প্রেসে। কম্পোজ বসে আছে। কাল সকালে শেষ হওয়া চাই।

নীরেন চলে যেতেই, বিজনবাবু বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে।

বিমল তার মুখের দিকে তাকালে।

বিজনবাবু বললেন—আপনি সকলের সামনে এমন চুপ ক'রে ব'সে থাকেন কেন? ওদের সামনে লেখা পড়তে চান না—

বিমল তার দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। বিজনবাবু বিস্মিত হলেন তার দৃষ্টি দেখে। এমন দৃষ্টি যে এই লোকটির চোখে ফুটতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

বিমল বললে—হয়তো আমারই দোষ। ওঁরা ভাবেন দুঃখের ফেনা মাথায় ক'রে জীবন এক পেয়ালা আনন্দ। আমি তা ভাবতে পারি না বিজনবাবু।

চমকে উঠলেন বিজনবাবু। এতখানি গভীর-গম্ভীর উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিমল বললে—ওই ধারায় যদি আমাকে ভাবতে বলেন, তবে আমি বলব সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বট পাতা মাথায় দিয়ে আনন্দের ধ্যান করব আমি।

বিজনবাবু আবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলের দিকে। এ যেন নূতন করে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মধ্যে।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে একদল লোকের জুতোর শব্দ উঠল। সঙ্গেসঙ্গে উল্লাসের হাসি। বিমল প্রশ্ন করলে—এত রাত্রে কারা?

বিজনবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বিরজাদের দল আসছে। বিরজা বিখ্যাত গল্প লেখক, নকুল তার ভক্ত কবি, রতন—বাংলাসাহিত্যের নবীনতম লেখক—বিজনবাবু ওকে বলেন 'ডার্ক হর্স', ভূপেন এবং আরও কয়েকজন। লম্বা বাবরী চুল আঙুলে জড়িয়ে পাক দিতে দিতে ভূপেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। চমৎকার আবৃত্তি করে ভূপেন, পড়াশুনাও তেমনি প্রচুর। আরও একটি গুণ আছে ভূপেনের। জীবন তার খোলা খাতা। সে ভালবাসে এক অভিনেত্রীকে। স্ত্রী পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করে সে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ভূমিকা রচনা করছে। মধ্যে মধ্যে দশ দিন বারো দিন একাদিক্রমে সেখানেই থাকে, সকলকেই ঠিকানা দিয়ে রেখেছে—"দরকার হলে বাড়ীতে না পেলে সেখানে পাবে আমাকে।" অসঙ্কোচে বলে সে। এর জন্য বিমল ভূপেনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওই ভূপেনই যখন এসে বলে "কিছু টাকা আমায় আজ দিতেই হবে বিজনবাবু। বাড়ীতে

"আনন্দ মিশ্রে...
এইমাত্র অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলো। সারাদিনের খাটুনির পর এক কাপ ভালো চা খাওয়ার জন্যে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। কিন্তু বেচারীর ভালো চা বুঝি খাওয়া হলো না। তার বাড়িতে চায়ের জন্যে কেট্‌লিতে জল চাপিয়ে রাখা হয়েছে সেই কোন সকালে, আর সারাদিন ধরে সেই জল ফুটছে তো ফুটছেই। এ রকম জলে কক্ষনো চা ভালো হয় না। জল একবার মাত্র টগবগিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তা দিয়ে ভালো চা হয়।"
আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।
চা তৈরির
পাঁচটি সহজ নিয়ম
★
১। টাটকা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পটটা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর এ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।
ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শন্ বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।
সব চেয়ে ভালো
ভালো-তৈরি
চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 296

বউ বিয়ের বেনারসী প'রে রান্না করছে ;" অর্থাৎ কাপড় না কিনলেই নয়। টাকাটা অবশ্য এ্যাডভান্স ; তখন বিমল ক্ষুব্ধ হয়।

বিমল উঠল, বিজনকে বললে—চললাম আমি তা হ'লে।

এক কালে ভারতবর্ষে সাহিত্য রচনার কেন্দ্র ছিল বনভূমি। দেবতার স্তবগান রচনা করতেন ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজার সভায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিরা। রাজার স্তবগান মিশিয়েছিলেন তাঁরা দেবতার স্তবের সঙ্গে। মুসলমান আমলে হিন্দু কবিরা গ্রামে পাতার কুটীরে বসে গান রচনা ক'রে গানের দল নিয়ে বেড়াতেন। এ কালে মহানগরীতে এসে কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে, প্রকাশকেরা দোকান খুলেছে, কবি লেখকদের রচনা বই হয়ে বেরুচ্ছে—বিক্রী হচ্ছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের কথা এসেছে। মুক্ত হয়েছে রাজার স্তবগান করার লজ্জা থেকে। রাজা গুণী হলে গুণীর গুণগানে লজ্জা নাই কিন্তু রাজার গুণগান আশ্রয়ের জন্য অন্নের জন্য—সে যে দাসত্ব, চাটুকারবৃত্তি। জীবনের জয় গান। যে জীবন মাটির তলায় বীজ ফাটিয়ে উদ্গত অঙ্কুরের মত আকাশ লোকে আলোক স্নানে যাত্রা করতে চায় বনস্পতির মত সেই জীবনের জয়গান। মাটির কঠিন আস্তরণকে চৌচির করে ফাটিয়ে ঠেলে পথ করে নেওয়ার কষ্টে প্রাণান্তকর বেদনায় জর্জ্জর অথচ আনন্দের তপস্যায় বিভোর সেই জীবনের গান। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বাধা বিঘ্নকে ঠেলে সে উঠতে চাচ্ছে। দিকে দিকে তার অভিব্যক্তি। যত দুর্ব্বার গতি তার, তত বিরাট বাধা তার সম্মুখে, যত কঠিন বাধা তার পথে তত বিপুল জয় তার, সুখ এবং দুঃখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে দিন এবং রাত্রি আলোক এবং অন্ধকারের মত। এই বেদনা এই আনন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব না করলে কি সে গাইতে পারে এই গান ?

হন হন করে হেঁটেই চলেছিল বিমল। মনের খুসীতে এবং উত্তেজনায় ভাবতে ভাবতেই চলেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মনোহরপুকুর রোড। এসপ্লানেডের মোড়ে সে থমকে দাঁড়াল। একখানা শ্যামবাজারের ট্রামে জানালার ধারে অরুণা বসে রয়েছে। অরুণার ওপাশে— কে ? পিনাকী ? ঝাঁকড়া চুল, পুরু চশমার একখানা কাচ দেখা যাচ্ছে। পিনাকীই তো।

চৌরঙ্গী পার হয়ে বিমল এসপ্লানেডে এল। অরুণা এবং পিনাকীই বটে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হেসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে নমস্কার করলে। বললে—ওঁকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম চাকরীর জন্যে।

অরুণা বললে—একটা অনাথাশ্রমে ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

গম্ভীর ভাবে বললে কথাটা, রাজ্যের ভাবনার ছায়া নেমেছে অরুণার মুখে। গম্ভীর

মুখে সে ময়দানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললে—আমি অনেক ভাবলাম ওখানে ওই ভাবে দর্জ্জির কাজ করে—। কথাটা শেষ না করে সে ঘাড় নাড়লে বারবার। —পারবে না, সে তা পারবে না।

পথে ভবানীপুর চক্রবেড়ের ধারে বিমল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। এইখানে একটা পাইস হোটেল আছে, সেখানে খেয়ে বাসায় ফিরবে। অরুণা কোন কথা বললে না, সে ভাবছে। পিনাকী একটু হাসলে।

খেয়ে বাসায় ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। কে বসে রয়েছে দরজায় ?

—কে ?

—আমি, পিনাকী।

—পিনাকী ?

—হ্যাঁ। আজও একটু শোব এখানে। ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি পকেটে একদম পয়সা নেই। একখানা দু টাকার নোট যেন ছিল ; কিন্তু—।

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বিমল অনুভব করলে সে অপ্রতিভের মত হাসছে।

—লাবণ্যদির কাছে গেলে দিতেন কিন্তু বড্ড বকতেন। আমারও লজ্জা লাগল।

বিমল হেসে বললে—ওঠ, দরজা খুলি।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যার সঙ্গে যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইয়া গেলো, তাঁহারা যদি পুনরায় পূর্ব্বাশার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বার্ষিক বা ষাণ্মাষিক চাঁদা পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইবো।

কার্য্যাধ্যক্ষ
পূর্ব্বাশা

দ্রষ্টব্য :—পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১০ হইতে ৮৪০ পর্য্যন্ত ভ্রমবশতঃ ৮২০—৮৫০ ছাপা হইয়াছে।